BANGLADESH

1972-75

প্রকাশনায়
জাতীয় গ্রন্থ বিতান
১৭ কে জি গুপ্ত লেন ঢাকা
প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৮০
প্রচ্ছদ চিত্রণে
বীরেন সান্যাল
দাম
টাকা একশত পঞ্চাশ মাত্র
মুদ্রণে
মহীউদ্দীন আহমদ
জাতীয় মুদ্রণ
১০৯, হৃষিকেশ দাস রোড ঢাকা

Bangladesh : Bahattar Theke Panchattar (Bangladesh : 1972 to 1975) Edited by Munir Uddin Ahmad Published by Jatiya Grantha Bitan 17 K G Gupta Lane Dacca Printed by Mohiuddin Ahmad Jatiya Mudran 109 Hrishikesh Das Road Dacca Bangladesh, Price : Bangladesh Tk. 80·00 Foreign £ 3·00

বাংলাদেশ
বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর
(১৯৭২—৭৫)

আইন-শৃঙ্খলা

বাগেরহাটে লুটতরাজ অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৪, ১৯৭২

দু'টি মৃত্যু কয়েকটি জিজ্ঞাসা

আবার দু'জন আদম সন্তানকে রাজধানীর রাজপথে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর মুহূর্ত থেকে এ ধরনের ঘটনা রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলের প্রতিটি জনপদে সংঘটিত হয়ে আসছে।

—সোনার বাংলা মার্চ ৪, ১৯৭২

ডাকাতি : খুন : রাহাজানি

দেশ স্বাধীন হবার পর সকলেই আশা করেছিল এবার বুঝি নিরুদ্বেগে এক শান্তিময় পরিবেশে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলা যাবে। কিন্তু তা আর হল না।

প্রতিদিন আমাদের কাছে এমন অসংখ্য সংবাদ আসে, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে বোমা বিস্ফোরণ, গুলী করে হত্যা বা ডাকাতে-পুলিশে গুলী বিনিময়, সশস্ত্র ডাকাতি ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এসব হত্যা ও রাহাজানির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতারের খবর তেমন একটা আসে না।

—সোনার বাংলা মে ২৮, ১৯৭২

বাংলাদেশে প্রতিদিন কত লোক খুন হচ্ছে?

বাংলাদেশে দৈনিক কতো লোক খুন হচ্ছে? এ প্রশ্নটি আজ জনমনে বিশেষভাবে আলোড়িত হচ্ছে। প্রত্যহ যেভাবে হত্যা-রাহাজানির খবর আসছে তাতে এ ধরনের প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। সংবাদপত্রের পাতা উল্টালেই দেখা যাবে কোথাও ডাকাতের গুলীতে নিহত, কোথাও দুষ্কৃতিকারীদের হামলায় নিহত, কোথাও বা ঘর থেকে বের করে খুন, কোথাও দা দিয়ে জবাই করা ইত্যাকার নানা ঘটনা প্রত্যহ ঘটছে বাংলাদেশের সর্বত্র। মাত্র দুই-তিন দিনের রাজধানীর দৈনিক পত্রিকাগুলো দেখলেই প্রত্যহ বাংলাদেশের সর্বত্র কত আদম সন্তান কতভাবে প্রাণ দিচ্ছে তার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যাবে।

অনুমান করা হচ্ছে যে, সমগ্র বাংলাদেশে দৈনিক গড়ে ৭০ থেকে ১০০টি আদম সন্তান দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হচ্ছে।

—সোনার বাংলা জুন ৪, ১৯৭২

এবার কারফিউ দিয়ে লুট!

সম্প্রতি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার মৌকরা ইউনিয়নের মোদ্দা গ্রামের এক ব্যক্তির বাড়িতে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত কারফিউ দিয়ে লুটতরাজ করে।

—সোনার বাংলা জুন ২৫, ১৯৭২

আদমজীর দাঙ্গা আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়ছে : শতাধিক নিহত হবার আশঙ্কা

আদমজী মিলের ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার বিষবাষ্প অবশেষে মদনগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ ও ঢাকেশ্বরী এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, এপর্যন্ত বিক্ষিপ্ত গোপন হত্যায় নিহতের সংখ্যা শতাধিক বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

—গণকণ্ঠ জুলাই ৩, ১৯৭২

আজকের গ্রাম-বাংলা : খুন ডাকাতি জখম ছিনতাই

—গণকণ্ঠ আগস্ট ৩০, ১৯৭২

শহরে আরেকটি ব্যাংক ডাকাতি

গতকাল (শনিবার) প্রকাশ্য দিবালোকে ৩ জন সশস্ত্র তরুণ দুর্বৃত্ত বেইলী রোডস্থ উত্তরা ব্যাঙ্কের মহিলা শাখা লুট করিয়া ১১ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করে।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯৭২

দেশে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি : সেই সংগে সুপারিশও : পুলিশ নিরুপায়

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১৬, ১৯৭২

৯ মাসে রংপুরে ৩০২টি খুন : ২২৬টি ডাকাতি

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১৬, ১৯৭২

প্রতি ৪ ঘণ্টায় ৩টি ডাকাতি!

শুধু রাজধানী ঢাকা নগরী নয়, দেশের সর্বত্র অপরাধপ্রবণতা আবার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজধানীতে প্রতিদিন গড়ে ৩টি করিয়া

ডাকাতি হয়। সমগ্র দেশের হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে, চলতি মাসে গড়ে প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর তিনটি করিয়া ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২৯, ১৯৭২

দশ মাসে চার সহস্রাধিক ডাকাতি

দেশে গত দশমাসে মোট ৪,২৫০টি ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়াছে যে, এই সময়ের মধ্যে ঢাকা জেলায় সর্বাধিক ৬৮৬টি এবং নোয়াখালী জেলায় সর্বনিম্ন ৩৬টি ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৩, ১৯৭২

দশমাসে ১৪ হাজার চুরি

গত জানুয়ারী মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই ১০ মাস সময়ের মধ্যে দেশে প্রায় ১৪ হাজার ৩ শত ৫৫টি চুরি সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৪, ১৯৭২

ঢাকায় পুলিশের গুলীবর্ষণ : ২ জন নিহত : ৬ জন আহত

গতকাল (সোমবার) ঢাকাস্থ মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের সম্মুখে পুলিশের গুলীবর্ষণে ২ জন ছাত্র নিহত ও ১ জন প্রেস ফটোগ্রাফারসহ ৬ ব্যক্তি আহত হয়।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২, ১৯৭

ভৈরবের অদূরে বৃহত্তম লঞ্চ ডাকাতি : নগদ এক লক্ষ টাকা ও ৫০ হাজার টাকার মালামাল লুণ্ঠন

সম্প্রতি ভৈরবের মেঘনা নদীর ডুবাজাইলে স্মরণকালের বৃহত্তম ল ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৬, ১৯৭

সিরাজগঞ্জের সর্বত্র আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি : পুলিশ অসহায়

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৮, ১৯৭

ভাণ্ডারিয়ার গ্রামাঞ্চলে জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নাই : পুলিশ অসহায় না কর্তব্যবিমুখ ?

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৯, ১৯৭৩

ডাকাতি : রাহাজানি : ছিনতাই : খুন : গ্রামবাংলার সাধারণ চিত্র : নিরাপত্তার অভাবে জনমনে সন্ত্রাস

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১১, ১৯৭৩

ব্যাংকের টাকা ও গাড়ী ছিনতাই

গতকাল ঢাকার গেন্ডারিয়া এলাকায় কয়েকজন সশস্ত্র যুবক পোস্তগোলা সোনালী ব্যাংকের ২ হাজার ৫ শত ৮২ টাকা ৭৯ পয়সা ছিনতাই করিয়া চম্পট দেয়।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী, ১১, ১৯৭৩

আইন-শৃঙখলা পরিস্থিতির অবনতি রোধে আর কতদিন ?

গ্রাম-বাংলায় সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের মগের মুল্লুক কায়েম

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১৩, ১৯৭৩

সন্ত্রস্ত মানুষ ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া মাঠে-জঙ্গলে অথবা নদীবক্ষে নৌকায় রাত্রি যাপন করিতেছে

যশোরের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিভীষিকা ও ত্রাসের রাজত্ব

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১৮, ১৯৭৩

দুর্নীতির স্বগরাজ্য নিয়ামপুর থানা : পুলিশ নিষ্ক্রিয়

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৪, ১৯৭৩

একনজরে গত এক বছরে দেশের আইন-শৃঙখলা পরিস্থিতি : ব্যাঙ্ক ডাকাতি—৩১টি : গুপ্ত হত্যা—১৪৬৭টি, ডাকাতি—২০৩৯টি : ছিনতাই—১৭৩৪১টি।

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ২৯, ১৯৭৩

রক্তস্নাত বাড়বকুণ্ড

বাঙালীর খুনে বাঙালীর হস্ত এমন বীভৎসভাবে রঞ্জিত হইতে পারে তা আমরা ভাবিতে পারি নাই। আশা করিয়াছিলাম, স্বাধীনতা সংগ্রাম-

কালীন পূর্ণ নয় মাস ধরিয়া বর্বরতার যে বীভৎস বিকার লক্ষ্য করিতে হইয়াছে, স্বাধীন বাংলাদেশে তা কোনদিন দেখিতে হইবে না। কিন্তু আমাদের সে আশা সফল হয় নাই। বাড়বকুণ্ড আমাদের সে আশাকে নিরাশায় পর্যবসিত করিয়াছে। নিশীথ রাত্রির কোলে নিশ্চিন্ত নিদ্রামগ্ন শ্রমিক-সমাজের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমাদের মধ্যকার এক শ্রেণীর লোক প্রমাণ করিয়াছে যে, বর্বরতার দিক হইতে আমরাও কম যাইতে পারি না। জানি না, এই লোমহর্ষক ঘটনার নেপথ্য নায়ক কারা ? কাদের প্ররোচনায় বাইশটি (সরকারী হিসাবে) মূল্যবান জীবনের অকাল বিয়োগাত্মক পরিণতি ঘটিল এবং শতাধিক শ্রমিককে আহত হইয়া হাসপাতালে স্থান লাভ করিতে হইল ! তবে নেপথ্য নায়ক যে বা যাহারাই হউক, বাড়বকুণ্ডের ঘটনা আমাদের শিহরিত ও বেদনাপ্লুত করিয়াছে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৭৩

২৮ দিনে ২০ জন আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থক নিহত !

নির্বাচনী তৎপরতা শুরু হওয়ার পর গত এক মাস অর্থাৎ কেবল ফেব্রুয়ারী মাসেই দেশের বিভিন্ন স্থানে গুপ্তঘাতকদের গুলীতে ২০জন আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, আওয়ামী যুবলীগ ও জাতীয় শ্রমিক লীগ কর্মী নিহত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক মার্চ ২, ১৯৭৩

মদ তাড়ি গাঁজা ভাং ধর্ষণ ইত্যাদি, ইত্যাদি !

রূপগঞ্জ (ঢাকা)—দেশ স্বাধীন হবার পর এই থানায় বিভিন্ন এলাকায় মদ, তাড়ি, গাঁজা, ভাং, জুয়া, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ও নারী ধর্ষণ দিন দিন বেড়েই চলছে। জানা গেছে এসব কাজে যারা লিপ্ত তাদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুল-কলেজের ছাত্র।

—সোনার বাংলা মার্চ ১৮, ১৯৭৩

টেক্সটাইল মিলে ১ লক্ষ টাকা ডাকাতি

গত শনিবার হাশেম টেক্সটাইল মিলে এক সশস্ত্র ডাকাতি সংঘটিত হয়। ডাকাতেরা নগদ ও মালামালসহ প্রায় এক লক্ষ টাকা লইয়া পলাইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছে।

—ইত্তেফাক মার্চ ২০, ১৯৭৩

একদিকে লুটপাট চলিতেছে : অপরদিকে ইক্ষুর অভাবে
দেওয়ানগঞ্জ সুগার মিল বন্ধ: আড়াই হাজার
শ্রমিকের ভাগ্য অনিশ্চিত

—ইত্তেফাক মার্চ ২৪, ১৯৭৩

মোহনগঞ্জ বার্তা :
৩টি লাশ উদ্ধার: ২ জন আহত: ৩টি অগ্নিকাণ্ড

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১, ১৯৭৩

বানরিপাড়ায় এক রাতে সাত বাড়ীতে ডাকাতি

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২, ১৯৭৩

ডাকাতি: নরহত্যা: জনজীবন ওষ্ঠাগত

রূপগঞ্জ, বৈদ্যেরবাজার ও আড়াইহাজার থানায় দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্যে জনজীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। পাইকারী লুটতরাজ ও নরহত্যা চালাইয়া তাহারা এই তিনটি থানায় এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৪, ১৯৭৩

জয়দেবপুরে সশস্ত্র ব্যাংক ডাকাতি
সাড়ে আটাত্তর হাজার টাকা ছিনতাই.

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৫, ১৯৭৩

সাধারণ মানুষ নিজেদের হাতে আইন তুলিয়া লইয়াছেন

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৭, ১৯৭৩

চাঁদপুরের পল্লীতে ডাকাতির হিড়িক

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৪, ১৯৭৩

৮০ হাজার টাকা ছিনতাই

ঈশ্বরদী আরোনখোলা সড়কে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হাট ফেরৎ কয়েক জন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে প্রায় ৮০ হাজার টাকা ছিনতাইয়া লইয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২২, ১৯৭৩

রক্ষীবাহিনী নিষ্ক্রিয় কেন? গ্রাম-বাংলায় পুনরায় গুপ্তহত্যা-
ডাকাতি ও সমাজবিরোধী তৎপরতা মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৯, ১৯

গ্রাম-বাংলায় বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের অমানুষিক
কাণ্ডকীর্তন : ডাকাতি-খুন-রাহাজানি আবার চলিতেছে

—ইত্তেফাক মে ৭, ১৯

যশোরের গ্রামে জীবনের নিরাপত্তা নাই

—ইত্তেফাক মে ৭, ১৯৭

দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চলে জীবনের নিরাপত্তা কোথায়?

—ইত্তেফাক মে ৯, ১৯৭

গ্রামে-গঞ্জে আইন-শৃংখলার অবনতি:
ডাকাতি লুটতরাজ চলিতেছে

—ইত্তেফাক মে ১২, ১৯৭

জীবনের নিরাপত্তা নেই: পুলিশ নিষ্ক্রিয়:
মানিকগঞ্জে খুন ডাকাতি রাহাজানি

—গণকণ্ঠ মে ১৪, ১৯৭

নির্বিঘ্নে ডাকাতি-নরহত্যা ও দৈহিক নির্যাতন চলিতেছে

—ইত্তেফাক মে ১৬, ১৯৭

মাগুরায় গণজীবনে নিরাপত্তা নাই : তিন দিনে
৭ ব্যক্তিকে হত্যা :
৩ জনকে এক সারিতে বাঁধিয়া গুলী করা হইয়াছে

—ইত্তেফাক মে ১৮, ১৯৭

সিলেট জেলার সর্বত্র আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি :
সশস্ত্র দুর্বৃত্ত দলের উপদ্রব বৃদ্ধি

—ইত্তেফাক মে ১৯, ১৯৭

শৈলকুপার বিভিন্ন এলাকায় লুটতরাজ
দুর্বৃত্তরা নারী-পুরুষ ও শিশুদের পরনের কাপড়
পর্যন্ত খুলিয়া লইয়া যাইতেছে

—ইত্তেফাক মে ২০, ১৯৭৩

জামালপুরে আড়াই মাসে ৪৮টি হত্যাকাণ্ড : ২৭৩টি ডাকাতি :
বে-আইনী অস্ত্র-শস্ত্রসহ রক্ষীবাহিনী যাহাদের গ্রেফতার করে
তাহারা আবার ছাড়া পায় কিভাবে ?

—ইত্তেফাক মে, ২৭, ১৯৭৩

একরাতে ২২টি বাড়ীতে ডাকাতি

—ইত্তেফাক জুন ৪, ১৯৭৩

আইন-শৃংখলা আদৌ আছে কি ?

নেতৃবৃন্দের আশ্বাস-আবেদন, সরকারী হুঁশিয়ারী, প্রশাসনিক যন্ত্রের তৎপরতা, সব কিছুকে ভ্রূকুটি করিয়া দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক ক্রমাবনতিতে সর্বত্র স্বাভাবিক জীবন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে।

—ইত্তেফাক জুন ৭, ১৯৭৩

গ্রাম-বাংলায় ভয়াবহ পরিস্থিতি :
সর্বত্র চুরি-ডাকাতি খুন রাহাজানি অবাধে চলছে

—গণকণ্ঠ জুন ১১, ১৯৭৩

ছয় লক্ষ টাকা আত্মসাৎ।

জাতীয়করণের পর দেশের কতিপয় বীমা কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়। জাতীয়করণের পূর্বেকার সময়ের বিভিন্ন খাতে ব্যয় দেখাইয়া এইসব টাকা পয়সা আত্মসাৎ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাবেক জনতা ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পৃথক পৃথক ১২টি খাতে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ১৪, ১৯৭৩

৩টি থানায় ৬ মাসে ৬০ জন নিহত

গত ছয় মাসে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা, মিরপুর ও দৌলতপুর থানায় প্রায় ৬০ ব্যক্তি অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হাতে নিহত হইয়াছেন বলিয়া স্থানীয় এক হিসাবে জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ১৭, ১৯৭৩

হত্যা : লুট : ধর্ষণ : হয়রানি : ডাকাতের ভয়ে গ্রাম-বাংলার
মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে শরণার্থী সেজেছে

—গণকণ্ঠ জুন ১৯, ১৯৭৩

এ পর্যন্ত ২০টি ব্যাংক ডাকাতি : ১৬ লক্ষাধিক টাকা লুট

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মালেক উকিল গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় সংসদে বলেন যে, স্বাধীনতার পর হইতে চলতি বৎসরের ১৪ই জুন পর্যন্ত ২০টি ব্যাংক ডাকাতির রেকর্ড হইয়াছে। এই সব ডাকাতিতে ১৬ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত ৫৮ টাকা ৩১ পয়সা খোয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ২০, ১৯৭৩

দুষ্কৃতিকারীরা পুলিশের হাত হইতে অস্ত্র ছিনাইয়া লইতেছে

—ইত্তেফাক জুন ২৫, ১৯৭৩

গ্রাম-বাংলায় পাইকারীহারে লুটতরাজ
আইন ও শৃংখলার চরম অবনতি : জনমনে আতঙ্ক

—ইত্তেফাক জুন ২৭, ১৯৭৩

আরেকটি পুলিশ ক্যাম্পে দুষ্কৃতিকারীদের হামলা

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বরিশাল জেলার কাঁঠালিয়া থানার আমুয়া পুলিশ ক্যাম্পে হামলা চালাইয়া একদল তরুণ দুস্কৃতকারী ৪টি রাইফেল ও কিছু গোলাবারুদ লইয়া উধাও হইয়াছে বলিয়া গতকাল (বুধবার) ঢাকায় প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ২৮, ১৯৭৩

বিভিন্ন স্থানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি
সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের ভয়ে গ্রাম-বাংলার মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত

—ইত্তেফাক জুন ২৮, ১৯৭৩

ঝিনাইদহে এক সপ্তাহে আটটি গুপ্তহত্যা

—ইত্তেফাক জুলাই ১, ১৯৭৩

ঢাকা-আরিচা সড়ক : সূর্য ডুবিলেই ডাকাতের ভয় :

—ইত্তেফাক জুলাই ২, ১৯৭৩

ডাকাতরা ছেঁড়া কাপড়ও বাদ দেয় না

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, বাগেরহাটের পল্লীতে বর্তমানে ডাকাতেরা ছেঁড়া কাপড়, ২।১ সের আটা এবং ২।৪টি টাকার জন্যও ডাকাতি করে।

—ইত্তেফাক জুলাই ২, ১৯৭৩

বরিশালে থানা অস্ত্রশালা লুট

—ইত্তেফাক জুলাই ৪, ১৯৭৩

অস্ত্রশালা লুট : ৪ ব্যক্তি নিহত

গত সোমবার সন্ধ্যায় একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমার লালমোহন থানার অস্ত্রশালা লুট করার সময় এক ব্যক্তি নিহত এবং একজন পুলিশসহ তিন জন আহত হয়।

—ইত্তেফাক জুলাই ৪, ১৯৭৩

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হত্যাকাণ্ডে বিভিন্ন মহলের ক্ষোভ

—ইত্তেফাক জুলাই ৫, ১৯৭৩

দেড় বৎসরে ২ হাজার ৩৫টি গুপ্তহত্যা

গতকাল (শুক্রবার) সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মালেক উকিল জানান যে, গত বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে চলতি বৎসরের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত দেশে ২ হাজার ৩৫টি গুপ্তহত্যা সংঘটিত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জুলাই ৭, ১৯৭৩

গ্রাম-বাংলায় দুষ্কৃতিকারীরা তৎপর

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, গত ৯ দিনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কমপক্ষে ৪৮টি খুন, ৭০টি ডাকাতি ও একটি থানা লুট হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জুলাই ১০, ১৯৭৩

পুলিশ ফাঁড়ি আক্রান্ত : সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র লুট

গতকাল (বুধবার) পত্রিকান্তরের খবরে জানা গিয়াছে, গত সোমবার বিকালে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত বৈদ্যেরবাজার থানার আলীপুর পুলিশ ফাঁড়িটি লুট করিয়া ৬টি রাইফেল, ১টি এস. এল. আর., ৩০০ রাউন্ড রাইফেলের গুলী এবং ৫০ রাউন্ড এস. এল. আর-এর গুলী নিয়া পলায়ন করে।

—ইত্তেফাক জুলাই ১২, ১৯৭৩

আরও একটি পুলিশক্যাম্প লুট : সুবেদার নিহত : ৩ জন পুলিশ অপহৃত

বৈদ্যের বাজার থানার অলিপুরা পুলিশ ক্যাম্প লুট হওয়ার দুইদিন অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার আরেকটি পুলিশ ক্যাম্প লুট, একজন সুবেদারকে হত্যা ও ৩ জন পুলিশকে অপহরণ করার খবর রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অলিপুরা পুলিশ ক্যাম্প লুট করার ন্যায় একইভাবে দুষ্কৃতকারীরা এই ক্ষেত্রেও 'মুসলিম বাংলার' ধ্বনি দিয়া আক্রমণ চালায় এবং পুলিশ দলকে কাবু করিয়া লুণ্ঠনপর্ব সম্পন্ন করে।

—ইত্তেফাক জুলাই ১৩, ১৯৭৩

টিভির কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রাংশ চুরি

বাংলাদেশ টেলিভিশন সার্ভিসের ঢাকা কেন্দ্র হইতে কয়েক লক্ষ টাকার মূল্যবান খুচরা যন্ত্রপাতি অপহৃত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জুলাই ১৪, ১৯৭৩

নিরাপত্তার ভাব হ্রাস পাইতেছে

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে প্রতিদিনই খুন, ডাকাতি, রাহাজানি ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির উদ্বেগজনক খবর পাওয়া যাইতেছে। দিনদিনই গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবন হইতে নিরাপত্তার ভাব লোপ পাইতে শুরু করিয়াছে।

—ইত্তেফাক জুলাই ১৬, ১৯৭৩

ব্যাঙ্ক হইতে এ পর্যন্ত দেড় কোটি টাকা ছিনতাই : রহস্য কোথায় :

—ইত্তেফাক জুলাই ২২, ১৯৭৩

গ্রামে-গঞ্জে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির আরও অবনতি : ডাকাতি, গুপ্ত-হত্যা ও সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ চলিতেছে

দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি অবনতির গুরুতর খবর আসিয়া পৌছিতেছে। সাধারণ গুপ্ত হত্যা নহে, গতকাল বৃহস্পতিবার খবর আসিয়াছে ফাঁড়ি ও বাজার লুটের, খবর আসিয়াছে লঞ্চ ও ট্রেন ডাকাতির। দুস্কৃতিকারীদের জিঘাংসার শিকার হইয়াছে ৭ ব্যক্তি। গত বুধবার রাত্রে দুস্কৃতিকারীরা ঘিওর থানার কামড়া পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র লুট করে। তাহাদের গুলীতে প্রাণ হারায় ২ জন সাধারণ মানুষ। দুর্ধর্ষ ডাকাত দল সুরমা নদীতে লঞ্চ ডাকাতি করিয়া যাত্রীদের সর্বস্ব ছিনাইয়া নেয়। সমাজবিরোধী চক্র হাজীগঞ্জে ট্রেন থামাইয়া যাত্রীদের সবকিছু অপহরণ করে। শ্রীমঙ্গলের একটি বাজারের ব্যবসায়ীগণ ভীতি বিহ্বল চোখে লক্ষ্য করেন, কী নির্মমতার সহিত তাহাদের দোকানের সব কিছু দুর্বৃত্তরা লুট করিতেছে।

—ইত্তেফাক জুলাই ২৬, ১৯৭৩

লৌহজং থানা ও ব্যাঙ্ক লুট

ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার রাত্রে শতাধিক সংখ্যার একদল সশস্ত্র লোক মুন্সীগঞ্জ মহকুমার লৌহজং থানা ঘেরাও করিয়া পুলিশকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে এবং থানার রেকর্ডপত্র তছনছ করিয়া সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যায়। সশস্ত্র ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধ্বনি দিয়া থানার ফ্ল্যাগ স্ট্যাণ্ডে ভিন্ন ধরনের একটি পতাকাও উত্তোলন করে এবং পরে ঐ রাত্রিতেই ব্যাংকের লৌহজং শাখায় হানা দিয়া ব্যাংকের সমুদয় অর্থ লুণ্ঠন করে।

—ইত্তেফাক জুলাই ২৮, ১৯৭৩

একমাসে ২২ লক্ষ টাকার পণ্য লুণ্ঠিত : হাতিয়া দ্বীপে জলদস্যুদের উপদ্রব

—ইত্তেফাক জুলাই ২৯, ১৯৭৩

'দুর্বৃত্তের ফ্রি স্টাইল'

—ইত্তেফাক আগস্ট ১, ১৯৭৩

পুলিশ ফাঁড়ি ও বাজার লুট : লঞ্চ ও ট্রেনে ডাকাতি

—ইত্তেফাক আগস্ট ৩, ১৯৭৩

এবার পাইকারীহারে ছিনতাই : সন্ধ্যা হইলেই শ্মশান

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার পূর্বাঞ্চলের তিনটি থানা এলাকা ত্রাসের রাজ পরিণত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ১১, ১৯

চট্টগ্রামে ব্যাংক ডাকাতি : লালদীঘিতে গ্রেনেড চার্জে ১৮ জন আহত : পাথরঘাটায় রেঞ্জার অফিসের অস্ত্র লুট

—ইত্তেফাক আগস্ট ১৫, ১৯

খুন ডাকাতি রাহাজানি : নোয়াখালীর নিত্যকার ঘটনা : জনমনে ভীতি

—ইত্তেফাক আগস্ট ১৬, ১৯

১ জন নিহত : অস্ত্রশস্ত্রসহ ৬ জন গ্রেফতার : রাজধানীতে পুলিশ ও দুর্বৃত্তের মধ্যে গুলীবিনিময়

গতকাল (বুধবার) পুলিশের সহিত ছয়জন সশস্ত্র তরুণের এক পশ গুলী বিনিময় হইয়া গিয়াছে এবং ইহার ফলে একটি তরুণ নিহত ও জন আহত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ১৬, ১৯

নিরাপত্তার আকুতি গ্রাম-বাংলার ঘরে ঘরে

সমগ্র দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির ফলে এ মানুষের জান-মাল ও ইজ্জতের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার অভাবে গ্রাম-গঞ্জ শহরবাসীর মনে হতাশার মাত্রা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং আই শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রতি মানুষের আস্থা লোপ পাইতেছে। অব এমন দাঁড়াইয়াছে যে, চুরি-ডাকাতি, লুঠ-তরাজ তো আছেই, রাজনৈতি সামাজিক ও বৈষয়িক কারণে শত্রুতামূলক হত্যাকাণ্ডের ভয়ে মানুষ বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতেছে। যাহারা বিত্তশালী তাহারা শহরের আত্মী স্বজনের বাড়ীতে এমনকি শহরের আবাসিক হোটেলগুলিতে পর্যন্ত আসি উঠিতেছেন। যাঁহাদের শহরে বাস করিবার সঙ্গতি নাই, তাঁহারা ব জঙ্গলে অথবা এখানে-ওখানে রাত্রি কাটাইতেছেন।

—ইত্তেফাক আগস্ট ১৭, ১৯

প্রকাশ্য দিবালোকে খুলনায় ২ জন নিহত : চট্টগ্রামে মিছিলের উপর বোমা নিক্ষেপ : ১৪ ব্যক্তি আহত

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৩, ১৯৭৩

রাজধানীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড : ব্যাংক লুট : ঈশ্বরদীতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীপ্রধান খুন

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৪, ১৯৭৩

সশস্ত্র হামলাকারীদের কারফিউ জারি : বৈদ্যেরবাজার এলাকা হইতে ৯ জন আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগ কর্মী অপহৃত

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৬, ১৯৭৩

চন্দনপুর ফাঁড়ি ও বাজার লুট : আনন্দবাজার হইতে অপহৃত ৯ জন এখনও নিখোঁজ

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৭, ১৯৭৩

ধানীখোলা পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা : অস্ত্র-শস্ত্র লুট : হাবিলদার অপহৃত

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৭৩

রক্ষীবাহিনীর সহিত সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলী বিনিময়ে ৪ জন নিহত : ১টি পুলিশ ফাঁড়ি ও ২টি বাজার লুট

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ৪, ১৯৭৩

হবিগঞ্জে ২০ মাসে ১ হাজার ২শ গুপ্ত হত্যা

সম্প্রতি হবিগঞ্জে দুষ্কৃতিকারীদের তৎপরতা বেড়েই চলেছে। দিনের পর দিন ডাকাতি আর গুপ্ত হত্যা লেগেই আছে। জানা গেছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে একমাত্র হবিগঞ্জ মহকুমায় আজ পর্যন্ত এক হাজার দুই শত গুপ্ত হত্যা সংঘটিত হয়েছে।

—সোনার বাংলা সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৭৩

না! মানবতা শিহরিত হয়নি

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটায় মানবতার চিহ্নিত বধ্যভূমি এই বাংলার মাটিতে আর একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এই হত্যালীলা

সংঘটিত হয়েছে রাজধানীর বুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। পাঁচটি তরুণের জীবন্ত ও প্রাণবন্ত রক্তে লালে লাল হয়ে গেছে পীচ ঢালা পথ। জনৈক সহযোগী লিখেছেন, "একবার-দুইবার-কয়েকবার ব্রাস ফায়ার। শিহরিত হইল মানবাত্মা।" কিন্তু এই ঘটনায় সত্যিই কি মানবাত্মা শিহরিত হয়েছে? মানবাত্মার বুকে কান পেতে শুনুন! না এতটুকু স্পন্দন সেখানে জাগেনি। এতটুকু নড়চড় সেখানে হয় নি। আরো হাজারটা রাতের মতো সেই বিভীষিকাময় রাতও পেরিয়ে গেছে। মানবতার নিষ্পন্দনতায় এতটুকু ব্যত্যয় ঘটেনি।

—সোনার বাংলা সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৭৩

বৈদ্যের বাজারে আরও ৩ জন খুন : ১ ব্যক্তি অপহৃত

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৭৩

চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিক সংঘর্ষ : ২ জন নিহত ১০ ব্যক্তি আহত : কয়েকজন নিখোঁজ

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৭৩

২০ মাসে জামালপুরে ১৬১৮টি ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১৭, ১৯৭৩

১৫ সহস্রাধিক মামলার মধ্যে ২৬৮টির নিষ্পত্তি

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১৭, ১৯৭৩

ঝিনাইদহে ১৯ মাসে তিন হাজার ডাকাতি ৩০১ ব্যক্তি খুন

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৭৩

কারফিউ দিয়া বাজার লুট : দুর্বৃত্তদের গুলীতে ৭ জন নিহত

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৭৩

সংসদে প্রশ্নোত্তর : এ পর্যন্ত ৭৩ জন পুলিশ ও বি-ডি-আর খুন : ২টি থানা ও ১৭টি ফাঁড়ি লুট

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৭৩

রাজশাহীতে পুলিশ ফাঁড়ি ভস্মীভূত
দুর্বৃত্তের গুলীতে ৭ জন পুলিশসহ অনূন্য ১২ ব্যক্তি নিহত

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৭৩

৪ জন টহলদার পুলিশ অপহৃত

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২, ১৯৭৩

রাজশাহীতে প্রকাশ্য দিবালোকে আড়াই লক্ষাধিক
টাকা রাহাজানি

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৩, ১৯৭৩

রক্ষীবাহিনীর সহিত গুলী বিনিময়ে ৮ জন নিহত

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৫, ১৯৭৩

থানা, খাদ্যগুদাম, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর ও অয়্যারলেস কেন্দ্র লুট

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৬, ১৯৭৩

সমাজবিরোধী তৎপরতা বৃদ্ধিতে ভাসানীর উদ্বেগ :
আইন-শৃংখলার ক্রমাবনতি দেশের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৬, ১৯৭৩

আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীরা যখন পদব্রজে,
রেডক্রসের গাড়ীগুলি তখন কর্তাদের ব্যক্তিগত কাজে

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৭, ১৯৭৩

মহিলাদের পরনের কাপড়ও ছিনতাই :
এক রাত্রে ২ মাইল এলাকায় তিনশত বাড়ীতে ডাকাতি

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৮, ১৯৭৩

বগুড়ায় আওয়ামী লীগ নেতা খুন : চুয়াডাঙ্গায় একরাতে
৮ জন নিহত : খুনীরা দুর্বার

গুপ্তঘাতকের ব্রাস ফায়ারে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে বগুড়ার বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মুজিবর রহমান আক্কেলপুদ্ধা। এই ঘটনা ঘটিয়াছে গতকাল (রবিবার) সন্ধ্যায়। তাঁহার সঙ্গী জনাব ইসমাইল

আকন্দও গুলীতে নিহত হইয়াছেন। পূর্বদিন অর্থাৎ শনিবার রাত্রে চুয়াডাঙ্গার কয়েকটি গ্রামে বাড়ী বাড়ী হানা দিয়া সশস্ত্র ব্যক্তিদের একটি দল ৮ জনকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিয়াছে। একটির পর একটি হত্যাকান্ড দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির এক বীভৎস চেহারাই সর্বত্র তুলিয়া ধরিয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৮, ১৯৭৩

চুয়াডাঙ্গায় একরাতে আরও ছয়জন খুন

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৯, ১৯৭৩

কুষ্টিয়ায় ৯ মাসে ৮৭টি খুন : ৬৯টি ডাকাতি : ২১৬৪
জন গ্রেফতার

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১১, ১৯৭৩

হরিণাকুণ্ড থানায় অগ্নি সংযোগ : অস্ত্র-শস্ত্র লুট : সশস্ত্র
হামলাকারীদের সহিত পুলিশের প্রচণ্ড গুলী বিনিময় :
আহত অবস্থায় একজন নকশাল গ্রেফতার

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১১, ১৯৭৩

চুয়াডাঙ্গা জেল হইতে ১৪ জনের পলায়ন

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১৩, ১৯৭৩

এবার সী ট্রাকের ব্যবহার : আড়াই লক্ষ টাকা ছিনতাই।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১৬, ১৯৭৩

ফাঁড়ি লুট : পুলিশ খুন

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২২, ১৯৭৩

১১টি থানা ও ফাঁড়ি লুট : পুলিশসহ শতাধিক
নিহত : সহস্রাধিক ডাকাতি—অক্টোবরের খতিয়ান

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১, ১৯৭৩

প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে আড়াই লক্ষাধিক টাকা
ছিনতাই : এক ব্যক্তি নিহত

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২, ১৯৭৩

এক রাত্রে ৭০ বাড়ীতে ডাকাতি

গতরাত্রে রূপগঞ্জ থানার কর্ণগোপ গ্রামের ৭০টি বাড়ীতে সশস্ত্র ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২৯, ১৯৭৩

ঝিনাইদহের গ্রামে এক রাত্রে ১৫টি ডাকাতি

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২৯, ১৯৭৩

পাঠক যে খবর আর পড়িতে চাহে না

গতকাল (মঙ্গলবার) সংবাদপত্রে আরেকটি থানা ও ব্যাংক লুটের খবর প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিদিনের খবরের কাগজে কোন না কোন খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, থানা-ফাঁড়ি কিংবা ব্যাংক লুটের খবর ছাপা হইতেছে। বিদগ্ধ পাঠকমহল হইতে মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, আমরা প্রতিদিন এই খবর আর পড়িতে চাহি না। এই পর্যন্ত যতগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে, ইহার শতকরা ৫ ভাগ ক্ষেত্রেও প্রকৃত অপরাধীদের ধরা কিংবা তাহাদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১, ১৯৭৩

চন্দ্রঘোনা থানা ও জিঘলী ফাঁড়ি লুট

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭৩

গোলা ও মাঠের ধান লুট

গতকাল (শুক্রবার) ঝিনাইদহ হইতে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা এক তারবার্তায় জানাইয়াছেন যে, গত বুধবার দিবাগত রাত্রে বেশ কিছুসংখ্যক তরুণীসহ প্রায় এক হাজার সশস্ত্র লোক ঝিনাইদহ থানার ভিতসর, ঘোড়াশাল ও পাকা এই তিনটি গ্রামের মাঠের অধিকাংশ পাকা ধান কাটিয়া লইয়া যায়।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১৫, ১৯৭৩

শহরের ৪টি স্থানে বোমা বিস্ফোরণ

গতকল্য (শনিবার) রাত্র ৮ হইতে ১১টার মধ্যে শহরের ৪টি স্থানে কে বা কাহারা হাতে তৈয়ারী বোমা নিক্ষেপ করে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭৩

ঢাকা-চাটগাঁ ট্রেন চলাচল ব্যাহত রেলওয়ে ব্রীজ উড়িয়ে দেয়া হয়েছেঃ রেল লাইন ধ্বংস

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ১৭, ১৯৭৩

গুলীবর্ষণঃ পোলিং অফিসার অপহরণঃ সন্ত্রাসঃ ৫টি ইউনিয়নে নির্বাচন পণ্ড ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও ব্যালট বাক্স ছিনতাই

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২০, ১৯৭৩

খুন-ডাকাতি ও লুণ্ঠন আজ বাংলাদেশকে মগের মুলুকে পরিণত করেছে

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২১, ১৯৭৩

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনঃ হত্যা ঃ অবাধ জালভোট। পোলিং সেন্টার লুট ঃ অগ্নিসংযোগ ঃ গোলাগুলী ঃ অস্ত্রের মুখে আরো ২০টি কেন্দ্রের নির্বাচন পণ্ড

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২১, ১৯৭৩

২৪টি কেন্দ্রে নির্বাচন বাতিলঃ ব্যালট বাক্স হাইজ্যাকঃ জাল ভোটঃ ২ জন পোলিং অফিসার খুন

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২২, ১৯৭৩

দুই বছরে একই গ্রামে ১৭৭টি ডাকাতি

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ২৫, ১৯৭৩

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের হালচালঃ মারামারিঃ ছিনতাইঃ বুলেটের অবাধ ব্যবহার

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২৫, ১৯৭৩

রাজধানীতে আবার ব্যাংক লুট

গতকাল (বুধবার) সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ একদল সশস্ত্র যুবক পরীবাগস্থ সোনালী ব্যাংক হইতে রিভলবার উঁচাইয়া ৬৮ হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৩, ১৯৭৪

রাজধানীতে বীভৎস হত্যাকাণ্ড

রাজধানী ঢাকার বুকে আবার আলোড়ন তুলিয়াছে গ্রীনরোড স্টাফ কোয়ার্টারের একটি ফ্ল্যাটে সংঘটিত বীভৎস হত্যাকান্ড। স্টাফ কোয়ার্টারের ৫ নং বিল্ডিং-এর 'আর' ফ্ল্যাটে জবাই করা হইয়াছে পঞ্চাষোর্ধ্ব প্রৌঢ়, তাঁহার চল্লিশ বছর ছুঁই ছুঁই বয়সের প্রৌঢ়া স্ত্রী এবং দশ বছর বয়সের কিশোরী পরিচারিকা খায়রুনকে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৭, ১৯৭৪

বগুড়ায় এক সপ্তাহে ৩ জন খুন ১ জন গুলীবিদ্ধ

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৯, ১৯৭৪

এবার ব্যাংকে ডাকাতি নয়—চুরি

লক্ষ্মীপুর ৮ই জানুয়ারী—গত ২৯শে ডিসেম্বর লক্ষ্মীপুরস্থ উত্তরা ব্যাঙ্কের শাখা অফিস হইতে ৩০ হাজার ১ শত টাকা রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৯, ১৯৭৪

আততায়ীর গুলীতে ভোলার সংসদ-সদস্য মোতাহার উদ্দীন আহমদ নিহত

ভোলার জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মোতাহার উদ্দীন আহমদ গতকাল (বৃহস্পতিবার) অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১১, ১৯৭৪

সিলেটের ২টি থানায় ৩টি বাজার লুট

গত ১০ দিনে সিলেট জেলার সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীরা ২টি থানার ৩টি বাজার লুট করিয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১২, ১৯৭৪

মেঘনাবক্ষে দুর্ধর্ষ লঞ্চ ডাকাতি

সম্প্রতি এখান হইতে কিছুদূরে মেঘনাবক্ষে কর্তব্যরত ৭ জন পুলিশের ৭টি রাইফেল ছিনাইয়া নেওয়ার পর একদল দুর্বৃত্ত একটি যাত্রীবাহী লঞ্চে ডাকাতি করিয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১২, ১৯৭৪

বাংলা একাডেমী হইতে ২২ হাজার টাকা ছিনতাই

গতকাল (শুক্রবার) বেলা আনুমানিক সোয়া এগারটার সময় কয়েকজন সশস্ত্র যুবক বাংলা একাডেমী হইতে ২১ হাজার ২ শত ১৩ টাকা ২৬ পয়সা ছিনতাই করে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৭৪

জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর : ১০২৮০ টি ডাকাতি হয়েছে, বাজার লুট হয়েছে ১৩ টি, থানা থেকে প্রায় ৪শ' আগ্নেয়াস্ত্র লুট, দুষ্কৃতিকারীর হামলায় ১৮০৯ জন নিহত

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৭৪

বগুড়ায় তিনটি খুন

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১২, ১৯৭৪

খুলনায় শ্রমিক নেতা নিহত

খুলনা পিপলস্ জুট মিল শ্রমিক ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক জনাব আবদুল হান্নান গতকাল রবিবার দুর্বৃত্তের গুলীতে নিহত হন।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১২, ১৯৭৪

প্রকাশ্য দিবালোকে রিলিফের কাপড় লুটের রহস্য কোথায় ?

১০ই ফেব্রুয়ারী—সম্প্রতি কুড়িগ্রামস্থ রংপুর-দিনাজপুর পুনর্বাসন সার্ভিস-এর রিলিফ-কাপড়ের গুদাম প্রকাশ্য দিবালোকে লুট হইয়া যায়।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯৭৪

ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সভায় 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' প্রত্যাহারের দাবী

ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির এক সভায় অনতিবিলম্বে 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' তুলিয়া লইবার জোর দাবী জানান হয়। ইহা ছাড়া সভায় রক্ষীবাহিনীর হাতে প্রদত্ত ক্ষমতা ও অন্যান্য সকলপ্রকার 'কালাকানুন' রহিত করিয়া গণতান্ত্রিক আইন-ব্যবস্থা কায়েমের দাবী জানান হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় : "বিশেষ ক্ষমতা আইন, '৭৪ নামক কালাকানুন'

পাস করিয়া গণতন্ত্র হত্যার যে জঘন্য প্রচেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে শান্তিকামী স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের মনে দারুণ ক্ষোভ, অসন্তোষ ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে।

ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১৪, ১৯৭৪

জামালপুরে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি :
২ মাসে ২ শতাধিক ডাকাতি : ১০ ব্যক্তি খুন : সোয়া-কোটি টাকার মালামাল লুট

—ইত্তেফাক মার্চ ৫, ১৯৭৪

মোহনগঞ্জে চুরি ডাকাতির হিড়িক :
জনমনে আতঙ্কের কালোছায়া

—ইত্তেফাক মার্চ ৭, ১৯৭৪

বাগেরহাটে ডাকাতি খুন ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম

—ইত্তেফাক মার্চ ১০, ১৯৭৪

ব্যাঙ্ক হইতে ৭০ হাজার টাকা ছিনতাই

কতিপয় সশস্ত্র ব্যক্তি গতকাল (শনিবার) দুপুরে জনতা ব্যাঙ্কের মোহাম্মদপুর শাখা হইতে ৭০ হাজার ৩ শত টাকা ছিনতাই করিয়া পলায়নে সক্ষম হয়।

—ইত্তেফাক মার্চ ১০, ১৯৭৪

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চোর-ডাকাতের ভয়ে জনগণ সন্ত্রস্ত

—ইত্তেফাক মার্চ ১৬, ১৯৭৪

নারায়ণগঞ্জে ব্যাঙ্ক ডাকাতি : ৩ লক্ষাধিক টাকা ছিনতাই

—ইত্তেফাক মার্চ ১৬, ১৯৭৪

রাজধানীতে একই সময়ে দুইটি ব্যাংক ডাকাতি

—ইত্তেফাক মার্চ ১৬, ১৯৭৪

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলীবর্ষণ : ৬ জন নিহিত : ১৭ জন গ্রেফতার

—ইত্তেফাক মার্চ ১৮, ১৯৭৪

এক ব্যক্তি খুন : ৩৩ জন আহত : যশোরে বাজার লুট

গতরাতে একদল দুষ্কৃতিকারী যশোর জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র বড় বাজারে হামলা চালায়। সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীদের হামলায় একব্যক্তি নিহত এবং অন্ততঃ ৩৩ জন আহত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১, ১৯৭৪

একই রাত্রে ১৫টি বাড়ীতে সশস্ত্র ডাকাতি

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১, ১৯৭৪

খুলনার একটি এলাকায় ১ সপ্তাহে ১৩টি ডাকাতি

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১, ১৯৭৪

গ্রেনেড বিস্ফোরণ : ছাত্রী আহত : ৩ জন গ্রেফতার :
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

মহসিন হলের সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মাত্র দুইদিনের মধ্যে গতকাল (সোমবার) দুই দুইটি গ্রেনেড বিস্ফোরণের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গন পুনরায় কলঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে একজন ছাত্রী গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৯, ১৯৭৪

গেল হপ্তার ফিরিস্তি : চারশ'রও বেশী বড় ডাকাতি :
৮০টি খুন : ২০ জনকে পিটিয়ে হত্যা : ৬টি বাজারে লুট

গত সপ্তাহে সারাদেশে চারশ'র বেশী ডাকাতি সংগঠিত হয়েছে। ডাকাতেরা প্রায় কোটি টাকার সম্পদ আত্মসাৎ করেছে।

শুধুমাত্র খুলনা জেলার একটি গ্রামে একই রাতে ৩৬টি বাড়ীতে ডাকাতি হয়। অনেক স্থানে ডাকাতেরা কারফিউ দিয়ে ডাকাতি করে। ডাকাতি করতে গিয়ে জনতার হাতে ১৯ জন ডাকাত নিহত হয়। ডাকাতি করার সময় ডাকাতদের গুলীতে ৯ জন নিরীহ গ্রামবাসী নিহত হয়। একজন গ্রামবাসী আহত হয়।

এছাড়াও গতসপ্তাহে প্রাপ্ত সংবাদ মতে ৬টি বড় বড় বাজার লুট হয়। ডাকাতেরা অনেকস্থানেই কারফিউ দিয়ে ও গান গেয়ে লুট করে। ঢাকার কালিয়াকৈর বাজারে ডাকাতেরা সারারাত ধরে নির্বিঘ্নে লুট করে। বাজার

লুট ছাড়াও গত সপ্তাহে পুলিশের হাতে টাংগাইলের রামপুরা ও কুকরাইল গ্রাম দু'টি লুণ্ঠিত ও তছনছ হয়। এখানে একজন পুলিশও মারা যায়।

বুভুক্ষু জনতা রংপুরে একটি খাদ্য বোঝাই ট্রেন লুট করে ১০০ বস্তা চাউল নিয়ে যায়। ডাকাতি ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও হিংসাশ্রয়ী হত্যাকাণ্ডে এ সপ্তায় মোট ৬০ জন মারা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে হবিগঞ্জ থানার যুবলীগ নেতা এবং ঢাকার রমনা থানার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়াও এসব ঘটনায় বহু ব্যক্তি আহত হয়।

জনতার হাতে পিটুনি খেয়ে গত সপ্তাহে প্রায় ২০ জন ডাকাত নিহত হয়। এর মধ্যে রংপুরের নীলফামারীতে ১২ জন এবং গাইবান্ধার দুইজন রয়েছে।

—সোনার বাংলা এপ্রিল ১৫, ১৯৭৪

রেলওয়ে ওয়াগন হইতে আশংকাজনক হারে খাদ্যশস্য চুরি

সরকারী খাদ্য-গুদাম হইতে দেশের বিভিন্ন স্থানে রেলযোগে যে খাদ্য শস্য প্রেরণ করা হইয়া থাকে উহার প্রায় এক চতুর্থাংশ খাদ্য রহস্যজনক-ভাবে উধাও হইয়া যায় বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৭, ১৯৭৪

যশোর বাজারে লুট : দুর্বৃত্তের গুলীতে ২০ জন আহত

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৮, ১৯৭৪

খুলনায় ১ ব্যক্তিকে পিটাইয়া হত্যা

আজ দুপুরের দিকে স্থানীয় খান জাহান্ আলী রোডে ইন্নত আলী নামে জনৈক ব্যক্তিকে একদল লোক পিটাইয়া হত্যা করে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৯, ১৯৭৪

রাজশাহীতে ব্যাঙ্ক লুট

আজ সকালে ৫ জন সশস্ত্র তরুণ জনতা ব্যাংকের হরিয়ান শাখা হইতে ৩৮ হাজার টাকা লুট করিয়া নিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২১, ১৯৭৪

'আইনের শাসন আছে কিনা আমি জানি না'

বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) জনাব সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলেছেন, দেশে আইনের শাসন বলবৎ আছে কিনা তা আমি জানি না।

—সোনার বাংলা এপ্রিল ২১, ১৯৭৪

বরিশালের পল্লীতে ৩ জন খুন

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২২, ১৯

গুলী চালনার দায়ে বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক ২ জন ছাত্রের চক্ষু উৎপাটিত

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২২, ১৯

মঠবাড়িয়া থানায় আততায়ীর হাতে চেয়ারম্যান নিহত

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৩, ১৯

প্রকাশ্য দিবালোকে বগুড়ার ভাইস চেয়ারম্যান খুন

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৪, ১৯

নীলফামারীতে তিনমাসে পাঁচ শতাধিক ডাকাতি

নীলফামারী (রংপুর) ১৬ই এপ্রিল, প্রতিদিন গ্রাম হইতে শত শ পরিবার জানমালের নিরাপত্তার জন্য শহরে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে শহরে বাসগৃহ সঙ্কট ও জমি ক্রয়ের হিড়িক পড়িয়াছে। গত ৩ মা মহকুমায় ৫ শতাধিক ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৪, ১৯

ওয়াগান ভেংগে খাদ্য লুট—বিশৃংখলার আলামত

ভারতের গুজরাট ও বিহারের হাওয়া বাংলাদেশেও লেগেছে।

সম্প্রতি রংপুর রেলস্টেশনে ট্রেন থেকে ১০০ বস্তা চাল লুট এ গাইবান্ধা ওয়াগান থেকে ৬০০ মণ চাল লুটের ঘটনা থেকে এটা সুস্প হয়ে উঠেছে যে, অনুরূপ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী কিছু কিছু শক্তি এদেশে সক্রিয় রয়েছে।

—সোনার বাংলা এপ্রিল ২৮, ১৯

সরিষার ভূত তাড়াতে হবে সর্বাগ্রে

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান অবশেষে বেসামরিক প্রশাসনের সা যার্থে সামরিক বাহিনী তলব করেছেন। কিন্তু এই চরম ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাপারটি কিভাবে আগেভাগে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো ? এটা কি কে অলৌকিক ভূতুরে কাণ্ড, না দুর্নীতিবাজ ও দুষ্কৃতিকারীদের পিঠ বাঁচ

নোর জন্য কোন কৌশলী প্রয়াস? আমরা সহজ বুদ্ধিতে এটুকু বুঝতে পারি যে, দেশব্যাপী সেনাবাহিনী তলবের বিষয়টি কোন নীচুতলার ব্যাপার নয়, নিঃসন্দেহে উঁচুতলার ব্যাপার। নীচুতলার লোকদের এটা জানবার কথা নয়। তবু কি আশ্চর্য! উঁচুতলার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও পক্ষকাল আগে লিক-আউট হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। আর লিক-আউটকারীদের কল্যাণেই মওজুতদার, মুনাফাখোর, চোরাচালানী সমাজবিরোধী ও বেআইনী অস্ত্রধারীরা স্ব স্ব পিঠ বাঁচানোর জন্য একেবারে দু'সপ্তাহের দীর্ঘ অবকাশ লাভ করলো। বস্তুত এটা যে কোন অলৌকিকও ভূতুরে কান্ড নয়, বরং একটা সুপরিকল্পিত কারসাজি, তা আজ দিবালোকের মতই পরিষ্কার।

—সোনার বাংলা এপ্রিল ২৮, ১৯৭৪

রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযান : চোরাই গাড়ী ও অস্ত্রশস্ত্রসহ ৪ জন যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

—গণকণ্ঠ মে ২০, ১৯৭৪

ঝিনাইদহে ১৬ মাসে ৫৬০ জনের আত্মহত্যা

গত বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে চলতি বৎসরের মে পর্যন্ত ষোল মাস সময়ে ঝিনাইদহ মহকুমার ছয়টি থানায় পাঁচশত ষাটজন নরনারী আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট মহল সূত্রে জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক মে ২৭, ১৯৭৪

শিমুলিয়ার ফাঁড়ি লুট। পুলিশ-দুবৃর্ত্ত গুলী বিনিময়

—ইত্তেফাক জুন ১, ১৯৭৪

সারা দেশে সমাজ শত্রুদের অবাধ রাজত্ব : নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় প্রতিদিন গড়ে ৩ জন খুন

—সোনার বাংলা জুলাই ২৮, ১৯৭৪

যৌথবাহিনীর কম্বিং অপারেশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ : জনমনে হতাশা বৃদ্ধি

পঁচিশে এপ্রিল থেকে আজ ৭ই জুন—সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ দিন হলো যৌথ-বাহিনী 'কম্বিং অপারেশনে' নেমেছে। দেশের বর্তমান সামাজিক এবং

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসীর মনে আজ প্রশ্ন জেগেছে, যৌথবাহিনীর এ অভিযান কি ব্যর্থ হয়ে গেলো? দেশের সমস্যা সমাধানে জনগণের শেষ ভরসা সেনাবাহিনীও কি অবশেষে ব্যর্থ প্রমাণিত হলো?

—গণকণ্ঠ জুন ৭, ১৯৭৪

১ মাসে ১২টি হত্যাকাণ্ড : ১টি হাট লুট : ১৩টি দোকানে ডাকাতি

—ইত্তেফাক জুন ৯, ১৯৭৪

গ্রামবাংলার খবর

স্বাধীনতা অর্জনের পর গত ২৭ মাসে ঝিনাইদহ মহকুমার কমপক্ষে প্রায় দশ হাজার ডাকাতি, ৫ শতাধিক খুন, ১টি ডাকঘর লুট, ১টি থানা লুট, ১০টি বাজার লুটসহ বেশুমার চুরি সংঘটিত হয়েছে বলে এক বেসর-কারী পরিসংখ্যানে জানা গেছে।

—সোনার বাংলা জুন ১১, ১৯৭৪

আইন-শৃংখলা

কালকিনি থানার কমলাপুর গ্রামের আবদুস সামাদ নামে সেনাবাহিনীর জনৈক জওয়ানকে সম্প্রতি কে বা কাহারা হত্যা করেছে।

ঢাকার ইসলামপুর-এর নিকট দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক একব্যক্তি নিহত ও অপর দুইজন আহত হয়েছেন।

গত ৮ই জুন আততায়ীর গুলীতে নারায়ণগঞ্জ জেলার মনির-প্রধান পন্থী ছাত্রলীগ সভাপতি গোলাম মহিউদ্দিন শাহজাহান ও আবদুল রউফ প্রাণ হারিয়েছে।

চিনাদধুকুরিয়া গ্রামের মজিদকে জনতা পিটিয়ে হত্যা করেছে।

—সোনার বাংলা জুন ১৬, ১৯৭৪

অপরাধ ও অপরাধ-প্রবণতা সম্পর্কে সেমিনার

ডি. এস. পি. জনাব হামজা হোসেন বলেন : ১৯৭০ সনে দেশে ১৩ শত ৬৯, '৭২ সনে ৫ হাজার ৩ শত ৫৭ এবং '৭৩ সনে ২ হাজার ৮ শত ৩১টি খুন হয় এবং ১৯৬৮ সনে ১২ শত ১৫টি এবং '৭২ সনে ৪ হাজার ৯ শত ৬টি ডাকাতি সংঘটিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, স্বাধী-

নতার পর হইতে এ পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্নভাবে প্রায় ২শত কোটি টাকা ছিনতাই হইয়াছে।

নারী ধর্ষণের ব্যাপারে তিনি বিশ্বে আমেরিকার পর বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করেন।

—ইত্তেফাক জুন ২৪, ১৯৭৪

বগুড়ায় থানা লুট : ২ জন পুলিশসহ ৩ জন নিহত

—ইত্তেফাক জুন ২৪, ১৯৭৪

দীর্ঘ ৬৩ দিনের রাজনৈতিক তৎপরতার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে :
১৪৪ ধারা ভঙ্গ : শহরে বহু খণ্ড মিছিল

—গণকণ্ঠ জুন ২৯, ১৯৭৪

সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তথ্য
এ পর্যন্ত ৯৫৬০টি নরহত্যা : ১২২৪ টি ডাকাতি ২৭১টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে

গণকণ্ঠ জুন ২৯, ১৯৭৪

সশস্ত্র ব্যক্তিদের সহিত পুলিশের গুলী বিনিময়ে ২ জন নিহত

—ইত্তেফাক আগস্ট ১১, ১৯৭৪

ঝিনাইদহের গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃংখলার অবনতি

—ইত্তেফাক আগস্ট ১৮, ১৯৭৪

গত ৩৩ মাসে দুষ্কৃতিকারীদের গুলীতে ৪ জন এম.সি.সহ ৫২৪ জন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৩, ১৯৭৪

নদীপথে ১১শত মণ গম লুট : ভাগ্যকুলে ব্যাঙ্ক ডাকাতির চেষ্টা : যশোরে ওয়াগান হইতে খাদ্যশস্য চুরি : নোয়াখালীতে বাজার লুট

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৩, ১৯৭৪

এগার হাজার টাকার ধান ও ১ হাজার মণ গম লুট

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৫, ১৯৭৪

পাবনায় পুলিশ ও সশস্ত্র দলের মধ্যে গুলী : ১ ব্যক্তি নিহত

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৫, ১৯৭৪

বুভুক্ষু মানুষের আর্তনাদ : বেপরোয়া লুটতরাজ :
আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৬, ১৯৭৪

থানা আক্রমণ—২ ঘণ্টাব্যাপী গুলী বিনিময় :
১ জন পুলিশ নিহত

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৭৪

রংপুরে চাউল বোঝাই ট্রাক লুট

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৭৪

বরিশালে খাদ্য ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি

কংকালসার ক্ষুধার্ত মানুষের ভীড় একদা 'বাংলার শস্যভাণ্ডার' নামে অভিহিত বরিশাল জেলার খাদ্য পরিস্থিতিকে প্রকটভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৩০, ১৯৭৪

সিরাজদিখান থানায় হামলা

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে একদল সশস্ত্র লোক মুন্সিগঞ্জ মহকুমার সিরাজদিখান থানা আক্রমণ করে বলিয়া ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ৯, ১৯৭৪

সাতক্ষীরায় বাজার লুট

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১০, ১৯৭৪

লৌহজংয়ে সন্ত্রাস তৎপরতা

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২৩, ১৯৭৪

মঙ্গলবার ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ঘটনায়
২ জন নিহত, ২২ জন আহত

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২৭, ১৯৭৪

বরিশালে আড়াই বৎসরে ৬ সহস্রাধিক ডাকাতি পাঁচশত খুন

—ইত্তেফাক নভেম্বর ৩০, ১৯৭৪

মানিকগঞ্জে ব্যাংক ডাকাতি

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৪, ১৯৭৪

খুন : বগুড়া ও মুন্সীগঞ্জ এলাকা হইতে ২২টি লাশ উদ্ধার

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৫, ১৯৭৪

ঢাকায় বোমাবাজি ও নাশকতামূলক তৎপরতা

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১৫, ১৯৭৪

বোমা : লুট : সন্ত্রাস

সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র ব্যক্তিরা গতকাল (রবিবার) দেশের ৪টি স্থানে রেললাইন উড়াইয়া ফেলিয়াছে, নান্দাইল রোড রেল স্টেশন ও আউলিয়া নগর রেল স্টেশন পোড়াইয়া দিয়াছে। অগ্নিসংযোগ করিয়াছে ফরিদপুরের কাশাইপুর, ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া ও মুন্সিগঞ্জের রেকাবী বাজারের তহসিল অফিসে, বরিশাল, ময়মনসিংহের আঠারবাড়ী ও নীলফামারীর টেলিফোন এক্সচেঞ্জে বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে, হামলা চালান হইয়াছে শিবপুর থানায় ও তারাবো পুলিশ ফাঁড়িতে। লুট হইয়াছে বেতকা বাজার।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭৪

ঢাকা শহরে গাড়ী ছিনতাই

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১, ১৯৭৫

সাতটি রাইফেল ছিনতাই

গত রাত্রে একদল চরমপন্থী দৌলতপুর থানার অন্তর্গত তারাগুনিয়া সোনালী ব্যাঙ্ক শাখায় কর্তব্যরত পুলিশের নিকট হইতে ৩টি রাইফেল ছিনতাই করিয়াছে। কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৫, ১৯৭৫

সিরাজগঞ্জে স্বাক্ষর জাল : ট্রেজারীর ১০ লক্ষ টাকা গায়েব

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৬, ১৯৭৫

সভা, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, লক-আউট নিষিদ্ধ

গতকাল (সোমবার) স্বরাষ্ট্র দফতরের এক তথ্যবিবরণীতে বলা হয় যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও আইন-শৃংখলা রক্ষার খাতিরে সরকার এক নির্দেশ জারি করিয়া সভা, শোভাযাত্রা ও সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৭, ১৯৭৫

গুপ্ত হত্যা : থানা আক্রমণ : পাটে আগুন

—সোনার বাংলা জানুয়ারী ১২, ১৯৭৫

মেঘনায় লঞ্চ ডাকাতি : ৮টি রাইফেল ছিনতাই : ২ লক্ষ টাকার মালামাল লুট

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১৬, ১৯৭৫

যশোরে কৃষি উন্নয়ন সংস্থার ধানের গুদাম লুট

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৭৫

গত তিন বছরের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি : ১১ হাজার হত্যাকাণ্ড—১৪ হাজার ডাকাতি—১১ হাজার ৬ শ লুট—২৬ হাজার দাংগা

পুলিশসূত্রে প্রকাশ, বাংলাদেশ হবার পর থেকে এ পর্যন্ত দেশে প্রায় ১১ হাজার হত্যাকান্ডসহ ২ লাখ ৫০ হাজার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। ঐ সব অপরাধে গ্রেফতার হয়েছে এক লাখ ৪০ হাজার ব্যক্তি।

প্রকাশ ১৯৭৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মোট অপরাধের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৯ শ' ৭৮। এর মধ্যে ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে ১৪ হাজার ১০৮টি, লুট ১১ হাজার ৬ শ' ১০টি, সিঁদেল চুরি ৪ লাখ ৫ হাজার ৫ শ' ৪০টি, চুরি ৩৯ হাজার ৯ শ' ৮১টি, খুন ১০ হাজার ৮ শ' ৫০টি, দাংগা ২৬ হাজার ১০৯টি এবং অন্যান্য অপরাধ ৭৭ হাজার ৮ শ' ৮০টি। মোট আসামী ধরা পড়েছে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭ শ' ৮১। গত ৩ বছরের সালানা হিসাব হলো : ১৯৭২ সালের সারা দেশে দায়েরকৃত অপরাধের সংখ্যা ছিল ৯৮ হাজার ৮ শ' ৮৭টি। আসামী ধরা পড়ে ৪২ হাজার ৩ শ' ৮৯ জন। ১৯৭৩ সালে দায়েরকৃত অপরাধের সংখ্যা ৭০ হাজার ৪ শ' ১টি।

১৯৭৪ সালে দায়েরকৃত অপরাধের সংখ্যা ৭০ হাজার ৬ শ' ৯০। এবং অপরাধী ধরা পড়েছে ৫০ হাজার ১ শ' ৬২ জন। পুলিশের উক্ত হিসাব অনুযায়ী ১৯৭২ সালে গ্রেফতারকৃত খুনির সংখ্যা ৪ হাজার ১ শ' ৮৫। ১৯৭৩ সালে ৩ হাজার ৮শ ৭২টি। এবং ১৯৭৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ২ হাজার ৯ শ' ২ জন। এই তিন বছরে খুন হয়েছে যথাক্রমে ৫ হাজার ৯ শ' ৮, ২ হাজার ৫ শ' ৭১ এবং ২ হাজার ২ শ' ১১টি। এই সময়ে ডাকাতির সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৪ হাজার ৮ শ' ৬৭, ৫ হাজার ১২৪ এবং ৩ হাজার ১১৬।

লুটের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে যথাক্রমে এক হাজার ৬২৬, ৩৩ হাজার ২৩ এবং ৩ হাজার ৩৯৪ জন ব্যক্তি।

—সোনার বাংলা ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৭৫

রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে দুর্বৃত্তের গুলীতে ২ জন খুন : দেড় লক্ষ টাকা ছিনতাই

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ৪, ১৯৭৫

৩৯ লক্ষ টাকা প্রতারণা : ৪ জন গ্রেফতার

গতকাল (শনিবার) সরকারকে ৩৯ লক্ষ ৯ হাজার ৩ শত ৫৮ টাকা প্রতারণা করার একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৬, ১৯৭৫

খুন : গ্রেফতার

গতকাল (সোমবার) বার্তা সংস্থা বিপিআই জানান: সম্প্রতি কতিপয় সশস্ত্র দুর্বৃত্ত চুয়াডাঙ্গা কলেজের ৩ জন ছাত্রকে তাহাদের স্ব স্ব গ্রামে নির্মমভাবে হত্যা করে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৫, ১৯৭৫

ফাঁড়ি লুট : ২ জন পুলিশ নিহত

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৯, ১৯৭৫

ওয়াগন হইতে দেড়শত বস্তা চাউল চুরি

দৌলতপুরে বাজার লুট

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২০, ১৯৭৫

পাংশা থানায় বাজার লুট

—ইত্তেফাক মে ১৭, ১৯৭৫

দাউদকান্দিতে বাজার লুট

—ইত্তেফাক মে ২৫, ১৯৭৫

শহরে ছিনতাই

—ইত্তেফাক মে ২৮, ১৯৭৫

ধলেশ্বরী বক্ষে দুর্ধর্ষ লঞ্চ ডাকাতি

—ইত্তেফাক জুন ৬, ১৯৭৫

সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় মতামত

এর শেষ কোথায় ?

গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল ঘেরাও করিয়া দুইটি কামরা হইতে সাতটি ছেলেকে গানপয়েন্টে বাহির করিয়া লইয়া গিয়া মহসিন হলের করাইডোরে ফল-ইন করাইয়া অটোমেটিক অস্ত্রের গুলীতে-গুলীতে সর্বাঙ্গ ঝাঁঝরা করিয়া যেভাবে তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে তাহাকে বীভৎস, নৃশংস-মর্মান্তিক বলিলেও যথেষ্ট বলা হয় না। হল ভরা ছাত্র। গেটে দারওয়ান। প্রভোস্ট আছেন। হাউস টিউটর আছেন। পাশেই পুলিশের ফাঁড়ি। অদূরে পুলিশ কন্ট্রোল। রাত্রি একটা হইতে দুইটার মধ্যে এতবড় একটা সাংঘাতিক কমাণ্ডো-ধরনের অপারেশন মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নির্বিঘ্নে ঘটিয়া গেল। কেহ জানিল-না। জানিলেও চিনিল না। হতভাগ্য ছাত্রকয়টির জীবন রক্ষার্থে কেহ আগাইয়া আসিল না। পরদিন সকালে পুলিশ আসিল। অতীব দক্ষতার সঙ্গে সাতটি লাশই 'উদ্ধার' করিল। গোটা প্রশাসন নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। শান্তি-নিরাপত্তার রক্ষকগণ চঞ্চল-কর্মব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। হলে যাহাতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে না পারে, তজ্জন্য 'কড়া পুলিশ প্রহরার' ব্যবস্থা হইল।

.... এক কথায় দুই বছর ধরিয়া যেভাবে যা কিছু হইয়া আসিয়াছে—হল ঘেরাও, রেইড, ভিক্টিমদের বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া, গুলী, হত্যা, আততায়ীদের নির্বিঘ্নে গাড়ীতে চড়িয়া প্রস্থান, পুলিশ কর্তৃক লাশ 'উদ্ধার', হলে হলে 'কড়া প্রহরা' মোতায়েন, নেতৃবৃন্দের নিন্দা ও শোকবার্তা, সরকারের সঙ্কল্প প্রকাশ—সবই যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। যেন সবকিছু ছককাটা। কোথাও পান হইতে চুন খসে নাই। মহসিন হলের কোণে বধ্যভূমিতে দুই ইঞ্চি পুরু রক্তের চিহ্নও হয়ত দুই-চারদিন পরে মুছিয়া যাইবে। কিন্তু যে জিনিসটা শত ঢাকাঢাকি আর চুনকামেও মুছিবে না, সেটা জাতির মুখের কলঙ্ক, প্রশাসনের কপোলের কালিমা। কিন্তু তাতেই বা কার কি? অমন ত কতই ঘটিল। কতজনে কতকিছু বলিল। প্রশাসনের কাফেলা কি থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে? না কি স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া গিয়াছে মৃত্যুর মিছিল?

আমরা সবাই একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছি। না-জানার ভান করিতেছি। আমরা বধির না হইলেও বোবা। আমরা কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু অতদূরে কলিকাতায় বসিয়া 'আনন্দবাজার' দেখিতেও পাইয়াছেন, কিঞ্চিৎ বলিতেও পারিয়াছেন। সে বক্তব্য বড় ইঙ্গিতপূর্ণ। উহা

আমাদের আত্মবিনাশের অশুভ বারতা বহন করে। গত শনিবারের উপ-সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমরাও এই আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত দিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শুভবুদ্ধির কাছে আপীল জানাইয়াছিলাম,—যেরূপ জানাইয়াছি দুই বৎসর যাবতই। কিন্তু তাতে কি লাভ হইয়াছে? কার শুভবুদ্ধি আমরা জাগ্রত করিতে পারিয়াছি? এই যে 'গভর্নমেন্ট উইদিন গভর্নমেন্ট'-এর কালো-ছায়া স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইতেছে, পারিয়াছি কি সরকার ও ক্ষমতাসীনদলকে সে সম্পর্কে সতর্ক ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে? নাকি পারিয়াছি অস্ত্রের ভাষায় যারা কথা বলে, যারা ভ্রাতৃরক্তে হাত রাঙ্গায়, তাদেরে নিবৃত্ত করিতে? পারিয়াছি কি এই উপলব্ধি জাগ্রত করিতে যে, যাহারা অস্ত্রের ভাষায় কথা বলে তাহারা নিজেরাও অস্ত্রের শিকারে পরিণত হয়? আমরা কিছুই করিতে পারি নাই। আমরা ব্যর্থ। আমাদের প্রশাসন ব্যর্থ। বোধ করি, এটা আমাদের সামগ্রিক জাতীয় ব্যর্থতারই কালিমামণ্ডিত চিত্র।

বাংলাদেশ জুড়িয়া প্রতিদিন প্রতি রাত্রি কত হত্যা, কত লুণ্ঠন, কত অগ্নিসংযোগ, কত শ্বেত-সন্ত্রাস, কত মর্মান্তিক ঘটনাই ত ঘটিতেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেও গত এক বছর-সোয়াবছরের মধ্যে চার-পাঁচ বার-বেআইনী অস্ত্রের প্রকাশ্য মহড়া হইয়াছে। সংঘটিত হইয়াছে সশস্ত্র আক্রমণ, পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড; হলের পর হল লণ্ডভণ্ড হইয়াছে এবং অস্ত্রের মুখে হইয়াছে ব্যালট বাক্স ছিনতাই। প্রশাসন 'দুষ্কৃতিকারীদের' খুঁজিয়া বাহির করার 'দৃঢ়সঙ্কল্প' বার বার প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ণ শান্তি-নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা দান করিয়াছেন। বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার ও শ্বেত-সন্ত্রাস বন্ধ করার বজ্র-কঠোর সঙ্কল্প পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন। এবং তজ্জন্য স্পেশাল পাওয়ারও হাতে লইয়াছেন। কিন্তু কি তার ফলাফল? নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে, এতটুকু ফল অর্জিত হয় নাই। বরঞ্চ, পরিস্থিতির দিন দিন দ্রুত অবনতিই ঘটিতেছে। ডঃ মাযহারুল হকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী উক্তিটিরই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা যাইতে পারে, 'আমরা প্রতিদিন তীব্রবেগে এগিয়ে চলেছি রসাতলে'।

.... মহাসমুদ্রে কোথায় যেন একটা বিরাট পানির পাঁক সৃষ্টি হইয়াছে। সেই পাঁক আমাদের দ্রুতবেগে টানিয়া লইয়া যাইতেছে ডুবাইয়া মারিতে। আমরা অসহায়ভাবে ধ্বংসের সেই দুর্নিবার আকর্ষণে ধাইয়া চলিয়াছি। যেন আমাদের আর কোন ভরসাই অবশিষ্ট নাই। আমরা যে সমগ্র জাতি সেই মহাসমুদ্রের পাঁকের টানে ধাইয়া চলিতে চলিতে আর্ত চিৎকার করিয়া বলিতেছি, 'বাঁচাও, বাঁচাও', কে শোনে কার কথা?

আইনের দেবী নাকি অন্ধ। তিনি কারো চেহারা দেখিতে পান না। আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি নিরাপত্তা রক্ষার সুমহান দায়িত্ব যাঁরা বহন করেন, তাঁদেরও মুখ চিনিয়া আইন প্রয়োগ করিতে গেলে চলে না। আইনের দণ্ড প্রয়োগের পথে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কোন বাছ-বিচার আসিয়া দাঁড়াইলে আইনের ব্যর্থতা সেখানে অনিবার্য। প্রশাসন আজ আত্মজিজ্ঞাসা করুন, পরিপূর্ণ সততা সহকারে নিজেকে প্রশ্ন করুন: আমাদের এই যে লজ্জাস্কর নিদারুণ ব্যর্থতা এর কারণ কি আইন-প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদেরই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, পক্ষপাতিত্ব, অন্যায় হস্তক্ষেপ ও নির্লজ্জ আত্ম-প্রবঞ্চনাই নয়? যদি নিজেকে প্রশ্ন করার মত এইটুকু সততা ও সৎসাহস তাঁহারা দেখাইতে পারেন, তবে প্রশ্নের সদুত্তরও পাইবেন। উহারই মধ্যে পাইবেন শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার নয়, শুধু শ্বেত-সন্ত্রাস নির্মূল করার নয়, সামগ্রিক জাতীয় আত্ম-বিনাশের মুখ হইতেও ফিরিবার ও ফিরাইবার পথ-নির্দেশ। আর যদি প্রশাসন সেই সৎসাহস, সততা ও সত্যনিষ্ঠা দেখাইতে না পারেন, তবে তাঁরা জানিয়া রাখুন, যাহা চলিতেছে ইহার কোন শেষ নাই এবং যে 'পয়েন্ট অব নো রিটার্নের' দিকে দেশ ও জাতি ধাবিত হইতেছে, সেখান হইতে কোন প্রত্যাবর্তন নাই।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় চৈত্র ২৫, ১৩৮০

এই নারকীয় যজ্ঞের শেষ কোথায়?

আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। পবিত্র ঈদের দিনেও যদি এই রাজধানী শহরের বাসিন্দাদের ছয় ছয়টি হত্যা ও মৃত্যুর-সংখ্যা গণিতে হয়, তবে বিস্ময়াহত হওয়া ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে উপায় আর কি থাকে! এমনিতেই শিউলি-মুনিরা হাবিব প্রমুখের হত্যাকাণ্ডের আজও কোন কূল-কিনারা পুলিশ করিতে পারেন নাই। তার উপর গ্রীন রোড স্টাফ কোয়ার্টারের তিন তিনটি বীভৎস হত্যাকাণ্ড এবং খিলগাঁও, বাসাবো ও সার্কুলার রোডের হত্যা দিনে দিনে তালিকাই ভারী করিয়া চলিয়াছে। দিন কয়েক আগে এই রাজধানীতে পিটাইয়া হত্যার কাণ্ড ও আবার ঘটিয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্ক লুটের কাহিনীও খুব বেশী বাসী হয় নাই। দেশের অন্যান্য স্থান হইতেও প্রায় প্রতিনিয়তই খুন-জখমের সংবাদ আসিতেছে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়া যাঁহারা আত্মতুষ্টিতে বিভোর রহিয়াছেন, তাঁহারা, অন্য এলাকার কথা বাদ থাকুক, খোদ রাজধানীর এইসব নারকীয় হত্যা-যজ্ঞের সন্তোষজনক কি জওয়াব খুঁজিয়া বাহির করিবেন, তাহাই আমরা জানিতে চাই।

দেশে প্রতিদিন গড়ে ১১টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতেছে। এই খতিয়ানে অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু সংখ্যায় কিছু কম হইলেও কোন হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট কাহারও পক্ষে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। সরকারকে নূতন করিয়া নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের খতিয়ান লইতে হইবে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সরকার অন্ততঃ কিছু লোকের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, খুন-খারাবি করিয়াও রেহাই পাওয়া যায়।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় চৈত্র ২৫, ১৩৮০

রামপুর-কুকরাইলে কী দেখেছি

॥ ১ ॥

—আবদুল গাফফার চৌধুরী

···· গত সাতই এপ্রিল রবিবার টাঙ্গাইল শহর থেকে মাত্র পনর মাইল দূরে অবস্থিত কালিহাতী থানার রামপুর ও কুকরাইল গ্রাম দেখতে গিয়ে মনে হল, আমরা বড় বেশী আশা করেছিলাম। ক্ষমতা যাঁরা হাতে পেয়েছেন, তাঁরা তা ব্যবহার করতে শেখেন নি। তাই অপব্যবহারের মাত্রা বেড়েছে। পুরনো শাসকদের পরিত্যক্ত প্রশাসনিক যন্ত্র আর গদী নিজেদের দখলে পেয়ে তাঁরাও পুরনো কায়দায় ক্ষমতা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন, ভাবছেন এটাই বুঝি নিয়ম। ব্যবহার না জানলে অপব্যবহারটাও কেউ দক্ষতার সাথে করতে জানে না। এখন ক্ষমতার নির্যাতন তা-ই আরো মাত্রাহীন।

···· কিন্তু রামপুর-কুকরাইল থেকে বন্না হয়ে টাঙ্গাইল ফেরার পথে আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। তিন বছর আগের ধ্বংসযজ্ঞ এবং এবারের ধ্বংসযজ্ঞ। নৃশংসতায় কোন্‌টি বড় এবং কোন্‌টিকে ধিক্কার দেব?

···· আমরা প্রথমে ঢুকলাম কুকরাইল গ্রামে। এক নজর দেখেই মনে হল, একটা বন্য হাতী যেন সারা গ্রামটাকে লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেছে। আর বন্যহাতীর সেই তাণ্ডব থেকে রক্ষা পায়নি কেউ। এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশু, নারী এবং অবলা জীবজন্তুও নয়। একটার পর একটা আগুনে পোড়া বাড়ী। টিনগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। চাল, ডাল, কলাই, তিসি, তাঁত, সূতা, সূতার রং ভস্মীভূত। যে বাড়ীগুলো আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছে, তা নির্মমভাবে লুণ্ঠিত। মেয়েদের শরীর থেকে পর্যন্ত সোনা আর রূপার গয়না ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। গরু পুড়েছে, হাঁস-মুরগী, ছাগল পুড়ে ছাই

হয়েছে—তার কঙ্কাল চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। যারা সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে, তাদের সম্বিত এখনো ফেরেনি। আমাদের দেখে একদল সর্বহারা নরনারী—যারা দশদিন আগেও ছিল সম্পন্ন গৃহস্থ এবং তাঁতী, তারা সমস্বরে কেঁদে উঠল। লজ্জা ভুলে মায়ের বয়েসী কয়েকজন মহিলা এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল। তাদের কারো কারো দেহে নির্মম প্রহারের চিহ্ন। তাদের কান্নায় আল্লার আরশ কেঁপে ওঠে। জানি না, মানুষের গদী কেঁপে ওঠে কিনা!

কার কথা লিখবো? শয়ে শয়ে পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে। অসংখ্য বাড়ীঘর, দোকান, তাঁত ভস্মীভূত হয়েছে। এমন হয়েছে—বহু পরিবারের আজ মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এক মুঠো খাবার সংগ্রহের সংস্থান নেই। মানুষের মধ্যে পশু প্রবৃত্তি এতটা মাথাচাড়া দিতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। অত্যাচারীরা গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে তাদের সর্বস্ব লুট করে সন্তুষ্ট হয়নি, গ্রাম দু'টোর প্রত্যেকটি ইদারায়, প্রত্যেকটি পুকুরে পেট্রোল আর কেরোসিন ছিটিয়ে পানীয় জল পানের অনুপযুক্ত করে রেখে এসেছে। একটি চৌদ্দ বছরের ছেলে—সারা গায়ে মারের দাগ, এক বদনা পানি ইদারা থেকে তুলে এনে আমাকে দিল। বললো: 'একটু মুখে দিয়ে দেখুন।' মুখে দিতে হল না, নাকের কাছে নিতেই দেখি, কেরোসিনের উৎকট গন্ধ। দগ্ধ, লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত গ্রামটিতে কান্নায় ভেংগে পড়া নারী-পুরুষের পাশ কাটিয়ে হাঁটছিলাম আর ভাবছিলাম তিন বছর আগের কথা।

.... আমি কাঁদতে ভুলে গেছি। কিন্তু কুকরাইলের সাত সন্তানের মা আছিয়া খাতুন, বৃদ্ধা করিমন্নেসা আর আবদুল হালিমের মেয়ে সাহেরা খাতুনকে দেখে আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। অত্যাচারীরা একেবারে পশু না হলে মেয়ে মানুষের গায়ে এমনভাবে হাত তুলতে পারে না। করিমন্নেসার মাথা ফাটানো। সাহেরা খাতুন যুবতী। তার সর্বাঙ্গে রোলারের প্রহার এবং নখরাঘাতের চিহ্ন। আছিয়া খাতুনের পিঠ ফুলে ঢোল হয়ে আছে। চোখের ওপর কিছুটা অংশ কেটে গিয়ে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। মনোয়ারা নামে একটি মেয়ের অবস্থা দেখে আমি রাগে ক্ষোভে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

.... কুকরাইল গ্রামে এমন একজন সম্পন্ন মানুষ নেই, যার বাড়ি লুট হয়নি। ডাঃ মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন একজন এম. বি. বি. এস. ডাক্তার। সরকারী চাকুরে। থাকেন ঢাকার নওয়াবগঞ্জে। তাঁর বাড়িতে ঢুকে দুর্মূল্য

ডাক্তারি যন্ত্রপাতি পর্যন্ত নষ্ট করা হয়েছে। ঘরের খাট-পালঙ্ক, লেপ-তোষকে আগুন দেয়া হয়েছে। ব্লাড প্রেসার মাপার একটা আনকোরা নতুন যন্ত্র দেখি ভেঙ্গে বারান্দায় ফেলে রাখা হয়েছে। পাশের বাড়ি থেকে লুট করা হয়েছে রেডিও। পুরনো আমলের একটা গ্রামোফোন যন্ত্র আছড়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। দু'হাতে লুটপাট করা হয়েছে রামপুর ও কুকরাইল গ্রাম। লুটেরারা গরুর গাড়ী বোঝাই করে লাখ লাখ টাকার লুটের মাল নিয়ে গেছে। যা নিতে পারেনি, তা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে। রামপুরের ইদ্রিস মিয়া যথেষ্ট মান্যগণ্য লোক। তার বাড়িতে টিনের ঘর চৌদ্দটি। তাঁত ৩৫টি। গোলায় ৩৫ মণ ধান। ঢেকিতে ছেঁটে তোলা হয়েছে ১৫ মণ চাল। তাছাড়া আছে সরিষা, কলাই। ঘরে ছিল তাঁতের কাপড়ের কয়েকশো পাউণ্ড রং। যার প্রতি পাউণ্ডের দাম দেড় হাজার টাকা। ইদ্রিস আলী কিছু লেখাপড়া জানেন। তাই সখ করে তার তাঁত শিল্পের নাম করেছেন 'দেশবন্ধু হ্যাণ্ডলুম'। এই হ্যাণ্ডলুমের ৩৫টি তাঁতই এখন বিধ্বস্ত।

.... দু'একটা যা বেচেছে তার সুতা ছিড়ে দেয়া হয়েছে। ১৪টি বড় টিনের ঘরই ভস্মীভূত। ৩৫ মণ ধান, ১৫ মণ চাল, সরিষা-কলাই, কয়েক শ' পাউন্ড রং সব শেষ। রামপুরের আজিজুর রহমানের অবস্থা আরো শোচনীয়। ৩২ বছরের যুবক। গ্রামের সবচেয়ে বড় তাঁতী। ৮০ হাজার টাকার তৈরী তাঁতের কাপড় ও সুতা ছিল তার ঘরে। সব লুণ্ঠিত। তার ও তার ভাইয়ের যুবতী বৌয়ের পরনের কাপড় ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই যা লুণ্ঠিত হয়নি।

আজিজুর রহমানের বিধ্বস্ত ঘর থেকে যখন বেরুচ্ছি, তখন শুনি মেয়েকণ্ঠে উচ্চ স্বরে রোদন। উঠানে না নামতেই পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন একটি মেয়ে। নাম সখীনা। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। একটি তাঁত চালিয়ে কোনরকমে দিন কাটান। সেই তাঁতটি ধ্বংস করা হয়েছে। সখীনার এখন জিজ্ঞাসা: তিনি কিভাবে দিন গুজরান করবেন? এই প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

—জনপদ উপসম্পাদকীয় চৈত্র ২৭, ১৩৮০

॥ ২ ॥

আমরা সবাই ঘেমে নেয়ে উঠেছি। তবু কুকরাইল থেকে রামপুর গ্রামে গিয়ে উঠলাম। সেই একই ইতিহাস, একই ধ্বংসের স্বাক্ষর। যে গৃহস্থের ছ'টি গরু গোয়ালে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে, তার বুকে পুত্রশোকের মত ব্যথা।

আমাদের দেখে সে হাহাকার করে উঠল। বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে ছ'টি গরুর দগ্ধ কঙ্কাল।

হাঁটতে হাঁটতে একটা ব্যাপার বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল। বাংলাদেশের গ্রাম। কিন্তু কোন বাড়িতে হাঁস-মুরগীর সাড়া-শব্দ নেই। বৃদ্ধ করিম মিয়াকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, কিছু পুড়ে মরেছে। কিছু লুটেরারা নিয়ে গেছে। দু'শ' থেকে আড়াই শ' ছাগল ওরা লুট করেছে।

কী লুট করেনি ওরা? রামপুর হাটের বৃদ্ধ হাজী আব্দুস সবুর মিয়া। এবছরই হজ্জ করে দেশে ফিরেছেন। হাটে তার কাপড়ের দোকান। বেশী রাখেন কাফনের কাপড়। ত্রিশ হাজার টাকার কাপড় ছিল তার দোকানে। সব লুট। দোকানটিও ভেঙে দেয়া হয়েছে। নিজের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে হাজী সাহেব শিশুর মত অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমি জানি, এই কান্না বৃথা যাবে না। বাংলার দুঃখী মানুষের এই কান্না থেকে আবার একদিন বাষ্প হবে, মেঘ হবে। ঝড়ের অশনি সংকেতও দেখা দিতে পারে আজকের শান্ত নীলাকাশে।

.... রামপুর-কুকরাইল গ্রামে মোট ক্ষতির পরিমাণ কোটিখানেক টাকারও বেশী হবে। কিন্তু দু'জন ছেলে মানুষ ম্যাজিস্ট্রেট তা যদি চার-পাঁচ লাখ টাকা দেখায় আমি বিস্মিত হব না।

.... রামপুর-কুকরাইলে এতবড় ধ্বংসযজ্ঞের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি, আই. জি. কি একবার গ্রাম দু'টোতে যেতে পারতেন না? এ গ্রামের মানুষেরা-তো বিদেশী নয়, এ দেশের মানুষ। আমাদেরই বাবা-মা-ভাই-বোন। এদের কাছে বাঙালী পুলিশের হয়ে ক্ষমা চাইতে, দুঃখ প্রকাশ করতে লজ্জা কি? এদের ক্ষতিপূরণের সামান্য ব্যবস্থা করতেই বা কার্পণ্য কেন? এ দু'টো ব্যবস্থা করলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। তা না করে বিদেশী শাসকদের মত প্রভুসুলভ মনোভাব ও অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং সেই সঙ্গে 'আমরা যা করেছি ঠিকই করেছি' ধরনের আচার-আচরণ কেন?

.... যদি তদন্তে দেখা যেত, ডাকাত ও দুষ্কৃতিকারী আসলে পুলিশের মধ্যে রয়েছে, তাহলে তাদের সাজা দিতে হত। আর যদি দেখা যেত, কয়েকজন গ্রামবাসীর হঠকারিতার ফলে একজন পুলিশকে কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ দিতে হয়েছে, তাহলে দোষী গ্রামবাসী কয়েকজনের বিচার ও শাস্তি দেয়া চলতো। তা না করে পুলিশের দু'দুটো গ্রাম ধ্বংস করা এবং নিজে-দের হাতে আইন তুলে নেয়া অমার্জনীয় অপরাধ। এটা একটা জঘন্য

নজীর। এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত অশুভ ও সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। এত-বড় ধ্বংসযজ্ঞ যারা চালিয়েছে, তাদের চৌদ্দজনকে মাত্র গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে, আজ পর্যন্ত ঘটনার তদন্ত বা দোষী ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থা হয়নি, এ খবর আমার কাছে বিস্ময়কর ও লজ্জাকর দুই-ই। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীকে বলি : "মনসুর ভাই, দুষ্কৃতিকারী শুধু দেশের মানুষের মধ্যে নয়, আপনার পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও রয়েছে। তাদের খুঁজে বের করুন। শাস্তি দিন। বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীকে জনগণের আদর্শ সেবক বাহিনীরূপে গড়ে তুলুন।"

.... টাঙ্গাইলের নতুন বিষাদ-সিন্ধু কাহিনী সরকারী কাগজে গুরুত্বসহ ছাপা হয়নি, বেতারে-টেলিভিশনে চাপা দেয়া হয়েছে। কিন্তু গণ-কবির কণ্ঠ-বেতারে তা' আজ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলাদেশে।

.... কথা উঠতেই একজন উত্তেজিত হয়ে বললেন: 'আমি বহু নির্যাতন দেখেছি। বৃটিশ আমলে, পাকিস্তানী আমলে অনেক হত্যাকাণ্ডও দেখেছি, কিন্তু এ রকম সম্পদ ধ্বংস জীবনেও দেখিনি। দেশের পুলিশ দেশের সম্পদ এমনভাবে ধ্বংস করে এ অভিজ্ঞতা আমার প্রথম।

—জনপদ উপসম্পাদকীয় চৈত্র ২৮ ১৩৮০

আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নাই

....কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, কাজ এখনও অনেক বাকী। যে-পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার হইয়াছে, তার চাইতে অনেক বেশী ছড়াইয়া রহিয়াছে চতুর্দিকে। অবৈধ অস্ত্রধারীরা আবার মাথাচাড়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। গত কয়েকদিনে রাজধানী নগরী ও অন্যান্য শহরে যেসব ছোটখাটো সন্ত্রাস-মূলক ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাই আমাদের এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। ১২ই জুন আমরা লিখিয়াছিলাম, 'কাহারও কাহারও ধারণা, ভরা বর্ষা নামিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে শহর-নগর-পল্লীগ্রাম সর্বত্র ক্রাইমের আরেকটা হিল্লোল বহাইবার চেষ্টা করা হইবে। আষাঢ়স্য প্রথম দিবস হইতেই শুরু হইয়াছে ঘনঘটা। আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি সম্পর্কে পার্লামেন্টারি পার্টির সন্তুষ্টির সংবাদ যেদিন বাহির হইল সেদিনের কাগজেই উহার পাশাপাশি বাহির হইয়াছে হাজারিবাগ ট্যানারি এলাকায় দুষ্কৃতিকারী গ্যাং-এর ত্রাস সৃষ্টির সংবাদ, মুন্সীগঞ্জে দুইটি বাজার লুট ও ময়মনসিংহের একটি রেল স্টেশন তছনছ করার সংবাদ এবং দেশের অনেক কয়টি স্থানে বোমা বিস্ফো-

রণের সংবাদ। পত্রিকান্তরে চোরাচালানকারীদের একটি 'সেকেণ্ড ফ্রন্ট' খোলার খবরও বাহির হইয়াছে। সেটা বর্মা-সীমান্তে। চোরাচালানীরা সেই ফ্রন্টে নাকি দৈনিক লাখ লাখ টাকার পণ্য পাচার করিতেছে।

এছাড়া নরহত্যা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক হত্যার খবর ত প্রায় প্রতিদিনের কাগজে আছেই। কর্মীরা তাহাদের জীবনের নিরাপত্তাবিধানের দাবী উঠাইতেছেন। আত্মরক্ষার জন্য নাকি অস্ত্রও চাহিতেছেন। এই অবস্থায় গণতন্ত্র চলে না বলিয়া রাজনৈতিক মহলের কেহ কেহ হতাশাব্যঞ্জক অভিমতও প্রকাশ করিতেছেন। এহেন পরিস্থিতিতে এধরনের কথা উঠা অস্বাভাবিক নয়। এতদসত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে, পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে হইবে রাজনৈতিক পথেই এবং তাহা করিতে হইবে আইনের দ্বারা ও প্রশাসনের দ্বারাই। অন্য কিছুর দ্বারা নয়।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় আষাঢ় ৫, ১৩৮১

দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি

রণের সংবাদ। পত্রিকান্তরে চোরাচালানকারীদের একটি 'সেকেণ্ড ফ্রন্ট' খোলার খবরও বাহির হইয়াছে। সেটা বর্মা-সীমান্তে। চোরাচালানীরা সেই ফ্রন্টে নাকি দৈনিক লাখ লাখ টাকার পণ্য পাচার করিতেছে।

এছাড়া নরহত্যা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক হত্যার খবর ত প্রায় প্রতিদিনের কাগজে আছেই। কর্মীরা তাহাদের জীবনের নিরাপত্তাবিধানের দাবী উঠাইতেছেন। আত্মরক্ষার জন্য নাকি অস্ত্রও চাহিতেছেন। এই অবস্থায় গণতন্ত্র চলে না বলিয়া রাজনৈতিক মহলের কেহ কেহ হতাশাব্যঞ্জক অভিমতও প্রকাশ করিতেছেন। এহেন পরিস্থিতিতে এধরনের কথা উঠা অস্বাভাবিক নয়। এতদসত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে, পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে হইবে রাজনৈতিক পথেই এবং তাহা করিতে হইবে আইনের দ্বারা ও প্রশাসনের দ্বারাই। অন্য কিছুর দ্বারা নয়।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় আষাঢ় ৫, ১৩৮১

দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি

পাগল না মাথা খারাপ!

সম্প্রতি রাজাকার কমাণ্ডার বলে কথিত জনৈক ব্যক্তিকে পুলিশ রাজধানীর একটি এলাকা থেকে গ্রেফতার করলে জনতা তাতে বাধ সাধে বলে জানা গেছে।

প্রকাশ, উপস্থিত জনগণ উক্ত ব্যক্তিকে ছেড়ে দিয়ে বরং দুর্নীতিবাজ এম-সি-এ-দের গ্রেফতার করার দাবী জানায়।

—সোনার বাংলা জুলাই ২, ১৯৭২

প্রভাবশালীদের জন্যে ব্ল্যাক মার্কেটারের শাস্তি হয় না খাদ্যশস্য রেশনের চাল সিগারেট ও সিমেন্ট নিয়ে গ্রামাঞ্চলে ঢালাও কালোবাজারী

—গণকণ্ঠ জুলাই ৪, ১৯৭২

রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদকের বাড়ী থেকে

বাংলাদেশ রাইফেল ও পুলিশ রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সচিব ও মিউনিসিপ্যালিটির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের চেয়ারম্যান জনাব আবদুস সালাম টুকুর বাড়ি থেকে ২৩টি রিলিফের কোট, ১৫টি পুরনো ঢেউটিন ও একখানা পারমিট উদ্ধার করেছেন।

—গণকন্ঠ জুলাই ১৪, ১৯৭২

কাপড়ের বাজারে আগুন জ্বলছে সুতো যায় কোথায়?

দেশ স্বাধীন হবার সাথে সাথেই কাপড়ের দাম দ্বিগুণ হারে বাড়ছে। সূতোর অভাবে বাংলাদেশের লাখ লাখ তাঁতীর তাঁত বন্ধ হবার পথে।

—গণকন্ঠ জুলাই ১৫, ১৯৭২

তাঁত শ্রমিক নেতার বিবৃতি

জাতীয় শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ঢাকা জেলা তাঁত শ্রমিক লীগের সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান ভুঁইয়া এক বিবৃতিতে-তাঁতীদের নিকট সূতা বিক্রয়ে বিসিক কর্মকর্তাদের দুর্নীতির তীব্র নিন্দা করেন।

—গণকন্ঠ জুলাই ১৬, ১৯৭২

বরিশালে টেস্ট রিলিফের নামে গৌরীসেনের টাকার শ্রাদ্ধ

—গণকন্ঠ আগস্ট ২, ১৯৭২

শিশুখাদ্যে ব্যাপক ভেজাল
৪০ লক্ষ শিশু ইতিমধ্যেই পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত

একদিকে প্রয়োজনীয় শিশুখাদ্যের অভাব এবং অপরদিকে শিশুখাদ্যের ব্যাপক ভেজালের ফলে দেশের প্রায় ১ কোটি শিশু এক সংকটময় ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইয়াছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ১০, ১৯৭২

সেই ১ শত কোটি টাকার হিসাব কোথায়?

স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে বাংলাদেশের তদকালীন অধিকৃত অঞ্চলের ব্যাংক ও ট্রেজারী হইতে স্বর্ণ-রৌপ্যসহ প্রায় ১ শত কোটি টাকার কারেন্সী নোট মুজিব নগরে লইয়া যাওয়া হয়।

জানা গিয়াছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় গণপরিষদ সদস্য, স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তা বা মুক্তিযুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই এই অর্থ মুজিবনগরে নিয়াছিলেন। ইহাছাড়া বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার অফিসে দৈনন্দিন ব্যয়ের জন্য রক্ষিত প্রচুর টাকাও ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী অফিসারগণ সংগে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকাশ, সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ পাওয়া যায় বগুড়ার বিভিন্ন ব্যাংক হইতে। বগুড়ার ব্যাংকগুলি হইতে নাকি ৩৫ কোটি টাকা, রাঙ্গামাটি ব্যাংক হইতে ৪ কোটি, ভৈরব ব্যাংক হইতে ৬ কোটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্যাংক হইতে ৬ কোটি ও দিনাজপুর ব্যাংক হইতে ১০ কোটি টাকা বিভিন্ন সময়ে মুজিব-নগরে নেওয়া হয়।

—ইত্তেফাক আগস্ট ১৫, ১৯৭২

তিনি আওয়ামী লীগার বলে থানায় কেস হয় না—ঈশ্বরদীতে রেশনের চালের কালোবাজারী নিয়ে তুমুল কাণ্ড

—গণকন্ঠ আগস্ট ১৬, ১৯৭২

সাবধান! চিনিতে ইউরিয়া

চট্টগ্রামের বাজারে এইমর্মে জোর গুজব রটিয়াছে যে, চিনির সহিত ইউরিয়া সার মিশাইয়া মানবিক মূল্যবোধ বির্বজিত একশ্রেণীর ব্যবসায়ী ও ডিলার ভেজাল চিনি বাজারে ছাড়িতেছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ২২, ১৯৭২

কতিপয় এম-সি-এ প্রসংগে

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান আবদুর রাজ্জাক একশ্রেণীর আমলা, কতিপয় এম-সি-এ এবং টাউটশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সরকারকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ করিয়াছেন।

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৫, ১৯৭২

খুলনায় এম-সি-এ-এর বাড়ী থেকে এক লাখ টাকার চোরাই বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উদ্ধার

—গণকন্ঠ আগস্ট ২৬, ১৯৭২

মাগুরায় নীলামের মাল নিয়ে আওয়ামী লীগের তেলেসমাতি

—গণকন্ঠ আগস্ট ২৮, ১৯৭২

জীবন-রক্ষাকারী ওষুধ উধাও

জীবন-রক্ষাকারী ৭৫ ভাগ ওষুধ আর বাজারে নেই। স্বাধীনতার আট মাস পার হয়ে যাওয়ার পরও কেন জীবন রক্ষাকারী ওষুধ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।

—গণকন্ঠ আগস্ট ২৯, ১৯৭২

লাইসেন্স বিতরণে স্বজনপ্রীতির ফলেই পণ্যমূল্য দিন দিন বেড়ে চলেছে

—গণকন্ঠ সেপ্টেম্বর ৫, ১৯৭২

মৌলবীবাজার বণিক সমিতির বিবৃতি : শিশুখাদ্য সংকটের জন্য ব্যবসায়ীরা নয়, টিসিবি-ই-দায়ী

—গণকন্ঠ সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৭২

দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি ও জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ : আওয়ামী লীগ হইতে ১৯ জন এম-সি-এ বহিষ্কৃত

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ হইতে দুর্নীতিপরায়ণ গণপরিষদ সদস্য এবং কমিশ্নকে উচ্ছেদের এক বিপ্লবী অভিযান শুরু করা হইয়াছে। এই

অভিযানের প্রথম দফায় দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি এবং গণ-স্বার্থবিরোধী কার্য-কলাপের অভিযোগে গতকাল (শুক্রবার) ১৯ জন এম-সি-এ-কে দল হইতে বহিস্কারের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৭২

বাড়ী বণ্টনের নামে এ নিষ্ঠুর খেলা কেন?

পরিত্যক্ত বাড়ী বণ্টন নিয়ে সরকারী আমলাদের কারসাজি ও কারচুপির খেলা নিষ্ঠুরভাবে দিনদিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। নিরীহ মানুষ বিশেষ করে বিগত স্বাধীনতাযুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের অসহায় পরিবার-বর্গ স্বেচ্ছাচার আমলাদের এ নিষ্ঠুর খেলার শিকারে পরিণত হচ্ছেন সব-চেয়ে বেশী।

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ৫, ১৯৭২

ভোজ্য তৈলে ভেজালের দরুন সোয়া কোটি লোক রোগাক্রান্ত

চিকিৎসাবিদগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভোজ্য তৈলে ব্যাপক ভেজালের ফলে দেশের শতকরা ২৫ জন অর্থাৎ প্রায় সোয়া কোটি লোক পেটের পীড়া, চোখের পীড়া ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ভুগিতেছেন।

ইত্তেফাক অক্টোবর ২৩, ১৯৭২

আদমজী জুট মিলের ওয়ার্কশপে এলাহী কাণ্ড : প্রায় দেড় লক্ষ টাকার খুচরা যন্ত্র গোপনে বিক্রি

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ২৭, ১৯৭২

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী চট্টগ্রামের পদত্যাগী আওয়ামী লীগ নেতা শ্রীবিধান কৃষ্ণ সেনের বিবৃতি : আওয়ামী লীগ উঠতি পুঁজিপতি সুবিধাবাদ ও দুর্নীতির আখড়া হয়েছে

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ৩১, ১৯৭২

'মালের অভাব নাই' 'সরবরাহ নাই' কোনটি ঠিক?

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১৭, ১৯৭২

গ্রেফতার হচ্ছে হরদম : প্রভাবশালীদের চাপে ছাড়া পাচ্ছে ডাকাত পুষছে কারা? অপরাধের সরকারী হিসাব : হত্যাকাণ্ড ৫২ : ডাকাতি ২৪৭ : ছিনতাই ৯২১ : গ্রেফতার ৯৭২—অপরাধীর শাস্তি?

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ১৮, ১৯৭২

মোজাফ্‌ফর ন্যাপ কার্যকরী সংসদের সভা : আওয়ামী লীগ দুর্নীতিকে সামাজিক ব্যধিতে পরিণত করেছে

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ২০, ১৯৭২

পরিত্যক্ত বাড়ী উদ্ধার অভিযান ব্যর্থ

শুনে সকলে অবাক হবেন, মীরপুর, মোহাম্মদপুর এলাকা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ঢাকা শহরের পৌর এলাকায় সাধারণের জানা মতে ১৯৮১টি আওয়ামী লীগ শাখা, উপশাখা, প্রশাখা অফিস রয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের আশ্রিত একটি ছাত্র সংগঠনেরও অসংখ্য অফিস খোলা হচ্ছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিরোধী ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ীতে রাতা-রাতি এসব অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ২০, ১৯৭২

দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি—অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ লাইসেন্স-পারমিট বিতরণে আওয়ামী লীগ এম-সি-এ'র 'নো চিন্তা ডু ফুর্তি'

দুর্নীতির তেলেসমাতি কারবার এবং স্বজনপ্রীতি এ দেশে কোন নতুন ঘটনা নয়।

নরসিংদীর এম-সি-এ জনাব মোসলেম উদ্দীন ভুঁইয়া দুর্নীতি আর স্বজন-প্রীতির যে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন, তা অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ভঙ্গ করে দিয়েছে।

জানা গেছে, এই এম-সি-এ আমদানী লাইসেন্স, কাপড়ের হোল সেলার, সিমেন্ট, সূতা, বিলাস দ্রব্যাদির ডিলারশীপ, সার ও মূল্যবান বিদেশী কাপড়-চোপড় আমদানী ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে এ পর্যন্ত মোট ২১টি

লাইসেন্স-পারমিট তার আত্মীয় স্বজনকে ইস্যু করেছেন। নিম্নে লাইসেন্স-ধারী ব্যক্তিদের নাম এবং এম-সি-এ'র সাথে তাদের সম্পর্ক ও লাইসেন্সের বিবরণ দেয়া হলো :—

১। জনাব আবদুর রাজ্জাক	আমদানী লাইসেন্স	চাচা
২। ,, আফছার উদ্দীন ভুইয়া	ঐ	পিতা
৩। ,, আবদুল লতিফ ,,	ঐ	চাচা
৪। ,, আবদুল মতিন ,,	ঐ	ভাই
৫। ,, আবদুর রশিদ ,,	ঐ	ভাই
৬। ,, জানে আলম ,,	ঐ	ভাই
৭। ,, আবদুর রাজ্জাক ,,	কাপড়ের হোল সেলার	চাচা
৮। ,, জানে আলম ,,	সিমেন্ট	ভাই
৯। ,, জানে আলম ,,	সূতা	ভাই
১০। ,, জনাব আবদুর রশিদ	সূতা	ভাই
১১। ,, আবদুল মতিন	সূতা	ভাই
১২। ,, আবদুর রশিদ	বিলাস দ্রব্য	ভাই
১৩। ,, মোশাররফ হোসেন	এম. আর. ডিলার	ভাই
১৪। ,, রমিজ উদ্দীন	ঐ	ভাই
১৫। ,, আবদুর রশিদ	ঐ	ভাই
১৬। ,, রমিজ উদ্দীন	সার	ভাই
১৭। ,, জয়নাল আবেদিন	ঐ	ভাই
১৮। ,, আবদুর রাজ্জাক ভুঁইয়া	বিদেশী কাপড়	চাচা
১৯। ,, আবদুল মতিন	ঐ	ভাই
২০। শ্রীমহানন্দ সাহা	ঐ	বন্ধু
২১। শ্রীমহানন্দ সাহা	সিমেন্ট	বন্ধু

—গণকন্ঠ নভেম্বর ২১, ১৯৭২

বারহাট্টা থানা : আওয়ামী লীগের নেতা রেশন মেরে দিচ্ছে :
রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ধোলাই

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ২১, ১৯৭২

সিলেট জেলায় রেডক্রসের চিত্র
নায়ক : আওয়ামী লীগ নেতা
মাল : রেডক্রসের
কারবার : ব্ল্যাকমার্কেট

—গণকন্ঠ নভেম্বর ২২, ১৯৭২

ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ :
সরকারের ব্যয় বেড়েছে সমস্যা কমেনি

—গণকন্ঠ নভেম্বর ২৮, ১৯৭২

দৈনিক ১৮ লক্ষ গ্যালন : বৎসরে ২০ লক্ষ টাকা
পানির অপচয় পানিতে যাইতেছে
এর জবাব কি ?

ওয়াসা বর্তমানে ঢাকা শহরে যে পরিমাণ পানি সরবরাহ করিতেছে তাহার অর্ধেকের বেশী পানি অর্থাৎ প্রত্যহ ১৮ লক্ষ গ্যালন পানি অব্যবস্থা এবং অবহেলার দরুন অপচয় হইতেছে। ইহার ফলে প্রত্যহ প্রায় ৫ হাজার টাকা অর্থাৎ প্রতি বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার পানি একেবারে পানিতেই চলিয়া যাইতেছে ।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৪, ১৯৭২

টাঙ্গাইল মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সম্মেলন :
কাদের সিদ্দিকী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কোরানের
অবমাননা করেছে

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২০, ১৯৭২

সাবেক এম. সি. এ ভ্রাতা সমাচার : রেশনের সিমেন্ট :
কালোবাজারীদের জমজমাট ব্যবসা চলছে

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২৭, ১৯৭২

যেখানে সূতা সেখানে এম. সি. এ
আসল তাঁতীদের খবর নেই : টাউটদের হরিলুট

প্রয়োজনীয় সূতার অভাবে সিরাজগঞ্জে কয়েক হাজার বেকার তাঁতী এখন অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যুর দিন গুণছে। অভিযোগে প্রকাশ, স্থানীয়

এম-সি-এ এবং কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতার কারসাজি ও বিসিকের দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির ফলে প্রকৃত তাঁতীরা কোন সূতা পাচ্ছে না।

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২৮, ১৯৭২

প্রায় ৪ কোটি টাকা মূল্যের সরকারী জমি বেহাত!

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে কেবল ঢাকা শহরেই বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রায় দুই লক্ষ বর্গগজ এলাকা জবর-দখলকারীদের অধীনে চলিয়া যাইতেছে।

বর্তমান বাজার দরে এই ভূমির মূল্য প্রায় ৪ কোটি টাকা। ইহাছাড়া চট্টগ্রাম, লালমনিরহাট, সৈয়দপুর, রাজবাড়ী, পাকশী, ভৈরববাজার, আখাউড়া, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, দেওয়ানগঞ্জ, ময়মনসিংহ ইত্যাদি এলাকারও রেলওয়ের প্রচুর পতিত ভূমি জবরদখলকারীদের অধিকারে চলিয়া যাইতেছে। স্বাধীনতার পর এক শ্রেণীর লোক ঢাকা শহরে রেলওয়ের পরিত্যক্ত ভূমিতে (কাওরান বাজার হইতে গেণ্ডারিয়া পর্যন্ত) বসতগৃহ ও দোকানপাট নির্মাণ শুরু করে। উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতার পূর্বেও পরিত্যক্ত রেল লাইনের কোন কোন এলাকার বাস্তহারাদের বস্তি ছিল। তবে তাহারা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কোনরকমে মাথা গোজার ঠাঁই করিয়া নিয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর এক শ্রেণীর লোক অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে উক্ত পরিত্যক্ত ভূমি দখলের প্রয়াস পায়। প্রথমে তাহারা পরিত্যক্ত ভূমির বিভিন্ন স্থানে টিনের ঘর নির্মাণ করিয়া কোন কোন রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ের সাইনবোর্ড লাগায়। এমনকি কোন কোন এলাকায় রাজনৈতিক দলের ছোট-খাট নেতা-দের সম্বর্ধনা বা সভা ইত্যাদিরও আয়োজন করে।

পরে হঠাৎ দেখা যায় যে, এই পরিত্যক্ত ভূমিতে দোকানপাট, মার্কেট ইত্যাদি নির্মাণ শুরু হইয়া যায় এবং বিভিন্ন ছোটখাট ব্যবসায়ীর নিকট সেলামী লইয়া ভাড়া দেওয়া হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, আলোচ্য পরিত্যক্ত ভূমিতে পাকাপোক্ত দেওয়াল ঘেরা দোকান পাট নির্মাণ শুরু হইয়াছে।

অভিজ্ঞ মহল অভিমতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, রেলওয়ের এই বিরাট পরিত্যক্ত এলাকায় সরকারী উদ্যোগে কোন বাণিজ্যিক বা আবাসিক গৃহ নির্মাণ করা হইলে শহরের আবাসিক সমস্যার বেশ কিছুটা সুরাহা হওয়া সম্ভব।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ২৮, ১৯৭২

'কোন্ বিবাদীর কতবড় আত্মীয় আছে তাহা বিচারকের জানিবার কোন কারণ নাই, জানিলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না'

গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকার প্রথম মুন্সেফ আদালতে জীবন বীমা কর্পোরেশন গং বনাম আবুল হাসনাত জায়গীরদার মামলার শুনানীর দিন ছিল। বাদী আবুল হাসনাত জায়গীরদার এবং বিবাদী জীবন বীমা কর্পো-রেশন গং। এই শুনানী সম্পর্কে প্রথম মুন্সেফ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন উহা হুবহু নিম্নে প্রকাশ করা হইল :

"২০-৫-৭৫ উভয়পক্ষ ও কমিশনার সাহেব উপস্থিত। অদ্য অত্র মোকদ্দমার অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে আরও শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। কিন্তু অতীব দুঃখের সহিত আমি প্রকাশ করিতেছি যে, গতকল্য পর্যন্ত অত্র মোকদ্দমার বিবাদীপক্ষ হইতে আমাকে এইমর্মে একাধিকবার হুমকি প্রদান করা হইয়াছে যে, অত্র মোকদ্দমার অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ বিবাদীদের স্বপক্ষে প্রদান করা না হইলে আমাকে বিবাদীপক্ষ তাহাদের অতি বড় আত্মীয়ের কৃপায় অত্রাদালত হইতে অন্যত্র বদলীর বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ বিবাদীর কত বড় আত্মীয় আছে তাহা কোন বিচারকের জানিবার কোন কারণ নাই বা জানিলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না। আইনের চোখে সবাই সমান। বিবাদীপক্ষের উক্ত অপপ্রকাশ নিঃসন্দেহে এদেশের জন্য অতি দুর্ভাগ্যজনক বটে। বিবাদী পক্ষের উক্তরূপ জঘন্য হুমকির প্রতি নতি স্বীকার করিলে বিচার বিভাগের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইবে। আমার চাকুরীগত ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে এ বিষয়ে অধিক কিছু প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও ইহার তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ অত্র মোকদ্দমা অত্রাদালত হইতে উঠাইয়া লইবার জন্য ঢাকার মাননীয় জেলা জজ বাহাদুরের নিকট আমি বিশেষ আবেদন জানাইতেছি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ এডভোকেট মহোদয়ের প্রতি আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। উপরোক্তমর্মে মাননীয় জেলা জজ বাহাদুরের নিকট তৎক্ষণাৎ অনুরোধপত্র পাঠান হউক।

—স্বাঃ আঃ রহমান
মুন্সেফ ২০-৫-৭৫।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত ২৪শে এপ্রিল জীবন বীমা কর্পোরেশ-নের শাখা অফিসকে মুসলিম ইন্সিওরেন্স ভবন হইতে নিরালা ভবনে

স্থানান্তরকে কেন্দ্র করিয়া এই মামলা রুজু করা হয়। বাদী আবুল হাসনাত জায়গীরদারের আবেদনক্রমে গত ৩০শে এপ্রিল ঢাকার দেওয়ানী আদালতের প্রথম মুন্সেফ জীবনবীমা কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরসহ ৬ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এক অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। উক্ত নিষেধাজ্ঞায় জীবনবীমা কর্পোরেশনের আঞ্চলিক অফিস জোন সি-র কার্যালয় স্থানান্তর হইতে বিরত থাকার জন্য কর্পোরেশন কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ জারি করা হয়। উক্ত নির্দেশে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি না করার জন্য বলা হয় এবং শুনানীর তারিখ ১৩ই মে নির্ধারিত হয়। ১৭ই মে পর্যন্ত চলার পর শুনানী মুলতবী রাখা হয় এবং ২০শে মে অর্থাৎ গতকাল (মঙ্গলবার) এই শুনানীর পরবর্তী তারিখ ধার্য হয়।

—ইত্তেফাক জ্যৈষ্ঠ ৬, ১৩৮২

লবণ মওজুত ও কালোবাজারীর অভিযোগে সংসদ-সদস্য গ্রেফতার

গতকাল (বৃহস্পতিবার) পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক হ্যাণ্ড-আউটে বলা হয়, কক্সবাজার হইতে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ-সদস্য ও বাংলাদেশ জাতীয় লবণ উৎপাদন সমিতির যুগ্ম আহ্বায়ক ডাঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীকে গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রে চট্টগ্রামে গ্রেফতার করা হয়। লবণ মওজুত ও কালোবাজারীর দায়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনে তাঁহাকে আটক করা হইয়াছে। তিনি লবণের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে লবণের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী। তিনি কক্সবাজারে লবণ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে দেশের অন্যান্য স্থানে লবণ সরবরাহের পথে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করিতেছিলেন এবং মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার নির্ধারিত মূল্যে অপরিশোধিত লবণ বিক্রয়ের সরকারী নীতির বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছিলেন।

বাস্তুহারা সমিতির সভায় অভিযোগ : বিদেশী রিলিফ সামগ্রী কেবল আওয়ামী লীগের ভোগেই লাগছে

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ৩, ১৯৭৩

পারমিট কি হাওয়ায় উড়িতেছে ?

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১১, ১৯৭৩

জ্বালানী তেল ব্যবসায়ে দুর্নীতির পাহাড়

আগামী এক বছরে শতকরা ৯০টি পেট্রোল চালিত যানবাহন বিকল হওয়ার আশঙ্কা।

ভেজাল জ্বালানি ব্যবহারের ফলে আগামী এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের শতকরা ৯০টি পেট্রোল চালিত যানবাহন আংশিক বা সম্পূর্ণ অকেজো হইয়া যাইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৩, ১৯৭৩

জামালপুরে জাসদ নেতা সাজাহান সিরাজ : রিলিফের মাল চুরি করেছে যারা এখন তারাই আবার আপনাদের ভোট প্রার্থী

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৭৩

গাড়ী রেডক্রসের কিন্তু চড়ে বেড়ান আওয়ামী লীগ নেতারা

সুনামগঞ্জে রেডক্রসের গাড়ী, রিলিফের ট্রাক, জীপ ও স্পীডবোট আওয়ামী লীগের কর্মকর্তারা দলীয় কাজে ব্যবহার করছেন বলে জানা গেছে।

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ৬, ১৯৭৩

চট্টগ্রাম নোয়াখালী কুমিল্লায় গণবিস্ফোরণ

ঘটনা বানিয়াচং : সেয়ানে সেয়ানে কারবার। কৃষকদের সার নিয়ে — আওয়ামী লীগ চেয়ারম্যান ও কৃষি ইন্সপেক্টরের মালপানি কামানোর ধুম।

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৭৩

রিলিফ চুরির দায়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনতার হাতে গ্রেফতার

আসন্ন নির্বাচনে পাবনা জেলার ঘাটঘরিয়া থানা নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব মহিউদ্দিন আহমদকে রেডক্রসের মাল চুরি করে বিক্রির দায়ে জনতা আটক করে। ঈশ্বরদী থেকে পাবনার রাস্তায় আনুমানিক রাত দশটায় উক্ত আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনৈক ব্যবসায়ীর কাছে রেডক্রসের ১৬৫ বস্তা সিমেন্ট, ১ গাইট কম্বল ও ১ গাইট কাপড় চুরি করে বিক্রি করেন। যে ট্রাকটি উক্ত রিলিফের দ্রব্য নিয়ে যাচ্ছিল তার সাথে একটি মোটর সাইকেলে জনাব মহিউদ্দিন যাচ্ছিলেন।

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ২৫, ১৯৭৩

তারা আওয়ামী লীগার, তাই পাসপোর্ট লাগে না :
আখাউড়া সীমান্তে নেতা-উপনেতাদের অবাধ বেআইনী তেজারতি

ভারত গমনাগমনের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নেতা, উপনেতা, পাতি নেতা এবং তাদের পরিবার পরিজনদের বেলায় পাসপোর্ট প্রযোজ্য নয় বলে বিশ্বস্ত মহল সূত্রে জানা গেছে। তারা আওয়ামী লীগের কর্মী এটাই তাদের বড় পরিচয় এবং তাদের দাপটে সীমান্ত-রক্ষীসহ আইন প্রয়োগকারী বিভাগগুলো অসহায় বলে মনে হচ্ছে।

—গণকণ্ঠ মার্চ ১৪, ১৯৭৩

৬ হাজার পরিত্যক্ত বাড়ী বে-আইনী দখলে
আরো ৭ হাজার অবৈধ মালিকানাধীনে রয়েছে

—গণকণ্ঠ মার্চ ২২, ১৯৭৩

লক্ষ কোটি জনতা আজ ভুখা : জাতির মনে চরম হতাশা :
বিক্ষোভ-অনাস্থা : এই মেকী স্বাধীনতা জনগণ চায়নি

বাংলাদেশের লক্ষ কোটি জনতা আজ ভুখা। গোটা জাতির মনে আজ চরম হতাশা, সংশয়, বিক্ষোভ ও অনাস্থার ভাব বিরাজ করছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সম্পর্কবিহীন কতিপয় ব্যক্তি এবং অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ ও উচ্ছৃংখল আওয়ামী লীগ দল কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাদখলই বাঙালী জাতির আজকের এই চরম দুর্দশার মূল কারণ। আওয়ামী লীগের অযোগ্য নেতৃত্ব, দুর্নীতি, অরাজক শাসন ব্যবস্থা জাতির সমস্যা সমাধানে অক্ষমতা ও অনীহা এবং বিদেশী মহলের কাছে আত্ম বিক্রি সমগ্র জাতির মনে আজ দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়, সন্দেহ ও অনাস্থার সৃষ্টি করেছে। জনতা এই মেকী স্বাধীনতা চায়নি।

—গণকণ্ঠ মার্চ ২৪, ১৯৭৩

উপকূলীয় তৈল-টার্মিনাল অকেজো :
একশ ৪ কোটি টাকা গচ্চা

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৩, ১৯৭৩

এই টাকা কোন্ গর্তে যায়?

স্বাধীনতা উত্তরকালে সবে ইজারাদারি প্রথা বিলোপের পর নূতন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষাও তিন চারগুণ অধিক

হারে গ্রাম-বাংলার হাট বাজারের সামান্য পুঁজির ক্ষুদ্র দোকানদার ও কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হইতেছে। কিন্তু আদায়কৃত এই খাজনার কোন অংশই সরকারের রাজস্ব তহবিলে জমা হইতেছে না।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৩, ১৯৭৩

হবিগঞ্জে স্বল্প আয়ের লোকদের মাথা গোজার ঠাঁই নাই

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৫, ১৯৭৩

শ্বেতপত্র প্রকাশ

ভারতে ছাপা নোটের পটভূমিকা সম্পর্কে অপর একটি মহল ১২ই এপ্রিল বিবিসি'র বাংলা সংবাদভাষ্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। ঐ ভাষ্যে বলা হয় যে, বাংলাদেশ সরকার ভারতেও শত কোটি টাকা ছাপা-নোর অর্ডার দিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দফতরের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বরাত দিয়া বিবিসি'র সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, প্রকৃত চালু নোট ঐ ৩ শত কোটি টাকার চেয়েও ৪ গুণ বেশী।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৮, ১৯৭৩

রাজধানীতে ১২ লাখ ভূয়া রেশন কার্ড

—গণকণ্ঠ এপ্রিল ২১, ১৯৭৩

যন্ত্রাংশের অভাব : ২ হাজার নলকূপ অকেজো
পানীয় জলের সংকট

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২১, ১৯৭৩

দেশের বিভিন্ন এলাকায় জীবন রক্ষাকারী ঔষধের তীব্র অভাব

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৫, ১৯৭৩

সিগারেটের কৃত্রিম সঙ্কটের পিছনে রহস্যজনক চ্যানেল

গত দুইদিন যাবৎ কে-টু, বৃস্টল ও স্টার সিগারেট সম্পূর্ণ উধাও হইয়া গিয়াছিল। এবার ক্যাপস্টান সিগারেটও উহাদের পিছু ধরিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৯, ১৯৭৩

ভূয়া ব্যবসায়ীদের অবাধ রাজ :
একই লোক নানান নামে অসংখ্য লাইসেন্সের মালিক

—গণকণ্ঠ মে ৮, ১৯৭৩

ভৈরবে জিনিসপত্রের দাম কেবল উপরে উঠছে :
ভূয়া ব্যবসায়ীর আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ : মরছে গরীব জনসাধারণ

—গণকণ্ঠ মে ১৬, ১৯৭৩

আশুগঞ্জে তেল ও আটার ডিলারদের জমজমাট ব্যবসা : স'মিল মালিকদের যোগসাজশে রেশনের অর্ধেক মাল কালোবাজারে বিক্রি

—গণকণ্ঠ মে ২২, ১৯৭৩

কালো টাকা উদ্ধার : বস্ত্র কর্পোরেশনে চাউল-গমের অতিরিক্ত মূল্য প্রত্যাহার। বাড়ী ভাড়াও শুধু আয় নয়, ব্যয়ের উপর কর ধার্যের সুপারিশ : সংসদ-সদস্যদের সম্পত্তির শ্বেত পত্র চাই

সংসদ-সদস্য জনাব আবদুস সাত্তার (জাসদ) গতকাল (সোমবার) জাতীয় সংসদ-সদস্যদের সম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী জানান। তিনি গতকাল জাতীয় সংসদে ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণকালে বলেন যে, ১৯৭০ সালে সদস্যদের আর্থিক অবস্থা কি ছিল এবং বর্তমানে কি পরিমাণ সম্পত্তি আছে, সে সম্পর্কে শ্বেত-পত্র প্রকাশ করা উচিত। তিনি বলেন যে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলীয় ব্যক্তিদের লাইসেন্স-পারমিট বিতরণ করিয়া দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, উহার প্রেক্ষিতে শ্বেতপত্র প্রকাশ অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রসংগে তিনি স্বাধীনতার পর দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে নামে-বেনামে যে টাকা জমা হইয়াছে উহার উৎস অনুসন্ধানের আহ্বান জানান।

—ইত্তেফাক জুলাই ৩, ১৯৭৩

এই অশ্রুভেজা টাকা যায় কোথায়? কে
বা কাহারা এই অদৃশ্য তস্কর?

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের ৪০০টি চেক আবার 'উধাও' হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। গত ৮ই আগস্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কেবিনেট ডিভিশন বিভিন্ন ব্যাঙ্কে প্রদত্ত সার্কুলারে উল্লেখিত ৪ শতটি চেকের তালিকা দিয়া 'পেমেন্ট স্টপ' করার জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্কে নির্দেশ দিয়াছেন। সার্কুলার এবং তালিকা বিশেষ কারণে এখানে প্রকাশ করা হইল না।

—ইত্তেফাক আগস্ট ১৫, ১৯৭৩

গৃহ গবেষণা কেন্দ্রে অচলাবস্থা
৯ কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংসের মুখে

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও অন্যান্য কতিপয় কর্মপদ্ধতির অভাবে পূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের অধীন 'গৃহ গবেষণা কেন্দ্রে' অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ৩১, ১৯৭৩

ভোগ্যপণ্য সংস্থার ম্যানেজার বলেন : কিছু না, গাইবান্ধার জন্য বরাদ্দকৃত লক্ষাধিক টাকার কাপড় লা-পাত্তা :
আরও ২৫ হাজার টাকার কাপড় পঁচিয়াছে

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৭৩

যাত্রীদের সীমাহীন দুর্ভোগ : জীবনের নিরাপত্তা নেই

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ৫, ১৯৭৩

কুলাউড়া শাহবাজপুর লাইনে ৫০ পয়সা ঘুষ দিয়ে
ট্রেন থামানো যায়

বাজারে সিমেন্ট নেই : ব্ল্যাক মার্কেটে ৯০ টাকা বস্তা
অসাধু ডিলারদের টুপাইস ইনকাম

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ১৯, ১৯৭৩

প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বেদখল

জামালপুর মহকুমার বিভিন্ন থানা এলাকাসমূহের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, ডাকবাংলা ও রেলওয়ে সম্পত্তি প্রভৃতি জবরদখল অব্যাহত রহিয়াছে বলিয়া প্রাপ্ত সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে। এই ভোগ দখলকৃত সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৮৮ লাখ টাকা হইবে বলিয়া প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১৯, ১৯৭৩

হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব থাকে জেলা শহরে :
প্রয়োজনীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতি নেই
দৌলতপুর থানায় জনগণ চিকিৎসার সামান্যতম
সুযোগ থেকেও আজ বঞ্চিত

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ২৭, ১৯৭৩

কুড়িগ্রামেও ভুয়া রেশন কার্ড উদ্ধারের নামে প্রহসন :
নতুন কার্ড বণ্টন নিয়ে ডিলারদের মধ্যে হাতাহাতি :
৩ শ' কার্ড ছিনতাই

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ৯, ১৯৭৩

ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদপুষ্ট কর্তারা ঢালাও টাকা বানাচ্ছে :
রকফসফেট আমদানী নিয়ে বিরাট কারচুপি : টি এস পি
কারখানা আজো বন্ধ : ক্ষতি ৬০ কোটি টাকা

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ১৩, ১৯৭৩

মানিকগঞ্জে জিনিসপত্রের দাম ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি, জনসাধারণের
দুর্ভোগ : এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী দেদার মুনাফা লুটছে

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ১৪, ১৯৭৩

রাজধানীতে পানি সংকট

প্রয়োজন ১৫ কোটি গ্যালন : সরবরাহ ৪ কোটি গ্যালন

ক্রমবর্ধমান ঢাকা নগরীতে ক্রমশঃই পানি সংকট তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে।

এক পরিসংখ্যানে জানা গিয়াছে যে, বর্তমানে নগরীর অধিবাসীদের জন্য প্রতিদিন ১৫ কোটি গ্যালন পানির প্রয়োজন। কিন্তু ঢাকার পানি সরবরাহ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ 'ওয়াসা' প্রতিদিন মাত্র ৪ কোটি গ্যালন পানি সরবরাহ করিতে সক্ষম। আর এই ৪ কোটি গ্যালন সরবরাহও খুবই অনিয়মিত।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১৮, ১৯৭৩

চাঁটগা-বন্দরে যাদুর খেলা

বছরের ১লা জানুয়ারী থেকে নভেম্বর মাসের চলতি সপ্তাহ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন শেড ও নোঙ্গর করা জাহাজ থেকে চুরি ও অবৈধ পাচারের ফলে প্রায় দেড় কোটি টাকার খুচরা যন্ত্রপাতি, শিশু খাদ্য, ওষুধপত্র কাপড় এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্য খোয়া গেছে।

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ২৪, ১৯৭৩

প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন ভাঙ্গন ঠেকাতে? উত্তরবঙ্গে আওয়ামী
শিবিরে ক্ষমতার কামড়াকামড়ি

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ১৯, ১৯৭৩

কাঠচোরেরা নীলছড়ি বন শেষ করছে :
এক বছরে ৮০ লাখ টাকার কাঠ চুরি

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ২৯, ১৯৭৩

আমদানীকৃত আলুবীজ তরতরকারীর বাজারে কেন?

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৪, ১৯৭৩

৮ মাসে সোয়া কোটি টাকার অধিক ডেমারেজ

চলতি বৎসরের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের অভ্যন্তরে মজুত মালের ডেলিভারী দেরীতে গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টকে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ২৯ হাজার ৯ শত ৫৭ টাকা ৩৯ পয়সা ডেমারেজ চার্জ হিসাবে প্রদান করিয়াছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৪, ১৯৭৩

জালিয়াতীর অভিযোগ : সরকারী ক্যাশিয়ার গ্রেফতার :
বড়লেখা পূবালী ব্যাঙ্ক শাখা থেকে দেড় লক্ষাধিক টাকা
আত্মসাতের চেষ্টা

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ৫, ১৯৭৩

৬ মাসের ডেমারেজ ২ কোটি টাকা

চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে আগত ভাড়া করা জাহাজ হইতে মাল খালাসে দেরীর জন্য বাংলাদেশকে গত ছয় মাসে বৈদেশিক মুদ্রায় ২ কোটি টাকার ডেমারেজ দিতে হইয়াছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৭, ১৯৭৩

বিষয়টা কি খুবই নগণ্য?

পরিবহন ও সমুদ্র বন্দর সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের গড়িমসির জন্য স্বাধীনতার পর হইতে চট্টগ্রাম বন্দরের বিধ্বস্ত জেটি পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত কনসালটেন্ট কোম্পানীকে প্রতিমাসে অনর্থক ৫ হাজার ডলার প্রদান করিতে হইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭৩

স্পেশাল পুলিশের সাথে গুলী বিনিময় : প্রধানমন্ত্রীর তনয়সহ ৫ জন আহত !

গত শনিবার রাত সাড়ে এগারোটায় ঢাকার কমলাপুর স্পেশাল পুলিশের সাথে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রধানমন্ত্রী তনয় শেখ কামাল, তার ৫ জন সাঙ্গ-পাঙ্গ ও একজন পুলিশ সার্জেন্ট গুলীবিদ্ধ হয়েছে। শেখ কামাল ও তার সঙ্গীদেরকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নয়, দশ ও তেত্রিশ নম্বর কেবিনে ভর্তি করা হয়েছে। আহত পুলিশ সার্জেন্ট জনাব শামীম কিবরিয়াকে ভর্তি করা হয় রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে।

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ১৯, ১৯৭৩

পুলিশের কাছে দু'জনের আত্মসমর্পণ : ভূয়া প্রতিষ্ঠানের নামে রাজশাহী থেকে দেড় লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ১৯, ১৯৭৩

ঝিনাইদহ হাসপাতালের কথা শুনুন—

পয়সা না দিলে রোগীরা ওষুধ পায় না : এম্বুল্যান্স ব্যস্ত প্রমোদ ভ্রমণে

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২৪, ১৯৭৩

জামালপুরে

ভোকেশনাল গ্রুপের লক্ষ লক্ষ টাকার হরিলুট

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৩১, ১৯৭৩

জুট ইণ্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের অভ্যন্তরে—বেতনের কয়েকগুণ মেডিক্যাল বিল—

দেশের ৭২টি জুটমিলের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ জুট ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের প্রশাসনিক অব্যবস্থা চরম পর্যায়ে পৌছিয়াছে।

অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বেশ কিছু কর্মচারী মাসিক বেতন অপেক্ষা ১৩।১৪ গুণ বেশী মাসিক মেডিক্যাল বিল দিতেছেন এবং উহা পাসও হইয়া যাইতেছে।

প্রকাশ, উক্ত কর্পোরেশনের বিভিন্ন গ্রেডের মাত্র ১৮ জন কর্মচারী (যাহাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন ৩ শত টাকার উর্ধ্বে নহে), যাহাদের

মোট মাসিক বেতন যেখানে সাড়ে ৫ হাজার টাকার মত, সেখানে তাঁহারা
বেতন ছাড়াই নির্বিঘ্নে ২ হইতে ৪ মাসের মধ্যে প্রায় ২৮ হাজার টাকা
মাসিক মেডিক্যাল বিল গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে কর্পোরেশনের এস্টেট বিভাগের জনৈক কর্মচারী বেতন
বাদেই গত এপ্রিল মাসে ২ হাজার ১ শত ৮৬ টাকা ৭০ পয়সা, মে মাসে
৩ হাজার ১০ টাকা ৪০ পয়সা, জুন মাসে ৩ হাজার ২ শত ৮৯ টাকা ৩৩
পয়সা, জুলাই মাসে ৩ হাজার ৮৭ টাকা ৩৪ পয়সা, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের
জুনিয়র ক্লার্ক এপ্রিল মাসে ১ হাজার ৮ শত ৬৬ টাকা ৯৫ পয়সা, মে মাসে
১ হাজার ৭ শত ২১ টাকা ৮৩ পয়সা, জুন মাসে ৩ হাজার ১ শত ৫৮
টাকা ৯৫ পয়সা, জুলাই মাসে ২ হাজার ৭২ টাকা ১৩ পয়সা, ক্রয় বিভাগের
জনৈক জুনিয়র ক্লার্ক গত এপ্রিল মাসে ১ হাজার ৩ শত ২১ টাকা ৯৯
পয়সা, মে মাসে ১ হাজার ৩ শত ৯৮ টাকা ৬ পয়সা, জুন মাসে ২
হাজার ৩ শত ৫ টাকা ১২ পয়সা এবং জুলাই মাসে ২ হাজার ৮ শত ৫৪
টাকা ৯৮ পয়সা, মেডিক্যাল বিভাগের ১ জন কম্পাউণ্ডার এপ্রিল মাসে ১
হাজার ৪৮ টাকা ৫১ পয়সা, মে মাসে ২ শত ২২ টাকা ৫৭ পয়সা,
জুন মাসে ২ হাজার ৩ শত ৪৬ টাকা ৩৫ পয়সা এবং জুলাই মাসে ১
হাজার ১ শত ৬২ টাকা ৪৮ পয়সা মেডিক্যাল বিভাগের একজন টাইপিস্ট
এপ্রিল মাসে ৮ শত ৩৬ টাকা ৪ পয়সা, মে মাসে ৯ শত ৬৫ টাকা ৪১
পয়সা, জুন মাসে ১ হাজার ৯ শত ৩ টাকা ৪৭ পয়সা এবং জুলাই মাসে
১ হাজার ৭ শত ৮২ টাকা ৩১ পয়সা, এস্টেট বিভাগের একজন অফিস
এসিস্ট্যান্ট এপ্রিল মাসে ৬ শত ৯৯ টাকা, মে মাসে ৬ শত ৩৩ টাকা,
জুন মাসে ২ হাজার ৩ শত ২৮ টাকা, এবং জুলাই মাসে ২ হাজার ২ শত
৫৮ টাকা, এস্টেট বিভাগের একজন কেয়ার-টেকার গত এপ্রিল মাসে ৮
শত ৮২ টাকা, মে মাসে ১ হাজার ৬ শত টাকা, জুন মাসে ২ হাজার ১
শত ৯ টাকা এবং জুলাই মাসে ২ হাজার ১ শত ৩০ টাকা, প্ল্যানিং
বিভাগের জুনিয়র ক্লার্ক এপ্রিল মাসে ৬ শত ৮৫ টাকা, মে মাসে ১ হাজার
২ শত ৯৩ টাকা, জুন মাসে ১ হাজার ৫ শত ৫১ টাকা এবং জুলাই মাসে
১ হাজার ৫ শত ৭৯ টাকা, একজন ফাইন্যান্স এসিস্ট্যান্ট গত এপ্রিল মাসে
৫ শত ৯৬ টাকা, মে মাসে ৮ শত ৫৪ টাকা, জুন মাসে ১ হাজার ৭৭
টাকা এবং জুলাই মাসে ১ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা, বীমা বিভাগের জুনিয়র
ক্লার্ক ৩ মাসে ৪ হাজার ৩ টাকা, আর. সি. সি. বিভাগের অফিস এসিস্ট্যান্ট

৪ মাসে ১ হাজার ৫ শত ২৬ টাকা, সেলস বিভাগের পিওন মাসে ৩ হাজার ৫০ টাকা, একাউন্টস বিভাগের স্টেনো ৪ মাসে ২ হাজার ৭৩ টাকা, সেলস বিভাগের ম্যানেজারের পি. এ. ৩ হাজার ৩ শত ৪০ টাকা, পিওন ২ মাসে ১ হাজার ৩ শত ২ টাকা, ক্রয় বিভাগের স্টেনো ২ মাসে ১ হাজার ৮ শত ৩৯ টাকা, মেডিক্যাল বিভাগের পিওন ২ মাসে ৮ শত ২ টাকা, অফিস এসিস্ট্যান্ট ৪ মাসে ১ হাজার ৫ শত ৮৬ টাকা এবং আউট বিভাগের টাইপিস্ট গত ৩ মাসে ৩ হাজার ১ শত ১১ টাকা ৬৮ পয়সা শুধুমাত্র মেডিক্যাল ভাতাই গ্রহণ করিয়াছে।

পাট প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য

জুটমিল সংস্থার বর্তমান এই চরম প্রশাসনিক অব্যবস্থা সম্পর্কে পাট প্রতিমন্ত্রী জনাব মোসলেম উদ্দিন খানের বক্তব্য জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বিশেষ কোন মন্তব্য করিতে অস্বীকার করেন।

ওয়াসা ডুবিতেছে

রাজধানীর পানি সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন প্রতিষ্ঠানটির (ওয়াসা) অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখা এক বিরাট হুমকি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যেই সরকারের কাছে ওয়াসার দেনা ১৩ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। প্রতি বছরই বাজেটে ঘাটতি হইতেছে প্রায় ৬০ হইতে ৭০ লক্ষ টাকা। উন্নয়ন খাতের টাকা দিয়া অফিসার ও কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হইতেছে।

ওয়াসার হিসাব মতে, প্রতিদিন শহরে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হয়। স্থান ভেদে প্রতি হাজার গ্যালনে ২ টাকা, ৩ টাকা ও ৪ টাকা হারে মূল্য আদায় করা হয়। পথপার্শ্বস্থ ওয়াসার টেপে বিনা মূল্যে সর্বাধিক ৬০ লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহ ধরা হইলেও বাকী ৩ কোটি গ্যালন পানির মূল্য ২ টাকা হাজার গ্যালন হিসাবে বছরে ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা আয় হওয়ার কথা। কিন্তু ওয়াসার হিসাবে বছরে ৯০ লক্ষ টাকা বিল হয়। এই ৯০ লক্ষ টাকার বিলও সময়মত গ্রাহকদের দেওয়া হয় না, যার জন্য বহু টাকা অনাদায় থাকিয়া যাইতেছে। পানি সরবরাহ করা হইতেছে অথচ টাকা পাওয়া যাইতেছে না। এই টাকা কোথায় যাইতেছে কে জানে?

অভিযোগে প্রকাশ, শহরে বহুসংখ্যক পানি সরবরাহের বেআইনী লাইন রহিয়াছে। 'নগদ বিনিময়'-এর পরিবর্তে ওয়াসার কোন কোন কর্মচারী এই বেআইনী লাইনদানে জড়িত রহিয়াছে বলিয়াও অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

এক সাক্ষাৎকারে ওয়াসার জনৈক মুখপাত্র এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন 'মুজিবনগর সরকারের' সংগৃহীত ৭৫ কোটি টাকার কোন হিসেব নাই

উনিশ শ' একাত্তর সালে কলকাতায় 'মুজিবনগর সরকার' গঠিত হয়েছিলো। ঐ বছরের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মুজিবনগর সরকারই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। কলকাতায় প্রবাসী হওয়া সত্ত্বেও এ দেশের জনমনে এর প্রভাব ছিলো ব্যাপক। সবাই জানতো সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করছেন মুজিবনগরস্থ বাংলাদেশ সরকার। তাই দেশ-প্রেমিক বাঙালীদের হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ও আর্থিক আনুকূল্য গিয়েছে প্রবাসী সরকারের কাছে। লণ্ডন প্রবাসী বাঙালীদের কষ্টার্জিত চাঁদার টাকা এসেছে সেই সরকারর কাছে। পাকিস্তান অধিকৃত বাংলাদেশ থেকে ব্যাংক লুট করে নেয়া টাকা গেছে মুজিবনগর সরকারের হাতে। যদিও শাসক দলের বিপুল পরিমাণ টাউট রাজনৈতিক নেতা এ দেশের ব্যাংকের পয়সা সোনা-রূপা লুট করে নিয়ে গিয়ে সামান্য অংশ জমা দিয়ে বাকীটা অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোটাই আত্মসাৎ করেছে।

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ৪, ১৯৭৪

এই ১২০ কোটি টাকা কোথায় যাইতেছে?

এক টাকা সত্তর পয়সা নির্ধারিত মূল্যের 'ক্যাপস্টান' সোয়া তিন, সাড়ে তিন টাকায় উঠিয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্য নূতন কিছু নয়। বাজারে প্রতিটি জিনিসেরই নির্ধারিত মূল্য উল্লেখ করা আছে। কিন্তু প্রতিটি জিনিসই যথাসম্ভব চড়া দামে বিক্রয় হইতেছে। এই নিয়া প্রকাশ্যে কালো-বাজারীর বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রে বহু লেখালেখি চলিয়াছে। সরকারী বেসরকারী সকল দলের নেতারাই মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখিতেছেন। তবে কেন ফল হইতেছে না—এই প্রশ্নের জবাব অজ্ঞাত।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১৪, ১৯৭৪

আন্তর্জাতিক বাজারে দুর্নাম: খাদ্য দফতরের কর্তারা পয়সা বানাচ্ছে: ২ লাখ টন গম কিনতে দেড় কোটি টাকা ক্ষতি

সরকারী খাদ্যগুদামে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের মাত্র অর্ধেক মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কর্তা-ব্যক্তিরা জানুয়ারী-জুনে শিপমেন্টযোগ্য খাদ্যশস্য ক্রয়ের

পরিবর্তে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের খাদ্যশস্য ক্রয় করতে অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি কর্তারা আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে গোপনপথে বাজার মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দামে জুন-সেপ্টেম্বরে শিপমেন্টযোগ্য ২ লক্ষ টন গম ক্রয় করেছেন। এতে ক্ষতি দাঁড়াচ্ছে কমপক্ষে দেড় কোটি টাকা।

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ২২, ১৯৭৪

জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর—

ত্রাণ তহবিলের চেক চুরি হইয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলেও উত্তরবঙ্গে নূতন ট্রেন চালু সম্ভব নয়। ২২৩টি স্টেট বাস অকেজো

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৫, ১৯৭৪

আওয়ামী যুবলীগ সরকারের দুর্নীতির অংশীদার নহে

—শেখ মনি

গতকাল (রবিবার) আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়ামের সভাপতি শেখ ফজলুল হক মনি সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারকে আমরা সমর্থন করি, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিশ্বাস করি। কিন্তু আওয়ামী যুবলীগ আওয়ামী সরকারের দুর্নীতির অংশীদার নয়।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৮, ১৯৭৪

ঢাকায় পরিত্যক্ত দোকানপাটের সংখ্যা দুই সহস্রাধিক : সরকারের হাতে মাত্র ১৮৯টি

এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ঢাকার ডেপুটি কমিশনার জানান, শহরের নিউমার্কেট এবং মীরপুর ব্যতিরেকেই দুই সহস্রাধিক পরিত্যক্ত দোকান পাট ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। এই পর্যন্ত ইহার মধ্যে মাত্র ১৮৯টি পরিত্যক্ত দোকান সরকারের হাতে আসিয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৮, ১৯৭৪

সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মনির স্বীয় দোষ স্খালন চেষ্টা : আওয়ামী লীগ ও মুজিববাদী ছাত্র সংগঠনই নাকি যত নষ্টের গোড়া

আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান জনাব শেখ ফজলুল হক মনি অবশেষে সরকার, সরকারী দল এবং মুজিববাদী ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, শাসকদলে দুর্নীতিবাজ রয়েছে।

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ২৮, ১৯৭৪

টি ভি সেট বিতরণে বিশেষ কোটা কার স্বার্থে ?

বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ও বাংলাদেশে সংযোজিত টি ভি সেট বিতরণ সম্পর্কিত সরকারী নীতিমালার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, সরকার বিশেষ একটি মহলের স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করে প্রকৃত আবেদনকারীদেরকে বঞ্চিত করছেন।

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ৩, ১৯৭৪

১৩ কোটি টাকার খয়রাতি গম পাচার!

বাংলাদেশের সর্বহারা মানুষের জন্যে সহানুভূতিশীল বিশ্ববাসীর সাহায্য-সামগ্রী পাচার করে এ দেশের প্রভাবশালী মহল কোটি কোটি টাকা অর্জন করছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি এই মহল অর্থপিপাসু আন্তর্জাতিক মহলের সহায়তায় তের কোটি টাকার খয়রাতি গম ভারতে পাচার করেছে বলে জানা যায়।

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ৬, ১৯৭৪

শীঘ্রই রিলিফ কমিটিসমূহ বাতিল করা হবে

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ১২, ১৯৭৪

৬ শত ড্রামে সয়াবিনের বদলে পানি

ঢাকা সিএসডি গুদামে বর্তমানে সয়াবিন তৈলের ৬ শত ড্রামে পানি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২৮, ১৯৭৪

ক্ষমতাসীন দলীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলার নমুনা

ক্ষমতাসীন দলের কর্তা-ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা কয়েকটি মামলার নম্বরসহ তুলে দেয়া হচ্ছে। এসব মামলার প্রাথমিক তদন্ত হয়েছে কিন্তু মাঝপথে তদন্ত বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মামলা হচ্ছে :

৪৫ হাজার টাকার টিন চুরির অভিযোগে সাবেক এম-সি-এ জনাব সাজিদ আলী মোক্তারের বিরুদ্ধে গত ১৯৭২ সালের ৬ই অক্টোবর বৈদ্যের বাজার থানায় দায়ের করা ৩ নম্বর মামলা, সংসদ-সদস্য জনাব শাহজাহানের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে দায়ের করা ডি ডি টি এসি মেমো নম্বর ২৯২০ (তারিখ ২০শে নভেম্বর ১৯৭৩) মামলা। এ ছাড়া সাবেক এম-সি-এ জনাব ফজলুল হক সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করা এবি/-২৬৩-৭২ নম্বর মামলা, সাবেক এম-সি-এ জনাব রেয়াজউদ্দিন আহমদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এবি/-১০২-৭২ নম্বর মামলা, বর্তমান সংসদ সদস্য জনাব আবেদ আলীর বিরুদ্ধে দায়ের করা এবি/৯৪-৭২ নম্বর মামলা, সাবেক এম-সি-এ জনাব আবদুল লতিফ খানের বিরুদ্ধে দায়ের করা এবি/-২১২৭২ নম্বর মামলা, সাবেক এম-সি-এ জনাব সফির উদ্দিনের বিরুদ্ধে এবি/-৮৭-৭২ নম্বর মামলা, সাবেক এম-সি-এ জনাব গোলাম মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে এবি/-৩০৩-৭২ নম্বর মামলা, সাবেক এম-সি-এ সৈয়দ এমদাদুল বারীর বিরুদ্ধে এবি/-১৩৭/-৭২ নম্বর মামলা, সাবেক এম-সি-এ জনাব জহিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দায়ের করা ১০৮-৭২ নম্বর মামলা, বর্তমান সংসদ-সদস্য জনাব নূরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এবি/৭৯-৭২ নম্বর মামলা, সাবেক এম-সি-এ জনাব সিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে দায়ের করা এ বি/৩৩৭-৭২ নম্বর মামলা, সাবেক এম-সি-এ গোলাম হাসনাইনের বিরুদ্ধে এবি/১৭৪-৭২ নম্বর মামলা, সাবেক এম-সি-এ জনাব আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে এবি/২০৯-৭২ নম্বর মামলা, সাবেক এম-সি-এ জনাব রওশন উল হকের বিরুদ্ধে এবি/১৪০-৭২ নম্বর মামলা, সাবেক এম-সি-এ ডাঃ গোলাম সরোয়ারের বিরুদ্ধে দায়ের করা এবি/১৫৫-৭২ নম্বর মামলা উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া দুর্নীতি দমন বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল জনাব বোরহান উদ্দিনের বিরুদ্ধে পি এম ইবি-১৫৯ (সি)-৭৩-৬৩২ নম্বর চিঠিতে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। যুগ্ম-ডাইরেক্টর জেনারেল জনাব মান্নান বক্সের বিরুদ্ধে এসি-৩৩৬ নম্বর মামলা রয়েছে।

অভিযোগে প্রকাশ, ব্যক্তিগত স্বার্থে জনাব মান্নান বক্স খুলনা হাউজের অর্থ পাচার মামলায় তদন্ত গোপন করে রেখেছেন।

অভিজ্ঞ মহলের মতে এই সরিষার ভূত দিয়ে যে দুর্নীতি দমন বিভাগ কাজ করছে সেই বিভাগ এবং ক্ষমতাসীনদের স্বজনতোষণ নীতির মাধ্যমে দুর্নীতি উচ্ছেদ সম্ভব নয় বরং দিনদিন দুর্নীতির প্রসার ঘটছে এবং ঘটবে।

—গণকণ্ঠ মার্চ ১১, ১৯৭৪

সরকারী গুদামে লাখ লাখ টাকার রিলিফ ও পুনর্বাসন সামগ্রী নষ্ট হইতেছে

মহকুমার বিভিন্ন গুদামে কম্বল, গুড়া-দুধ, ঢেউটিন, তাঁবু, শাল, কাঠের খাম ও পুনর্বাসন সামগ্রী পড়িয়া থাকিয়া নষ্ট হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাছাড়া ইতিমধ্যে প্রায় ৪০ লাখ টাকা মূল্যের ঢেউটিন, কম্বল, গুড়াদুধ ও পুনর্বাসন সামগ্রী গুদাম হইতে রহস্যজনকভাবে লাপাত্তা হইয়া গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক মার্চ ১৬, ১৯৭৪

চালের ওয়াগন লুট!

গতকাল মঙ্গলবার রাতে বুভুক্ষু জনতা বদরগঞ্জের নিকটস্থ স্থানে রেলওয়ে মালগাড়ীর ওয়াগন ভেঙ্গে ১০০ ব্যাগ চাল নিয়ে নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে বলে এখানে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে।

—গণকণ্ঠ এপ্রিল ৪, ১৯৭৪

বেনাপোলের 'নোম্যান্সল্যাণ্ড'-৪০ লক্ষ টাকার পণ্য!

বেনাপোল সীমান্তের 'নোম্যান্স ল্যাণ্ডে' আবার ৪০ লক্ষ টাকার আমদানীকৃত পণ্য খোলা আকাশের নীচে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ মজিবুর রহমান আকস্মিকভাবে বেনাপোল পরিদর্শনের সময় লক্ষ লক্ষ টাকার পণ্য ঠিক এমনিভাবে খোলা অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখেন।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৮, ১৯৭৪

টেস্ট রিলিফের একলক্ষ উনিশ সহস্রাধিক টাকার হিসাব নাই

সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ থানা উন্নয়ন সার্কেল অফিসারের অফিস হইতে বিগত ১৯৭১-৭২ ও ৭২-৭৩ সালে টেস্ট রিলিফের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা

হইতে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৬ শত ৯৩ টাকার হিসাব অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই বলিয়া এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৬, ১৯৭৪

সরিষার ভূত তাড়াইবে কে?

জানা গিয়াছে যে, প্রতিমাসে বিসিক ও সমবায়ের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে গড়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার সূতা বণ্টন করা হয়। বিলিকৃত সূতার সিংহভাগ যায় ভূয়া তাঁতীদের হাতে। ফলে, ১০ কোটি টাকার সূতা কালোবাজারীতে ১৫ হইতে ১৮ কোটি টাকা পর্যন্ত বেচাকেনা হয়।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৮, ১৯৭৪

ঢেউটিনের কালোবাজারীতে দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

পলাশবাড়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান যথাক্রমে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান ও মিঃ অরজিত সরকারকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের ৩ শত বাণ্ডিল ঢেউটিন কালোবাজারে বিক্রয়ের দায়ে গত রবিবার গ্রেফতার করা হইয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৮, ১৯৭৪

পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট ও ব্যবসা সংস্থা উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ

পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ী, দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খাতে গত আড়াই বছরে আনুমানিক ৩ শ' কোটি টাকার আয় হইতে সরকার বঞ্চিত হয়েছেন। এই ৩ শ' কোটি টাকার মধ্যে পরিত্যক্ত ঘর ভাড়া বাবদ প্রায় পৌণে ১৬ কোটি টাকা, পরিত্যক্ত দোকান-পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মওজুদ দ্রব্য বাবদ প্রায় ২ শ' কোটি টাকা এবং একশত পৌণে সাতাশ কোটি টাকা পরিত্যক্ত দোকান-পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ থেকে সরকার এ পর্যন্ত বঞ্চিত হয়েছেন। এ অর্থ সম্পদ বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের আশীর্বাদপুষ্ট এক শ্রেণীর ভাগ্যবানদের কুক্ষিগত বলে অভিযোগে জানা গেছে।

—গণকণ্ঠ এপ্রিল ১৯, ১৯৭৪

মাত্র ১২ টাকা দরে কেন?

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, বাজারে যখন সিমেন্ট দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য তখন স্থানীয় জনস্বাস্থ্য দফতরের জনৈক ইঞ্জিনিয়ার বিভাগীয় কাজের জন্য ঠিকাদারদিগকে ১২ টাকা দরে সিমেন্ট সরবরাহ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

অথচ, বর্তমানে সিমেন্টের সরকার নির্ধারিত মূল্য বস্তা ৪২ টাকা এবং খোলাবাজারে সোয়াশত টাকারও বেশী।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২২, ১৯৭৪

এ ক্ষতির জন্য দায়ী কে?

সারাদেশে যেখানে চরম খাদ্য সংকট বিরাজ করিতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে রেলওয়ের কর্মচারীদের গাফিলতি আর অবহেলার দরুন সম্প্রতি সিরাজগঞ্জে আমদানীকৃত বিপুল পরিমাণ চাউল বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৪, ১৯৭৪

পরীক্ষা-নিরীক্ষার গচ্চা মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা!

দেশের গ্রামাঞ্চলে ৫০ হাজার নলকূপ স্থাপন করিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী বিভাগ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা গচ্চা দিয়াছেন।

ইহার কারণ, উক্ত বিভাগের প্রকৌশলীরা নলকূপের 'প্ল্যাট-ফরম' তৈরীর এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেন। ইহাকে এখন 'অকেজো' ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ইতিমধ্যে ৫০ লাখ টাকার সরকারী অর্থের অপচয় হইয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৫, ১৯৭৪

অর্থ : বেবীফুড সমাচার

শিশুখাদ্যের সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। নির্ধারিত মূল্যে তো দূরের কথা, তিনগুণ বেশী দাম দিয়াও বেবীফুড পাওয়া দুষ্কর। বেবীফুডের অভাবে জনসাধারণের দুর্ভোগও ক্রমান্বয়ে বাড়িতে বাড়িতে এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যাহাকে শেষ সীমা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৩০, ১৯৭৪

গতকাল পর্যন্ত ১৩ জন গ্রেফতার : জাল নোটের কারবার

—গণকণ্ঠ মে ১, ১৯৭৪

জাসদ-এর বিবৃতি
সেনাবাহিনী আহ্বান প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফলশ্রুতি
অবাধে কাজ করতে না দিলে সশস্ত্র বাহিনীর খ্যাতি-সুনাম বিপন্ন হবে

—গণকণ্ঠ মে ৭, ১৯৭৪

২০ হাজার লাইসেন্স ইস্যু হয়েছে : ১০ ভাগ প্রকৃত ব্যবসায়ীরা পেয়েছে
৯০ ভাগ লাইসেন্স ভুয়া ব্যবসায়ী

—গণকণ্ঠ মে ৮, ১৯৭৪

সশস্ত্র বাহিনীর অভিযান : এ পর্যন্ত গ্রেফতারকৃত ৮৩১ ব্যক্তির অধিকাংশই ক্ষমতাসীন দলীয়—
প্রভাবশালী মহলের চাপে বহু আটক ব্যক্তি ছাড়া পাচ্ছে

যৌথ বাহিনীর কম্বিং অপারেশনে গত ৬ই মে পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে আটশ'রও বেশী দুষ্কৃতিকারী ধরা পড়েছে। এই সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় দৈনিকগুলোতে। দুষ্কৃতিকারীদের সবার নাম-ঠিকানা কাগজের পাতায় ছাপা হয়নি। তবে যাদের হয়েছে, দেখা গেছে তাদের সকলেই ক্ষমতাসীনদল বা তদীয় অঙ্গদলসমূহের নেতা অথবা কর্মী।

—গণকণ্ঠ মে ৮, ১৯৭৪

দলীয় স্বার্থের খাতিরে তদন্ত রিপোর্ট ধামাচাপা :
৩ লাখ ভুয়া তাঁতী সনাক্ত : এদের বিচার করবে কে ?

নব্য ব্যবসায়ীগোষ্ঠী এ পর্যন্ত ভুয়া তাঁতের মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে কমপক্ষে ২শ' কোটি কালো টাকা আয় করেছে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া দূরে থাক এ সব ভুয়া তাঁতীদের ভিন্ন উপায়ে পুনর্বাসন করার চেষ্টা চলত বলে বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ।

—গণকণ্ঠ মে ১৪, ১৯৭৪

বে-আইনী অস্ত্র ও মালামাল উদ্ধারের চাঞ্চল্যকর কাহিনী

গতকাল (শনিবার) পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয় যে, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের দুইজন সংসদ-সদস্যের পিত্রালয়ে ও নিজ বাসভবন হইতে

বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গিয়াছে। যৌথ অভিযান পরিচালনাকালে সেনাবাহিনী এই সব অস্ত্র এবং অন্যান্য মালামাল উদ্ধার করেন।

খবরে বলা হয় যে, কুমিল্লার জাতীয় সংসদের একজন মহিলা সদস্যের পিতার বাড়ী হইতে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় সশস্ত্রবাহিনী সম্প্রতি অস্ত্রশস্ত্রসহ চোরাই পথে আনিত বিপুল পরিমাণ বিদেশী দ্রব্যাদি ও সদস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি উদ্ধার করেন। চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন, "সেনাবাহিনী যাচ্ছে। আমাদের বাড়ীতে যা আছে তা সরিয়ে দিন।"

সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ, কুমিল্লার ব্রিগেড কম্যাণ্ডার কর্ণেল হুদা, ডেপুটি কমিশনার ও স্থানীয় তিনজন সংসদ-সদস্য সেইস্থান পরিদর্শন করেন।

—ইত্তেফাক মে ১২, ১৯৭৪

মৌলবীবাজারে সেনাবাহিনীর অভিযান : আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার : প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও মালামাল উদ্ধার

—গণকণ্ঠ মে ১৫, ১৯৭৪

আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গদলই সকল অন্যায় ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত—ভাসানী
এ সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই

—গণকণ্ঠ মে ১৫, ১৯৭৪

সবুজ বিপ্লব 'বিবর্ণ প্রায়'

বহু ঘোষিত 'সবুজ-বিপ্লব' বিবর্ণ হলুদ বরণ করিতে শুরু করিয়াছে। মাঠে মাঠে ইরি ধান শুকাইতেছে, আউশ ও আমনের চারা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, ফলন বৃদ্ধিতে কৃষক মহলের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভেজাল ঔষধের জন্য এবং পানি সেচের অভাবে বিপরীত ফল দেখা যাইতেছে।

—ইত্তেফাক মে ১৫, ১৯৭৪

দেউলিয়ার পথে চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংস্থা

সরকারের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক নীতির ফলে চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংস্থা (সিডিএ) মূলত: দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। সিডিএ'র ব্যাপারে সরকারের

অর্থনৈতিক নীতির মৌলিক পরিবর্তন না হইলে দেশের এই বৃহত্তম নগর উন্নয়ন সংস্থা অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

—ইত্তেফাক মে ২২, ১৯৭৪

পুরাতনরা চিনি-ময়দা পায় না—অজুহাত, সরবরাহ নাই অথচ নূতন নূতন বেকারী অনুমোদন পায় কি করিয়া ?

—ইত্তেফাক মে ২৭, ১৯৭৪

১০০ বস্তা সিমেন্ট : শতকরা ৪০ ভাগ বালি

সম্প্রতি বরিশালস্থ এস এ ডিপার্টমেন্ট বিভাগীয় কাজের জন্য টি-সি-বি হইতে ১০০ বস্তা সিমেন্ট পাইয়াছেন। কিন্তু ৪০ বস্তা হইতেই নাকি বালি ও মাটি মিশ্রিত সিমেন্ট বাহির হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ৪, ১৯৭৪

মোটরগাড়ী, ঘড়ি বিক্রেতা ও তামাক ব্যবসায়ীরাও শিশুখাদ্য আমদানীর লাইসেন্স পাইয়াছে

জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরকালে গতকাল (মঙ্গলবার) জানা যায় যে, শিশুখাদ্য আমদানীর জন্য ১৯৭৩-৭৪ সালে চা ব্যবসায়ী, ঘড়ি বিক্রেতা, মোটর গাড়ীর দোকানী এবং তামাক ব্যবসায়ী, প্রমুখকেও লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ১২, ১৯৭৪

ডেমারেজ

১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে বিদেশ হইতে আগত জাহাজ হইতে সময়-মত খাদ্যশস্য খালাস না করার ফলে সরকারকে ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬ শত ৬০ মার্কিন ডলার ও ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৮ শত ২৮ জার্মান মার্ক ডেমারেজ দিতে হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ১৪, ১৯৭৪

ছ' জোটের জনসভায় মওলানী ভাসানী

মওলানা ভাসানী বলেন, সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযান চলাকালে টাঙ্গাইলের জনৈক সংসদ-সদস্যার বাড়ী থেকে ১৪ শ' বান টিন, আড়াই হাজার রিলিফের কম্বল উদ্ধার করেছে। কিন্তু তাকে গ্রেফতার করা হয়নি কেন ?

—গণকণ্ঠ জুন ১৪, ১৯৭৪

দুর্নীতির দায়ে আওয়ামী লীগের ২ জন সংসদ-সদস্য সাসপেণ্ড

—গণকণ্ঠ জুন ১৬, ১৯৭৪

জাতীয় সংসদে তথ্য প্রতিমন্ত্রীর তথ্য—মন্ত্রীরা ডিএ বাবদ ৬ লক্ষ ৩ হাজার টাকা নিয়েছেন

—গণকণ্ঠ জুন ১৮, ১৯৭৪

দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের পোয়াবারো : বরিশাল বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রটি বেওয়ারিশ সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে

—ইত্তেফাক জুন ১৯, ১৯৭৪

শহীদী আত্মার সাথেও প্রতারণা চলছে

গোবিন্দগঞ্জের গণকবরের জন্য প্রদত্ত ৫৮ হাজার টাকা গেল কোথায় ?

—গণকণ্ঠ, আগস্ট ৬, ১৯৭৪

ক্ষমতাসীন টাউটশ্রেণীর হাতে রিলিফ বণ্টনের নামে চলছে প্রহসন রিলিফ চুরি ও বণ্টনে দুর্নীতি

—গণকণ্ঠ, আগস্ট ১৩, ১৯৭৪

ভোগ্যপণ্য সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের কারসাজি—মেহেরপুরের গুদাম থেকে বহু টাকা মূল্যের শাড়ী গায়েব

—গণকণ্ঠ আগস্ট ২৯, ১৯৭৪

কবিরাজগঞ্জের কর্মিসভায় সাত্তার মানিকের ভাষণ : মন্ত্রী থেকে শুরু করে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-উপনেতারা আখের গোছাতে ব্যস্ত

—গণকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ৪, ১৯৭৪

প্রচুর বিদেশী রিলিফ আসছে অথচ দুর্গতরা ধুঁকে ধুঁকে মরছে

বাংলাদেশের বন্যাদুর্গতদের জন্য বিদেশী সাহায্য সামগ্রী আসা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু অনাহারক্লিষ্ট ও রোগেশোকে জর্জরিত মানুষের দুর্দশা তাতে সামান্যও কমেনি।

—গণকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯৭৪

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন : ১৩টি পত্রিকা মাহাত্ম্য কীর্তন করবে : মাত্র ৩ কোটি টাকা ব্যয় হবে : দেবে গৌরী সেন

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দল চাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে আসন্ন কাউন্সিল অধিবেশনের জৌলুশ বৃদ্ধি এবং ক্ষমতাসীন দলের মাহাত্ম্য-কীর্তনের জন্য বিভিন্ন সংবাদপত্রে ৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সুশোভন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। জনগণের কঠোর শ্রমার্জিত অর্থ থেকে এ জন্য কমপক্ষে ৩ কোটি টাকা অপচয় হবে বলে ওয়াকিফহাল মহল মনে করছেন। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে।

—গণকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯৭৪

একটি বিলম্বিত সিদ্ধান্ত : বাড়তি ব্যয় ৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকা : দায়ী কে ?

একটি প্রকল্প। নাম টিএসপি সার কারখানা। স্বাধীনতার পর হইতেই ইহাকে লইয়া সভা হইতেছে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতেছে ও বাতিল হইতেছে। আজও প্রকল্পের উৎপাদন শুরু সম্ভব হয় নাই। আর সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় মাত্র ৪০ হাজার টন মাল আমদানী করিতে বাড়তি ব্যয় করিতে হইয়াছে ৩ কোটি ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৭৪

জেলা প্রশাসন সাক্ষী গোপাল : সরকার বিপুল পরিমাণ আয় থেকে বঞ্চিত : দিনাজপুরে পরিত্যক্ত সম্পত্তির হরিলুট

—গণকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৭৪

লবণের বদলে নলকূপের লোনাপানি

বামনা থানার বহুসংখ্যক লোক এখন তরি-তরকারীতে নলকূপের লবণাক্ত পানি ব্যবহার করিয়া লবণের অভাব পূরণ করিতেছে

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯৭৪

লবণ মওজুদ ও কালোবাজারীর অভিযোগে সংসদ-সদস্য গ্রেফতার

গতকাল (বৃহস্পতিবার) পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক হ্যান্ড আউটে বলা হয়, কক্সবাজার হইতে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ-সদস্য ও বাংলাদেশ জাতীয় লবণ উৎপাদন সমিতির যুগ্ম আহ্বায়ক ডাঃ শামসুদ্দিন চৌধুরীকে গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রে চট্টগ্রামে গ্রেফতার করা হয়।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১, ১৯৭৪

আওয়ামী ঢাল—তলোয়ারের দৌরাত্ম্য

ডাকাতির অভিযোগে সংসদ-সদস্যের (হোমনা থানার) ভাই গ্রেফতার—ছোট একটি খবর। ঢাকার একটি সহযোগী দৈনিকের ভেতরের পৃষ্ঠায় গুরুত্বহীনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও খবরটি যে-কোন পাঠকের দৃষ্টিতে গুরুত্ব নিয়ে ধরা পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ১০, ১৯৭৪

পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ অব্যাহত

ক্ষমতাসীন দলীয় ব্যক্তিরা জাল দলিলের মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ অব্যাহত রেখেছেন

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ১১, ১৯৭৪

সরকারের আশ্রয়পুষ্ট ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারিতায় সারাদেশ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ১২, ১৯৭৪

রাজশাহীতে ভূয়া রেশন কার্ডধারীরা ২ বছরে আড়াই লাখ মণ গম তুলেছে

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ২৮, ১৯৭৪

গার্ডিয়ানের বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচার অব্যাহত

"ঢাকা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ভীতিপ্রদ শহর"
"পাঁচশো মিলিয়ন পাউণ্ড সাহায্যের হিসাবে নেই"
"আওয়ামী লীগ অকর্মণ্য ছেলেদের চাকরির উৎস"
"দিল্লী থেকে প্রাপ্ত তালী দেয়া ছিন্নবস্ত্র নিয়েই বাংলাদেশ সন্তুষ্ট।"

—সোনার বাংলা নভেম্বর ২৮, ১৯৭৪

প্রভাবশালীদের বাড়ী-ঘর দখল অব্যাহত : গৃহনির্মাণ সংস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ১০, ১৯৭৪

সরকারী নীতি ও নতুন নতুন আইনের ফাঁক: ৬ কোটি টাকার 'শক্রসম্পত্তি' বিক্রি

সরকারী নীতি ও আইনের ফাঁকে ইতিমধ্যে প্রায় ৬ কোটি টাকার সাবেক শক্র-সম্পত্তি বাড়ী-ঘর ও জমি বিক্রি হয়েছে। এ খাতের সরকারী আয় হ্রাস পেয়েছে বছরে প্রায় ৫০ লাখ টাকা।

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭৪

প্রচণ্ড শীত নেমেছে : লাখ-লাখ বিবস্ত্র মানুষ মৃত্যুপথযাত্রী : রিলিফের কম্বলগুলো গেল কোথায়?

এক প্রাথমিক হিসাবে দেখা গেছে, বাংলাদেশ রেডক্রস কয়েকটি দেশ থেকে প্রায় তিন হাজার প্যাকেট কম্বল পেয়েছে। এক দেশ থেকে পেয়েছে একশ' ব্যাগ এবং অন্য এক দেশ থেকে প্রায় দশ হাজারটি কম্বল। ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় কয়েকটি দেশ থেকে পেয়েছে প্রায় একশ' কার্টুন এবং প্রায় বিশ হাজারটি কম্বল। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ-তহবিলে এসেছে প্রায় তিরিশ প্যাকেট কম্বল।

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭৪

দুই বিলিয়ন ডলারের বিদেশী সাহায্য

—ডঃ আলিম আল রাজী

জনাব রাজী বলেন, যুদ্ধের ফলে দেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুনর্গঠনের জন্য এক দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে বলে এস্টিমেট করা হয়েছিল। কিন্তু বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত বিদেশী সাহায্য এসেছে দুই বিলিয়ন ডলার। সেই বিদেশী সাহায্যের টাকা কোথায় অদৃশ্য হলো, তিনি তা জানতে চান। তিনি বলেন, এত বিপুল পরিমাণ বিদেশী সাহায্য আসা সত্ত্বেও দেশ শুধু অবনতির দিকেই যাচ্ছে, এর কারণ কি? এ সম্পর্কে জনগণের কাছে সরকারকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

—সোনার বাংলা ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭৪

রেশন কর্তৃপক্ষের মজার খেলা : "দুহাজার ভূয়া কার্ড উদ্ধার হলে তিনহাজার ভূয়া কার্ড ইস্যু হয়"

—সোনার বাংলা ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭৪

রাজধানীর ভাঙ্গা রাস্তা কার্পেটিং হচ্ছে ভুষো ইট দিয়ে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের ২৬ লাখ টাকার পুরোটাই কি জমে যাবে?

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২১, ১৯৭৪

ভেজাল লবণ খেয়ে দুই ব্যক্তির মৃত্যু

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ৩০, ১৯৭৪

বছরে পৌণে দু'কোটি টাকার পেট্রোল অপচয়

সরকারী গাড়ীগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে প্রতিবছর ১ কোটি ৬৪ লাখ ২৫ হাজার টাকার পেট্রোল অপচয় হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বর্তমানে সরকারী গাড়ীর সংখ্যা হচ্ছে মোট ৩ হাজার। তন্মধ্যে জীপ ২ হাজার এবং মোটরকার, মাইক্রোবাস ও মিনিবাস হচ্ছে এক হাজার।

জানা গেছে, ঐ ৩ হাজার গাড়ীর জন্য প্রতিবছর ২১ লাখ ৯০ হাজার গ্যালন পেট্রোল খরচ হচ্ছে। যার বর্তমান বাজার দর প্রতি গ্যালন ১৫ টাকা হারে ৩ কোটি ২৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

—জনপদ আশ্বিন ২৮, ১৩৮১

রেশনকাড জালিয়াতির দায়ে ৪৪ জন গ্রেফতার

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৫, ১৯৭৫

মীরপুর ডি-৭ সাব-এরিয়ায় শতকরা ৫৭টি রেশনকার্ড ভূয়া প্রমাণিত

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৯, ১৯৭৫

ভেজাল সরিষার তৈলের কারখানা আবিষ্কার : ১১ জন গ্রেফতার

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৩, ১৯৭৫

তেজগাঁও খাদ্য গুদাম এলাকায় অবাধ অবৈধ ব্যবসা

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৩১, ১৯৭৫

টেস্ট রিলিফের গম কালো বাজারে বিক্রয়ের অভিযোগে দুই-জন সদস্যসহ ইউ পি চেয়ারম্যান গ্রেফতার

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২৩, ১৯৭৫

ছয় হাজারের মধ্যে সাড়ে পাঁচ হাজারই ভুয়া

কেবল একটি থানাতে ৬২ হাজারের মধ্যে সাড়ে ৫ হাজার তাঁত ফ্যাক্টরীই ভুয়া। এইসব ফ্যাক্টরীর অধীনে ২ লক্ষ ৩০ হাজার হস্তচালিত তাঁতের মধ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজার তাঁতের কোন অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

—ইত্তেফাক মার্চ ১০, ১৯৭৫

শরণার্থীদের জন্য প্রদত্ত অর্থ আত্মসাতের চাঞ্চল্যকর তথ্য: ১৪ কোটি টাকার হিসাবে গড়মিল

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে উপলক্ষ্য করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একটি মহল যে কিভাবে অর্থ সম্পদ লোপাট করেছে তা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। লণ্ডনে বাংলাদেশ তহবিলের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ও শ্রমিক-দলীয় এককালীন বৃটিশ মন্ত্রী বাংলাদেশের 'সম্মানিত নাগরিক' স্টোন হাউজের কেলেঙ্কারীর সুরাহা হতে না হতেই পশ্চিমবাংলায় একশ্রেণীর অর্থগৃধ্নু পিশাচের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।

—সোনার বাংলা এপ্রিল ২৭, ১৯৭৫

পুলিশী অভিযান— বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের চার বছর

জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির পেছনে বেআইনী অস্ত্র-শস্ত্রের ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বেআইনী অস্ত্র গত ৪ বছরে কত নিরীহ মানুষের জীবন যে নির্দয়ভাবে কেড়ে নিয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নেই।

এই কয় বছরে পুলিশ বাহিনীর অভিযানের ফলে যে সব অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে তার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হলো:

শুধু পুলিশের তৎপরতায় স্বাধীনতার পর থেকে চলতি বছর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সর্ব মোট ৭ হাজার ৪৫২টি বেআইনী অটোমেটিক রাইফেল উদ্ধার হয়। একই সময়ে নন-অটোমেটিক রাইফেল উদ্ধার করা হয় সর্বমোট ২৭ হাজার ৪৫২টি। বন্দুকের সংখ্যা হচ্ছে ২ হাজার ৪৯৬টি।

একইভাবে বেআইনী পিস্তল ও রিভলভার উদ্ধার পায় মোট ৭৭৫টি। ঐ একই সময় পুলিশ মোট ৫১ লাখ ১৮ হাজার ৩৫৬ গোলা-গুলী উদ্ধার করেন।

উপরোক্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-গুলী ছাড়া গত তিন বছরে পুলিশ তলোয়ার, ছুরি, বেয়োনেট উদ্ধার করে ১ হাজার ৫১৭টি। ম্যাগজিন, বেড়েল, ৫ হাজার ৩৯৬টি। ডিটোনেটর ৯০০ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য ১০ হাজার ৫৮ অর্থাৎ ৩৬৮ বাক্স।

—সোনার বাংলা মে ২৫, ১৯৭৫

রেডক্রস সম্পর্কে শ্বেতপত্র—অডিট এখনো শেষ হয়নি: তদন্ত চলছে: সাহায্যের হিসাব পাওয়া যায়নি

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে কত সাহায্য পেয়েছে তার কোন হিসেব নেই। দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে কি পরিমাণ সাহায্য কিভাবে বিতরণ করা হয়েছে তার কোন তালিকা নেই। সমিতির লাখ-লাখ টাকা খরচের হিসাবপত্রও অনুপস্থিত। দুর্নীতি অপচয় ও অর্থ আত্মসাতের একটা চক্র রেডক্রসকে ঘিরে ধরেছিল।

বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতির চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব বি. এ. সিদ্দিকী গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১৬ পৃষ্ঠা টাইপ করা এক বিবৃতিতে এ কথা জানান। তিনি তাঁর এই বিবৃতিটি বাংলাদেশ রেডক্রসের গত সাড়ে তিন বছরের ইতিহাসের 'শ্বেতপত্র' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গাজী গোলাম মোস্তফার পরিচালনায় বাংলাদেশ রেডক্রসকে গত সাড়ে তিন বছর দেশের সর্বোচচ ক্ষমতাধারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছিলো।

তিনি বলেন, দুঃস্থ মানবতার সেবার জন্যে বিদেশের দেয়া সাহায্য সামগ্রীর অপব্যবহার করা হয়েছে, ব্যক্তিগত ও একটা চক্রের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে রেডক্রসের সম্পত্তি। এ কাজে গাজী গোলাম মোস্তফা পেয়েছেন তাঁর সেই চক্রের সহকর্মীদের সহযোগিতা। তাই আইন বা ন্যায়নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রশ্নের সম্মুখীনই তিনি হননি।

....তিনি বলেন সাবেক চেয়ারম্যান দেশ-বিদেশে নিজে দুর্নাম কুড়িয়েছেন। তেমনি সমিতির মর্যাদাও হানি করেছেন। বিচারপতি বলেন, 'বাংলাদেশ রেডক্রস-এর সম্মান পুনরুদ্ধার করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মুখের চামড়াই চলে যেতে পারে।

বিচারপতি সিদ্দিকী বলেন, স্বাধীনতার পর যাদের নিয়ে বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতি গঠন করা হয় তাদের অনেকেরই রেডক্রসের নীতি এবং দুঃস্থ মানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থ সেবার মহান ব্রত সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। সমিতির সর্বোচ্চ সংস্থা 'জেনারেল বডি'র ১২৬ জন মনোনীত প্রতিনিধির অধিকাংশই ছিলেন একটি বিশেষ গোষ্ঠীবদ্ধ।

স্টক রেজিস্টার নেই

স্বাধীনতার পর ৭২ ও ৭৩ সালে বিভিন্ন দেশ রেডক্রসকে যে বিপুল সাহায্য সামগ্রী দিয়েছে, তার কোন স্টক রেজিস্টার রাখা হয়নি। এমনকি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান রেডক্রসের যে স্টক রেজিস্টার ছিল তারও কোন তত্ত্বাবধান করা হয়নি।

দুস্থ লোকেরা পায়নি—হাঁস-মুরগী খেয়েছে

দুঃস্থ জনসাধারণ রেডক্রসের সাহায্য পায়নি। রেডক্রসের খাদ্য পেয়েছে একশ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তির গবাদি পশু। সাবেক চেয়ারম্যানের হাঁস-মুরগী আর কুকুর।

বাংলাদেশ রেডক্রসের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব বি. এ. সিদ্দিকী গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সাহায্য সামগ্রী বিতরণের পর্যাপ্ত তালিকা পাওয়া যায়নি। যে সামান্য কাগজপত্র তিনি পেয়েছেন, তাতে দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক কম্বল, কাপড়, জামা, দুধ এবং প্রোটিন খাদ্য পেয়েছেন এক শ্রেণীর আমলা, উচ্চাসনে সমাসীন কতিপয় ক্ষমতাশীন ব্যক্তি। গম ও চাল দেওয়া হয়েছে তাদের গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগীর খাদ্য হিসেবে।

তিনি জানান, সাবেক চেয়ারম্যানের গরু রাখা হতো বড় মগবাজারের শান্তরী হাউসে রেডক্রসের অফিস প্রাঙ্গণে। গরুকে রেডক্রসের স্টক থেকে দেওয়া হতো গম-চাল এবং সি-এস-এম ও ডব্লিউ এস. এম. খাদ্য।

এছাড়া সাবেক চেয়ারম্যানের ৯২, গুলশানস্থ সেক্রেটারিয়েট, মোহাম্মদপুরের গেস্ট হাউজ এবং ১০৮, গুলশানস্থ রেডক্রসের একটি বাড়ি ভরপুর ছিল রেডক্রসের সাহায্য সামগ্রীতে। বিচারপতি সিদ্দিকী জানান, ৯২, গুলশানের বাড়িতে ১০ বস্তা চাল পাওয়া গেছে। বাড়ির দারোয়ান জানিয়েছে, এগুলো 'সাহেবের' (গাজী গোলাম মোস্তফা) কুকুরের জন্যে রাখা হয়েছে। ১০৮, গুলশানের বাড়িতে থাকতে দেয়া হয়েছে রেডক্রসের একজন মহিলা কর্মীকে। বিচারপতি জানান, এই মহিলা রেডক্রস থেকে বাড়িভাড়া ভাতা পান। কিন্তু তার কাছ থেকে কোন ভাড়া নেয়া হতো না।

বিচারপতি জনাব বি. এ. সিদ্দিকী বলেন, গরু এবং কুকুরের ভাগ্যে রেডক্রসের যে খাদ্য জুটেছে তা সঠিকভাবে বিতরণ করা হলে গত বছর বাংলাদেশে অনাহারে এত লোক হয়ত মারা যেত না।

এরা পলাতক

তিনি বলেন, মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে নিযুক্ত রেডক্রসের এডহক কমিটির কর্মকর্তারা গত সাড়ে তিন বছর সাহায্য সামগ্রী গ্রহণ ও বিতরণ এবং অর্থনৈতিক লেন-দেনের ব্যবস্থার কোন হিসাব কেন্দ্রকে দেয়নি। বিচারপতি জানান, মহকুমা থেকে এসডিওরা জানিয়েছেন যে, হিসাব-নিকাশের জন্যে রেডক্রসের এসব কর্মকর্তাদের এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

উনত্রিশটি ব্যাঙ্ক একাউন্ট

একমাত্র ঢাকা শহরের বিভিন্ন শাখা ব্যাংকে রেডক্রসের ২৯টি একাউন্ট খোলা হয়েছিল। কিন্তু লেনদেনের কোন মা-বাপ ছিল না।

পঁচিশ লাখ টাকা

গত বছরের জুন মাসে সমিতির ম্যানেজিং বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয় যে, ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করবেন চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষ দু'জনে মিলে। বিচার-পতি সিদ্দিকী জানান, তা সত্ত্বেও সাবেক রেডক্রস চেয়ারম্যান দূরের এক ব্যাংকে সমিতির একাউন্ট খোলেন এবং তার পরিচালক ছিলেন তিনি নিজে একা। '৭৪-৭৫ সালে এই একাউন্টে তিনি ২৫ লাখ টাকা লেনদেন করেন।

২৯৮টি গাড়ীর মধ্যে ৯৫টি অচল

রেডক্রসের ২৯৮টি যানবাহনের মধ্যে ৯৫টি এখন অচল এবং মেরা-মতের অযোগ্য।

রেডক্রস চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব বি. এ. সিদ্দিকী জানান, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রেডক্রস বিভিন্ন দেশ থেকে ৯০টি হাল্কা ধরনের গাড়ী, ১৬২টি ট্রাক, ৪৫টি এ্যাম্বুলেন্স এবং ১টি বাস সাহায্য হিসেবে পায়।

এর মধ্যে এখন ২৯টি হাল্কা ধরনের গাড়ী, ৩২টি ট্রাক এবং ৩৪টি এ্যাম্বুলেন্স শুধু চলাচলই নয়—মেরামতেরও অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

বিচারপতি সিদ্দিকী বলেন, এই যানবাহনগুলো ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠী-গত কাজে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ জ্বালানীর দাম যেতো

রেডক্রসে তহবিল থেকে। তিনি জানান, মেরামত খরচা বাদে শুধুমাত্র প্রতি মাসে জ্বালানীর খরচ ছিল ৪৫ হাজার টাকা।

রেডক্রসের কাজের বাইরে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত গাড়ীর জ্বালানী ও মেরামত খরচ ৭২ সালে দেখানো হয়েছে ২ লাখ ৪৩ হাজার ৭শ' ১৩ টাকা। ৭৩ সালে দেখানো হয়েছে ৫ লাখ ৮৪ হাজার ৯ শ' ৪৩ টাকা। ৭৪ সালে দেখানো হয়েছে ৮ লাখ ৫১ হাজার ৬ শ' ৮০ টাকা এবং চলতি সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত খরচ দেখানো হয়েছে ৮ লাখ ৭৯ হাজার ১ শ' ৭ টাকা। বিচারপতি বলেন, উল্লিখিত খরচ সরাসরি রেডক্রসের কাজে ব্যবহৃত গাড়ীর জ্বালানী ও মেরামত খরচ বহির্ভূত।

—দৈনিক বাংলা অক্টোবর ১৫, ১৯৭৫

শ্রমিক নেতা মান্নানের অভিযোগের জবাবে সাবেক মন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান

···তিনি ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর লক্ষ লক্ষ টাকার ফ্যার্নিচারের জন্য আমাকে দায়ী করিতে চাহিয়াছেন। স্বাধীনতার পর পরই বিভিন্ন পরিত্যক্ত শিল্পকারখানা ও সম্পত্তি কাহাদের তত্ত্বাবধানে ছিল তাহা জনাব মান্নানেরই বেশী জানার কথা। আমি স্বাধীনতা লাভের একমাস পর ঢাকায় আসি এবং প্রায় তিন মাস পর মন্ত্রিসভায় যোগ দেই ও ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর ধানমণ্ডীর একটি বাড়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে আমার সরকারী বাসভবনরূপে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। আমি থাকার আগে এই বাড়ী কাদের দখলে এবং কি কি ছিল তাহা তিনি ভাল জানেন। আমি মন্ত্রীত্ব ছাড়ার কয়েক সপ্তাহ আগে বাড়ীটি আওয়ামী লীগ প্রধানকে ছাড়িয়া দিয়া সরকারীভাবে আমার জন্য বরাদ্দকৃত অন্য বাড়ীতে চলিয়া আসি এবং পরবর্তী সময়ে সরকারী বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়ার সময় সরকারের সমস্ত মালা-মাল ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। জনাব মান্নান কথিত মালামালের কেন এতদিন খোঁজ করেন নাই তাহার কারণ আমার বোধগম্য নহে।

···জনাব মান্নান বিবৃতি দেওয়ার আগে এইসব একটু খোঁজ নিলেও পারিতেন। তিনি আশেপাশে একটু তাকাইলেই দেখিতে পাইতেন যে, অনেকের পরিবার-পরিজন স্বাধীনতার কল্যাণে সামান্য কারণেও বিদেশে যাইতেছেন, অনেকের সন্তান-সন্ততি বিদেশে স্থায়ীভাবে পড়াশুনাও করিতেছে। তাহাদের সম্পর্কে জনাব মান্নান কিছু বলেন না কেন?

সমবায় সম্পর্কে তিনি পাইকারী মন্তব্য রাখিয়াছেন। সমবায় একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয় সেইগুলি পরিচালনা করে না। আর যে প্রতিষ্ঠানগুলির নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন সেইগুলি প্রায়ই আমাদের দলীয় এমসিদের দ্বারা পরিচালিত। আমার মন্ত্রীত্বের আমলে তাহাদের কোন ত্রুটি আমার জানা নাই। তবে সমবায়-মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিবার পরই আমি মন্ত্রণালয় হইতে যে-কোন পারমিট বা সুপারিশ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়াছিলাম। ইহার জন্য অনেক গণ্যমান্যদের কোপানলে আমাকে পড়িতে হইয়াছে।

যাঁহারা সমাজতন্ত্রের নাম জিকির করিয়া খোদার ফজলে বাড়ী-গাড়ী সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন, আমি এই ধরনের সমাজতান্ত্রিক নেতাদের বিরুদ্ধে সবসময়ই সোচ্চার ছিলাম।

—ইত্তেফাক ফাল্গুন ১৯, ১৩৮০

সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় মতামত

স্বজন প্রীতির মহামারী

দেশে স্বজনপ্রীতির মহামারী লাগিয়াছে। চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, এজেন্সী-ইন্ডেন্টিং ইত্যাদি যে-কোন কিছুর সুযোগ-সুবিধা পাইতে হইলে স্বজনের সীলমোহর প্রয়োজন। এছাড়া কোন গত্যন্তর নাই। বর্তমানে উহা এমন এক ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে যে, কোথাও একটা পিয়নের পদ খালি হইলে উহাতে নিয়োগলাভের জন্য পর্যন্ত 'আপনজনের' সার্টি-ফিকেট দরকার হইয়া পড়ে। অন্যথায় নিয়োগলাভের কোন আশা নাই। এই যেখানে অবস্থা সেখানে অযোগ্য অপেক্ষা যোগ্য লোক বেশী সমাদর পাইবে তাহা হলফ করিয়া বলা চলে না। আর অযোগ্য লোকের বিপুল সমাবেশ ঘটিতেছে এবং এর যা অপরিহার্য পরিণতি বাংলাদেশের প্রশাসনে উহার কালোছায়া এরিমধ্যে বিস্তারলাভ করিয়াছে। সর্বত্র আজ শিথিলতা এবং বন্যার পানির মত ঘোলাটে অবস্থা। এখন পত্র-পত্রিকায় কর্মখালির কোন বিজ্ঞাপন ছাপা হইলে একএক সময় অনেক প্রার্থী পন্ডশ্রম ভাবিয়া দরখাস্ত করা হইতে বিরত থাকে। তাহারা ধরিয়া লয়, ইহা নেহাতই লোক দেখানো কারবার। যা হইবার পিছন দরজা দিয়া আগে ভাগেই হইয়া গিয়াছে। তাহাদের এই ধারণা যে অকারণ নয়, কয়দিন আগের একটি খবর হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ডিসাইডেড গেম' শিরোনামায় প্রকাশিত উক্ত খবরে বলা হয়, বিজ্ঞাপিত শূন্যপদ পূরণ করার পর লোক দেখানোর জন্য একটি আধা-সরকারী সংস্থা দরখাস্ত আহ্বান করে। এই গোপন মাজেজা না জানিয়া কিংবা জানিয়া শুনিয়াও কুহকিনী আশার ছলনায় ভুলিয়া যাহারা দরখাস্ত করেন তাহাদেরও ইন্টারভিউর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ অপেক্ষা আপনজন মুরুব্বীর সন্ধানে বেশী ছোটাছুটি করিতে দেখা যায়।

স্বাধীনতার পর হইতে আজ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ইহাই আমরা দেখিয়া আসিতেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে যে যোগ্যতা বা বাছাই পরীক্ষা লওয়া হয়, উহা যে নিছক পরিহাসের বস্তু, সে সম্বন্ধে আজ আর কাহারও মনে দ্বিধা নাই। মুরুব্বীদের জোরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যাহাদের সদগতি হয় বা হইয়াছে, তাহাদের হাব-ভাব, কথাবার্তা বলার ঢং, কায়দাকানুন দেখিলে কার খুঁটির জোর কত শক্ত তাহাও সহজেই বুঝা যায়। এর ফল হইতেছে বিষবৃক্ষের ছায়া রোপন করার শামিল। তিনি জানেন, তাহার ভাই কিংবা

ভাগ্নে বিজ্ঞাপিত পদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন এবং নিরপেক্ষ পরীক্ষায় যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে সক্ষম। —সুতরাং তাহার জন্য তদ্বির করিবার দরকার নাই, চারিপাশের অবস্থা হইতে তাহার মনেও এই বোধ জাগিতেছে যে, না, শুধু যোগ্যতার উপর ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তক্‌দির খুলিতে হইলে তদ্বির করিতেই হইবে। বলা বাহুল্য, এইভাবেই স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি সমাজজীবনে সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়াইতেছে। নৈতিকতা ভেঙ্গে যাইতেছে। দেশময় এই ধারণা সর্বব্যাপক হইতেছে যে, স্বাভাবিক উপায়ে আজ আর কোন কিছু হইবার নয়। এই অস্বাভাবিক পথ অর্থাৎ 'আপনজনের মাপকাঠি' যদি দেশের কোন মঙ্গল করিত, তাহা হইলে ন্যায়-নীতির কথা ছাড়িয়া দিয়াও না হয় উহা মানিয়া লওয়া যাইত। কিন্তু এই পাপে দেশ যে সলিলে ডুবিতে বসিয়াছে। যত চুরি-ছ্যাঁচড়ামি আর কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ-এর খবর পত্র-পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে, খোঁজ নিলে দেখা যাইবে সেই মহাপুরুষদের কেহই 'পরজন নয়'। আর সম্ভবতঃ তা নয় বলিয়াই তাহাদের কাহারও শাস্তিভোগ করিতে হয় নাই। শাস্তির ভয়ে ভীত কাহাকেও হইতে হইতেছে না। কারণ, তাহারা জানে তেমন সাধ্য কাহারও নাই। তেমন কথা বলিলে বরং বক্তার দেশানুগত্য বা দেশপ্রেমেই চ্যালেঞ্জ করিয়া বলা হইবে। অতএব, তাহারা দোর্দন্ড প্রতাপে ভাগ্য গড়ার কাজ চালাইয়া যাইতে পারিতেছেন। সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা বরখাস্ত করা হইলেও আসলে বাঁচাইবার চেষ্টারই নামান্তর। কারণ, পরবর্তীকালে উক্ত ব্যক্তির সেই প্রতিষ্ঠান কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান সংস্থান হইয়াছে। অথচ আগের দিনে সরকারী হিসাবের এক পয়সা ফেরের জন্য কোন ব্যক্তি দায়ী প্রমাণিত হইলে তাহার আর রক্ষা পাওয়ার উপায় থাকিত না। কিন্তু আজ কোটি কোটি টাকার হের-ফেরের জন্যও নিছক বরখাস্তের উর্ধ্বে আর কিছু হইতে দেখা যায় না। বিষয়টি এমনই হাল্কাভাবে বিবেচিত হইতেছে।

যোগ্য 'আপনজনদের' সংস্থান করিয়া দেওয়ার রেওয়াজ পৃথিবীর অন্য কোন কোন দেশেও অবশ্য রহিয়াছে। তবে সে সব দেশের 'আপনজনের' সংজ্ঞার সাথে যেমন মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে ডিগ্রীর তারতম্য। আমেরিকার দলীয় প্রেসিডেন্ট পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে দলীয় দৃষ্টিকোণ হইতে লোক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু উহার সংখ্যা আমেরিকার মত দেশেও বড়জোর হাজার-

খানেক হইবে কিনা সন্দেহ। পক্ষান্তরে, কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে সম্পূর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লোক নিয়োগ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ সব দেশে একদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। ফলে লোক-জনও সকলই এক দলের। তাছাড়া দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নিয়োগ করে বলিয়া যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয় না, এমন কথা ঘোর কম্যুনিজম বিরোধীর পক্ষেরও বলার উপায় নাই। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, আমেরিকা বা কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে বেকারত্বের সংখ্যা আমাদের দেশের মত সর্বগ্রাসী নয়। ফলে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কিছু লোক নিয়োগ করা হইলেও উহা আমাদের দেশের মত অন্যের ক্ষোভের কারণ ঘটায় না। কেন না, প্রাণে বাঁচিয়া থাকার মত ন্যূনতম সংস্থান সেখানে প্রায় সকলেরই আছে। কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে ম্যাট্রিকুলেট প্রার্থী চাহিয়া বিজ্ঞাপন দিলে এম. এ. ডিগ্রীধারীর দরখাস্তে প্লাবন সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় 'আপনজনের' মহিমা যদি এমনভাবে শিকড় গাড়িয়া বসে তাহা হইলে একদিন উহার পরিণতি যে আগ্নেয়গিরির বিপুল উদগীরণের ন্যায় ভয়াবহ হইবে না, এর কোন নিশ্চয়তা নাই।

শুধু চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে নয়। এজেন্সি-ইন্ডেন্টিং ব্যবসা-বাণিজ্য, কন্ট্রাক্টরী, লাইসেন্স-পারমিট ইত্যাদির সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও সেই এক কথা। সরকারী তথ্য-পরিসংখ্যান মতেই পঁচিশ হাজার আমদানীকারকের মধ্যে ১৫ হাজার ছিল ভুয়া। এই সব ভুয়া আমদানীকারকের লাইসেন্স বাতিল কিংবা কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎকারীকে চাকরী হইতে সাময়িক-ভাবে বরখাস্ত করা ন্যায়বিচার নয়। কিন্তু উর্ধ্বে কাহারও বিরুদ্ধে তেমন কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার নজির অন্ততঃ আমাদের চোখের সামনে নাই। এর হেতু দুর্বোধ্য! তবে অনুসন্ধান করিলে হয়ত দেখা যাইবে এখানেও যাবতীয় অনাচার হইয়াছে 'আপনজনের' নামে।

পাকিস্তানী শাসনের তেইশ বছরে এ দেশের মাটিতে কায়েমীস্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আসন গাড়িয়া বসিয়াছিল। তাহারা নিজেরা পাঁচ আঙ্গুলে ঘি খাওয়ার প্রেরণা হইতে নানারকম অন্যায় কাজের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। ফলে, মানুষের মনে ধীরে ধীরে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, উহাদের সরাইতে না পারিলে আমার আর বাঁচার কোন উপায় নাই। বলা বাহুল্য, এই নির্মম বোধ হইতেই মানুষ ক্রমে জাগিয়া উঠিয়া আন্দো-লনের পথে পা বাড়াইয়াছিল। সে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে এ দেশের

সাড়েসাত কোটি মানুষের প্রত্যেককেই কমবেশী নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। সেই নির্যাতন-নিপীড়নের ভিতর দিয়া আন্দোলন গণমুখী-রূপ ধারণ করে এবং বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে উহার পর্যায়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। শোনা যায়, আইয়ুব-ইয়াহিয়ার আমলেও যাহারা আন্দোলনের ছায়া না মাড়াইয়া স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ নাকি আজ তস্য-তিতস্য আত্মীয়ের ত্যাগ ও দুঃখবরণের খাতে দশানন রাবণের ন্যায় দশ বাহু বিস্তার করিয়া সম্পদ কুক্ষিগত করার চেষ্টা করিতেছেন। কোন কোন জেলায় তাঁহাদের দাপট নাকি এতই প্রচণ্ড যে, মধ্যযুগে জমিদারী সেরেস্তার সম্মুখ দিয়া প্রজাকুল যেমন জুতা-পায়ে, ছাতা-মাথায় চলাফেরা করিতে পারিত না, তেমনি একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হইতেছে। যাহাদের নাম ভাঙ্গাইয়া এই চরম অবাঞ্ছিত কাজ করা হইতেছে তাহারা যে এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্জ্ঞান ইহা বিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। দুর্ভাগ্য এই যে, তবু এর প্রতি-বিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন তাঁহারা অনুভব করিতেছেন না। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এর পরিণতি শুভ হইবার নয়। ত্যাগ ও নির্যাতন বরণের ইতিহাস হইতে সাড়েসাত কোটি মানুষের কাহারও নাম যেহেতু কাটিয়া দেওয়ার উপায় নাই, সেহেতু জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন ও মর্যাদার নিশ্চয়তা সকলেরই প্রাপ্য অধিকার। আজ যদি একের ত্যাগের পূর্ণ ফলে তস্য-তিতস্য আত্মীয়কুল জাকাইয়া বসে এবং অন্যেরা শুধু বিশীর্ণ হয়, যদি তাহাদের প্রাণে বাঁচিয়া থাকার মত সংস্থানও না জুটে তাহা হইলে এর পরিণাম মারাত্মক হইতে বাধ্য। চাই কি, এ জন্য একদিন হাড় কামড়া-কামড়ি শুরু হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় জুলাই ৫, ১৯৭৩

মঞ্চে-নেপথ্যে

...এদেশে আজও পঁচিশ হাজার ইম্পোর্টারের মধ্যে পনর হাজারই 'ভুয়া' বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া যায়। সরকারও সেই রিপোর্টের সত্যতা স্বীকার না করিয়া পারেন না। ভুয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে শত শত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স ইস্যু হওয়ার খবরও কিছু বিরল নয়। আমাদের শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব গত ২৭শে এপ্রিল স্বয়ং এক ভাষণে বলিয়াছিলেন যে, একটি প্রাথমিক তদন্তে দেশে ১২৭৭টি ভুয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। এইসব 'শিল্পের' কোন অস্তিত্ব নাই। অথচ এগুলি

শিল্পের কাঁচামাল আমদানীর জন্য নিয়মিতভাবে ইম্পোর্ট লাইসেন্স পাইয়া আসিতেছিল। বাণিজ্যমন্ত্রী কামরুজ্জামান সাহেবও গত এপ্রিলের শেষভাগে জানাইয়াছিলেন যে, শুধু ঢাকা নগরীতেই জরীপ চালাইয়া ৭৮টি ঠাঁই-ঠিকানাহীন ও ট্রেড লাইসেন্সবিহীন ডিলারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। চলতি মাসের ২রা তারিখ সরকারী সূত্রে খবর বাহির হইয়াছে যে, কাপড়, সিমেন্ট, সি-আই-শিট, টায়ার-টিউব, ব্লেড, সুপারি, নারিকেল তৈল, মিল্ক-ফুড, জমানো-দুধ, সোডা এ্যাশ প্রভৃতি জিনিসের ১৭৮৩ জন সরকারী ডিলার সরকারের প্রচারিত প্রশ্নমালার জবাব না দেওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দাখিল-না-করায় তাহাদের ডিলারশিপ বাতিল করা হইয়াছে। দৃশ্যতঃ এগুলি ভুয়া ডিলার। টিসিবি'র সরকারী মাল নিয়াছে আর সাবাড় করিয়াছে। তথ্য-ফত্য, হিসাব-পত্র আবার কি? 'ওহিতো বেচ্‌কে কড়হাই, মুলায়া।' ওর আবার হিসাব-নিকাশ কি? ডিলারশিপ এক নামে বাতিল হইলেই বা কি আসে যায়? আর নাম নাই? নামের কি ঠ্যাকা পড়িয়াছে? সমবায়মন্ত্রী মতিউর রহমান সাহেবও গত এপ্রিলে জানাইয়াছিলেন যে, সমবায়ের ন্যায় একটি পবিত্র ক্ষেত্রেও ভুয়া-ভুঁইফোড়ের ছড়াছড়ি। এক জরীপে জানা যায় যে, সমবায় সমিতিসমূহের কাগজপত্রে দেখানো তাঁতের শতকরা ৬০ ভাগই ভুয়া। যেখানে ৫ লাখ ৪১ হাজার তাঁতের সংখ্যা দেখাইয়া ক্রমাগত সূতার পারমিট লওয়া হইয়াছে সেখানে আছে মাত্র ২ লাখ ৬৫ হাজার তাঁত। অবশিষ্ট পৌণে তিন লাখেরই কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু এগুলিই চূড়ান্ত সংখ্যা নয় এবং কাহিনীরও শেষ এখানেই নয়। চূড়ান্ত জরীপে নিঃসন্দেহেই আরও অনেক ভুয়া-ভুঁইফোড় ডিলার, লাইসেন্সহোল্ডার, পারমিটহোল্ডার এবং সাইনবোর্ড বা লেটারহেড-সর্বস্ব শিল্প ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া যাইবে। হয়ত শেষ পর্যন্ত দেখা যাইবে যে, ভুয়ারাই মেজরিটি এবং 'যা' তা' মেজরিটি নয়'—একেবারে যাকে বলে 'ব্রুট মেজরিটি'। সমবায়েও পানি-মেশানো দুধ নয়, দুধ-মেশানো পানিরই চালাও কারবার।

. . . দেশের ধান-পাট সমানে পাচার হইতেছে, আমাদের চোখের সামনে পাট-সম্পদ শেষ হইয়া যাইতেছে, সমস্যা-সঙ্কটে দেশের অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, মুদ্রাস্ফীতির চোটে টাকার দাম দশ পয়সায় নামিয়াছে। তবু কি বলিব, চোরাচালান 'ডেডস্টপ', পাটের ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জ্বল, পাট-শিল্পের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হইতেছে। সব সঙ্কট আমরা কাটাইয়া উঠিয়াছি, আমাদের আর কোন সমস্যা নাই এবং দেশে তেমন কোন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে নাই? না, এভাবে রাতকে দিন করায় সায় দেওয়া যাইতে পারে না। দেশের শিল্পগুলি, গুটিকয়েক ব্যতিক্রম বাদে, প্রায় সবই একটানা লস্ দিতে দিতে রক্তশূন্য পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে এবং শত শত এমনকি হাজার হাজার ভুয়া বা ফাও 'কর্মীর' বোঝার চাপে একটার পর একটা শিল্প 'লে-অফ' বা একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইতেছে। আর যেগুলি চালু আছে তারও অনেকগুলিকেই সরকারী সাবসিডি বা ব্যাঙ্ক-ওডির ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিয়া কোনক্রমে বাঁচাইয়া রাখিতে হইতেছে। তবু কি বলিব, আমাদের শিল্পের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিয়াছে, আর কোন চিন্তার কারণ নাই? না, এরূপ আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া দেশের চরম সর্বনাশ ডাকিয়া আনা যাইতে পারে না। যাহা সত্য তাহা বলিতেই হইবে। অর্ধসত্য বলিয়া আত্মপ্রতারনা করা এবং সরকার ও দেশবাসীকে অন্ধকারে রাখা চলিবে না।

...সমবায় মন্ত্রী এরপর আরও কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়া বলেন, 'হঠাৎ করিয়া গজাইয়া উঠা এই নূতন টাকাওয়ালারা পাকিস্তানী আমলের আদমজীর চেয়েও মারাত্মক। আদমজীরা কিছু মুদ্রাই পাচার করিত। কিন্তু ইহারা জাতির গোটা সারাংশই বাহিরে পাচার করিয়া দিতেছে। ইহারা নিজেদের অসদুপায়ে অর্জিত মূলধন ব্যাপকহারে দেশের বাহিরে সরাইয়া লইয়া যাইতেছে এবং তার ফলেই মুদ্রামানের দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে।

...যদি না-হইয়া থাকে, কেন হয় নাই? মতিউর রহমান সাহেবদেরে সবিনয়ে অনুরোধ করি, আগে এই কারণটি অনুসন্ধান করুন। যেসকল চিহ্নিত লোক কোটি কোটি টাকা পাচার করিয়া বিদেশে বাড়ী কিনিতেছে, ফলাও কারবার চালাইতেছে, যাহারা গাছের আগারটাও খাইতেছে তলারটাও কুড়াইতেছে, যাহারা আদমজীদের চেয়েও সাংঘাতিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দেশের গোটা সার-পদার্থ সরাইয়া লইয়া দেশটাকে খোক্‌লা করিয়া ফেলিতেছে, তাহারা কি কর্মকর্তাদের অপরিচিত? যদি অপরিচিত না-হইয়া থাকে তবে তাহাদের কয়জনের বৈদেশিক ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স সম্পর্কে অনুসন্ধান লওয়া হইয়াছে? কয়জনের এখানকার এ্যাসেট বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে? কয়জনের ব্যাঙ্ক তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে? কয়জনের নাগরিকত্ব বাতিল করা হইয়াছে? দেশের ভিতরেও যাহারা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে তাহাদের (ও তাহাদের পোষকতাকারী রাজনৈতিক টাউটদের) কয়জনের স্বনামী-বেনামী সম্পত্তি ও কায়কারবারের অনুসন্ধান লওয়া হইয়াছে? যাঁহারা ভুয়া শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে এতদিন যাবৎ লাইসেন্স

বাগাইয়া তাহা বিক্রি করিয়াছে এবং যে সকল অফিসার উপর্যুপরি উহা ইস্যু করিয়াছেন তাহাদের কয়জনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে? যে সকল 'কোভারেটর' পৌণে তিন লক্ষ ভুয়া তাঁতের হিসাব দিয়া সূতার পারমিট লইতেছিল এবং যাহারা সমবায়মূলক ব্রাদারহুড দেখাইয়া উহা ইস্যু করিতেছিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে উক্ত মন্ত্রণালয় কি লিগ্যাল এ্যাকশন লইয়াছেন? যদি এর কিছুই না করা হইয়া থাকে তবে 'মুখোশ উন্মোচন' করার কথা বা 'প্রকাশ্যে চাবুক মারার' কথা বলিয়া কি হইবে?

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় নভেম্বর ২৭, ১৯৭৩

মঞ্চে-নেপথ্যে

শচীমাতা বলে নিমাই নিমাই, প্রতিধ্বনি বলে নাই, নাই, নাই।

সবার মত আমরাও বড় আশা করিয়াছিলাম, দীর্ঘ এক যুগেরও অধিক-কাল পর স্থানীয় সংস্থাসমূহের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা অবাধ-নিরপেক্ষ হইবে; শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া নির্বাচন সম্পন্ন হইবে; নব-নির্বাচিত ও নবরূপে গঠিত এইসব সংস্থা সত্যিকার গণতান্ত্রিক ও শক্তি-শালী স্থানীয় নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিবে; দেশকে দুর্নীতি ও অরাজকতামুক্ত করিতে সাহায্য করিবে এবং সরকার যে বিরাট পাঁচসালা উন্নয়ন প্রকল্প হাতে লইয়াছেন তাহার বাস্তবায়নে এই সকল স্থানীয় সংস্থা ১৯৭৪ সালের প্রারম্ভ হইতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ব্যাপক কর্মতৎপরতা শুরু করিবে।

কিন্তু আফসোস, সে আশা যেন অনেক পরিমাণেই একটা ব্যর্থ পরি-হাসে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

...বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খবরাখবরে প্রকাশ, প্রথম দিনের নির্বাচনে ৫৩৮টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে প্রায় ৬০টি ইউনিয়নেই ব্যাপক গোলযোগ, মারপিট, অগ্নিসংযোগ, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, খুন-জখম, গোলা-গুলী ও পোলিং অফিসার অপহরণের ঘটনা সংঘটিত হয়। স্বভাবতঃই এদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে খবর আসিতে বিলম্ব হয়। কোথাও কোথাও আবার অফিসারদের মধ্যে 'দুর্ঘটনার' খবর চাপা দিবার প্রবণতা আছে। উহাকে তাঁহারা নিজেদের অযোগ্যতার পরিচায়ক মনে করেন। কাজেই প্রকৃতপক্ষে কতগুলি স্থানে নির্বাচন বিঘ্নিত হইয়াছে তাহার পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাইতে সময় লাগা স্বাভাবিক। যাই হউক, সেই প্রথমদিন হইতে প্রতিদিনই বিভিন্ন

জেলা হইতে অনুরূপ অশান্তির খবর আসিতেছে। কতক জায়গায় শান্তিরক্ষার্থ পুলিশের গুলীও চালাইতে হইয়াছে। নোয়াখালীতে দুইজন পোলিং অফিসার উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের হাতে নাকি নিহত হইয়াছেন। জামালপুরের একজন প্রথম শ্রেণীর নাম করা ম্যাজিস্ট্রেট গোলযোগ থামাইতে গিয়া গুলীবিদ্ধ হইয়াছেন। বরিশালের একজন প্রিসাইডিং অফিসার অপহৃত হইয়াছেন এবং নানা জায়গায় আরও অনেক লোক হতাহত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। অনেক জায়গায় ইলেকশন কার্যে নিযুক্ত অফিসাররা রীতিমত নিরাপত্তার অভাব বোধ করিতেছেন। প্রতিমুহূর্তে প্রাণের ভয় লইয়া কাজ করিতে হইলে সে-কাজ কিরূপ হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কোন কোন স্থানে নিরাপত্তারক্ষীদের উপরও হামলা করা হইয়াছে, বন্দুক ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে, পুলিশের ফাঁকাগুলীকে পর্যন্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ব্যালট-পেপার ও বাক্স ছিনতাই করা হইয়াছে। এমন খবরও আসিয়াছে যে, ভুয়া ভোট প্রদানের হিড়িকে 'পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশুদের' দ্বারাও ভোট দেওয়া হইয়াছে। সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা অনেক জায়গায় নিজেদের সমর্থিত প্রার্থীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া প্রতিপক্ষীয় সন্দেহে ভোটারদের বুথে প্রবেশে বাধা প্রদান করিয়াছে অথবা সবকিছুই লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছে।

...এযাবৎ নিরঙ্কুশ শান্তিতে কতগুলি ইউনিয়নে নির্বাচন সমাধা হইয়াছে তাহার সংখ্যা জানা যায় নাই। তবে যতদূর জানা যায়, গুরুতর হাঙ্গামার দরুন এযাবৎ কয়েকশত কেন্দ্রে নির্বাচন বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত এই সংখ্যা কত দাঁড়াইবে কে বলিতে পারে? যেসকল কেন্দ্রে নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে, সেগুলিতেও উহা কতটা অবাধে ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে, সেকথা বলার সাধ্য কার? ভুয়া ভোট ও ব্যালটের কারচুপির যে ছড়াছড়ির কথা শোনা যায় তাতে নির্বাচনের গণতান্ত্রিক চরিত্রই-বা কত-টুকু রক্ষিত হইয়াছে, কে বলিবে? ইতিপূর্বে কিছু লোক নাকি অস্ত্রের হুমকি দেখাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিদেরে দাঁড়াইতে না-দিয়া অথবা তাহাদের মনোনয়ন-পত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করিয়া 'বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' নির্বাচিত হইয়া গিয়াছিলেন। সেইসব কথাও এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই উঠিয়া পড়ে। এবং সেই সঙ্গেই প্রশ্ন উঠে: দেশব্যাপী স্থানীয় সংস্থাসমূহের নির্বাচনে সরকারের এতো সতর্ক ও ব্যাপক আয়োজনের নীট ফলাফল তবে কি দাঁড়াইল?

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় ডিসেম্বর ২৫, ১৯৭৩

চুক্তি ভঙ্গের সাজা নয়, পারিতোষিক

সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ! এখানে টিভি সেটের ন্যায় বিলাস-সামগ্রীর মূল্য সরকারী সাবসিডি দিয়া কমানো হয়। আর শিশুখাদ্যের ন্যায় নিত্যকার জরুরী জিনিসের দাম সরকারীভাবেই শতকরা একশ' ভাগ কি তারও বেশী বাড়াইয়া ধার্য করা হয়। সত্যই কি বিচিত্র লীলা!

এই বিচিত্র রীতিনীতির নজীর চতুর্দিকে। নমুনা অসংখ্য। কিন্তু অত তুলিয়া ধরার মত জায়গা নাই। মাত্র দুইটা দৃষ্টান্ত এইক্ষেত্রে তুলিয়া ধরিতেছি।

পত্রিকান্তরে একই দিনে দুইটা দৃষ্টান্ত বাহির হইয়াছে। ২২শে জানুয়ারী এক সহযোগী 'চুক্তিভঙ্গের সাজা মেলেনি বরং পারিতোষিক মিলেছে ৮ লাখ টাকা' শীর্ষক একটি সংবাদে লিখিয়াছেন, "চুক্তি ভঙ্গের দায়ে যেখানে দণ্ডলাভের কথা, সেখানে কয়লা পরিদফতর একটি পরিবহন সংস্থাকে একটি নতুন চুক্তির মাধ্যমে অতিরিক্ত সাড়ে ৮৫ হাজার ডলার (প্রায় ৮ লাখ টাকা) উপহার দিয়েছেন। গেল সপ্তাহে চুক্তিভঙ্গকারী উক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে একক আলাপ-আলোচনার পর (নেগোসিয়েশন) এই উপহাররূপী নতুন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বলে জানা গেছে"।

একই দিনে অপর এক সহযোগী "২ লাখ টন গম কিনতে দেড় কোটি টাকা ক্ষতি" শীর্ষক আরেকটি চাঞ্চল্যকর খবর পরিবেশন করিয়াছেন। সেটা আরও গুরুতর। ইহাও একটি চুক্তিভঙ্গকারী ব্ল্যাক-লিস্টেড কোম্পানীকে (যাহারা নাম পাল্টাইয়া এখন ভিন্ন নামে নাকি ব্যবসা-করিতেছে) প্রাইভেট নেগোসিয়েশনে টনপ্রতি সাত ডলার অতিরিক্ত মূল্যে দুই লক্ষ টন গম সরবরাহের অর্ডার প্রদানের ব্যাপার। প্রকাশ, এক লক্ষ টন সিমেন্ট সরবরাহের চুক্তিভঙ্গের দায়ে ইতিপূর্বে ইহাদিগকে ব্ল্যাকলিস্ট করা সত্ত্বেও ইহারা কোন কোন প্রভাবশালী কর্মকর্তার আনুকূল্যে ভিন্ন নামে আবার ব্যবসা করার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

টনপ্রতি ২২২ ডলার মূল্যে দুই লক্ষ টন গম সরবরাহের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। অথচ সেইদিন গমের আন্তর্জাতিক বাজার-দর ছিল প্রতিটন ২১০ হইতে ২১৫ ডলার। এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ১১ই ডিসেম্বর যখন কতিপয় কোম্পানীর নিকট হইতে গমের অফার নেওয়া হয় তখন কোন কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইহাদের চেয়েও কম রেটের অফার দিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অফার গ্রহণ করা হয় নাই।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় মাঘ ১০, ১৩৮০

প্রশাসনের সুষ্ঠুতার খাতিরে

প্রয়োগ করা হউক বা না হউক, মাথার উপর তরবারি ঝুলাইয়া রাখিলে কাহারও পক্ষে উহার প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব হয় না। স্বভাবতঃ সে তখন আত্মরক্ষার পথ খোঁজে। বলা বাহুল্য, ইহা নিবেদিতচিত্ত কর্মপ্রয়াসের অন্তরায়। আর অন্তরায় বলিয়াই প্রেসিডেন্টের ৯ নং আদেশ সম্পর্কে বহুবার বলা কথা আবারও আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি। এবং বলা অনাবশ্যক যে, তা প্রশাসনের সুষ্ঠুতার খাতিরে।

যে-কোন উন্নয়নমূলক কাজ-কর্ম বা সরকারী প্ল্যান-প্রোগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে সরকারী কর্মচারীদের আন্তরিক কর্মোদ্যম ও সহযোগিতার উপর। সরকার নীতি নির্ধারণ করেন, প্ল্যান-প্রোগ্রাম তৈরী করেন। কিন্তু উহাকে বাস্তবে কার্যকর করেন সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। তাঁরা যদি মন খুলিয়া সহযোগিতা না করেন, তাহা হইলে কোন কাজই সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে সফল হইতে পারে না।

...প্রশাসনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শিরা-উপশিরা হিসাবে যাহারা নিয়োজিত তাদের সকলেই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, একথা যেমন ঠিক নয়, তেমনি সকলেই সন্দেহজনক চরিত্রের লোক এমন মনে করারও কোন হেতু নাই। তবে কথা হইল, মন্দ লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে বহু আইন রহিয়াছে। যদি কেহ দুর্নীতি করেন কিংবা কর্তব্য-কর্মে ফাঁকি দেন তাহা হইলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিশ্চিতভাবেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর কেহ দণ্ড ভোগ করিলে উহার কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে না। ইহা ছাড়া সার্ভিস রুলসেও বিভিন্ন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা না করিয়া যে লোক দীর্ঘ পনরবিশ বছর পরম নিষ্ঠার সহিত বিভিন্ন সরকারের অধীনে নিছক সরকারী কর্মচারী হিসাবে কাজ করিল তাঁকে যদি 'অমুক মনা' বা 'তমুক মনা' অভিযোগে কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়া জমিদারী সেরেস্তার মত 'কাল হইতে তোমার আর আসার দরকার নাই' বলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা কি ন্যায় ধর্ম বা সুবিচার বলিয়া গণ্য হইতে পারে? ইহাতে প্রশাসন কর্মীদের মধ্যে কি ভুল বুঝাবুঝি, বিভেদ, শৈথিল্য জন্মলাভ করিয়া সরকারী প্ল্যান-প্রোগ্রামের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ব্যাহত হইতে পারে না? নিশ্চয়ই

পারে। আর পারে বলিয়াই বোধ হয় বাংলাদেশের প্রশাসনে এত শৈথিল্য, বিভেদ ও বিশৃংখলা।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় মাঘ ১৬, ১৩৮০

মাথাগোঁজার ঠাঁই

...ঢাকা নগরীতেই সাত হাজার পরিত্যক্ত বাড়ী। তন্মধ্যে চার হাজারই নাকি বে-আইনী দখলদারদের কবলে। এই সকল বাড়ী বে-আইনী দখল-মুক্ত করা গেলে সীমিত আয়ের কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যা অনেকটা মোচন করা যাইতে পারিত। কিন্তু সরকারের ঐসব গৃহ উদ্ধার অভিযান বার বার শুরু হইয়া বার বার থামিয়া গিয়াছে। সরকার ডালে গেলে বে-আইনী দখলদাররা যান পাতায়। কেহ কেহ অপরের কাছে দখলীস্বত্ব বিক্রি করিয়া কাটিয়া পড়েন। শুরু হয় নয়া দখলদারের সঙ্গে নূতন করিয়া হাঙ্গামা। কেহ কেহ সাবেক মালিকের নিকট হইতে ব্যাকডেট দিয়া বে-আইনী পন্থায় কাগজপত্র যোগাড় করিয়া উচ্ছেদ ঠেকাইবার জন্য অর্ডার বাহির করিয়া আনেন। উহা যে বে-আইনী কাগজ ও বে-আইনী দখল তাহা আইনের ঘরে সাব্যস্ত হইতেও ত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

...অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বে-আইনী দখলদারদের পিছনে প্রভাবশালী মহলের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক আনুকূল্য বর্তমান। উচ্ছেদের আদেশ হয় বটে, কিন্তু সেই প্রভাবশালী মহলের যাদুকাঠির স্পর্শে উহা পর মুহূর্তেই বাতিল বা স্থগিত হইয়া যায়।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় ফাল্গুন ১৯, ১৩৮০

স্থান-কাল-পাত্র

পত্রখানি বিগত ১২-৬-৭৪ তারিখের লেখা। এসেছে চট্টগ্রাম থেকে। লিখেছেন জনৈক ওয়াকেফহাল ব্যক্তি। পত্রের শুরুতেই তিনি বলেছেন, "রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে আপনাকে ও আপনাদিগকে কতকগুলি বিশেষ গোপন খবর-কাহিনী জানাইতেছি।"

যাহোক, পত্র-লেখক প্রশ্ন করেছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিম জার্মানী থেকে প্রায় ১৬ কোটি টাকার যে রিলিফ সামগ্রী বাংলাদেশে এসে-ছিল, তার হিসাব কেউ দিতে পারবেন কি? সেই রিলিফ সামগ্রীতে ছিল কয়েক হাজার টন ঢেউ টিন, সিমেন্ট, দুধ জাতীয় খাদ্য, কম্বল ও কাপড়। এদেশের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের ও গরীব মানুষদের জন্য সাহায্য বাবত উক্ত

রিলিফ সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন "বার্ডস রিলিফ" নামক পশ্চিম জার্মানীর এক সাহায্য সংস্থা। পত্র-লেখক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন যে, একথা কি ঠিক যে, উক্ত রিলিফ সামগ্রী এদেশের কোন গরীব দুঃখীমানুষের নাগালে পৌছে নাই; বরং চট্টগ্রাম থেকেই তা পাচার হয়ে চলে গেছে অন্য কোথা—অন্য কোন্‌খানে?

পত্র-লেখক যাই বলুন, আমার মত অনেকের মনেই এ প্রশ্ন জাগবে, এ রিলিফ দ্রব্য যদি এদেশের গরীব দুঃখীরা না পেয়ে থাকে তবে কারা পেয়েছে, এই রিলিফ দ্রব্যের বিলি-বণ্টনের সাথে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁরা কি তা বলতে পারবেন না? আর যদি অভিযোগ সত্য হয় অর্থাৎ এই রিলিফ দ্রব্য যদি পাচার হয়েই থাকে, তবে সে পাচারে কার কার হাত ছিল,—তা খুঁজে বের করা খুব কি কঠিন? "ম্যানছেরু মিয়ার" ঘটনা থেকে বুঝা যায়, এতটুকু সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা যদি থাকে, তবে এ ধরনের কেলেঙ্কারির তথ্য উদঘাটন করা মোটেও কঠিন হয় না। এসব ঘটনার আসল নায়ক—"ম্যানছেরু মিয়া" হয়ত তাতে ধরা পড়তে না পারে, কিন্তু অনেকের "ম্যান ছেরুমিয়া" হওয়ার খায়েশ তাতে প্রশমিত হয় বৈকি!

...উক্ত পত্র-লেখক অপর একটি অভিযোগ করেছেন, আমদানী করা টায়ার-টিউব সম্পর্কে।

...কথা হচ্ছে, পত্র-লেখক সহসা কেনইবা এই ধরনের বিষয় নিয়ে এতটা তোলপাড় করতে চাইছেন? তাঁর নিজের কোন স্বার্থ কি এতে জড়িত ছিল? সে স্বার্থ কি বিঘ্নিত হয়েছে? নাকি অন্য কিছু? এ সব প্রশ্ন আমার নিজস্ব। কেননা, পত্রলেখক অত্যন্ত ভাল মানুষের মতই লিখেছেন, যদি দেশকে আপনারা সত্যিকারভাবে ভালবাসেন তা' হলে এসব সম্পর্কে গোপনে খোঁজ-খবর নিলেই ঝুলির মধ্য হতে বিড়াল বের হয়ে পড়বে। . দেশবাসীর সামনে এসব লোকের চেহারা তুলে ধরা দরকার—যেন ভবিষ্যৎ বংশধরেরা সাবধান হতে পারে। —ইত্যাদি।

পত্র-লেখকের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য—দেশগড়ার বিস্তর কাজ পড়ে রয়েছে। কে কোথায় রিলিফের দ্রব্য লোপাট করল কি না করল, তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। আর আমদানী করা মালামাল? আল্লাহ্ সহায় হোন! টি-সি-বি-র সম্পর্কে উচ্চবাচ্য যত কম করা হয়, ততই মঙ্গল। ভুলেও কোন দিন জানতে চাইবেন না কোন পণ্যের বিষয়ে দেশের প্রয়োজন কত, আমদানী কত, আর উৎপাদন কত!

পত্র-লেখক অবশ্য আকারে ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন যে, এসব বিষয়ের সাথে "হুণ্ডি-টাকার ঘাপলাও নাকি জড়িত আছে। এবং অনেক হোমরা-চোমরা এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

... আমি পত্র লেখকের উদ্দেশ্যে সবিনয়ে নিবেদন করে রাখলাম, জনাব, দেশটা আপনার একলার নয়! কেউ যদি কিছু করে খেতে চায়, তাতে কেন অযথা আপনি বাধা দিতে চান? তাছাড়া করে খাওয়া বা চরে খাওয়ার লোক যারা, তারা অনেক বেশী শক্তিধর। কবে যে বেঘোরে জানটা চলে যাবে, টেরও পাবেন না। তার চেয়ে নিজের যদি কোন চরকা থাকে—তাতে তেল লাগান, আখেরে ভাল হবে!

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় আষাঢ় ৫, ১৩৮১

ভেজালের শিকার

বলা বাহুল্য, আজকাল জীবনের সর্বস্তরে ভেজাল এবং সেই ভেজালের প্রাত্যহিক শিকার অসংখ্য। অন্যান্য ক্ষেত্রের ভেজালের কথা না-হয় আপাততঃ বাদই দিলাম। কিন্তু খাদ্য ও ঔষধের ভেজালের প্রসঙ্গটিকে আর চাপা দিয়া রাখা যায় না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও পুষ্টিবিদরা ভেজালজনিত ব্যাধি ও অনাহারজনিত অপুষ্টির ভয়াবহ পরিণতি ভাবিয়া আজ রীতিমত শঙ্কিত। আমরা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে জানিয়া শুনিয়া বিষ পান করিয়াই চলিয়াছি। অথচ আমরা নীলকণ্ঠ নই যে, বিষ খাইয়া বিষ হজম করিতে পারি।

... ইতিমধ্যে ভেজালের বিষে আমাদের কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে। প্রতিদিন উহা আমাদের অজ্ঞাতে অনেক জীবন অকালে হরণ করিয়া লইতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর একরামুল ইসলামের মর্মান্তিক অকালমৃত্যু এরই একটি টাটকা নজীর। খোলা বাজার হইতে সংগৃহীত ভেজাল বেরিয়াম প্রয়োগই হাসপাতালে চিকিৎসারত এই তরুণ প্রতিভাধর বিজ্ঞান অধ্যাপকের সম্ভাবনাময় জীবনাবসানের কারণ বলিয়া প্রকাশ। অথচ এইরূপ একটি অপূরণীয় ক্ষতিতেও আমাদের বিবেক জাগ্রত হইল না। আমরা বিশেষ উচ্চবাচ্য করিলাম না। দায়সারা গোছের একটু-আধটু শোক প্রকাশ করিয়া বা মরহুমের প্রধান শিক্ষাবিদ পিতা জনাব মরনুদ্দিনের কাছে এক আধটা সমবেদনা বাণী পাঠাইয়াই আমরা থামিয়া গেলাম।

...আমাদের দেশে খাদ্য ও ঔষধসহ প্রতিটি জিনিসের বোধ করি আরও বেশী ভেজাল চলিতেছে। দেশে সুসংবদ্ধ ভেজালকারী চক্রের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত। তাহাদের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সুসংগঠিত। তাহাদের সাংগঠনিক দক্ষতায় ঔষধের দোকানেই নয়, সরকারী হাসপাতাল এবং কেন্দ্রীয় ঔষধাগারেও লক্ষ লক্ষ টাকার ভেজাল ও বাতিলযোগ্য ঔষধের প্রবেশাধিকার ঘটে। মাত্র গত জুলাই মাসে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরে ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের 'আমদানীকৃত' প্রায় পৌণে দুইলক্ষ বোতল নকল ডেক্সট্রোজ স্যালাইনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। জনস্বাস্থ্য দফতর কর্তৃক সেইগুলি হাসপাতালে-হাসপাতালে বণ্টনও করা হইয়াছিল। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষা ছাড়াই চর্মচক্ষেই সেই স্যালাইনের বোতলে অনেক ময়লা ও তলানী দৃষ্ট হওয়ায় হাসপাতালসমূহ উহা গ্রহণ না করিয়া কেন্দ্রীয় স্টোরে ফিরাইয়া দেয়। পরে উপর্যুপরি রাসায়নিক পরীক্ষাতেও দেখা যায় যে, সেইগুলি একেবারে নকল স্যালাইন।

...সম্প্রতি ঠাকুরগাঁ হইতেও "মেয়াদ উত্তীর্ণ" কলেরা ইনজেকশন প্রয়োগে একই পরিবারের চার ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আজকাল ফুটপাতে যেমন "মেড-ইন-জিঞ্জিরা' ভিটামিন ট্যাবলেটের ছড়াছড়ি তেমনি 'স্বয়ং শিক্ষিত' 'ডাঃ ফজরালিদেরও গায়ে গায়ে ঢালাও ব্যবসা'। আরও শোনা যায় যে, 'নিউ জাঞ্জিবার' ছাড়াও কোন কোন প্রকৃত ঔষধের কারখানাতেও আমদানীকৃত উপাদানের অভাব-অপ্রতুলতায় সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড ঔষধ তৈরীর ঘটনা বিরল নয়। লেবেল-টেবেল ঠিকই থাকে। কিন্তু কোন গুণ নাই তার (শুধু দামের) কপালে আগুন।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় কার্তিক ২১, ১৩৮১

ভোগ্যপণ্য সংস্থার আমল নামা

একটি করিয়া ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলিয়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়।

জানা গিয়াছে যে, সংস্থার ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি ঠিক মত কাজ করিতেছে কিনা ইহার তথ্যানুসন্ধান বা অডিটের জন্য কখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। যাহার জন্য হিসাবের গড়মিলে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংস্থাকে লোকসান দিতে হইয়াছে। একই কারণে গত সেপ্টেম্বর মাসে মফঃস্বলের সমস্ত দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়ার সময় জিনিস ও নগদে সংস্থাকে কত টাকা গচ্চা দিতে হইয়াছে জানা যায় নাই।

প্রকাশ, গত মে মাস পর্যন্ত ভোগ্যপণ্য সংস্থা সর্বমোট ৫০ কোটি টাকার মালামালের ব্যবসা করিয়াছে। ক্রয়মূল্য হইতে শতকরা ২০ টাকা মুনাফা করিয়া সংস্থা মাল বিক্রয় করিয়া থাকে। এই হিসাবে ১০ কোটি টাকা মুনাফা হওয়ার কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে বিপরীত ঘটনা। সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ভোগ্যপণ্যসংস্থার লোকসানের পরিমাণ ৪ কোটি টাকার উপর। ইহা ছাড়া ব্যাংকের দেনা ১০ কোটি টাকা ও টি-সি-বির নিকট বিরাট অঙ্কের দেনা ভোগ্যপণ্য সংস্থার অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

টি-সি-বির আমদানীকৃত পণ্য ও স্থানীয় মিলে উৎপাদিত নানা ধরনের সামগ্রী ভোগ্যপণ্য সংস্থার দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে। বস্ত্র মিলে উৎপাদিত সমুদয় বস্ত্রের একক হোলসেলার ভোগ্যপণ্য সংস্থাকে নিয়োগ করা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, সূতার ব্যবসাও সম্পূর্ণভাবে সংস্থার হাতে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

দুর্নীতি দমন প্রসঙ্গে

...দুর্নীতি একটা ব্যাপক বিষয়। সামাজিক ব্যবস্থায় যখন মূল্যবোধের মারাত্মক অবক্ষয় ঘটে অথবা সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থায় যখন আইন ও বিধি ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির অবৈধ অবকাশ সৃষ্টি হয় তখনই দুর্নীতির বীজ উপ্ত হয়। দুর্নীতির ক্রম-ব্যাপকতা লাভ কতকটা রক্ত-বীজের বংশ-বিস্তারের সঙ্গে তুলনীয়। রক্ত-বীজের বংশ অতি দ্রুত প্রসারলাভ করে। শরীরকে করিয়া তোলে বিকল। দুর্নীতির বীজও অতি দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। এবং সমাজদেহকে বিবিক্ত ও বিষাক্ত করিয়া তোলে।

—ইত্তেফাক প্রতিবেদন ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

ইনফ্লেশনে চারদিক সয়লাব। বক্তৃতার বাজারেও বেজায় ইনফ্লেশন। প্রতিদিন কত রকমের সভা, সম্মেলন, সমাবেশ, সম্বর্ধনা, সাংস্কৃতিক উৎসব, দ্বারোদঘাটন, মালাদান। কত বক্তা, কত ভাষণ! বক্তৃতা যে হারে বাড়ে, কাগজের কলেবর সে হারে বাড়ে না। বরং আরও কমিয়া যায়। কারণ নিউজপ্রিন্টের তীব্র সঙ্কট ও অগ্নিমূল্য দেশের অন্যান্য বক্তাদের নেতাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর সংখ্যাই যেখানে পুরা হসাব জুড়িলে চল্লিশোর্ধ এবং বলার সময় মা'শা আল্লা, কেউ কম বলেন না, সেখানে কয়জনের বক্তৃতা কতটুকু পত্রস্থ করা যায়! মন্ত্র জানা থাকিলে নাকি একটা বিরাট দৈত্যকেও এতটুকু ঠুলির মধ্যে পুরা যাইতে পারে। কিন্তু আফসোস, সাংবাদিকদের এরূপ কোন মন্ত্র জানা নাই। কাজেই নিরূপায় হইয়া তাঁদের কাঁচি-কলম চালাইতে হয়। অনেক ওভার-সাইজ জিনিসকে ছাঁটিয়া-কাটিয়া সাইজে আনিতে হয়। সবার বাণী পত্রস্থ করিতে গিয়া অনেক সময় কারো প্রতিই পুরাপুরি সুবিচার করা যায় না। এটা শুধু সংবাদপত্রেরই সমস্যা নয়, রেডিও-টিভির বার্তা-বিভাগেরও একই সমস্যা। অনেক নিউজবুলেটিন ত তাদের মন্ত্রী দিয়া শুরু করিয়া মন্ত্রী দিয়াই শেষ করিতে হয়। দেশে-দুনিয়াতে যেন এর বাইরে অন্য কিছু নাই।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় ফেব্রুয়ারী ২৬, ১৯৭৪

...আমরা মুখে আত্ম-শুদ্ধি, আত্ম-সমালোচনার কথা বলি বটে, কিন্তু আসলে 'আত্ম'-টাই এখানে অনুপস্থিত। আয়নার সামনে নিজের চেহারা দেখি না। পল্টনের সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া আমরা যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করি তাদের মধ্যে হোমরা-চোমরাও অনেকেই দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাঁরা যখন দুর্নীতি উচ্ছেদ ও শুদ্ধি অভিযানের 'উদাত্ত আহ্বান' জানান তখন সে আহ্বান কোন্ কাজে আসে? লোকে বরং উহা শুনিয়া বলে 'ভূতের মুখে হরিনাম'। যাঁরা ভুয়া, ভুঁইফোঁড়, ঠাঁই-ঠিকানাহীন লোকদের নামে লাইসেন্স-পার্মিট মঞ্জুরীর সুপারিশ করেন তাঁরাই আবার মাইক লাগাইয়া বলেন, ভুয়া লাইসেন্স ডিলারী বাতিলের কথা। কবি বলিয়াছেন, 'সাপ হৈয়া কাট তুমি, ওঝা হৈয়া ঝাঁড়'। এও তাই। যাঁরা এসব ভণ্ডামি করেন তাঁরা বোঝেন না যে, কিছু লোককে বরাবর ধোঁকা দেওয়া যাইতে পারে, সকল লোককে কিয়ৎকাল বোকা বানানো যাইতে পারে, কিন্তু সকল মানুষকে চিরকাল ফাঁকি দেওয়া যায় না। এসব গুমর, ভণ্ডামি একদিন না একদিন ধরা পড়েই। এবং যখন ধরা পড়ে তখন আর বাঁচার পথ থাকে না।

...বিদেশীরা ইতিমধ্যেই আমাদের লইয়া নানান জোক্ শুরু করিয়া দিয়াছে। 'বাংলা'কে তারা 'বাংগ্লার' ('অনাড়ী' অর্থে) বলিতেও ছাড়ে না। তাদের কি দোষ দিব? আমরাই ত আমাদের মুখে প্রতিনিয়ত লেপন করিতেছি দূরপনেয় কলঙ্ককালিমা।

আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, পার্টি, প্রশাসন সবকিছুতে অসংখ্য গলদ, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। দুর্নীতি ও গলদ দিন দিন বাড়িতেছেই। কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। গোদাপায়ের লাথিতে কোন কাজ হয় নাই, হবেও না।

...গণমনে সৃষ্টি হয়েছে নিদারুণ হতাশা। মুখে অনেক হুমকিই উচ্চারিত হয় বটে কিন্তু কাজে কিছু হয় না। বরং জলসাঘরের আসর জাঁকাইয়া পয়লা সারিতে উপবিষ্ট থাকতে দেখা যায় দুর্নীতির সেরা-সেরা পাণ্ডাদেরেই।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় এপ্রিল ৬, ১৯৭৪

স্থান-কাল-পাত্র

যদি বলি আমাদের সমাজের আজ যে অবস্থা তার জন্য দায়ী তিন 'শন' তাহলে কি খুব বেশী ভুল বলা হবে? এ তিন শন হল: রেশন, ফ্যাশন আর কন্ট্রাডিকশন।

রেশনের মাজেজা সেই যে বিশ্বযুদ্ধের আমল থেকে শুরু হয়েছে, তার থেকে আজো মানুষের রেহাই মিলল না। অধুনা এদেশে রেশনের নামে যা কিছু চলছে, তাতে মাঝে মাঝে মনে হয়, সব কিছুরই যদি রেশন হতে পারে, তাহলে রেশনের রেশন হতে দোষ কি?

না, রেশনের লম্বা লাইনে দাঁড়ানোর ভয়ে একথা বলছি না। যদি কেউ গ্যারান্টি দিতে পারেন যে, লাইন দিলে জিনিস মিলবে, তাহলে যত ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটই পোহাতে হোক না কেন, সে লাইনে দাঁড়াতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু সে গ্যারান্টি কে দেবে? রেশন মালিক? ডিলার? সরকার না অন্য কেউ?

...অধুনা আবার রেশনের রকমফের দেখা দিয়েছে। তার নাম ন্যায্যমূল্যের দোকান। বাপের যেমন বাপ থাকে,—তেমনি ন্যায্যমূল্যের দোকানেরও আবার জনক রয়েছে। তাঁর নাম ভোগ্যপণ্য সংস্থা। বহুবার মনে হয়েছে, এদেশে এর চেয়ে সার্থকনামা প্রতিষ্ঠান বুঝি আর একটাও নাই। ভোগ্যপণ্য সংস্থা—সংস্থা বটে; এবং সে সংস্থা পণ্য ভোগ করার সংস্থাও বটে।

··সোয়াবিন তেলের সের এখন খোলাবাজারে বেশী নয়—মাত্র ২১ টাকা। নারিকেল তেলের সের পৌঁছে গেছে ৪০-এর কোটায়। শুনে খোশ হয়েছি। আর ন্যায্যমূল্যের দোকান, ভোগ্যপণ্য সংস্থা ও রেশনের মর্তবা আন্দাজ করে নিয়ে মনে মনে আওড়েছি, কি আওড়েছি, তা আর নাইবা বললাম।

এবারে ফ্যাশনের আলোচনায় আসতে চাই। এ ফ্যাশন, সে ফ্যাশন নয়। একেবারে হাল ফ্যাশন। মাথার চুলে জুলফীতে অথবা পোশাকে-আশাকে ফ্যাশনের বাহার নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। কথা হয়েছে ৫৫৫ সিগারেট; বাসায় ১২ ইঞ্চি পুরু কার্পেট, সোফা-গদির ফ্যাশন নিয়েও।

কিন্তু হাল ফ্যাশনের মাজেজা এত ক্ষুদ্র নয়; নয় এতটা তুচ্ছও। এ ফ্যাশন চলে রাজার হালে। এ ফ্যাশনের বাজার হয় হাফটনী ট্রাক-ট্রলীতে। এ ফ্যাশন হাজার টাকা দামের সোনা-গয়নাতে বাঁধা পড়তে নারাজ। এ ফ্যাশন হিল্লী-দিল্লী-কলিকাতা-মস্কো দৌড়াদৌড়ি করে; কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রায় টান পড়ে না। এ ফ্যাশনের গৎবাঁধা থাকে উঁচু তারে। সে তার খেয়াল গায় মনের খুশিতে। সে ফ্যাশন কারো মাথায় হাত বুলায়, কারো পিঠে ডাণ্ডার বাড়ি মাড়ে।

এ ফ্যাশন হালে বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান-মনীষার রাজ্যেও হানা দিয়েছে। কে কবে কোথায় অধ্যাপকগিরি করেছে কি করে নাই; দিব্যি 'অধ্যাপক' নাম চালিয়ে ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন দুর্মুখ অবশ্য বলেন যে, 'এ ফ্যাশনের দেশে রাজনীতিটাই বড় ফ্যাশনের ব্যবসায়।'

··এবারে তিন 'শনের' শেষ 'শন' অর্থাৎ কন্ট্রাডিকশনের কথায় আসা যেতে পারে। কন্ট্রাডিকশন শব্দের আভিধানিক বাংলা হচ্ছে—অস্বীকার, প্রতিবাদ, অসঙ্গতি, বিরুদ্ধ উক্তি এবং পরস্পরবিরোধী শব্দযুক্ত উক্তি। বলা বাহুল্য, এ সব শব্দের আলোকে যে কেউ সহজেই বর্তমান অবস্থার পূর্ণ পরিচয় পেতে পারেন।— উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, দ্রব্যমূল্যের কথা।

এক পক্ষের বক্তব্য হচ্ছে, দ্রব্যমূল্য শুধু এ দেশে নয়, সব দেশেই বেড়েছে। অপর পক্ষ বলেন, স্বীকার করি, সব দেশেই দ্রব্যমূল্য বেড়েছে বা বাড়ছে; কিন্তু তা কি এতটা লাগামহীন, এতটা গলাকাটা বাহারের?— দু'পক্ষের এ বক্তব্য মধ্যস্থিত বিরোধিতা বা অসঙ্গতি এদেশের আসমান-জমিন জুড়ে বিরাজমান। কেউ একবারও ভেবে দেখার গরজ অনুভব করছেন না যে, এ কন্ট্রাডিকশনের অবসান হওয়া দরকার।

কর্তৃপক্ষ সবুজ বিপ্লব করছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সারের দাম কয়েকগুণ বাড়িয়েছেন। তাঁরা জনকল্যাণ করছেন কোমর বেঁধে, কিন্তু রেশনে, ন্যায্য-মূল্যে যে দাম ধরছেন, বেঁধে দিচ্ছেন,—তাতে যে 'কল্যাণের' বারোটা বাজার যোগাড় হয়েছে, তা একবারও ভেবে দেখছেন না।

· মজার কথা এই যে, কার হুঁশিয়ারি কে দেয়। জনকল্যাণের নামে কল-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল। অনেক দেশেই করা হয়। কিন্তু এদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা যে কি 'জনকল্যাণ' সাধনে ব্যাপৃত রয়েছে তা নাকি বলা যাবে না। বললেই সেটা হবে আদর্শ-বিরোধিতা। অথচ যে

আদর্শের দোহাই দেওয়া হয়, সে আদর্শ যে জনকল্যাণের নামে জনগণের এই নাভিশ্বাস উঠাবার সম্পূর্ণ বিরোধী, সে কথা কেউ একবারও খতিয়ে দেখতে চান না।

কিন্তু এহেন কনট্রাডিকশন বা অসঙ্গতি কোথায় নয়? মানুষকে ভূখা-নাঙ্গা রেখে নানান টালবাহানায় আমদানী করা হল কোটি টাকার ব্লেড। কিন্তু সে ব্লেড কোন অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল। 'ম্যান ছেরু মিয়ারা' কি কোন মঙ্গল গ্রহের লোক, অথবা দুর্নীতির রাজ-রাজারা কি এতটাই অচেনা যে, তাদের পাত্তা পাওয়া দায়?

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় জুন ৩, ১৯৭৪

ঘরে-বাইরে

...নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন বর্তমান সংকটের জন্য অংশতঃ দায়ী, এ কথা আমিও জানি। এ-ও জানি যে, এই পতন শুরু হয়েছে গতকাল কিংবা পরশু নয়, মুজিবনগরে। তিক্ত হলেও একথা আজ স্বীকার করতে হবে যে, ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয়গ্রহণকারী তরুণ যুবসমাজ এবং শ্রমিক-কর্মচারী ও নেতার একটি অংশ যখন দেশ মুক্ত করার মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত, তখন অন্য একটি দল শুধু হিল্লী-দিল্লীই ঘুরে বেড়াননি, নাইট ক্লাবের আসর গুলজার করেও মাড়োয়ারীদের সঙ্গে ব্যবসা ফেঁদে দুর্নীতির চূড়ান্ত করেছেন। উহাই অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে প্রথমোক্ত দলের কিছু-সংখ্যকের অবচেতন মনে। তারপর দেশ যখন স্বাধীন হলো, সকলে ফিরে এলেন। এই ফেরার পর উচিত ছিল সুমহান আদর্শের মন্ত্রে সকলকে ঐক্য-বদ্ধ রেখে দেশ গড়ার মহাযজ্ঞ শুরু করা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘটলো সম্পূর্ণ বিপরীত। মুজিবনগরী আর অমুজিবনগরীর সংঘর্ষে ঐক্য গেল রসাতলে। আদর্শের প্রেরণা সৃষ্টির পরিবর্তে কিছুসংখ্যক হয়ে উঠলেন লুটের নেশায় মশগুল। তাঁদের দেখাদেখি পড়ে গেল কাড়াকাড়ি। শুরু হলো বাড়ী দখল, গাড়ী দখল, সেক্রেটারীয়েটের গদি দখল। আর এমনিভাবে অবক্ষয় ঘটলো মূল্যবোধের, জাতীয় চরিত্র তলিয়ে গেল অধঃপতনের অতল গুহায়। সে গুহা হতে জাতির পুনরুত্থান নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই মূল্যবোধ ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতিবিধান এবং মহৎ আদর্শের প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। তবে বিনষ্টি যত সহজ, সংস্কার তত সহজ নয়। ইহা সময়সাপেক্ষ এবং আয়াসসাধ্য।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় অক্টোবর ৩০, ১৯৭৪

লঙ্গরখানায় দুর্নীতি

বহু লঙ্গরখানায় মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতি চলিতেছে। ক্ষেতের ফসল খাইতেছে বেড়ায়। অবস্থা দেখিয়া প্রতীয়মান হয়, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের যত জোরদার চেষ্টাই নেওয়া হউক, লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনা দুর্নীতিমুক্ত করিতে না পারিলে চেষ্টা মাঠে মারা যাইবে।

...পটুয়াখালীস্থ আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে : 'প্রত্যেকটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ ডিলারদের সহিত যোগসাজশে গম নিয়া নানারূপ টাল-বাহানা ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। মহকুমা হাকিমদের কয়েকটি ইউনিয়নে ঝটিকা সফরের পরে সম্প্রতি দুইজন চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন মেম্বার ও ডিলারকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

লঙ্গরখানায় দুর্নীতির এইরূপ অভিযোগ আরও বহু আছে। বিষয়টি গুরুতর বলিলেও কম বলা হয়। বাঁচার সর্বাবিধ সহায়-অবলম্বন হারাইয়া জঠর-জ্বালা জুড়াইবার জন্য যারা একখানা রুটি বা একটু পানি-ভাতের আশায় লঙ্গরখানার লাইনে আসিয়া দাঁড়ায়, তাদের মুখের গ্রাসটুকু কাড়িয়া নেওয়া শুধু অপরাধ নয়, হত্যার চেয়েও মারাত্মক সেই অপতৎপরতা। মানবতাবোধের লেশমাত্র যাদের নাই, যারা সাদা চোখে মানুষের দুর্দশা হইতে ফায়দা লুটিতে পারে, শুধু তাদের পক্ষেই এহেন জঘন্য অপরাধ করা সম্ভব। এহেন জঘন্য অপরাধে যারা অপরাধী, তারা শাব্দিক অর্থেই জানিয়া শুনিয়া মানুষ মারার 'ব্যবসা' চালাইতেছে। এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

...লঙ্গরখানায় আজ দুর্নীতি চলিতেছে। রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতি চলিতেছে। খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থায়ও দুর্নীতি। লাখ লাখ মণ খাদ্য ও সাহায্যসম্ভার চুরি হইতেছে। এদিকে না খাইতে পাইয়া মানুষ মরিতেছে। সরকার দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে তৎপর কিন্তু এই সকল দুর্নীতির রাস্তা বন্ধ করার জন্য মোটেও চিন্তিত বলিয়া মনে হয় না। ফলে যা হওয়ার হইতেছে এবং আরও হইবে। যে যেরকম পারে ছলে-বলে-কৌশলে লুটপাট করিয়া যাইতেছে। সরকারী প্রশাসনের উপর দুর্নীতি নিরোধের যে দায়িত্বভার ন্যস্ত, তাহা ভাসিয়া গিয়াছে। আজ লঙ্গরখানায় দুর্নীতি চলিতেছে বলিয়া দুই-চার-পাঁচজনকে ধরিয়া শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুর্নীতি বন্ধ হইবে কি? না, সেইরূপ আশা করা বাস্তবোচিত হইবে না। লঙ্গরখানায় দুর্নীতি হওয়া বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, গোটা দুর্নীতিগ্রস্ত জালেরই ইহা একটি অংশ।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় কার্তিক ১২, ১৩৮১

স্থান-কাল-পাত্র

...সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকেই একবাক্যে সায় দিয়েছেন, মনের ইঁদুর, স্বভাব ও চরিত্রের ইঁদুর মারতে হলে প্রাচীন সেই পুরাতন কাঠ বা টিনের যন্ত্র—অর্থাৎ কিনা সেই পুরাতন নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আদর্শই মোক্ষম। তাঁরা আরও বলেন, জীবনে মূল্যবোধ জাগাতে হবে। চিরন্তন সত্যের আলোকে নীতি ও নৈতিকতার প্রতিষ্ঠিত স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান জেনে নিয়ে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তা মেনে চলতে হবে।

...পত্রিকার মনোযোগী পাঠক যাঁরা, তাঁরাই জানেন, অতি সম্প্রতি রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তরুণ-তরুণী ও ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক চরিত্রের যে অবনতির সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, তার সংখ্যা কত বেশী। এসব সংবাদ থেকে একটা বিষয় আজ স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে এমন স্থান খুব কমই রয়েছে, যে স্থানের তরুণ-তরুণীরা মদ-ভাঙ-গাঁজা খাচ্ছে না; যাকিছু এতদিন পাপ ও অন্যায় বলে বিবেচিত হয়ে আসছিল, সে সব কাজ তারা অবাধে করছে না এবং এসব করেও তারা সমানতালে বুক ফুলিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে দাপট দেখিয়ে বেড়াচ্ছে না।

সমাজ জুড়ে দুর্নীতি, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ও অন্যায়-অনাচারের যে ইঁদুর অবাধে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে, সব ধরনের আইন-শৃংখলা, নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের তার কেটে দিচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে মারাত্মক।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় নভেম্বর ১২, ১৯৭৪

আসমান জমিন জোড়া একখানা আয়না—আর সে আয়নায় দেখা যাচ্ছে আমার মুখ, আপনার মুখ, ওর মুখ, তার মুখ এবং কার মুখ নয়?

তাই সেদিন যখন অফিসে আগত ভদ্রলোক বহুক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছিলেন যে, সমস্যাটা লেখা নিয়ে বা না লেখা নিয়ে নয়—আসল সমস্যাটা হল 'চরিত্র' নিয়ে, তখন আমি তাঁকে বাধা দিতে পারি নাই। কিভাবে বাধা দিতে পারতাম। বাধা দেওয়ার উপায়ইবা ছিল কি। এই তো আজকের পত্রিকায় দেখছি, লণ্ডনে বাংলাদেশ রিলিফ তহবিল নিয়ে অভিযোগ উঠেছে 'ডেইলি মিরর' পত্রিকার এক খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ রিলিফ তহবিল পরিচালনার ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বৃটিশ, পার্লামেন্টের নিখোঁজ

সদস্য মিঃ জন স্টোনহাউস এই তহবিলের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন। 'মিরর' পত্রিকার খবরে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের রিলিফ তহবিল পরিচালনায় 'ব্যাপক ন্যায়' ও 'দোষত্রুটি'র অভিযোগ সম্বলিত একখানি পত্র বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর হস্তগত হয়েছে। সংবাদে আরও প্রকাশ, মাইনরিটি কাউন্সিলের রেভারেণ্ড মাইকেল স্কটের এই পত্রে এই মর্মে দাবী করা হয় যে, বৃটেনে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালীর প্রদত্ত অর্থের একটি অংশ আসল স্থানে পৌঁছে নাই। পত্রে আরও দাবী করা হয় যে, বাংলাদেশ তহবিলে ১০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক অর্থ চাঁদা হিসাবে জমা হয়েছিল। অথচ ১৯৭২ সালে তহবিল গুটিয়ে ফেলার সময় খাতাপত্রে মাত্র ৪১২,০৮৩ পাউণ্ড চাঁদা পাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। হিসাবে দেখান হয় যে, তহবিলের কর্মকর্তারা ৩৭৬৫৬৮ পাউণ্ড বাংলাদেশ সরকারকে দিয়েছেন—বাদবাকী অর্থ দেখান হয়েছে তহবিলের খরচ হিসাবে। অভিযোগে আরও প্রকাশ, বৃটেনের সর্বত্র বিভিন্ন কমিটির নামে ১৩৩৫টি চাঁদার বই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তহবিল গুটিয়ে ফেলার সময় ১৫৩টি চাঁদার বই পাওয়া যায় নাই এবং ৫৬টি বই ফেরত আসে নাই।

..লণ্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন অভিযোগ প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেছেন বটে, তবে সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন যে, ১৯৭২ সালে তহবিলের হিসাব পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং পরীক্ষিত সেই হিসাব প্রকাশের পর অভিযোগ বন্ধ হয়েছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, অভিযোগ সে সময়ে বন্ধ হলেও পুনর্বার নতুন করে সে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। আর এই অভিযোগ এমন এক সময় উঠেছে, যখন তহবিলের ট্রাস্টি মিঃ জন স্টোন নিখোঁজ হয়ে গেছেন।

..সংবাদে দেখছি মিঃ জন স্টোনহাউস বাংলাদেশ রিলিফ তহবিলের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন। অর্থাৎ ওই তহবিলের আরও ট্রাস্টি ছিলেন। সুতরাং এই তহবিলের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন এই তদন্তের আওতা থেকে তাঁরা কেউই বাদ যাবেন না—এটা ধরে নেওয়া যায়। এবং এটাও আশা করা চলে যে, বাংলাদেশের নামে তহবিল খুলে কারা কি করেছিলেন, সময়ে তাও স্পষ্ট হবে।

কিন্তু বিদেশের বাংলাদেশ রিলিফ তহবিল সংক্রান্ত বিষয় স্পষ্ট হলেও বাংলাদেশ রিলিফ বা অনুরূপ তহবিল সম্পর্কে আমরা কি কোনদিন স্পষ্ট

হতে পারব? বিদেশ থেকে বাংলাদেশের জন্য এযাবৎ ঠিক কতটা রিলিফ আর্থিক ও বৈষয়িকভাবে এসেছে, সে সম্পর্কে নানাজনের নানা কথাই শুধু শোনা গেছে। সরকারের তরফ হতেও একাধিকবার এবিষয়ে অনেক কিছুই বলা হয়েছে। কিন্তু সেই নানা কথার গুঞ্জরণ কি তাতে থেমেছে? থেমেছে কি বিদেশে পুঁজি পাচারের অভিযোগ সংক্রান্ত আন-কথা আর কান কথা? এতদ্দেশীয় অনেক মহাজনেরই নাকি বিদেশে অনেক কিছু হয়েছে বা রয়েছে বলে শোনা যায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বাংলাদেশের রিলিফ নিয়ে ভারতেও একাধিকবার তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে। এই ইত্তেফাকেই বেশ কিছুকাল আগে মুজিবনগর সরকারের হাজার কোটি টাকার হিসাব চাওয়া হয়েছিল। কেউ কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই। উচ্চবাচ্য হয় নাই—সরকারী পত্রিকার জনৈক কলামিস্টের সেই দাবী সম্পর্কে—যেখানে তিনি বলেছিলেন: অন্য কিছু না করা হোক, ভারতীয় ব্যাঙ্কে জমা হয়ে পড়ে থাকা এতদ্দেশীয় জন-মহাজনদের অর্থ ফ্রিজ করার ব্যবস্থা করা হোক।

ঘুরে ফিরে আবার সেই অফিসে আগত ভদ্রলোকের কথার ফিরে আসতে হয়। লেখা বা না লেখা বড় কথা নয়। বড় কথা হল—চরিত্র। এ চরিত্র আমার, আপনার চরিত্র; এ চরিত্র বাঙালীর চরিত্র। এই চরিত্রের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে—প্রতারণা। আমি আপনাকে প্রতারণা করি; আপনি প্রতারিত করেন আমাকে। আমি প্রতিশ্রুতি দেই লম্বা চওড়া; তারপর অনায়াসে নানা অজুহাত অসিলায় সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি। ভঙ্গ করার কারণ দর্শাই। যা নয়, তাই নিয়ে হৈ চৈ বাঁধাই। কাজের কাজ পড়েই থাকে। কিন্তু সবকিছুর নিটফল কি দাঁড়ায়? আত্মপ্রবঞ্চনা। সেই যে ধুই প্রতারকের গল্প—এ ওকে ঠকিয়ে ভাবে—জবর দাঁও মেরেছি। কিন্তু দাঁও যে দা হয়ে নিজের ঘাড়েই পড়েছে—ঘরে না যাওয়া পর্যন্ত তা মালুম হয় না। আর মালুম যখন হয় তখন তাহা শুধরাবার সময় থাকে না।

এভাবেই আত্মপ্রতারণা ও আত্মপ্রবঞ্চনা ঘুরে ফিরে এমন একটা দুষ্ট চক্রের জন্ম দিচ্ছে—যা থেকে কেউই আজ উদ্ধার পাচ্ছি না। চার আনার লবণ ষাট টাকায় বিকাচ্ছে বলে বুক চাপড়াচ্ছি—কিন্তু দ্রব্যমূল্যের সেই কাছিমের কামড় ছাড়াতে পারছি কই? অন্যে যাই করুক—আমি তো ঠিক রয়েছি, এমনি এক ধরনের ভাবনা দিয়েও অনেকেই নিজেকে প্রতারিত করছেন। কিন্তু প্রতারণা প্রবঞ্চনার আঁধা-চক্র থেকে তিনিও কি উদ্ধার পাচ্ছেন? "আল্লাহ্ ততক্ষণ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না—যতক্ষণ সে জাতি নিজেই নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে।"—অন্য কথায় এখন যা দাঁড়িয়েছে, তার জন্য দায়ী আমরাই—অন্য কেউ নয়। আর এর থেকে যদি উদ্ধার পেতে চাই—চাই কোন পরিবর্তন, তবে সে পরিবর্তন সেই উজ্জ্বল-উদ্ধার সম্ভব করতে হবে আমাদেরকেই।

হয়ত সে কারণেই অফিসে আগত ভদ্রলোকের সেই বক্তব্যের কথাটাই বার বার করে ঘুরে ফিরে মনে জাগছে: লেখা বা না-লেখা কোন সমস্যা নয়। আসল সমস্যা হল আমরা নিজেরাই। তার মানে, আমাদের চরিত্র। এ চরিত্র আজ যে-কোন কারণেই হোক তিমিরাবর্তে হারিয়ে যেতে বসেছে। তাইত—"তুমি মাস্তলে আমি দাঁড় টানি ভুলে; অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।" আর তাই, গোটা জাতির অন্তরের অন্তস্থল থেকে আকুল আর্তি উত্থিত হচ্ছে: "রাত পোহাবার কত দেরী—পাঞ্জেরী?"

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় ডিসেম্বর ২, ১৯৭৪

স্টোনহাউসের বাংলাদেশের তহবিল: ৩ হাজার পাউণ্ডের হিসাব নাই

নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে মিঃ জন স্টোনহাউস ১৯৭১ সালে একটি তহবিল গঠন করেন। এই তহবিলের অন্যূন ৩ হাজার পাউণ্ড এখন লাপাত্তা। সম্প্রতি লণ্ডনের 'দি টাইমস'-এর প্রথম পৃষ্ঠার এক সংবাদ নিবন্ধে এই তথ্য প্রকাশিত হয়।

বৃটেনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক প্রস্থ বিশেষ স্মারক ডাক টিকিট বিক্রয় করিয়া তহবিলের অর্থ সংগৃহীত হয়। আর এই অর্থ জমা হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ তহবিলে কিন্তু হয় নাই, অথচ মিঃ স্টোনহাউস স্বয়ং এই তহবিলের একজন ট্রাস্টী ছিলেন।

বাংলাদেশ সাহায্য তহবিলের এই অর্থ কারচুপির ব্যাপারে 'টাইমস' অনুসন্ধান চালান। হিসাবে (একাউন্টস্-এ) দেখা যায়, জমার পরিমাণ ৪ শত ৫০ দশমিক ১৩ পাউণ্ড। 'টাইমস' বলেন, আসলে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ মুদ্রণ-ব্যয় ও দালালি বাদে কমপক্ষে উহার ছয়গুণ বেশী।

এদিকে বৃটেনবাসী বাঙালীরা সাব্যে কবহাসে অবস্থিত বাংলাদেশ ফিলাটেলিক এজেন্সির ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে তাহা জানিতে পারেন নাই। এই এজেন্সি ছিল স্মারক ডাকটিকিটগুলির একমাত্র পরিবেশক। এইটি এখন অবলুপ্ত। অনুসন্ধানে দেখা যায়, জনৈক খ্যাতিমান ইংরেজকে সংস্থার প্রধান নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাঁর নিযুক্তির অব্যবহিত পরই

রহস্যময়ভাবে ডাকটিকিটগুলি হারাইয়া ফেলেন। এই ভদ্রলোক এখন স্পেনে বসবাস করিতেছেন বলিয়া জানা যায়।

মিঃ স্টোনহাউস ডাকটিকিটগুলি মুদ্রণের ভার দিয়াছিলেন 'ফরমা' ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রিন্টার্সকে। কত টিকিট ছাপা হইয়াছিল 'ফরমা' উহা জানাইতে নারাজ। এদিকে ডীলারদের স্পষ্ট কথা : বিক্রয়ের গতি ছিল খুব দ্রুত। 'ফরমা' অবশ্য একটি ব্যাপার স্বীকার করিয়াছেন : ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২-এ নয়া ডাকটিকিটের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলাদেশ ডাকঘর খোঁজ-খবর নেওয়ার পর প্লেটসহ বিপুল সংখ্যক টিকিট বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

'৭১-এর গ্রীষ্মকালে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার সাবেক পোস্টমাস্টার জেনারেল হিসাবে অভিজ্ঞ মিঃ স্টোনহাউসকে তহবিল সংগ্রহের ও প্রচারাভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের ভারার্পণ করেন। ইহার মাত্র দুই মাস পর ২৯শে জুলাই তাড়াহুড়া করিয়া আটটি ডাকটিকিটের একটি সেট প্রকাশ করা হয়। যুগপৎ লণ্ডন ও মুজিবনগর হইতে প্রকাশিত এই টিকিটগুলির খুব অল্পই মুক্তাঞ্চলে ডাকের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছিল। যশোরের একটি মুক্তাঞ্চলীয় ডাকঘর হইতে মিঃ স্টোনহাউস নিজে কয়েকটি মাত্র টিকিট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ডাকটিকিটের আর্থিক দিক সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার ছিলেন অন্ধকারে, এই দিকটি তাহারা কখনও জানিতে পারেন নাই। আরও জানা যায়, বিক্রীত টিকিটগুলির হিসাব বাহির করার সকল প্রয়াসই তাহাদের ব্যর্থ হইয়াছে। তবে বাংলাদেশ সরকার এখন একটি অনুসন্ধান চালাইতেছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মিঃ স্টোনহাউস '৭২-এর ১লা ফেব্রুয়ারী সেই একই মুদ্রক 'ফরমাকে' ১৫টি টিকিটের একটি দ্বিতীয় সিরিজ ছাপার অর্ডার দেন। বাংলাদেশ ডাক বিভাগের নিকট তিনি ইহার মুদ্রণ ব্যয়ও চাহিয়া পাঠান। কিন্তু অস্বীকৃত হওয়ায় উপরে বর্ণিত টিকিট বিনষ্ট করিয়া ফেলার ঘটনা ঘটে। জানা যায়, বাংলাদেশের জিজ্ঞাসার উত্তরে মিঃ স্টোনহাউস বলিয়াছিলেন যে, বিক্রীত অর্থ বাংলাদেশ তহবিলে জমা হইয়াছে। অথচ হিসাবে দেখা যায়, মাত্র ৪৫০ দশমিক ১৩ পাউণ্ড।

'টাইমস'-এর তথ্যানুসন্ধানে প্রকাশ, মিডলসেক্স-এর রিকম্যানস ওয়ার্থ-এর স্ট্যাম্প ডীলার মিঃ হ্যারি এলেন বৃটেনে উভয় সংস্করণেরই বৃহত্তম ক্রেতা। তিনি প্রথম সংস্করণের ২ হাজার ১ শত ১০টি এবং দ্বিতীয় সংস্করণের ৯

শত ৩০টি টিকিট ক্রয় করেন। ডীলারদের ক্রয়মূল্য ছিল ১ম সংস্করণের প্রতিটি ১ দশমিক ০৯ পাউণ্ড আর দ্বিতীয়টির প্রতিটি ৫৯ পেনি। উহাদের বর্তমান মূল্য যথাক্রমে ২ দশমিক ৪০ পাউণ্ড এবং ১ পাউণ্ড। মিঃ এলেন বলিয়াছেন : একটি নবীন দেশের স্মারক ডাকটিকিট বিধায় ক্রেতাদের উৎসাহ ছিল বিপুলতর। উদ্দেশ্য প্রধানতঃ সংগ্রহ।

অপর ডাকটিকিট সংগ্রহ প্রতিষ্ঠান স্ট্যানলি গিন্‌বস ক্রীত উভয় সংস্করণের টিকিটের সংখ্যা অন্যূন ১ হাজারটি। ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্রিথেরোর স্ট্যাম্প ডিলার এম. এন. হাওয়ার্থ উভয় সংস্করণের কমপক্ষে ৫ শত পাউণ্ড মূল্যের টিকিট, সাউদাম্পটনের জে স্যাণ্ডারস প্রতিটির আড়াই শতটি ও ব্রিস্টলের আর্চ হ্যারিস দেড়শত হইতে ২ শতটি টিকিট ক্রয় করেন। তাঁহাদের সকলেই জানান, টিকিটগুলির বিক্রয় গতি ছিল খুবই দ্রুত।

—ইত্তেফাক প্রতিবেদন বৈশাখ ৬, ১৩৮৫

মঞ্চে-নেপথ্যে

আজ লিখিতে বসিয়া বিশিষ্ট লেখক শ্রী নির্মল সেনের একটা লেখার কথা মনে পড়িল। "বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ" শীর্ষক সেই লেখাটি আজ হইতে ঠিক এক বছর আগে এইদিনে (১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪) প্রকাশিত হয়। নির্মল সেন নির্ভয়ে অনেক নির্মম সত্য কথা নিবন্ধে তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন যে, 'মেহেরপুরের আম-বাগান', 'বালিগঞ্জের অভিজাত এলাকা, 'আগরতলার কয়েকটি ভবন' এর গল্পই সব গল্প নয়। আছে আরও অনেক গল্প। সেই গল্প-বলাচ্ছলে তিনি তুলিয়া ধরেন '১৯৭২ সালের প্রথম দিন থেকেই যে ষড়যন্ত্র হচ্ছিল, মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের চরিত্র হননের' জন্য সেই ষড়যন্ত্রের আলেখ্যও। তিনি বলেন, "সীমান্তের ওপার যারা গিয়েছিল তারা সকলেই সৎ এবং সাধু ছিল, এ দাবী কেউ করবে না। অনেক নেতা এবং উপনেতাই সৎ এবং সাধু জীবনযাপন করেননি। এজন্য বিদেশে আমাদের মুখে কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে। অনেকের জন্য মুখ দেখান ভার হয়েছে। অনেক নেতা ছিলেন যারা সুযোগ পেলে ইয়াহিয়া খানের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করতেন। অনেক নেতাই ছিলেন যারা মানুষের দুর্গতির সুযোগ নিয়ে ভারতের ব্যাংকে টাকা জমিয়েছেন। অনেক নেতাই ছিলেন যারা কোন দিন ফ্রন্টে না গিয়ে বাক্স কাঁধে নিয়ে ছবি তুলে কাগজে ছাপিয়েছেন। তারা আজও আছেন। আছেন বহাল তবিয়তে। কিন্তু তারা তো সব নয়। সব নয় ওরা যারা বাংলাদেশে এসে একগাল দাঁড়ি

দেখিয়ে কাঁধ পর্যন্ত চুল ঝুলিয়ে মুক্তিবাহিনীর লোক সেজেছিল। ওরা সব নয় যারা বাংলাদেশের বুকে গাড়ী, বাড়ী হাইজ্যাক করেছিল। ওদের মধ্যে অধিকাংশ মুক্তিবাহিনীর শিবিরের কাছাকাছিও যায়নি। ওরা কলকাতা আর আগরতলায় 'নেতৃত্ব' করেছে। ওরা ভাগাভাগির জন্য প্রতিযোগিতা করেছে। ওরা গ্রামের হাজার হাজার তরুণকে শত্রুর মুখে ঠেলে দিয়ে কলকাতা, আগরতলা, শিলং আর দিল্লীতে ভাষণ দিয়েছে আর সভা করেছে।' 'বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ' এ সেই নেতাদের গল্প বলিয়াছেন নির্মল সেন।

. . সেই নেতা-উপনেতারা এবং লম্বা 'চুল আর বাবড়িওয়ালা হাইজ্যাকাররা' ওখানেই থামেন নাই। নির্মল সেনের বক্তব্য অনুযায়ী, তারা ১৯৭২ সালের প্রথম দিন হইতেই 'খুব সুচতুরভাবে' একটা গভীর ষড়যন্ত্র চালাইতেছিলেন প্রকৃত 'মুক্তিবাহিনীর চরিত্র-হননের' উদ্দেশ্যে। তাঁর ভাষায়, সেই ষড়যন্ত্র-কারীরা "মুজিবনগরে গিয়েছিল, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তারা সমর্থন করেনি। তারা জানত, মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা তাদের চেনে। তারা জানত, মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা যদি বাংলাদেশে এসে সত্য কথা ফাঁস করে দেয় তাহলেই ('নেতাদের') রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাই এই নেতারা বাংলাদেশে ফিরে এসেই ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলেন। . . এমনকি যে নেতারা একদিন দালালদের হত্যার জন্য মুক্তিবাহিনীর তরুণ-দের নির্দেশ দিয়েছিল তারাই আবার এই হত্যার জন্য মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা শুরু করল। . . দিনের পর দিন তাদের হাজতে পুরে রাখা হয়েছে। জামিন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এই ঘটনা থেকে একান্তই পরিষ্কার, শুধু সীমান্তের এপারে নয়, সীমান্তের ওপারেও যারা ছিলেন তাদের অনেকেই এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। তারা মুক্তিবাহিনীকে বরদাস্ত করতে পারেননি। তারা জানতেন যে, এই মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা যদি বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে তাদের এই কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে তাহলে তাদের রেহাই নেই। তাই দেখা গেছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রতি জেলায় এমন একটি চক্র যে চক্রের নেতারা ওপারে ছিলেন। ওপারে থেকে দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সারা দেশে অসংখ্য নকল মুক্তিবাহিনী সৃষ্টি করেছেন। পার্মিট-লাইসেন্স দিয়ে কিনতে চেষ্টা করেছেন মুক্তিবাহিনীর সৎ তরুণদের।

. . . . একদল তরুণ দেশের জন্য প্রাণ দিতে গিয়ে পরিচিত হয়েছে চোর-বাটপাড় আর হাইজ্যাকার বলে। আর তার ভিত্তিতে রচিত হচ্ছে আর এক ইতিহাস।

"বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ" নিবন্ধে নির্মল সেনের এক বছর আগে-কার সেই বক্তব্য ছিল আরও দীর্ঘ। অব্যক্তও হয়ত রহিয়া গিয়াছিল অনেক কিছু, অনেক নেতার অনেক কথা, অনেক কীর্তিমানের অনেক কীর্তি-গাঁথা ; বলিতে চাহিলেও হয়ত অনেক কথা তখন বলা যায় নাই। বলার উপায় ছিল না। কারণ, কারোরই ঘাড়ের উপর দুইটা মাথা নাই। লেখক নিজেই আরেক প্রসঙ্গে অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন, 'আমি একজন সাং-বাদিক, কিন্তু স্টেনগানকে আমিও অস্বীকার করতে পারি না'। বস্তুতঃ, গত চার বছরের ইতিহাসের একটা বড় অধ্যায়ই এই স্টেনগান, এল-এম-জি, এস. এল. আর'-এর শ্বেত সন্ত্রাসের ইতিহাস। শোনা যায়, বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক স্বাধীনতার কিছুদিন পর একদা অদ্ভুতভাবে স্বগৃহ হইতে অন্তর্হিত হন। সেই যে তিনি নিখোঁজ হইয়া গেলেন আর কোন দিন ফিরিলেন না। একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামকালে তিনিও ওপারে গিয়াছিলেন এবং টেপে ও ক্যামেরায় এমন অনেক কিছু বাস্তব আলেখ্য নাকি ধরিয়া আনিয়াছিলেন যাহা ডকুমেন্টারি চিত্রাকারে প্রকাশ পাইলে 'কীর্তিমান নেতা-উপনেতাদের রেহাই ছিল না'। হি নিউ অল দীজ 'এ্যাফেয়ার্স' টু মাচ। এবং সেই 'টু মাচ' জানাটাই হইল তাঁর কাল। অকস্মাৎ একদা তিনি নিখোঁজ হইলেন। আর কোন দিন ফিরিলেন না। "বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ"-এর বিবরণের সঙ্গে সেই প্রখ্যাত চিত্র পরিচালকের চির অন্তর্ধান ঘটনার কি অদ্ভুত মিল!

মাত্র চার বছরের স্বাধীনতার জীবনে বাংলাদেশও কম লাভ করে নাই। আর তাই শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক বন্ধু নির্মল সেনকেও (ফেডারেল সাংবাদিক ইউ-নিয়নের সভাপতিরূপে) গত বছর ২৫শে সেপ্টেম্বর বলিতে শুনিয়াছি, "হয় এই সরকার থাকবে, না হয় আমরা থাকবো। বিশ্বাসঘাতক আমরা নই, সরকারই বিশ্বাস ঘাতক।"

. . . . সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। ওরা নাই, আমরা আছি, আমরা থাকিবও। কিন্তু যাইবার আগে চারটা বছরের মধ্যে ওরা এই জাতির কী করিয়া গিয়াছে, আজ ১৬ই ডিসেম্বর তার একটা সালতামামী সমীক্ষা হওয়া দরকার। বিভিন্ন একাডেমির 'নিরলস প্রচেষ্টায়' ইতিহাস লেখার নামে তৈলায়ন ও পৃষ্ঠকুণ্ডয়ন চার বছরে যথেষ্ট হইয়াছে। আর নয়। এবার সত্যিকার একটা হিসাব-নিকাশ হউক। একটি বিখ্যাত বৈদেশিক পত্রিকার প্রতিনিধির সহিত এক 'গোপন সাক্ষাৎকারে' এ দেশের

জনৈক প্রবীণ বামপন্থী দলপতি দাবী করিয়াছেন যে, 'পঁচিশ হাজারের অধিক দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীকে সেই স্বৈরাচারী শাসনামলে নিধন করা হইয়াছে'। অমন কথা অধুনা আরও অনেকেই বলিতেছেন। কারও কারও মতে, নিধন সংখ্যাটা আরও বৃহৎ। রাষ্ট্রীয় বা দলীয় পর্যায়ে যাহাদের সেই শাসনামলে 'নির্মূল' করা হইয়াছে, অনেকের মতে, তাহাদের সংখ্যা নিরূপণের জন্য পাঁচ মিনিটে কুলাইবে না। অনেকেই বলেন যে, সত্যিকার আদর্শপরায়ণ মুক্তিযোদ্ধারা—যাহারা বঞ্চনা ছাড়া আর কিছু পায় নাই—স্বৈরশাসনামলের শেষাংশে চূড়ান্তভাবে বিভ্রান্তিমুক্ত হইয়া মেহেরপুর, বালিগঞ্জ, থিয়েটার রোড, আগরতলা, শিলং প্রভৃতি স্থানে সংঘটিত নানা কেলেঙ্কারিপূর্ণ ঘটনা ফাঁস করিতে থাকায় এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করায় তাহাদের অনেককেই 'রাজনৈতিক ঘাতক দল' বা 'প্রাইভেট আর্মি'র শিকারে পরিণত হইতে হইয়াছে। তাহারা আর কোন দিন ফিরে নাই। প্রকাশ, তাহাদের অনেকের গলা কাটা, নাক-কান-কাটা, চোখ-উপড়ানো, বিকৃত-ক্ষতবিক্ষত লাশ শ্মশানঘাটে, কবরস্থানে, সেতুর নীচে, ঝাড়-জঙ্গলে, পথিপার্শ্বে পড়িয়া থাকিতে অথবা নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। জনৈক পদস্থ পুলিশ অফিসার (যিনি স্বয়ং একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন) সে আমলে ঐ ধরনের ঘাতকবাহিনীর অস্তিত্ব এবং বিশেষ বিশেষ কেটিগরির কর্মীদের 'নির্মূল' করার 'টপ-সিক্রেট' সরকারী নির্দেশের কথা আমার কাছে স্বীকার করেন। অতএব, নির্মল সেন তাঁর মূল্যবান তথ্যপূর্ণ নিবন্ধে প্রকৃত মুক্তিবাহিনীর আদর্শপরায়ণ ছেলেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা 'মামলা ঠুকিয়া দেওয়া' ও তাদের 'চরিত্র হননের যে সুচতুর ষড়যন্ত্রের কথা (যা তাঁর বক্তব্যানুযায়ী ১৯৭২ সালের প্রথমদিন থেকেই শুরু হইয়াছিল) ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অচিরেই সেই তরুণদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো এবং 'চরিত্র হননের' পর্যায়কেও বহুদূর অতিক্রম করিয়া যায়। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাইভেট বাহিনীর হাতে প্রচুর অস্ত্র তুলিয়া দেওয়া হয় অথবা তাহাদিগকে বেআইনী অস্ত্র রাখার 'ওপেন জেনারেল লাইসেন্স' প্রদান করা হয়। বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের নামে সে আমলে বার বার সশস্ত্র বাহিনী নামানো হয় বটে, কিন্তু যখনই তাঁহারা আসল জায়গায় হাত বাড়াইতে যান তখনই তাঁহাদের হাতে নানা বাধা-নিষেধের জিঞ্জির পরানো হয় অথবা আরব্ধ অপারেশন অসমাপ্ত রাখিয়াই তাঁহাদিগকে প্রত্যাহার করিয়া আনা

হয়। এই আগুন লইয়া খেলার কি পরিণতি হইয়াছে সে কথা আজ বলা নিষ্প্রয়োজন।

নির্মল সেনের ভাষায়, 'একদল তরুণ (যারা) দেশের জন্য প্রাণ দিতে গিয়ে চোর, বাটপাড় আর হাইজ্যাকার বলে' চিত্রিত হইয়াছে, সুচতুরভাবে যাদের 'চরিত্র হনন' করা হইয়াছে, এমনকি অনেকের মতে, যাদেরে 'দুষ্কৃতিকারী' আখ্যায়িত করিয়া একেবারেই 'নির্মূল' করা হইয়াছে, আজ পঁচাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর তাদের কথা জাতির স্মরণ করা উচিত। তাদের মধ্যে যারা এখনও বঞ্চিত-জীবনের গ্লানি ও আশাভঙ্গের মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়ার পসরা লইয়া কোনক্রমে টিকিয়া আছে, তাদের সন্ধান করা এবং মুক্তিযোদ্ধার প্রাপ্য মর্যাদাপূর্ণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। এই আবেগপ্রবণ তরুণদেরে আবার সেই 'ভোগের স্রোতে গা-ভাসানো', 'বিদেশী ব্যাংকে টাকা জমানো', একশ্রেণীর নেতা-উপনেতারা হাতছানি দিয়া যাতে বিভ্রান্ত করিতেও নিজেদের এ্যাডভেঞ্চারিজমের ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতে না পারে, সেজন্য ঐ কীর্তিমান নেতা-উপনেতাদেরে তাদের আসল চেহারায় মেলিয়া ধরা উচিত। আজিকার ১৬ই ডিসেম্বরের এটাই হইবে সবচেয়ে বড় কাজ। নির্মল সেনের এক বছর আগে কার লেখা "বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ" ছিল সেই স্বৈরশাসনামলে সেপথে এক নির্ভীক পদক্ষেপ। স্বৈরশাসনের অবসান সেই পদক্ষেপকে সহজ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছে। সত্যের ভিত্তিতে লেখা হউক সেই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস যার ধারা আজও চলিতেছে অবিরাম। আরও নতুন নতুন অধ্যায়ের নতুন নতুন উপাদান মাল-মশলা ইতিমধ্যে প্রস্তুত। সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকরা কোথায়?

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় পৌষ ১, ১৩৮২

চোরাচালান

'আইনানুগ চোরাচালানী চুক্তি'

ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির সহ-সভাপতি জনাব মোখলেসুর রহমান গত বুধবার সকালে চেম্বার বিল্ডিং-এ সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে বলেন, যদি সরকার সম্পূর্ণভাবে সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ করতে সক্ষম না হন তবে সীমান্ত এলাকায় দু'মাইল এলাকাব্যাপী ফ্রি জোন এরিয়া স্থির করে কেবল পচনশীল দ্রব্যের অবাধ ব্যবসা চালাতে পারেন। জনাব রহমান সীমান্ত বাণিজ্যিকে একটি আইনানুগ চোরাচালান হিসাবে অভিহিত করেন।

—সোনার বাংলা বৈশাখ ২৩, ১৩৭৯

মিত্র বাহিনী বাংলাদেশ থেকে যে সব অস্ত্র নিয়ে গেছে তা থাকলে কুড়ি বছরের মধ্যে আমাদের অস্ত্র কিনতে হতো না—মেজর জলিল

—সোনার বাংলা জুলাই ৮, ১৯৭২

পুরাদমে চোরাচালান

যশোর, খুলনা এবং কুষ্টিয়া এই তিনটি জেলার সমস্ত সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান নির্বিঘ্নে চলিতেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ প্রভাবশালী মহলের আশীর্বাদপুষ্ট এইসব সমাজবিরোধী ব্যক্তিকে দমনে সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িয়াছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ১৭, ১৯৭২

সেই লক্ষ লক্ষ টাকার সঠিক হিসাব প্রয়োজন

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ (লিবারেশন কাউন্সিল) কর্তৃক আদায়কৃত কয়েক লক্ষ টাকার শুল্ক করের সঠিক হিসাব অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, উত্তরাঞ্চলীর মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ ১৯৭১ সনের আগস্ট মাসে রংপুর ও দিনাজপুর সীমান্ত এলাকায় পাট, চাউল, খাসি, ডিম, মাছ ইত্যাদি দ্রব্যের উপর শুল্ক-কর আদায়ের জন্য বহু সংখ্যক কাস্টমস অফিসার নিয়োগ করেন।

প্রকাশ, ঐ সময় বাংলাদেশে দিনাজপুর ও রংপুর সীমান্ত দিয়া প্রতিদিন হাজার হাজার মণ পাট, চাউল, মাছ ও অসংখ্য হাঁস-মুরগী, গবাদি পশু এবং ডিম ভারতে প্রেরণ করা হইত।

—ইত্তেফাক আগস্ট ১৮, ১৯৭২

শুধু জিনিসপত্র নয়—টাকার বিনিময়ে অবাঙালীও
দিব্যি পার হয়ে যাচ্ছে

যশোর-খুলনা সীমান্তে চোরাচালানীদের জমজমাট ব্যবসা

—গণকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৭২

দুঃখী বাংলায় ৪০ লক্ষ শিশু পুষ্টিহীনতায় মৃত্যুর
দিন গুণছে : রেডক্রসের শিশুখাদ্যের প্রকাশ্যে
ব্যাপক চোরাকারবার

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ২৫, ১৯৭২

চোরাচালানোর নেপথ্য কাহিনী

একটি বিদেশী পত্রিকার ঢাকাস্থ সংবাদদাতা বাংলাদেশের চোরাচালানী-দের রহস্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন "বাংলাদেশের মন্ত্রীরা দুই আংগুলের মাঝখানে চোরাচালান কৃত বিদেশী সিগারেট রেখে চোরাচালানীদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়েন"। কথাটি আমাদের জন্যে লজ্জাকর হলেও শতকরা একশত ভাগ সত্য।

—সোনার বাংলা মার্চ ১৮, ১৯৭৩

মুদ্রা কালোবাজারী—
যশোর সীমান্তে বহু টাকা ও মালামাল উদ্ধার

বাংলাদেশ রাইফেলস-এর জওয়ানগণ গত দুইদিন সীমান্ত এলাকা হইতে ভারতে ছাপা বিভিন্ন মানের মোট ২ হাজার ৭ শত ৬২ টাকার বাংলাদেশী কাগজী মুদ্রা আটক করিয়াছেন।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১০, ১৯৭৩

এই মালপত্র যাইতেছে কোথায় ?

গত এক সপ্তাহ যাবৎ ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র ইসলামপুর, মৌলভী বাজার, চকবাজার হইতে ব্যবসায়ী নামধারী এক শ্রেণীর লোক হাজার হাজার মণ চাল-ডাল প্রভৃতি ক্রয় করা শুরু করিয়াছে। ব্যবসায়ী মহলও জিনিসপত্র কেনার এই ধুম দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে ভাবিতেছেন যে, এই মালপত্র যাইতেছে কোথায় ?

কোন একটি মহলের খবরে প্রকাশ, সীমান্তের ওপারে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সীমান্ত এলাকায় গুদাম নির্মাণ করিয়া এই সব জিনিস-পত্র কিনিয়া গুদামজাত করিতেছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৬, ১৯৭৩

মুনাফালোভীরা দেশকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিচ্ছে :
লাখ-লাখ মণ ধান চালান

বাংলাদেশের ভাটি এলাকার হাজার হাজার কৃষক মহাজনের ঋণ আদায় ও বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এক বিরাট চক্রান্তের শিকারে পরিণত হচ্ছে। প্রাপ্ত খবর অনুসারে একজন মুনাফালোভী ধানের ব্যাপারী ধান মাড়াই হবার সাথে সাথে মাঠ থেকেই ধান কিনে নিচ্ছে। সীমান্তবর্তী জেলা থেকে নৌকাযোগে লাখ লাখ মণ ধান উজান ভাটি অঞ্চলে পাঠাচ্ছে। এসব নৌকার কোন কোনটি উজান বেয়ে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের দিকেও যাচ্ছে বলে জানা যায়।

—গণকণ্ঠ এপ্রিল ২৮, ১৯৭৩

চাটগাঁ বাংলাদেশের লাণ্ডিকোটাল—
চোরাপথে বিদেশী পণ্যে বাজার ছেয়ে গেছে—
অসৎ ব্যবসায়ীদের বেশুমার কারবার

—গণকণ্ঠ মে ১, ১৯৭৩

যা চাইবেন তাই পাবেন—সীমান্ত আইন এখানে খাটে না
চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য আখাউড়া

—গণকণ্ঠ মে ১১, ১৯৭৩

প্রায় সোয়া কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে
পাচার হয়ে যাচ্ছে

—গণকণ্ঠ জুন ৮, ১৯৭৩

ঝিনাইদহের সীমান্ত এলাকা
চোরাচালানীদের স্বর্গরাজ্য

—ইত্তেফাক জুন ২০, ১৯৭৩

আশংকাজনকহারে চোরাচালান ও মূলধন পাচার দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ

বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের গভর্নর জনাব এ. এম. হামিদুল্লাহ গত শুক্রবার রাতে বলেন যে, আশংকাজনক হারে চোরাচালান এবং সীমান্তের বাহিরে ভীতিজনক হারে মূলধন স্থানান্তর দেশের অর্থনীতির বর্তমান সংকটজনক অবস্থার দুইটি প্রধান কারণ।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭৩

ওপেন সিক্রেট

পশ্চিম সীমান্ত দিয়া প্রতিদিন পাট, মাছ, চাউল, কাঁচাচামড়া, আটা, ছোলা, বিদেশ হইতে আমদানীকৃত ঔষধ, খুচরা যন্ত্রপাতি, তেতুল, কাঁসা-পিতল ইত্যাদি মালামাল ব্যাপকভাবে ওপারে চলিয়া যাইতেছে। কুষ্টিয়ার চিলমারি হাট হইতে খুলনার রায়মঙ্গল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৩৫০ মাইল সীমান্তের সর্বত্র একই ঘটনা—একই অবস্থা। মাল পাচার করার পদ্ধতি ভারী অদ্ভুত। অপকর্ম সম্পাদনে মাথা যে কতভাবে কাজ করে সীমান্ত এলাকায় গেলে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাইবে।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৭৩

ওপেন সিক্রেট-৮

সরকার কি চোরাচালান বন্ধ করিতে সত্যই আগ্রহী? যদি তা-ই হইয়া থাকে, তবে এই রিপোর্ট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুমিল্লার নূরপুর-চৌমুহনীর নিকট একটি দেওয়াল ঘেরা বাড়ীতে তল্লাশী চালানোর ব্যবস্থা করুন। ১২ লক্ষ টাকার ভারতীয় শাড়ী সেখানে জমা রাখা হইয়াছে। ঈদের তিন-দিন পূর্বে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের দোকানগুলিতে পাচার হইবার অপেক্ষায় রহিয়াছে মাত্র। কুমিল্লার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কেহ কেহ সেই বাড়ীটির হদিস জানেন। ট্রাফিক পুলিশের অনেকেই খোঁজ রাখেন, একটি লাল গাড়ী ও একটি অটো-রিকশা কতদিন যাবৎ আনাগোনা করিয়া ঐ শাড়ী জমা করিয়াছে।

কমপক্ষে দশটা গাড়ী ঢাকা-কুমিল্লা রোডে চোরাচালানের মাল লইয়া যাতায়াত করে। কুমিল্লার পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশদের অনেকেই গাড়ীগুলি চিনেন এবং গাড়ীর নম্বরগুলিও তাহাদের মুখস্ত।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২৩, ১৯৭৩

সীমান্ত চোরাচালান "ডেড স্টপ"।

—ব্রিগেডিয়ার দত্ত

বাংলাদেশ রাইফেলস প্রধান ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত গতকাল (শুক্রবার) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে, সকল সীমান্ত জুড়িয়া চোরাচালান "ডেড স্টপ"-এর পর্যায়ে আনা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, তাহার হাতে ন্যস্ত সমুদয় শক্তি-সামর্থ্য ও গুরুত্ব আরোপ করিয়া বাংলাদেশের স্থল সীমান্ত চোরাচালানকারীদের জন্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে 'সীল' করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অবশ্য এই প্রসংগে জল সীমান্ত পথে চোরাচালানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার না করিয়া তিনি বলেন যে, প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাবে কর্যতাঃ নদী পথে চোরাচালানীদের উপর আমাদের কোনই নিয়ন্ত্রণ নাই।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ৩, ১৯৭৩

খুলনা ও যশোর হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার ঔষধ পাচার

খুলনা ও যশোরের বিভিন্ন এলাকা হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার ঔষধপত্র সীমান্তের ওপারে পাচার হইতেছে। সীমান্ত এলাকা বর্তমানে উভয় দেশের চোরাচালানকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১২, ১৯৭৩

ওপেন সিক্রেট-৯

ব্রিগেডিয়ার দত্ত সম্প্রতি এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জোরের সহিত বলিয়াছেন, চোরাচালান 'ডেড স্টপ'। কতখানি দায়িত্ব লইয়া জোরের সহিত তিনি এ কথা বলিতে পারিলেন কে জানে, তবে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত নিবেদন করিতে হইতেছে যে, সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর এবং বাস্তব সত্য হইল চোরাচালান এখনও চলিতেছে। তাঁহার চোরাচালান নিরোধ সংস্থার এবং পাঠকদের অবগতির জন্য কুমিল্লা সেক্টরের একটি মানচিত্রও এখানে দেওয়া হইল। এই মানচিত্রের দ্বারা সকলেই বুঝিতে পারিলেন, এখনও চোরাচালান অব্যাহত গতিতে কোন চ্যানেল দিয়া চলিতেছে। তৎসংগে বিডি-আর প্রধানের মন্তব্যের পরবর্তী ঘটনা ও তথ্যাদি এখানে পরিবেশন করার তাগিদ অনুভব করিতেছি।

গত ৮ই নভেম্বর রাত্রে কুমিল্লার শাহপুর দরগাহ্‌র নিকটবর্তী গোম-তীর আইল দিয়া মাল পাচার হইয়াছে। এই দরগাহ্ হইতে মাত্র ৫ ফার্লং

পূর্বদিকে সীমান্ত। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এই দরগাহে ধর্মীয় কাজে প্রচুর জনসমাগম হয়। গত ৮ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার ধর্মপ্রাণ মানুষেরা দরগাহে গিয়াছিলেন। রাত্রি ১০টা ৩০ মিনিটে এই স্থানের নিকটবর্তী গোমতীর আইলের উপর দিয়া ১১ বার অর্থাৎ ২২ বস্তা মাল ওপারে পাচার হইয়াছে। এই ঘটনার ৫/৬ মিনিট পর পোস্ট অফিসের নিকটবর্তী স্থানে ৪ জনকে ছাতা মাথায় ধূমপান করিতে দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে তিনজন বিডিআর এবং একজন চোরাচালানী ছিল। চাক্ষুষ প্রমাণই এই ঘটনার জন্য যথেষ্ট। বিডিআর প্রধান এই তথ্যকে উড়াইয়া দিতে পারিলেও যাহারা প্রত্যক্ষদর্শী এবং সংশ্লিষ্ট লোকগুলি সুনিশ্চিতভাবে এই ঘটনাকে স্বীকার করিবেন।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১৭, ১৯৭৩

গুড় পাচারের চ্যানেল

ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গার বিস্তীর্ণ সীমান্ত বরাবর গুড় পাচারের জন্য চোরাকারবারীরা একটি 'চ্যালেন' তৈয়ার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মহেশপুর, করিমপুর ও দামুরহুদা 'চ্যানেলে' চোরাকারবারীরা হস্তচালিত আখ মাড়াই কল মালিকদের টাকা লগ্নি করিয়া থাকে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২২, ১৯৭৩

চাউল-পাটের পরিবর্তে

রাজশাহীর সীমান্ত বরাবর অন্যান্য জিনিসের চোরাচালানের মধ্যে বর্তমান অননুমোদিত ও অশ্লীল বইপত্রও উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়াছে।

সীমান্তের ওপার হইতে অবৈধ উপায়ে আনা বই-পুস্তক, বিশেষ করিয়া অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীগুলি এখানে এবং রাজধানীসহ অন্যান্য ছোটবড় শহরে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২৬, ১৯৭৩

হবিগঞ্জের সীমান্ত এলাকা এখন চোরাচালানীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত

হবিগঞ্জ মহকুমার বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে—বিশেষ করিয়া মোহনপুর, হরষপুর, মনতলা, তেলিয়াপাড়া, কাতলামারা, বাল্লা, গাজীপুর, নমুরা, চিমটিবি, রেমা, বগাবিল প্রভৃতি এলাকায় চোরাকারবারীরা বেপরোয়া তৎপরতা চালাইয়া যাইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাকনভেম্বর ২৮, ১৯৭৩

পূর্ব সীমান্তে ডিমের চোরাচালান

—ইত্তেফাক মে ২, ১৯৭৩

চোরাচালানীদের জন্য ভাড়ায় চাউলের পারমিট সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাচালানীদের অশুভ তৎপরতায় বহু আকাঙ্ক্ষিত খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযান সফল হইতেছে না

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১১, ১৯৭৪

সীমান্তের নোম্যান্স ল্যাণ্ডে দুইমাস যাবত উন্মুক্ত আকাশের নীচে আমদানীকৃত ২২ লক্ষ টাকার কাপড় : প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন : তদন্তের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আজ আকস্মিকভাবে এখানকার বেনাপোল সীমান্ত পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার 'নোম্যান্স ল্যাণ্ডে' মুক্ত আকাশের নীচে অরক্ষিত অবস্থায় টি সি বি'র প্রায় ২২ লক্ষ টাকা মূল্যের আমদানীকৃত কাপড় অযত্নে পড়িয়া থাকিতে দেখেন। প্রায় ২২ লক্ষ টাকা মূল্যের এই আমদানীকৃত কাপড় গত ৩০শে নভেম্বর, ৭৩ হইতে এখানে পড়িয়া আছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৪, ১৯৭৩

যশোরের বিভিন্ন বাজারে চোরাচালানের প্রচুর বিদেশী পণ্য অবাধে বিক্রি হইতেছে

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৫, ১৯৭৪

১৫ লক্ষ টাকার কাপড় পাচার

বিক্রীত কাটা কাপড়ের গাটে লুকাইয়া ডেমরাস্থ আহমদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিল হইতে ১৬ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের ভাল থান কাপড় পাচার হইয়া যাওয়ার এক গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৩০, ১৯৭৪

৫৩৬ মাইল সীমান্ত চোরাচালানীদের জন্য উন্মুক্ত ?

প্রকাশ, ভারত ও বার্মার সহিত বাংলাদেশের ৫ শত ৩৬ মাইল আন্তর্জাতিক সীমারেখা পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয় নাই। এই অচিহ্নিত সীমান্ত

দিয়া প্রতিদিন ব্যাপকহারে চোরাচালান হইতেছে। তাহাছাড়া, ঐসব সীমান্ত এলাকায় জমি হইতে ফসল কাটিয়া লওয়া এবং গবাদি পশু অপহরণও নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১০, ১৯৭৪

একদিকে কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি অপরদিকে চোরাচালানীদের পোয়াবারো : সিলেট জেলায় অগ্রিম মূল্যে ক্ষেত হইতে ইরি ধান ক্রয়ের হিড়িক

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৩০, ১৯৭৪

ভারতে নীত অস্ত্রশস্ত্র ও মালামালের তালিকা প্রকাশ!

অবশেষে স্বীকৃতি মিলেছে : পাকবাহিনীর পরিত্যক্ত যুদ্ধ-সরঞ্জাম ৭১-এর যুদ্ধের পর ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সরকারী-ভাবেই এ স্বীকারোক্তি করেছেন। শুধু স্বীকৃতিই নয় ভারত নাকি দয়া পরবশ হয়ে অস্ত্র ফেরৎ দেয়ার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু ক'রেছে। সরকারী পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের পর বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম ভারত নিয়ে যায়। অবশ্য কার অনুরোধে কিভাবে এসব অস্ত্র ভারতে যায়, সেটা এমন বড় কথা নয়। জনগণের লক্ষণীয় বিষয় হলো : অতঃপর বিষয়টি স্বীকার করা হলো।

—সোনার বাংলা মে ১৯, ১৯৭৪

পণ্যমূল্য কমেনি বরং বেড়েছে : পুরাদমে মজুতদারী ও কালোবাজারী চলছেই : সীমান্তে চোরাচালান অব্যাহত লুট-পাট ডাকাতি খুন কমেনি

—গণকণ্ঠ জুন ৭, ১৯৭৪

জাতীয় বিবেক পাচার হচ্ছে!

একশ্রেণীর ভারতীয় ব্যবসায়ী এখন থেকে শহীদ-এর মাথার খুলি পাচার করে নিয়ে জাপানের মেডিক্যাল কলেজ ও ডাক্তারদের কাছে চড়াদামে বিক্রি করছে। প্রতিটি খুলির দাম ১ লক্ষ বিশ হাজার থেকে ১ লক্ষ আশি হাজার টাকা। জাপানী দৈনিক পত্রিকা আশাহীসিম্বুনে

এ খবর প্রকাশিত হবার পরই আমাদের চৈতন্যোদয় হয়েছে। খবরটি অপ্রকাশিত থাকলে কারো কোন মাথা ব্যথা থাকতো না। অবস্থা দেখে মনে হয়, আমাদের মাথাগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিদেশে পাচার কর দিলেও বুঝি আমরা টেরই পাব না। আদতে আমাদের বিবেক পাচার হয়ে যাচ্ছে।

—সোনার বাংলা জুন ১৬, ১৯৭৪

কুমিল্লা সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানীর মাল আটক হইতেছে কিন্তু রাঘব বোয়ালরা ধরা পড়িতেছে না

চোরাচালানী রোধের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কুমিল্লার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা হইতে অহরহ চোরাচালানের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কার অশুভ হস্তের ইঙ্গিতে কাজ চলিতেছে, স্থানীয় দেশ-প্রেমিক চিন্তাশীলরা তাহা বাহির করিতে পারিতেছেন না। তবে চোরাচালানীদের আসল রাঘব-বোয়াল ধরিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে এই চোরাচালান বন্ধ হইতে পারে বলিয়া তাহারা মনে করেন।

—ইত্তেফাক জুন ২৫, ১৯৭৪

মাঝ দরিয়ায় খাদ্যের চোরাকারবার

—ইত্তেফাক আগস্ট ২২, ১৯৭৪

জাহাজ হইতে মাল পাচারের নিরাপদ স্থান

বর্তমানে সন্দ্বীপ উপকূল জাহাজ হইতে মাল পাচারের নিরাপদ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে এবং সংঘবদ্ধ দল এই পাচারকার্যে লিপ্ত বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ।

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৫, ১৯৭৪

জাহাজ হইতে মাল পাচারের একটি ঘাঁটি

জাহাজ হইতে মাল পাচারের বড় ঘাঁটি মদনগঞ্জের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীতে। একটি গোপন সূত্র হইতে এই খবর পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৬, ১৯৭৪

গারো পাহাড় ও চরাঞ্চল পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত : যমুনা নদী দিয়ে ব্যাপক চোরাচালান হচ্ছে

—গণকণ্ঠ আগস্ট ২৬, ১৯৭৪

যশোহর-খুলনা সীমান্তে চোরাকারবার জমজমাট

বর্ষা ও বন্যার দরুন সীমান্ত বেষ্টনীতে সেনাবাহিনী মোতায়েন কিছুদিনের জন্য ব্যাহত হওয়ার সুযোগ লইয়া যশোহর, খুলনা, কুষ্টিয়া সীমান্তে সংঘবদ্ধ চোরাকারবারী দলগুলি আবার সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৭, ১৯৭৪

পাট চোরাচালানের নির্ভরযোগ্য অভিযোগ

দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়া পাট চোরাচালানের নির্ভরযোগ্য অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া পাট প্রতিমন্ত্রী জনাব মোসলেম উদ্দিন খান স্বীকার করিয়াছেন।

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৯, ১৯৭৪

ভারতে পাচারই দুর্ভিক্ষের কারণ

বাংলাদেশের খাদ্য ও সরবরাহ সম্পর্কে এক সমীক্ষায় প্রকাশ, এ বছরে জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত ১৫ লাখ টন ধান, ৮ লাখ টন চাল এবং লাখ লাখ টন পাট ও মরিচ ভারতে পাচার হয়েছে। এই ব্যাপক পাচারই দেশের বর্তমান ভয়াবহ দুভিক্ষের মূল কারণ বলে বিশেষজ্ঞ মহল সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন।

—সোনার বাংলা সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৭৪

গড়ে ১৫ হাজার মণ পাট দৈনিক পাচার হচ্ছে

গত বছরের মত এবারও প্রতিদিন গড়ে ১৫ হাজার মণ পাট পাচার হচ্ছে। বর্তমান বাজারে এর আনুমানিক মূল্য ১৫ লাখ টাকা।

—গণকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৭৪

ক্ষমতাসীনদের আশ্রয়ে সংঘবদ্ধ চোরাচালানীরা ভূয়া লাইসেন্স-পারমিটধারী ডিলার ও এজেন্সী মালিকরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে—দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করছে কারা ?

আওয়ামী লীগ সরকারের সৃষ্ট পণ্যব্যবসায়ী ভূয়া লাইসেন্স পারমিটধারী ডিলার, এজেন্সীর মালিক এবং তাদেরই আশ্রয়পুষ্ট সংঘবদ্ধ চোরাকারবারীর দল চক্রান্ত করে বাংলাদেশকে এই ভয়াবহ সংকট, দুভিক্ষ আর

অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। চোরাকারবারীরা গত আমন মওসুমেই ১৫ লক্ষ টন ধান আর ৮ লক্ষ টন চাল সীমান্তে পাচার করেছে।

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ২, ১৯৭৪

সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানীদের অশুভ তৎপরতা : কৃষকদের দুরবস্থার সুযোগে অগ্রিম মূল্যে ক্ষেতের ধান ক্রয়

সিলেট জেলার সীমান্ত এলাকার আসন্ন আমন ফসল গত বৎসরের মত এবারও সংঘবদ্ধ চোরাকারবারী ও মজুতদারদের হাতে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া এক উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গত কিছুদিন যাবৎ প্রভাবশালী চোরাকারবারী ও মজুতদাররা সীমান্ত অঞ্চলের দরিদ্র কৃষকদেরকে নানারূপ প্রলোভন দিয়া তাহাদের ক্ষেতের ধান অগ্রিম মূল্যে ক্রয় করিতেছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১৩, ১৯৭৪

লবণ ও সারের বিনিময়ে ব্যাপকহারে পাট পাচার

দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের বাজার দর সরকারী মূল্য হইতে অনেক বেশী হওয়ায় অত্র অঞ্চলে সরকারী পাটক্রয় সংস্থাগুলি পাটক্রয়ে ব্যর্থ হইতেছে।

চলতি অর্থ বছরে এমনিতেই উত্তর বঙ্গের পাটের চাষ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ায় পাট উৎপাদন উদ্বেগজনক হারে হ্রাস পাইয়াছে, তদুপরি উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন বাজারে পাটের মূল্য সরকার-নির্ধারিত মূল্য হইতে অনেক বেশী হইবার ফলে সরকার এই অঞ্চলে পাট ক্রয়ে দারুণভাবে ব্যর্থ হইতেছে। এই সুযোগে একশ্রেণীর মুনাফাখোর ব্যবসায়ী নগদ অর্থ ছাড়াও লবণ এবং সারের বিনিময়ে উত্তর বঙ্গের সীমান্ত এলাকা দিয়া ব্যাপক পরিমাণ পাট পাচার করিতেছে বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২১, ১৯৭৪

দিনাজপুর হইতে ট্রাক বোঝাই ধান-চাউলের নিরুদ্দেশ যাত্রা-অথচ মানুষ অনাহারে মরিতেছে

দিনাজপুর, ২৪শে অক্টোবর—খাদ্যে উদ্বৃত্ত দিনাজপুর জেলাতেও দুভিক্ষ উহার নিষ্ঠুর থাবা মেলিয়া ধরিয়াছে। ফলে দিনাজপুর জেলা সদরেই

প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০ জন অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে। রেল স্টেশন ও ইহার আশেপাশে বুভুক্ষু মানুষের ভীড় ক্রমান্বয়েই বাড়িতেছে। ক্ষুধার তাড়নায় রংপুর হইতেও হাজার হাজার অসহায় পরিবার দিনাজপুরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। জেলার লঙ্গরখানাগুলিতে শতকরা প্রায় ৭০ জনই রংপুরের লোক।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২৫, ১৯৭৪

প্রতিদিন চাল বোঝাই অসংখ্য ট্রাক রংপুর থেকে ছিট-মহলের মধ্য দিয়ে অবাধে সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছে

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ৩১, ১৯৭৪

ওপেন সিক্রেট: সরকারী খাদ্য গুদাম হইতে চাউল পাচার

'স্মাগলিং' হয় সীমান্ত এলাকা হইতে এ খবর সবারই জানা। কিন্তু সরকারী খাদ্য গুদাম হইতে, সাইলো হইতেও যে এ কারবার হইয়া থাকে তাহার খোঁজ কেহ রাখেন কি?

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১, ১৯৭৪

রুই-কাতলারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে: চুনোপুটি আটক: এক মণ চাল পাচার করলে বাংলাদেশের নোটে ৪ শ' টাকা: কার্ফুর আবরণে ব্যাপক চোরাচালান

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ১০, ১৯৭৪

খুলনার সীমান্ত পথে শত শত মণ ধান পাচার

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১১, ১৯৭৪

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক: খাদ্য-শস্য সংগ্রহ ও চোরাচালান বন্ধের জন্য গণকমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১৮, ১৯৭৪

কানাডার হুঁশিয়ারী: চোরাচালান রোধ না হইলে খাদ্য সাহায্য হ্রাস পাইবে

অটোয়া ৪ঠা ডিসেম্বর (রয়টার)—গতকাল ওয়াকিবহাল সূত্রে জানা যায় যে, বাংলাদেশ হইতে খাদ্যশস্যের চোরাচালান দমনের ব্যাপারে কার্যকরী পন্থা গৃহীত না হইলে ভবিষ্যতে কানাডীয় খাদ্য সাহায্য হ্রাস করিয়া দেওয়া হইবে মর্মে বাংলাদেশকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৭, ১৯৭৪

কুমিল্লা হইতে ফেনী সীমান্ত পর্যন্ত যা দেখিলাম

সেনাবাহিনীকে সীমান্তে নিয়োজিত করার পর চোরাচালানীরা একটু সতর্ক হইয়াছে। অন্ততঃ যে সমস্ত স্থানে সেনাবাহিনীর পস্টিং রহিয়াছে, সে সমস্ত স্থানে এড়াইয়া চলাই তাহারা নিরাপদ মনে করিতেছে। তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, তাহা হইল সীমান্তে কতদিন সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখা হইবে?

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১১, ১৯৭৪

নৌ-পথে ব্যাপকহারে খাদ্যশস্য পাচার

মঙ্গলা বন্দর হইতে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় বিভিন্ন স্থানে মালামাল বহনকারী বার্জ ও জাহাজ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার পণ্য ও খাদ্য পাচারের কাহিনী জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭৪

লেভীতে দাম কম: বিদেশী ব্যবসায়ীদের অনুপ্রবেশ: অধিক মূল্যে ধান ক্রয়: ভারতে পাচার: প্রতিরোধ নেই

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২২, ১৯৭৪

খাদ্যের চোরাচালান জমজমাট: অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য

আশ্বিন মাস আর আষাঢ় মাস। বাংলাদেশের মানুষের জন্য এ দু'টো বড়ই সংকটের মাস। খাদ্য ঘাটতি চরম রূপ নিয়ে দেখা দেয় এই দু'মাসে। গত বছরের নজিরবিহীন খাদ্য সঙ্কটের পর কর্তৃপক্ষ খাদ্য সংগ্রহের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়াছেন। যাতে সময় থাকতে খাদ্য মজুত করে রাখা যায় এবং অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে না যায়। সঙ্কটের সময়টা খুব বেশী দূরে নেই। আসন্ন বর্ষা মওসুমে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে কিনা সে চিন্তা সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

—সোনার বাংলা জুন ১, ১৯৭৫

বাংলাদেশে হিন্দুস্তানী লুট

২০০ বৎসরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যা করতে পারেনি, ২৫ বৎসরে পশ্চিম পাকিস্তানীরা যা করবার সাহস পায়নি মাত্র তিন বৎসরে হিন্দুস্তানের মাড়োয়ারী বঙ্গবন্ধুরা (!!) বাংলাদেশের কি সর্বনাশ করেছে তার একটি হিসাবের, সার-সংক্ষেপ দেখুন :—

১। ধান, চাউল ও গম পাচার হয়েছে ৭০/৮০ লক্ষ টন মূল্য
(গড়ে ১৩০ টাকা মন ধরলে) ··· ২১৬০ কোটি টা.।
২। পাট .. .. .. ৫০ লক্ষ বেলের উপরে .. ৪০০ ,, ,,
৩। ত্রাণ সামগ্রী .. .. .. পাচার হয়েছে .. ১৫০০ ,, ,,
৪। যুদ্ধাস্ত্র, আমদানী করা যন্ত্রাংশ, ঔষধ পত্র, মাছ,
ছাগল, গরু, মহিষ, মুরগী, ডিম, বনজ সম্পদ ইত্যাদি মিলে ১০০০ ,, ,,
সর্বমোট—৫০৬০ কোটি টা.।

জনতার মুখপত্র (১) নভেম্বর, ১৯৭৫

সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় মতামত

তিন বছরে আড়াই হাজার কোটি টাকার চাল পাচার

গত তিন বছরে বাংলাদেশ থেকে ৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য পাচার হয়েছে বলে একটি বিদেশী পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। লণ্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টেও এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

পশ্চিম বাংলার একটি মাসিক পত্রিকার ডিসেম্বর '৭৪ সংখ্যায় ''বাংলাদেশ! আমার বাংলাদেশ!'' শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয় যে, বাংলাদেশের খাদ্য ও কৃষি দফতরের হিসেব অনুসারে ১৯৭১-এর পরবর্তী তিন বছরে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে ৩২৩ লাখ টন এবং তা ছাড়া ১৯৭৪-এ আউশ ধান উৎপন্ন হয়েছে ২৮ লাখ টন অর্থাৎ মোট উৎপাদন ৩৫১ লাখ টন। আর এই তিন বছরে খাবার জন্যে মোট প্রয়োজন ৩২৩ লাখ টন এবং বীজধানের জন্যে (মোট উৎপাদনের ১০%) প্রয়োজন ৩৩ লাখ টন অর্থাৎ মোট প্রয়োজন ৩৬৬ লাখ টন। এই তিন বছরে (১৯৭৪-এর অক্টোবর পর্যন্ত) বিদেশ থেকে মোট খাদ্য আমদানীর পরিমাণ ৬৫ লাখ টন।

অর্থাৎ উৎপাদন ও আমদানী-খাতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে, ৩৫১×৬৪=৪১৫ লাখ টন, মোট প্রয়োজন যেখানে ৩৬৬ লাখ টন। অর্থাৎ প্রায় ৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হবার কথা—কিন্তু যার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।''

লণ্ডনের ''গার্ডিয়ান'' পত্রিকার ৮ই নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, প্রতি বছর ১০ লাখ থেকে ২০ লাখ টন চাল বাংলাদেশে থেকে ভারতে পাচার হয়। এর সবটুকু সরকারের হাতে এলে সরকারী বন্টন ব্যবস্থার ঘাটতি পূরণের জন্য যথেষ্ট হবে।'' খাদ্য উৎপাদন ও আমদানী বাবদ প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের কেবল উদ্বৃত্ত অংশ-প্রায় ৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য পাচার হয়েছে বলে ধরে নিলে টাকার অংকে এর দাম দাড়াচ্ছে ২ হাজার ৫ শ' কোটি টাকা (বিশ্ববাজারে প্রতি টন চালের দাম ৬০০ ডলার অর্থাৎ ৪৮০০ টাকা হিসেবে)।

খাদ্য উৎপাদন ও আমদানী থেকে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের ৪১৫ লক্ষ টন থেকে চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত ৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য পাচার হয়ে থাকলে বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি বা অনাহারে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর যুক্তি মেলে না। পাচার হওয়া খাদ্যশস্যের পরিমাণ হবে আরো অনেক

বেশী। উক্ত পত্রিকায় বলা হয়, এই বিপুল পরিমাণ টাকার খাদ্যশস্য গত তিন বছরে ভারতে পাচার হয়েছে বলে বাংলাদেশে তথ্যাভিজ্ঞ মহল অভিযোগ করেছেন।

সরকারী হিসেবে এবছর অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা সাড়ে সাতাশ হাজার। কোন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানী করা না হলেও এ মৃত্যুর যুক্তি নেই। উক্ত পত্রিকায় বাংলাদেশের সরকার পরিচালিত সাপ্তাহিক একটি রিপোর্টের বরাত দিয়ে লিখেছে, বাংলাদেশের সরকারী হিসেব অনুসারে এ বছর মোট খাদ্য উৎপাদন ধরা হয়েছে ১০৬ লাখ টন এবং মাথা পিছু দৈনিক সাড়ে সাত ছটাক খাদ্য প্রয়োজনীয় বলে ধরে মোট প্রয়োজন হচ্ছে ১২৪ লাখ টন অর্থাৎ ঘাটতি ১৮ লাখ টন। এর সঙ্গে এবছর বন্যার জন্য ৫ লাখ টন খাদ্যশস্য ধ্বংস হয়েছে ধরে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ২৩ লাখ টন অর্থাৎ মোট প্রয়োজনের প্রায় ১/৫।

—১৯৭৪ সালের শেষের দিকে জনপদ থেকে

কোটি টাকার চাল পাচার

তাহলে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাথাপিছু দৈনিক গড় ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে মাত্র দেড় ছটাক। এই সামান্য ঘাটতি থেকে বাংলাদেশ এবারে হাজার হাজার লোকের অনাহারে মৃত্যুবরণের কোন যুক্তিই মেলে না।

মরিচ ও লবণ সংকটের কারণ বিশ্লেষণ করেও উক্ত পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ''বাংলাদেশে লবণ তৈরী হয় চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং সেটাও হয় বছরের একটা বিশেষ সময়ে। এবছর লবণ উৎপাদনের সময় ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এবং তাদের এজেন্টরা এসে উৎপাদনের পরে পরেই ২০/২৫ পয়সা সের দরে প্রায় সমস্ত লবণ কিনে নিয়ে যায়। ফলে সারা বাংলাদেশে লবণের প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয় এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ২০/২৫ পয়সা সের দরে কেনা সেই লবণই আবার বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়ে ৩০/৪০ টাকা দামে বিক্রি করে।'' উল্লেখ করা যেতে পারে সাম্প্রতিক লবণ সংকটের সময় দাম প্রতিসের ৬০ টাকা পর্যন্ত ওঠে। ভারত থেকে ১৯ লাখ মণ লবণ আমদানীর কথা সরকারীভাবে জানান হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রতিসের মরিচের দাম ১৬০-১৭০ টাকা পর্যন্ত উঠে। এ প্রসংগে উক্ত পত্রিকায় বলা হয়, বাংলাদেশ প্রতিবছর ইরাককে বেশ

কিছু পরিমাণ শুকনো লংকা রপ্তানী করতো। এ বছর রাশিয়া বিভিন্ন-ভাবে চাপ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ৪ টাকা ৩০ পয়সা সের দরে প্রায় ২৭০০০ টন লংকা কিনে নেয়। রাশিয়া বাংলাদেশ থেকে ৪ টাকা ৩০ পয়সা সের দরে কেনা এই শুকনো লংকাই ইরাককে বিক্রি করে ৩০ টাকা সের দরে। এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে সরকারীভাবে বাংলাদেশ বাণিজ্য সংস্থার দ্বারাই। আর বাংলাদেশে কাঁচা লংকা বিক্রি হয় প্রতিসের ৪০ টাকায়।

লবণের এই সংকটের ফলে পশু চামড়া শিল্পও সংকটে পড়ে যায়। কারণ সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে গড়ে গরু প্রভৃতির চামড়াকে ঠিকভাবে রাখার জন্য ৪ সেরের মতো লবণ লাগে কিন্তু এই প্রচণ্ড দামে লবণ কিনে চামড়া ঠিকভাবে রাখা আর্থিক কারণে অসম্ভব হয়ে পড়ার ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা প্রায় জলের দামে এই সব চামড়া কিনে নিয়ে যায় বলে উক্ত পত্রিকায় বলা হয়। চোরাপথে পাট পাচার ভারতীয় লোক-সভায় স্বীকৃত হয়েছে।

চোরাচালান কিভাবে হচ্ছে উক্ত পত্রিকার মতে "ভারতীয় চোরা-চালানীরা অন্ততঃ ৪০০-৫০০ কোটি টাকার পুঁজি বাংলাদেশের সঙ্গে চোরাচালানী ব্যবসায়ে নিয়োজিত করেছে। ভারতের কুখ্যাত আন্তর্জাতিক চোরাচালানী শ্রীমন্টু ভাই ভিমানী গত আড়াই বছর ধরে প্রতি মাসেই যে একবার করে বাংলাদেশ সফর করে আসছে তা নিশ্চয়ই শুধু হাওয়া খাবার জন্য নয়।"

পাট, ধান, চাল, লবণ প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যই শুধু নয় এ ছাড়াও বাংলাদেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানী করা বস্ত্র ও যন্ত্রাংশ, নানাবিধ ভোগ্যপণ্য, ডেকরণ কাপড় এবং ত্রাণ সাহায্যে একটা বিপুল পরিমাণ অংশ চোরাইপথে ভারতে পাচার হয়েছে বলে 'অনীক' পত্রিকায় স্বীকারোক্তি রয়েছে।

—জনপদ সম্পাদকীয় ১৯৭৪

গড়ে ১৫ হাজার মণ পাট দৈনিক পাচার হচ্ছে

গত বছরের মত এবারও প্রতিদিন গড়ে ১৫ হাজার মণ পাট পাচার হচ্ছে। বর্তমান বাজারে এর আনুমানিক মূল্য ১৫ লাখ টাকা। এ অব্যাহত পাচারের অনিবার্য ফল হিসেবে হয় দেশের পাটকলগুলো বন্ধ বা উৎপাদন হ্রাস করবে অথবা পাট রফতানীতে বিঘ্ন ঘটবে বলে অভিজ্ঞ-

মহল আশঙ্কা করছেন। ক্ষমতাসীনদের ষড়যন্ত্রমূলক নীতিই বর্তমান পাট-সঙ্কটের জন্য দায়ী বলে তথ্যাভিজ্ঞমহল জানিয়েছেন।

এক জরীপে জানা গেছে, গত ৫ বছর ধরে জুলাই মাসে মোট পাট উৎপাদনের শতকরা ৪·১৯ ভাগ এবং আগস্ট মাসে ১২·৪২ ভাগ পাট বাজারে কেনাবেচা হয়। এবছরের উৎপাদন ধরা হয়েছে ৪০ লাখ বেল। উক্ত হিসেব মত ইতিমধ্যে কমপক্ষে ৬ লাখ ৬৫ হাজার বেল পাট বাজারে এসেছে। বর্তমান বছরের আর্থিক দুর্যোগে আরো বেশী পাট আমদানী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাটক্রয় হয়েছে মাত্র ৫ লাখ ৫০ হাজার বেল। বাকী পাট বাজারে এসেছে, কিন্তু পাচার হয়েছে বিদেশে। ইতিমধ্যে ২ থেকে সোয়া ২ লাখ বেল পাট পাচার হয়েছে এবং দৈনিক গড়ে পাট পাচারারের পরিমাণ হচ্ছে ১৫ থেকে ১৬ হাজার মণ। সরকারী ভ্রান্তনীতিই পাট পাচারের জন্য দায়ী বলে তথ্যনিষ্ঠমহল জানান।

...জানা গেছে, মাথাভারী প্রশাসন দুর্নীতির অভাবে পাটক্রয় সংস্থাগুলোর বিনিয়োগকৃত সবমূলধনই শেষ। ইতিমধ্যে জেএমসি ৩ থেকে ৪ কোটি, জে টি সি ৩ কোটি ও জে পি সি দেড় কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। আর পাটকল সংস্থা—তার অবস্থা আরো আশঙ্কাজনক। গত ২ বছরে ধ্বংসপ্রায় পাটকলগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে ৩৫ কোটি টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যু করতে হয়েছে। এখন প্রায় ৬০ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য মিলগুদামে জমা। কর্তাদের অযোগ্যতা, বিক্রয়ের অব্যবস্থা এবং পরিবহণ সঙ্কটের দরুন এ রফতানীযোগ্য পাটজাতদ্রব্য গুদামবন্দী হয়ে আছে।

গাওসিয়া জুট মিলে ১ কোটি, ফৌজি চটকলে ৬০ লাখ, করিম জুট মিলে ৪০ লাখ টাকার পাটজাতদ্রব্য পড়ে আছে। অন্যান্য সব মিলের অবস্থাই প্রায় এরূপ। এর ফলে, অর্থের অভাবে মিলগুলো পাটক্রয় করতে পারছে না। অথচ অন্যান্য সববছরই আগের বছরের উদ্বৃত্ত পাটসহ ৬ মাসের প্রয়োজন অর্থাৎ প্রায় ১৬ থেকে ২০ লাখ বেল পাট পাটকল সংস্থা কিনে ফেলত।

—গণকণ্ঠ সম্পাদকীয় সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৭

মঞ্চে-নেপথ্যে

খাদ্যমন্ত্রী সংসদে স্বীকার করিয়াছেন যে, আভ্যন্তরীণ খাদ্যসংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হইবে না। এই ব্যর্থতার কারণ সবাই

জানেন। কাজেই কারণসমূহের আলোচনা আর আমি করিব না। করিয়া লাভও নাই। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীকে যখন বুঝানো হয় বা তাঁহাকে এইমর্মে ব্রিফ্ করা হয় যে, আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কম-বেশী হইলে কিছু আসে যায় না, উহাতে সামগ্রিক ঘাটতির কোন পরিবর্তন হয় না এবং 'আভ্যন্তরীণ সংগ্রহের পরিমাণের উপর বাহ্যিক আমদানীর মাত্রা নির্ভর করে না' তখন বিস্মিত না হইয়া পারি না। খাদ্যমন্ত্রী স্বয়ং একাধিক স্থানে বলিয়াছেন যে, সীমান্ত-পথে খাদ্য-পাচারই খাদ্য-ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধির মুখ্য কারণ।' চোরাচালান যে 'ডেড স্টপ' হয় নাই বরং এখনও চলিতেছে, একথা তিনি সংসদেও স্বীকার করিয়াছেন। মন্ত্রীর এসব উক্তি ও স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে তাই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করে যে, এই তলা-খোলা-রুটির ঝুড়ি ('বটমলেস ব্রেডবাস্কেট') হইতে 'উদ্বৃত্ত' খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিয়া সরকার আপন হস্তে রাখিতে ব্যর্থ হইলে সেই উদ্বৃত্ত শস্য যে দেশের ভিতরেই থাকিবে তার নিশ্চয়তা কি? উদ্বৃত্ত খাদ্য সরকারের ঘরে থাকাও যা, জোতদার মওজুদদার-চোরাচালানীদের ঘরে থাকাও কি তাই? দুইটার অর্থ কি অভিন্ন? স্ট্যাটুটারি রেশনিং, মডিফায়েড রেশনিং ও জরুরী পরিস্থিতিতে মার্কেটিং অপারেশন চালানো এবং আর্মি-পুলিশ-রক্ষীবাহিনী-বিডিআর-শিক্ষক ও কর্মচারীদের রেশন যোগানোর জন্যই বোধ করি বার্ষিক তিন হইতে চার লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটা গমের রেশনের অতিরিক্ত। আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ সফল হইলে অন্ততঃ এই দিক দিয়া সরকার অনেকটা নিশ্চিত হইতে পারিতেন। কিন্তু চাউল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যদি শতকরা সত্তর ভাগই অপূর্ণ থাকে তবে হ্রাসকৃত বরাদ্দটুকুও (মাথাপিছু সপ্তাহে তিন পোয়া চাউল) নিয়মিত যোগাইয়া যাইবার জন্য কি সরকারকে বিদেশ হইতে অতিরিক্ত চাউল সংগ্রহ করিতে হইবে না? মণকরা ১২০ টাকা (দাম বাড়িয়া গেলে আরও বেশী) হারে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে চাউল আমদানী করিয়া ৮০ টাকা ভর্তুকী দিয়া ৪০ টাকায় উহা সরবরাহ করিতে থাকিলে সরকার কতকাল চালাইতে পারিবেন? অতএব, একথা কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, আভ্যন্তরীণ সংগ্রহের কম-বেশীর উপর সামগ্রিক খাদ্যাবস্থা ও বাহ্যিক সংগ্রহের পরিমাণ নির্ভর করে না? আমাদের দেশটা ফাইনান্সিয়াল টাইমস-এর ভাষায় 'বটমলেস ব্রেড বাস্কেট' না-হইলে এবং এখান হইতে বিপুল পরিমাণ খাদ্য-পাচার অব্যাহত গতিতে-না-চলিলে, পরিস্থিতি অবশ্যই অন্যরূপ হইত। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। আমাদের

দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা 'ডেড স্টপের' অসার আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়াছি আর এদিকে আমাদেরই দেশের অর্থগৃধ্নুরা আমাদের মুখের গ্রাস মাড়োয়ারী-মহাজনদের হাতে তুলিয়া দিয়া দেশকে খোক্‌লা করিয়া ফেলিতেছে।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৭৫

মঞ্চে-নেপথ্যে

সেই নাসিরুদ্দিন হোজার বিড়াল-মাপা গল্পের পর থেকে চোরাচালানের উপরে নির্দিষ্ট করে কিছু লিখি নাই। হিসাব করে দেখলাম ওই লেখাটার পরে সীমান্তে চোরাচালানী তৎপরতা সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাদের মোটমাট সংখ্যা হল ৩৯৭টি। উল্লেখ করা দরকার যে, এর প্রায় বেশীর ভাগ সংবাদই হচ্ছে, চোরাচালান কালে ধরা পড়ার ঘটনার। এর মধ্যে আবার অনেকগুলিই হল সীমান্তের ওপার থেকে মালামাল নিয়ে আসারকালে ধরা পড়ার ঘটনা। ভারতীয় পত্র-পত্রিকা যা কিছু হাতে পড়ে, কচিৎ কদাচিৎ সেগুলিতে চোরাচালানের সংবাদ থাকে। সে সব স্বল্প সংবাদেও আবার দেখা যায়, ধরা-পড়া লোকদের বেশীর ভাগ লোকই বাংলাদেশের।

.... আমার সংগৃহীত প্রায় ৪০০ ঘটনার মধ্যে হালে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে মাত্র ৪টি সংবাদ নিচে তুলে ধরছি। (১) রংপুর সদর মহকুমার বদরগঞ্জ থানার সীমান্তবর্তী তারাগঞ্জ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার লোহার পাত ও রেলওয়ে ওয়াগনের বিভিন্ন অংশ পাচার হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। (২) হবিগঞ্জ মহকুমা সীমান্ত চোরাচালানীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। প্রকাশ, বাংলাদেশের বাজার থেকে একশ্রেণীর দুষ্কৃতিকারী হাজার হাজার মণ মাছ, পাট, পাটজাত দ্রব্য, মরিচ, সোয়াবিন, সাবান, কাগজ, কেরোসিন, ধান-চাল, ডিম, হাঁস-মুরগী উচ্চমূল্যে ক্রয় করে ট্রাকে ভর্তি করে ও রেলযোগে রাতের আঁধারে পাচার করছে। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, রাত্রিবেলা জনগণের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন কোন লোক শত শত চোরাচালানীকে সীমান্তের ওপারে দিয়ে আসে। ...চোরাচালানীদের উপদ্রবে সীমন্তবর্তী এলাকার জনগণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ... এসব কার্যকলাপ পরিদর্শন করার জন্য গত ২৯শে মার্চ আমরা কয়েকজন সাংবাদিক সীমান্ত এলাকা ঘুরে আসি। এসব দেখে মনে হয়েছে, বাংলাদেশের এত সম্পদ যদি পাচার না হত, তাহলে খাদ্য-শস্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কোন অভাবই এত তীব্র হতো না।....

(৩) এবারের এই সংবাদের শিরোনাম হল : 'ময়মনসিংহের আটা কোথায় যায় ?' পত্রান্তরের বিশেষ প্রতিনিধি জানাচ্ছেন : সম্প্রতি ময়মনসিংহসহ জেলার কয়েকটি এলাকা সফর করে আসার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা যেমনি দুর্ভাগ্যজনক এবং দেশের স্বার্থ বিরোধী—যার পরিণাম আজকের খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের আকাশ-ছোঁয়া-গতি।...একটি সংঘবদ্ধ খাদ্যশস্য চোরাচালানীর দল টাকার থলে নিয়ে বসে আছে ময়মনসিংহ, সরিষাবাড়ী, গফরগাঁও, জামালপুর ও নেত্রকোনায় এবং এদেরই মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে আটা ঢাকা থেকে। তারপর পাচার করছে সীমান্তের ওপারে। ·· বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, খাদ্যশস্য পাচার বা চোরাচালানীদের কলকাঠি যারা নাড়ছে, তাদের মধ্যকার রুই-কাতলাদের অনেকেই ঢাকায় বসে পরিকল্পনা করছে। ···ইত্যাদি।

(৪) এবারের হেডিং তামাক পাচার। সংবাদ এই যে, রংপুরে উৎপাদিত বেশীর ভাগ তামাক সীমান্ত-পথে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

যাহোক, চোরাচালানের প্রায় ৪ শত সংবাদ থেকে (মনে রাখা দরকার যে, এসব সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত। আসলে সীমান্তে যা ঘটছে তা সেই বিদেশী পত্রিকায় বাংলাদেশকে "বটমলেস ব্রেড বাসকেট" বলার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে দিয়েছে কিনা, সেটাই আজ গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।) মাত্র ৪টি সংবাদ তুলে দিলাম। এই ৪টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সরকার দলীয় কর্তা ব্যক্তির মালিকানাধীন পত্রিকা ও সরকার পরিচালিত পত্রিকায়। কিন্তু তবুও ভয় হচ্ছে, কোটিকে গুটিকের মত চারশতের মধ্যে এই চারটি সংবাদও আবার চোরাচালান-এলার্জিতে যাঁরা ভুলেছেন, তাঁদের অস্বস্তির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

তাছাড়া এই প্রশ্নও না জেগে পারে না যে, ওই যে সংবাদদাতারা প্রায় একবাক্যে সবাই বলছেন, এত খাদ্যশস্য ও মালপত্র যদি পাচার না হত তা হলে দেশের খাদ্য পরিস্থিতি ও মূল্য পরিস্থিতি ভিন্ন রকম হত —একথা কি ঠিক ? কিছুকাল আগে জনৈক দায়িত্বশীল সরকারী ব্যক্তি বলেছিলেন, সংবাদদাতারা বন্ধুরাষ্ট্র বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত। তিনি অন্যত্র আরেকবার বলেছিলেন, এ ধরনের সংবাদ হচ্ছে 'বিদ্বেষ' মনোভাবপ্রসূত।

...ইতিমধ্যে অনেকেই বলছেন, পাচার করা ধান-চালের পরিমাণ কম-বেশী ১০/১৫ লক্ষ টন হবে—যার মূল্য কয়েক কোটি টাকা।

...এখানেই আদি অকৃত্রিম আরেকটা প্রশ্ন দেখা দেয়। চোরাচালান বন্ধের সুরাহা কি ? সবাই জানেন, দুই দেশের মধ্যে পাথুরে দেওয়াল তুলে দিয়েও মানুষের নির্গমন রোধ করা সম্ভব হয় না।....

...সেই প্রথম দিকে কিভাবে ১৩ টাকার আমুলস্প্রে ১৪ টাকায় কিনে নিয়ে সীমান্ত পারে ১২ টাকারও কমে বিক্রয় করে স্বার্থবাদী চোরাচালানীরা প্রতি কৌটা আমুলস্প্রেতে কমপক্ষে ৫/৬ টাকা করে লাভ করত—সে কাহিনী আশা করি সবারই মনে আছে। অধুনা সেই একই ধরনের পণ্য পাচারে মুনাফার হার যে অনেক বেশীগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে তা কেবল এই মুদ্রামানের অধোগতির দরুন। (এদিকে দিন কয়েক আগে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এই সংবাদও প্রকাশ পেয়েছিল যে, বাংলাদেশের একডজন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী—(এ দেশে যার মূল্যমাত্র ৪০ পয়সা) পকেটে করে সীমান্তপারে নিয়ে যাওয়ামাত্র সেখানে ১০/১২ টাকা লাভ মিলে যায়। এর ফলাফল কি দাঁড়িয়েছে, পরিবার পরিকল্পনা দফতর তার খতিয়ান ভাল বলতে পারবেন।)

...এদেশের একসের চাল ৪ টাকায় কিনে নিয়ে সীমান্ত পারে যদি তা ৪ টাকায়ও বিক্রয় করা হয়, তবে যে টাকা পাওয়া যায়, তার মূল্য এদেশী টাকায় ৮/১০ টাকা। এই লাভ কোন্ চোরাচালানী স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে পরিত্যাগ করবে, চোরাচালান যাঁরা বন্ধ করতে চান তাঁরা স্থির মস্তিষ্কে কথাটা ভেবে দেখতে পারেন।

...আসল গলদ বাসা বেঁধে রয়েছে মুদ্রামানের মধ্যে। মুদ্রার মানের উন্নতি—তথা সমতা বিধান করলেই চোরাচালান বহুলাংশে বন্ধ হবে এবং বাকী যা থাকবে, তা বন্ধের জন্য বর্তমান অবস্থায় বিডিআর বা অন্যান্য বাহিনী কতটুকু তৎপরতা প্রদর্শন করছে—তাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু মুদ্রামানের হাল ধরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা কি এ বিষয়টার দিকে নজর দেওয়ার ফুরসত জোটাতে পারবেন ?

...তাঁহারা এটুকু স্বীকার করিয়াছেন যে, কানাডার খাদ্য-সাহায্য যাহাদের জন্য দেওয়া হইয়াছে তাহারাই যাহাতে উহা পায়, তাহা সুনিশ্চিত করার বিষয়ে ঢাকায় দুই দেশের কর্মচারীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় অগ্রহায়ন ২২, ১৩৮১

মঞ্চে-নেপথ্যে

...দেশে যেটুকু ফসল হইয়াছে তাহার এতটুকুও যদি বাহিরে চলিয়া যায় তবে আর রক্ষা নাই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষীয় মহল বিশ্বাস করুন, এই ইতিহাস বিশ্রুত দুর্ভিক্ষের দিনেও বিদেশ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা ও অগ্নি-মূল্যে ক্রয়করা গম-আটা পাচার হইতেছে। তৎপরিবর্তে আনা হইতেছে লবণ—যাহার দাম সেরকরা আট-দশ টাকাও দেখিয়াছি। কালামে-পাকে এক স্থানে বলা হইয়াছে, 'ইয়ুখরেবুনা বয় তাহুম বেআইদিহিম', অর্থাৎ উহারা স্বহস্তে উহাদের গৃহ ধ্বংস করিয়াছে। কথাটি বহুলাংশে আমাদের ক্ষেত্রেও আজ প্রযোজ্য। আমরা আমাদের দুর্ভাগ্য ও দুর্ভিক্ষের জন্য এর-ওর উপর দোষ চাপাই। কিন্তু নিজেদের সর্বনাশ আমরা নিজেরা করিতেছি। আমরা নিজ দেশবাসীর মুখের গ্রাস নিজহস্তে অপরের গোলায় তুলিয়া দেই। অতএব, দোষ নিজেকে ছাড়া আর কাকে দিব? কবি গোলাম মোস্তফা লিখিয়াছেন, ঢেঁকি যখন কুমীর হয়, গৃহস্বামীর উদ্ধার নাই, মরণ তার সুনিশ্চয়।' আমাদেরও ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইয়াছে। বেড়ায় বার বার ক্ষেত খাইতেছে। আমরা বেড়া ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব কামরুজ্জামান সম্প্রতি বলিয়াছেন, 'চোরাচালানই জাতির বর্তমান দুর্দশার কারণ।' কিন্তু এই কথাটাই যখন আমরা বলিয়াছি তখন চোরাচালান 'ডেড স্টপ' বলিয়া উহা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত কোন দায়িত্বশীল অফিসারের মুখে আমাদের এরূপ কথাও শুনিবার দুর্ভাগ্য হইয়াছে যে, 'ব্যাপক পাচারের ভিত্তিহীন প্রচারণার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব ও ভারত-বিরোধিতার গন্ধ রহিয়াছে?

....দোষ তবে কার? আমাদের না অপরের? বেড়ায় আমাদের ক্ষেত খাইয়াছে। আজও খাইতেছে। আমরা যথেষ্ট সতর্ক হই নাই।

..কিন্তু আজ এই ঐতিহাসিক মন্বন্তরে অগণিত জীবনের মূল্যেও যদি আমরা সতর্ক না হই, ধান, চাল, পাট, মুদ্রা ইত্যাদি পাচারের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন না হই, তবে যত বৈদেশিক সাহায্যই আসুক না কেন, আমাদের ও আমাদের অর্থনীতির কোন ভবিষ্যৎ নাই! পৌষ-মাঘের শীতের রাত্রে নদীর পানিতে নামিয়া আপনি যতই মাছ মারুননা কেন, যে খালুইয়ে মাছ রাখিবেন সে খালুইয়ের তলায় যদি ফুটা থাকে তবে আপনার অত কষ্ট করিয়া মাছ ধরাই কি বৃথা নয়? আমরা কবির ভাষায় বলিতে

পারি, 'এ কেবল দিন-রাতে, জল ঢেলে ফুটা পাত্রে, বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মেটাবার'।

...অবশেষে সেই ধানের অধিকাংশ সনাতন পথে লোপাট হইয়া যায়, আর কিছুটা উঠে মওজুদদার-মুনাফাখোরের গোলায়। মাস খানেকের মধ্যে ৪৫ টাকার ধান আশি টাকায় উঠিয়া পড়ে। সরকার যখন শুকনা ও পরিষ্কার ধান কেনার জন্য জোরেশোরে গঞ্জে-বাজারে নামিলেন তার আগেই সব ফর্সা, ফক্কিকার। পরবর্তী কাহিনী সর্বজনবিদিত। ধানের দর লাফাইতে লাফাইতে বাড়িয়া মণকরা দুইশ' টাকার উপর উঠিল। বাল্য-কালে আমার পিতাকে দেখিয়াছি আড়াই টাকা, তিনটাকা মণ দরে বাড়ীর ধান বেচিতে। আর আমি সেদিন চোরের ভয়ে আমার সামান্য কিছু আউশ ধান বেচিয়া আসিলাম মণকরা দুইশ পাঁচ টাকায়। তফাৎ মণকরা মাত্রই কিঞ্চিদধিক দুইশ টাকা। পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে কী অবিশ্বাস্য পরিবর্তন।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় কার্তিক ১১, ১৩৮১

চতুরঙ্গ

গত আড়াই বছর যাবৎ যে বিষয়টি নিয়ে সবচে' বেশী লেখা-লেখি হয়েছে, সে বিষয়টি হচ্ছে চোরাচালান। মাত্র তেরোমাস আগের কথা। চোরাচালান তৎপরতা দমনে নিয়োজিত বিডি আর বাহিনীর চীফ ব্রিগে-ডিয়ার দত্ত অতি স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, চোরাচালান শুধু বন্ধ হয়েছে তা নয়, চোরাচালান 'ডেড স্টপড'। 'ডেড স্টপ' কথাটার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ: সংশয়াতীতরূপে বন্ধ। কিন্তু এত দিনে এই কথাটার মর্মার্থ সারা দেশের মানুষ হাড়েহাড়ে উপলব্ধি করছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল, এই দুইবছরের মধ্যে চোরাচালানী তৎপরতা বাংলাদেশের জন্য সমূহ সঙ্কট ডেকে নিয়ে এসেছে। পাট শিল্পের নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি, ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি, মাত্রাতিরিক্ত দ্রব্যমূল্য এবং ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ,—এই সব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পেছনে এককভাবে যে কারণটি সবচে' বেশী দায়ী, তার নাম চোরাচালান।

...আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানও স্বীকার করেছেন, দেশের বর্তমান দুরবস্থার পেছনে বহুলাংশে দায়ী চোরা-চালান তৎপরতা। জনাব কামরুজ্জামানের এই নিঃসংশয় ও দ্ব্যর্থহীন বিবৃতির

পর আশা করা যায় সরকারী পক্ষের অন্যান্য অনেকেই 'সত্য স্বীকারের' মিছিলে যোগ দেবেন। কিন্তু ততদিনে যা হওয়ার হয়ে গেছে। গত আড়াই বছরের সময়কালের মধ্যে বর্ডারের সব কয়টা 'সুবিধাজনক' জায়গায় চোরাচালানের তৎপরতা ও ব্যবসা জোরদার জমে উঠেছে। রাজনৈতিক টাউট শ্রেণীর লোকেরা এতে যোগ দিয়েছে। যারা অতি অল্প সময়ে মোটা টাকা কামাতে চায়, সেই সকল ব্যবসায়ী এই তৎপরতায় শামিল হয়েছে। সীমান্ত এলাকার বহু লোকও লিপ্ত হয়েছে এই অবৈধ তৎপরতার সঙ্গে। এমনকি যাদের 'বেড়া' হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদেরও অনেকে এই পাপ ব্যবসায়ের অংশীদার। অর্থাৎ আড়াই বছর আগে আগুন ছিল একটা শুকনো পাটশোলার মুখে, আড়াই বছরের মধ্যে সেই আগুন বাড়তে বাড়তে প্রায় সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে—এখন এই আগুন বেড়া পার হয়ে চালে উঠে পড়েছে। আগুন যখন চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার উপক্রম করেছে, তখনই—মাত্র আমরা 'সত্য'কে স্বীকার করলাম। প্রকারান্তে বলা যায়, স্বীকার করতে অতঃপর আমরা বাধ্য হলাম!

ক'দিন আগে সেতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) থেকে এসেছিলেন জনৈক ভদ্রলোক। বললেন, সেতাবগঞ্জ সুগার মিলের মাঝখান দিয়ে বর্ডার বরাবর চলে গেছে যে রাস্তা সেই রাস্তায় প্রায়শঃই দেখা যায় ট্রাকের মিছিল। ট্রাক ভর্তি ধান, চাউল, পাট, চামড়া, খুচরা যন্ত্রাংশ ইত্যাদি নির্বিবাদে, বিনা বাধায় চলে যায় বর্ডার পার হয়ে, কেউ বাধা দেয় না।

মাস ছয় আগের কথা; বেনাপোল বর্ডারের কাছে এক আত্মীয় বাড়ীতে গিয়েছিলেন আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক। জানালেন, বেনাপোল বর্ডারের এক'শ গজের মধ্যেই বিদেশী আগরওয়ালাদের পাটগুদাম। সামনে ট্রাক, গরুর গাড়ী বোঝাই পাট আসছে, ভর্তি হচ্ছে গুদাম এবং রাতের বেলায় এক রহস্যজনক উপায়ে গুদামের পাট চলে যাচ্ছে ঐপারে। এমন প্রকাশ্যে এই কাজ চলছে, অথচ কাছেই রয়েছে চেকপোস্ট। কেউ বাধা দেয় না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সদ্য এসেছেন আমাদের এক বন্ধু। তাঁরও একই অভিমত। ইচ্ছে করলেই এপারের জিনিস ওপারে পাচার করা যায়। এপার থেকে ওপারে যায় তুচ্ছ জিনিস। যেমন চাউল, চা, চামড়া, পাট, পেট্রোল ইত্যাদি। ওপার থেকে এপারে আসে 'মহামূল্যবান', 'জীবন রক্ষাকারী' জিনিসপত্র, যেমন বিড়ি, বিড়ির পাতা, তেজপাতা, জিরা, লবণ, ইত্যাদি। ব্যবসা খুবই জমজমাট।

জলপথে এবং সমুদ্রপথেও ব্যাপক চোরাচালান চলছে। চোরাচালানীরা বাংলাদেশ থেকে পাচার করে সোনা, বৈদেশিক মুদ্রা, আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি ও খুচরা অংশ, এছাড়া পাট, চাউল, চা এবং চামড়া তো আছেই। চোরাচালানীরা বাংলাদেশে পাচার করে মদ, বিদেশী সিগারেট, গাঁজা জাতীয় মাদক দ্রব্য, প্রসাধন দ্রব্য, কাপড় ট্রানজিস্টর, ঘড়ি, সাইকেল যন্ত্রপাতি এবং দামী সেন্ট। তেঁতুলিয়া থেকে সুন্দরবন, কামালপুর থেকে রাঙ্গামাটি, এই বিশাল বৃত্তের নানাস্থানে হাজার হাজার চোরাপথ খোলা হয়েছে এবং প্রতিদিন পাচার হচ্ছে কোটি কোটি টাকার মালামাল।

বিদেশী কোন এক পত্রিকা বাংলাদেশকে 'তলাহীন পাত্র' বলে উপহাস করেছিলেন। বাংলাদেশ দরিদ্র বটে, কিন্তু সম্পদহীন নয়। বাংলাদেশের আছে সোনালী আঁশ, আছে অঢেল গ্যাস, আছে মৎস্য সম্পদ, চা, চামড়া ও বিশাল জনশক্তি। যদি এ সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়, তাহলে বাংলাদেশ নিশ্চিতই বিত্তশালী দেশরূপে পরিগণিত হবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অবস্থাটা তলাহীন পাত্রের চেয়ে খুব একটা ভালও বলার উপায় নেই। তলাহীন পাত্রে যাই যায় তা-ই যেমন গায়েব হয়ে যায়, চোরাচালানের কল্যাণে আমাদের নিজস্ব সম্পদ ও বিত্তের দশাও কম-বেশী তেমনটাই দাঁড়িয়েছে। আমাদের যা কিছু সম্পদ, সবই 'ছুটে যাচ্ছে' বর্ডারের দিকে। পাট, চা, চামড়া, মাছ ইত্যাদি পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সহায় ছিল, কিন্তু আজ আর সে কথা নিশ্চিন্তে ভাবার উপায় নেই। চোরাচালানের দৌরাত্ম্যে তলাহীন পাত্রের মতই আমাদের অবস্থা।

...সেদিন এক ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ নাগরিক বলছিলেন, নেহাত মাটি, গাছপালা, বাড়ীঘর, অফিসভবন পাচার করা যায় না, তাই ওগুলো যথাস্থানে এখনো টিকে আছে। যদি উপায় থাকত, তাহলে হয়ত দেখতাম, চোরাচালানীদের 'কল্যাণে' মতিঝিলের বহু তলাবিশিষ্ট বাড়ীগুলি কিংবা সুন্দরবনের একাংশ কোন একদিন পাচার হয়ে গেছে।

উক্ত নাগরিক ছিলেন ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ। পরিহাসচ্ছলেই কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু এ থেকে চোরাচালানের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার দিকটা নিশ্চিতই ফুটে উঠে। ব্রিগেডিয়ার দত্তের মত যাঁরা চোরাচালান 'ডেড স্টপ' বলে দাবী করার প্রয়াস পান, তাঁরা হয়ত এই উক্তিকে 'সত্যের বিকৃতি অথবা

'সত্যের অপলাপ' বলে দাবী করবেন। তা দাবী করুন। আমাদের কিছু বলার নেই। আগুনের লকলকে শিখা গায়ে কাপড়-চোপড় স্পর্শ করতে উদ্যত হলেও কেচ্ছা-কাহিনীর আলসের রাজা 'কেবা আঁখি মেলেরে' বলে সুখ-স্বস্তি প্রকাশ করেছিল স্বচ্ছন্দে! সুতরাং বলার কি-ই-বা আছে!

কিন্তু চোরাচালানের দৌরাত্ম্যে গোটা দেশের অর্থনীতি যেরকম ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে সজাগ-সচেতন নাগরিকদের কেউ উদ্বেগ বোধ না করে পারেন না। এই যে একটা গোটা দেশ, এই দেশের অর্থনীতির উপর কার্যকর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নেই,—এর অন্যতম প্রধান কারণ চোরাচালান। এই যে ভয়াবহ ক্রমদ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি,—সে ব্যাপারে প্রশাসনের কিছু করার নেই, প্রশাসন অথর্ব ও অসহায় হয়ে পড়েছে। এরও অন্যতম প্রধান কারণ চোরাচালান তৎপরতা। এই দেশে ভয়াবহ খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষ, তারও পেছনে রয়েছে চোরাচালান। চোরাচালান একটা অদৃশ্য গহ্বর, যেখানে আমাদের সম্পদ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। চোরাচালান যেন একটা সিরিঞ্জ, যা দিয়ে গোটা দেহের রক্ত বার করে নেওয়া হচ্ছে। দিন দিন রক্তহীন ও ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছি আমরা। আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

...যশোর, খুলনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, কামালপুর, শেরপুর হালুয়াঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, টেকনাফ, সুন্দরবন প্রভৃতি সীমান্তে কারা চোরাচালানের রাঘববোয়াল তা কর্তব্যরত সেনাবাহিনী, বিডি-আর, পুলিশ এবং সর্বোপরি সরকারী প্রশাসনের জানা উচিত। জানা না থাকলে আমাদের জিজ্ঞাসা, আপনারা তাহলে এতদিন কি করেছেন? অনেকেরই সন্দেহ-সংশয় রয়েছে যে চোরাচালানের রাঘববোয়ালদের ধরার ব্যাপারে হয়ত বা উপর মহলের কারো কারো নিষেধ-তর্জনী কাজ করছে। এই ব্যাপারেও সকল সন্দেহ-সংশয়ের নিরসন হওয়া দরকার সেই সন্দেহ-সংশয় নিরসনের দায়িত্ব বর্তায় সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ এবং অন্যান্য এজেন্সির উপর, সর্বোপরি সরকারের উপর।

কথাটি কি সত্য?

প্রকাশ, কানাডা সরকার নাকি বাংলাদেশকে এই মর্মে 'হুঁশিয়ার' করিয়া দিয়াছেন যে, খাদ্যের চোরাচালান বন্ধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে ভবিষ্যতে কানাডীয় খাদ্য সাহায্য কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় কার্তিক ২০, ১৩৮১

অর্থনীতি

'সত্যের অপলাপ' বলে দাবী করবেন। তা দাবী করুন। আমাদের কিছু বলার নেই। আগুনের লকলকে শিখা গায়ে কাপড়-চোপড় স্পর্শ করতে উদ্যত হলেও কেচ্ছা-কাহিনীর আলসের রাজা 'কেবা আঁখি মেলেরে' বলে সুখ-স্বস্তি প্রকাশ করেছিল স্বচ্ছন্দে। সুতরাং বলার কি-ই-বা আছে!

কিন্তু চোরাচালানের দৌরাত্ম্যে গোটা দেশের অর্থনীতি যেরকম ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে সজাগ-সচেতন নাগরিকদের কেউ উদ্বেগ বোধ না করে পারেন না। এই যে একটা গোটা দেশ, এই দেশের অর্থনীতির উপর কার্যকর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নেই,—এর অন্যতম প্রধান কারণ চোরাচালান। এই যে ভয়াবহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি,—সে ব্যাপারে প্রশাসনের কিছু করার নেই, প্রশাসন অথর্ব ও অসহায় হয়ে পড়েছে। এরও অন্যতম প্রধান কারণ চোরাচালান তৎপরতা। এই দেশে ভয়াবহ খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষ, তারও পেছনে রয়েছে চোরাচালান। চোরাচালান একটা অদৃশ্য গহ্বর, যেখানে আমাদের সম্পদ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। চোরাচালান যেন একটা সিরিঞ্জ, যা দিয়ে গোটা দেহের রক্ত বার করে নেওয়া হচ্ছে। দিন দিন রক্তহীন ও ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছি আমরা। আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

...যশোর, খুলনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, কামালপুর, শেরপুর হালুয়াঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, টেকনাফ, সুন্দরবন প্রভৃতি সীমান্তে কারা চোরাচালানের রাঘববোয়াল তা কর্তব্যরত সেনাবাহিনী, বিডি-আর, পুলিশ এবং সর্বোপরি সরকারী প্রশাসনের জানা উচিত। জানা না থাকলে আমাদের জিজ্ঞাসা, আপনারা তাহলে এতদিন কি করেছেন? অনেকেরই সন্দেহ-সংশয় রয়েছে যে চোরাচালানের রাঘববোয়ালদের ধরার ব্যাপারে হয়ত বা উপর মহলের কারো কারো নিষেধ-তর্জনী কাজ করছে। এই ব্যাপারেও সকল সন্দেহ-সংশয়ের নিরসন হওয়া দরকার সেই সন্দেহ-সংশয় নিরসনের দায়িত্ব বর্তায় সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ এবং অন্যান্য এজেন্সির উপর, সর্বোপরি সরকারের উপর।

কথাটি কি সত্য?

প্রকাশ, কানাডা সরকার নাকি বাংলাদেশকে এই মর্মে 'হুঁশিয়ার' করিয়া দিয়াছেন যে, খাদ্যের চোরাচালান বন্ধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে ভবিষ্যতে কানাডীয় খাদ্য সাহায্য কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় কার্তিক ২০, ১৩৮১

অর্থনীতি

নরসিংদী কলেজে তাজউদ্দিন

মুদ্রা পাচারের ফলে অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে

অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ আজ দুপুরে নরসিংদী কলেজে নারায়ণগঞ্জ জেলা পূর্বাঞ্চলীয় শাখা ছাত্র লীগ সম্মেলনে ভাষণ দানকালে বলেন, বাংলাদেশের কতিপয় নেতার বিদেশী ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স রয়েছে। তারা অনবরত দেশ থেকে মুদ্রা পাচার করে দিচ্ছে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের মানুষ কাপড়ের অভাবে মরছে আর এক শ্রেণীর শিল্পপতি নামধারী লণ্ডনে কাপড়ের কল চালু করছেন।

...অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলেন, পুলিশ চোর, ডাকাত, হাইজ্যাকারদের ধরে আনে আর অন্য দিকে মন্ত্রী পরিষদ থেকে কিংবা উর্ধ্বতন মহল থেকে টেলিফোন আসে ছেড়ে দেয়ার জন্যে। ফলে দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

চিনি কল প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, চিনিকলগুলো চালু করার জন্যে যখন চেষ্টা চালানো হয়েছিল তখন এক শ্রেণীর নেতা বাধা প্রদান করেন এবং আখ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেন। তাদের জন্যে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হতে পারেনি। কিন্তু আজ যদি বিরোধীদলীয় কেউ বাধা প্রদান করত তাহলে তাদের উপর চলত গুলী।

—জনপদ মার্চ ১১, ১৯৭৪

দুর্যোগকালে উটপাখীর মত বালিতে মাথা গুঁজিয়া থাকিলে চলিবে না—তাজুদ্দিন

অর্থমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ বলেন যে, বর্তমান জাতীয় দুর্যোগকালে উটপাখীর মত বালিতে মাথা গুঁজিয়া থাকিলে চলিবে না। বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাইতে হইবে এবং অবিলম্বে দলমত নির্বিশেষে সমস্যার বাস্তব সমাধানের পথে আগাইয়া আসিতে হইবে।

...তিনি বলেন যে, ৩ বৎসর মানুষ একাধারে দুর্ভোগ সহ্য করিতেছে। কিন্তু পাশাপাশি এত লোক কালো টাকার মালিক হইল কিভাবে? জনাব তাজুদ্দিন শ্লোগান, স্টেনগানের রাজনীতি বন্ধ করিয়া দুর্গতদের সাহায্যে আগাইয়া আসার জন্য তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান।

...জনাব তাজুদ্দিন বলেন যে, সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে না পারিলে দেশ টিকিবে কিভাবে?

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১৪, ১৯৭৪

বাংলাদেশের অর্থনীতি

---ডঃ মাযহারুল হক

(প্রবন্ধটি মূলতঃ মার্চ ১৯৭৪ সনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ থেকে নেয়া।)

আজ আমার পরম আনন্দের বিষয় যে, আমি আপনাদের সঙ্গে সম্ভবতঃ শেষবারের জন্য মোলাকাত করতে আসতে পেরেছি। দিন কয়েক আগেও আমিও এটা ভাবিনি যে, আমি এই সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারব। দেখতে পাচ্ছেন আমি অতিশয় রুগ্ন। আমার জীবনপ্রদীপের শিখা আজ নিবু নিবু, তাই যাবার আগে আমার বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিবেক দিয়ে যা উপলব্ধি করছি, তার কিছুটা বলে যেতে চাই। যদি আমি নির্বোধের মত কিছু বলি, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির

বুদ্ধি যেথা মুক্ত---

এই নীতি অনুসরণ করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদরা দীর্ঘকাল যাবৎ পাকিস্তানী শাসকদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। ১৯৫৩ সনে শুরু করা সংগ্রাম ১৯৭০ সনে পিছন ফিরে দেখলে এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি মনে হবে। প্রবল প্রতাপান্বিত আইয়ুব খানের পক্ষেও তাঁদের উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, গত দুই বছরের মধ্যে কোন বেসরকারী অর্থনীতিবিদ সাধারণের অবগতির জন্য, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও পরিকল্পনা কি হওয়া উচিত এবং সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন তার পরিণতি কোথায়, সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলেননি। অথচ আমরা প্রতিদিন তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছি রসাতলে। আমাদের অর্থনীতিবিদরা, যাঁদের সুনাম পশ্চিম জগতেও আছে, তাঁরা কি আজ বুদ্ধিহীন, সাহসহীন রুদ্ধবাক হয়ে গেছেন? আজ যদি তাঁরা তাঁদের কর্তব্যে অবহেলা করেন ভবিষ্যৎ তাঁদের ক্ষমা করবে না।

দুই বছর আগে যখন পরিকল্পনা কমিশন শুধু অর্থনীতিবিদদের নিয়ে গঠিত হোল, তখন আমি পরিকল্পনা কমিশনের পণ্ডিতদের বলেছিলাম, যদি আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়, এটা নিশ্চিত মনে হয় যে, অগ্রগতির পরিকল্পনা অর্থনীতিবিদদের কাজ নয়। এটা নেহায়েত সোসিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যাপার। যাঁরা পরিসংখ্যার উপর নির্ভর করে, অংক কষে পরিকল্পনা করতে চান তাঁদের সে পরিসংখ্যার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, যা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তা হোল মানুষের—অর্থাৎ যাদের জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে—তাদের সম্ভাব্য আচরণ সম্বন্ধেও ধারণা থাকা। প্রথম কাজ হোল সমাজকে উন্নয়নকামী ও উন্নয়নপন্থী করে গড়ে তোলা। সেটা অর্থনীতিবিদদের কাজ নয়। তাদের কাজে নামার আগে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এই ধরুন আপনি উঁচু দরের সাঁতারু। আপনি সাঁতরিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হতে চান। পানিতে নামার আগে আপনাকে কি কি বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে, সেটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। পানির তাপমাত্রা কি, ঢেউয়ের উচ্চতা কি, স্রোতের গতি কোন দিকে ও কতটুকু। বাতাস কোন্ দিক থেকে বইছে এবং কি গতিতে বইছে এই ধরনের বিচার করলে বাংলাদেশে কোন পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশীয় জিনিসের মূল্য কিভাবে উঠানামা করবে কত উঁচুতে উঠবে, বিদেশী উৎপাদন দ্রব্য এবং আনুষঙ্গিক ভোগ্যপণ্যের মূল্যের মাত্রা কি হবে; দেখা যাচ্ছে পরিকল্পনা কমিশন এসব বিষয়ে কিছুই জানতেন না। পরিকল্পনা কমিশন যদি মোটামুটিভাবে বাহাত্তরের দ্রব্যমূল্যের উপর ভিত্তি করে থাকেন, তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, '৭৩-এর মাঝামাঝি—অর্থাৎ যখন পাঁচসালা পরিকল্পনা চালু করবেন—তখন সে মূল্যমাত্রার সঙ্গে আগেকার মূল্যমাত্রার কয়েকগুণ প্রভেদ।

মনে হচ্ছে, একটা ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশন একেবারে চোখ বুঁজে ছিলেন, কিন্তু তাঁদের বোঝা উচিত ছিল যে, চোখ বুঁজে থাকলে জিনিসের অস্তিত্ব বিলোপ হয় না, শুধু নিজেকেই বোকা বানানো হয়। সে ব্যাপারটা হোল, মুক্তির আগে যাদের হাতের সঞ্চিত সম্পদ উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং রোজগার অর্জনে ব্যবহৃত হোত, এখন তা লুটেরাদের দখলে রয়েছে। এই যে সম্পদ হস্তান্তরিত হোল এবং এক ধরনের অবাধ শোষণের ফলে দেশের সম্পদের বহুলাংশে যে অহরহ একশ্রেণীর হাতে পুঞ্জীভূত হচ্ছে,

তার অনেকটাই চোরাপথে আসা বিদেশী দ্রব্যে, আয়েশ দ্রব্যে এবং বিদেশে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, তা একেবারেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন তাদের হাতে যা রয়েছে সেটা উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করার উপায় কি? এখন প্ল্যানিং কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য স্থানীয় মুদ্রার প্রচণ্ড ঘাটতি।

তবুও ধরা যাক, এই বিনিয়োগযোগ্য মুদ্রা আমাদের হাতে রয়েছে। কিন্তু তা বিনিয়োগের জন্য যে ধরনের ইন্সেন্টিভ প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন কি কোন পথ-নির্দেশ দিয়েছেন? এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিরোধী। স্বাধীনতার পূর্বে যেসব স্বল্প আয় ব্যক্তি তাদের অতি কষ্টে সঞ্চিত অর্থ বাংলাদেশের শিল্পের মূলধন যোগাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনেছেন, নীট-এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করেছেন অথবা সরকারকে উন্নয়ন কাজে ঋণ দিয়েছেন, তাঁরা আজ নিঃস্ব। এর মধ্যে যাঁরা অবসরগ্রহণ করেছেন বা বিধবা হয়েছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ অনুসংস্থানের ব্যবস্থাও ছিল। তাঁরা হিসেব করেছিলেন যে, বছরের সংসার চালানোর অর্থ এই বিনিয়োগ থেকে আসবে। আজ প্রায় চার বছর ধরে তাঁরা তা থেকে এক পয়সাও পায়নি। তাঁদের সংসার কিভাবে চলছে, সে সম্বন্ধে সরকার কি কোন বিবেচনা করেছেন? অথচ এ ধরনের লোকের কাছ থেকেই সঞ্চয় এসে থাকে। সরকার জনসাধারণ যে সব শিল্পে শেয়ার কিনেছেন, সেসব শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন সোশ্যালিজমের খাতিরে এবং তাতে এদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছেন। সোশ্যালিজম চালু করলে তা তো ডিভিডেন্ড দেয়া চলে না! আর ডিভিডেন্ড দেবেই বা কোথেকে? এসব শিল্প তো প্রায়ই সবই নিজেদের আয়ে নিজেদের অস্তিত্বরক্ষা করতে পারছে না। বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প পাট। বেশ কয়েক কোটি টাকা নাকি লাগবে তাকে খাড়া করতে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একাত্তরের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন সুদ সঞ্চয়কারীরা পাবে না। এবং এই সময়ের মধ্যে কেনা সঞ্চয়পত্র ও নিট-এর টাকাও ফেরত পাবে না। যুক্তি হোল, হানাদার সরকারের খেদমতে এসব অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। কি চমৎকার যুক্তি! এ সময়ের মধ্যে যেসব টাকা সরকারী পোস্টাল সেভিং ব্যাংকে ছিল তার সুদ কিন্তু দেয়া হয়েছে এবং এসময়ে যে টাকা জমা হয়েছে, তাও বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। আপনারা সকলেই জানেন, নিট-এর টাকা সরকারের হাতে দেয়া

হয়নি, এটা একটা বিনিয়োগকারী ট্রাস্টের হাতে দেয়া হয়েছে। এটাও আপনারা সকলে জানেন যে, বাংলাদেশের লোকেরা যত টাকার নিট কিনেছেন তার চেয়ে বেশী বাংলাদেশের শিল্পেই এই ট্রাস্ট বিনিয়োগ করেছে। অনেকে হয়তো জানেন না যে, ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেটের টাকা প্রতিরক্ষার জন্য নয় এবং তা হতেও পারে না। নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনিশ্চিত পাবলিক কন্‌ট্রিবিউশন-এর উপর নির্ভর করে না। এই অর্থ উন্নয়ন কাজেই ব্যবহৃত হয়।

সরকারী সিদ্ধান্তের যুক্তিহীনতার চরম দৃষ্টান্ত হোল যে, ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যেসব সরকারী কর্মচারী হানাদার সরকারের সেবা করেছেন, তাদের ডিসেম্বরের বেতন পুরোপুরি আদায় করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও যদি পরিকল্পনা কমিশন ভেবে থাকেন যে, সঞ্চয়ের পথ অবারিত, তাহলে তারা নিজেদের বোকা বানাচ্ছেন। একথা অবশ্য বলা দরকার যে, সকলপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিলেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে বর্তমান দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতিতে সঞ্চয় অসম্ভব। বর্তমানে অনেকেই ক্যাপিটাল কন্‌জুম করে বেঁচে আছেন। এবং এ পরিস্থিতি থেকে কবে নিস্তার পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। পরিকল্পনা কমিশন পাঁচ বছরের জন্য যে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অংক দিয়েছেন, আমার বিবেচনায় তা নেহাতই অবাস্তব। সরকারী রাজস্বের উদ্বৃত্ত আমি কল্পনাই করতে পারি না। তাছাড়া, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোকে সোশ্যালিজমের নামে বাঁচিয়ে রাখতে হলে অনেক রাজস্ব তাতে ঢালতে হবে। যদিও তাদের তৈরী দ্রব্যের দাম গগনচুম্বী। আমরা আমাদের অর্থনীতিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত বললেও ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের সমস্ত ফ্যাক্টরী অটুট ছিলো। ফ্যাক্টরীর থেকে যেসব জিনিস উধাও হয়েছে সেটা ১৬ই ডিসেম্বরের পর। সমস্ত যন্ত্রপাতি অক্ষত থাকলেও উৎপাদন অব্যাহত রয়নি, তার কারণ এসব ম্যানেজ করার লোক ছিল না এবং যে কাঁচামালের প্রয়োজন তা আনারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। শ্রমিকদের নতুন ধ্বংসাত্মক-মনোবৃত্তির কথা না-ই-বললাম। আমাদের নেতারা শ্রমিকদের পাকিস্তান যুগে বার বার বলেছেন, "তোমাদের দুঃখদুর্দশার একমাত্র কারণ হোল শোষণ।" সেটা আজ বুমেরাং করছে তাদেরই উপর। আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল যোগাযোগের ক্ষেত্রে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও বিধ্বস্ত যোগাযোগ উৎপাদন ক্ষমতার উজ্জীবন ও বণ্টন ব্যবস্থা সুচারু করার পথে চরম বিঘ্ন ছিল। তারপর পাকিস্তান থেকে আমাদের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কাঁচামাল

ও বহুবিধ ভোগ্যপণ্য আসতো, তা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এসব আমরা দেশী টাকায় কিনতাম। এখন এসব বিদেশী মুদ্রায় উঁচু এবং ক্রমবর্ধমান দরে কিনতে হচ্ছে। সে বৈদেশিক মুদ্রা কোথায়?

আরেকটি মহাগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, শিক্ষা ব্যবস্থার চরম দুর্গতি। এ দু'বছরে ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নানা প্রকার জাঁকজমকপূর্ণ সম্মেলন ও সমাবেশে কোটি টাকার উপর খরচ করেছে বলে আমার ধারণা। এবং এ সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং পরীক্ষাকেন্দ্রে যা ঘটেছে, তা দেখে আমার দৃঢ় ধারণা হচ্ছে যে, ছাত্র ও শিক্ষার মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটেছে। এর প্রতিকার কি? অথচ আমরা প্রতিদিন শুনছি আমাদের সোনার বাংলা গড়তে হবে। কারা গড়বে বলুন? সোনার বাংলা নিশ্চয়ই গড়া হয়েছে কিছুসংখ্যক লোকের জন্য। এবং এই ছিল সোনার বাংলার চিরন্তন ব্যবস্থা।

আমাদের রাজনৈতিক নেতারা শুধু আজ নয়, আদিকাল থেকে অহোরাত্রি বলে বেড়াচ্ছে, "টাকার জন্য কোন চিন্তা করতে হবে না।" সেটা যে কত বড় অসত্য, পরিকল্পনা কমিশনের আভ্যন্তরীণ ও বহির্জগতের টাকার অভাবে নতুন করে পরিকল্পনার লক্ষ্য, প্রায়োরিটি ও বরাদ্দের যে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে তাতেই প্রমাণিত হয়েছে। গত দেড় বছরে যে পরিমাণ অর্থ আমরা উৎসবে ব্যয় করেছি তার অঙ্ক নেহাত কম নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব দেশ বাংলাদেশের পক্ষে এ ধরনের আচরণ পাপ। গত দু'বছরের কার্য-কলাপ দেখে কোন ব্যক্তির যদি ধারণা হয় যে, বাংলাদেশে আর যা কিছুরই অভাব হোক না কেন, অর্থের অভাব নেই, তা অন্যায় হবে না। শান-শওকতের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, সেটাও একই পর্যায়ে পড়ে। অথচ পরম লজ্জার বিষয় যে, এটা ঘটেছিল এমন সময়, যে সময় সমস্ত দেশকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বিশ্ববাসী ১৬০০ কোটি টাকার খাদ্য ও দ্রব্যসামগ্রী এ দেশে বিতরণ করেছে।

এখন থেকে আর খয়রাতি খাদ্য পাবার আশা কম। এ বছরে পনের লাখ টন খাদ্য ঘাটতির কথা শুনা যাচ্ছে, সেটা শুধু গম কিনে পূরণ করতে গেলেই প্রায় সবটা অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাই খরচ হয়ে যাবে, আর ঘাটতি পূরণের জন্য অর্ধেক গম ও অর্ধেক চাল কিনতে গেলে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় কুলোবে না। পাট থেকে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আমদানীর আশা ছিল এখন আর তা হচ্ছে না। এইতো আমাদের আভ্যন্তরীণ আর অর্জিত

বৈদেশিক মুদ্রার ছবি। পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্য পরিকল্পনা কমিশন বিপুলভাবে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করছেন। অথচ সেটা আসবার কোন উপায় তো দেখা যাচ্ছে না। পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম বছর তো প্রায় শেষ হয়ে এলো, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, আগেকার পাইপলাইনে যা ছিল তার চেয়ে বেশী বিশেষ কিছু সাহায্য আসেনি। আর তাছাড়া গ্যালোপিং মুদ্রাস্ফীতির ফলে এ প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ কততে দাঁড়াবে তা পরিকল্পনা কমিশন জানেন না। অন্ততঃ সেটা তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনার দলিলে চিন্তা করেননি। আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি ও হাইপার গ্যালোপিং আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতির দাপটে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাই সম্ভব নয়। সুতরাং, যেখানে পরিকল্পনা কমিশন প্রথম বছরে কি ঘটবে না ঘটবে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না, সেখানে তাঁরা পাঁচ বছরের মহাপরিকল্পনা রচনা করেছেন। এটা বিরাট ও সময়ের অপচয়। বাংলাদেশে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (এডিপি) বাইরে চিন্তা করা বর্তমান পরিস্থিতিতে বাতুলতা মাত্র।

তারপর আভ্যন্তরীণ অর্থেরও ঘাটতি রয়েছে। এখানে সরকার এ যাবৎ নোট ছাপিয়ে তার অর্থের চাহিদা পূরণ করেছেন। নোট সার্কুলেশন বৃদ্ধির পরিমাণের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি নিতান্তই স্বল্প। ফ'লে হু হু করে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া সবচেয়ে মারাত্মক কারণ হোল, সরকার আশ্রিত কিছুসংখ্যক লোকের হাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত করায় এই গোষ্ঠী অক্টোপাশের মত সমস্ত দেশের অর্থনীতিকে নিজেদের কবলে এনে শোষণ করে যাচ্ছে। বস্তুতঃ গত দু'বছরের সমাজকে শোষণহীন করার নামে বাংলাদেশে যে লুণ্ঠন চলেছে, তার নজীর ইতিহাসে নেই। অল্প কিছুদিনের মধ্যে দেশের সম্পদের এক বৃহৎ অংশ এমন সব ব্যক্তির হাতে গিয়ে পৌঁছেছে, এবং আজও ক্রমাগত যাচ্ছে, যারা দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার কাজে কোনদিন আত্মনিয়োগ করেনি, দু'বছর আগে যারা ছিল নিরন্ন আজ তারা লক্ষপতি। দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। রাজনৈতিক নেতারা শত লক্ষ বার দুর্নীতি উচ্ছেদ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জনসাধারণকে জ্ঞাপন করেছেন। দুর্নীতি যাঁদের ব্যবসা তাঁরাও এই কোরাসে যোগ দিয়েছেন। অথচ দুর্নীতি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এই শোচনীয় পরিস্থিতির অবসান ঘটাতেই হবে। কিভাবে ঘটাতে হবে, সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তা বিবেচনা করবেন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সরকার এ যাবৎ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এ ধরনের ব্যাপারে পরম শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রীয় নেতার প্রভাব কার্যকরী হয়ে থাকে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের আকুল আবেদনও সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হচ্ছে।

পরিকল্পনা কমিশন তাঁদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম অধ্যায়ে (সোশ্যাল এণ্ড পলিটিক্যাল পার্সপ্যাকটিভ অব গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট) বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের চারটি স্তম্ভ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, তাঁরা ভেবেছেন তাঁদের পরিকল্পনা এই চারটি স্তম্ভ যে নির্দেশ দিচ্ছে তার উপর ভিত্তি করেই হবে। গণতন্ত্র হোল প্রথম স্তম্ভ। অর্থাৎ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। গণতন্ত্র যে কি সেটা বোঝা ভার। শাসকভেদে গণতান্ত্রিক নীতির পরিবর্তন ঘটতে দেখেছি। মুখে গণতন্ত্র কাজে স্বৈরাচার এটাই হোল সুয়েসের এদিকের দেশগুলোর গণতন্ত্রের রূপ। আজ গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দিতে রাজী, কাল তারা ক্ষমতায় আসলে স্বৈরাচারী হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্রকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। তারপর পাস হলো স্পেশ্যাল পাওয়ার্স এ্যাক্ট। এ প্রভিন্স্ আপনাদের জানা আছে। এরপরও আমরা বলি আমরা গণতান্ত্রিক দেশ। তার একমাত্র কারণ আমাদের ভোট দেবার অধিকার আছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাব অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায় হতে পারে, যেমন পারে জানমালের নিরাপত্তার অভাব। কিন্তু সেকথা থাক।

এরপরে আসে জাতীয়তাবাদ। ও নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো, কারণ, ব্যাপারটা জটিল, এবং পরিকল্পনার সঙ্গে এর সরাসরি কোন যোগ আছে বলে আমি মনে করি না। তৃতীয় স্তম্ভ সেকুলারিজম্। আমার বিবেচনায় আমাদের রাষ্ট্র সেকুলার নয়, ধর্মনিরপেক্ষ। সেকুলার অর্থে ধর্ম উপেক্ষিত বোঝায়। ধর্ম-নিরপেক্ষতা দ্বারা আমি মনে করি শুধু "আইনের চোখে সবাই সমান" এ কথাই বোঝায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে ইকুয়েলিটি বিফোর আই অব ল'-এর গুরুত্ব যথেষ্ট।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হোল সমাজতন্ত্র। অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজতান্ত্রিক হবে। সোশ্যালিজমের নিশ্চয় একটা অর্থ আছে : এটা কি, কিভাবে আসে এবং কিভাবে রক্ষা করতে হয়, যারা সোশ্যালিজমের ধ্বনি উঠিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন, মাইক্রোফোন অচল করে দিচ্ছেন, তাঁরা কি সবাই জানেন, কি সম্বন্ধে তাঁরা বলছেন? "সোশ্যালিজম ইজ এ মাস্ট"—কিন্তু এই সোশ্যালিজম কি? বাংলাদেশের শতকরা আশীজন জমির অধিকারী কৃষক। তাদেরকে সোশ্যালিজমের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করে তা গ্রহণ করার দাবী জানালে আমার বিশ্বাস হাতের কাস্তে নিয়ে তাড়া করে আসবে। অথচ "আমরা সমাজতন্ত্র চাই," এটা বলে বেড়ানো হচ্ছে। আমি এসব কথা বলছি, তাই বলে আপনারা ভাববেন না, আমি সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে। সোশ্যালিজমের আসার একটা নির্দিষ্ট পথ রয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো তাকে সামাজিক বিপ্লব বলে থাকে। যাঁরা ওয়েলফেয়ার স্টেটকে সোশ্যালিস্ট স্টেট বলে থাকেন তাঁরা জানেন এই ওয়েলফেয়ার স্টেটের ধারণা এবং কার্যক্রম শুধু উন্নত দেশগুলোতেই হয়েছে। কারণ, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন সেটা শুধু সম্পদ উৎপাদনকারী দেশগুলোই যোগাতে পারে।

সোশ্যালিজমের ধারণা সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যই কিছু সংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে এসেছিল। কার্ল মার্কস-এর হিস্টরিক্যাল এনালাইসিস-এর একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও যুগিয়েছে। অথচ মার্কস-এর নির্ধারিত পথে সোশ্যালিজম আসেনি। এটা এল প্রথম রাশিয়ায়—যেখানে একটা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী বহুদিন থেকে গড়ে উঠেছিলো এবং জার শাসনের আমলে অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছিল। সেই স্বল্পসংখ্যক সমাজতন্ত্রপ্রাণ ব্যক্তিরা লেনিন-এর নেতৃত্বে প্রথম মহাযুদ্ধে রাশিয়ায় যে বিপর্যয় ঘটে সে সুযোগ নিয়ে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সৃষ্টি করে। সে আজ প্রায় ষাট বৎসর আগের কথা। একনায়কত্বের অবসান এখনও ঘটেনি, যদিও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আগের থেকে অনেক সহজ হয়েছে। পূর্ব ইউরোপে গত মহাযুদ্ধের অবসানের সুযোগ সোশ্যালিস্ট দলগুলো রাশিয়ার সামরিক শক্তির সাহায্যে সোশ্যালিস্ট একনায়কত্ব কায়েম করে। ১৯৪৯ সালে মাও সেতুং বহুদিনের নির্যাতন ও সাধনার পরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন চীনে। এইসব দেশে গণতন্ত্র বলতে আমরা যা বুঝি তা নেই। দেশের সব কাজ কম্যুনিস্ট পার্টির নির্দেশেই চলছে। এবং এসব দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য। আবার সবদেশে সোশ্যালিজম বলতে ঠিক এক কথা বোঝায় না। দেশ ভেদে পরিবেশ ভেদে সমাজতন্ত্রের রূপ বদলেছে। কিন্তু কোন দেশে সমাজতন্ত্র সামাজিক বিপ্লব ছাড়া এবং কম্যুনিস্ট পার্টির একনায়কত্ব ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলাদেশে কি তা ঘটেছে? ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ কি সোশ্যালিস্ট দল? সোশ্যালিজম কি এঁরা কি

ঠিক বোঝেন ? এদের যে পার্টি ক্যাডার রয়েছে, তাদের কার্যকলাপ নিতান্তই সমাজতন্ত্রবিরোধী। অথচ আওয়ামী লীগ কেন যে "সোশ্যালিজম চাই" বলল, সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। এটা কি প্রহসন? এটা কি প্রবঞ্চনা ? না প্রহেলিকা ?

আমাদের শাসনতন্ত্রে আছে আমাদের সমাজতন্ত্র হবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। এ ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামো পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে রয়েছে, যেমন যুক্তরাজ্য, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশ। সোশ্যালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অথবা লেবার পার্টি নাম দিয়ে তাঁরা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কিছু কিছু ব্যবস্থা নিজেদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রবর্তন করেছেন। শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ একটা বিশেষ নীতি হলেও অন্ধের মত তা প্রয়োগ করা হয় না। এটা আমাদের বোঝা উচিত শিল্পোন্নত দেশে শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা কোন কঠিন কাজ নয়। শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে জনসাধারণের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া বেকারত্ব ও বার্ধক্যের জন্য ভাতার ব্যবস্থাও রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো কিন্তু এ ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্র বলবে না। এটা বস্তুতঃ ওয়েলফেয়ার স্টেটের প্রোগ্রাম এবং সেজন্যই এটা এখনও টিকে আছে, যদিও সবসময়ই সোশ্যালিস্ট ডেমোক্রাটিক পার্টি বা লেবার পার্টি এসব দেশের নির্বাচনে জয়ী হয়নি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো কিন্তু নির্বাচনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ভার নির্ধারিত প্রতিনিধিদের হাতে অর্পণ করতে রাজী নয়। সে নিয়ন্ত্রণভার থাকবে কম্যুনিস্ট পার্টির উপর। সেখানে ডিক্টেটরশীপ অফ দি প্রলেতারিয়েত-এর নামে পার্টি সবকিছু করছে।

একটা মজার কথা বলি ; হালে যুক্তরাজ্যে ল্যাণ্ড রিফর্মের আন্দোলন চলছে অর্থনীতিবিদদের মহলে। ক্যালডর সমেত ক্যামব্রিজের কিছু অর্থনীতিবিদ সুপারিশ করেছেন যে, সরকার সমস্ত ফ্রিহোল্ডকে ৯৯ বছরের লিজহোল্ড করে আইন প্রণয়ন করুন। এর ফলে জমির মূল্য নিয়ে স্পেকুলেশন কিছুটা রোধ করা সম্ভব হবে। এই প্রস্তাবের সমালোচনা একটি বাক্যে করা হয়েছে "ইট সুড অ্যালসো বি স্টিপুলেটেড দ্যাট দি লেবার গভর্নমেন্ট হুইচ উইল পাস দিজ ল' উইল রিমেইন ইন অফিস ফর দিজ ৯৯ ইয়ার।" তা সত্ত্বেও যেসব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সোশ্যালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিরোধী দল ক্ষমতায় এলেও তা পাল্টে যায় না। কারণ তারা সমাজে একটা গুরুতর সংঘর্ষ এড়াতে চায়।

বাংলাদেশের অবস্থা কি তাই? আমরা আমাদের জনশক্তির জন্য কর্ম সংস্থান করতে পারছি না, কর্ম সংস্থানের বৃদ্ধির জন্য অবসর গ্রহণের সময় কমিয়ে দিতে চাই। আমরা আমাদের সকল সম্পদ সমভাবে বণ্টন করে বছরে মাথাপিছু পাই মাত্র সত্তর ডলার। আমাদের সম্পদ যদি না বাড়ে, আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য কিভাবে বাড়বে তা আমি বুঝতে পারি না। সুতরাং আমি একথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আমাদের শাসক গোষ্ঠী যেমন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ অযোগ্য তেমন আমাদের পরিবেশও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। উপযুক্ত পরিবেশে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন সম্ভব হয় একমাত্র সোশ্যালিস্ট পার্টি দ্বারা। লুটতরাজ যেমন বাধাহীন চলছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের দাবী ও "শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার" শপথও সমান সমান চলছে। এখানে বলে রাখি, সেদিন কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রো বলেছেন যে, কিউবায় এখনো মার্কসইজম-এর সময় আসেনি।

পরিকল্পনা কমিশন সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে একটা ক্লাসরুম লেকচার দিয়েছেন, কিন্তু এটা কাকে দিয়েছেন বোঝা ভার। দেশের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশনের সোশ্যালিস্ট প্ল্যানিং করা উচিত ছিল। তাঁরা তা করেননি। সোশ্যালিস্ট প্ল্যানিং করতে হলে সোশ্যালিজম কি তা বলতে হবে এবং বাংলাদেশের সোশ্যালিজম কেমন হবে, তা-ও বলতে হবে। পাঁচ বছরে কতখানি করা যায় তাও নির্ধারিত করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন-এর কিছুই করেননি, তাঁদের শিক্ষার প্রোগ্রাম গতানুগতিক এবং অন্যান্য সেক্টরের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, এটা পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আর এক রূপ। বাংলাদেশের সোশ্যালিজম কি আমরা তা জানি না, অথচ সোশ্যালিজম সোশ্যালিজম বলে আমরা গলা ফাটাচ্ছি ; আমাদের মন্ত্রীরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পুরস্কার বিতরণী সভাতেও সোশ্যালিজম কায়েমের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন। সবচেয়ে মজার কথা, সেদিন কাগজে (বিরোধী দলীয় নয়) পড়লাম, অর্থমন্ত্রী সোশ্যালিজম কি সে সম্বন্ধে যেন আলোচনা করা না হয় সে অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণটা কিন্তু বোঝা গেল না ; পত্রিকায় তা বলা হয়নি। হতে পারে সরকারের তরফ থেকে বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রের একটা রূপরেখা আমরা শীগগিরই পাবো। এবং আমরা এটাও আশা করি ; শোষণহীন সমাজের একটা সংজ্ঞা সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। এখন তো শুধু শ্লোগান হিসাবে দেওয়া হচ্ছে।

আরেকটা শ্লোগান সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সেটা হল 'মুজিববাদ'। আমরা যারা সোশ্যালিজম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করেছি একথা জানি যে, সোশ্যালিস্ট দুনিয়ায় মার্কসিজম, লেনিনিজম, মা-ওইজম এমনকি টিটোইজম শব্দ ব্যবহার করা হয়। সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠা ও চালু রাখার ব্যাপারে এই শব্দের প্রত্যেকটির একটা অর্থ রয়েছে। এই সবের অর্থ বিভিন্ন বলে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভেদেরও সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'মুজিববাদ' কি, পরিকল্পনা কমিশন আমাদের জানাননি। পরিকল্পনা কমিশন 'মুজিববাদ' শব্দটি উপেক্ষা করে চুপ থাকতে পারেন না। প্রত্যেক বড় বড় রাজনৈতিক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব এই শ্লোগানটি দিয়ে থাকেন। আমি টেলিভিশন সেটের সামনে বসে বহুবার দেখেছি। কোনবার যে শতবার "মুজিববাদে আমাদের মুক্তি" এই শ্লোগানটি উচ্চারণ করেননি, আমি জানি না। সুতরাং 'মুজিববাদ' যদি বাংলাদেশের সোশ্যালিজমের রূপরেখা হয়, পরিকল্পনা কমিশনের উচিত ছিল সেটা বিশদভাবে আলোচনা করা। আমরা আমাদের দারুণ দুরবস্থার মধ্যে "মুজিববাদে আমাদের মুক্তি" এবং "আমরা সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করব" এই বিভ্রান্তিকর শ্লোগান শুনে শুনে মূঢ়, হতবাক হয়ে যাচ্ছি।

বিচিত্রার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সঠিক বিশ্লেষণ করতে গেলে সর্বপ্রথম সমগ্র বিষয়টিকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে নিতে হবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাথমিক এবং প্রধান বিষয়টি হচ্ছে খাদ্য পরিস্থিতি।

বাংলাদেশের খাদ্য ও সামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের হিসাব থেকে জানা যায় ১৯৭৪ সালের জন্যে মাথাপিছু গড়ে দৈনিক ১৫·৫ আউন্স হিসাবে খাদ্য (চাল এবং আটা) প্রয়োজন ১৩৪·০০ লক্ষ টন। আশা করা যায় দেশী উৎপাদন দাঁড়াবে ১২৮·০০ লক্ষ টন, যার মধ্যে খাদ্য হিসাবে পাওয়া যাবে ১০৬·০০ লক্ষ টন। সুতরাং সহজ হিসাব অনুসারে খাদ্য ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে ১৮·০০ লক্ষ টন। খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্যে ২২·০০ লক্ষ টন আমদানীর সিদ্ধান্ত রয়েছে যার মধ্যে ৫·০০ লক্ষ টন আগামীর জন্যে সংরক্ষণ করা হবে। অথচ এপ্রিল মাসের সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে আমদানী হয়েছে মাত্র ৩·৭৪ লক্ষ টন।

এপ্রিল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। তেরটি জেলায় সাধারণ চালের মূল্য

বেড়েছে। যদিও ৬টি জেলায় কিছু কমার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেটুকু কমেছে তাও অর্থনৈতিক কারণে বলে মনে হয় না বরং সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের শুভ পরিণতি মনে করা চলে।

দেশের সাধারণ চালের গড় সর্বনিম্ন খুচরা মূল্য মণপ্রতি টাকা ৪·১৩ বেড়ে ১২৭·০৯ টাকা দাঁড়িয়েছে। গত বছর মণ প্রতি মূল্য ছিল ৯৬·৮২ টাকা। মধ্যম ধরনের চাল ৯·৪১ টাকা থেকে বেড়ে ১৪০·০০ টাকা হয়েছে।

মূল্য পরিস্থিতি—

মাথা পিছু আয়তো নয়ই, হাইজ্যাক চোরাচালানী আর ব্যাংক লুট ছাড়া মানুষের আয় বাড়েনি। অথচ মূল্য বৃদ্ধি প্রলয় থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথই আমাদের অর্থনীতি করতে পারেনি। মানুষ মাত্রই যখন দুরবস্থায় পড়ে, তখন এ অবস্থার মোকাবিলা করতে সে এতই ব্যস্ত থাকে যে অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত দুরবস্থা যে কত গভীর ছিল তা বুঝতে পারে না। আমরা অর্থনীতির এ প্রলয় ঝড়ে এখনো প্রকাশ্যে কেউ বুঝতে পারছি না কি গভীর দুর্ভিক্ষে আমরা ভুগছি। যদি কোন দিন অর্থনীতির উন্নতি হয় সেদিন আজকের কথা ভেবে অবাক হবো যে আমরা কি নরক দুর্ভিক্ষের গ্রাসে দিন কাটিয়েছিলাম।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূল্য বৃদ্ধি ছাড়া প্রকৃত পক্ষে মূল্যহ্রাস বলে কোন শব্দ নেই। যা কিছু হ্রাস হয়েছে তা সাময়িক অথবা জোর করে—যার ফলে আবার তা বেড়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ সামরিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কথা অনুল্লেখই শ্রেয়।

আমরা ১ নং তালিকা থেকে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি দ্রব্যের ভয়ংকর মূল্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করতে পারি।

খাদ্য সমস্যাই যে দেশে এত প্রকট সে দেশের বাসস্থান সমস্যা না ভাবাই উচিত। শিক্ষা বা অন্যান্য সমস্যার প্রশ্নই ওঠে না।

মূল্য বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণের আয়তন এ প্রবন্ধের সীমানায় নেই। শুধু এটুকু বলা যায় মূল্য হ্রাস ঘটানো কোন জোর-জবরদস্তি ব্যাপার নয়, এটি একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে মূল্য হ্রাস ঘটাতে হলে সে পথেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মজুতদারী কালোবাজারীরা মূল্য বৃদ্ধির প্রথম বা প্রধান কারণ নয়। তারা মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে ঠিকই কিন্তু অত্যন্ত সাময়িক সময়ের জন্যে। দীর্ঘকালীন মূল্য বৃদ্ধি তাদের আয়ত্তের বাইরে

কেন না তারা এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সমুদ্রের মাছ মাত্র। সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাদের নেই।

মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে অর্থ বৃদ্ধি। অর্থ-বৃদ্ধির তালে তালে মিলিয়ে উৎপাদন বেড়ে চললে অর্থনীতির হয়তো কল্যাণই হয়। কিন্তু শুধু অর্থবৃদ্ধি ঘটলে সমস্ত অর্থনৈতিক কাঠামোতে তা ঘুনের মতই কাজ করে। বাংলাদেশের অর্থনীতি শুধু ঘুনেই ধরেনি সঙ্গে সঙ্গে চলছে পঁচনক্রিয়া—উৎপাদন হ্রাস বা বন্ধ। পঁচন আর ঘুন উভয়ই এ দারুণ দুর্ভিক্ষের মূল কারণ।

উৎপাদন হ্রাসের একটি অন্যতম উৎস হচ্ছে জাতীয়কৃত কারখানা। যেখানে প্রশাসন হয়েছে জরাগ্রস্ত। ব্যক্তিগত স্বার্থের পতাকা সেখানে সমুন্নত। অভিজ্ঞতা শূন্য। জাতীয়করণের মহান আদর্শ ধূলায় লুণ্ঠিত। তাই এসব প্রতিষ্ঠান একদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে অধিকতর ঋণ নিয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাচ্ছে অন্যদিকে উৎপাদন হ্রাস থেকে মূল্যমানকে বাড়িয়েছে আরও বেশী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মুদ্রা-বৃদ্ধি ঘটিয়েছে সরকার নীতি এবং প্রতিষ্ঠান-সমূহ, আর উৎপাদন কমিয়েছে সরকারী কলকারখানাসমূহ। সুতরাং মূল্য-বৃদ্ধির জন্যে একমাত্র সরকারী ব্যবস্থাই দায়ী। মুনাফাখোর বা মজুতদারী সেখানে মুখ্য নয়।

অনেকে যুক্তি দেখান যে কাঁচামালের অভাব এবং কার্যকরী চাহিদার' অভাবের জন্যে উৎপাদন হ্রাস হতে বাধ্য। এ যুক্তি ধোপে টেকে না এই জন্যে যে আমদানী প্রক্রিয়ার সরকারী অকার্যকারিতার জন্যেই কাঁচামালের এ অভাব।

অবশ্য আমাদের একথা স্বীকার করে নিতে হবেই যে জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানসমূহে ইদানিং কিছুটা উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। যদিও স্বাধীনতার পূর্বের তুলনায় তা নগণ্য

মুদ্রা পরিস্থিতি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস মুদ্রা বৃদ্ধির ইতিহাস। ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে মুদ্রা সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৮৭,৫০ কোটি টাকা সেখানে ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে প্রায় ৩০০% বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮২৭,২৭ কোটি টাকা। যেহেতু উৎপাদন বৃদ্ধি শূন্য (সামান্য উন্নতি ও গড় অবনতি যোগ বিয়োগ করতে গেলে উৎপাদন শূন্য) সেহেতু এই ৩০০% মুদ্রা-বৃদ্ধির ফল নিশ্চয় মূল্য বৃদ্ধি। যার নিদারুণ কষাঘাত পড়েছে সাধারণ মানুষের উপর। ১৯৬৯ সাল থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত গড় বাৎসরিক মুদ্রা বৃদ্ধির হার ছিল ২০% সেখানে স্বাধীনতার প্রথম বছর (১৯৭২-এর জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর) বৃদ্ধি পায় ৭০% এবং ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় ১০%।

মূল্যবৃদ্ধির কারণ সংক্রান্ত তালিকা

(কোটি টাকায়)

সময়	ব্যক্তিগত খাত	গণ খাত	সময় আমানত	সরকারী ফিসকাল কার্যকলাপ	বিদেশী খাত	বিবিধ খাত	মোট
জানুয়ারী ১৯৭৪	(—)৪'৭০	(—)৬'১৯	(—)১৯'৮৯	(+)২৯'৭১	(—)৮'৯৭	(+)১১'৮৯	(+)১'৭৫
ফেব্রুয়ারী ,,	(+)৩'৮০	(+)১১'৭৩	(+)৩'৫৬	(+)৪'৮১	(—)১০'৭৫	(—)১৪'৯৭	(—)১'৮৫
মার্চ ,,	(—)১'৫২	(+)০'১৫	(—)৩'৫৪	(+)১'৪৯	(+)১৯'১৬	(+)৪'৪৭	(+)২০'২১
এপ্রিল ,,	(+)১৯'৫	(+)০'৩৪	(—)৮'৭৫	(+)৯'২৩	(—)১৪'১০	(+)৯'৭৯	(—)১'৫৪
মোট	(—)০'৪৪	(+)৬'০৩	(—)২৮'৬২	(+)৪৫'২৪	(—)১৪'৬৯	(+)১১'১৮	(+)১৮'১৮

উৎসঃ 'বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন' ও সিলেকটেড ইকোনমিক ইনডিকেটর' থেকে।

মুদ্রা সরবরাহ তালিকা

সময়	মুদ্রা সংখ্যা (কোটি টাকার)	% বাৎসরিক মুদ্রা বৃদ্ধির পরিমাণ
১৯৬৯ জুন	৩৪'৩২	—
১৯৭০ ,,	৩৫৯'১০	৪'৯০
১৯৭১ ,,	৪৮১'০২	৩৩'৯৫
১৯৭২ ,,	৪৮৫'৭০	০'৯৫
১৯৭৩ ,,	৬৯৬'০৩	৪৩'৩০
১৯৭৪ জানুয়ারী	৮১০'১৫	
১৯৭৪ ফেব্রুয়ারী	৮০৮'৬০	
১৯৭৪ মার্চ	৮২৮'৮১	
১৯৭৪ এপ্রিল	৮২৭'২৭	
১৯৭৪ জুন	৮১৬'৭৮	
১৯৭৪ সেপ্টেম্বর	৮২০'৮৭	

উৎস : 'বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন' ও 'সিলেকটেড ইকোনমিক ইনডিকেটর' থেকে।

১৯৬৯ সালের অথবা তার পূর্বের বৃদ্ধির পিছনে কেনীসিয় মুদ্রা বৃদ্ধি এবং উন্নতির কোন আদর্শ হয়তো কিছুটা হলেও কাজ করেছিল কেননা তখন উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতো। স্বাধীনতার প্রথম বছর যুদ্ধ ক্লান্ত অর্থনীতির পুনর্জীবনের জন্যে হয়তো কিছুটা মুদ্রাবৃদ্ধি সয়ে নেওয়া যায় কিন্তু বর্তমানের এ মুদ্রাস্ফীতি যে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের ঘণ্টা ধ্বনি শোনাচ্ছে—এতে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১৮,৭১ কোটি টাকার যে মুদ্রা বৃদ্ধি ঘটেছে তার পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে সরকারী কার্যকলাপ। ৬'০৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি ঘটিয়েছে 'গণ-খাতা' এবং সরকারী ফিসকাল কার্য্যকলাপ এর কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫'২৪ কোটি টাকা। 'বিবিধ কারণ' ছাড়া অন্যান্য অর্থবৃদ্ধির কারণগুলির কোনটিই অর্থবৃদ্ধি তো ঘটায়নি উপরন্তু অর্থ সংকোচনে সাহায্য করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে অর্থ বৃদ্ধির মূল কারণ—সরকার।

উৎপাদন পরিস্থিতি

স্বাধীনতার পূর্বকালীন সংগ্রামে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সামগ্রিক উৎপাদন ব্যাহত এবং সংকোচিত হয়। তদানীন্তন সামরিক সরকার আত্মসমর্পণের পূর্বে অবশিষ্ট সব কিছু বিনষ্ট করে দেবার উদ্দেশ্যে বাদবাকী ক্ষতি করে।

	পরিমাণ	জানুয়ারী ১৯৭৩	জানুয়ারী ১৯৭৪	এপ্রিল ১৯৭৪	আগস্ট ১৯৭৪	সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
চাল (সাধারণ)	সের	২'১২	২'৮৭	৩'৮৭	৪'৭৪	৬'৫০
আটা	সের	১ ০০	১'১২	২'২৫	৩'০০	৪ ৫০
মশুর ডাল	সের	৩'০০	৬'০০	৫'০০	৫'৫০	৫'৫০
আলু	সের	০'৮৭	২'০০	১'৭৫	৩'০০	৩'০০
মাছ (রুই)	সের	৮'০০	১২'০০	১২'০০	১৬'০০	১৪'০০
মাংস	সের	৯'০০	১২'০১	১১'০০	১৪'০০	১৪'০
সরিষার তেল	সের	১৩ ০০	১৬'০০	২০'০০	৩০'০০	৩৬'০০
জ্বালানী কাঠ	মণ	১৪'০০	১৬'০০	১৭'০০	২০'০০	২০'০০
কেরোসিন	গ্যালন	৬'০০	৭'০০	৭'০০	৮'৭৫	৮'৫০
লংক্লথ	গজ	১২'০০	১৪'০০	১৪'০০	১৪'০০	১৪'০০
সাবান (কাপড় কাচা)	সের	৪'৫০	৬'০০	১২'০০	১২'০০	১৬'০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত "সিলেকটেট ইকোনমিক ইনডিকেটর" থেকে

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতিকারীদের সহযোগিতায় অনেকেই অবশিষ্ট কলকারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি চুরি করে বাকী শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাকে ধ্বংস করে।

একদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থা অন্যদিকে কলকারখানার কংকাল নিয়ে বাংলাদেশ জন্মগ্রহণ করে। আশা করা গিয়েছিল জাতীয়করণের ফলে দেশের এ দুরবস্থা লাঘব হবে। নতুন কলকারখানা গড়ে উঠবে, জাতীয়করণের সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে উঠবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থহীন মানসিকতা ও লোভ এবং প্রশাসনিক অযোগ্যতার ফলে উৎপাদন পূর্বের পর্যায়ে তো ফিরে আসেইনি, বরং কমে গেছে। একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির এ সরকারী অক্ষমতা অন্যদিকে সরকারী মুদ্রাস্ফীতির নীতি জন্ম দিয়েছে এক ভয়ংকর মূল্য-বৃদ্ধির দুর্যোগ।

আমরা উৎপাদন হ্রাসের একটি তালিকা পেশ করতে পারি। যেখানে সিগারেট, দেয়াশলাই ও চা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত তথ্যাদি জাতীয়কৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত। তালিকায় বিয়োগ চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে উৎপাদন ১৯৬৯-৭০-এর তুলনায় ১৯৭৩-৭৪-এ শতকরা কত ভাগ কমেছে এবং যোগ চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে কত ভাগ বেড়েছে। এ তালিকা লক্ষ্য করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো আমাদের উৎপাদন দুরবস্থা কোন্ স্তরের।

দ্রব্যাদি	একক	১৯৬৯-৭০-এর তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে উৎপাদনের % পরিবর্তন
পাটজাত দ্রব্য	টন	(−) ১৫
হেসিয়ান	,,	(−) ২৭
স্যাকিং	,,	(−) ২৪
অন্যান্য	,,	(+) ৮১
তুলাজাত কাপড়	হাজার গজ	(+) ৩২
তুলার সূতা	হাজার পাউণ্ড	(−) ১৪
কাগজ	টন	(−) ৪৩
নিউজপ্রিন্ট	টন	(−) ২৬

সিগারেট	লক্ষ কাঠি	(—) ৩৩
ম্যাচ	হাজার গ্রুস বাক্স	(—) ৫২
সিমেন্ট	টন	(—) ৩
স্টিল	টন	(+) ৩৬
ইউরিয়া	টন	(+) ১৯১
চিনি	টন	(—) ৫
পেট্রোলিয়ামজাত	----	(—) ৬২
চা	হাজার পাউণ্ড	(—) ৯

উৎস : প্লানিং কমিশনের নির্ধারিত অর্থনৈতিক নির্দেশক জুলাই ১৯৭৪ থেকে।

জীবনযাত্রা পরিস্থিতি—

ঢাকার মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ জীবনযাত্রার খরচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গত এপ্রিল মাসে তা ১১'০৯ পয়েন্ট (১৯৬৯-৭০-১০০) বেড়ে ২৭৮'২৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। খাদ্যের খরচ ১৬'০৯ পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ২৮৮'৯৫, আবাসিক খরচ ৫'১৮ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৫'১৩, বস্ত্র ও পাদুকায় ১৩'০২ পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ৩৮৯'১০। জ্বালানী ও আলো-কায়নের খরচ কমতে দেখা যায় ৬'১৩ পয়েন্ট, ফলে খরচ দাঁড়াচ্ছে ২৭৯'০০ পয়েন্ট। ২ নং তালিকায় এ সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করতে পারি।

ঢাকা শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাপনের খরচ

	১৯৫৫-৫৬ =১০০ হিসাবে	১৯৬৯-৭০ =১০০ হিসাবে
জানুয়ারী ১৯৭২	২০৮'৬২	
জুন ১৯৭২	২৪৪'৮০	
ডিসেম্বর ১৯৭২	৩১৬'৯৭	
জানুয়ারী ১৯৭৩	৩১৭'৮৫	
জুন ১৯৭৩	৩৬১'৪৬	
ডিসেম্বর ১৯৭৩	৪২৬'৪৩	২৪৪'২৯
জানুয়ারী ১৯৭৪	৪৩৪'৫৭	২৪৯'৬৩
মার্চ ১৯৭৪	৪৭০'৩৩	২৬৭'১৫
এপ্রিল ১৯৭৪	৪৮৭'৪৭	২৭৮'২৪
মে ১৯৭৪	—	২৮৪'৪৪
জুন ১৯৭৪	—	৩০৩'৭১
জুলাই-১৯৭৪	—	৩১৬'১০
আগস্ট ১৯৭৪	—	৩৫২'৩৮

উৎস : বাংলাদেশ বুর‍্যো অফ স্টাটিসটিক্স

বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতি—

বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্যে, বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ঘাটতি পূরণের কাজে আমদানীর জন্যে বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের একমাত্র পথ। আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের মুদ্রার কোন সম্মানও নেই, নেই স্বীকৃতি। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রা দিয়েই আমাদের কেনা-বেচা।

এই বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রায় সবটাই আসে পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে। ১৯৭৩-৭৪ সালে কাঁচা পাট থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ১১৫'০০ কোটি টাকার সমান। যেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে আয় হয়েছিল ১০৪'৭০ কোটি টাকা। আপাতঃ দৃষ্টিতে এ বছরের আয় যদিও গত ১৯৭২-৭৩-এর অর্থ বৎসরের চেয়ে বেশী কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে আদতে তা নয়। কেননা ইতিমধ্যে মুদ্রার মূল্যমান প্রকৃতপক্ষে কমে গেছে। সুতরাং এই ১১৫'০০ কোটি টাকা আর আগের বছরের ১১৫'০০ কোটি টাকা সমান নয়। বরং কম।

কাঁচা পাট দিয়ে ইতিমধ্যে আমাদের প্রকৃত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে ১০৮'৮১ কোটি টাকা ১৯৭৪ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত।

পাটজাত দ্রব্য থেকে ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বৎসরে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা নির্ণয় করা হয়েছে ১৬০'০০ কোটি টাকা। যেখানে ১৯৭২-৭৩ এ হয়েছিল ১৩৯'৫০ কোটি টাকা। ১৯৭৪ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত প্রকৃত আয় হয়েছে ১৮১'৬৫ কোটি টাকা। গত বছর ওই সমসাময়িক সময় অর্জিত হয়েছিল ১৬৯'৬৯ কোটি টাকা।

এছাড়া বৈদেশিক বাজারে চায়ের চাহিদা বাড়ছে বলে আশা করা যাচ্ছে। যাতে উল্লেখযোগ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আন্তর্জাতিক হিসাব বুলেটিনে দেখা যায় বৈদেশিক মুদ্রার ভয়ংকর ভাটার টান। প্রতি সপ্তাহে বৈদেশিক মুদ্রা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের আর কোনই স্থান থাকছে তো নাই, বরং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

সময়	পরিমাণ
ডিসেম্বর ১৯৭১	শূন্য
জুন ১৯৭২	১১০'৫০
ডিসেম্বর ১৯৭২	২১৬'৭১
জুন ১৯৭৩	১২৫'৩৪
সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	১৫১'৫১
ডিসেম্বর ১৯৭৩	১১৬'১৫
এপ্রিল ১৯৭৪	৬৬'৫৭
মে ১৯৭৪	৪৩'৫২
জুন ১৯৭৪	৯১'২৫
সেপ্টেম্বর ১৯৭৪	৪৪'৫২

উৎস: 'বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন' ও একই প্রতিষ্ঠানের 'সিলেকটেড ইকোনমিক ইনডিকেটার'।

অর্থের মান—

অর্থনীতিতে অর্থের মান হিসাব করা যায় দু'ভাবে। আভ্যন্তরীণ বাজারে ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর মূল্য কত এটাই হিসাব করে। আভ্যন্তরীণ বাজারে অর্থের মূল্য দুই তৃতীয়াংশ থেকে তিন চতুর্থাংশ কমে গেছে। অর্থাৎ পূর্বের এক টাকার মূল্য এখন ৩৫ পয়সা থেকে ২৫ পয়সায় ওঠানামা করছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার মান অত্যন্ত বেশী ওঠা-নামা করছে। ১৯৭২-৭৩ সালে এর অবস্থা খুবই সংগীন ছিল। সীমান্তে চোরাচালানী

এবং পুঁজি পাচারের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দিয়েছিল এ দারুণ দুরাবস্থা। এক ডলার সমান বাংলাদেশী টাকা ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ছিল ১১'৫০ টাকা, সেপ্টেম্বরে হয় ১৩'০০ টাকা, অক্টোবরে ১৫,০০ টাকা, ১৯৭৩-এর জানুয়ারীতে হয় ১৬'৫০ এবং মার্চে ১১'৪০ টাকা। ১৯৭৩ -এর জুলাই- আগস্টের পর থেকে টাকার এই দুরাবস্থা কিছুটা সুস্থতার দিকে যেতে আরম্ভ করে। অর্থনীতিবিদগণ এর কারণ আবিষ্কারে মগ্ন হন এবং দেখতে পান আমন ফসল ভাল হওয়ায় সীমান্তের ওপারে যে বিপুল পরিমাণ চাল পাচার হয়ে যায় তারই ফলশ্রুতি হিসাবে টাকার মানের এ উন্নতি।

আমরা সম্পূর্ণ তথ্য নীচের তালিকা থেকে পাবো। এতে ভারতীয় মুদ্রার সঙ্গে দেশীয় মুদ্রার তুলনাও দেখানো হয়েছে।

তারিখ	এক ডলার সমান বাংলাদেশী টাকা	ভারতীয় একশত টাকা সমান বাংলাদেশী টাকা
জুলাই ১৯৭২	১১'৫০	১০৯'৫২
অক্টোবর ১৯৭২	১৫'০০	১৫৬'২৫
জানুয়ারী ১৯৭৩	১৬'৫০	১৬৫'০০
এপ্রিল ১৯৭৩	১৩'০০	১৪৪'৪৪
জুলাই ১৯৭৩	১৪'৮০	১৭১'৬৯
অক্টোবর ১৯৭৩	১১'২০	১২৭'২৭
ডিসেম্বর ১৯৭৩	১১'৪০	১২০'০০

উৎস: ডলারের হিসাবটি 'নিউজউইক' থেকে। ভারতীয় মুদ্রার মান ওই একই পত্রিকায় প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে হিসাব করে বের করা।

মোট জাতীয় উৎপাদন, মুদ্রাস্ফীতি এবং সামগ্রিক উন্নয়ন পরিস্থিতি

ডা: এ. এম. এ. রহিম মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত [১] এক প্রবন্ধে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি মেপেছেন মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) তথ্যাদি

থেকে। ১৯৬৯-৭০ সালে মোট জিডিপি ছিল ২৯২১৬ মিলিয়ন টাকা পরিমাণ ১৯৭২-৭৩ সালে ওই উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালের মূল্যমান দিয়ে হিসাব করলে দাঁড়ায় ২৫৫৭৩ মিলিয়ন টাকা। প্রায় ১৪% অধঃপাত। ১৯৭২-৭৩ সালের মূল্যমানে ১৯৭২-৭৩-এর মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হয় ৫১.৩৬৩ মিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ ওই সময় ব্যবধানে প্রায় ১০০% মূল্যমান বৃদ্ধি পেয়েছিল। ডঃ রহিম লেখেন মুদ্রা বৃদ্ধি যদি শূন্যও থাকতো তবুও ওই সময় মূল্যমান ১৪% বাড়তো। মুদ্রাবৃদ্ধি ১৯৭৩-এর আগস্ট পর্যন্ত বেড়েছে ৮৩% তার সঙ্গে দ্রব্যাদির উৎপাদন কমেছে ১৪% সুতরাং অর্থনীতিবিদরা মনে করেন মূল্য বৃদ্ধি পাবে ওই সময়ে ১০৯%।

*(বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিনে প্রকাশিত প্রবন্ধ, 'সাম আসপেক্ট অফ ইনফ্লাশন থিওরীজ ইন দি কনটেক্সট অব বাংলাদেশ।)

মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন

(১৯৫৯-৬০ সালের মূল্য অনুসারে)

বছর	জিডিপি (মিলিয়ন টাকা)	মাথা পিছু জিডিপি (টাকা)
১৯৪৯-৫০	১২৩৭৪	২৯৩
১৯৬৬-৬৭	১৮৭৩৪	২৯০
১৯৬৯-৭০	২২৩১৭	৩১৬
১৯৭২-৭৩	১৯৫৩৫*	—

উৎস : জনাব অজিজুর রহমান খানের 'দি ইকোনমী অব বাংলাদেশ বই থেকে। তারকা চিহ্নটি হিসাব করে দেওয়া।...

এক দিকে মুদ্রাস্ফীতির এই বিরাট চাপ অন্যদিকে জিডিপির এই ক্রমাবনতির ফলে মাথাপিছু আয় নির্ঘাত আরও কমে যাচ্ছে। ওদিকে জনসংখ্যাও বেড়ে চলেছে দ্রুত। সুতরাং স্বাধীনতা থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে ক্ষয়িভূত হচ্ছে, জন্ম দিচ্ছে মহামারী দুর্ভিক্ষ এবং হিসাব অনুসারে বন্যা ও যুদ্ধ। বাংলাদেশের যে-কোন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ আসলে উন্নয়নের বিশ্লেষণ নয় বরং ভয়ংকর মনন্তরের বিশ্লেষণ।

সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় মতামত

মঞ্চে-নেপথ্যে

মন্ত্রী বলিয়াছেন, বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী মাথাপিছু আনুমানিক আয় ৫৮০ টাকা। কিন্তু সংগে সঙ্গেই তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহাকে চূড়ান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না, কারণ বর্তমান দ্রব্যমূল্য অস্থায়ী। কাজেই বর্তমান বাজারদর অনুসারে মাথাপিছু আয়, (যাহা মোট জাতীয় উৎপাদনকে সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে), ৫৮০ টাকা দেখানো হইয়া থাকিলেও ১৯৬৯-৭০ সালের বাজারদর অনুসারে ইহা দাঁড়ায় ৩৬৪ টাকা।

অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন, উনসত্তর-সত্তর সালের মূল্যমানের হিসাবে মাথাপিছু আয় বাড়ে নাই। তবে কি উহা সমান সমান রহিয়াছে? নাকি উনসত্তর-সত্তরের তুলনায় কমিয়াছে? প্রশ্নোত্তরে সে বিষয়টা খোলাসা হয় নাই।

তবু নানা প্রশ্ন থাকিয়া যায়। মাথাপিছু আয় ত বুঝা গেল। কিন্তু যে "মাথা"-র দিয়া সাকুল্য জাতীয় উৎপাদনকে ভাগ করিয়া এই মাথাপিছু আয়ের অংক বাহির করা হইয়াছে সেই "মাথা"-র প্রকৃত সংখ্যা কত? বার বৎসর মাথাগুণতি হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা কত বাড়িয়াছে তাহা না জানা থাকিলে, যত উর্বর মাথাই খাটানো যাক, মাথাপিছু আয় কি করিয়া বুঝা যাইবে?

জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কেও প্রশ্ন আছে। অর্থমন্ত্রী তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ১৯৬৯-৭৫ সালের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে উৎপাদন শতকরা ১৫ (পনর) ভাগ হ্রাস পাইয়াছে এবং অনেকগুলি প্রধান শিল্পের উৎপাদন আরও বেশী (তাঁর ভাষায় উল্লেখযোগ্যভাবে) হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু উৎপাদন কি মাত্র এইটুকুই হ্রাস পাইয়াছে? চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রধান ত ভিন্ন কথা বলেন; গত মার্চের শেষ দিকে তিনি যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, পাট ও বস্ত্রের ন্যায় মুখ্য শিল্পগুলি উহাদের উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকও অতিক্রম করিতে পারে নাই, বরং উৎপাদনের দ্রুত অবনতিই ঘটিয়াছে।

কাজেই যে দুইটা ফ্যাক্টার ধরিয়া মাথাপিছু আয় বাহির করা হইয়াছে, তাহার একটা সম্পর্কেও নির্ভরযোগ্য ও টাটকা তথ্য পরিসংখ্যান হাতে নাই। আমরা নিশ্চয় করিয়া জানি না, জনসংখ্যা কত এবং বিভিন্ন সেক্টরে জাতীয় উৎপাদন কত। উহা না জানা পর্যন্ত যত মাথা খাটাইয়া যত তথ্যই তৈয়ার করা যাক, তাহার উপর নির্ভর করা চলে না।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় জুন ২৩, ১৯৭৩

মঞ্চে-নেপথ্যে

কল্পনা করুন, একটা ট্রেনের দুই প্রান্তে দুইটা এঞ্জিন লাগানো। সমান অশ্বশক্তি সম্পন্ন উভয় এঞ্জিন। একই সংগে সমান শক্তিতে দুই এঞ্জিনই দিল বিপরীত দিকে টান। অবস্থাটা কি দাঁড়াইতে পারে, কল্পনা করুন।

প্ল্যানিং-কমিশন বলিয়াছেন, জিনিসপত্রের দাম একশ' হইতে চারশ' পার্সেন্ট বাড়িয়াছে। খাদ্য শস্যের দাম বাড়িয়াছে দেড়শ' পার্সেন্ট। এই অগ্নিমূল্য কমাইবার জন্য চেষ্টার বিরাম নাই। তাহারা অনেক জিনিসের দাম কন্ট্রোল করিয়াছেন। দোকানদারদিগকে মূল্য তালিকা টাঙ্গাইবার হুকুম দিয়াছেন। ক্রেতাদের পরামর্শ দিয়াছেন বেশী দাম না দিতে। অপরিহার্য ভোগ্যপণ্য ও শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণের জন্য চলতি পিরিয়ডে ২১৫ কোটি টাকার পণ্য সামগ্রী আমদানীর কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, 'কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের দাম আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই আশাতীতভাবে কমিয়া যাইবে। - - -।

ইতিপূর্বেও একাধিকবার আমরা বলিয়াছি যে, মূল্যমান স্থিতিশীল করিতে না পারিলে সরকার যতই চমৎকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করুন না কেন, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইবে না। বার্ষিক ইকনমিক গ্রোথ বা উন্নয়ন মাত্রা যাহাই স্থির করা হউক, তাহা অর্জিত হইবে না। মূল্যমান বৃদ্ধি বা টাকার মূল্য হ্রাসের দরুন উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয়ও বাড়িতে থাকিবে। বরাদ্দকৃত অর্থে তখন কুলাইবে না। তদবস্থায় হয় প্রকল্প ছাটকাট করিতে হইবে, উহার আকার-আকৃতি ক্ষুদ্রতর করিতে হইবে, নচেৎ ডেফিসিট ফাইনান্সিং বা নূতন নোট ইস্যু করিয়া প্রকল্পের কাজ চালু রাখিতে হইবে। প্ল্যানিং কমিশনের মতে, লিবারেশনের পর ১৫ মাসে মানিসাপ্লাই এমনিতেই বাড়িয়াছে শতকরা ৮৩ ভাগ। ডেফিসিট ফাইনান্সিং চালাইয়া সরকারী ব্যয় নির্বাহ করিতে গেলে মুদ্রাস্ফীতি আরও তীব্র হইবে, জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়িবে এবং মানুষের দুর্ভোগের কোন সীমা-পরিসীমা থাকিবে না।

....ইতিমধ্যে কতিপয় ভোজ্য ও ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সরকারী আদেশ সেই আশাকে দুরাশায় পরিণত করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। সরকারের এই মূল্য বৃদ্ধির আদেশ যেন বাজারে দ্রব্য মূল্যের আগুনে পেট্রোল ঢালিয়া দিয়াছে। ইহার লেলিহান শিখা এখন সামনে যা পাইতেছে তাহাই গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত মঙ্গলবার সংসদে বাজেট বিতর্কে

জনাব মঈনুল হোসেন বলিয়াছেন, 'বাজারের উপর সরকারের কর্তৃত্ব নাই।' কথাটা সর্বাংশে সত্য।....

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় জুলাই ৬, ১৯৭৩

মঞ্চে-নেপথ্যে

....আমাদের স্ববিরোধিতাকে আমরা একটা ট্রেনের দুই প্রান্তে দুইটা ইঞ্জিন লাগাইয়া সমপরিমাণ শক্তিতে বিপরীত দিকে টানার সংগে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, উহার দ্বারা পথ আগায় না, বরং বিপরীত দিকে টানাটানিতে হয় ট্রেনটি ছিড়ে, না হয় উহা লাইনচ্যুত হইয়া যায়। প্রশাসনের ঐসব স্ববিরোধী নীতিতেও কোন সুফল অর্জিত হয় না, বরং উহা দ্বারা সমস্যা অধিকতর জটিল করিয়া তোলা হয় এবং জনসাধারণকে গভীরতর হতাশার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের এক সহযোগীও সম্প্রতি লিখিয়াছেন, "মনে হয় সরকার নিজেই নিজের সবুজ বিপ্লবের ঘোষণাটিকে একটি কাগজে ঘোষণায় রূপান্তরিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।"

এমনিতে কথাটা শুনিতে অদ্ভুত লাগে। সরকার নিজেই নিজের বিঘোষিত সবুজ বিপ্লবকে অসার করিয়া তুলিতেছেন, এ কেমন কথা? কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, অতিশয়োক্তি নাই।...।

দুঃখের বিষয়, অমন গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন সহায়ক জিনিসটির ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা নিদারুণভাবে পশ্চাদপদ। ১৯৭১-৭২ সালে ফার্টিলাইজারের ব্যবহার আগের বৎসরের তুলনায় প্রায় ৬৪ হাজার টন হ্রাস পাইয়া ২ লক্ষ ৪১ হাজার টনে দাঁড়ায়। ১৯৭২-৭৩ সালে নাকি প্রায় তিন লক্ষ টন ফার্টিলাইজার ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতি একরে ন্যূনতম ডোজ ২ মণ হারে হিসাব করিলে উহার দ্বারা বড়জোর আটত্রিশ লাখ একর জমির সর্বনিম্ন চাহিদা মিটানো সক্ষম হইয়াছে। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ আবাদী জমি পরিমাণের দিক দিয়া গত অর্থবৎসর ও এ বৎসরের আমদানীর মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য না থাকিলেও খাদ্য বহির্ভূত আমদানীর খাতে ৫৪০ কোটি অর্থাৎ আগের বছরের চেয়ে শতেক কোটি টাকা অতিরিক্ত ধরা হইয়াছে। বৎসরের প্রথমার্ধে অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর শিপিং পিরিয়ডে নন-ফুড আমদানীর জন্য যদি ইহার অন্ততঃ অর্ধেক টাকা ধার্য করা হইত, তবে চাহিদা পুরাপুরি না মিটিলেও পরিস্থিতি কিছুটা সহজ হইয়া আসিত। কিন্তু শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ও খাদ্য বহির্ভূত পণ্য আমদানীর জন্য এই পিরিয়ডে মোট

ধার্য করা হইয়াছে মাত্র ২১৫ কোটি টাকা। তারও মধ্যে মাত্র ৬৯ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা রাখা হইয়াছে ভোগ্যপণ্য খাতে, আমদানীর জন্য। আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, আন্তর্জাতিক মূল্যমানের প্রেক্ষিতে এই ২১৫ কোটি টাকা পরিমাণ টাকার আমদানী দ্বারা শিল্পের পঞ্জীভূত তাই কতটা মিটানো যাইবে, আর জনসাধারণের বহুদিনের জমিয়া উঠা অভাব ও প্রয়োজনই কতটা পুরা করা যাইবে। তদুপরি আমদানীকৃত জিনিস পাচারের দিকটা ত আছেই।-----।

রিলিফের মালপত্র লইয়া যে কেলেঙ্কারী ঘটিয়া গেল, তাহার পরও যদি সরকার ঐরূপ কোন অভিনব কার্যক্রম গ্রহণ করিতে যান, তবে সেটা আর সাধারণ কেলেঙ্কারী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। কেলেঙ্কারির স্তর অতিক্রম করিয়া উহা আত্মহনন ও আত্মবিনাশের পর্যায়ে পৌঁছিবে। ভুলের ফসল অনেক জমিয়া উঠিয়াছে।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় জুলাই ১০, ১৯৭৩

গ্যাংগ্রিন মলমে-প্রলেপে সারেনা

...প্ল্যানিং কমিশন, অর্থমন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প দফতর ও বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের বিজ্ঞ কর্তাব্যক্তিগণ যা-খুশি বলুন, আমরা আজ পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ সহকারে প্রধানমন্ত্রীকে সোজাসুজি এই কথাই বলিতে চাই যে, দেশের অর্থনীতি কার্যতঃ ধসিয়া পড়িয়াছে।

...আজ আমরা এমনি এক সংকীর্ণ গিরিপথের উপর দণ্ডায়মান যাহার নীচে গভীর খাদ আর উপরে উঁচু পাহাড়। এই বিপদসঙ্কুল 'প্রিসিপিস' হইতে আমাদের সর্বাগ্রে কোনভাবে বাহির হইয়া আসিতে হইবে। এখন আর এক্সপেরিমেন্টেশনের অবকাশ নাই। এজেন্সিগিরি বাতিল করি, বিদেশে অর্থ সম্পদ পাচারকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করি, এবং কোটি কোটি টাকা মূল্যের যেসব পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বেআইনী দখলে রহিয়াছে সেগুলি উদ্ধার করিয়া উপযুক্ত কাজে লাগাই বা ডিস-ইনভেস্টমেন্ট করি তবে এই সর্বমুখী অর্থনৈতিক সঙ্কট এতটা তীব্র থাকিবে না, থাকিতে পারে না।

...আমাদের শেষ কথা এই যে, গ্যাংগ্রিন এমনি এক মারাত্মক ব্যাধি যাহা কোন মালিশে-মলমে-প্রলেপে সারে না। আজ জাতীয় অর্থনীতিকে তথা জাতিকে বাঁচাইবার প্রয়োজনে যাহাই করিতে হয়, তাহাতে দ্বিধা সংকোচ করিলে চলিবে না।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় বৈশাখ ৫, ১৩৮১

মঞ্চে-নেপথ্যে

...ডঃ মাযহারুল হক তাঁহার জীবনের সর্বশেষ একটি ভাষণে বলিয়াছিলেন, "আমার জীবন প্রদীপের শিখা আজ নিবু নিবু। তাই যাবার আগে আমার বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিবেক দিয়ে যা উপলব্ধি করছি তার কিছুটা বলে যেতে চাই"। তিনি বলিয়াছিলেন, "মুক্তির আগে যাঁদের হাতে সঞ্চিত সম্পদ উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং রোজগার অর্জনে ব্যবহৃত হোত, এখন তা লুটেরাদের দখলে রয়েছে।"

...আজ আমরা শুনিতে পাই, কালোটাকার পরিমাণ ছয়শত কোটিতে উঠিয়াছে। কোন কোন মন্ত্রীর মুখেও আমরা শুনি যে, 'প্রভাবশালী লোকেরাও' কেহ কেহ বিদেশে সম্পদ পাচারে লিপ্ত। অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন, দেশের অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম। অপর একজন মন্ত্রী অল্পদিন হয় বলিয়াছেন, 'দেশ আজ এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সম্মুখীন। মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তবহির্ভূত, অর্থনীতি চরম সঙ্কটাপন্ন। শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন শুধু ব্যাহতই নয়, প্রাক-স্বাধীনতা আমলের সর্বনিম্ন উৎপাদনহারের চেয়েও অনেক কম। মূলধন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত এবং তা উৎপাদনমূলক কোন কাজে লাগিতেছে না। ফলে গরীব আরও গরীব এবং ধনিক আরও ধনী হইতেছে। এসবের মধ্য দিয়া কি হকের উক্তির অকাট্য সত্যতাই ফুটিয়া উঠিতেছে না?

আজ আমরা সরকারী সূত্রেই জানিতে পারি, গত দুই আড়াই বছরে টাকার যোগান ২১৫ পার্সেন্ট বাড়িয়াছে। আমরা জানিতে পাই, সরকার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও সরকারী কর্পোরেশনগুলির ধার-দেনার পরিমাণ এরইমধ্যে সাড়ে সাত শত কোটি টাকার উপর উঠিয়াছে। শুধু সরকারী শিল্প ও কর্পোরেশনসমূহেরই দেনা ৪০০ কোটি টাকার উপর। কেবল পাট শিল্পেরই ধার পৌণে দুইশত কোটি টাকা। এবারের প্রায় ত্রিশ কোটি লইয়া পাটকলগুলি আড়াই বছরে লস দিয়াছে প্রায় শতেক কোটি টাকা। নোট ছাপাইয়া এইসব একটানা লস ও ডেফিসিট মিটাইতে হইতেছে। বস্তুতঃ গোটা অর্থনীতিই হইয়া দাঁড়াইয়াছে 'ভর্তুকী অর্থনীতি।' দ্রব্যমূল্য ইতিমধ্যে বাড়িয়াছে চারশ হইতে আটশ পার্সেন্ট পর্যন্ত। খাদ্যের দাম কোথাও কোথাও আড়াই বৎসর পূর্বেকার তুলনায় পাঁচশ' পার্সেন্টের উর্ধ্বে উঠিয়াছে। টাকার দাম ১৯৪৯ সালের অনুপাতে নামিয়াছে গড়পড়তা সাত পয়সায়। টাকার এই মূল্যাবনতি ও বর্তমান দ্রব্যমূল্য ধর্তব্যে না-লইয়াও দেখা যায় ১৯৬৯-৭০ সালের মাথাপিছু ৪২২ টাকা আয়ের তুলনায় ৭২,৭৩ সালে উহা নামিয়াছে ৩৪০ টাকায়; ৭৩-৭৪ সালে আরও নিম্নে এবং মানুষের প্রকৃত আয় এই-ভাবে প্রতিদিন কর্পূরের মত উবিয়া যাইতেছে। বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল, আই-এম-এফ হইতে কর্জকরা ৬০ কোটি টাকা বাদ দিলে, নাকি প্রায় শূন্যের কোঠায়। বিদেশী মুদ্রার অভাবে পণ্য আমদানীর এল. সি. খোলার অসুবিধা দাঁড়ায়। মালের জাহাজ ভাড়া পরিশোধে সমস্যা দেখা দেয়।

...ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা, বছরের শেষ নাগাদ রফতানীলক্ষ্যের চেয়ে প্রকৃত রফতানীতে অন্ততঃ ৪০ কোটি টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। অর্থো-পার্জনের নিরিখে এই ঘাটতির চেয়েও পণ্য রফতানীর পরিমাণগত ঘাটতি গুরুতর। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তি মোতাবেক নিরূপিত সময়ের মধ্যে মাল চালান দিতে না-পারায় প্রচুর পেনালটি দিতে হইবে এবং তাহা দিতে হইবে বৈদেশিক মুদ্রায়। শুধু তাহাই নয়, পণ্য সরবরাহে ব্যর্থতার দরুন অনেক চিরাচরিত বাজার আমাদের হারাইতে হইতেছে এবং সেই বাজার অন্যে দখল করিয়া লইতেছে। ওয়াকিফহালরা বলিয়াছেন যে, চলতি বছরের প্রথম নয় মাসেই ট্রেড ব্যালান্সে ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে ১২৬ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। বছরের শেষ নাগাদ ক্রেডিট পার্চেজের বিরাট অঙ্কগুলি ধরিয়া ঘাটতি হয়ত দুই শত কোটি টাকা ছাড়াইয়া যাইবে। বৈদেশিক সাহায্য যাহা আশা করা গিয়াছিল তার অর্ধেকও আসে নাই। আভ্যন্তরীণ রাজস্বখাতে এস্টিমেটের চেয়ে প্রকৃত আয় দেড় শত কোটি টাকার মত কম। অথচ প্রশাসনিক ও অন্য-বিধ ব্যয় বাড়িয়াছে অন্ততঃ একশত কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী স্বয়ং বিপুল রাজস্ব ঘাটতির কথা উল্লেখ করিয়া গত ২৯শে মার্চ বলেন যে, বিদেশী সাহায্য যদি সবটাও পাওয়া যায় তবু উন্নয়ন-কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হইবে না। সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন-মন্ত্রী ৩০শে মার্চ বলিয়াছেন যে, দেশের ২ কোটি কৃষি-নির্ভর শ্রমিকের মধ্যে ৭০ লক্ষ পুরাপুরি বেকার। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও পুঁজি-বিনিয়োগ থামিয়া থাকায় এবং বেসরকারী শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র গুরুতরভাবে সঙ্কুচিত হওয়ায় শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যাও রীতিমত ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। সূচীভেদ্য হতাশার অন্ধকারে বাঁচার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাদের অনেকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতার সর্বনাশা পথে পা বাড়াইতেছে। এই সকল পরিস্থিতি অর্থনীতিবিদ ও প্ল্যানারদের অগ্রেই ভাবা উচিত ছিল। যাঁরা তা করেন নাই আজ তাঁরা রাজনৈতিক সরকারের উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া বলিতেছেন, আমরা প্ল্যানার—গণক নই।

ডঃ মাযহারুল হক তাঁর জীবনের শেষ রচনা ও বক্তৃতাগুলিতে বার বার ওয়ার্নিং দিয়াছিলেন যে, এই ধরনের এক সর্বমুখী সঙ্কট আসিতেছে। সর্বশেষ ভাষণটিতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ বিপর্যস্ত। এভাবে আর কিছুদিন চলিলে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হইবে। সরকার চালিত কোন কাগজ কিছু দিন আগে খবর দিয়াছিলেন যে, দেশের বহুমুখী অর্থনৈতিক সঙ্কট মোচনের জন্য 'সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা' অবলম্বিত হইতে যাইতেছে কিন্তু কোথায় সেসব সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা? রোগীর যে এদিকে নাভিশ্বাস। সরকারী অর্থনীতিবিদরা কি এখনও মার্ক-টাইম করিতে থাকিবেন? এখনও কি তাঁরা সরকারকে সত্যনিষ্ঠ পরামর্শ দিবেন না?

ডঃ মাযহারুল হকের ন্যায় অর্থনীতিবিশারদের উপর্যুপরি সতর্কবাণী সত্ত্বেও সর্বনাশের ব্যবস্থা করিতে কোন দিক দিয়াই আমরা কম করিনি। আমাদের দুর্লভ মুদ্রা অর্জনকারী মুখ্য পণ্যগুলিকে আমরা বার্টার বা বিনিময়ের সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছি। উহার পরিবর্তে আমরা নিম্নমানের জিনিস আনিতেছি এবং তাহাও অতি উচ্চমূল্যে। কোন কোন ক্ষেত্রে বার্টারে আমাদের জিনিস নিয়া অপরে তাহা বিশ্ব-বাজারে পুনঃরফতানী করিয়া প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা কামাইতেছে। কিন্তু আমরা যেহেতু বার্টারের শাতপাকে বাঁধা, সেইহেতু, সেই দুর্লভ মুদ্রা অর্জনের সুযোগ হইতে তৎপরিমানে বঞ্চিত চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স বিনিময় বাণিজ্য বিলোপের দাবী করিয়াছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে আজও কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

চা-আমাদের একটি মুখ্য রফতানী পণ্য। বিশ্বে এর চাহিদা বিপুল। কিন্তু চা-কেও আমরা বার্টারের সামগ্রী করিয়া রাখার বিপুল আন্তর্জাতিক চাহিদা ও উচ্চমূল্যের সুযোগ হইতে বঞ্চিত।

বেড়ার আগুন চালে ধরিতেছে, বেণীর আগুন হাতে লাগিতেছে। তবু আমরা যেন কিসের নেশায় বুঁদ হইয়া রহিয়াছি। আমরা জাগ্রত থাকিয়াও ঘুমন্ত, নির্বিকার। ডঃ মাযহারুল হক মাঝে মাঝে সবল ঝাঁকুনি দিয়া আমাদের সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিতেন। তিনিও চলিয়া গেলেন। কে আর আমাদিগকে সবল হাতে নাড়া দিয়া বলিবে: তীব্র বেগে তোমরা রসাতলে ধাইয়া চলিয়াছ।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় জ্যৈষ্ঠ ১৪, ১৩৮১

মঞ্চে-নেপথ্যে

দেশের সামনে অসংখ্য প্রাণান্তকর সমস্যা। এসব সমস্যার পাহাড় দিন দিন বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। রাজধানী শহরে বসিয়া এসব বোঝা যায় না। এ যেন এক আলাদা জগৎ। টাকা নয় তো যেন উড়ো খৈ। যাহারা টাকা ধরার কৌশল জানে, হাত বাড়াইলেই তাহাদের মুঠি মুঠি টাকা। ডালির পর ডালি ভরিয়া শেষ করিতে পারে না। এখানে সিনেমা হলে টিকিট দুষ্প্রাপ্য। প্রায়ই 'হাউস ফুল।' চীনা রেস্টুরেন্টে ভিড়ের জন্য ঢোকা দায়। আগে হইতে টেবিল রিজার্ভ-না-করিলে জায়গা পাওয়া দুষ্কর। বিলাসদ্রব্যের বিপণীতে আগের চেয়েও বেশী ভিড়। ক্রমবর্ধমান ভিড় জুয়েলারির দোকানেও। বারশ' টাকা সোনার ভরি হউক, তাতেই কি? প্যারিসের একটা 'শ্যানেলফাইভ' সুগন্ধি সাত-আটশ' টাকায় কিনিবার খদ্দেরের অভাব হয় না। একটা 'ইন্টিমেট' পার্ফ্যুম আড়াইশ' টাকা। একটা 'দ্যাটম্যান' আফ্টার-শেভ লোশন তিনশ' টাকা। এক শিশি 'ব্রুট' অ-দ্য কোলন পাঁচশ' টাকা। কিনিবার লোকের অভাব নাই। এক কেক্ 'ইম্পিরিয়াল ল্যাদার' গায়ে-মাখা সাবান পঁয়তাল্লিশ টাকা। একটা 'উডবেরি' সাবান পঁয়ত্রিশ টাকা। এক ক্যান 'এভিট' হেয়ার স্প্রে দেড়শ' টাকা। তালিকা আর কত বাড়াইব? সেদিন স্বচক্ষে দেখিলাম, দুইটি চৌদ্দ-পনের বছরের নাকে দুধ-গলা ছেলে আয়েশ করিয়া ডানহিল সিগারেট ফুঁকিতেছে। এক প্যাকেট ডানহিলের দাম, শুনিতে পাই, বিশ-বাইশ টাকা। সিগারেটের একটা 'রন্সন' গ্যাসলাইটার দুই আড়াইশ' টাকা। এসব দামী বিদেশী সিগারেট ও সিগারেট লাইটার শহরে বড়লোকদের পকেটে পকেটে। জনিওয়াকার হুইস্কির বোতল নাকি আড়াইশ' টাকা ছাড়াইয়া তিনশ' ছুঁই-ছুঁই করিতেছে। তবু ক্লাব ও বারের ব্যাকডোরে তৃষিত ক্রেতার অভাব নাই। কেরুর 'জিন'-এর বোতলও নাকি প্রায় শতেক টাকা।

এসব দেখিয়া আমার চক্ষু চড়কগাছ হইলে কি হইবে, কাঁচা পয়সাওয়ালারা নির্বিকার। নগরে-বন্দরে অঢেল পয়সার এমনিই ছড়াছড়ি। বৎসরকাল আগে লিখিয়াছিলাম, এমন দিন বোধ হয় শীগগিরই আসিতেছে যখন পাঁচ টাকার নোটই হইয়া দাঁড়াইবে সর্বনিম্ন ডিনোমিনেশনের কারেন্সি নোট। কিন্তু এখন আমার ধারণা পাল্টাইয়াছে। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতের নগরে বন্দরে পাঁচ টাকার নোটও বিনিময়ের মাধ্যম আর থাকিবে না। কারণ এক শ্রেণীর শহুরে লোক এখনই একটাকা পাঁচ টাকার নোটকে কোন টাকা

বলিয়াই গণ্য করে না। জানি না, তাহাদের কাছে টাকার টেকশাল আছে, না সোনার খনি। তাহারা, বোধ করি, 'সোনার বাংলা' গড়ার জন্য তাহাদের অপরিমিত সঞ্চয়কে স্বর্গে রূপান্তরিত করিতেছে। তাই সোনার ভরি বারশ' টাকা। অনেকে নাকি দেশী টাকার অঙ্কে হিসাব-কিতাব করাই ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহারা হিসাব করে ডলার বা পাউণ্ডের অঙ্কে। 'সোনার ছেলে' গড়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার অনেকে নাকি ফ্যামিলি-ফরযন্দ বিলাতে ট্রান্স-ফার করিয়া সন্তান-সন্ততিকে সেখানেই মানুষ করিতেছে। এবং তাহাদের আশ্রয় সংস্থানের জন্য লণ্ডনে বাড়ীও কিনিতেছে। সত্যি, 'সোনার বাংলা' গড়ার কী অপূর্ব সাধনা!

এসব যখন দেখি বা শুনি তখন ভাবিয়া পাই না, আমরা কোথায় আছি। শহরে-নগরে কাঁচা পয়সার এই ঝনঝনানি কানে তালা লাগাইয়া দেয়। এই বিলাস, এই বৈভব চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়। দেশে নাকি অনাহারে মানুষ মরে। অথচ এখানে চারিদিকে কত হাস্য-লাস্য, নৃত্য-গীত, কত আনন্দ-উৎসবের অপরূপ সমারোহ, কত চিত্তহরণকারী সংস্কৃতি-চর্চা, কত খুশির আলোর বন্যা! এসব দেখিয়া মনেই হয় না যে, দেশে কোন দুর্ভিক্ষ আছে, অভাব আছে, সমস্যা আছে। বিদেশ হইতে যে-কোন লোক আসিয়া হোটেল-রেস্টুরেন্টে, ক্লাবে-বারে, বিলাস-বিপণী কেন্দ্রে এসব দেখিয়া ধারণাই করিতে পারে না যে, এটা দুর্ভিক্ষের দেশ, এদেশে হাহাকার আছে, আছে অন্তহীন দৈন্য-দারিদ্র্য। কিন্তু এই মহানগরীতেই যে আছে বাবুপুরা, নাখালপাড়া, কাওরান বাজার বা কাঁটাবনের বস্তির ন্যায় শত শত বস্তি—যেখানে দেশের ছিন্নমূল ভাগ্যহত মানুষেরা হাজারে হাজারে আসিয়া বাঁশের ঝুপরি অথবা খোলা আসমানেরই নীচে এতটুকু আশ্রয় খুঁজিয়া মরে এবং সেই আশ্রয়ও আবার নগর উন্নয়ন ও জঞ্জাল অপসারণে রত বুলডোজারের চাপে গুঁড়াইয়া যায়,—সে খবর আমরাই রাখার প্রয়োজন বোধ করি না, আর ত বিদেশীরা!

কিন্তু এই শহরে অভিজাত য়্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটিটা বৃহত্তর জাতির নিরিখে কতটুকু? এই প্রাচুর্যময় নগরীর পেরিমিটার কতদূর? দশ মাইল, পনের মাইল, বড় জোর বিশ মাইল। সেই বিশ মাইল দূরে—এই মতিঝিল, ইস্কাটন, ধানমণ্ডী, বনানী, পল্লবী, শ্যামলী, গুলশান ইত্যাদির অদূরেই যে দেশ সে দেশের চেহারাটা কি? নগরীর প্রাচুর্যময় সমাজের কোন চিহ্ন কি সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যায়? রাজধানীর অভিজাত অঞ্চল হইতে পনের-বিশ মাইল দূরে গেলেই কি মনে হয় না, এক ভিন্ন দেশ, এক ভিন্ন সমাজে

আসিয়াছি? সেখানে যে বিস্তীর্ণ দেশ পড়িয়া রহিয়াছে, সেই দেশবাংলার কোটি কোটি মানুষের অসীম দারিদ্র্য, অন্তহীন বুভুক্ষু কি গুটিকয়েক শহর-নগরের জৌলুস ও প্রাচুর্যের দিকে অবিরাম মুখ-ব্যাদান করিতেছে না? এই মুখ-ব্যাদানের পরিণাম কি, তাহা কি আমরা একটিবারও ভাবিয়া দেখি? দেখি না। দেশের অগণিত মানুষের আর্তনাদ ও হাহাকারকে আমরা কানে তুলি না। কতিপয় লোক শহরে-নগরে কালোটাকার স্তূপে তলাইয়া গিয়াছে। দেশের মানুষের কথা মনে করার প্রয়োজন বোধ করে না। এদেরই কেহ কেহ বড়জোর মাঝেমধ্যে দুই-চারিটা ভাল ভাল কথা বলিয়া, মুখরোচক বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়া দেশ-সেবা ও জন-সেবার অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এবং এই-ই তাদের 'সোনার বাংলা গড়া'!

এদিকে আড়াই বৎসরে 'সোনার বাংলার' দশা কি দাঁড়াইয়াছে? "ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে? ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনার উপায় কি, আর ক'টা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।" বর্গীর অত্যাচারের যুগের সেই বহুল-প্রচারিত ছড়ার কথাই কি বাংলার আজিকার অবস্থা দেখিয়া মনে পড়ে না? অথচ ঔপনিবেশিক শাসনশোষণের নিগড় ছিন্ন করিয়া যে-স্বাধীনতা আসিয়াছে, সে স্বাধীনতার অঙ্গীকার ত ইহা ছিল না। সে-অঙ্গীকার ছিল অত্যুচ্চ, অতি মহান। ইহা পাঞ্জাবী-পশ্চিমের স্থলে নব্য বাঙালী শোষক শ্রেণী সৃষ্টির কথা বলে নাই। একশ্রেণীর শহরে-লোকের এই বিলাস, বৈভবের অবাধ সুযোগ করিয়া দেওয়ার কথাও বলে নাই। বলিয়াছিল সম-সমাজের কথা। বলিয়াছিল শোষণ ও বৈষম্য-হীন সমাজে সকলের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, জীবিকা ও কর্মসংস্থানের কথা। বলিয়াছিল, সকলের শান্তি ও স্বস্তির কথা। জানি, একটা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে মাত্র আড়াই বৎসরে এর সবকিছু হয় না, দুধ ও মধুর নহর সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু ইহাও জানি, অন্ততঃ ইহার কিছু কিছু করা যাইতে পারিত। বিশ্ব-সম্প্রদায় এতদুদ্দেশ্যে আমাদের সাহায্যদানে কিছু কার্পণ্য করে নাই। বরং আড়াই বৎসরে যত দান, ত্রাণ ও ঋণ দিয়াছে (যাহার সাকুল্য পরিমাণ প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা) তত সাহায্য পৃথিবীর আর কোন দেশ কোনকালে পায় নাই। দেশের সাধারণ মানুষও কিছু কম দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নাই, কম ত্যাগ স্বীকার করে নাই। অতএব, ইহার পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ের মধ্যে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে আমাদের অন্ততঃ কিছুটা সাফল্য অর্জন করা উচিত

ছিল। সেকথাও না-হয় বাদই দিলাম। অন্ততঃ দেশের অর্থনীতিটাকে মোটামুটিভাবে আমাদের গোছাইয়া তোলা উচিত ছিল। আমরা কি সেটুকুও করিতে পারিয়াছি? পারি নাই। বরং দায়িত্বশীল মন্ত্রী পর্যন্ত এখন স্বীকার করেন যে, 'দেশ আজ এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সম্মুখীন। মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্ত বহির্ভূত। অর্থনীতি চরম সঙ্কটাপন্ন। শিল্প-উৎপাদন শুধু ব্যাহতই নয়, প্রাক স্বাধীনতা আমলের সর্বনিম্ন উৎপাদন হারেরও অনেক নীচে। মূলধন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত। সে-মূলধন কোন উৎপাদনমূলক কাজে আসিতেছে না। ফলে গরীব আরও গরীব এবং ধনিক আরও ধনী হইতেছে। সেই বিজ্ঞ মন্ত্রীই অন্যত্র বলিয়াছেন, 'স্বাধীনতার পর প্রত্যেক দেশের জন-গণের মধ্যেই দেশকে সুন্দররূপে গড়িয়া তোলার আগ্রহ দেখা দেয়। বাংলাদেশেও সেই আগ্রহ প্রচুর ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা স্তিমিত হইয়া পড়িতেছে।' 'অপর এক মাননীয় মন্ত্রী বলিয়াছেন, ''ক্ষমতাসীন হইয়া ২৬ মাসে দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট কমাইতে পারি নাই। মানুষের মধ্যে নতুন নতুন অসন্তোষ সৃষ্টি হইতেছে। স্বাধীনতার স্বাদ আমরা কতিপয় সুবিধাবাদী লোক ভোগ করিব, আর দুঃখের বোঝা বহিবে এদেশের কোটি কোটি মানুষ—এটা বেশী দিন চলিতে পারে না।···পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দিনে দিনে অসন্তোষের অগ্নিগিরি সৃষ্টি করে। সেই অগ্নিগিরির মুখে কেউ টিকিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ক্ষমতায় বসিয়া সেসব কথা ভুলিয়া গিয়াছি—ইহাই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।''

···বর্তমান বিজ্ঞ বাণিজ্যমন্ত্রীর অন্ততঃ একটা কথার উদ্ধৃতি না-দিয়া নিজের মনকে মানাইতে পারিতেছি না। গত পয়লা এপ্রিল তিনি বলিয়াছেন, 'আমাদের লক্ষ্য কি তাহা বোধহয় আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। লক্ষ্যচ্যুত হইয়া যাইতেছি। হোঁচট খাইতেছি। মাথা-ঠুকাঠুকি করিতেছি। (মাথা-ঠুকাঠুকি কথাটার প্রয়োগ বর্তমান পরিস্থিতিতে সত্যই কী য়্যাপ্রোপ্রিয়েট! সংসদের ভিতরে পর্যন্ত সরকারী দলের মধ্যে এমনকি মাননীয় মন্ত্রীদের মধ্যেও যখন এরূপ প্রকাশ্য মাথা ঠুকাঠুকি লক্ষ্য করি তখন বুঝি, মুশতাক সাহেবের কথাটা কি নিদারুণ সত্য!)

জনাব মুশতাক আহমদের কথার রেশ ধরিয়াই বলি : বাস্তবিকই কি আমরা আমাদের লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিয়াছি? এবং তাই পদে পদে হোঁচট খাইতেছি? নাকি নৌকার বাঁধন না-খুলিয়াই সারারাত ধরিয়া প্রাণপণে বৈঠা ঠেলিতেছি, তাই কেবল পরিশ্রমই সার হইতেছে, পথ আগাইতেছি না।

....সমস্যাগুলি হ্রাস না-পাইয়া বরং বাড়িয়া চলিয়াছে। পাট লাটে উঠিবার উপক্রম। কাঁচা পাটের অভাবে রফতানী ত ব্যাহত হইতেছেই, এমনকি দেশের পাটকলের উৎপাদনও বিঘ্নিত। বাম্পার আমন ফসলের বৎসরেও খাদ্যাভাব ত হ্রাস পাইলই না, বরং এবারকার খাদ্যসংকট ও অগ্নিমূল্য অতীতের সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার আড়াই বৎসর পরও শিল্পোৎপাদনের মাত্রা ১৯৬৯-৭০ সালের বেস্-ইয়ারের পর্যায়ে ত পৌঁছানো গেলই না, বরং উৎপাদন হ্রাসের গতি অবিরাম চলিতেছে। লোকসানে-লোকসানে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি প্রায় সব রক্তশূন্য। যে কয়টি শিল্পের 'মুনাফার' জন্য কয়েকদিন আগেও আমরা খুব গর্ব করিতেছিলাম, এখন শুনিতে পাই, সেগুলিরও লোকসানের অঙ্ক বেজায় ভারি। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পজাত পণ্যের মূল্য দফায়-দফায় বাড়াইয়াও লস্ ঠেকানো যাইতেছে না। উৎপাদন ও রফতানী হ্রাসের দরুন বৈদেশিক মুদ্রার্জনে বিপুল ঘাটতি। ব্যালান্স-অব-পেমেন্টে বিরাট দায়। অর্থমন্ত্রী বিগত বাজেটে আশ্বাস দিয়াছিলেন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য অর্থ ও বৈদেশিক সাহায্যের কোন অভাব হইবে না। এখন দেখা যাইতেছে অর্থেরই অভাব। অভাব শুধু বৈদেশিক মুদ্রা ও বিদেশী সাহায্যের ক্ষেত্রে নয়। নিদারুণ অভাব আভ্যন্তরীণ রাজস্বের ক্ষেত্রেও। নজীরবিহীনভাবে নোট ছাড়িয়াও টাকার অভাব মিটানো যাইতেছে না।

এই সর্বনাশা মুদ্রাস্ফীতিই দেশের অর্থনীতির কলিজা-ফুস-ফুস কুরিয়া-কুরিয়া খাইতেছে। দ্রব্যমূল্য তাই সাত-আটশ' পার্সেন্ট পর্যন্ত বাড়িয়া মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। অর্থাভাবে বার্ষিক যোজনার পঞ্চান্ন বা ষাট ভাগই ঘাটতি। এরপরও বৃহৎ আকারের দ্বিতীয় বার্ষিকী যোজনার কথা শোনা যাইতেছে। আরও শোনা যাইতেছে অতিরিক্ত ট্যাক্স ধরিয়া দুইশ কোটি টাকা আয় বাড়াইবার কথা। কিন্তু জাতীয় আয় ও মাথা-পিছু আয় না-বাড়াইয়া, অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি না-করিয়া এবং অর্থনীতির অবক্ষয় ও সঙ্কোচন রোধ না করিয়া, ট্যাক্স যতই বাড়ানো যাক, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে রাষ্ট্রীয় আয় যে তেমন কিছু বাড়ানো যাইতে পারে না, একথাটা কেন আমরা বুঝি না? গ্যালপিং ইনফ্লেশনের দরুন টাকার আজ যা' মূল্য কাল তা থাকিতেছে না। কাজেই সরকার যে-বাজেট বা যে যোজনা তৈয়ার করিতেছেন তাহারও পায়ের তলায় মাটি স্থির থাকিতেছে না। টাকার মূল্য ও অর্জিত রাজস্বের প্রকৃত মূল্য প্রত্যহ কমিতেছে।

অপরপক্ষে সরকারী প্রশাসনিক ব্যয় তথা যোজনার ব্যয়ভার দিন দিন বাড়িতেছে। দুই মাথা কোনক্রমেই একত্রিত করা যাইতেছে না। এর কোন প্রতিকার না করিয়া কেবল ট্যাক্স ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাবুক দ্বারা অর্থনীতির কোমরপড়া-ঘোড়ার পাছায় শপাং শপাং যতই কশাঘাত করা যাক, তাহাতে কি ফললাভ হইবে? হ্যাঁ, বাজারে যে পাঁচ-ছয় শ' কোটি কালোটাকা ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা ছাঁকিয়া তুলিতে পারিলে একটা কাজের মত কাজ হইত। কিন্তু একাধিকবার সে সুযোগ আসা সত্ত্বেও এবং আমরা বার বার সে সাজেশন দেওয়া সত্ত্বেও কালোটাকাগুলি ছাঁকিয়া তোলা হয় নাই। অথচ এটা কে না-জানে যে, সেই কালোটাকা ছাঁকিয়া না তোলা পর্যন্ত, যতকিছুই করা যাক, বিশৃংখল অর্থনীতিকে ডিসিপ্লিনে আনা যাইবে না। সরকারী আয় বৃদ্ধিরও সেটা ছিল একটা বড় উপায়। উহা না করিয়া অস্বাভাবিক অতিরিক্ত হারে ট্যাক্স, ফীও ডিউটি বৃদ্ধি, ডাক-তার টেলিফোন বিজলীর মাশুল ও রেলের ভাড়া বৃদ্ধি এবং রেশন, ফ্যার্টিলাইজার ও শিল্প-জাত পণ্যের উপর্যুপরি মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে পারে না। কর, মাশুল ও মূল্যবৃদ্ধির একটা মাত্রা আছে। যাহার অধিক বাড়াইতে গেলে সাম্প্রতিক বিমান ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ার ন্যায় সেগুলিরও ডিমিনিসিং রিটার্ন শুরু হইতে পারে। এবং তাহাতে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলাই আরও বাড়িতে পারে।

সর্বমুখী সংকটে পড়িলে অনেক সময় চিন্তার ক্ষেত্রেও নাকি তালগোল পাকাইয়া যায়। বিশ্ব-প্রতিভার অধিকারীরাও তখন ভুলের পর ভুল করিয়া বসেন। কোন গঠনমূলক সমালোচনা, কোন বন্ধুসুলভ পরামর্শও তখন মনঃপূত হয় না। কোন্ এক সর্বনাশা শক্তির দুর্নিবার আর্কষণে মানুষ তখন বিপর্যয়ের পথেই কুইক্ মার্চ ও ডবল কুইক্ মার্চ করিয়া ধাইয়া চলে। নেতারা বিশ্বাস করুন, এই রাজনীতিতে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের আর এতটুকু রুচি নাই। মানুষ বাঁচিলে, রাজ্য বাঁচিলে ত রাজনীতি! অতএব, আপনারা আপাততঃ ওসব রাখিয়া মানুষকে ও দেশটাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করুন। না করিলে অগ্নিগিরির বিস্ফোরণ ঘটিবেই। সেই বিস্ফোরণ কেউ ঠেকাইতে পারিবে না এবং সেই বিস্ফোরণে কেহ রক্ষা পাইবে না। আমি গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া দেখিয়াছি, আগে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করিত, প্রতিবাদ জানাইত; এখন আর প্রতিবাদও জানায় না, বড় একটা কথাও বলে না। এ যেন ঝড়ের প্রাক্কালে প্রকৃতির মৌন-শান্ত অবস্থা। এরা যখন কথা বলিবে তখন কাহাকেও ছাড়িয়া কথা বলিবে না—পজিশন, অপজিশন কাহাকেও না।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় জ্যৈষ্ঠ ২৫, ১৩৮১

নয়া বাজেট

দেশের গোটা অর্থনীতিই যেখানে বিশৃঙ্খল, সেখানে বাজেট সুশৃঙ্খল, সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে, এটা আশা করা বাতুলতা। কুশলী অর্থমন্ত্রী এই বাজেট তৈয়ার করিতে গিয়া ভাষা ও পরিসংখ্যানের মারপ্যাচে দেশবাসীকে 'সুগার কোটেড' কুইনাইন পরিবেশন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা খুব বেশী মানুষকে তিনি খুশী করিতে পারেন নাই। কথায় বলে, ডেগে থাকিলে ডৈ-এ উঠে। ডেগেই নাই, তা' অর্থমন্ত্রী ডৈ-এ উঠিবে কোথা হইতে?

...এখানে কি বাজেট, কি যোজনা কোনটারই প্রেমিস, কোনটারই বুনিয়াদ ঠিক থাকে না। বছরের কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই বরাদ্দের গোঁজামিলগুলি মুখ-ব্যাদান শুরু করে। বছরের শেষ নাগাদ কাগজী বরাদ্দের সুউচ্চ মিনারগুলি ধ্বসিয়া যায়। আর তাই আঠার কোটি টাকার বাজেট-অনুমিত ডেফিসিট ফাইনান্সিংয়ের স্থলে উহার প্রকৃত পরিমাণ দাঁড়ায় একশ' আশী কোটি টাকা। উৎপাদন, পণ্য রফতানী, আমদানী, বৈদেশিক মুদ্রার্জন, রাজস্ব আদায়, বিদেশী সাহায্য লাভ, পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টরের মূলধন বিনিয়োগ, মানিসাপ্লাই, মূল্যমান—কোন দিক দিয়াই একটা লক্ষ্য, একটা ধারণা, একটা এস্টিমেটও ঠিক থাকে না। সবকিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। গোঁজামিল দিয়া গরমিল আর ঢাকিয়া রাখা যায় না।

...মন্ত্রীর বাজেট-ভাষণ ও বাজেটোত্তর বক্তব্যে কিছু স্ব-বিরোধিতাও সুস্পষ্ট। আগামী বৎসর ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টন খাদ্য-উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। উৎপাদন যদি তাহার কাছাকাছিও হয় তবু আমদানীর কোন প্রশ্নই থাকে না। অথচ অর্থমন্ত্রী আগামী অর্থ বৎসরে ১৭ লক্ষ টন খাদ্য আমদানীর এস্টিমেট রাখিয়াছেন, তবে কি মন্ত্রী নিজেও তাঁর নির্ধারিত লক্ষ্যের বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান? মন্ত্রী স্বনির্ভরতার কথা বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে, "ধনতান্ত্রিক দেশ হইতে সাহায্য লইয়া সমাজতন্ত্র করা যায় না।' অথচ তিনি সোয়া পাঁচশ' কোটি টাকার বার্ষিক যোজনার প্রায় ৭৫ শতাংশকেই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করিয়াছেন। সেই বৈদেশিক সাহায্য আসে কিন্তু প্রধানতঃ 'ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী মহল' হইতেই। (অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, আমাদের বন্ধু-সমাজতান্ত্রিক শিবির হইতে এযাবৎ কোন গ্রান্ট পাওয়া যায় নাই, ভবিষ্যতেও পাওয়ার কোন আশা আছে বলিয়া মনে হয় না) অতএব, প্রশ্ন এই যে, পাশ্চাত্য 'ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী মহলের' সেই 'অবাঞ্ছিত' সাহায্যের

জন্য এত ঘুরাঘুরি ও কপাল-ঠুকাঠুকির তবে কি দরকার। বিবেকের দিক হইতে আমাদের পরিষ্কার হওয়া উচিত। আমরা যদি উল্টা পাল্টা কথা-বার্তা বলিয়া নিজেদের পজিশন আবার খারাপ করিয়া না তুলি এবং মধ্য-প্রাচ্য ও ইসলামী দুনিয়াসহ সকল মহলে আমাদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালাই তবে ৩৯৪ কোটি টাকা সাহায্য লাভ হয়ত অসম্ভব হইবে না।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় আষাঢ় ৮, ১৩৮১

মঞ্চে-নেপথ্যে

...আর আমাদের অবস্থা কি? ১৯৭৩ সালের জুন মাসে আমাদের তৎ-কালীন জনৈক মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই কাপড়-চোপড়সহ প্রতিটি অপরিহার্য জিনিসের দাম আশাতীতভাবে কমিয়া যাইবে। বিভিন্ন পণ্যের আমদানী ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে সৎ ও সরল বিশ্বাসেই মন্ত্রী বিশেষ আত্মপ্রত্যয় সহকারে সেই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু একটা কথা সম্ভবতঃ তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, এদেশের অর্থ-নীতিতে সব সময়ই দুইয়ে দুইয়ে চার হয় না এবং আমাদের বিচিত্র অর্থনীতি কোন শাশ্বত ইকনমিক ল'এর পথ ধরিয়া কোন নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলে না। অর্থনীতির পাগলা ঘোড়া লাফাইয়া যেদিকে খুশি সেদিকে চলে। কোন নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দ্রব্যমূল্যের সূচক সংখ্যা টানিয়া নীচের দিকে রাখা যায় না। তাই সরকারী তথ্য হইতেই জানা যায় যে, ১৯৬৯-৭০ সালকে ভিত্তি ধরিলে দ্রব্যমূল্য মোটামুটি সাড়ে তিনশ' পার্সেন্ট বাড়িয়াছে। গত ২৯শে নভেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে জানা যায়, বিগত এক বৎসরেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য গড়ে শতকরা ৮২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাউল ও আটার ক্ষেত্রে মূল্য-বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২৪০ এবং ৩২৫ পার্সেন্ট। লবণের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি আরও অনেক বেশী। ডি কন্ট্রো-লের পূর্ব পর্যন্ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় মূল্য বাড়িয়া আট আনা সেরের লবণ আশি টাকা পর্যন্ত উঠে। লক্ষণীয় এই যে, ৬ই ডিসেম্বর লবণের সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারের খবর প্রকাশের সাথে সাথে দাম হু হু করিয়া আবার কমিতে আরম্ভ করে এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই নারায়ণগঞ্জে প্রতিসের লবণের দাম বিশ টাকা হইতে কমিয়া পাঁচ টাকায় ও ঢাকাতে চৌদ্দ টাকা হইতে ছয় টাকায় নামিয়া আসে। জোয়ারের গতির চেয়েও ভাটার টান বেশী। সত্যি, আমাদের কী বিচিত্র অর্থনীতি! ধারণা করা যায় যে, আর

কয়েক দিনের মধ্যেই লবণের দাম আরও কমিয়া মোটামুটি স্বাভাবিক অব-স্থায় ফিরিয়া আসিবে। এই ডি-কন্ট্রোলের বুদ্ধিটা যাঁহারই মাথা হইতে বাহির হইয়া থাকুক, তাঁহার বাস্তববাদী চিন্তাও বিজ্ঞ-পরামর্শকে আমার অকুণ্ঠ অভিনন্দন। এইরূপ বাস্তববাদিতা গোটা শিল্প, বাণিজ্য, মুদ্রা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসৃত হইলে অর্থনীতির এই লেজে-গোবরে অবস্থার উদ্ভব কিছুতেই হইতে পারিত না। লবণের সের আশি টাকা, মরিচের সের একশ' টাকায় কোনক্রমেই উঠিতে পারিত না। 'ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিন' বলিতে যাহা বোঝায় তাহা কিছুতেই এভাবে বিলুপ্ত হইতে পারিত না।

লবণ-ঘটিত এই ব্যাপারটা বর্তমান ধরনের কন্ট্রোলের অসারতা, ব্যর্থতা ও অনাবশ্যকতা চোখে আঙ্গুল দিয়া আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে। যে নিয়-ন্ত্রণাদেশ বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার সাধ্য আমাদের নাই, সেরূপ নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করা গোদা পায়ের লাথিরই শামিল। উহা অহে-তুকও অনাবশ্যকই নয়, সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হইতে ক্ষতিকর, জনজীবনের পক্ষে অস্বস্তিকর।

...আমাদের সেই সংশয়-সন্দেহ ইতিমধ্যে সর্বাংশে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। কোনক্ষেত্রেই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রসূ হয় নাই। উহা মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারী মুনাফাখুরী ও অপরিহার্য পণ্য সামগ্রী লইয়া লুটেরাদের দুর্নীতি, দুষ্কৃতি, রোধ করিতে পারে নাই। কর্তৃপক্ষ দোকানে-দোকানে প্রাইসলিস্ট টাঙ্গাইবার কড়া নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কোন কাজে আসে নাই। সরকার সদুদ্দেশ্য লইয়া বিপুল অর্থব্যয়ে ভোগ্যপণ্য সংস্থার মাধ্যমে ইউনিয়নে ইউনিয়নে প্রায় পাঁচ হাজার ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলিয়াছিলেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টে অমন একটি সুন্দর স্কীমও জনকল্যাণে আসিতে পারে নাই। কয়েক কোটি টাকা লোকসান দিয়া সরকার মফঃস্বলের সব ন্যায্যমূল্যের দোকান উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর্থিক ক্ষতির বিপুল বোঝাই উল্টা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়াছে এবং উহাই সরকার নিয়ন্ত্রিত ন্যায্যমূল্যের দোকানের "নীট লাভ"। ইতমধ্যে টিসিবির আমদানী ও ভোগ্যপণ্য সংস্থার পণ্যবণ্টন ব্যবস্থা দেশের চাহিদা মিটাইতে ব্যর্থ হওয়ায় ও জি এল-এ কাপড় আমদানী করাইতে হইয়াছে এবং ওয়েজ আর্নার্সস্কীমে বাহান্ন প্রকার বৈদে-শিক পণ্য-দ্রব্য আমদানীর অবাধ সুযোগ দিতে হইয়াছে। একদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের উৎপাদিত প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকার সুতা সরকারী সংস্থার গুদামে পচিতেছে ও উঁই ইঁদুরের খোরাক হইতেছে। অন্যদিকে ওজিএল এবং

ওয়েজ অর্নার্সস্কীমে এসবের অবাধ আমদানী। কী বিচিত্র ব্যবস্থা! একই আমদানী পণ্যের এখন বাজারে দুই রকমের মূল্য। সরকারী একাউন্টে বা বেসরকারী খাতে ক্যাশ লাইসেন্সে আমদানীকৃত জিনিসের একরূপ মূল্য, ওয়েজ আনার্সস্কীমে আনীত জিনিসের অন্যরূপ মূল্য। সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূল্য তালিকা আর কোন কাজে আসিতেছে না। কারণ, ওয়েজ আর্নার্স স্কীমে আমদানীকৃত জিনিসের ক্ষেত্রে কোন মূল্য নিয়ন্ত্রণ নাই। কোন কোন দিক দিয়া এগুলি শুল্কমুক্তও। এমতাবস্থায়, অন্ততঃ এইসব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রাইস কন্ট্রোল রাখার আদৌ কি প্রয়োজন? কি লাভইবা সরকারী সংস্থার মাধ্যমে এধরনের পণ্য আমদানী ও বণ্টন-ব্যবস্থা চালু রাখার ও তজ্জন্য একটানা লোকসান দিবার?

···মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডক্টর এ. এম. এ. রহিমের একটি মূল্যবান উক্তির কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিয়া আমরা আজিকার আলোচনা শেষ করিব। 'বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক বুলেটিন'-এর ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এক নিবন্ধে ডঃ রহিম বলিয়াছিলেন, ''মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতিতে কন্ট্রোল অথবা অর্ডার কোন কাজে আসে না। উহা শুধু ধনিকেরই উপকারে আসে।···এই আসার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এ দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের সবচেয়ে বড় ক্ষতি-সাধন করিয়াছে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনিবার্যরূপেই কালোবাজারের জন্মদান করে এবং তাহার ফলে কেবল ধনিকদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। পক্ষান্তরে গরীবেরা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কিছুই পাইতে পারে না। ..নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতিকে অবাধ পুঁজিবাদী শোষণের সহায়ক বলিয়া গণ্য করা হইলেও বাস্তব অবস্থা এই যে, যখন কন্ট্রোল প্রবর্তন করা হয় তখন দুর্লভ জিনিস অধিকতর দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ্য হইয়া দাঁড়ায়। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করার প্রশাসনিক ব্যয়ভারকে হিসাবে ধরা হইলে দেখা যায় যে, উহার ব্যয়ের চেয়ে লাভের পরিমাণ অনেক কম।'' বলা বাহুল্য, ইহা বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের অভিমত নয়, ডঃ রহিমের অভিমত। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেশের অবনতিশীল দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি ও জীবনযাত্রার দ্রুতবর্ধনশীল দুর্বিষহ ব্যয়-ভার সম্পর্কে যেসকল তথ্য-পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয় সেগুলিই ডঃ রহিমের উপরোক্ত অভিমতের সারবত্তা এবং এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার অসারতা ও অনাবশ্যকতা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় অগ্রহায়ন ২৫, ১৩৮১

মঞ্চে-নেপথ্যে

...গাজী গোলাম মোস্তফা —যিনি গত ১৩ই জানুয়ারী ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি পুনঃনির্বাচিত হইয়াছেন—তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নগর আওয়ামী লীগ সম্মেলন দুর্নীতির বিরুদ্ধে খুব শক্ত দাবী তুলিয়াছেন। গাজী সাহেব সর্বপ্রকার দুর্নীতি ও অসামাজিক কার্যকলাপ উপড়াইয়া ফেলার অনুকূলে ওজস্বিনী ভাষণদানের পর সম্মেলন আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবক্রমে সরকারের কাছে দাবী জানান, সরকার যেন 'রাজনৈতিক নেতাদের সম্পত্তি সম্পর্কে একটা তদন্ত করেন এবং 'স্বাধীনতার পর যাহারা বে-আইনী ও অসদুপায়ে বিষয় সম্পত্তির পাহাড় গড়িয়াছে তাহাদের সমস্ত অর্থ-বিত্ত-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিবিধান করেন।' নগর আওয়ামী লীগ সম্মেলন ভুয়া লাইসেন্স-পার্মিটবাজদের বিরুদ্ধেও কঠোর শাস্তি বিধানের দাবী জানান।

অতি উত্তম দাবী। 'রাজনৈতিক লীডারদের' সম্পত্তির হিসাব নিকাশ নেওয়ার কথা, অসৎপথে অর্জিত বেবাক-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের কথা শুনিতেও কেমন যেন রোমাঞ্চ লাগে-কেমন চাঞ্চল্য জাগে—তাই না? তবু 'লীডারে কওমদের' সম্পত্তির হিসাব নিকাশের কথা, অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি কাড়িয়া নেওয়ার কথা, চাবুক মারার কথা শুনিলেই ভালও লাগে। যদি কোনদিন একথায় কাজ হয়! যদিই দাগীরা একটু ভয় পায়।

..এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছেন অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দীন সাহেবও। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলা একাডেমীতে এক ভাষণে তিনি বলিয়াছেন, 'নিজেদের ঘর থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর সরকারের সাফাই গাওয়া নয় বুদ্ধিজীবীরা, আপনারা আমাদের দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিন, নতুবা আগামী দিন আপনাদেরেও ক্ষমা করবে না।'

অর্থমন্ত্রী আরও বলিয়াছেন, 'স্বাধীনতার পর এক শ্রেণীর মানুষ অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। কিন্তু শতকরা ৮৫ জন লোক না খেয়ে থাকবে আর আমরা কতিপয় লোক অর্থ-বিত্তবিলাসে মজে থাকব তা' হতে পারে না। এটা বেশীদিন চলতে পারে না। এ-অবস্থা চলতে থাকলে দেশে বিপ্লব অনিবার্য।' অর্থমন্ত্রী নিরর্থক এসব কথা বলিয়াছেন কি? সেরূপ ত মনে হয় না।

দুর্নীতিবাজদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নূতন শব্দ পর্যন্ত জয়েন করিয়াছেন তিনি তাহাদের নাম দিয়াছেন 'চাটার দল'। বঙ্গবন্ধু বলিয়াছেন দুর্নীতিবাজরা তাঁহার নামের ট্যাবলেট বিক্রির ব্যবসা চালাইতেছে। কিন্তু যেদিন 'মুজিব নামের ট্যাবলেট' শেষ হইয়া যাইবে সেদিন উহাদের আর বাঁচার কোন পথ থাকিবে না।

..সমবায় মন্ত্রী মতিয়ুর রহমান সাহেব এদের নাম দিয়াছেন "ময়ূরের পুচ্ছধারী দাঁড়কাক।"

..পূর্তমন্ত্রী জনাব সোহরাব হোসেনও দুর্নীতি সম্পর্কে অতি চমৎকার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'অন্যের উপর দোষারোপ নয়, আত্মসমালোচনা এবং আত্মজিজ্ঞাসাও করতে হবে। নিজেকে না-শুধরে অন্যের সমালোচনা করা বা অন্যকে শোধরাতে যাওয়াও ভণ্ডামি'।

আত্মশুদ্ধির কথা বছরখানেক আগে হইতে রাজ্জাক সাহেব, তোফায়েল সাহেবরাই শুধু বলেন নাই, ইতিমধ্যে আরও অনেক নেতা বলিয়াছেন, এখন তো আত্মশুদ্ধির কথা, আত্মসমালোচনার কথা না-বলিলে বক্তৃতাই হয় না। বস্তুতঃ ভাল কথা, বড় কথা সবাই বলিতেছেন। কেহবা আন্তরিকভাবেই বলেন আর কারোবা বাৎ কি বাৎ, বলার জন্যই বলা। তথ্য প্রতিমন্ত্রীর ভাষায়, এখন চোরেরাও বড় বড় কথা আর খালি গলায় বলে না, মাইক লাগাইয়া বলে। সত্যই ভাল কথার এত হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে যে, কে আন্তরিকতার সঙ্গে বলিতেছে আর কার 'মুখে শেখ ফরিদ বগলে ইট' বুঝা দুষ্কর শুধু ভাল কথাই যদি দুর্নীতি দূর করার জন্য যথেষ্ট হইত, তবে ইতিমধ্যে দেশে দুর্নীতি জিনিসটারও কাহাত পড়িয়া যাইত।

..চারিদিক হইতে অভিযোগ উঠিতেছে যে, রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কেহ কেহ স্বনামে বা বেনামীতে বহু এড-হক লাইসেন্স, ইম্পোর্ট লাইসেন্স, পার্মিট, ডিলারশিপ ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাগাইয়া লইয়াছেন। ইহার কোন প্রতিকার হয় নাই। বিভাগীয়মন্ত্রী স্বয়ং বলিয়াছেন যে, পঁচিশ হাজার লাইসেন্স হোল্ডারের মধ্যে পনের হাজারই ভুয়া। এই ভুয়া ভুঁইফোঁড়দের তালিকা প্রকাশ করার দাবী উঠিয়াছে। দাবী উঠিয়াছে এই লাইসেন্স-পার্মিট বিক্রয়কারী ভুয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে কিন্তু কোন তালিকা প্রকাশ করা হয় নাই।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় জানুয়ারী ২২, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

...আর তিনটা দিন গেলেই চুয়াত্তরের জানুয়ারীও গেল। সেই সঙ্গে গেল উনিশশ তেয়াত্তর-চুয়াত্তর অর্থবছরের সাত মাস। প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার পাঁচ-সালা যোজনার প্রথম বছরের বরাদ্দ পৌণে সাতশ কোটি টাকা। সাত মাসে এর মোটামুটি ষাট পার্সেন্টের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'টাইম ফ্যাক্টারটা' বড় জিনিস। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করিতেই হইবে। তা'না হইলে প্ল্যানিং-এর কোন অর্থ হয় না।

এই সাত মাসে আসলে কতটা কাজ হইয়াছে, আমরা জানি না। তবে এটুকু বিলক্ষণ জানি যে, বড় ধরনের কোন প্রকল্পে হাত দেওয়া হয় নাই। কোন নয়া বড় শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হয় নাই। পূর্বেকার কিছু কিছু অসমাপ্ত প্রকল্পেরই কাজ করা হইয়াছে বা হইতেছে। আর হইতেছে এখানে সেখানে কিছু প্যাচ-ওয়ার্ক, কিছু খণ্ড-ক্ষুদ্র কাজ, কিছু পুনর্গঠন কর্ম। উহার দ্বারা আর যাই হউক, জাতীয় অর্থনীতিকে যথেষ্ট পরিমাণে গতিশীল করা যায় না, বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের নূতন নূতন রাস্তা খোলা যায় না। আজ প্রায় সাড়ে তিন বৎসর যাবৎ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নতৎপরতা কার্যতঃ থামিয়া রহিয়াছে। প্রতি বৎসর যেক্ষেত্রে লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচশ লাখ বাড়িতেছে সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নতৎপরতা প্রায় থামিয়া থাকা বা নেহাত মন্থর গতিতে চলার ফলশ্রুতি কি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলার প্রয়োজন করে না। ইহার পর যদি আবার উল্টা প্রসেস চলিতে থাকে, অর্থাৎ বিপুল অর্থ-সম্পদ পাচার হইতে থাকে, ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়, কল-কারখানা অচল ও বিকল থাকে, শিল্পোৎপাদন হ্রাস পায় এবং সম্পদের অপচয় ও লুণ্ঠন চলিতে থাকে, তবেত আর কথাই নাই। বোঝার উপর শাকের আঁটির চাপে অর্থনীতির মেরুদণ্ড তখন ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হয়। বিজ্ঞ অর্থমন্ত্রী পর্যন্ত দেশের অর্থনীতির ভগ্নোন্মুখ অবস্থার কথা স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য আবার কোন কোন মহল হইতে 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ' তথ্য-পরিসংখ্যানাদি তুলিয়া ধরিয়া এটাও দেখাইতে চেষ্টা করা হয় যে, অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য দ্রুত ফিরিয়া আসিতেছে, অতএব চিন্তার আর কোন কারণ নাই। কিন্তু সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এসব কষ্ট করিত যুক্তি-তথ্য কি ধোপে টিকে? টিকে না। অপেক্ষা-কৃত ক্ষুদ্রস্ত কোন কোন শিল্পের উৎপাদন হ্রাসের একটানা ধারা থামিয়া থাকিতে পারে,

কোন কোনটার উৎপাদন কিঞ্চিৎ বাড়িয়া থাকিতে পারে এবং ক্ষতির মাত্রা কিছু কমিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা সামগ্রিক চিত্রের কতটুকু?

সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে যে চিত্রটি চোখে পড়ে, তাহা অর্থমন্ত্রীর উপরোক্ত উক্তির সত্যতাই কি প্রমাণ করে না? আমরা নৈরাশ্যবাদী নই, তবে অবাস্তব আশাবাদের আত্ম-প্রবঞ্চনাতেও বিশ্বাস করি না।

সে যাই হউক, অর্থনীতির অবস্থা বর্তমানে যা দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে পুঁজি ভাঙ্গিয়া খাওয়ার দশা বলিলে সম্ভবতঃ বেশী বলা হইবে না। সরকারের রাজস্ব খাতে আয়ের অবস্থা, যতটা জানা যায়, তাহা বড় আশাপ্রদ নয়। আর নয় বলিয়াই কাঁড়ি কাঁড়ি কাগজী নোট বাজারে ছাড়িয়া ও মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করিয়া সরকারের ক্রমবর্ধমান খরচ সংকুলান করা হইতেছে। ফলে, মুদ্রাস্ফীতি ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। রফতানী খাতে ১৯৭৩-৭৪ সালে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের পরিমাণ ৩৪০ কোটি এবং আমদানী খাতে ব্যয় ৭১০ কোটি টাকা অনুমান করা হইয়াছিল। এটা প্ল্যানিং কমিশনের এস্টিমেট। অতএব বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও ব্যয়ের মধ্যখানে ফাঁক ৩৭০ কোটি টাকা। আশা করা হইয়াছিল, এই ফাঁক বিদেশী সাহায্য দ্বারা পূর্ণ করা যাইবে। অবশ্য ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে বৈদেশিক সাহায্য খাতে ৩৫২ কোটি টাকা প্রাপ্তির এস্টিমেট ধরা হইয়াছে। কিন্তু এই আয় ও ব্যয়ের এস্টিমেট শেষ পর্যন্ত কতটা টিকিবে বলা শক্ত। সম্প্রতি রোম হইতে ফিরিয়া আসিয়া অর্থমন্ত্রী ব্যালান্স-অব-পেমেন্টের জটিল পরিস্থিতি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা উদ্বেগজনক। তিনি বলিয়াছেন যে, এবার শুধু জ্বালানি তৈল আমদানীতেই লাগিবে ১০৯ কোটি টাকা। প্রাকৃতিক সম্পদমন্ত্রী অবশ্য ২৩শে ডিসেম্বর বলিয়াছিলেন যে, গতবারের ৪৫ কোটি টাকার স্থলে এবার তৈল আমদানী খাতে ব্যয় হইবে ২০০ কোটি টাকারও বেশী। পরে তিনি বলিয়াছেন ১৪০ কোটি টাকার কথা।

...খাদ্য-আমদানী খাতে এবার ১২০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অর্থমন্ত্রী যে আভাস দিয়াছেন, আভ্যন্তরীণ খাদ্য-সংগ্রহের নিদারুণ ব্যর্থতা দেখিয়া এবং আন্তর্জাতিক খাদ্য-মূল্যের সর্বশেষ রিপোর্ট পর্যালোচনা করিয়া তিনি আশা করি ইতিমধ্যেই তাহা পরিবর্তনের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খাদ্যমন্ত্রী সম্প্রতি সংসদে বলিয়াছেন যে, এবার ১৮ লক্ষ টন খাদ্য আমদানীর প্রয়োজন হইবে। যদি তর্কের খাতিরে ইহাকেই নির্ভুল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবু প্রশ্ন

থাকিয়া যায় যে, ১৮ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করিতে ১২০ কোটি টাকায় কি করিয়া কুলাইবে? যদি ধরা যায় যে, এর পুরাটাই আনা হইবে গম, তবু বর্তমান বাজারদর (প্রতিটন মোটামুটি ২২৫ ডলার) অনুযায়ী ১৮ লক্ষ টন গম আমদানী করিতেই ত ৩২৫ কোটি টাকার অধিক লাগিবে। আর যদি এর এক-চতুর্থাংশও চাউল আমদানী করিতে হয় তবে খাদ্যের বিল আরো অন্ততঃ ৭৫ কোটি টাকা বাড়িয়া যাইবে। 'আনরব' (জাতিসংঘ সাহায্য সংস্থা) ডিসেম্বরেই চলিয়া গিয়াছে। জানি না, তাহাদের সাহায্যের পাইপ-লাইনে যেটুকু আসার বাকী আছে তাহাতে খাদ্যশস্যও কিছু আছে কিনা। যদি না-থাকিয়া থাকে তবে ত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের ফুড গ্র্যান্ট সত্ত্বেও খাদ্য ও তৈলের বিল শোধ করিতেই দেশের অর্জিত সাকুল্য বৈদেশিক মুদ্রা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তাহাতেও কুলাইবে না।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় জানুয়ারী ২৯, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

...১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে গত ৪ঠা জানুয়ারী পর্যন্ত মানি সাপ্লাই ৩৮৮ কোটি হইতে বাড়িয়া প্রায় ৮২৪ কোটি টাকায় উঠিয়াছে। এখন বোধ হয়, সাড়ে আটশ' কোটি ছাড়াইয়া গিয়াছে। বর্তমানে একেক সপ্তাহে উহা পনের-বিশ কোটি টাকা করিয়া বাড়িতেছে। বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের বুলেটিনেই দেখা যায়, চলতি অর্থ-বৎসরের প্রথম ছয় মাসেই (৪ঠা জানুয়ারী পর্যন্ত) অর্থের যোগান বাড়িয়াছে ১২৭ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। আর দ্রব্যমূল্য, পরিকল্পনা কমিশনের তথ্যানুযায়ী, স্বাধীনতার পর দেড় বৎসরে বাড়িয়াছে একশত হইতে চার শত পার্সেন্ট। পরবর্তী আট মাসে দ্রব্যমূল্য, ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায়, শতকরা তিনশত হইতে ছয়শত ভাগ, এমনকি কোন কোন আইটেমে আটশত ভাগও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর সরকারের ডেফিসিট ফাইনান্সিং ও ধারদেনা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও শিল্পসমূহের ঋণ-ওভার ড্রাফটের ত কোন লেখা-জোখাই নাই। আমরা কিন্তু দিব্যি আছি! প্রদর্শনী খুলিয়া 'অগ্রগতির' নিদর্শন দেখাইতেছি, ক্ষুধিত মানুষকে নৃত্য-গীতের ষোড়শোপচার পরিবেশন করিতেছি, জঠরের অবশিষ্টাংশ অমৃত-ভাষণ দ্বারা ভরিয়া দিতেছি। আর সমালোচকদের উদ্দেশ্যে থাকিয়া থাকিয়া পাগলা মেহেরালীর ভাষায় উচ্চারণ হুংকার উচ্চারণ করিতেছি: সব্ ঝুট হ্যায়।

১৯৭৩ সালের ওয়ার্লর্ড ব্যাংক এ্যাটলাসে বলা হইয়াছে : বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ বাংলাদেশ। ইহার মাথাপিছু আয় ৭০ ডলার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ২·৭ পার্সেন্ট; পক্ষান্তরে বার্ষিক মাথাপিছু সম্পদ বৃদ্ধির হার ·৭ (দশমিক সাত) পার্সেন্ট মাত্র। অর্থমন্ত্রীর কথা মতে বলা চলে, এটাও প্রকৃত চিত্র নয়। গত ১৮ই জুন সংসদে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বর্তমান বাজারদর অনুসারে মাথাপিছু আয় ৫৮০ টাকা হইলেও ১৯৬৯-৭০ সালের বাজারদর অনুসারে মাত্র ৩৬৪ টাকা। লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতির দরুন টাকার দাম (তথা মানুষের প্রকৃত আয়) এত কমিয়া যাইতেছে যে, এই ফাঁপানো কাগজী আয়ের কোন অর্থ থাকিতেছে না।

অর্থ থাকিতেছে না অর্থনীতিরও। অর্থমন্ত্রী গত ১১ই মে নিজেই বলিয়াছেন যে, 'দ্রুত অবনতিশীল জাতীয় অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়ার পর্যায়ে পৌছিয়াছে, উহার ক্ষয়িষ্ণু প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইবার উপক্রম। গত পয়লা ফেব্রুয়ারীও তিনি বলিয়াছেন, "দেশের অবস্থা ভাল নয়। দেশের সত্যিকার চিত্র জনসাধারণের কাছে তুলিয়া ধরিতে হইবে। জনগণকে বলিতে হইবে আসল সমস্যার কথা। সস্তা কথা দিয়া আর জনপ্রিয়তা রক্ষা করা যাইবে না।"

...বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর আনিসুর রহমান বলিয়াছেন, 'দেশের অর্থনীতিতে একটা বড় রকমের সংকট আগামীতে আসিতেছে'। ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীজের ভাইস প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, "দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়তার সর্বনিম্ন ধাপে নামিয়া আসিয়াছে, ইহাকে ভরাডুবি হইতে রক্ষা করার জন্য এই মুহূর্তেই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য।' বস্তুতঃ ভয়াবহ সঙ্কটের কথা সবাই বলেন।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় মার্চ, ৫, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

... অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যাঙের ছাতার মত একশ্রেণীর ব্যবসায়ী গজাইয়া উঠিয়াছে। ইহারা প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে অন্যায় প্রভাব খাটাইয়া, অবৈধভাবে ধারণাতীত পরিমাণ অর্থোপার্জন করিয়া চলিয়াছে। এইভাবে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বিপুল 'কালো টাকা' জমিয়া উঠিয়াছে। এই কালো টাকাওয়ালারা বেশী বেশী দামে জিনিসপত্র কিনিয়া সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত 'ভালো টাকার' ক্রয়-ক্ষমতা অকেজো করিয়া দিতেছে।

"...মাঝে মাঝে এঁদের মুখ দিয়া এমন ,সব কথাও বাহির হইয়া পড়িতেছে যাহা 'পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন' অস্ত্রবৎ নিদারুণ। সেদিন ত একজনে আবেগের আতিশয্যে বলিয়াই ফেলিয়াছেন : "ক্ষমতাসীন হয়ে ছাব্বিশ মাসে দেশের মানুষের দু:খকষ্ট কমাতে পারিনি। তাই মানুষের মধ্যে নতুন নতুন অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। স্বাধীনতার স্বাদ আমরা কতিপয় সুবিধাবাদী লোক ভোগ করব আর সমস্ত দু:খের বোঝা বইবে দেশের মানুষ—এটা বেশীদিন চলতে পারে না। পাক আমলে বলতাম, মানুষের মনে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের অগ্নিগিরি তৈরী হচ্ছে। এই অগ্নিগিরির উপরে কোন শক্তিই টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু আগে যেসব কথা বলতাম, ক্ষমতায় বসে সেসব কথা ভুলে গেছি, এটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।"

..মাননীয় অর্থমন্ত্রীই বলুন, কোথায় তেমন অর্থনৈতিক কাজকর্ম? অর্থ-বছরের প্রায় নয় মাস গেল য়্যানুয়াল প্ল্যানের বড় কোন কাজ, বলিতে গেলে, শুরুই হইতে পারিল না। রিসোর্সের চল্লিশ শতাংশ আসার কথা বৈদেশিক সূত্র হইতে, আর ষাট ভাগ আসার কথা দেশের ভিতর হইতে। বৈদেশিক সূত্রের কথা না হয় বাদই দিলাম। দেশের ভিতর হইতে যে অর্থ-সম্পদ পাওয়ার কথা তারই বা দেখা কোথায়? চারিদিকে এত সস্তা কাগজী টাকার ছড়াছড়ি, তবু ত সরকারী রাজস্বের বিপুল ঘাটতির কথাই শুনি। কেন? কেন শুনি যে, প্ল্যানের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কি তারও বেশী শর্টফল হইতে যাইতেছে?

..কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এসব ব্যাঙের ছাতা সৃষ্টির সুযোগ কাহারা দিয়াছেন? কেন সে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে? বৎসরাধিককাল পূর্ব হইতে এদের দুর্নীতি, এদের লাইসেন্স বিক্রি সম্পর্কে এত যে এজিটেশন চলিতেছে, তবু এই ব্যাঙের ছাতাগুলি উপড়াইয়া ফেলা হয় নাই কেন? আজ যখন এদের 'একনিষ্ঠ' প্রচেষ্টায় দ্রব্যমূল্য তিনশ' হইতে ছয়শ' পার্সেন্ট এমনকি কোন কোন আইটেমে সাত-আটশ' পার্সেন্ট পর্যন্ত বাড়িয়া বাজারে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, তখন সনাতন উপায়ে এখানে সেখানে কিছু খুচরা ব্যবসায়ী ধরা হইতেছে। কিন্তু অর্থমন্ত্রীই বলুন, রাঘব বোয়াল না ধরিয়া কতকগুলি চুনোপুঁটি ধরিয়া কোন বাঞ্ছিত ফল লাভ কি সম্ভব?

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় মার্চ ১৯, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

···লিবারেশনের পূর্বেকার দিনেও প্রতিবছর প্রকল্প ব্যয় গড়পড়তা সাত-আট পার্সেন্টহারে বৃদ্ধি পাইত। লিবারেশনের পরবর্তী আমলে এই বৃদ্ধির কোন হারপটার নাই। কোন লেখা-জোখা নাই। একদিকে মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্য-মূল্য, শ্রমমূল্য ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি, আর অন্যদিকে টাকার মূল্যহ্রাসের দরুন ক্রমেই প্ল্যান-প্রোগ্রামের পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাওয়া। অতএব, অনেক অর্থনীতিবিদের মতে, এ প্ল্যানের কোন মানে হয় না। এত বড় ব্যয়বহুল মহা-মন্ত্রণালয় পোষারই কোন মানে হয় কিনা, জানি না।

১৯৭৩-৭৪ অর্থ বৎসরে আভ্যন্তরীণ সম্পদ খাতে যে ১৭৩ কোটি টাকার এস্টিমেট ধরা হইয়াছিল তাহা পূর্ণ হইবার কোন আশা দেখা যাইতেছে না। উদ্বৃত্ত রাজস্ব ধরা হইয়াছিল ৬৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও ব্যবসা খাতের মুনাফা, অতিরিক্ত কর, পরিত্যক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর মূল্য, আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, ক্যাপিটাল রিসিট প্রভৃতি খাতে আয় ধরা হইয়াছিল ৯০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ নেওয়ার কথা ছিল সোয়া আঠার কোটি টাকা। এইসব মিলাইয়া ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক প্ল্যানের আভ্যন্তরীণ অর্থ-সংস্থানের অনুমিত অঙ্ক ধরা হইয়াছিল ১৭৩ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যাঙ্ক হইতে ধারকর্জের খাত ছাড়া অন্য কোন খাতেই ঈপ্সিত অর্থ অর্জিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অর্থ দফতর ও প্ল্যানিং কমিশনের মুখ আঁটা। কাজেই রিসোর্স ও রাজস্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক কিছু জানার উপায় নাই। তবু আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি আভ্যন্তরীণ রাজস্ব সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তা' বড় উদ্বেগজনক। প্রায় প্রতিটি খাতে রাজস্ব আয়ের দিক দিয়া বিপুল ঘাটতির কথা জানা যাইতেছে। প্রধানতঃ উৎপাদন ও রফতানী হ্রাসই ইহার জন্য দায়ী। রিপোর্টে প্রকাশ, আবগারী শুল্কের প্রধান উৎস সিগারেট ও পেট্রোলিয়াম খাতেই সরকারকে প্রায় ৪৩ কোটি টাকা রাজস্ব হারাইতে হইবে। সিগারেট শিল্পের উৎপাদন উহার লক্ষ্য মাত্রার এক তৃতীয়াংশেরও কম। তৈল শোধন শিল্পের উৎপাদনে আরও শোচনীয় অবস্থা। তাই উক্ত দুই শিল্পে আবগারী শুল্ক আয় সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অনুরূপভাবে বিক্রয়কর এবং আমদানী রফতানী শুল্ক খাতেও প্রচুর ঘাটতির সম্ভাবনা।

··ফরেন রেমিটেন্সের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। অর্থমন্ত্রী গত আগস্ট মাসে লণ্ডন সফর করিয়া যদিও বলিয়াছিলেন যে, প্রবাসী বাঙালীদের সরকারী

সূত্রে স্বদেশে অর্থ প্রেরণ 'উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে' তবু বাস্তব অবস্থা বিপরীত। পত্রান্তরে প্রকাশ, মাড়োয়ারী হুণ্ডি-ব্যবসায়ীরা এই খাতেও বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা বানচাল করিয়া দিয়াছে। পাউণ্ড আসে প্রচুর। তবে সরকারী চ্যানেলে নয়, বাট-পাড়িয়া মাড়োয়ারিয়া চ্যানেলে। টাকার দফা রফা। সরকারের ফরেন এক্সচেঞ্জ তহবিল ফক্কিকার। তবু সবাই আমরা নির্বিকার।

বার্ষিক প্ল্যানের হিসাব অনুযায়ী, এবারকার ব্যালান্স-অব-পেমেন্টের ঘাটতির এস্টিমেট ৩৭০ কোটি টাকা। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা আয় যদি পঁচিশ ত্রিশ পার্সেন্ট কম দাঁড়ায় এবং অন্যদিকে তৈল, খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী আমদানী খাতে ব্যয় দ্বিগুণ বাড়িয়া যায় তবে এই বিরাট ফাঁক কি দিয়া পূর্ণ করা যাইবে? আমার নিশ্চিত ধারণা, এবার খাদ্য-পরিস্থিতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ১৮ লক্ষ, এমনকি ২২ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করিয়াও অবস্থা সামলানো যাইবে না। আরও অতিরিক্ত খাদ্য আমদানী করিতেই হইবে। কিন্তু সে অর্থ কোথায়? ধারে বা ছয় মাস-নয় মাসের ডেফার্ড পেমেন্টের শর্তে খাদ্য কেনা গেলেও সেই মেয়াদের মধ্যে ত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের বুলেটিনে দেখা যায় যে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা-রিজার্ভ গত জানুয়ারীর শেষে মাত্র ৯৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। বিগত দুই মাসে পরিস্থিতির কোন উন্নতি হইয়া না-থাকিলে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কইবা অত ক্রেডিট পার্চেজ অথবা ডেফার্ড পেমেন্টের দায়িত্ব কি করিয়া গ্রহণ করিবেন?

অর্থমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, বাংলাদেশ এক নিদারুণ ব্যালান্স অব পেমেন্ট সঙ্কটের সম্মুখীন। কিন্তু সেই ঘাটতি ব্যালান্স বা আন্তর্জাতিক দায়-পরিশোধের পরিমাণ যে বর্ষশেষে কততে দাঁড়াইবে, অর্থ দফতর বা প্ল্যানিং কমিশন মুখ না-খুলিলে, অপরের পক্ষে তা' সঠিক বলার উপায় নাই। তবে এটা বলা যায় যে, ঘাটতির অঙ্ক বেশ বড়ই দাঁড়াইবে। পাঁচ শ' কোটি ছাড়াইয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়। বৈদেশিক সাহায্যে ইহার কতটা পূর্ণ হইবে, বলা শক্ত।

আরও একটা বিষয় লক্ষণীয়। সরকারের রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় কমিলে কি হইবে, প্রশাসন তথা গোটা এসটাবলিশম্যান্টের সামগ্রিক ব্যয় কিন্তু গাণিতিক হারেই বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রশাসনের কলেবর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পদের জন্য যোগ্য লোক নয়, পোষা লোকের

জন্য উচ্চ পদ সৃষ্টি করা হইতেছে। চারিদিকে চলিতেছে একটা রাজসিক ব্যাপার। চলিতেছে এলাহি কাণ্ড-কারখানা। আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যয় ও বিভিন্ন 'বাহিনীর' ব্যয় উল্লম্ফনে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রশাসনিক কর্মচারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কর্মীদের দাবী মিটাইবার ব্যয় অসম্ভব হারে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-সেক্টর হইতে কোন মুনাফা পাওয়া ত দূরের কথা, সেগুলি বাঁচাইয়া রাখার জন্য উল্টা ঘরের টাকাই ঢালিতে হইতেছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে নগদ অর্থের ভর্তুকী দিতে দিতে সরকার সারা হইতেছেন। আরও বাড়িয়া চলিয়াছে নানাবিধ অনুৎপাদনমূলক ব্যয়। রাজস্বের আয়ে আর কুলাইতেছে না। ব্যাঙ্কের ধারকর্জেও কুলাইতেছে না। নোট ছাপাইয়া এসব ব্যয় সংকুলান করিতে হইতেছে। প্ল্যানে বলা হইয়াছিল যে, পাঁচ বছরে ডেফিসিট ফাইনান্সিং বা ঘাটতি অর্থ যোগানোর পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪২৫ কোটি টাকা। অথচ চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই সরকারের ডেফিসিট ফাইনান্সিং দাঁড়াইয়াছে ১১৪ কোটি টাকা। অধুনা উহার মাত্রা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। একেক সপ্তাহেই কুড়ি-বাইশ কোটি টাকার নোট ছাড়া হইতেছে। এভাবে চলিলে প্ল্যানের প্রথম বছর অর্থাৎ চলতি অর্থ-বছরেই ডেফিসিট ফাইনান্সিং-এর পরিমাণ হয়ত আড়াইশ' কোটি টাকা ছাড়াইয়া যাইবে।

আমার ধারণা, সমাজতন্ত্রের নামে আমরা সাধ্যের অতীত অঙ্গীকার করিয়া ফেলিয়াছি। এসটাবলিশম্যান্টের কমিটম্যান্ট এতটা বাড়াইয়া ফেলিয়াছি যে, অত বড় গোয়ালে ধোঁয়া দিবার সাধ্যও এখন আর নাই। স্টেট ক্যাপিটালিজমকে এবং সবকিছুর সেন্ট্রালাইজেশনকেই মনে করিয়াছি সোশ্যালিজম। ব্যুরোক্র্যাটিক মেশিনারীর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্য চালাইতে গিয়া গোড়াতেই গুরুতর গলদ করিয়া ফেলিয়াছি এবং তজ্জন্য আজ গচচার পর গচচা দিতেছি ও পদে পদে মার খাইতেছি। রাজ্যের দায়-দায়িত্ব মাথায় তুলিয়া লইয়াছি। অথচ উহা বহন করিবার শক্তি নাই। অর্থমন্ত্রী একাধিকবার বলিয়াছেন যে, অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম। বস্তুতঃ পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামোর ঘাড়ে নতুন 'সমাজবাদী' দায়-দায়িত্ব ও উদার অঙ্গীকারের মাত্রাতিরিক্ত বোঝা চাপাইয়া দিবারই এই পরিণতি। তদুপরি, গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত আছে সমাজতন্ত্রের বুলি কপচানো এক শ্রেণীর 'নেতা'সহ অসাধু মহলের বিদেশে বিপুল অর্থ-সম্পদ পাচার। আছে সীমাহীন দুর্নীতি, অন্তহীন অপচয়। আছে লুটপাট

সমিতির ঢালাও কারবার। আছে উপর হইতে নীচ পর্যন্ত প্রশাসনের আগাগোড়ায় অযোগ্যতা, অক্ষমতা, কর্মবিমুখতা ও ব্যর্থতা। কিন্তু এ সবেরও উপর আছে, আমাদের ইডিওলজিক্যাল অবস্টিনেসি বা 'আদর্শের' একগুঁয়েমি। শিশুকে বিনা দুধে মারিব, তবু মায়ের বুকে দুধ আসিতে পারে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিব না। 'আদর্শের' বেদীমূলে এমন সর্বস্ব বলিদান আর কে কবে দিতে পারিয়াছে? আমি যতই চিন্তাভাবনা করি না কেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া ততই তাজউদ্দিন সাহেবের কথায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হই। তিনি বলিয়াছিলেন, এর চেয়ে সোজাসুজি সমাজতন্ত্র বা সোজাসুজি ধনতন্ত্র ভাল। আমিও মনে করি, সমাজতন্ত্রের নামে মিশ্র-অর্থনীতির এই জগাখিচুড়ি করার চেয়ে একটা কিছু সোজাসুজি বাছিয়া লইলেই ভাল ছিল। এমনকি সোজাসুজি ধনতন্ত্রও চলিতে দিলে সবকিছু এতটা এলোমেলো হইয়া পড়িত না। ডঃ মাযহারুল হক বলিয়াছেন, "আমি একথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আমাদের শাসকগোষ্ঠী যেমন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ অযোগ্য তেমনি আমাদের পরিবেশও উহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

...আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, আমরা আজ যেখানে চলিয়াছি তাহা 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন।' তলাইয়া যাওয়া ছাড়া সেখান হইতে ফেরার কোন আশা নাই। এই মুহূর্তেই জগাখিচুড়ি নীতি বাদ দিয়া সোজাসুজি একটা কিছু গ্রহণ না করিলে আর কোন 'বাঁচাও' নাই। সকল সূত্র হইতে প্রচুর বাহ্যিক সাহায্য আসিলেও উহা লাইনচ্যুত অর্থনৈতিক ট্রেনকে আর লাইনে দাঁড় করাইতে পারিবে না। দুই বৎসরে দুই সহস্রাধিক কোটি টাকা পরিমাণ 'দান ও ত্রাণ' সাহায্য পাওয়া সত্ত্বে ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে আমাদের নিদারুণ ব্যর্থতাই ইহার জলন্ত প্রমাণ।

এইডের কথা যখন উঠিল তখন সেকথাও কিঞ্চিৎ বলি। পূর্বেই বলিয়াছি যোজনার প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালে ৩৫২ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য প্রত্যাশা করা হইয়াছিল। এ কথাও বলিয়াছি যে, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দ্রব্যমূল্য তথা সামগ্রিক কস্ট বৃদ্ধির দরুন এই সাহায্যের দ্বারা উন্নয়ন ব্যয় সংকুলান ত দূরের কথা, অগ্নিমূল্যে খাদ্য, তৈল, কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ও অপরিহার্য দ্রব্য সামগ্রী আমদানীর বিল পরিশোধ করাই অসম্ভব। কাজেই, উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য আরও অনেক বেশী সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু কথায় বলে, "মোটে মায়ে রান্ধে না, তপ্ত আর পান্তা'। এক সহযোগী পরিকল্পনা কমিশন সূত্রের বরাত দিয়া গত ২৬শে মার্চ

খবর দিয়াছেন যে, প্রত্যাশিত সাড়ে তিন শ' কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে এ যাবৎ মাত্র দুইশ' কোটি টাকার 'আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র চল্লিশ কোটি টাকা হাতে আসিয়াছে ও ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত সহযোগীই ৭ই মার্চ খবর দিয়াছিলেন যে, এবারকার বার্ষিক যোজনার ৫০ শতাংশই শর্টফল হইবার সম্ভাবনা। সহযোগী বলিয়াছিলেন যে, অর্থাভাবের দরুন জামালগঞ্জ কয়লা ও গ্রামাঞ্চল বিদ্যুতায়নের ন্যায় 'জাতীয় মর্যাদাজনক প্রোজেক্টসমূহ স্থগিত হইয়া যাইতে পারে। অপর এক সহযোগীও লিখিয়াছেন যে, চলতি অর্থ-বৎসরের প্রথমার্ধে প্রকল্প-সাহায্য ও অপ্রকল্প-সাহায্য মিলাইয়া মাত্র ৬ কোটি ডলার (৪৫ কোটি টাকা) ফরেন এইড পাওয়া গিয়াছে।

বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারটা সত্যই আমাদের কাছে বড় অদ্ভুত মনে হইতেছে। কাগজে-পত্রে বিদেশী প্রতিনিধিদলের এত সফর, এত জরিপ, এত আশ্বাস ও এত চুক্তির কথা পাঠ করি, অথচ বছরে ছয় মাস-নয় মাসে মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য আসে, এটা কেমন কথা? বছরের নয় মাস গেল, আজও বিশ্বব্যাঙ্কের 'বাংলাদেশ এইড কনসর্টিয়াম-ই গঠিত হইল না, এটাইবা কি ব্যাপার? আমরা এই 'কলামে' অনেকবার সরকারকে এবিষয়ে আলোকসম্পাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। গত ২৮শে আগস্ট এক নিবন্ধে আমরা লিখি, "স্বাধীনতার পর হইতে এযাবৎ বিভিন্ন সূত্রে বাংলাদেশের এই (ও রিলিফ) প্রাপ্তি ও উহার ব্যবহার সম্পর্কে প্ল্যানিং কমিশন বা অর্থ মন্ত্রণালয় একটি পূর্ণ ভাষা সম্বলিত শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন, জনগণের পক্ষ হইতে ইহা আমাদের অনুরোধ। সাহায্যের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কোন সিক্রেট নয়। অতএব, এ বিষয়ে জনসাধারণকে আস্থায় লইতে অসুবিধা কি?" কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাশভারী প্ল্যানিং কমিশন এতই গদাইলস্করী চালে চলেন যে, জনমতকে তাঁরা বড় একটা গা করেন না।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় মার্চ ৩০, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

... রাজনীতি যেমন তেমন, অর্থনীতির আজ নাভিশ্বাস। সম্প্রতি 'শিক্ষা ও জনশক্তি সেমিনারে' প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ডঃ মাযহারুল হক সোজাসুজি ভাষায় বলিয়াছেন : "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমানে বিপর্যস্ত। মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, কর্মবিমুখতা, শ্রমিক অসন্তোষ, উৎপাদন হ্রাস, রাজস্ব হ্রাস, ব্যয়-বৃদ্ধি, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বৈদেশিক সাহায্যের অপ্রতুলতা ইত্যাদি দুরবস্থা উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ ও ব্যাহত

করিয়াছে। একথা বললেও অত্যুক্তি হইবে না যে, বর্তমান অবস্থা আর কিছুদিন চলিলে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হইবে।"

ডক্টর হক রাজনীতিক নন, তিনি একজন প্রবীণ অর্থনীতিবিদ। সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেই গোটা পরিস্থিতি যাচাই করিয়া তিনি এই সুচিন্তিত রায় দিয়াছেন। বস্তুতঃ দেশের এ্যাকাডেমিক ইকনমিস্টদের প্রায় সবারই অভিন্ন মত। আর অর্থনীতিবিদদের কথা কি বলিব, দেশের বিজ্ঞ অর্থমন্ত্রী নিজেই ত কতবার কত জায়গায় কতভাবে বলিয়াছেন যে, জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংসোন্মুখ। এই সেদিনও তিনি এক ভাষণে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজস্ব সহ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের যে চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহাকে করুণ ও হতাশাব্যঞ্জক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আভ্যন্তরীণ রাজস্ব খাতে, অর্থমন্ত্রীর মতে, ব্যয় বাড়িয়াছে ১০০ কোটি টাকা। সেই অনুপাতে আয় বাড়ে নাই। রাজস্বের বহু খাতে বিরাট শর্টফল। নোট ছাপাইয়া ঘাটতি মিটাইতে-মিটাইতে কাগজী টাকারই দফা রফা। বিপিআই খবর দিয়াছেন যে, চলতি অর্থ-বৎসরের ৩২৪ কোটি টাকা পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যের মধ্যে প্রথম আট মাসে অর্জিত হইয়াছে ১৮৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, পরবর্তী চার মাসে অবশিষ্ট ১৩৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এমনকি পাট ও পাটজাত জিনিসের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় কোরিয় বুমের ন্যায় বুম চলা সত্ত্বেও কি পাট, কি পাটজাত দ্রব্যখাতে রফতানী লক্ষ্য সম্পূর্ণ অর্জিত হইবার আশা দেখা যাইতেছে না। বাজেটে এবারকার অনুমিত বৈদেশিক সাহায্যের অংক ধরা হইয়াছিল ৩৫২ কোটি টাকা। কিন্তু জনৈক ইংরেজী সহযোগী গত ১৫ই এপ্রিল 'নির্ভরযোগ্য সূত্রের' উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, বর্তমান অর্থ-বৎসরে আড়াই শ' কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির আশ্বাস পাওয়া গেলেও প্রকৃত প্রাপ্যতা মাত্র শতেক কোটি টাকা। অথচ অর্থমন্ত্রীর সাম্প্রতিক উক্তি অনুযায়ী, খাদ্য আমদানীতেই লাগিবে ৩৬০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জ্বালানিমন্ত্রীর মতে, তৈল আমদানীতে ব্যয় হইবে মোটামুটি দেড়শ' কোটি টাকা। এছাড়া ভোগ্য ও ভোজ্যপণ্য, শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি, ঔষধ ও নির্মাণসামগ্রী আমদানী খাতে কমছে-কম চারশ কোটি টাকার প্রয়োজন ত আছেই। কিন্তু কোথায় এত বৈদেশিক মুদ্রা? বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের পরিবেশিত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে সম্প্রতি পত্রিকান্তরে খবর বাহির হইয়াছে

যে, দেশের 'অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা'র তহবিল শূন্যের কোটায়। অর্থাৎ স্পেশাল ড্রয়িং রাইট অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে কর্জস্বরূপ লব্ধ ষাট কোটি টাকা ছাড়া বাংলাদেশের তহবিলে কার্যতঃ আর কোন বৈদেশিক মুদ্রা-রিজার্ভ নাই। অথচ মাত্র সোয়া বছর আগেও বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ছিল ২০২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। আমি মাসাধিককাল আগে এই কলামে উদ্বেগাকুল হইয়া লিখিয়াছিলাম যে, সরকারের হাতে যে-বৈদেশিক মুদ্রা আছে তাহার দ্বারা বড় জোর দুই লক্ষ টন চাল বা চার লক্ষ টন গম কেনা যাইতে পারে। মাসখানেকের মধ্যে তদপেক্ষাও পরি-স্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটিয়াছে এবং লক্ষ্য করা যাইতেছে, সেই অব-নতির ধারা অবিরাম।

অতএব, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে কী সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে তাহা এই সকল তথ্য হইতেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এখন আর বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করার প্রশ্ন নয়, এখন অর্থনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা করারই একমাত্র প্রশ্ন। আর অর্থনৈতিক অস্তিত্বই যদি, খোদা না-খাস্তা, ধ্বসিয়া পড়ে তবে কোথায় থাকিবে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম জাতীয় অস্তিত্বের বৃহত্তর প্রশ্ন?

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় এপ্রিল ২৫, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

১৯৭৩-৭৪ অর্থ বৎসরের এটা সর্বশেষ মাস। শেষ মাস এটা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনারও। সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার বিশাল পাঁচসালা পরিকল্পনার একটা বৎসর কার্যতঃ অমনি-অমনি গেল। যোজনার প্রথম বৎসরটাই, বলিতে গেলে, প্রমাণিত হইল বন্ধ্যা। যে বার্ষিক পরিকল্পনার শতকরা পঞ্চান্ন বা ষাট ভাগই ঘাটতি, সেটা বন্ধ্যা নয়ত কি?

কিন্তু কেন এই বন্ধ্যাত্ব? কেন এই ব্যর্থতা? এ ব্যাপারে প্ল্যানাররা দোষারোপ করেন রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষের উপর।

পাঁচসালা যোজনার প্রথম বৎসরটাই দেখা গেল বন্ধ্যা। আর প্রথম বার্ষিক প্ল্যানের ষাট ভাগই শর্টফল। পৃথিবীর কোন দেশে কোন প্ল্যানে এরূপ অস্বাভাবিক ঘাটতি ও নিদারুণ ব্যর্থতা দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

এই বন্ধ্যাত্ব ও ব্যর্থতার পিছনে নিশ্চয়ই এগুলির অনেক 'দান' রহিয়াছে কিন্তু আমার মতে, এর জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী আমাদের গোড়ার গলদ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'আমি জেনে-শুনে বিষ করেছি পান'।

আমরাও জানিয়া-শুনিয়া ভুলের পর ভুল করিয়াছি। একগুঁয়ের মতো সেই ভুলগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছি। আমাদের সরকারের ইকনমিক 'কনসেন্স কীপার'রা শাসকদলকে এর পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেন নাই। অদূরে গুরুতর অর্থনৈতিক নিম্নচাপ সৃষ্টি হইতেছে এবং টর্নেডো-টাইডাল বোরের সম্ভাবনা রহিয়াছে—এ-সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন নাই। বরং 'ব্রাহ্মণী! ও কিছু নয়, বাতাস' বলিয়া শাসন কর্তৃপক্ষকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমসাময়িক বিশ্বের মুদ্রাস্ফীতির সমস্ত রেকর্ডকে আমাদের দেশের গ্যালপিং ইনফ্লেশনের পাগলা ঘোড়া যখন ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখনও আমাদের সরকারী ব্যাঙ্কিং এক্সপার্টরা বলিয়াছেন যে, দেশের প্রকৃত চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, উহার পরিপাক শক্তি বিচার করিয়াই টাকার ভোজ্-বা অর্থের যোগান বাড়ানো হইয়াছে, মুদ্রাস্ফীতি বলিতে যাহা বোঝায়, বাংলাদেশে তাহা নাই।

আমাদের বিশেষজ্ঞদের 'বিচক্ষণতা' ও 'দূরদর্শিতার' এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। পলিটিশিয়ানরা এক্সপার্ট নন। তাঁহারা উৎ-সাহের আতিশয্যে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে গেলে অথবা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়িতে গেলে তাহাদিগকে ভ্রান্ত নীতির অবাস্তব পথ হইতে ফিরানো অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদেরই দায়িত্ব। আমাদের অর্থনৈতিক প্ল্যানাররা সে দায়িত্ব কি স্বাধীন বিবেক ও অনন্য নিরপেক্ষ মন লইয়া পালন করিতে পারিয়াছেন? নিঃসন্দেহেই পারেন নাই। দেশ ও দুনিয়ার অর্থনৈতিক হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে, দ্রুত মুদ্রামূল্য হ্রাস ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন প্রকল্প বা যোজনার পায়ের তলা হইতে মাটি কিভাবে প্রতিমুহূর্তে সরিয়া যাইতেছে ও সঙ্কট প্রতিদিন কি হারে বাড়িতেছে, আমাদের দেশের ক্ষমতা-সীন দল—আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব কামরুজ্জামানও সম্প্রতি বলিয়াছেন 'এই মুহূর্তে পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, আমাদের পর্যায়ক্রমে আগাইয়া যাইতে হইবে'। কিন্তু বাস্তবে কি এই নীতি অনুসরণ করা হইতেছে? নিশ্চয়ই হইতেছে না। বরং এমন সব এলোপাতাড়ি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে যাহার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন উৎসগুলি, গুটিকয়েক ব্যতিক্রম বাদে বিপর্যস্ত। লোকসানের অন্ত নাই। ভর্তুকী দিতে দিতে সরকার সারা। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পজাত পণ্যমূল্য উপর্যুপরি বৃদ্ধি করিয়াও লস্ এড়ানো যাইতেছে না। একদা যেসব শিল্প-ইউনিট প্রচুর লাভজনক ছিল, আজ সেগুলি আন-ইকনমিক ইউনিট হইয়া দাঁড়াইতেছে। লোকসানে-লোকসানে সেগুলি

রক্তশূন্য। শিল্প ক্ষেত্রে বৈদেশিক পুঁজির কোলাবোরেশনকে অধুনা আমন্ত্রণ জানানো হইতেছে। বৈদেশিক পুঁজিবিনিয়োগকারীদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাকেও সাগ্রহে আমন্ত্রণ করা হইতেছে। অথচ দেশের আভ্যন্তরীণ পুঁজিকে অবাস্তব সিলিং ও অবাঞ্ছিত বিধি-নিষেধ আরোপ দ্বারা গুরুতররূপে সীমিত ও আড়ষ্ট করিয়া রাখা হইতেছে। বিদেশী পুঁজির যৌথ-উদ্যোগকে সাদরে আহ্বান জানানো হইতেছে, কিন্তু দেশী পুঁজিকে যৌথ-উদ্যোগের সুযোগ দেওয়া হইতেছে না, এমনকি সরকারের হাতে কন্ট্রোলিং শেয়ার রাখিয়াও না। স্বদেশী শিল্পোদ্যোগীদের বহু বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হইতেছে না। ফলে, বিপুল সম্পদ বিদেশে পাচার হইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি খবর বাহির হইয়াছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাঙালীদের অর্জিত প্রচুর মূলধন ও বৈদেশিক মুদ্রা দেশের শিল্পোন্নয়নে নিয়োজিত না-হইয়া লণ্ডনে পাচার হইতেছে। দেশের ভিতর এখনও যে-মূলধন লোকের হাতে আছে তাহাও 'শাই'। উহা ধনোৎপাদনে বিনিয়োগ করা হইতেছে না। গত দুই-আড়াই বৎসরে সৃষ্ট নব্য কমপ্যারাডর বুর্জোয়াদের হাতে শত শত কোটি টাকার ব্ল্যাকমানি। তাহা ছাঁকিয়া তোলা বা ধনোৎপাদনের পথে নিয়োজিত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করা হইতেছে না। প্ল্যানাররা রিসোর্সের অভাবের কথাই শুধু বলেন। কিন্তু এসব সম্পদ আহরণের পথ বাৎলান না। কালো টাকা ছাঁকিয়া তোলা বা দেশের কাজে লাগাইবার বাস্তব উপায় কি, সেটুকুও তাঁহারা বলেন না। অল্পদিন আগে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞদল বাংলাদেশে আসিয়া এখানকার অবস্থা জরিপ করিয়া অর্থনীতি পুনঃবিন্যাসের জন্য কতগুলি সুপারিশ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের অর্থনৈতিক প্ল্যানার ও কর্ম-কর্তারা সে বিষয়ে নীরব, নির্লিপ্ত, নির্বিকার। নিজেদের ব্যর্থতার দোষ স্খলনের জন্য তাঁহারা দায়িত্ব চাপাইতেছেন প্রশাসনিক অযোগ্যতার উপরে—অন্য কথায়, রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষের উপর। আর ওদিকে রাজনৈতিক শাসক শ্রেণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একে অপরের উপর এবং কার্যতঃ প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর দোষ চাপাইয়া নিজেকে নির্দোষ ও দায়-দায়িত্বমুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কী হাস্যকর এই 'এস্কেপ-গোটের' প্রচেষ্টা!

...চলতি সালে বৈদেশিক সাহায্য প্রত্যাশা করা হইয়াছিল ৩৫২ কোটি টাকা। এর লম্বা লম্বা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিতেই বৎসর কাটিয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে যা পাওয়া গেল তা নাকি শতেক কোটিরও কম। নব্য স্বাধীন

বাংলাদেশকে সাহায্য দিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে বিশ্বসম্প্রদায় যে ক্ষেত্রে গোড়ার দিকে এত উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন, গত বৎসরাধিককাল যাবৎ সাহায্য দানে তাঁহাদের কেন এত অনীহা, দ্বিধা, সঙ্কোচ ও দীর্ঘসূত্রতা, আমাদের প্ল্যানাররা তা' বলেন না। বস্তুতঃ তাঁহাদের বলার মত কোন কৈফিয়ৎ নাই। তাঁহারা জানেন, এইড ঠিকই আসিত। কিন্তু তাঁহারাই তাঁহাদের অপরিণামদর্শী কার্যক্রম দ্বারা উহাকে নিরুৎসাহিত করিয়া দিয়াছেন। এখন আবার তাঁহারাই বলিতেছেন, বৈদেশিক সাহায্যের আঙ্গুর ফল বড় টক। উহার উপর জাতীয় অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অত বেশী নির্ভরশীল করিয়া রাখা উচিত নয়। এই বিজ্ঞ, বিদগ্ধ মহলকে স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় : বৈদেশিক সাহায্যের আঙ্গুর ফল যদি অতই টক তবে আপনারা প্ল্যানের ৬০ পার্সেন্টকেই কেন উহার উপর নির্ভরশীল করিয়া প্ল্যান রচনা করিয়াছিলেন। আঙ্গুর ফল টক বলিয়াই কি আই.ডি.এ. বা ইউ.এন. ডি.পি. অথবা অন্যান্য বৈদেশিক সূত্রের মঞ্জুরীকৃত প্রকল্প সাহায্যের অধিকাংশ আপনারা অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন? নাকি 'ডেস্ট্রাকশন প্রিসিডস কনস্ট্রাকশন' প্রবচন অনুযায়ী ডেস্ট্রাকশন ডিমোলিশন এখনও পুরাপুরি সম্পন্ন হয় নাই বিধায় আপনারা কনস্ট্রাকশন শুরুই করিতে পারিতেছেন না? তাই কি পাঁচ বৎসরের যোজনার একটা বছর অমনি অমনি নষ্ট করা হইল?

আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকর্তারা বিশ্ব ব্যাঙ্কের 'এইড-টু বাংলাদেশ কনসর্টিয়াম' গঠনের আশ্বাসবাণী বৎসরাধিককাল ধরিয়া শোনাইতেছেন। আমরা জানিতাম, এসব অলীক আশা। আমরা আমাদের অর্থনীতির পাগলা ঘোড়াকে ডিসিপ্লিনে আনিতে না পারিলে আমাদের নীতি ও উদ্দেশ্য আরও সুস্পষ্টভাবে বিশ্বসমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে না পারিলে এবং ল' এ্যাণ্ড অর্ডার পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম না হইলে মুখ্য সাহায্যদানকারী মহলগুলি সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসিতে তেমন উৎসাহ বোধ করিবে না। এটাও কিছু অজানা বিষয় ছিল না!

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় জুন ৪, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

...স্বাধীনতার পর গত তিন বৎসরে ব্যাঙ্ক হইতে নেওয়া ঋণ উৎপাদনশীল খাতে এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয় নাই। যেখানে ঋণ দেওয়া উচিত ছিল না সেখানেও প্রচুর ঋণ দেওয়া হইয়াছে। এর ফলে যেমন সর্বক্ষেত্রে

মওজুদদারি বাড়িয়াছে তেমনি অনুৎপাদক ঋণের পাহাড় জমিয়া যাওয়া মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনাব নাজির আহমদ দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন যে, দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত ও গতিশীল করার উদ্দেশ্যে লিবারেশনের পর হইতে ব্যাঙ্কের ঋণদান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু তদসত্ত্বেও এখনও শিল্পোৎপাদন সর্বশেষ স্বাভাবিক বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালের উৎপাদন স্তরের পিছনে রহিয়াছে। দেশের পণ্য রফতানী স্বাধীনতা পূর্বকালীন পর্যায়ে পৌছিতে ব্যর্থ হইয়াছে। কৃষি-উৎপাদনেও অবনতি ঘটিয়াছে। এই সব কারণের সহিত দ্রুত-মুদ্রা-সরবরাহ যুক্ত হইয়া মূল্য-মাত্রার উপর সাংঘাতিক চাপ সৃষ্টি করিয়াছে। দেশে বিপুল মুদ্রাস্ফীতির জন্যও এটাই দায়ী।

...গভর্নর নাজির আহমদ সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্বজন-বিদিত সত্য কথা। তবে তাঁহার পূর্বসূরীরা অতটা খোলাখুলিভাবে এসব কথা স্বীকার করেন নাই। বরং কেহ কেহ মুদ্রাস্ফীতির অস্তিত্বকেই অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

..বর্তমানে বাংলাদেশের মুদ্রা বিনিময় হারকে কোন মাপকাঠিতেই বিচার করা যায় না। সরকারীভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের মুদ্রা মূল্যমান সমান, কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশের মুদ্রা মূল্য প্রায় এক তৃতীয়াংশ। অন্যান্য মুদ্রার ক্ষেত্রেও একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যাহার ফলে নোট ছাপাইয়া সরকারী-বেসরকারী খাতের অফুরন্ত চাহিদার কেবল যোগানই দেওয়া হইয়াছে, উহার পরিণামের কথা তেমন ভাবা হয় নাই। এবং হয় নাই বলিয়াই মানি-সাপ্লাই বাড়িতে বাড়িতে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের ৩৮৮ কোটি টাকার স্থলে গত ৩১শে জানুয়ারী উঠিয়াছে প্রায় ৯১৫ কোটি টাকায়। ধনোৎপাদন যদি সেই অনুপাতে বাড়িত তবে কোন কথা ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশ বাঙ্কের গভর্নরের স্বীকৃতি-মতেই, কি কৃষি, কি শিল্প কোন খাতেই উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালের পর্যায়ে উঠিতে পারে নাই, বরং সেই তুলনায় এখনও প্রচুর ঘাটতি রহিয়াছে। অথচ সেই বেসুইয়ারের তুলনায় বর্তমানে মানিসাপ্লাই বাড়িয়াছে প্রায় ২৩৬ পার্সেন্ট। হাইপার ইনফ্লেশন কি আর সাধে? অগ্নিমূল্য কি অকারণ?

মানি সাপ্লাইয়ের কথা থাক, ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের কথায় ফিরিয়া আসি। বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক রিপোর্টে জানা যায়, সেই এক বৎসরেই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট ২০৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৮১৬

কোটি ৯৩ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে উহা বাড়িয়াছিল ১৮৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের অপর এক রিপোর্টে দেখা যায়, গত ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত চলতি অর্থবৎসরের প্রথম সাতমাসে ব্যাঙ্কক্রেডিট বাড়িয়াছে ১২৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত দুই বৎসর সাত মাস সময়ে ব্যাঙ্ক-ক্রেডিট ৫১৬ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৯৪২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। ১৯৭৪-৭৫ সালের মাসিক বৃদ্ধির গড় পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষাও অধিক - যেমন অধিক ছিল পূর্বেকার বৎসরের অনুপাতে ১৯৭৩-৭৪ সালের মাসিক ব্যাঙ্ক-ক্রেডিট সম্প্রসারণের গড়। এই হারে ক্রেডিট বৃদ্ধি অব্যাহত থাকিলে চলতি অর্থ বৎসরের শেষ নাগাদ ব্যাঙ্ক ক্রেডিট এক হাজার কোটি টাকার উপর উঠিবে। এবং মানি-সাপ্লাইও বর্তমান হারে বাড়িতে থাকিলে অর্থ বৎসরের শেষে হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি পৌছিবে।

...আমরা জানি, আমাদের অর্থনৈতিক ফ্যাক্টরসমূহ এত অস্থির ও অনিশ্চিত যে, বাজেটের ব্যালান্স বা আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা সুকঠিন। আমাদের কোন এস্টিমেটেই টিকে না। কিসে যেন কি হইয়া যায়।

...১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেট রাজস্বখাতে অনুমিত আয় ও ব্যয় ধরা হইয়াছিল যথাক্রমে ৪১১ কোটি ৩১ লক্ষ ও ২৯৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। সংশোধিত বাজেটে উহা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৭৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ও ৩৬৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এস্টিমেটের চেয়ে রাজস্ব-আয় হ্রাস পায় ৩৩ কোটি ৯৫ লক্ষ এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায় ৬৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। দুই দিকের গ্যাপটা প্রায় একশ চার কোটি টাকা, অর্থাৎ বাজেটের ব্যয়বরাদ্দের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী। এই অস্বাভাবিক বাজেট গ্যাপের পরও আছে 'রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও সরকারী করপোরেশনসমূহের বিস্তর লোকসান।' বস্তুতঃ পাবলিক সেক্টরকে ক্রমাগত সরকারী ভর্তুকী ও ক্রমবর্ধমান ব্যাঙ্কক্রেডিট দ্বারা চালু রাখিতে হয়। ইহা জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যাধির মুখ্য কারণসমূহের অন্যতম।

..একটা বিষয় সুস্পষ্ট। আমদানী ও রফতানীর ক্ষেত্রে আমাদের বিরাট গ্যাপ। আই.ডি.এ. এবং অন্যান্য বৈদেশিক সূত্র হইতে এবার বেশ ঋণ ও সাহায্য আসিতেছে। তদ্‌সত্ত্বেও ব্যালান্স-অব-পেমেন্টের বিপুল ঘাটতি দাঁড়াইবার আশঙ্কা। ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্সের রিপোর্টে জানা যায়, চলতি অর্থ বৎসরের প্রথম ছয় মাসে পণ্য রফতানী খাতে ১৪৮ কোটি টাকা অর্জিত

হইয়াছে এবং আমদানী খাতে ৩৫৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। অর্থাৎ ট্রেড ব্যালান্সের ছয় মাসের ঘাটতি ২০৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালের প্রথম ছয় মাসের রফতানী আয় পূর্ববর্তী বৎসরের উক্ত পিরিয়ডের তুলনায় প্রায় ১৩ কোটি টাকা কম। ট্রেড ব্যালান্সের ঘাটতি এবার নিঃসন্দেহে আরও বেশী দাঁড়াইত।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় মার্চ ৭, ১৯৭৫

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত শ্বেতপত্র : আকাঙ্ক্ষিত অর্থনীতি গড়ার জাতীয় উৎসাহ ও উৎপাদিকা শক্তি নস্যাৎ করিয়া ধনলিপ্সু চক্রের সৃষ্টিই চরম অর্থনৈতিক নৈরাজ্য ও গণদুর্দশার কারণ

"দেশের অর্থনীতি গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে যে-কোন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য জনগণের মধ্যে সীমাহীন উৎসাহ ও উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদিকা শক্তিসমূহকে উৎসাহ ও নেতৃত্ব দানের পরিবর্তে একটি অর্থ-নৈতিক স্বার্থান্বেষী চক্র সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং উহারই পরিণতিতেই দেখা দেয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থা ও নৈরাজ্য। ইহার ফলশ্রুতিতে জনগণের ব্যাপক দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেয় এবং সৃষ্টি হয় মুষ্টিমেয় হঠাৎ স্ফীত ক্রোড়পতির; সহজাতভাবেই ইহারা দুর্নীতিবাজ এবং সমাজের শাশ্বত মূল্যবোধগুলি বিনষ্ট করার জন্য তাহারাই দায়ী।"

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া প্রেসিডেন্টের সচিবালয় কর্তৃক গতকাল (শুক্রবার) প্রকাশিত এক শ্বেতপত্রে উপরিউক্ত মন্তব্য করা হয়। শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, দেশের অর্থনীতি 'স্থবিরতার' পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে।

১৫ই আগস্টে সরকার পরিবর্তনের পর ২৫শে আগস্ট প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত অর্থনৈতিক দায়িত্বন্যস্ত কর্মীদল দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মূল প্রতিবন্ধকসমূহ পর্যালোচনা করিয়া যে রিপোর্ট পেশ করেন, উহার ভিত্তিতে এই শ্বেতপত্র প্রণীত হইয়াছে।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অবহিত হইবার ব্যাপারে জনগণের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া প্রকাশিত শ্বেতপত্রে স্বাধীনতার পর হইতে প্রাপ্ত বিপুল বৈদেশিক সাহায্য মঞ্জুরীর অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির দরুন দাতা ও দেশসমূহের অনাস্থা, দ্রব্যমূল্য ৪ গুণ বৃদ্ধির

ফলে জনজীবনে দুর্দশা, শিল্প ক্ষেত্রে শাসকচক্রের উচ্চাভিলাষী অংশের সৃষ্ট শ্রমিক বিশৃংখলা এবং পণ্য বণ্টন ক্ষেত্রে অব্যবসায়ী রাজনৈতিক টাউটদের সৃষ্ট নৈরাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, এই পরিস্থিতিতে সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সততা, যৌক্তিকতা ও শৃংখলা ফিরাইয়া আনাকেই আশু দায়িত্ব বলিয়া মনে করেন।

শ্বেতপত্রে বলা হয় যে, দেশমুক্তির পর উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্রদত্ত বিপুল সাহায্য ও মঞ্জুরী ঐকান্তিক ও দৃঢ়সংকল্প নেতৃত্বের অভাবে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে নাই। ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি চলিতে থাকায় অনেক সাহায্যদাতা দেশ নিজেদের আয়ো-জনে সরাসরি ত্রাণসামগ্রী বণ্টনের জন্য দাবি জানাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

শ্বেতপত্রে সাবেক সরকারের আমলের মুদ্রাস্ফীতির অস্বাভাবিক মাত্রার কথাও উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, চাউলের মূল্য ৪০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাতে ভূমিহীন বেকার ও স্থির আয়ের লোকদের জীবনে দুর্দশা নামিয়া আসে।

শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ণতঃ ব্যবহার করিবার অক্ষমতার ফলে একমাত্র ৭৪-৭৫ সালেই ৫৫০ কোটি টাকার উৎপাদন খোয়া যায়। শিল্প-ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির অন্যতম কারণ হিসাবে শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, সাধারণ শ্রমিকগণ শিল্পশান্তি ও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও শাসকচক্রের কোন কোন ব্যক্তি নিজেদের উচ্চা-ভিলাষ ও স্বার্থ চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের মধ্যে বিশৃংখলার অনুপ্রবেশ ঘটায়। এই স্বার্থবাদী চক্র কলকারখানায় লুটতরাজ চালায় এবং মূলধন ধ্বংস করে।

শ্বেতপত্রে বলা হয় : দেশের অর্থনৈতিক এবং আর্থিক পরিস্থিতি জানিবার অধিকার জনগণের রহিয়াছে, সরকার সশ্রদ্ধভাবে তাহা স্বীকার করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ আশঙ্কাজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এব্যাপারে জনগণকে অবহিত করানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তিনি মনে করেন।

২। দেশের অর্থনীতি গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে যে কোন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য জনগণের মধ্যে সীমাহীন উৎসাহ ও উদ্দীপনা থাকাসত্ত্বেও উৎপাদিকা শক্তিসমূহকে উৎসাহ ও নেতৃত্ব দানের পরিবর্তে একটি অর্থ-

নৈতিক স্বার্থান্বেষী চক্র সৃষ্টি করা হইয়াছিল, উহার পরিণতিতেই দেখা দেয় চরম অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও নৈরাজ্য। ইহার ফলশ্রুতিতে জনগণের ব্যাপক দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেয় এবং সৃষ্টি হয় মুষ্টিমেয় হঠাৎ করিয়া স্ফীত ক্রোড়পতির, সহজাতভাবে ইহারা দুর্নীতিবাজ এবং সমাজের শাশ্বত মূল্য-বোধগুলি বিনষ্ট করার জন্য তাহারাই দায়ী।

৩। ১৯৭৫-এর ২৫শে আগস্ট দেশের চলমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং মূল অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সনাক্ত করার জন্য প্রেসিডেন্ট একটি অর্থনৈতিক দায়িত্ব-ন্যস্ত কর্মদল বা টাস্ক ফোর্স নিয়োগ করেন। দায়িত্ব-ন্যস্ত কর্মীদল অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে সমস্যাবলী পরীক্ষা করেন এবং ১৯৭৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্টের নিকট তাঁহাদের প্রতিবেদন পেশ করেন। ঐ প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই এই শ্বেতপত্র প্রণয়ন করা হইয়াছে। শ্বেতপত্রে দেখা যাইবে যে, দেশের অর্থনীতি ইতিমধ্যে স্থবিরতার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। অর্থনীতি ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার, সঙ্গতিপূর্ণ করা ও সুশৃংখল করা এবং দুর্দশাকাতর লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্ভোগ লাঘবের আন্তরিক চেষ্টা হিসাবে সরকারও জনগণের সামনে পরিব্যাপ্ত বিশাল দায়িত্ব ও কর্মযজ্ঞেরও প্রতিফলন ইহাতে পাওয়া যাইবে।

৪। বাঙ্গালী জাতির প্রতিভা বিকাশের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পত্তনের লক্ষ্য লইয়াই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালিত হইয়াছিল। এই লালিত আকাঙ্ক্ষা সফল করার উদ্দেশ্যে চরম ত্যাগ স্বীকার করা হয়। বাংলা-দেশের মর্মন্তুদ ঘটনাবলী বিশ্ব-সমাজের ব্যাপক সহানুভূতি অর্জন করে। উদ্বাস্তু লোকদের পুনর্বাসন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য আমরা ব্যাপক ও বিপুল সাহায্য ও অনুদান লাভ করি। আশা করা গিয়াছিল যে, উৎসর্গীকৃত প্রাণ ও সংকল্পবদ্ধ নেতৃত্ব থাকিলে, দেশীয় সম্পদাবলীর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা,সাহায্যের সৎ ও যথাযথ সদ্ব্যবহার করা হইলে অত্যল্প-কালের মধ্যে অর্থনীতি পুনর্বাসন এবং উৎপাদিকা শক্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে সংগঠিত করা সম্ভব হইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ সাহায্য ও মঞ্জুরীর বহুলাংশ যথা-যথভাবে ব্যবহার করা হয় নাই। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি এতই ব্যাপক ও নির্বিচার ছিল যে, অনেক সাহায্যদাতা দেশ ত্রাণসামগ্রী বণ্টনের জন্য নিজস্ব আয়োজন গ্রহণের জন্য চাপ দিতেছিল।

পরিকল্পনা : ৫। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা শুরু করা হইলেও পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রতি পূর্ণ অঙ্গীকার

ঘোষণা করা হয় নাই। ইহার ফলে, পরিকল্পনা মেয়াদের মাঝামাঝি আসিয়া ১৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরেও সামগ্রিক উৎপাদনমাত্রা ১৯৬৯-৭০-এর মাত্রার নীচে পড়িয়া থাকে এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয় আরও কম থাকে।

কৃষি : ৬। কৃষিক্ষেত্রে মোট খাদ্যোৎপাদন ১৯৬৯-৭০-এর ১১৯ দশমিক ১৯ লক্ষ টন হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৭৪-৭৫ সালে ১১৪ দশমিক ৮৩ লক্ষ টনে উপনীত হয়। সার, বীজ, পাম্প ও কীটনাশকের মত কৃষি উপকরণগুলির সরবরাহে ছিল ঘাটতি ; এমনকি প্রাপ্ত উপকরণগুলিও অদক্ষ প্রশাসন ও ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থার জন্য যথাসময়ে কৃষকদের হাতে পৌঁছিত না। উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের বীজের বণ্টনে ঘাটতি দেখা দেয়—আমন ধানের মওসুমে ৮০,০০০ মণ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে মাত্র ৬০,০০০ মণ, বোরো মওসুমে ৫০,০০০ মণের মধ্যে ২৬ হাজার মণ এবং আউশ মওসুমে ৫০,০০০ মণের মধ্যে ৩২,০০০ মণ বণ্টন করা হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালে ধার্যকৃত ৪০,০০০ পাম্প সরবরাহের লক্ষ্যের মধ্যে মাত্র ৩৫,০০০-এর মত পাম্প জমিতে পৌঁছানো হয়, উহার অনেকগুলিই চালু করা যায় নাই এবং বহু মূল্যবান নগদ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে অতীব তাড়াহুড়া করিয়া সংগ্রহ করা হইলেও ৫০০০ পাম্প জমিতেই পাঠানো হয় নাই।

৭। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত তাল মিলাইয়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যর্থতা সরকারকে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে খাদ্য আমদানী করিতে বাধ্য করে। গত বৎসর ৫৪ কোটি ডলার (৪৩২ কোটি টাকা) মূল্যের ২৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়। চলতি বৎসর ৪০ কোটি ডলার (৫২০ কোটি টাকা) মূল্যে ২০ লক্ষ টনের মত খাদ্য আমদানী হইতে পারে। এইরূপ বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমদানী সত্ত্বেও দেশ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়াছিল। উহাতে বহু-সংখ্যক লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং জনগণের ব্যাপক দুর্দশা সৃষ্টি হয়।

শিল্পঃ ৮। শিল্পখাতে স্বাধীনতার পর হইতে বেশ কয়েকটি শিল্পে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তথাপি সামগ্রিক শিল্প উৎপাদন এখনও ১৯৬৯ -৭০-এর মাত্রার নীচে রহিয়া গিয়াছে। এই খাতটি শিল্পো-দ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপনাগত ব্যুৎপত্তি, কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশের অভাব, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, নগদ অর্থের অসুবিধা, ঋণের অভাব ও শ্রমিক বিশৃংখলার মত বহুতর সমস্যার সম্মুখীন।

৯। দেশের মোট শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার শতকরা ৮৫ ভাগ ক্ষমতার রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে বিদ্যমান ক্ষমতার অপূর্ণ সদ্ব্যবহার অন্যতম নৈরাজ্যজনক দিক। পাটশিল্পে ক্ষমতা ব্যবহার মাত্র ৬০ শতাংশ, বস্ত্রশিল্পে ৭৫-৮০ শতাংশ, চিনি কলে ৬০ শতাংশ, ইস্পাতে ৩০ শতাংশ, নিউজপ্রিন্টে ৬৬ শতাংশ, সিমেন্টে ৩৪ শতাংশ, টিএসপিতে ২১ শতাংশ, চামড়ায় ১৭ শতাংশ এবং সিগারেটে ২৪ শতাংশ। ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহারের দরুন ১৯৭৪-৭৫ সালেই পাট, বস্ত্রকল, চিনি, ইস্পাত, কাগজ ও বোর্ড, সার ও রাসায়নিক শিল্পে মোট ক্ষতির পরিমাণ ৫৫০ কোটি টাকা। ক্ষমতার এই অপূর্ণ ব্যবহার শুধু উৎপাদনই ব্যাহত করে নাই, অধিকন্তু অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগও নষ্ট হয়। ইহার ফলে দ্রব্য ও উপযোগিতামূলক ব্যবস্থাগুলির সাধারণ দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি হয় এবং দর পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

১০। যে সব প্রতিবন্ধকতা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহের কর্মদক্ষতাকে ব্যাহত করিয়াছিল তন্মধ্যে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শূন্যতা সর্বাধিক ক্ষতিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনেক ক্ষেত্রে অদক্ষ, দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য আত্মীয়-স্বজন দ্বারা পদ পূরণ করা হইয়াছিল।

১১। শ্রমিক সম্প্রদায় সাধারণভাবে শিল্প-শান্তি ও বর্ধিত উৎপাদনে উৎসাহী ছিল। কিন্তু শাসকচক্রের কতিপয় সদস্য তাঁহাদের আপন আপন উচ্চাভিলাষ ও আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে বিশৃংখলার অনুপ্রবেশ ঘটান এবং এইভাবে শিল্পের প্রাণশক্তি ধ্বংস ও নূতন বিনিয়োগ অনুৎসাহিত করেন। এই স্বার্থান্বেষী চক্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে লুটতরাজ ও মূলধন অপব্যয় করেন।

১২। পাট ও পাটশিল্প আমাদের জন্য শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। অথচ এই শিল্পের পরিস্থিতিই হইয়া পড়ে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক। ১৯৭৪-৭৫ বর্ষে ধানের চড়া দর ও পাটের ক্ষেত্রে অসঙ্গতঃ মূল্যনীতির কারণে পাট চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ পূর্ববর্তী মৌসুমের ২২ লক্ষ একর হইতে হ্রাস পাইয়া প্রায় ১৪ লক্ষ একরে পৌঁছায় আর পাটের ফলন ৬১ লক্ষ গাঁইট হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৭৪-৭৫ বর্ষে ৩৯ লক্ষ গাঁইটে পৌঁছায়। এই বৎসরগুলিতে পাটের একরপ্রতি ফলন, মান ও পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই হ্রাস পায়। পাটশিল্প বহু সমস্যায় জর্জরিত হইতেছে—যেমন, ব্যবস্থাপনার অসুবিধা, অদক্ষতা, উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচ্চ ব্যয় ও কৃত্রিম আঁশ বা সিনথেটিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। পাটশিল্প ১৯৬৯-

৭০ বর্ষে উৎপাদন করিয়াছিল ৬ লক্ষ ২১ হাজার টন আর গত বৎসর উৎপাদন করিয়াছে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টন মাত্র।

১৩। পাটশিল্পের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক বিশৃংখলাই নিম্নপর্যায়ের উৎপাদনের জন্য দায়ী। বিদেশে পাটের বাজার সৃষ্টিতে অক্ষমতার দরুন আমরা কেবল কৃত্রিম, আঁশের কাছে মারই খাই নাই, বরং আমাদের পণ্যের জন্য সর্বোচ্চ মূল্য আদায়েও ব্যর্থ হইয়াছি।

১৪। বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচাইতে পীড়াদায়ক বৈশিষ্ট্য, যাহা সাধারণ মানুষকে আঘাত হানিয়াছে, তীব্র মুদ্রাস্ফীতি। ঢাকায় ক্রেতা পর্যায়ের দরসূচক ১৯৬৯-৭০ ভিত্তি-বৎসরের একশত হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে ৪৩০ বিন্দুতে পৌঁছায়। মূল্যস্তরে ইহা চারগুণেরও বেশী বৃদ্ধি। চাউলের মূল্য মণ প্রতি ৪শত টাকার মত এক উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছায়। খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় পল্লীর ভূমিহীন, বেকার এবং সীমিত আয়ের ব্যক্তিরা।

১৫। উল্লম্ফন গতিতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে বেশ কতিপয় কার্য-কারণের ফলে, যেমন বিশ্ব বাজারে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা, সরবরাহের অপ্রতুলতা, বিধিবদ্ধ সংস্থা, খাতের ঘাটতি পূরণে অর্থসংস্থান ও এই খাত কর্তৃক কর্জ গ্রহণ, যাহার দরুন-অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, বণ্টন-ব্যবস্থার বিকৃতি, মজুতদারী এবং চোরাচালান। স্বাধীনতার পর হইতে সরকার ৩ শত ৮৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার ঘাটতি পূরণে অর্থ সংস্থান করেন। ১৯৭৪-৭৫ বর্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় যথেষ্ট হ্রাস পাইলেও এই খাত ১ শত ৫১ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর্জ গ্রহণ করে।

১৬। অবিবেচনাপ্রসূত মূল্যনীতির দরুন মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। ইহার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানাদি একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের ব্যাঙ্ক ঋণ আটক রাখিয়া ও বাজারে পণ্যের স্বাভাবিক সরবরাহের সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উৎপাদিত পণ্যাদির সঞ্চয়ন অব্যাহত রাখে। নির্দিষ্ট উদাহরণ সহযোগে বলা যায়, একমাত্র পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য মজুতই প্রায় ২ শত ১০ কোটি টাকার আর ৫৩ কোটি টাকার বিক্রয়যোগ্য সূতী বস্ত্র মজুত পড়িয়া থাকে। সঞ্চিত মালামালের মোট মূল্য ৩ শত ৫৯ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

১৭। গোটা বিগত বৎসরই দায়শোধ পরিস্থিতি সংকটজনক থাকিয়া যায়। আমদানী খাতে যে ক্ষেত্রে ৯ শত ৭১ কোটি টাকার প্রয়োজন সে

ক্ষেত্রে রফতানী আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ শত ৯৬ কোটি টাকায়। বাজারে অস্বাভাবিকতা ও উচ্চ মুদ্রামানজনিত কারণে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এফ ও বি দরের চাইতে শতকরা ২০ ভাগ হইতে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত ভর্তুকী দিয়া সরকারকে রফতানীযোগ্য পণ্যাদি চালাইতে হয়। বিনিময় সংস্কার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বিলম্বিত হইয়াছে কিন্তু তথাপি অপ্রচলিত পণ্যাদির রফতানী বৃদ্ধিতে ও বৈদেশিক মুদ্রার আয় বৃদ্ধিতে তেমন কোন কঠোর প্রয়াস গৃহীত হয় নাই।

১৮। বণ্টন-ব্যবস্থায় চলিয়া আসিতেছে নানারকম ত্রুটি, যেমন—বেশ কয়েকটি এলাকায় অনাবশ্যক নিয়ন্ত্রণ, বণ্টন স্তরের বহুমুখীনতা যাহার দরুন ঋণ আটক পড়িয়াছে, উৎপন্ন দ্রব্যাদি সঞ্চিত হইয়াছে ও বাজারে সৃষ্টি হইয়াছে দুষ্প্রাপ্যতা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের উৎপাদিত পণ্যাদির মূল্য নির্ধারণ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক অস্থিরতা, যোগাযোগ সঙ্কট এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের সাধারণ ঘাটতি।

এই ব্যবস্থা অব্যবসায়ী সম্প্রদায় দ্বারা আরও বাধাগ্রস্ত হয়। প্রকৃত ব্যবসায়ীদের ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবসা হইতে দূরে সরাইয়া রাখা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক পোষ্য ও টাউটদের মধ্যে আমদানী লাইসেন্স প্রদান করা হয়—যাহারা অর্থনৈতিক কার্যক্রম দ্বারা অর্থনীতিতে তেমন কিছু সংযোজন করিতে পারে নাই। কিন্তু লাইসেন্স ও ব্যবসায়ীদের 'কোটা' দ্বারা অযাচিত মুনাফা অর্জন করে।

ক্রেতা জনসাধারণই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ঃ

১৯। দেশ জনসংখ্যা বিস্ফোরণের সমস্যার মোকাবিলা করে এবং সকলেরই দুর্দশা আরও বাড়ে। বর্তমানের বার্ষিক শতকরা ৩ ভাগ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে আগামী ২৫ বৎসরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইবে। এই সমস্যার আশু সমাধানের জন্য সম্মিলিত জাতীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

২০। অর্থনীতি এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় উপনীত। কম উৎপাদন, উৎপাদন ও আমদানী উচ্চ ব্যয়, বল্গাহীন মুদ্রাস্ফীতি জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা দারুণভাবে হ্রাস করিয়া দেয়। অর্থনৈতিক ও মুদ্রা ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন উহা খুবই বিরাট ও জটিল।

২১। অর্থনীতিকে গঠিকভাবে খাড়া করানোর জন্য আশু করণীয় হইতেছে অর্থনৈতিক নীতি ও ব্যবস্থাপনায় স্বাভাবিকতা, সুস্থতা ও শৃংখলা

ফিরাইয়া আনা। রাষ্ট্রীয় চার মৌলনীতি—যথা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের আদর্শের কথা মনে রাখিয়া এইদিকে বাস্তবোচিত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এবং এই সমস্ত বাধা দূরীকরণে বাস্তব কার্যক্রমের কর্মসূচী প্রণয়ন করা প্রয়োজন এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্পদের এবং সংরক্ষণ ও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো অপরিহার্য।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৭৫

মঞ্চে-নেপথ্যে

ইত্তেফাকের চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধি ২৮শে অক্টোবর যে প্রতিবেদন প্রেরণ করিয়াছেন উহার মর্ম ''অর্থনীতিতে সফলতার অভাব : ক্রয়ক্ষমতা সংকুচিত : অবিক্রীত শিল্পপণ্য স্তূপীকৃত''—এই সংবাদ শিরোনামেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্থনৈতিক মন্দার ছায়াপাতের বর্ণনাদানের পর রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, শিল্প ও ব্যবসায় মহলের মতে 'দেশের শিল্পগুলির বিভিন্ন খাতে এখন প্রায় ৭ শত কোটি টাকার মালামাল জমিয়া উঠিয়াছে, পক্ষান্তরে দেশের মুদ্রা সরবরাহ মাত্র নয়শত কোটি টাকার কিছু বেশী। দেশের মুদ্রা সরবরাহ এই মাত্রায় আসিয়া আবদ্ধতায় পড়িয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় আড়াই শ' কোটি টাকা আটকা পড়িয়াছে পাট শিল্পে, ৬২ কোটি টাকা বস্ত্র শিল্পে, ৫৬ কোটি টাকা লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পে, ১৫০ কোটি টাকা অন্যান্য ভোগ্যপণ্য শিল্পে আবদ্ধ।..পরিস্থিতি এমনি সংকটময় হইয়া উঠিয়াছে যে, যেসকল মূল-শিল্পের কোটি কোটি টাকার পণ্যসামগ্রী গুদামে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা কর্মচারীদের বেতন দিবার নগদ অর্থও পাইতেছে না।..অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী—যাঁহাদের গুদামে লক্ষ লক্ষ টাকার মালামাল পড়িয়া রহিয়াছে তাঁহাদের অনেকেই নিজেদের ঘরের দৈনন্দিন বাজার করিবার মত নগদ অর্থও হাতে পাইতেছে না।

সরকারী মালিকানাধীন একটি দৈনিক-এর ''অর্থনৈতিক ভাষ্যকার'' ২৯শে অক্টোবর লিখিয়াছেন, 'বাংলাদেশে বিভিন্ন চটকলে প্রায় ৬০ কোটি টাকার এক লাখ টন পাটজাত দ্রব্য গুদামজাত হয়ে আছে। স্বাধীনতার পর থেকে তিন বছরে চটকলগুলি প্রায় সোয়াশ' কোটি টাকা লোকসান দেওয়া ছাড়াও দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের কাছ থেকে চটকল পরিচালনার জন্য এ পর্যন্ত প্রায় ১৪০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। কিন্তু 'ভাষ্যকার' আরও লিখিয়াছেন যে, পাটজাত দ্রব্য বাজারজাতককরণের একক চ্যানেল 'বিজেআইসি' আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা ও অনভিজ্ঞতার দরুন ক্রমশঃ বাজার

হারাইতে বসিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 'সত্যি কথা বলিতে কি, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রফতানী হয় তাকে বাজারজাত না বলে বিক্রিই বলা চলে, অথচ বাজারজাত ও বিক্রি এক কথা নয়। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন যে, '১৯৭২ সালের আগে বেসরকারী উদ্যোগে শতকরা ৫০ ভাগ পাটজাতদ্রব্য রফতানী করা হত। বর্তমানে তারা বিদেশী ক্রেতাদের স্থানীয় ব্রোকার বা এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। অর্থাৎ তারা আর-রফতানীকারক নয়, (অনেকের লাইসেন্সের মেয়াদও সরকার হইতে রিনিউ করা হয় নাই), এবং তজ্জন্য তারা পাটজাতদ্রব্য রফতানী বা রফতানী বৃদ্ধির ব্যাপারে আদৌ কোন ভূমিকাই গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। রফতানীকারক না-হইতে পারিলে তাদের সে ভূমিকা গ্রহণের অধিকার নাই। অথচ ৭০টি দেশের সহস্রাধিক ক্রেতার কাছে পাটজাতদ্রব্য বাজারজাত করার মত পর্যাপ্ত মার্কেটিং মেকানিজম একচেটিয়া সরকারী সংস্থাটির (বিজেআইসি) নাই। আর নাই বলিয়াই আমাদের কেবলই পশ্চাদপসরণ। বেসরকারী পর্যায়ে এ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিং পলিসি অনুসরণ করিয়া ভারত, থাইল্যাণ্ড, নেপাল বাজার বাড়াইতেছে। প্রতিযোগীরা আগাইতেছে। আর আমরা স্বাধীনতার পর প্রায় ১২০ পার্সেন্ট মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াও কেবল পিছাইতেছি, এবং বিপুল অবিক্রীত পণ্যের বোঝা বহন করিতেছি। ব্যাঙ্কের কাছে পাটকলের প্রায় দেড় শত কোটি টাকা পরিমাণ বর্ণিত ধার-দেনা ও তার বিপুল সুদের কথা বাদই দিলাম। অবিক্রীত মালই এখন বিরাট বোঝা ও বড় সমস্যা।

কাঁচাপাটের ব্যাপারেও প্রায় একই অবস্থা। সরকারী মালিকানাধীন একটি দৈনিক ২৮শে অক্টোবর "ক্রয়-সংস্থাগুলো টাকার অভাবে পাট কিনতে পারছে না" শীর্ষক খবরে বলিয়াছেন যে, চারটি সরকারী পাট সংস্থাকে (যারা শতকরা সত্তর-পঁচাত্তর ভাগ পাট ক্রয়ের জন্য দায়ী) যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল তা' 'সেপ্টেম্বর মাসেই শেষ হয়ে গেছে।' 'উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী এই সংস্থাগুলি গত চারটি পাট মওসুমে লোকসান দিয়াছে প্রায় ২৯ কোটি টাকা। বিপুল লোকসানের দরুন তারা তাদের মূলধন ও রিজার্ভ প্রায় পুরাটাই হারাইয়াছে। ফলে ব্যাংকের মার্জিনের টাকা যোগাইবার সাধ্যও তাহাদের নাই। সরকারী পাট সংস্থাগুলি তো উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, টাকার অভাবে নিরুপায়।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় কার্তিক ১৪, ১৩৮২

শিল্প-কারখানা

হারাইতে বসিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 'সত্যি কথা বলিতে কি, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রফতানী হয় তাকে বাজারজাত না বলে বিক্রিই বলা চলে, অথচ বাজারজাত ও বিক্রি এক কথা নয়। ভাষ্য-কার লিখিয়াছেন যে, '১৯৭২ সালের আগে বেসরকারী উদ্যোগে শতকরা ৫০ ভাগ পাটজাতদ্রব্য রফতানী করা হত। বর্তমানে তারা বিদেশী ক্রেতা-দের স্থানীয় ব্রোকার বা এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। অর্থাৎ তারা আর-রফতানীকারক নয়, (অনেকের লাইসেন্সের মেয়াদও সরকার হইতে রিনিউ করা হয় নাই), এবং তজ্জন্য তারা পাটজাতদ্রব্য রফতানী বা রফতানী বৃদ্ধির ব্যাপারে আদৌ কোন ভূমিকাই গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। রফতানীকারক না-হইতে পারিলে তাদের সে ভূমিকা গ্রহণের অধিকার নাই। অথচ ৭০টি দেশের সহস্রাধিক ক্রেতার কাছে পাটজাতদ্রব্য বাজারজাত করার মত পর্যাপ্ত মার্কেটিং মেকানিজম একচেটিয়া সরকারী সংস্থাটির (বিজে-আইসি) নাই। আর নাই বলিয়াই আমাদের কেবলই পশ্চাদপসরণ। বেসর-কারী পর্যায়ে এ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিং পলিসি অনুসরণ করিয়া ভারত, থাই-ল্যাণ্ড, নেপাল বাজার বাড়াইতেছে। প্রতিযোগীরা আগাইতেছে। আর আমরা স্বাধীনতার পর প্রায় ১২০ পার্সেন্ট মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াও কেবল পিছাইতেছি, এবং বিপুল অবিক্রীত পণ্যের বোঝা বহন করিতেছি। ব্যাঙ্কের কাছে পাটকলের প্রায় দেড় শত কোটি টাকা পরিমাণ বর্ণিত ধার-দেনা ও তার বিপুল সুদের কথা বাদই দিলাম। অবিক্রীত মালই এখন বিরাট বোঝা ও বড় সমস্যা।

কাঁচাপাটের ব্যাপারেও প্রায় একই অবস্থা। সরকারী মালিকানাধীন একটি দৈনিক ২৮শে অক্টোবর "ক্রয়-সংস্থাগুলো টাকার অভাবে পাট কিনতে পারছে না" শীর্ষক খবরে বলিয়াছেন যে, চারটি সরকারী পাট সংস্থাকে (যারা শতকরা সত্তর-পঁচাত্তর ভাগ পাট ক্রয়ের জন্য দায়ী) যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল তা' 'সেপ্টেম্বর মাসেই শেষ হয়ে গেছে।' 'উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী এই সংস্থাগুলি গত চারটি পাট মওসুমে লোকসান দিয়াছে প্রায় ২৯ কোটি টাকা। বিপুল লোকসানের দরুন তারা তাদের মূলধন ও রিজার্ভ প্রায় পুরাটাই হারাইয়াছে। ফলে ব্যাংকের মার্জিনের টাকা যোগাইবার সাধ্যও তাহাদের নাই। সরকারী পাট সংস্থাগুলি তো উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, টাকার অভাবে নিরুপায়।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় কার্তিক ১৪, ১৩৮২

শিল্প-কারখানা

দেশের বস্ত্র শিল্পে চরম অচলাবস্থা : ৪ লক্ষ হস্তচালিত তাঁতের মধ্যে মাত্র ৭৫ হাজার চালু

বাংলাদেশের সাড়ে ৪ লক্ষ হস্তচালিত তাঁতের মধ্যে দেড় লক্ষ তাঁত উৎপাদনক্ষম রহিয়াছে এবং সুতার অভাবে এই দেড় লক্ষ তাঁতের উৎপাদন শতকরা ৫৭ ভাগ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পক্ষান্তরে ৭ হাজার বিদ্যুৎচালিত তাঁতের মধ্যে ৪ হাজার বিদ্যুৎচালিত তাঁত উৎপাদনক্ষম ছিল এবং সেখানেও সুতার অভাবজনিত কারণে শতকরা ৫০ ভাগ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে সমগ্র বাংলাদেশে প্রতি বৎসর মাথাপিছু সাড়ে ১৫ গজ কাপড়ের প্রয়োজন হইলে নিম্নতম পক্ষে মোট ১০৫ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন।

সেক্ষেত্রে পাক-আমলে বাংলাদেশে ৩৭ কোটি গজ কাপড় ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাংলাদেশে উৎপাদিত হইয়াছে ৩১ কোটি গজ এবং বাড়তি কাপড় আমদানী করা হইয়াছে পাকিস্তান হইতে।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে ৯ কোটি ৬০ লক্ষ টন সুতার পরিবর্তে ২৫ কোটি টন সুতা উৎপাদিত হইলে বাংলাদেশের হস্তচালিত তাঁত ও বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত হইতে উৎপাদিত কাপড় দেশের সমগ্র কাপড়ের চাহিদা মিটাইতে পারে। এছাড়া জলিল টেক্সটাইল মিলস্, সারমিন টেক্সটাইল মিলস, হালিমা টেক্সটাইল, আলহাজ টেক্সটাইল, চাঁন টেক্সটাইল ও গাউসিয়া টেক্সটাইল মিলের জন্য আমদানীকৃত তাঁত এখনো বসান হয় নাই।

—ইত্তেফাক জুলাই ১৮, ১৯৭২

আগামী বৎসর চিনি উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই

আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের চিনির কলগুলিতে সামান্য পরিমাণ চিনিও উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই বলিয়া আশংকা করা হইতেছে। ফলে দেশের সারা বৎসরের চাহিদা মিটাইবার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের হিসাব মতে বাংলাদেশকে প্রায় ৩২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন চিনি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ২১, ১৯৭২

বিড়ি পাতা ট্রেডার্স সমিতির সম্পাদকের জিজ্ঞাসা—দশলাখ বেকার বিড়িশ্রমিকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর কতদিন ?

—গণকণ্ঠ আগস্ট ২৪, ১৯৭২

বিসিক-এর অযোগ্যতা ও দুর্নীতির দরুন লক্ষ লক্ষ তাঁতী বেকার : বস্ত্র সংকটের জন্য দায়ী কারা—পুরানো কাপড়ের দোকানে আজ মধ্যবিত্তের ভীড়

—গণকণ্ঠ আগস্ট ৩১, ১৯৭২

টিসিবি, বিসিক ও টেক্সটাইল কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে সুতা ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকার ছিনিমিনি খেলা

প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সামগ্রী আমদানী করিয়া বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য টিসিবিকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমদানী ক্ষেত্রে টিসিবির অভ্যন্তরে যেভাবে কোটি কোটি টাকার খেলা চলিতেছে, তাহাতে বাজার স্থিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে দূরে থাকুক, জীবন ধারণের ব্যয়ভারের বোঝা আরো কতখানি ভারী হইয়া উঠে বলা যায় না।

বস্ত্র সংকট নিরসনে আমদানীকৃত প্রায় ৮ কোটি টাকা মূল্যের ৪৮ হাজার ৯ শত বেল সুতা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আসিয়া পৌছিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতা আমদানীর পশ্চাতে গোপন টেণ্ডার দলিলে রহস্যজনকভাবে বড় রকমের হের-ফের দেখা যায়। একই শীপমেন্টে আমদানীকৃত একই কোয়ালিটির সুতার ভিন্ন-ভিন্ন টেণ্ডার কন্ট্রাক্ট দলিলে লক্ষ লক্ষ টাকার অসম্ভব রকম হের-ফের পরিদৃষ্ট হয়। হিসাব করিলে দেখা যাইবে, সুতা আমদানীর ৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যূন ২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ইম্পোর্ট কন্ট্রাক্টের ফাঁক দিয়া গায়েব হইয়া গিয়াছে।

টিসিবি ইম্পোর্ট কন্ট্রাক্ট নং ১৫৪ (২।৮।৭২)-এ ৩২ কাউন্টের সুতার আমদানী মূল্যে (প্রতিক্ষেত্রেই ভাড়াসহ) প্রতিবেল ৭৫ পাউণ্ড এবং টিসিবি ইম্পোর্ট কন্ট্রাক্ট নং ১৫৫ ও ১৫৬ (২।৮।৭২)-এ ৪০ কাউন্টের সুতার আমদানী মূল্য প্রতিবেল ৮৪ পাউণ্ড দেখা যায়। ইহাতে খুচরা মূল্যে ৩২ কাউন্ট প্রতিবাণ্ডেল টাকার হিসাবে ৩৩ টাকা ৫ পয়সা এবং ৪০ কাউন্ট প্রতিবাণ্ডেল ৩৯ টাকা ৮২ পয়সা দর পড়ে।

টিসিবি ইম্পোর্ট কন্ট্রাক্ট নং ৪৫ (২৮।৪।৭২) এ সেই একই সুতা ৩২ কাউন্টের দাম প্রতিবেল ৭৭ পাউণ্ড এবং ৪০ কাউন্ট প্রতিবেল ৮৭ পাউণ্ড। মজা এখানেই শেষ নয়, একই তারিখের টিসিবি ইম্পোর্ট কন্ট্রাক্ট নং ৪৬-এ দেখা যায় সেই একই কোয়ালিটির সুতা ৩২ কাউন্ট প্রতিবেল ৯৭.৮৫ পাউণ্ড এবং ৪০ কাউন্ট ১১৪.৪৪ পাউণ্ড যাহার খুচরা দর পড়িতেছে টাকার হিসাবে ৩২ কাউন্ট ৩৬ টাকা ২৫ পয়সা প্রতি বাণ্ডেল এবং ৪০ কাউন্ট ৪০ টাকা ৭৪ পয়সা প্রতি বাণ্ডেল। আরো এক ধাপ বেশী গায়েবী কারবার দেখা যায় টিসিবি ইম্পোর্ট কন্ট্রাক্ট নং ৬০ ও ৬১তে। উক্ত দুটি ইম্পোর্ট কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী ভারত হইতে আমদানীকৃত সুতার দর দেখা যায় ৬০ নং কন্ট্রাক্ট ৩২ কাউন্ট প্রতিবেল ২৫১৪ টাকা ৬০ পয়সা, ৬১ নং কন্ট্রাক্টে প্রতিবেল ২২৮০ টাকা। ৬০ নং কন্ট্রাক্টে ৪০ কাউন্টের সুতা প্রতিবেল ২৬৫৩ টাকা ২০ পয়সা, ৬১ নং কন্ট্রাক্টে ২৬৮০ টাকা প্রতিবেল। ৬০ নং কন্ট্রাক্ট মতে খুচরা দর পড়িতেছে ৩২ কাউন্ট প্রতি বাণ্ডেল ৬২ টাকা ৮৭ পয়সা এবং ৪০ কাউন্ট প্রতি বাণ্ডেল ৬৬ টাকা ৩৪ পয়সা।

উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সুতা বাংলাদেশের বাজারে উন্নত মানের সুতা হিসাবে স্বীকৃত নয়। অথচ বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সুতার মধ্যে একই সুতার যে খুচরা মূল্য ৩৩ টাকা ৫ পয়সা ও ৩৯ টাকা ৮২ পয়সা পড়িতেছে, সেই সুতা ভারত হইতে আমদানী করা হইতেছে ৬২ টাকা ৮৭ পয়সা ও ৬৬ টাকা ৩৪ পয়সা দরে। ২০ কাউন্ট, ৩২ কাউন্ট, ৪০ কাউন্ট ও ৬০ কাউন্ট প্রতিটি কাউন্ট সুতার গোপন ইম্পোর্ট কন্ট্রাক্টে একই ধরনের গরমিল দেখা যায়। মোট ১১টি ইম্পোর্ট কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে আমদানীকৃত এই ৮ কোটি টাকা মূল্যের সুতা আমদানীতে কমপক্ষে ২ কোটি টাকার দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন যে, টেণ্ডার দাতা ও টেণ্ডার গ্রহীতার মধ্যে গোপন যোগসাজশ থাকার যে কথা শোনা যায়, তাহার বদৌলতেই এই ক্ষেত্রে তাহাই সুতা রফতানীকারক ও আমদানীকারকদের ভাগ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রার 'ব্যাপার-স্যাপার' সাধন করা হইয়াছে।

প্রকাশ, আমদানীকৃত সমস্ত সুতাই টিসিবি, বিসিকের মাধ্যমে বিলি-বণ্টন করা হইবে। উল্লেখযোগ্য যে, টিসিবি'র আমদানীকৃত সুতার নিম্নতম খুচরা দর প্রতি বাণ্ডেল ২০ কাউন্ট ২৮.৩৯ টাকা, ৩২ কাউন্ট ৩৩.৫

টাকা, ৪০ কাউন্ট, ৩৯'৮২ টাকা, ৬০ কাউন্ট ৭৬ টাকা এবং সর্বাধিক মূল্য ২০ কাউন্ট ৪৮'৫১ টাকা, ৩২ কাউন্ট ৬২'৮৭ টাকা, ৪০ কাউন্ট ৬৬'৩৪ টাকা ও ৬০ কাউন্ট ৯০ টাকার মত। শোনা যাইতেছে, সর্বাধিক আমাদানীকৃত মূল্যের উপরেও কয়েক ভাগ মুনাফা ধরিয়া সমুদয় স্থতার কাউন্ট প্রতি একটি নির্দিষ্ট হার ধার্য করিয়া টিসিবি ও বিসিক লেন-দেন করিবে।

উল্লেখযোগ্য যে, বিসিকের স্থতা বণ্টন মূল্য নিম্নরূপ:– ২০ কাউন্ট ৭৯'৮৪ টাকা, ৩২ কাউন্ট ৮৬'২৪ টাকা, ৪০ কাউন্ট ১১৩'২০ টাকা ও ৬০ কাউন্ট ১৫১'৬২ টাকা।

বিসিক এই জাতীয় স্থতা স্থানীয় টেক্সটাইল মিলগুলি হইতে নিম্নরূপ দরে ক্রয় করিয়া থাকে : ২০ কাউন্ট ৭৫'৬০ টাকা, ৩২ কাউন্ট ৮১'৮০ টাকা এবং ৪০ কাউন্ট ১০৭'৯০ টাকা।

প্রতি বাণ্ডেলে বিসিক গড়ে ৫ টাকা পরিবহণ খরচ ধরিয়া সমস্ত স্থতা ২৪টি কমিটির হাতে তুলিয়া দেয়। কমিটিগুলি নাকি আবার বাণ্ডেল প্রতি ৮ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত পরিবহণ খরচ ধরিয়া তাঁতীদের নিকট (যে সব ক্ষেত্রে মাল বরুার জন্য দেওয়া হয়) বিলি করিতেছে। জানা যায়, টেক্সটাইল কর্পোরেশন প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৪ হাজার বেল স্থতা বিসিকের নিকট হস্তান্তর করিতেছে। এই হিসাবে দেখা যায় মিল হইতে স্থতা সংগ্রহ বাবত বিসিক প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা পরিবহণ খরচ এবং কমিটিগুলি তারও বেশী ২ লক্ষ টাকা পরিবহণ খরচ দেখাইতেছে।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১, ১৯৭২

সরকারের মার্কিন প্রীতির ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় : তুলা কেলেঙ্কারী বন্ধ কর

বাংলাদেশ সরকার বস্ত্র মিল ও তাঁত শিল্পের জন্য ১ কোটি ৯০ লাখ টাকার যে তুলা আমদানী করেছিলেন তা নিম্নমানের দরুন কোন কাজে লাগেনি বলে খবরে প্রকাশ।

—গণকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ১, ১৯৭২

সরিষা নাই : উত্তরাঞ্চলে ২ শত তেল মিল বন্ধ

সরিষার দুষ্প্রাপ্যতার দরুন দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রায় দুইশত তেলের মিল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৭২

নিম্নমানের শাড়ী-কাপড় কেউ কিনছে না : দুর্নীতিবাজ আমলা ও অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজীতে বহু টাকা গচ্ছা যাবে

—গণকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৭২

৬টি কারখানা বন্ধ : ২২ হাজার শ্রমিক বেকার : দেশলাই শিল্পের ভবিষ্যৎ কি ?

সারা দেশের দেশলাই শিল্প চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে, যার উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি অবিলম্বে না নেয়া হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে গোটা শিল্পই এক মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

দেশের ১৮টি ম্যাচ ফ্যাক্টরীর মধ্যে ৬টি ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। বাকী ১২টি ফ্যাক্টরীর অবস্থা আশানুরূপ নয়।

স্থতার মূল্য বৃদ্ধির তুলনামূলক পরিসংখ্যান

ক্রমিক সংখ্যা	স্থতার নম্বর	স্বাধীনতার পূর্বে (টাকার অংকে)	মে, ১৯৭২ সাল (টাকার অংকে)
১।	১০ নং কাউন্টের স্থতা	১৮'০০	৩৫'০০-৪০'০০
২।	২০ নং ,, ,,	৩০'০০	৭০'০০-৭৫'০০
৩।	৩০ নং ,, ,,	৪৫'০০-৫০'০০	১০৫'০০-১১০'০০
	৪০ নং ,, ,,	৬০'০০	১৫০'০০
৫।	৬০ নং ,, ,,	৭৫'০০	২০০'০০

বিঃ দ্রঃ ৮০, ৮৪।২ এবং ১০০ নং কাউন্টের স্থতা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ৩, ১৯৭২

কাঁচামালের অভাব : ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭০ হাজার জোড়া সুতা আমদানী শতকরা ৮০টি জুতার কারখানা বন্ধ

জানা গিয়াছে যে, ঢাকা শহরের ছোট-বড় প্রায় ৩ শত জুতার কারখানার শতকরা ৮০টি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ১৫ হাজারেরও বেশী শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৭, ১৯৭২

চলতি সনে দেশে ৯০ হাজার টন চিনি ঘাটতি : ইক্ষুর অভাবে চিনি কলগুলি বন্ধ হওয়ার উপক্রম : প্রায় ৩৫ হাজার মিল কর্মচারী ও শ্রমিক বেকার হওয়ার আশংকা

প্রখ্যাত ইক্ষু গবেষক এবং বাংলাদেশ সুগার মিল করপোরেশনের উপদেষ্টা ডঃ মোস্তাফিজুর রহমানের সহিত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সুগার মিল কর্মকর্তাদের সহিত যোগাযোগ করিয়া জানা যায় যে, চলতি বৎসরে (১৯৭২-৭৩) উত্তরবঙ্গসহ সমগ্র বাংলাদেশে ৯০ হাজার টন চিনির ঘাটতি হইবে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৭, ১৯৭২

বর্তমান শ্রমনীতি শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী

জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি জনাব মোঃ শাহজাহান ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান এমসিএ বর্তমান শ্রমনীতি প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছেন।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১৫, ১৯৭২

আমলা ও রাজনৈতিক টাউটদের যথেচ্ছাচার রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানার ভবিষ্যৎ কি?

বাংলাদেশ থেকে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দেশের বড় বড় শিল্প কারখানা জাতীয়করণ এবং স্বাধীনতার পর বন্ধ হয়ে যাওয়া মিল কারখানাগুলো চালু করার জন্য ইতিমধ্যে ১৬০ কোটি টাকার মূলধন বিনিয়োগ করা হলেও মিল চালু করা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনার ব্যর্থতা, সর্বোপরি দুর্নীতিমুক্ত

দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার অভাবে বর্তমানে মিল কারখানাগুলো দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনৈতিক কর্তা ব্যক্তিদের রাতারাতি অর্থ উপার্জনের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে বলে জানা গেছে।

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ১৬, ১৯৭২

গত মাসে এক কোটি গজ কাপড় বাজারে ছাড়া হইয়াছে, কিন্তু সবটাই নাগালের বাহিরে

বাংলাদেশের ২১টি বস্ত্র মিল ঈদ উপলক্ষে চলতি মাসে ১ কোটি গজ কাপড় বাজারে ছাড়িয়াছে বলিয়া জানা যায়।

পক্ষান্তরে অভিযোগ পাওয়া যায় যে, এই এক কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে ৫০ হইতে ৭০ লক্ষাধিক গজ কাপড় কালোবাজারের শান-শওকত বৃদ্ধি করিয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ৩, ১৯৭২

উৎপাদন এখনো অর্ধেকের কম : খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে প্রতিমাসে ১০ লক্ষ টাকা লোকসান

দেশের একমাত্র নিউজপ্রিন্ট কারখানা খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের উৎপাদন এখনও স্বাভাবিক লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছাতে পারে নাই।

সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে যে, প্রতি মাসে বিভিন্ন খাতে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের প্রায় দশ লক্ষ টাকা লোকসান হইতেছে।

আসল তাঁতী সুতা পায় না শতকরা ৯০ ভাগ ফ্যাক্টরী বন্ধ

বাংলাদেশে তাঁত ও সুতা লইয়া এক ন্যাক্কারজনক খেলা চলিতেছে। প্রকৃত তাঁতীর হাতে সুতা পৌঁছাইতেছে না, সুতার অভাবে আসল তাঁতগুলি বন্ধ হইয়া আছে। অথচ ভুয়া ফ্যাক্টরীর নামে অঢেল সুতা বরাদ্দ হইতেছে। সেই বরাদ্দকৃত সুতা তিন চার হাত ঘুরিয়া যখন কিছুসংখ্যক তাঁতীর নিকট পৌঁছাইতেছে, তখন তাহার দাম হইতেছে আগুনের মত। সেই সুতা আগুনের দামে ক্রয় করিয়া তাঁতী যখন বস্ত্র উৎপাদন করে, তখন সেই বস্ত্রের মূল্য কি দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৪, ১৯৭২

২ শত কোটি টাকার ধান বিনষ্ট

হেমন্ত মৌসুমে অনাবৃষ্টি, প্রয়োজনীয় সেচ ও সারের অভাব এবং কীট-

পোকার আক্রমণে এই বছর প্রায় দুইশত কোটি টাকা মূল্যের আমন ধান মাঠেই বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৯, ১৯৭২

ইক্ষুর অভাবে যশোর-কুষ্টিয়ার চিনি কলগুলি বন্ধ থাকিবে?

যশোর জেলার চিনির কলগুলি এই বৎসর বন্ধ থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আখের অপ্রতুলতাই ইহার কারণ বলিয়া কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১২, ১৯৭২

তাঁত শিল্প সমিতির সম্পাদক—সুতা বণ্টন কমিটিতে এম সি এ'দের থাকার অধিকার নেই

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭২

হাজার হাজার মণ আখ শুকাইয়া যাইতেছে

কাউনিয়া-বোনারপাড়া লাইনে পীরগাছা, চৌধুরানী, কামারপাড়া প্রভৃতি রেল স্টেশনে হাজার হাজার মণ ইক্ষু শুকাইয়া যাইতেছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ২২, ১৯৭২

বীমা কর্পোরেশনের কোটি কোটি টাকার হিসেব কে দেবে?

আগামী সাত দিনের মধ্যে বাংলাদেশ বীমা করপোরেশনকে সাধারণ একটি তৃতীয় বীমা করপোরেশনে রূপান্তরিত করা হবে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে। এই বীমা করপোরেশনটি পাকিস্তানভিত্তিক মোট এক কোটি টাকা অথরাইজড মূলধন ও দুই দফায় পরিশোধকৃত ৫০ লক্ষ টাকার মূলধন নিয়ে ১৯৫২ সালে গঠিত হয়। এই করপোরেশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পুনঃ বীমা ব্যবসা। পরবর্তীকালে এই করপোরেশন সাধারণ বীমা ব্যবসায়ও শুরু করে।

এই করপোরেশনের শেয়ার শতকরা ৫১% ভাগ সরকার ও বাকী ৪৯% ভাগ জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হয়। করপোরেশন ব্যবসায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে এবং খুব অল্প দিনের মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানীতে টাকা ঋণ দিতেও নিয়োগ করতে সক্ষম হয়।

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২২, ১৯৭২

নির্ধারিত মূল্যে ইক্ষু সরবরাহে অনীহা— দেওয়ানগঞ্জ চিনি কল বন্ধ হওয়ার উপক্রম

জামালপুর, ৩১শে ডিসেম্বর—পর্যাপ্ত ইক্ষুর অভাবে দেওয়ানগঞ্জ চিনির কল আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বন্ধ হইয়া যাইবার এবং ইহার ফলে চলতি মৌসুমে ৬০ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা দিবার আশংকা করা হইতেছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১, ১৯৭৩

এই আমদানী লক্ষ্যের অর্থ?

বাংলাদেশে সারা বৎসরে বিলেটের প্রয়োজন ৭৫ হাজার টন অথচ বাংলাদেশ বাণিজ্য সংস্থা অহেতুক ২০ কোটি টাকারও বেশী বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটাইয়া ছয় মাসে ২ লক্ষ টন বিলেট আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৫, ১৯৭৩

সুন্দরী কাঠের অভাবে হার্ডবোর্ড মিল বন্ধ

খুলনা হার্ডবোর্ড মিলে সুন্দরী কাঠের স্টক নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় গতকাল হইতে মিলে উৎপাদন বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে প্রকাশ।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মিলে ব্যবহার্য প্রধান কাঁচামাল সুন্দরী কাঠ জেলার দক্ষিণে সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাঠ সংগ্রহের জন্য মিল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি লাভের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৯, ১৯৭৩

ইক্ষুর অভাবে পাচটি চিনিকল বন্ধের উপক্রম

ইক্ষুর অভাবের দরুন দেশের পাঁচটি চিনিকল বন্ধ হইয়া যাইতেছে বলিয়া আজ এখানে বাংলাদেশ সুগার মিল কর্পোরেশন সূত্রে প্রকাশ।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১১, ১৯৭৩

দেওয়ানগঞ্জ সুগার মিল বন্ধ ঘোষণা : সোয়া কোটি টাকা ক্ষতি

ইক্ষুর অভাব ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলার দরুন দেওয়ানগঞ্জ চিনির মিল গত ১০ই জানুয়ারী হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আমাদের জামালপুরস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ১৯৫৭ সনে দুই

কোটি টাকার মূলধন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ এই মিলটি চালু করা হয়। কিন্তু বিগত বছর যাবৎ প্রয়োজন মত আখ সংগ্রহ করিতে না পারায় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার দরুন মিলের ঘাটতি প্রায় ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১৮, ১৯৭৩

বণ্টন ব্যবস্থায় স্বজনপ্রীতি ও ভুঁইফোড়দের চক্রান্ত—আড়াই হাজার থানার ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প বিলুপ্তির পথে

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৪, ১৯৭৩

রক্ষক হয়েছেন ভক্ষক: লালবাতির আর দেরী নেই ধ্বংসের পথে ঢাকা টোবাকো ইণ্ডাস্ট্রিজ

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ১২, ১৯৭৩

আই ডব্লিউ টি-এ'র অভ্যন্তরে মাদারীর খেল লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয়

আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থার জনৈক উচ্চপদস্থ প্রকৌশলীর কারসাজিতে উক্ত সংস্থার লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় হচ্ছে, উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হচ্ছে, পক্ষান্তরে জনসাধারণের দুর্ভোগ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে বলে অভিযোগে প্রকাশ।

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ২৬, ১৯৭৩

তুলা কেলেঙ্কারী

কাপড়ের পর সুতা এবং অতঃপর তুলা কেলেঙ্কারি। গত শনিবার ৪টি বস্ত্রমিলের শ্রমিকেরা নিকৃষ্টমানের তুলা আমদানীর বিরুদ্ধে টি.সি.বি তুলা কর্পোরেশন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রমিকদের পক্ষ হইতে অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে যে, এক শ্রেণীর আমলা উপযুক্ত তদন্ত তদারক ছাড়াই 'পচা-তুলা' আমদানী করিয়া দেশের ৪৮টি বস্ত্র ও সুতাকল বন্ধ করার এবং সেই সংগে বর্তমান সরকারকে বিব্রত করার অপচেষ্টা চালাইতেছেন। অভিযোগ গুরুতর সন্দেহ নাই। ইতিপূর্বে বস্ত্র ও সুতা আমদানী এবং সেসবের বিলিবণ্টনেও অনুরূপ অভিযোগ

উত্থাপিত হইয়াছিল। সেই অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের জের এখনও চলিতেছে। কর্তৃপক্ষ যাহাই বলুন, একথা কোনক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নাই যে, দেশে বস্ত্রের সংকট রহিয়াছে এবং কোটি কোটি টাকার বস্ত্র বিমান পথে আমদানী করার পরেও সে সংকট নিরসনের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আমরা একাধিকবার এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি এবং প্রতি আলোচনাতেই এই মর্মে সুপারিশ করিয়াছি যে, দেশের বস্ত্র ও সুতা-কলগুলিকে পূর্ণরূপে চালু করার উপরেই বস্ত্র সমস্যার সমাধান বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। অতীতেও নিকৃষ্টমানের তুলা আমদানীর অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল। এখন সেই অভিযোগ বিক্ষোভের রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং শ্রমিকেরা পথে নামিয়াছেন। আমদানীকৃত তুলা সত্যই 'পচা তুলা' কিনা, এবং পচা হইলে তাহা কি প্রকারে এ গরীব দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে আমদানী করা হইল, উহার যথাযথ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

জনৈক বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, আমদানী করা তুলা নিকৃষ্ট বরং এতদ্দেশীয় সুতার কলসমূহ যে গ্রেড ও স্ট্যাণ্ডার্ডের তুলার উপযোগী, আমদানী করা তুলা সেই গ্রেড ও স্ট্যাণ্ডার্ডের নহে। ফলে, কলে তোলামাত্র সে তুলার আঁশ ছিড়িয়া যায়, তুলা জট পাকাইয়া বসে, ইহার দরুনই এই ধারণা জন্মে যে, আমদানী করা তুলা পচা বা নিকৃষ্টমানের। এই অবস্থায় শ্রমিকদের অভিযোগ সত্য, না বিশেষজ্ঞদের এই অভিমত সত্য, তাহাও তদন্ত করিয়া দেখা উচিত। এই প্রসঙ্গে আমরা আমদানীকারক সংস্থাগুলির প্রতি এই মর্মে আবেদন জানাইতে চাই যে, দেশীয় সুতার কলসমূহ কোন্ ধরনের তুলার উপযোগী তাহা পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং সে মোতাবেক সেই গ্রেড ও স্ট্যাণ্ডার্ডের তুলা যেখানে পাওয়া যায়, সেখান হইতেই আমদানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে আমদানীকৃত তুলার প্রয়োজনে সুতা কলগুলিকেই নতুন করিয়া সে তুলার উপযোগী করিয়া নেওয়া যাইতে পারে। ইহার মধ্যে যেটি কম ব্যয়সাপেক্ষ এবং ত্বরিত সম্ভব বলিয়া বুঝা যাইবে, সেটিই অবিলম্বে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা না করিয়া তুলা ও কলের হেরফের না বুঝিয়া ইচ্ছামত বা পাওয়া মাত্রই তুলা আমদানী করিলে আমদানীর আসল উদ্দেশ্য যে ব্যাহত হইতে পারে, উদ্ভূত তুলা পরিস্থিতিই তাহার বড় প্রমাণ। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে বিষয়টির দিকে মনোনিবেশ

করিবেন। দেশের বস্ত্র সংকট মোচনের জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। কাহারও গাফিলতি বা অবহেলার দরুন এই প্রচেষ্টা বিঘ্নিত হইলে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। কিন্তু সে কাজ করিতে গিয়া সুতা ও বস্ত্র সংকট দূরীকরণের মূল বিষয় যাহাতে কোনক্রমেই ধামা-চাপা না পড়ে সে দিকেও সংশ্লিষ্ট মহল সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন, ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ৫, ১৯৭৩

পারদের অভাব : বাঁশ সরবরাহের অব্যবস্থা : কর্ণফুলী পেপার মিল কি বন্ধ হয়ে যাবে ?

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৭৩

ইউনাইটেড টোব্যাকো কোম্পানীতে মাদারীর খেল : তবে কি শিল্প মন্ত্রণালয়ই দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছে ?

দুর্নীতির দায়ে প্রশাসক বরখাস্ত হয়েও চাকুরীতে বহাল : সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ

—গণকণ্ঠ মার্চ ৩, ১৯৭৩

যান্ত্রিক কারণে ইস্টার্ণ রিফাইনারী বন্ধ

বাংলাদেশের একমাত্র তৈল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী, যাহার প্রতি বার মাসে একবার 'সিডিউলড ওভারহল' করার নির্দেশ ছিল, উহা স্থাপিত হইবার পর বিগত চারি বৎসরে একবারও 'সিডিউল মেরামত' করা হয় নাই এবং ফলে ইস্টার্ণ রিফাইনারী ঘন ঘন বিকল হইয়া যাওয়ায় তৈল শোধনা-গার প্রায় সম্পূর্ণ অচলাবস্থায় আসিয়া গিয়াছে বলিয়া ওয়াকিফহাল মহল এখানে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

—ইত্তেফাক মার্চ ১৪, ১৯৭৩

ইস্টার্ণ রিফাইনারীতে অব্যবস্থা ও অপরিশোধিত তৈল ক্রয়ে কারচুপির ফলে সাড়ে ৬ কোটি টাকা গচ্চা

—গণকণ্ঠ মার্চ ২৫, ১৯৭৩

অপরিশোধিত তৈলের অভাবে ইস্টার্ণ রিফাইনারী বন্ধ

অপরিশোধিত তৈলের অভাবে চট্টগ্রামের ইস্টার্ণ রিফাইনারী আজ সকাল হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

রিফাইনারীর জনৈক মুখপাত্র জানান যে, আজ রিফাইনারী বন্ধ করার পূর্বে অপরিশোধিত তৈল সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক মার্চ ২৮, ১৯৭৩

চিনি সরবরাহের অভাবে নাবিস্কো ফ্যাক্টরী বন্ধের আশঙ্কা ?

আগামী দুই হইতে তিন দিনের মধ্যে দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান 'নাবিস্কো বিস্কুট এণ্ড ব্রেড ফ্যাক্টরী' বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে বিপুল অঙ্কের টাকা মুনাফা দেখাইলেও চিনির অভাবে এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

—ইত্তেফাক মার্চ ২৮, ১৯৭৩

ইস্পাত মিল অতি মুনাফার সোনার হরিণের পশ্চাতে ধাবমান

সরকার নিয়ন্ত্রিত চট্টগ্রাম স্টীল মিল কর্তৃপক্ষের অত্যধিক 'ব্যবসায়ী-সুলভ' মনোভাবের ফলে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের, বিশেষ করিয়া গ্রাম বাংলার জনসাধারণের ঘর-বাড়ী পুনর্নির্মাণ বা সংস্কার প্রায় দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে।

—ইত্তেফাক মার্চ ২৯, ১৯৭৩

গাইবান্ধা মহকুমার চার হাজার নলকূপের মধ্যে তিন হাজারই বিকল

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৪, ১৯৭৩

মুনাফাখোর ও কালোবাজারীর দৌরাত্ম্যে রূপগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী জামদানী শিল্প বিলুপ্তির পথে

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৫, ১৯৭৩

বস্ত্র সংকটের অন্তরালে

বর্তমানে বাংলাদেশে যে বস্ত্র সংকট দেখা দিয়াছে উহার জন্য দেশের বস্ত্র মিলসমূহ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা, সমবায় বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুসৃত নীতিই বহুলাংশে দায়ী বলিয়া ওয়াকিফহাল মহল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৭, ১৯৭৩

সারাদেশে হাইস্পীড ও ডিজেলের চরম সংকট : চট্টগ্রাম বন্দর অচল হওয়ার উপক্রম

হাইস্পীড ডিজেল ও পেট্রোলের অভাবে আজ হইতে চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ হইয়া যাইবে। শুধু চট্টগ্রাম বন্দরই নহে, সমগ্র বাংলাদেশের ডিজেল ও পেট্রোলের তীব্র সংকট দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন স্থানে বাস, ট্রাক চলাচল ও ফেরী সার্ভিসের সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এমনকি রাজধানী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে বাস ও লঞ্চ চলাচল সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে। ওদিকে খুলনায় বিভিন্ন কল-কারখানার উৎপাদন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ন্যাপথ্যার অভাবে গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিও বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৯, ১৯৭৩

জ্বালানী তৈল সংকট অব্যাহত

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১০, ১৯৭৩

খুলনার অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে 'লে অফ'

আজ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে এখানকার অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে 'লে-অফ' ঘোষণা করা হইয়াছে। গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রে 'ন্যাপথ্যার মজুদ পরিস্থিতি অস্বাভাবিকভাবে নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১১, ১৯৭৩

হিমাগার শিল্পে সংকট

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৩, ১৯৭৩

বস্ত্র রং করার কারখানা বন্ধ হওয়ার উপক্রম

রং ও বস্ত্রের অভাবে শহরের হস্তচালিত সমুদয় বস্ত্র রং করার কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল, ২৩, ১৯৭৩

নরসিংদীতে সুতা নিয়ে তেলেসমাতি খেল নকল তাঁতীদের তাঁতের সংখ্যা সহস্রাধিক অথচ আসল তাঁতীরা সুতা পাচ্ছে না

—গণকণ্ঠ মে ১২, ১৯৭৩

চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম : ষোল মাসে বস্ত্রমূল্য তিনগুণ বৃদ্ধি

স্বাধীনতার পর বিগত ১৬ মাসে দেশে চাহিদার তুলনায় ২৪ কোটি ৩৬ লক্ষ গজ বস্ত্র কম সরবরাহ হওয়ার দরুন শতকরা ৩ শত ভাগ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

—ইত্তেফাক মে ১৪, ১৯৭৩

২৯টি কাপড় রংয়ের কারখানা বন্ধ : অসংখ্য শ্রমিক বেকার

—ইত্তেফাক মে ১৬, ১৯৭৩

বরিশালে সুতা ও রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব অসাধু ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো : তাঁতীর তাঁত বন্ধ লক্ষাধিক লোক বেকার

—গণকণ্ঠ মে ১৭, ১৯৭৩

খুলনার ১শত তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা

খুলনা জেলার একশত তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সুতার অভাবে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক মে ১৭, ১৯৭৩

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ১২টি কর্পোরেশনে ৯৩ কোটি টাকা লোকসান

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গঠিত কর্পোরেশনগুলির ১২টিতে চলতি সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মোট ৯৩ কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ৩, ১৯৭৩

নড়বড়ে বোয়িং আসছে—গচ্চা যাচ্ছে কয়েক কোটি টাকা

অবশেষে বাংলাদেশ বিমান চলাচল মন্ত্রণালয় এমন একটি পুরানো বোয়িং বিমান ক্রয় করতে চলেছেন, যার পাখার আয়ু ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে।

—গণকণ্ঠ জুন ৭, ১৯৭৩

শিপিং করপোরেশনের এই অপচয় কেন?

দেশের নৌ-পরিবহণ ও বাণিজ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য দুটো জাহাজ কেনার উদ্দেশ্যে গত এপ্রিল ও মে মাসে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি দল দু'দফায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কতগুলো দেশ সফর করে এসেছেন।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, প্রতিনিধি দলটি জাহাজ কেনার নাম করে গেলেও কোন জাহাজ না কিনেই ফিরে এসেছেন এবং জাহাজ কেনা সংক্রান্ত কোন চুক্তি অথবা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সাথে কোন কথাবার্তা বলেছেন কিনা তাও জানা যায়নি।

—গণকণ্ঠ জুন ৯, ১৯৭৩

সরকারের সুষ্ঠু নীতি নেই : লাখ লাখ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা নষ্ট হচ্ছে
দশটি পরিত্যক্ত শিপিং কর্পোরেশন আজ ধ্বংসের পথে

—গণকণ্ঠ জুন ১৯, ১৯৭৩

সংসদে শিল্পমন্ত্রী
রাষ্টায়ত্ত শিল্পে ৩২ কোটি টাকা লোকসান

শিল্প মন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম গতকাল (শুক্রবার) জাতীয় সংসদে জানান যে, এ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ৩২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ২৩, ১৯৭৩

সরিষার ভূত প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা হজম করিয়াছে

টিসিবি'র আমদানীকৃত সরিষার ভূত ৫৩ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা হজম করিয়া ফেলিয়াছে।

ব্যাপারটি আর কিছুই নয়, টিসিবি কর্তৃপক্ষ ৮।১০ হাজার টন সরিষার বীজ ক্রয় করার জন্য গত মে মাসে আন্তর্জাতিক টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছিলেন।

গত ৪ঠা মে, ১৯৭৩ সনে সকাল ১১-২০ মিনিটে উক্ত টেণ্ডারগুলি খোলা হয়। ৬টি বিদেশী কোম্পানী টেণ্ডারপত্র দাখিল করিয়াছিল। ইহার মধ্যে কানাডার একটি কোম্পানী টনপ্রতি ২১৮ পয়েন্ট ৯৫ মাকিন ডলার হিসাবে ১০ হাজার টন সরিষার বীজ সরবরাহ করার প্রস্তাব দিয়াছিল। সেই রেট সর্বনিম্ন না হওয়ায় গ্রহণীয় হয় নাই। কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, গত ১১ই জুন, '৭৩ ঐ একই কোম্পানীর নিকট হইতে প্রতি টন ২৫৭ পয়েন্ট ৫০ কানাডীয় ডলার হিসাবে ১১ হাজার টন সরিষার বীজ ক্রয় করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কানাডীয় ডলারের মুদ্রামান মাকিন ডলারের চাইতেও বেশী।

—ইত্তেফাক জুন ২৩, ১৯৭৩

বিদ্যুৎ ঘাটতি : কাঁচামালের অভাব : উত্তরবঙ্গের কলকারখানা বিকল হতে চলছে
শুধু পাকশী পেপার মিলেই মাসিক ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি

—গণকণ্ঠ জুন ২৭, ১৯৭৩

ইস্পাত কারখানার অভ্যন্তরে

চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানায় তিন মাস পূর্বেও কমপক্ষে মাসিক ২ কোটি টাকার পাত বিক্রয় হইত। সেই ইস্পাত কারখানায় গত ২ মাসে নাকি একটি পাই পয়সার পাতও বিক্রয় হয় নাই। ফলে ইস্পাত কারখানায় এখন ২ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের উৎপাদিত দ্রব্য 'জাম' হইয়া আছে। গত ২ মাসে বিক্রয় হইতে চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানার কোন আয় হয় নাই।

—ইত্তেফাক জুলাই ১১, ১৯৭৩

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের দায় ৫ শত ৩৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা : বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ৩৮ হাজার ৬ শত ৭৫ কর্মঘণ্টা নষ্ট

—ইত্তেফাক জুলাই ১৭, ১৯৭৩

চট্টগ্রাম ইস্পাত মিল
পণ্যমান ও উৎপাদন আশংকাজনকভাবে হ্রাস

চট্টগ্রাম ইস্পাত মিলের উৎপাদন এবং পণ্যের গুণগত উৎকর্ষ গুরুতর-ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। পণ্যের মান এতটা হ্রাস পাইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক লয়েডস সংস্থা চট্টগ্রাম ইস্পাত মিলের উৎপাদিত পণ্যকে যে আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেট প্রদান করিবে না, তাহা একরকম নিশ্চিত।

—ইত্তেফাক জুলাই ১৭, ১৯৭৩

বাঁশ-কাঠের রয়ালটি কয়েকগুণ বৃদ্ধি : কর্ণফুলী পেপার মিলে লোকসানের সম্ভাবনা

বাজেটে বাঁশ ও কাঠ আহরণের উপর রয়ালটির উচ্চহার নির্ধারণ ও ফারনেস অয়েলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে কর্ণফুলী কাগজের মিলকে বিপুল লোকসানের সম্মুখীন হইতে হইবে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ৩, ১৯৭৩

লবণ উৎপাদনকারীরা সংকটের সম্মুখীন

১৭ই আগস্ট রফতানীর কোন সুবিধা না থাকায় দেশের মোট চাহিদার অতিরিক্ত প্রায় ৮০ লক্ষ মণ লবণ জমা হইয়া রহিয়াছে। ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে লবণের দাম কমিয়া যাইতেছে এবং লবণ উৎপাদনকারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটিতেছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ১৮, ১৯৭৩

টিএসপি কারখানা দেড় বছর ধরে বন্ধ : কর্তাদের ফ্রি স্টাইল দুর্নীতির আরেকটি নজীর : ৪৪ কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে

কাঁচামালের অভাবে দেড়লাখ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন চট্টগ্রামের
টিএসপি সার কারখানা দেড় বছরের চেয়ে বেশী সময় ধরে বন্ধ হয়ে আছে।
শেষ পর্যন্ত কাঁচামাল রক ফসফেট আনার যা একটা ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু
কর্তাদের কারসাজিতে বিশেষ একটি বিদেশী কোম্পানী থেকে রক কেনার
সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় প্রায় ৪৪ কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে। কাঁচামাল আম-
দানীতে সাড়ে ১২ কোটি টাকা, কারখানা বন্ধ ও বিদেশ থেকে টিএসপি
আমদানীর জন্য সাড়ে ৩১ কোটি টাকা এবং শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের
বেতন বাবদ প্রায় ৫৪ লাখ টাকা অপচয় হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের জনৈক
কর্তা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কর্পোরেশনের কর্তাব্যক্তিদের ক্ষমতার অপব্যবহার অর্থ-
লিপ্সা ও দুর্নীতির জন্যই এই আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ।

—গণকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ৪, ১৯৭৩

পাবনায় বিদ্যুৎ সংকট : ৩ কোটি টাকা লোকসান

স্বাধীনতার পর অদ্যাবধি পাবনা জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়মিত না হওয়ায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি ও জাতীয় অর্থনীতির বহু

আর্থিক লোকসান হইতেছে। জানা গিয়াছে যে, বিদ্যুৎ সংকটের জন্য এই যাবৎ মোট ৩ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯৭৩

বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন

দেশের বৃহত্তম শিশুখাদ্য ও জীবনরক্ষাকারী ঔষধ প্রস্তুতকারক কার-
খানা গ্লাক্সো ল্যাবরেটরীজের অচলাবস্থা দূর হওয়ার পরিবর্তে ক্রমেই
জটিল হইতেছে। ইতিমধ্যে ২৩ জন অফিসারের ১১ জন এবং ছয়জন
বিভাগীয় ম্যানেজারের একজন পদত্যাগ করিয়াছেন। অচিরে যদি আরও
দুই একজন পদত্যাগ করেন, তবু হয়তো বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না। এই
অবাঞ্ছিত অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন মহল বিভিন্ন বক্তব্য
রাখিয়াছেন। গ্লাক্সো অফিসার সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব আনোয়ার
রশিদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে কারখানা কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের
অভিযোগ করিয়া সরকারী হস্তক্ষেপ কামনা করিয়াছেন। ইহাছাড়া নির-
পেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠানেরও দাবী জানানো হইয়াছে। জনাব আনোয়ার রশিদ
বলিয়াছেন, শ্রমিক কর্মচারীরা কাজ করিতে রাজী, কিন্তু 'কর্তৃপক্ষ' অনড়।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৭৩

চৌষট্টি কোটি টাকার কাপড়

স্বদেশ ছাড়াও বিদেশের পত্র-পত্রিকায় যখন বাঙ্গালী সন্তান কর্তৃক
বস্ত্রাভাবে চট পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ প্রচেষ্টার সচিত্র খবরা-
খবর ছাপা হইতেছে তখন আমাদের এক সহযোগী খবর দিয়াছেন চৌষট্টি
কোটি টাকার কাপড় টিসিবি'র গুদামে অযত্নে নষ্ট হইতেছে। খবরে
বলা হয়, এ দেশের মানুষের দুঃসহ বস্ত্র সংকটের কাহিনী শুনিয়া 'দান'
হিসাবে জাপান এসব কাপড় দেয়। এর মধ্যে কৃত্রিম তন্তুজাত কাপড়
ছাড়াও টাফেটা শাড়ী, ট্রপিক্যাল স্যুটিং, পানামা স্যুটিং, নাইলন ইত্যাদি
বিভিন্ন জাতের কাপড় রহিয়াছে। এসব কাপড়ের কিছু অংশ ইতিমধ্যে
ঢাকা আনা হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ চট্টগ্রামে গুদামে তোলা হইতেছে।
কবে ব্যাপকভাবে ছাড়া হইবে তাহার কোন নাম নিশানা নাই। প্রকাশিত
খবরের বক্তব্য অনুযায়ী টিসিবি কর্তৃপক্ষের 'অদূরদর্শিতা' ও 'অযোগ্যতার'
জন্যই নাকি এসব কাপড় এতদিনেও বাজারে ছাড়া সম্ভব হয় নাই। খবরে
আরও বলা হয়, তবে ইতিমধ্যে সামান্য কিছু কাপড় বাজারে ছাড়া

হইতেছে বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য উহা আঙ্গুর ফল টকের ন্যায়। কারণ, এসব কাপড়ের সর্বনিম্ন দাম বিশ টাকা এবং উপরে শতাধিক।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৭৩

এই অধঃপতনের শেষ কোথায়!

এক বেসরকারী পরিসংখ্যাণে জানা গেছে যে, ১৯৭২-৭৩ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থার মোট ৩৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে।

তন্মধ্যে জুটমিল কর্পোরেশন ২৫ কোটি, সুগার মিল কর্পোরেশন ৭ কোটি ৯ হাজার টাকা, পেপার মিলস্ কর্পোরেশন ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, স্টিল মিল কর্পোরেশন ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ও মিনারেল গ্যাস কর্পোরেশনে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে।

—সোনার বাংলা অক্টোবর ৭, ১৯৭৩

ইস্পাত মিলে উৎপাদন বন্ধ

কাঁচামালের অভাব এবং শ্রমিক অসন্তোষের দরুন সপ্তাহাধিককাল যাবৎ চট্টগ্রামের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বন্ধ রহিয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২৪, ১৯৭৩

রেল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার দরুন কর্ণফুলী পেপার মিল বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা

কর্ণফুলী পেপার মিলে কাগজ প্রস্তুতের প্রধান উপকরণ বাঁশ ওয়াগনের অভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হইতেছে না। ফলে সিলেট জেলার বিভিন্ন স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাঁশের আটি বুকিং-এর অভাবে স্তূপকৃত হইয়া রহিয়াছে। বাঁশের অভাবে অচিরেই কর্ণফুলী পেপার মিলের উৎপাদন বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২, ১৯৭৩

বিদ্যুৎ সরবরাহে গোলযোগের দরুন উত্তরবঙ্গের বহু কলকারখানায় কোটি কোটি টাকা লোকসান

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ৬, ১৯৭৩

বিলেটের অভাবে ১৪টি স্টীল রি-রোলিং মিল বন্ধের উপক্রম

নির্ভরযোগ্য মহল সূত্রে জানা গিয়াছে যে, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে দেশের ১৪টি স্টীল রি-রোলিং মিলের উৎপাদন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

প্রকাশ, স্টীল রি-রোলিং মিলে কাঁচামাল 'বিলেটের' অভাবে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি মিলের উৎপাদন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দেশে বর্তমানে ২৫টি স্টীল রি-রোলিং মিল রহিয়াছে। তন্মধ্যে ১১টি মিল সরকারের পরিচালনাধীন ও বাকী ১৪টি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মিলগুলিই সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ৮, ১৯৭৩

একশ্রেণীর শ্রমিক নেতা উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য দায়ী —শ্রম মন্ত্রী

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১৪, ১৯৭৩

কাঁচামালের অভাবে

কাঁচামালের অভাবে খুলনার দুইটি দিয়াশলাই কারাখানায় গত বৃহস্পতিবার হইতে উৎপাদন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে প্রায় ৩ শত শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। কারখানা দুইটি হইতেছে: দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এবং বাংলাদেশ ম্যাচ কোম্পানী। এই দুইটি কারখানায় গড়ে প্রতিদিন ১ লক্ষ টাকা লোকসান হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২৬, ১৯৭৩

চিনি আর গুড়ের লড়াইয়ে

আমাদের চিনি শিল্প কেবল স্বয়ং সম্পূর্ণই নয়, সঠিক পন্থায় উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব হইলে প্রচুর পরিমাণে চিনি বিদেশে রপ্তানি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হইতে পারে। অথচ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে প্রতি বৎসর উৎপাদনে ঘাটতিই থাকিয়া যাইতেছে এবং কোন কোন চিনি কলের লোকসান ইতিমধ্যেই মূলধনকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ৩০, ১৯৭৩

বিমানে হজ্বে গমনেচ্ছুদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত : জেদ্দায় বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং আটক : ৬ হাজার টাকা জরিমানা

বাংলাদেশ বিমানের হজ্বযাত্রী বাহী বোয়িং বিমানটি ১শ' ৮৪ জন যাত্রী ও ৫ জন বৈমানিকসহ জেদ্দায় আটকা পড়েছে। প্রয়োজনীয় অনুমতি না নিয়ে যাবার ফলেই বিমানটিকে আটক করা হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুসারে বাংলাদেশ বিমানকে ৩ হাজার রিয়াল জরিমানাও করা হয়েছে। বাংলাদেশী মুদ্রায় এর পরিমাণ হচ্ছে ৬ হাজার টাকা। জেদ্দা বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিমানকে জানিয়ে দিয়েছেন, যেন পুনরায় এ ধরনের মারাত্মক ভুল না হয়, যেন অনুমতি না নিয়ে পুনরায় জেদ্দা না যাওয়া হয়।

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ৩, ১৯৭৩

বিতরণের সামগ্রী পোড়ান হইতেছে

দেশে যখন বস্ত্র সংকট বিরাজমান, ছিন্নমূল মানুষ মাথা গুঁজিবার ঠাঁই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, তখন তেজগাঁও শিল্প এলাকায় সরকারী কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে কয়েক লক্ষ টাকার শাড়ি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, কম্বল, বস্ত্র, তাঁবু ও উহা খাটাইবার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র পোড়াইয়া ফেলা হইতেছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৯, ১৯৭৩

''লেবার লীডারদের'' পয়সা রোজগারের ধুম : ১১ পয়সার দিয়াশলাই ৩০ পয়সায় বিক্রির গোমর ফাঁক ম্যাচ ফ্যাক্টরীগুলোতে হরিলুট

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২৩, ১৯৭৩

রাষ্ট্রয়ত্ত মিলগুলিতে হাজার হাজার বেল সুতা পড়িয়া আছে অথচ সুতার অভাবে মাত্র তিনটি থানায় ২ লক্ষ তাঁত বন্ধের উপক্রম

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ২৫, ১৯৭৩

আমদানকৃত ৭ হাজার সাইকেল গুদামে নষ্ট হইতেছে

জানা গিয়াছে যে, রাশিয়া হইতে টিসিবি কর্তৃক আমদানীকৃত প্রায় ৭ হাজার সাইকেল চট্টগ্রাম বন্দরের গুদামে দীর্ঘ দিন পড়িয়া থাকায় নষ্ট হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

প্রকাশ, গত আগস্ট মাসে জরুরী ভিত্তিতে এই সাইকেলগুলি রাশিয়া হইতে আমদানী করা হইয়াছিল।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২, ১৯৭৪

খুলনা ও যশোরে কল-কারখানা ঘেরাও

খুলনা ও যশোরের সমস্ত জুট মিলগুলিতে ঈদের বোনাসের দাবীতে ঘেরাও চলিতেছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৩, ১৯৭৪

মোব.রকগঞ্জে চিনি কল কর্তৃপক্ষের ভ্রান্ত নীতির বদৌলতে শৈলকুপা থানার হাজার হাজার আখচাষী চোখে সরিষার ফুল দেখিতেছে

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৩, ১৯৭৪

ঠাকুরগাঁও চিনিকলে দৈনিক ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইতেছে

প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইক্ষু সরবরাহ না হওয়ার ফলে ঠাকুরগাঁও চিনি-কল দৈনিক ১৫ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছে।

চিনিকল সূত্রে প্রকাশ, যে ক্ষেত্রে পূর্বে স্বাভাবিক হারে দৈনিক ৪০ হাজার মণ ইক্ষু মাড়াই হইত বর্তমানে সে স্থলে ৩০ হাজার মণ ইক্ষু মাড়াই হইয়া থাকে। ইহার ফলে ঠাকুরগাঁও চিনিকলে দৈনিক কাজের সময় আড়াইঘণ্টা হ্রাস পাইয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৪, ১৯৭৪

সিলেটে লক্ষ লক্ষ টাকার রিলিফ সামগ্রী বিনষ্ট

অযত্ন, অবহেলা ও সময়মত বণ্টন না করায় সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার রিলিফ সামগ্রী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৪, ১৯৭৪

নলকূপ বসানোর পুরানো চুক্তি বর্ধিত হারে রিন্যু করার ফলে ১৫ কোটি টাকার খেসারত দিতে হচ্ছে

বাংলাদেশ সরকার এক হাজার গভীর নলকূপ বসানোর জন্য যুগোশ্লা-ভিয়ার জিওটেক কোম্পানীকে অতিরিক্ত ৩ কোটি টাকা দিতে সম্মত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারের আরো ১৫ কোটি টাকা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ৯, ১৯৭৪

বাংলাদেশ বিমানে দুর্নীতির আর একদিক : চোরা পথে ২৩ জন ক্যাডেট পাইলট নেয়া হচ্ছে

দেশের জাতীয় বিমান চলাচল সংস্থা বাংলাদেশ বিমানকে দেউলিয়াত্বের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার নতুন চক্রান্ত শুরু হয়েছে। অযোগ্য ব্যক্তিদেরকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চোরা পথে নিয়োগ করে সংস্থার সুনাম, কর্মদক্ষতা ও ব্যবসায়িক ভিত্তি ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। জানা গেছে, এর পেছনে রয়েছে সরকারের অত্যন্ত প্রভাবশালী মহলের হাত।

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ১১, ১৯৭৪

বন্ধ টিএসপি কারখানা আজো চালু হয়নি : কবে হবে ঠিক নেই : ক্ষতি ২শ' সাড়ে ৭ কোটি টাকা

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ১৪, ১৯৭৪

সংসদে প্রশ্নোত্তর : রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে লক আউটের ফলে এ পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি টাকা ক্ষতি

স্বাধীনতার পর সরকার পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে লক আউট ঘোষণার ফলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে মোট ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে গতকাল (বুধবার) স্বতন্ত্র সদস্য জনাব মোঃ আবদুল্লা সরকারের এক প্রশ্নের জবাবে এই কথা জানান হয়।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১৭, ১৯৭৪

জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর

সার কারখানা বন্ধের ফলে দৈনিক ৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি। রিলিফ সামগ্রী বিতরণ সম্পর্কে প্রয়োজনবোধে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হইবে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৬, ১৯৭৪

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে ক্ষতি ১১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার ফলে ১৯৭২ সালের ১লা জুলাই হইতে

১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে মোট ১১ কোটি ৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৬, ১৯৭৪

সুতার মূল্য বৃদ্ধির সংগে সংগে

সুতার মূল্য বৃদ্ধির কথা ঘোষণার সংগে সংগে ঢাকার কাপড়ের বাজারে বড় রকম প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছে। গতকাল (শনিবার) ফুটপাতগুলিতে আলগা কাপড়ের দোকান বসে নাই। বায়তুল মোকাররাম, নিউ মার্কেট, ইসলামপুর ও শহরের অন্যান্য বস্ত্র বিপনী কেন্দ্রে অনেক দোকান বন্ধ থাকিতে দেখা যায়।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৭, ১৯৭৪

সপ্তাহকালের মধ্যে কয়লা না পৌঁছিলে ইস্পাত কারখানার চুল্লী জ্বলিবে না

কয়লা সংকটের দরুন এক সপ্তাহ পর চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানায় ইস্পাত উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। বর্তমানে চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানায় মাত্র ৪০ টন হার্ডবোর্ড মজুত রহিয়াছে। ইহার দ্বারা ইস্পাত, কারখানার চুল্লী আরও ৭ দিন জ্বলিতে পারে। ইহার পর অদূর ভবিষ্যতে কয়লা পাওয়ার নির্দিষ্ট সম্ভাবনা নাই।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৩০, ১৯৭৪

সুতার মূল্য বৃদ্ধির ফলে তাঁত শিল্প বন্ধ হইয়া যাইতে পারে

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১, ১৯৭৪

পদ্মার বক্ষে দিবালোকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পর পর ১০টি লঞ্চ ডাকাতি : ইস্টার্ণ রিফাইনারী বন্ধ

আজ বেলা ১২টায় অপরিশোধিত তৈলের অভাবে ইস্টার্ণ রিফাইনারীর যাবতীয় উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইস্টার্ণ রিফাইনারীর চিমনিতে উৎপাদন চালু থাকার একমাত্র লক্ষণ অনির্বান অগ্নিশিখাটিও আজ নির্বাপিত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৭৪

রিফাইনারী ৯২ দিন বন্ধ থাকায় এক নজরে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা

গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় সংসদে জনাব আবদুল্লা সরকারের এক প্রশ্নের জবাবে প্রাকৃতিক সম্পদ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ বলেন যে, ১৯৭৩ সালে অপরিশোধিত তৈলের অভাবে ৯২ দিনের জন্য এবং সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য রিফাইনারী আরও ৪৬ দিন বন্ধ ছিল।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ৪, ১৯৭৪

৯ কোটি টাকা বকেয়া ৪টি তৈল মার্কেটিং কোম্পানী অচলাবস্থার সম্মুখীন

ডিজেল, চুল্লীর জ্বালানি তৈল ও অন্যান্য তৈলজাত দ্রব্য বিক্রয় বাবদ বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ও কর্পোরেশনের নিকট ৯ কোটি টাকার অধিক বকেয়া পড়ার ফলে বাংলাদেশের ৪টি তৈল মার্কেটিং কোম্পানী অচল হইয়া পড়িতে পারে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯৭৪

আখচাষীরা অধিক মূল্যে গুড় উৎপাদনকারীদের নিকট আখ বিক্রয় করিতেছে মহিমাগঞ্জ চিনিকলে আখ সরবরাহ হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হইবে না

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯৭৪

উন্মুক্ত আকাশের নীচে টিসিবি আমদানীকৃত ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের বাসের চ্যাসিস

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১০, ১৯৭৪

কেরোসীন উধাও

সরকার কর্তৃক কেরোসীন ও পেট্রোলজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে না করিতেই এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর কারসাজিতে গতকাল (রবিবার) হইতেই জনসাধারণের নবতর দুর্ভোগ শুরু হইয়াছে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৯৭৪

যোগাযোগের অব্যবস্থা: পর্যাপ্ত যানবাহন নেই: সেতাবগঞ্জ চিনিকলে এবার ১৬ লাখ টাকার চিনি উৎপাদন কমে যাবে

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ১৯, ১৯৭৪

প্রতিটি শিক্ষা লুজিং কনসার্ন: কৃষিক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব: উৎপাদন শূন্যের কোঠায়: দেশে হাহাকার কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য কি?

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ১৯, ১৯৭৪

দিয়াশলাই শিল্পে মারাত্মক সংকট

খোলা বাজারে এখন একটি দিয়াশলাইয়ের দাম পঁয়ত্রিশ পয়সা। মফঃস্বলের কোন কোন অঞ্চলে পঞ্চাশ পয়সা দামে বিক্রয় হইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগে প্রতিটি দিয়াশলাই পঁচিশ পয়সা মূল্যে পাওয়া যাইত। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানা যায় যে, প্রধান কাঁচামাল পটাশিয়াম ক্লোরেটের অভাবে দেশের দিয়াশলাই শিল্প মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করিয়া শতকরা ২০ ভাগে নামাইয়া আনা হইয়াছে। তিনটি কারখানার উৎপাদন বন্ধ রহিয়াছে এবং যে কোন মুহূর্তে দিয়াশলাই উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থাও এই আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য অনেকটা দায়ী।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২০, ১৯৭৪

লবণ নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড: আট আনা থেকে আট টাকা

ঢাকার বাজারে গতকাল লবণের দাম আকস্মিকভাবে প্রতিসের ৮ টাকা পর্যন্ত পৌঁছায়। সকালেও প্রতিসের লবণের মূল্য ছিলো আট আনা।

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ২৩, ১৯৭৪

নারায়ণগঞ্জের ১৭০টি আটাকল কি বন্ধ হইয়া যাইবে?

গম বরাদ্দের অভাবে নারায়ণগঞ্জের ১৭০টি আটাকল এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক মার্চ ৫, ১৯৭৪

তাঁতীরা সুতা পায় না—তবে টাকা পায়

রূপগঞ্জ (ঢাকা) ৫ই মার্চ—রূপগঞ্জ, বৈদ্যের বাজার ও আড়াই হাজার থানার বিভিন্ন তন্তুবায় সমবায় সমিতি ও ফ্যাক্টরী লাইসেন্সের এক প্রাথমিক জরিপে দেখা গিয়াছে যে, ঐগুলির শতকরা ৯৫টিই ভূয়া।

—ইত্তেফাক মার্চ ৯, ১৯৭৪

নারায়ণগঞ্জের ১১০টি আমদানী লাইসেন্সের ৯২টি-ই-ভূয়া

—ইত্তেফাক মার্চ ২৫, ১৯৭৪

৪ জন গ্রেফতার : ভেজাল দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানায় হানা

বিভিন্ন প্রকার তৈল, ব্যাটারী, স্নো, পাউডার ও গ্লাক্সোজ-ডি নকল করার দায়ে গতকাল (রবিবার) শহরে ৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৫, ১৯৭৪

খুলনায় বিদ্যুৎ রেশনিং : ৪০টি মিল বন্ধ

গোয়ালপাড়া পাওয়ার হাউস বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় খুলনা ও যশোরের প্রায় ৪০টি মিল কারখানা অদ্য হইতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বন্ধ মিলের মধ্যে রহিয়াছে ১৮টি পাটকল। এই ১৮টি পাটকল বন্ধ থাকার ফলে দৈনিক ৮০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইতেছে। ৪০টি মিল বন্ধের ফলে সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৭, ১৯৭৪

ব্যাটারী কারখানাগুলি বন্ধ হইবার উপক্রম

বর্তমানে টর্চ ও ট্রানজিস্টারের ব্যাটারীর (ড্রাইসেল) দুষ্প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও শুধু জিঙ্ক শীটের অভাবে দেশের প্রায় অর্ধশত ব্যাটারী উৎপাদন কারখানা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৪, ১৯৭৪

কাঁচ শিল্পে সংকট

প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহে অব্যবস্থা এবং জ্বালানির স্বল্পতার ফলে দেশের কাঁচশিল্পে সঙ্কট দেখা দিয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৬, ১৯৭৪

নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প দুষ্প্রাপ্য

—ইত্তেফাক মে ৪, ১৯৭৪

দিনাজপুর সদর হাসপাতালে ঔষধের অভাবে চিকিৎসা ব্যাহত

জীবন রক্ষাকারী ঔষধের অভাবে জেলার অন্যতম চিকিৎসা কেন্দ্র দিনাজপুর সদর হাসপাতালে শত শত রোগীর চিকিৎসা ব্যাহত হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এ ব্যাপারে হাসপাতাল সূত্রে বলা হয় দীর্ঘদিন যাবৎ এই হাসপাতালে সরকারীভাবে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হইতেছে না।

—ইত্তেফাক মে ১১, ১৯৭৪

কটন মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড : ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি টাকা

আজ সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে টাঙ্গাইল হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী টাঙ্গাইল কটন মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের দরুন প্রায় এক কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে। যে সুতা পুড়িয়া ছাই হইয়াছে উহার আনুমানিক মূল্য ১০ লক্ষ টাকা হইবে। যে সমস্ত যন্ত্রপাতি অগ্নিকাণ্ডের দরুন অকেজো হইয়া গিয়াছে উহার আনুমানিক মূল্য ৯০ লক্ষ টাকার কম হইবে না।

—ইত্তেফাক মে ১৩, ১৯৭৪

সিমেন্ট নাই : রড নাই : ইটের অভাব
রংপুরে প্রায় সোয়া তিন কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ অচল

—ইত্তেফাক মে ২১, ১৯৭৪

সাতক্ষীরায় বিদ্যুৎ সংকট : ৭টি জেনারেটরের মধ্যে ৬টি বিকল

—ইত্তেফাক মে ২৮, ১৯৭৪

এক্সরে ফিল্মের অভাবে চিকিৎসা সংকট

এক্সরে ফিল্মের অভাবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল ও চেস্ট ক্লিনিকসমূহে আবার অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

—ইত্তেফাক মে ২৮, ১৯৭৪

ময়মনসিংহ শহরে পানীয় জলের সংকট চরমে পৌঁছিয়াছে

ময়মনসিংহ শহরে পানীয় জলের সমস্যা চরমে উঠিয়াছে। বর্তমানে শহরকে বাংলাদেশের কারবালা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

—ইত্তেফাক মে ৩০, ১৯৭৪

সংসদে প্রশ্নোত্তর
বিদ্যুৎ বিভ্রাটে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পে দশ মাসে ৭ কোটি ৫৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার ক্ষতি। স্বাধীনতার পর গ্রামবাসীদের গৃহ নির্মাণ বাবদ কোন সাহায্য দেওয়া হয় নাই

—ইত্তেফাক জুন ৪, ১৯৭৪

আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য অবিলম্বে খুচরা যন্ত্রাংশ চাই

আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র খুচরা যন্ত্রপাতির অভাবে সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, পর্যাপ্ত যন্ত্রাংশের অভাবে বর্তমানে সঠিক যন্ত্রাংশের পরিবর্তে বিকল্প যন্ত্রাংশের মাধ্যমে কাজ চালান হইতেছে। ইহার ফলে যে-কোন সময় বড় রকমের যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিতে পারে এবং এমনকি অচলাবস্থারও সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া অভিজ্ঞ মহল আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন।

—ইত্তেফাক জুন ৪, ১৯৭৪

এক বছরে ভোগ্য পণ্য সরবরাহ সংস্থার সাড়ে ৩ কোটি টাকা গচ্চা

—ইত্তেফাক জুন ১৩, ১৯৭৪

আর্থিক সংকটের আবর্তে দশ সহস্রাধিক বিড়ি শ্রমিক

—ইত্তেফাক জুন ৩০, ১৯৭৪

লোহার অভাবে ৫ হাজার কামার জাতব্যবসা ছাড়িয়া দেওয়ার কথা ভাবিতেছে।

—ইত্তেফাক জুন ৩০, ৬ ১৯৭৪

কর্তাদের অযোগ্যতা ও পরিকল্পনাহীনতা : ১০ কোটি টাকার বকেয়া বিল অনাদায়
বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ৯০ কোটি টাকার উৎপাদন ব্যাহত
বস্ত্রমূল্য আকাশচুম্বী : ৮৫ কোটি টাকার সুতা ও সরঞ্জাম গুদামজাত : তাঁতীরা বেকার

—গণকণ্ঠ জুলাই ১৫, ১৯৭৪

কাপড়ের অগ্নিমূল্য : অবৈধ ব্যবসায়ীরা বিপুল টাকার মালিক : প্রকৃত তাঁতীরা বেকার : আধিপত্যবাদ ও নব্য পুঁজির প্রসারের নীতি তাঁতশিল্পে সঙ্কট বাড়াচ্ছে

—গণকণ্ঠ জুলাই ২২, ১৯৭৪

পাওনা আদায়ের ব্যর্থতার ফলে—

অবশেষে আশঙ্কা সত্যে প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। বিদেশী কোম্পানীকে তেলের মূল্য পরিশোধ না করায় তৈল সরবরাহে অস্বীকৃতির ফলে আগামী শুক্রবার হইতে বাংলাদেশ বিমানের ঢাকা-কাঠমুণ্ডু ফ্লাইট বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ২২, ১৯৭৪

৩৬ লাখ টাকার কারচুপি : উৎপাদন অর্ধেকের কম : বগুড়া কটন মিলে লুটের রাজত্ব : প্রতিমাসে দু'লাখ টাকা লোকসান

বাংলাদেশ হবার পূর্বে বগুড়া কটন স্পিনিং মিলটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু প্রায় আড়াই বছর পূর্বে এই মিলটি জাতীয়করণ করার পর থেকে এটি লোকসান-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রতিমাসে ২ লাখ টাকা লোকসান দিয়ে বর্তমানে এই মিলের লোকসানের পরিমাণ ৫০ লক্ষাধিক টাকায় দাঁড়িয়েছে বলে জানা গেছে।

এছাড়া বাংলাদেশ কটন টেক্সটাইল কর্পোরেশনের অডিট রিপোর্টে প্রায় ৩৬ লাখ টাকার হিসাবে কারচুপি ফাঁস হয়েছে বলে প্রকাশ।

—সোনার বাংলা সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৭৪

কাঁচামাল, তেল ও যন্ত্রাংশের অভাবে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিরামিক কারখানা বন্ধ

অবশেষে ফার্নেস ওয়েল, কাঁচামাল, যন্ত্রাংশের অভাবে এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে উত্তরবঙ্গের শিল্পকেন্দ্র বগুড়ার বৃহৎ শিল্প কারখানাগুলির মধ্যে ভার্জিনিয়া টোবাকো (রাষ্ট্রায়ত্ত) এবং দেশের ২য় বৃহত্তম সিরামিক কারখানা তাজমা সিরামিক ইণ্ডাস্ট্রিজ গতকাল হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৭৪

কয়েক কোটি টাকার মেশিন-পত্র বিনষ্ট : কমপক্ষে ২০ জন হতাহত
রহস্যজনক বিস্ফোরণে ঘোড়াশাল সার কারখানার কন্ট্রোল রুম বিধ্বস্ত

ঘোড়াশাল সার কারখানায় রহস্যজনকভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে। গতকাল (বুধবার) দুপুর ২টা ৫ মিনিটে কারখানার প্রধান অংশ এ্যামুনিয়া কন্ট্রোল রুমে সংঘটিত এই বিস্ফোরণে সম্পূর্ণ কন্ট্রোল রুম বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রাথমিক রিপোর্টে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ১২ কোটি টাকা।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৭৪

ঘোড়াশাল সার কারখানায় রহস্যজনক বিস্ফোরণ : ভারতে আরও ৩টি সারকারখানা তৈরী হচ্ছে

—সোনার বাংলা সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৭৪

নেমকহারাম আসলে কারা এবার প্রমাণিত হলো—

বিদেশ থেকে লবণ আমদানী করার প্রয়োজন হতে পারে এ ধরনের রিপোর্ট পেশ করে সাসপেণ্ড হয়েছিলেন সরকারী দৈনিকের দুই জন সাংবাদিক। লবণ সংকট সৃষ্টি হতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করে গ্রেফতার হয়েছিলেন ঢাকা বণিক সমিতির প্রধান জনাব আবদুস সাত্তার। এত কিছু ঘটে যাবার পর সেই লবণের ব্যাপারে মুখ খুলেছেন আমাদের খাদ্যমন্ত্রী জনাব আবদুল মোমেন। এবার তাঁর কণ্ঠে আশংকা নয়, ভারত থেকে চার লাখ মণ লবণ আমদানীর আশ্বাস। সরকার নাকি জরুরী ভিত্তিতে এই ৪ লাখ মণ লবণ আমদানী করেছেন। লবণ সংকট নামক 'হারাম' শব্দটা উচ্চারণ করে যেখানে সাংবাদিকের চাকরি যায়, বণিক সমিতির নেতা গ্রেফতার হন, সেস্থলে মন্ত্রী কিভাবে ভারত থেকে লবণ আমদানীর সাংঘাতিক রকমের গোপন তথ্যটি ফাঁস করে দিলেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

—সোনার বাংলা অক্টোবর ১৬, ১৯৭৪

ময়দা ও চিনি সংকটে বেকারী বন্ধ হওয়ার উপক্রম

হবিগঞ্জ, ৩১শে অক্টোবর। চিনি ও ময়দার অভাবে হবিগঞ্জ মহকুমার প্রায় ১ শত বেকারী বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। ফলে, ঐ সমস্ত বেকারীতে কর্মরত প্রায় ১২ শত কারিগর ও শ্রমিকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২, ১৯৭৪

প্রকাশিত তদন্ত রিপোর্ট সকল মহলকে হতবাক করেছে ঘোড়শাল বিস্ফোরণের আসল রহস্য ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা ?

গত ১১ই সেপ্টেম্বর ঘোড়াশাল সার কারখানায় যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তার তদন্ত রিপোর্ট এখনও জন সমক্ষে প্রকাশিত হয়নি। তবে স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় তদন্ত রিপোর্টের বিবরণ জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। সেই বিবরণে সকল মহলের খুশী হবার কথা। কিন্তু তদন্ত রিপোর্ট বলে কথিত যে বক্তব্য গত ৩রা নভেম্বরে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, তা দেখে সর্বস্তরের মানুষ বিস্ময়ে হতবাক বনে গেছেন। এই তথাকথিত তদন্ত রিপোর্ট জনগণকে শুধু বিস্ময়াভিভূত করেনি, তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তাদের মুখে মুখে একই কথা, সত্যকে ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশেই এই রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে। শ্রমিক সমাজ এই রিপোর্টের প্রতিবাদে নেমে এসেছেন রাস্তায়।

—সোনার বাংলা নভেম্বর ১০, ১৯৭৪

৯ লক্ষ ডলার মূল্যের ৩০ হাজার টন চিটাগুড় অপচয় হইতেছে

বাজারজাতকরণ ও রফতানীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে প্রতিবছর বিভিন্ন চিনিকলের উপজাত পণ্য প্রায় ৩০ হাজার টন চিটাগুড় অপচয় হইতেছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজারদর অনুযায়ী এই চিটাগুড়ের মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ডলার বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১১, ১৯৭৫

বস্ত্র সংকট কি কৃত্রিম ?

বাংলাদেশের বাজারে কাপড়ের অভাব নাই। বর্তমানে 'ডিমাণ্ডের' তুলনায় 'সাপ্লাই' বাড়িয়াছে। তাই কাপড়ের মূল্য কমিয়াছে। কিন্তু দেশী কাপড়ের সবই 'ওয়েজ আর্নার' স্কীমে আনা হইয়াছে।

বিদেশী কাপড়ের দাম কমিলে কি হইবে দেশী কাপড়ের মূল্য এখনও আকাশচুম্বী। শাড়ী, লুঙ্গি, গামছা, গেঞ্জী ইত্যাদির মূল্যে তেমন কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে না।

দেশের মিলগুলিতে যে কাপড় তৈরী হইতেছে উহা ঠিকমত 'মার্কেটিং' হইতেছে না, যে স্থতা প্রস্তুত করা হইয়াছে উহা আর 'লিফট' করা হইতেছে না। ফলে দেশে তৈরী কাপড়ের বাজারে দেখা দিয়াছে এক চরম অনিশ্চয়তা।

কাপড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নাকি 'সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট'। তবু কেন কাপড় আমদানীর হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে, বুঝা দুষ্কর। বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্প সংস্থার এক রিপোর্ট (জানুয়ারী, ১৯৭৩) অনুযায়ী দেশে ৬ হাজার ৫ শত শক্তিচালিত তাঁত রহিয়াছে। বছরে কার্যরত দিনের সংখ্যা ৩০০ এবং দৈনিক দুই শিফটে গড়ে কমপক্ষে ৬০ গজ কাপড় উৎপাদিত হয়। এই হিসাব ধরিলে বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ গজ। চারলক্ষ হ্যাণ্ডলুমে দৈনিক গড়ে ৫ গজ করিয়া উৎপাদন করিলে বছরে ৬০ কোটি গজ কাপড় তৈরী করা সম্ভব। ইহাছাড়া, ১৩টি বিশেষ ধরনের কাপড়ের মিলে বছরে ৯৮ লক্ষ গজ কাপড় উৎপাদিত হইতে পারে।

ইহাতে দেখা যায়, বছরে মোট ৭২ কোটি ৬৮ লক্ষ গজ কাপড় উৎপাদন সম্ভব। সংস্থার মতে, মাথাপিছু ৮ গজ করিয়া ধরিলে গড়ে ৭ কোটি লোকের (প্রকৃতপক্ষে আরও কম) জন্য বছরে ৬০ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন। এই তথ্য সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে বছরে ১২ কোটি ৬৮ লক্ষ গজ কাপড় উদ্বৃত্ত থাকার কথা। কিন্তু আসলে কি তা হয়?

স্বাধীনতার পূর্বে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিমাণ কাপড় পাওয়া যাইত উহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

বৎসর	মোট উৎপাদন	মাথাপিছু
১৯৬৪-৬৫	৪৫·৩৫ কোটি গজ	৭·১০ গজ
১৯৬৫-৬৬	৪৯·৮৭ ,, ,,	৭·৬০ ,,
১৯৬৬-৬৭	৪৬·৪৮ ,, ,,	৬·৮০ ,,
১৯৬৭-৬৮	৪১·৬৯ ,, ,,	৫·০০ ,,
১৯৬৮-৬৯	৪৫·৭২ ,, ,,	৬·৩০ ,,

স্বাধীনতার পূর্বে কিছু কাপড় পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আমদানী করা হইত বটে, তবে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান হইতে হ্যাণ্ডলুমের শাড়ীসহ বিভিন্ন ধরনের কাপড় বিদেশে রফতানী ও করা হইত। ১৯৬৬-৬৭ সনে ৬ লক্ষ টাকার, ১৯৬৭-৬৮ সনে ৬৩ লক্ষ টাকার এবং ১৯৬৮-৬৯ সনে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার কাপড় বিদেশে রফতানী করা হইয়াছিল। কমনওয়েলথ দেশসমূহসহ ইউরোপীয় সাধারণ বাজার ও যুক্তরাষ্ট্রে কাপড় রফতানীর 'অগ্রাধিকার কোটা' বাংলাদেশও পায়। কিন্তু এখন আর উহার সদ্ব্যবহার করা হইতেছে না। বরং ভারত হইতে ১৬ কোটি টাকার কাপড় আমদানী করা হইয়াছে। ওয়েজ আর্নারস স্কীমে যে কত টাকা মূল্যের কাপড় আমদানী করা হইয়াছে উহার কোন হিসাব নাই।

সরকারী হিসাবে সমবায়ের অধীনে ৫ লক্ষ এবং বিসিকের অধীনে ৩ লক্ষ তাঁত ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে ঐ পরিমাণ তাঁত নাই—ঐ হিসাবের অর্ধেকের বেশী তাঁত ভূয়া। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সুতার দাম ছিল যথাক্রমে ২০ নম্বর ৩৫ টাকা, ৩২ নম্বর ৪৫ টাকা ও ৪০ নম্বর ৫৫ টাকা। তখন একটা সাধারণ শাড়ীর দাম ছিল ৮।১০ টাকা, একটি লুঙ্গির দাম ছিল ৩।৪ টাকা। আর এখন সেই সাধারণ শাড়ী ও লুঙ্গির দাম হইয়াছে যথাক্রমে ৪০।৪৫ ও ২০।২৫ টাকা। বর্তমানে কন্ট্রোলে যে সুতা পাওয়া যায় উহার মূল্য নিম্নরূপ :

সুতার রকম		বিসিক	সমবায়	খোলাবাজার
৩০।১	প্রতি বাণ্ডিল	২২৭ টাকা	১৫২ টাকা	১৭০ টাকা
৩২।১	,, ,,	২১৭ ,,	১৫৭ ,,	১৮০ ,,
৩৪।১	,, ,,	২১৮ ,,	১৮৪ ,,	১৯০ ,,
৪০।১	,, ,,	২২৫ ,,	২০৫ ,,	২০০ ,,

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৯-৭০ সনে ১০ কোটি ৫৬ লক্ষ পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত করা হয়। ১৯৭৩-৭৪ সনে ৪টি নূতন সুতাকল স্থাপন করা সত্ত্বেও উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই (৮ কোটি পাউণ্ড)।

দেশে ২১টি সুতাকলের ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকু আছে। ইহারা বছরে ১৪ কোটি পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত করিতে পারে। ১ গজ সুতায় ৫ গজ কাপড় তৈরী করা যায়। উহাতে দেখা যায়, বছরে ১ কোটি ৪০ লক্ষ গজ কাপড় তৈরী করা সম্ভব। স্বাধীনতার পূর্বে মিহি সুতা আমদানী করা হইত। কিন্তু প্রচুর পরিমাণ মোটা সুতা বিদেশে রফতানী করা হইত। বর্তমানে ইহা হয় না।

সস্তা কাপড় তৈরী করার জন্য যে সুতা ব্যবহার করা হয় উহা আমদানী করার প্রয়োজন নাই। কেবল বিশেষ ধরনের বস্ত্রের জন্যই মিহিসুতা ও কৃত্রিম তন্তু আমদানীর প্রয়োজন রহিয়াছে। টেকসই কাপড়ের জন্য বেশী পরিমাণ কৃত্রিম সুতা আমদানী করিলে উৎপাদিত কাপড় রফতানী করিয়া প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাইতে পারে। পাকিস্তান আমলেও উহা করা হইত।

গত মার্চ মাস হইতে বস্ত্রশিল্প সংস্থা কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। সবাই ভাবিয়াছিল অন্ততঃ বর্ধিত মূল্যে জনগণ কাপড় পাইবে। কিন্তু সংস্থার নির্ধারিত মূল্যে কাপড় পাওয়া যায় না—কালোবাজারের রেটে কাপড় বিক্রয় হয়। (সংস্থার রেট নিম্নে দেওয়া হইল):

কাপড়	ধরন	পূর্ব মূল্য প্রতি গজ	বর্তমান মূল্য প্রতি গজ	বৃদ্ধি %
মার্কিন	১৮×১৮৩৬″ / ৪০×৪০	২.৫০	৩.২৫	৩০%
,,	,, ৪৪″	২.৯০	৩.৮৭	৩৩%
,,	,, ৫২″	৩.৫০	৪.৫৫	৩০%
লংক্লথ (ব্লীচড)	২০×২০৩৬″ / ৫০×৪৪	৪.১০	৫.২৫	২৮%
ধূসর শাড়ী	১৮×১৮৪০″ / ৫০×৪৪	২.৯২	৩.৯৯	৩৬%
,,		৩.১৯	৪.০০	২৫%
,,	৩০×২৮৪৪″ / ৪৮×৩৮	৩.১৯	৪.০০	২৫%
১″ বর্ডার শাড়ী (ব্লচড)	৩৬×৩৬৪৪″ / ৪৮×৪৪	৩.৬০	৫.৯৯	৩৮%
১″ বর্ডার ২ লুঙ্গি	২৮×৩২৪৬″ / ৬৪×৫০	৪.০০	৫.৪০	৩৫%
পপলিন (রঙ্গীন)	২৮×২৪৩৬″ / ৭০×৫৮	৫.২০	৬.৮৫	৩১%
ধুতি (ধূসর)	২২×৩০৪২″ / ৪৫×৩৬	২.৭৭	৩.৭০	৩৩%
ড্রীল (ব্লীচড)	১৫×১৪৩০″ / ৭৬×৪৮	৪.৩০	৫.৮৬	৩৬%
,,	,, ৩২″	৪.৬০	৬.০৫	৩১%

বস্ত্রশিল্প সংস্থা নিজে সরাসরি কাপড় বণ্টন করেন না—ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সংস্থা এই দায়িত্ব নিয়াছেন। ভোগ্যপণ্য সংস্থা নিজস্ব পদ্ধতিতে কাপড় বণ্টন করেন। অভিযোগে প্রকাশ, এই 'নিজস্ব' পদ্ধতির জন্যই নাকি আসল দামে কাপড় পাওয়া যায় না—অনেক হাত ঘুরিয়া যখন ক্রেতার হাতে কাপড় পেঁ ীছে, তখন উহার মূল্য অনেক বৃদ্ধি পায়।

আসলে দেশে কাপড়ের অভাব তেমন নাই। শুধু দামী কাপড় আমদানী করিলেই চলে। তবে সস্তা কাপড় তৈরী করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ না করিলে সবসময় কাপড় আমদানীই করিতে হইবে।

দেশে বর্তমানে সাধারণ চালু বস্ত্রকারখানার সংখ্যা হইল ৪৫টি। বিশেষ ধরনের বস্ত্র কারখানা আছে ১৩টি। খুচরা যন্ত্রাংশের অভাবে ইহাদের সবকয়টির অবস্থা শোচনীয়। এই কারখানাগুলিকে পূর্ণোদ্যমে চালু করিতে হইলে কমপক্ষে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার যন্ত্রাংশ অবিলম্বে আমদানী করিতে হইবে বলিয়া সংশ্লিষ্ট মহল জানাইয়াছেন।

আর যে একটি প্রধান সমস্যা আছে, উহা হইল প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব। ১৯৭২-৭৩ সনে আমদানীকৃত কয়েকটি চালানের কাঁচাতুলা অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল বলিয়া উৎপাদিত সুতার পরিমাণ অনেকগুণ কমিয়া যায়। কমপক্ষে ১০ কোটি টাকার কাঁচামালের (বয়নশিল্পের জন্য সুতা এবং কারখানার জন্য তুলা অথবা কৃত্রিম আঁশ) ব্যবস্থা করিলে কারখানাগুলি চালু থাকিবে। সেই সংগে তিন শিফট চালু করিতে পারিলে উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইবে। আর যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের ব্যবস্থা না করা হয়, তবে বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

—ইত্তেফাক ১৯৭৪

উত্তরাঞ্চলে কুম্ভিপাতার অভাব :
সহস্রাধিক বিড়ি কারখানা বন্ধ : পাঁচলক্ষ শ্রমিক বেকার

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৮, ১৯৭৪

সুতার ফাঁস হইতে তাঁতীদের কি মুক্তি আসিবে ?

সুতা ও কাপড় বিলি বণ্টনের উপর কড়াকড়ি শিথিল করার কথা ঘোষিত হইলেও উহাতে প্রকৃত তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সুতা পাইবার পথটি কতখানি সুগম হইবে তাহা ভাবিয়া দেখার ব্যাপার হইয়াছে। সুতার শ্বাস-

রোধকারী ফাঁসে আটকাইয়া পড়া তন্তুবায়কুল হাসফাঁস করিতেছিল বলিয়া এই কড়াকড়ি শিথিল করনের ঘোষণায় তাহাদের ধরে প্রাণ আসার কথা।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭৪

গুদামে ৮০ কোটি টাকার স্থতা

টিসিবি, বিটিসি, বিসিক ও শিল্প সমবায়ের বিভিন্ন গুদামে প্রায় ৮০ কোটি টাকা মূল্যের ৯০ হাজার গাইট স্থতা মওজুত পড়িয়া রহিয়াছে।

উৎপাদিত স্থতা যথাসময়ে বিক্রয় না হওয়ায় বিভিন্ন স্থতাকলে উৎপাদন হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং মওজুত স্থতা বিক্রয় না হওয়ায় টিসিবি কর্তৃপক্ষ বড়ই 'বিব্রত' বোধ করিতেছেন।

—ইত্তেফাক মার্চ ২০, ১৯৭৫

সত্যই কি সংকট ?

প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ঘাটতি ও ব্যাপক দুর্নীতির ফলে দেশে সাবান সংকট তীব্র হইতে তীব্রতর আকার ধারণ করিয়াছে। খোলাবাজারে বর্তমানে সাবান পাওয়া দুষ্কর। ফলে ৩ টাকা মূল্যের সাবান ৭।৮ টাকায় বিক্রয় হইতেছে।

—ইত্তেফাক মে ৪, ১৯৭৫

চিনির ব্যাপারেও একই কথা। স্থযোগ সত্ত্বেও রপ্তানী বাণিজ্যে অচলাবস্থা

আমাদের রফতানী বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সরকার যত পদক্ষেপই নিচ্ছেন না কেন, বহির্বাণিজ্য দফতরের কর্মকর্তাদের গাফলতি ও অব্যবস্থার ফলে সে সব ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে চলেছে। টাকার অবমূল্যায়ণ, সাবসিডি প্রদান, শুল্ক হ্রাস ইত্যাদি রফতানী বৃদ্ধির জন্য যত ব্যবস্থাই গৃহীত হয়েছে, কোন ব্যবস্থাই রফতানী বাণিজ্য হতে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে পারেনি।

গত তিন বছরে ব্যবসায়ী স্থলভ প্রজ্ঞার অভাবে আমরা পাট হারিয়েছি। লবণের অভাবে চামড়া পঁচিয়েছি। বাকি ছিল চা ও তামাক, তার অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়।

—সোনার বাংলা জুন ৮, ১৯৭৫

৮২টি সেলাই স্থতা প্রস্তুত কারখানা সঙ্কটের সম্মুখীন

দেশের ৮২টি সেলাই স্থতা প্রস্তুত কারখানা সংকটের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ, দেশের চাহিদা পূরণে সেলাই সূতা প্রস্তুত কারখানাগুলি উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী হইলেও প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল-এর অভাব ও কাঁচা মাল যাহা পাওয়া যায় গুণগত দিক দিয়াও অত্যন্ত নিম্নমানের।

—ইত্তেফাক জুন ১১, ১৯৭৫

সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় মতামত

মঞ্চে-নেপথ্যে

...পাবলিকের ভাল করার দিকেই কমার্স মিনিস্ট্রি, সিসিআই-ই, টিসিবি, বিসিএসসি, ডিসি, এসডিও, প্রাইস ফিক্সেশন কমিটি, ওজি-এলের ইম্পোর্টার, কলিকাতার এক্সপোর্টার, সবার দৃষ্টি, সকলের লক্ষ্য। পাঠকরাই বলুন, এত নজরের পরও পাবলিকের ভাল না হইয়া পারে? নিশ্চয়ই পারে না। আর পারে না বলিয়াই ঢাকা শহরে এরই মধ্যে ও জি-এলে'র কাপড় লইয়া 'হুলস্থূল নাটক' পুনর্মঞ্চায়ন শুরু হইয়া গিয়াছে। এক সহযোগী খবর দিয়াছেন যে, লাইনে দাঁড়াইয়া সরকারের অনুমোদিত দোকান হইতে সোয়া সতের টাকার একটি ওজি-এলের কাপড় কিনিয়া ওখানেই পঁচিশ-ত্রিশ টাকায় বিক্রি করা যাইতেছে। ক্রেতা-বিক্রেতার কোন অভাব নাই। এই 'সর্বাঙ্গ-সুন্দর' বণ্টন ব্যবস্থাও পাবলিকের ভালর জন্যই নয় কি?

আরেক সহযোগীর বিজ্ঞ নিবন্ধকার লিখিয়াছেন: 'বাইশ টাকা জোড়ার শাড়ীর আমদানী শুল্ক, পরিবহন ও বিক্রেতার মুনাফা ধরে মূল্য দাঁড়াতে পারে ৪০ টাকা জোড়া;....এমনি করে সতের টাকার লুঙ্গি নাকি পড়বে চল্লিশ টাকার মত'। ইণ্ডিয়ান পাওয়ারলুমে ৩৬ কাউন্ট সুতার তৈরী 'সিল্কের মত উজ্জ্বল' লুঙ্গির উপর কাস্টমস নাকি একশ পার্সেন্ট শুল্ক জুড়িয়া দিতেছেন। তাহাতে চৌদ্দ টাকা জোড়ার লুঙ্গির দাম দাঁড়াইতেছে চল্লিশ টাকা। এই যে বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি, এটাও তো পাবলিকের ভালর জন্যই, তাই না?

গত জুনে শোনা গিয়াছিল, ওজিএলের মোটা শাড়ীর জোড়া হইবে ২১ টাকা ৭৫ পয়সা, আর প্রতিটি লুঙ্গি সাড়ে সাত টাকা। আরও শোনা গিয়াছিল যে, মোটা কাপড়ের উপর কোন ডিউটি বা শুল্ক লাগিবে না। বাণিজ্যমন্ত্রী সংসদে এই ধরনের একটি কথা গত জুন মাসে ঘোষণা করিয়াছিলেন। গরীবেরা যাতে সস্তায় কাপড় পায় সেটাই ছিল তাঁর মহদুদ্দেশ্য। এখন কাস্টমসের দয়ায় ও দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মহানুভবতায় সেই মোটা শাড়ী, মোটা লুঙ্গির দাম দ্বিগুণেরই উপর। এটাও পাবলিকের ভালোর জন্যই কি? বেশী দাম দিয়া কিনিলে লোকে সে কাপড়ের বেশী যত্ন লইবে। কাপড় বেশী দিন টিকিবে। দেখুন পাবলিকের কল্যাণকামীদের কি বুদ্ধি!

...অবশ্য একটা কথা উঠিতে পারে। এই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়েরই গত ২৪শে আগস্টের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছিল যে, 'ওজিএলের অধীনে কাপড় আসিতেছে না—সংবাদপত্রের এই খবর ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর; আসলে সব কাপড়ই আসিতেছে এবং শতকরা ৯০ ভাগ কাপড়ই ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিতেছে; প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই কিছু পরিমাণ কাপড় আসিয়া পৌঁছিয়াছে; মোট ঋণপত্রের শতকরা দশ ভাগের আমদানী কেবল বিলম্বিত হইতে পারে—সেটাও কোন ক্রমেই বন্ধ হইবে না।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় অক্টোবর ২৭, ১৯৭৩

স্থান-কাল-পাত্র

..দিন গেছে, কিন্তু যে কথাটা থেকে গেছে, তা হল কাপড়ের কথা। দিন যাচ্ছে,—যথানিয়মে শীত এসেছে। ঈদ আসছে। কিন্তু তবুও যে কথাটা থেকে যাচ্ছে, তা'হল কাপড়ের কথা, কাপড়ের অভাবের কথা। ওজিএল-এর মাধ্যমে কাপড় আমদানীর কথা। ন্যায্যমূল্যের দোকানের মারফত সে কাপড় বিলি-বণ্টনের কথা। তিন টাকার লুঙ্গি ২৩ টাকায় বিক্রির কথা।

..দিন এসেছে, দিন গেছে। মোটা কাপড়ের ছোট সেই দাবীটি পূরণ হয়েছে কি? যদি বলি, হয়েছে, তাহলে মিথ্যা বলা হবে না। আর যদি বলি, হয় নাই, তাও কেউ অসত্য বলে প্রমাণ করতে পারবে না।

ওজিএল-এর কল্যাণেই হোক অথবা টিসিবির বদওলতেই হোক, দেশের হাটে-বাজারে কাপড়ের কোন কমতি নাই। দোকানে-দোকানে, থরে-বিথরে কাপড় সাজানো। হরেক রকমের কাপড়। হরেক কিসিমের কাপড়। কিন্তু সে কাপড়ের গায়ে হাত দেয় কার সাধ্য? এই শীতের দিনে গরম কাপড়ের কল্যাণে নয়, শুধু কাপড়ের দামের দওলতেই হাত-পা-গা-মাথা সব গরম হয়ে পড়ে। আজো বাঙালীরা যে এই দারুণ শীতেও বিনা-কাপড়ে বহাল তবিয়তে বেঁচে বর্তে রয়েছে, সে কেবল কাপড়ের দামের গরমের দরুন। কাপড়ের দাম শুনেই গা গরম হয়, সে কাপড় কিনতে হয় না, পরতে হয় না।

তবুও মিটিং হয়। মন্ত্রী সাহেবদের মিটিং। হোমরা-চোমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈঠক। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কনফারেন্স। অফিসে-পার্টিতে এনতার চা-সিগারেট ওড়ে। দিস্তার পর দিস্তা কাগজের প্লান-প্রোগ্রাম লেখা হয়। ইনফরমেশন আর পাবলিক রিলেশন্স অফিসাররা সেই মুসাবিদার ইংরেজী নিউজ তৈরী করেন গলদঘর্ম হয়ে। পত্রিকার সংবাদিকেরা অনেক কায়দা-কসরত করে সে সংবাদের বাংলা করেন। পত্রিকার চওড়া

হেডিং আর বোল্ড পয়েন্ট হরফে সে সংবাদ ছাপা হয়। কাপড় আনার জন্য, ক্রয় করা কাপড়ে তত্ত্ব-তদারকির জন্য রথী মহা-রথীরা হিল্লী-দিল্লী করেন। কাপড় আসে। সুন্দরী সোহনী মার্কা শাড়ী : উলঙ্গ বাহার লুঙ্গী। নামী-দামী টেট্রন। কোনটা এসে যথানিয়মে দোকানের তাক ভরে তোলে। সাত হাত বদল হয়। ন্যায্যমূল্যের দোকান ঘুরে ফুটপাতে আশ্রয় নেয়।

....ওজিএল-এর নাম করে—কিন্তু ওজিএল-এ কি? কারণ ওজিএল-এর অর্থ ওপেন জেনারেল লাইসেন্স। সেই ওজিএল-এ লাইসেন্স ঠিকই ছিল। কিন্তু তা যেমন ওপেন ছিল না, তেমনি ছিল না জেনারেলও। ফলেই, লাইসেন্স নেওয়ার সময় লাইনের একখানা ইটের দাম উঠেছিল হাজার টাকার উপর। তখনই বুঝা গিয়েছিল, ঘাপলাবাজিটা কেমন হবে। হলও।

কিন্তু মামলার শেষ এখানেই নয়। কাপড় আনা হল অবাধে। কিন্তু বিক্রয়টা অবাধ নয়। অথচ ঢাক বাজানো হল ওজিএল-এর। বলা হল, এত সব করা হচ্ছে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে। জনগণের কল্যাণে। কাজটা ঠিকই করা হল। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে নয়—স্বার্থ রক্ষা পেল বৃহত্তের। গলাকাটা গেল জনসাধারণের। জনকল্যাণের নামে জনগণের এই যে গলাকাটা ব্যবসা চলল, চলছে এবং চলবে,—সে সম্পর্কে নাকি কিছু বলাও যাবে না। বললেই হবে পুঁজিবাদের দালালি। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত।

অথচ কাপড়ের দালালি যারা করেছে, কাপড় নিয়ে কারসাজি আর চক্রান্ত যারা চালাচ্ছে তাদের সাতখুন মাফ। নয়ত, যে দেশের লোক ছেঁড়া তেনা দিয়ে ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করতে হিমসিম খায়, সে দেশে দেশী উৎপাদিত কাপড় 'নষ্ট' অজুহাতে পুড়িয়ে ফেলা হয় কি কারণে? কোন্ অদৃশ্য ইঙ্গিত এই কাপড় পোড়ানোর পিছনে কাজ করে?

প্রশ্ন অনেক। অথচ সমস্যা কত কম। কিন্তু সমস্যা সমাধানের সর্বজনস্বীকৃত পন্থা গ্রহণ করা চলবে না। একসপেরিমেন্টের খেই হারিয়ে যাবে। একটা নতুন কিছু করার বাহবা বরবাদ হবে? জনসাধারণ দুঃখ পাচ্ছে? পাক না। সাধারণ মানুষের কষ্ট হচ্ছে? হোক না। সীমিত আয়ের লোকজনদের নাভিঃশ্বাস হচ্ছে। তা হবেই তো। যারা কাজ করার তারা তো বসে নাই। তাঁরা মিটিং করছেন। কনফারেন্স করছেন। দিস্তা দিস্তা কাগজ প্লান-প্রোগ্রামে খরচ হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট অনেকে হিল্লী-দিল্লী করছেন। সবই তো করা হচ্ছে জনগণের স্বার্থে, তাদের কল্যাণে। এত কিছু করার পরেও যদি কারো কল্যাণ না হয়, কেউ যদি এই শীতে

থবর কাঁপে, তো কি করা যাবে? পত্রান্তরের নামী সাংবাদিক কলকাতায় গিয়ে সেখানকার কথা লিখে পাঠিয়েছেন। লিখেছেন, সেখানকার একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন, জিনিসপত্রের যা দাম শুনছি, তাতে তোমরা কি করে বেঁচে আছ ভাই? এখানে (কলকাতায়) যে নিকৃষ্ট শাড়ীটির দাম পনর-বিশ টাকা, তোমাদের ওখানে তা-ই নাকি পঞ্চাশ-ষাট টাকা। কি অবস্থা বল দেখি? ইত্যাদি। এর জওয়াবে সেই সংবাদিক বলেছেন, কলকাতার তুলনায় আমরা সুখে নেই, কিন্তু স্বস্তিতে আছি।

আছিই তো। কেন থাকব না? ১৫।২০ টাকা দামের কাপড় পঞ্চাশ-ষাট টাকা দিয়ে কেনার মত স্বস্তি আর কোথায় পাওয়া যাবে? কোথায় দেখা যাবে, জনগণের কাপড়-সমস্যা সমাধানের জন্য এত এত বৈঠক আর কনফারেন্স, মন্ত্রী মহোদয়দের এত ঘন ঘন বক্তৃতা বিবৃতি? কোথায় দোকানে দোকানে এত কাপড়ের সমাহার? এত রকমের কাপড়। এত কিসিমের কাপড়। দাম বেশী? তা তো হবেই। পুঁজিবাদী চক্রান্তের ফেরে পড়ে দাম কমানো যাবে না। নতুন এক্‌সপেরিমেন্ট বাদ দিয়ে কাপড়ের প্রশ্নে যা করা হয়েছে, সেটাই বহুত। আর নয়। সে কাপড় যদি কেউ কিনতে না পারো—সে দোষ তোমার। দেখছ না, শত শত লোক—শত শত, হাজার হাজার টাকা খরচ করে কাপড় কিনছে। কাপড়ের দোকানগুলিতে চোখ বুলাও, নিজের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করো। খামোকা দোষ ধরো কেন? এ বদ স্বভাব বদলাবে?

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় ডিসেম্বর ১৯, ১৯৭৩

বস্ত্রে স্বনির্ভরতা

..মাথাপিছু আমাদের ন্যূনতম ৭ গজ-সাড়ে ৭ গজ কাপড় দরকার। বর্তমানে উৎপাদিত বস্ত্রের হিসাবে দেখিতে পাই ইতিমধ্যেই ৫ গজ সাড়ে ৫ গজ বস্ত্র উৎপাদিত হইয়া চলিয়াছে। আগামীতে আরও ৬টি মিলের উৎপাদন শুরু হইলে মাথাপিছু প্রয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা যে সহজেই অর্জিত হইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন পড়ে না।

..কিন্তু একটি প্রশ্ন এইস্থলে স্বভাবতঃ চাড়া দিয়া উঠে। মাথাপিছু সাড়ে ৭ গজের তুলনায় সাড়ে ৫ গজ কাপড় উৎপাদিত হইলেও তো কাপড়ের অভাব এত তীব্র, এত ভয়াবহ হইয়া দেখা দেওয়ার কথা নয়। তাহা হইলে আসল রহস্যটা কি? কেন দেশে কাপড়ের সংকট এমন ভয়াবহ? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজিতে হইলে বস্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থা, সুতা

বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থা, বস্ত্র গুদামজাতকরণ, সরবরাহকরণ ও সবকিছুর মধ্যে দুর্নীতি, অব্যবস্থা, কারচুপি, প্রশাসনিক গাফিলতি ইত্যাদি বিষয় একটু খুঁটিয়া দেখা দরকার; তবেই গর্তের সাপ বাহির হইয়া পড়িবে।

১৯৭২-৭৩ সালে উৎপাদিত ও আমদানীকৃত বস্ত্রের সর্বমোট পরিমাণ ৪৩·৫০ কোটি গজ। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা হিসাবে মাথাপিছু কাপড়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ গজেরও উপরে। ১৯৭৩-৭৪ সালে মিলসমূহ প্রায় আট কোটি গজ কাপড় তৈরী করিয়াছে, সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ৯,১৩৪৭ কোটি পাউণ্ড। এই সুতায় কমপক্ষে ৪০ কোটি গজ কাপড় তৈরী হওয়ার কথা। বিদেশ হইতেও যথেষ্ট পরিমাণ সুতা ও কাপড় টিসিবি'র মাধ্যমে আমদানী করা হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাপড়-সংকট দিন দিন প্রকটতর হইতেছে। আসলে বর্তমান বস্ত্র-সংকটের মূল কথা বস্ত্র উৎপাদন নহে, বস্ত্রের ক্রমমূল্য বৃদ্ধি। বস্ত্র উৎপাদন ও বণ্টনের মাঝখানের যে কারচুপি, দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও সমন্বয়ের অভাব, তদ্দরুনই কাপড়ের দাম অস্বাবিক বৃদ্ধি পাইতেছে। বস্ত্র উৎপাদন ও বণ্টনের মাঝখানে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সংস্থা, বস্ত্র শিল্প সংস্থা, সমবায় সংস্থা, অনুমোদিত ডিলারবর্গ,—এতগুলি স্তম্ভ পার হইতে হইতে কত যে কারচুপি হয়, কত যে লাভের বখরা বসে, কত যে কামড়া-কামড়ি চলে, তাহা আনুপূর্বিক বলিতে গেলে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনার প্রয়োজন। সরকার কাপড়ের দাম নাকি সাধারণ মানুষের 'ক্রয়-ক্ষমতার' মধ্যে রাখিতে ইচ্ছুক, অথচ সুতার দুর্নীতি দমন করিতে পারিলেন না, মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ম্য কমাইবার বাস্তব কার্যপন্থা নিতে পারিলেন না, পারিলেন না মিল ও ডিলারদের মধ্যে কাপড় সরবরাহের একটা সরাসরি অথচ দুর্নীতিমুক্ত, পরীক্ষিত ও বাস্তব পন্থা গ্রহণ করিতে। মিল চালাইবার সময় যখন-তখন বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে, খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে দেখা দেয় 'রেড টেপিজম', দেখা দেয় এক শ্রেণীর শ্রমিক নেতার লোভ-দুর্নীতির দৌরাত্ম্য,—সে সবের প্রতিকারও কিছু হইল না।

কাপড় যে পাওয়া যায় না, তাহা সত্য নয়। সব রকমের কাপড়ই বাজারে যত্রতত্র পাওয়া যায়। শুধু দামটাই গলাকাটা। দাম শুনিলে গলায় গামছা দিয়া মরিবার সাধ হয়। কাপড়ের এই অতি দুর্মূল্যতা ঘটিবার পিছনে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার দুর্নীতি, কারচুপি এবং অ-ব্যবস্থাই মূলতঃ দায়ী।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় ভাদ্র ৩০, ১৩৮১

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সঙ্কট

সংবাদ সংস্থার খবরে প্রকাশ, কাঁচামালের অভাব ও অন্যান্য অসুবিধার দরুন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাইয়াছে। দশটি সেক্টর করপোরেশনের মধ্যে নয়টিতেই শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করিতেছে। খবরে বলা হইয়াছে যে, এই পরিস্থিতি চলিতে থাকিলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার নয় শতাংশের বেশী অর্জিত হইবে না। চলতি বৎসরের জানুয়ারী-জুন শিপিং পিরিয়ডে শিল্পের কাঁচামাল আমদানীর জন্য যে-নগদ বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল, পরবর্তী সরকারী বিধি-নিষেধের দরুন তাহার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশই ব্যবহার করা যায় নাই। জুলাই-ডিসেম্বর পিরিয়ডের বরাদ্দও চাহিদার তুলনায় অনেক কম। 'এনা' খবর দিয়াছেন যে, তাহা হইতেও এক-তৃতীয়াংশ বৈদেশিক মুদ্রা ছাঁটকাট করা হইয়াছে। সেই হ্রাসকৃত বরাদ্দ অনুযায়ীও লাইসেন্স ইস্যুতে গরিমসি অনেক।

..সরকার যদিও বিগত আর্থিক বৎসরে ৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সেক্টরের ২৭ কোটি টাকা মুনাফার হিসাব দেখাইয়াছেন। তবু আমরা উদ্বেগমুক্ত হইতে পারিতেছি না। কারণ, উৎপাদিত জিনিসের দাম দফায় দফায় বাড়াইয়া তিন-চারশ পার্সেন্ট পর্যন্ত উঠাইয়াও প্রায় ছয় শত কোটি টাকা মূলধনের এসব শিল্প-কারখানায় মাত্র সাতাশ কোটি টাকা মুনাফা দেখানো কোন শ্লাঘার বিষয় নয়। পাটশিল্পের হিসাব আলাদা। উহার বিপুল লোকসান ধরিলে এটুকুও অফ্‌সেট হইয়া যায়। তাছাড়া ইতিমধ্যেই নাকি এসব রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের দায়-দেনা ইহাদের স্থির-সম্পদকে অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। এরপর যদি উৎপাদনের মাত্রা লক্ষ্যমাত্রার এক-দশমাংশে নামিয়া আসে তবে ইহাদের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যোদ্ধারের সম্ভাবনা কোথায়? আর রাষ্ট্রায়ত্ত শত শত শিল্প যদি এভাবেই শেষ হইয়া যায় তবে জাতীয় অর্থনীতিরই বা ভবিষ্যৎ কি? এসব শিল্পের ব্যর্থতা যে বৈদেশিক শিল্পোদ্যোগীদের উৎসাহও স্তিমিত করিয়া ফেলিতে পারে, সেকথা কি আমরা ভাবিয়া দেখি?

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় কার্তিক ২৮, ১৩৮১

একটি বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী (!)

বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্প সংস্থার জনৈক পদস্থ কর্মকর্তা বস্ত্রমূল্য হ্রাসের ব্যাপারে এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, '১৯৭৩

সালের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার দাম শতকরা একশ' ভাগেরও বেশী (?) হ্রাস পাওয়ায়' আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কাপড়ের মূল্য শতকরা ৩৫ ভাগ হ্রাস পাইবে এবং ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে মূল্য আরও কমিয়া যাইবে।

..কথাটা ভাবিতেও কী ভাল লাগে! দেশের দীন-দরিদ্র মানুষের এই দিগম্বর দশা আর থাকিবে না, কাহাকেও আর বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণের জন্য ছালা ও চটের টুকরা পরিতে হইবে না—কী চকৎকার কথা! কিন্তু শুধু কথায় যে আর চিড়া ভিজে না, তার কি? বছর দেড়েক আগেও একবার মন্ত্রী-পর্যায়ে দেশবাসীকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, দুই-তিন মাসের মধ্যেই কাপড়-চোপড়সহ সব রকম অপরিহার্য জিনিসের দাম আশাতীতরূপে কমিয়া যাইবে। কিন্তু কোনটারই দাম কমে নাই। সেই আশ্বাস আজ দেড় বৎসর পরও আশা-মরীচিকাই রহিয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত ওজিএলে কয়েক কোটি টাকার কাপড় আনা হইয়াছে। অধুনা ওয়েজ আর্নার্স স্কীমেও অনেক কাপড় আসিতেছে। তাছাড়া দেশীয় তাঁত ও দেশী মিলের উৎপাদিত এবং টিসিবি-র আমদানীকৃত কাপড় ত আছেই। তবু মূল্যহ্রাসের লক্ষণ নাই। এখনও তিন বছর আগেকার এক টাকার গামছা পাঁচ-ছয় টাকা, চার-পাঁচ টাকার লুঙ্গী পঁচিশ-ত্রিশ টাকা, ছয়-সাত টাকার শাড়ী চল্লিশ-বেয়াল্লিশ টাকা। 'সুন্দরী', 'সোহানীর' কত বাহার দেখা গেল, কিন্তু দাম সাধারণ মানুষের আয়ত্তে আর আসিল না। অতএব, সস্তা দরের বিদেশী তুলা আসিলেই যে সেই তুলার সুতা এবং সেই সুতার তৈরী কাপড়ের দাম কমিবে, কে তার নিশ্চয়তা দিতে পারে? মাঝখানে যে আরও বহু আন্-ইকনমিক ফ্যাক্টরের উদ্ভব হয় এবং সেইসব ফ্যাক্টরের জন্যই দুইয়ে-দুইয়ে চার হইতে পারে না, বস্ত্রশিল্প সংস্থার কর্মকর্তাদের তাহা অজ্ঞাত থাকার কথা নয়।

..২৩শে নবেম্বর বি. পি. আই. খবর দিয়াছেন যে, দেশের ৪৬টি কাপড়ের কলে বিদ্যুৎ-বিভ্রাট, শ্রমঘণ্টার অপচয়, যন্ত্রাংশের অভাব ও যন্ত্রপাতি ভাঙ্গার দরুন শুধু গত সেপ্টেম্বর মাসেই নয় লাখ পাউণ্ড সুতা ও নয় লাখ গজ কাপড় কম উৎপন্ন হইয়াছে। এর ফলে উৎপাদনগত লোকসান হইয়াছে অন্ততঃ দুই কোটি টাকা। গত জুলাই ও আগস্টেও প্রতিমাসে দুই হইতে আড়াই কোটি টাকা এইভাবে লোকসান দাঁড়াইয়াছে। সহযোগী 'মর্নিং

নিউজ'-এর বিগত ১৫ই জুলাইয়ের এক খবরে প্রকাশ, ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বৎসরে দেশের বস্ত্র শিল্পসমূহে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, কর্মবিরতি ও অন্যান্য কারণে ৭২ লক্ষ শ্রমঘণ্টা নষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতে উৎপাদনগত লোকসান দাঁড়াইয়াছে ১৮ কোটি টাকা। বিভিন্ন কাগজের খবরে আরও প্রকাশ বস্ত্রশিল্প সংস্থার পঞ্চাশ-ষাট কোটি টাকার কাপড় ও সুতা দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ভাড়া করা গুদামে পড়িয়া থাকিয়া নষ্ট হইতেছে। কয়েক কোটি টাকার কাপড় নাকি ইতিমধ্যেই উহা ইঁদুরের খোরাক হইয়াছে অথবা গুদামপচা হইয়া গিয়াছে। মিলসমূহের উৎপন্ন কাপড় দীর্ঘকাল অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকায় একদিকে সরকারী সংস্থাকে ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফটে বিপুল সুদ টানিতে হইতেছে, অন্যদিকে অকারণ বহন করিতে হইতেছে প্রচুর গুদামভাড়া।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় অগ্রহায়ণ ২৫, ১৩৮১

মঞ্চে নেপথ্যে

..গত মে মাসে সম্পাদিত বাংলা-ভারত চুক্তির একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ এবং রুশ রাষ্ট্রদূত মিঃ আঁদ্রে ফোমিনের সাম্প্রতিক একটি উক্তি জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। বাংলা-ভারত চুক্তি অনুসারে যৌথ-উদ্যোগে শিল্প স্থাপন এবং সেই শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী অপর দেশে সরবরাহের কথা রহিয়াছে। চুক্তির ১৪ (ঘ) ধারার (ই) উপ-ধারায় 'ভারতে ইউরিয়া সরবরাহের জন্য বাংলাদেশে একটি সার কারখানা' স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে অবশ্য বিষয়টা বুঝিতে কষ্ট হয় না। শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী সর্বাগ্রে বা সম্পূর্ণভাবে অপর দেশকে সরবরাহ করার কোন কথা উহাতে নাই। সে-দেশে রফতানী করা হইবে শুধু সেই পরিমাণ জিনিস যেটুকু উদ্বৃত্ত হইবে এবং তাহাও রফতানী করা হইবে উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য শর্তে।

..কিন্তু রুশ রাষ্ট্রদূতের উক্তিটি ছিল ভিন্নতর। গত ৮ই জুন, এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন নগদ অর্থে বাংলাদেশকে কোন সাহায্য প্রদান করিবে না। সোভিয়েত সাহায্যের ভিত্তি হইবে বিনিময় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাধীনে সোভিয়েত সাহায্যে স্থাপিত সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য ১২ হইতে ১৫ বৎসরের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট বিক্রয় করার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। এইভাবে পণ্য বিক্রয় দ্বারা সোভিয়েত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। রুশ রাষ্ট্রদূত আরও

বলেন, বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের জন্য সোভিয়েত সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তাঁর মতে কোন দেশই বার্ষিক বাজেটের জন্য সাহায্য দেয় না।

কোন দেশ দেয় কি দেয় না, সেটা ভিন্ন কথা। তা যাই হউক, এটাই নাকি সোভিয়েত সাহায্যের রীতি। এই রীতি ও ব্যবস্থাধীনেই নাকি রাশিয়া ভারতকে অনেক সাহায্য প্রদান করিয়াছে। ভারত সংশ্লিষ্ট শিল্প-ইউনিটের উৎপাদিত পণ্য সোভিয়েতের নিকট পূর্ব-শর্ত মোতাবেক রফতানী করিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া চলিয়াছে। অতএব, এটাই যখন রুশ সাহায্যের রীতি ও রেওয়াজ তখন রাষ্ট্রদূত আঁদ্রে ফোমিনের উপরোক্ত বক্তব্যকে আমরা অদ্ভুত ও উৎকট বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না। সেরূপ শর্তযুক্ত সাহায্য বা প্রকল্প-ঋণ আমরা লইব কিনা অথবা লইতে পারি কিনা—সেটা অন্য প্রশ্ন। কোন শিল্প স্থাপন করিয়া সেই শিল্প-ইউনিটের উৎপাদিত পণ্যের সম্পূর্ণ বা অধিকাংশই যদি ১২ হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত সাহায্যদাতা রাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধেই চালান দিতে হয় তবে উহা হইতে আমাদের এই চরম পণ্য-সঙ্কটে জর্জরিত দেশের কতটুকু ফায়দা হইবে? ক্রমবর্ধমান উৎপাদনব্যয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রুত-বর্ধনশীল মূল্যের প্রেক্ষিতে যদি সেই পণ্য আবার পূর্বনির্ধারিত রেটে সরবরাহ করিতে হয় তবে ত আরও বিপদ। সাহায্যদাতাকে আমরা দোষ দেই না। তাঁহারা ত তাঁহাদের দিকটা দেখিবেনই। ডঃ কামাল হোসেন রাশিয়ার সহিত সম্পাদিত তৈলানুসন্ধান চুক্তি সম্পর্কে যেসব শর্তের কথা সম্প্রতি সংসদে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেশের মানুষকে আরও ভাবাইয়া তুলিয়াছে। লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সত্যই 'তেল অনুসন্ধানে কত তেল পুড়িবে'।

..পুঁজিবাদী সাহায্য দ্বারা নাকি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তর্কের খাতিরে না-হয় মানিলাম সেকথা। কিন্তু গত আড়াই বৎসরে আমরা পুঁজিবাদী জগৎ হইতে কি পরিমাণ সাহায্য পাইয়াছি আর সমাজবাদী জগৎ হইতে কত? শেষোক্ত মহল হইতে যদি আমরা এক পঞ্চমাংশও না-পাইয়া থাকি তবে আমরা কি করিয়া পুঁজিবাদী জগৎকে বাদ দিয়া চলিব? আড়াই বৎসরে পুঁজিবাদীদের নিকট হইতে যে-আড়াই হাজার কোটি টাকার সাহায্য পাইয়াছি তাহাতে আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সমাজতন্ত্র কি আদৌ কিছু বিপন্ন বা বিক্রীত হইয়াছে?

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় জুলাই ২০, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

সংবাদ সংস্থার খবরে প্রকাশ, দেশের ৪৬টি সুতাকল ও কাপড়ের কলে উৎপাদিত ৪৭ কোটি টাকা মূল্যের দুই কোটি পাউণ্ড সুতা ও দুই কোটি গজ কাপড় দীর্ঘকাল গুদামে স্তূপীকৃত থাকার দরুন পচিয়া যাইতেছে অথবা পোকার আক্রমণে নষ্ট হইতেছে। এর মধ্যে রহিয়াছে সোয়া ১৩ কোটি টাকার সুতা আর কিঞ্চিদধিক সাড়ে ৩৩ কোটি টাকার সুতী কাপড়। বাংলাদেশ একটা বিরাট ধনাঢ্য দেশ। দেশের মানুষের কাপড়ের ছড়া-ছড়ি। অতএব ৪৭ কোটি টাকার কাপড় উঁইয়ে-ইঁদুরে খাইতেছে বা গুদামে পচিতেছে, এ আর এমন কি ব্যাপার! আমরা যদি এইরূপ কথা লিখিতে পারিতাম, তবে আর কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু আফসোস, দেশটা আমাদের এখনও তদ্রূপ হইয়া উঠে নাই। আপাততঃ ইহা পৃথিবীতে দরিদ্রতম। বিশ্ব সম্প্রদায়ের দান-খয়রাত ও ধার-কর্জের উপর ইহাকে নির্ভর করিতে হইতেছে। কাপড়ের অভাবে আজও এদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ দিগম্বর প্রায়। আর ব্যাঙ্কের কাছে কাপড় ও সুতাকলগুলির কোটি কোটি টাকা ঋণ। দিন দিন সেই ঋণের সুদ স্তূপীকৃত হইতেছে। ওদিকে সুতার অভাবে দেশের হস্ত-চালিত বা শক্তি চালিত তাঁতসমূহের উৎপাদন কার্যতঃ বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে যদি ৪৭টি মিলের ৪৭ কোটি টাকার সুতা ও কাপড় উঁইয়ে-ইঁদুরে খায় বা সেগুলি গুদামে পচে তবে আমরা আর যাই হউক, আনন্দের আতিশয্যে নৃত্য জুড়িয়া দিতে পারি না।

পাঠকগণ যেন মনে না করিয়া বসেন, ৪৭ কোটি টাকার সুতী-কাপড় নষ্ট হইতেছে শুনিয়া আমরা রাগের মাথায় এসব কথা বলিতেছি। না, রাগ আমাদের অনেক আগেই পানি হইয়া গিয়াছে। ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশ কোটি টাকার সুতা ও কাপর গুদামে বিনষ্ট হওয়ার খবর আজই নতুন পড়িতেছি না। পড়িতেছি অনেক দিন যাবৎ। গত মে মাস হইতে বিভিন্ন কাগজে ব্যানার হেড লাইনে এসব খবর ক্রমাগত বাহির হইতেছে। ৫ই মে এক সহযোগী খবর দেন, '৪০ কোটি টাকার কাপড় ও সুতা মিল-গুদামে পড়ে আছে,' ২৬শে মে অপর এক সহযোগী ৬ কলাম ব্যানারে খবর দেন, '৪০ কোটি টাকার সুতা ও কাপড় মিলে পড়ে আছে'। আরেক সহযোগী খবর প্রকাশ করেন যে, 'বস্ত্রশিল্প কর্পোরেশনের গুদামে ৩০ কোটি টাকার সুতা ও কাপড় ছয় মাস যাবৎ পড়িয়া পচিতেছে অথবা সেগুলি পোকায় খাইতেছে।' তারপর কাগজে-কাগজে এইসব খবর এবং তার পাশাপাশি বস্ত্র-শিল্পের

কোটি কোটি টাকা লস্‌ ও দেশের হাজার হাজার তাঁত সুতার অভাবে বন্ধ থাকার খবর বাহির হইতেছে তো হইতেছেই। ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় যে, গুদামে স্তূপীকৃত প্রায় ৫০ কোটি টাকার কাপড় ও সুতার মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর ব্যাঙ্কের কাছে হাইপথিকেটেড বা বন্ধক দেওয়া এসব মালের গুদামভাড়া বাবত বস্ত্রমিল কর্পোরেশনের মাসে মাসে এক কোটি টাকার মত গচ্চা দিতে হইতেছে।

বস্ত্রশিল্প সংস্থার কিন্তু এসব মাল বাজারে সরাসরি বিক্রয়ের অধিকার নাই। উৎপন্ন কাপড়ের শতকরা ৫০ ভাগ তাদের বিক্রয় করিতে হয় ভোগ্য পণ্য সংস্থার কাছে, ৩০ ভাগ মহকুমা পর্যায়ে সরকার নিয়োজিত ডিলারদের কাছে আর বাকী ২০ ভাগ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটির কাছে। এটাই সরকারী বিধান। নড়চড়ের উপায় নাই। মহকুমা পর্যায়ে ডিলার নিযুক্ত করার মালিক এস. ডি. ও. বাহাদুর এবং স্থানীয় সংসদ-সদস্যগণ। বস্ত্রশিল্প সংস্থা তাহাদের সুতাও সরাসরি বিক্রয় করিতে পারেন না। সেগুলি তাহারা বণ্টন করেন বিসিক, তন্তুবায় সমবায় সমিতি ও হ্যাণ্ডলুম এক্সপোর্ট কর্পোরেশন মারফৎ। অর্থাভাবে ও অন্যান্য কারণে এঁরা কেউ-ই বরাদ্দকৃত মাল নিয়মিত তুলিতে পারেন না। তার ফলে এই বিপুল মাল বস্ত্রশিল্প সংস্থার ঘাড়ে শুধু বোঝা-ই নয়, বিরাট ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোটি কোটি টাকা গুদাম-ভাড়া ও ব্যাঙ্কের সুদ ছাড়াও সম্পদ গুদামে পচিয়া বা পোকার শিকার হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। প্রকাশ, বস্ত্রশিল্প সংস্থা কিছু কাপড় সরাসরি বিক্রয়ের প্ল্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারী অনুমোদন না-পাওয়ায় উহা ভেস্তে গিয়াছে।

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় নভেম্বর ১৭, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

..সংবাদ সংস্থারই খবরে জানা যায়, চলতি অর্থ-বৎসরের প্রথমার্ধে আমাদের বাণিজ্যিক ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে ৩৪৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার অধিক। কিন্তু সরকার-চালিত এক সহযোগী 'নির্ভরযোগ্য সূত্রে' বরাত দিয়া ৭ই ফেব্রুয়ারী খবর দিয়াছেন যে, যদিও 'রফতানী বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই টাকার পুনর্মূল্যায়ন করা হয়' তবু 'কিন্তু জুলাই-ডিসেম্বর বাণিজ্য-মৌসুমে পূর্ববর্তী বছরের এই সময়ের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বেড়ে গেছে; আলোচ্য সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ চারশো কোটি

টাকারও বেশী। সহযোগী লিখিয়াছেন, 'অর্থনীতিবিদের অভিমত: পর্যাপ্ত ভোগ্যপণ্য ও রফতানীযোগ্য শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি এবং রফতানী-বাণিজ্যকে জোরদার করার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের এই ঘাটতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জোর চেষ্টা না চালালে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অগ্রগতির আশা দুরাশায় পরিণত হওয়ারই সম্ভবনা।

..মুদ্রাস্ফীতির কথা প্রশাসনও স্বীকার করেন। কিন্তু মন্দার কথাটা, কি কারণে জানি না, মুখ ফুটিয়া স্বীকার করেন না। অথচ, গত সেপ্টেম্বরে সরকারী শ্বেতপত্রেই দেখানো হইয়াছে যে, ঐ সময় পর্যন্ত ৩৫৯ কোটি টাকার শুধু সুতা, কাপড় ও পাটজাত দ্রব্যই অবিক্রীত অবস্থায় গুদামে মওজুদ ছিলো। ইতিপূর্বে একটি প্রেস-রিপোর্টে জানা গিয়াছিল যে, দেশে ৭০০ কোটি টাকার অবিক্রীত শিল্পজাত পণ্য পড়িয়া রহিয়াছে। সরকারী শ্বেতপত্র প্রকাশের পরবর্তী কয়েক মাসে অবিক্রীত শিল্পপণ্যের পরিমাণ সম্ভবতঃ আরও বাড়িয়াছে। ইনস্টল্ড ক্যাপাসিটির অব্যবহারও বড় একটা কমে নাই। এগুলি যদি রিসেশনের লক্ষণ না হয় তবে সরকারী অর্থনৈতিক উপদেষ্টাগণই বলুন, রিসেশনের লক্ষণ কি? বস্তুতপক্ষে, আমরা গত চার বৎসর যাবৎই রিসেশনে ভুগিতেছি। কতিপয় রাষ্ট্রানুগৃহীত ভাগ্যবান লোকের হাতে সে-আমলে অচেল পায়সা জমিয়া থাকিলেও সর্বসাধারণের বেলায় কার্যতঃ অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে 'ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়্যার, নট এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক'। কিছু লোকের পৌষ মাস, বাকী সবের সর্বনাশ। সর্বহারা 'সমাজতন্ত্রের' এই তো পরিণাম!

—ইত্তেফাক উপসম্পাদকীয় মাঘ ২৭, ১৩৮২

পাট

রাষ্ট্রায়ত্ত জুটমিলগুলিতে ব্যাপক তদন্তের প্রয়োজন

রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন জুটমিলে সম্পদের ও অর্থের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। প্রকাশ, স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭১ সালের ২০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার দেশের প্রত্যেকটি জুট মিলের সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়ের জরিপ করার জন্য জুট বোর্ডকে নির্দেশ প্রদান করে। এই নির্দেশের সংগে সংগেই জুটবোর্ড মিলসমূহের এক প্রাথমিক জরিপ শুরু করে। কিন্তু এই সময় জুট বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান বাণিজ্য দফতরের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হওয়ায় মিল জরিপের কাজ স্থগিত হইয়া যায়। ইত্যবসরে দেশের জুটমিলসমূহের কাজে দেখাশোনা করার জন্য সরকার বাণিজ্য দফতরের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন।

—ইত্তেফাক জুলাই ৯, ১৯৭২

রাষ্ট্রায়ত্ত পাট কলে লোকসানের খতিয়ান

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলসমূহে ১৯৭২-৭৩ সালে প্রায় ২৫ কোটি টাকা লোকসানের কথা শিল্পমন্ত্রী স্বীকার করেছেন।

গত সোমবার জাতীয় সংসদে তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেন। বিবরণটি নিচে প্রদত্ত হলো :

প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী নিম্নলিখিত পাট কলে ১৯৭২-৭৩ সনে লোকসানের আনুমানিক অংশ নীচে দেওয়া হলো :

নাম	লক্ষ	টাকা
আদমজী জুট মিলস	৪৭২·০৬	,,
বাওয়া জুট মিল	৩৭·৬৩	,,
লতিফ বাওয়ানী মিল	২১৯·৯৫	,,
করিম মিল	৮৪·৯০	,,
নিশাত মিল	২০·০৬	,,
ইউনাইটেড মিল	৭০·৮০	,,
মেঘনা মিল	২৩·৮১	,,
চাঁদপুর মিল	১৭·৮১	,,
বাংলাদেশ মিল	৭৮·২৯	,,
এলাইড মিল	১১·০১	,,
সোনার বাংলা মিল	৩·০৪	,,

নাম	লক্ষ	টাকা
জাব্বার মিল	৩৩.৪৪	,,
আলহাজ মিল	২১.১২	,,
আশ্রাফ মিল	১৮.১৮	,,
কো-অপারেটিভ মিল	১২.৫৪	,,
ফৌজী মিল	২০.৭০	,,
গাওছিয়া মিল	১১.৮৮	,,
কোহিনূর মিল	২৩.৩৬	,,
মাশরেকী মিল	৩৩.৭২	,,
ন্যাশনাল মিল	২২.৩০	,,
পূবালী মিল	৫.২৮	,,
নওয়াব আশকারী মিল	১৩.৯৫	,,
সাত্তার মিল	২৫.০৪	,,
নবারুণ মিল	৩৩.৩৮	,,
তাজ জুট ব্যাকিং মিল	২৬.১০	,,
মনওয়ার জুট মিল	২১.৯৮	,,
নিউ ঢাকা মিল	০.৫০	,,
সারওয়ার মিল	১৭.৯৪	,,
হোসাইন মিল	৫.৪১	,,
এসোসিয়েটেড মিল	২.৫০	,,
বাংলাদেশ ফেব্রিক মিল	৭.২০	,,
এম এম জুট মিল	২৩.২৩	,,
আর আর মিল	৮.১৯	,,
হাফিজ টেক্সটাইল	১৩.৩৪	,,
চিটাগাং জুট ব্যালিং	১১.৫০	,,
ভিক্টোরী জুট প্রডা:	৭২.৯৬	,,
এ কে খান জুট মিল	৪৫.৯২	,,
গুল আহমদ মিল	১৬.৯০	,,
মকবুলার রহমান মিল	৭২.৫০	,,
কাশেম মিল	৩৯.৪৭	,,
এম কে এম মিল	৯.০৪	,,

নাম	লক্ষ	টাকা
সুলতানা মিল	৩৮.৫৮	,,
ডব্লিউ রহমান মিল	৩৪.৫০	,,
স্টার আলফাইড মিল	৮৪.৯৩	,,
হামিদিয়া মিল	২৫.৫৫	.
স্টার মিল	৯.০৯	,,
পূর্বাঞ্চল মিল	১০৩.৪৪	,,
ইস্টার্ন জুট মিল	১৬.৯০	,,
যশোর মিল	২৪.৮৫	,,
ক্রিসেন্ট মিল	৫৫.৯৭	,,
পিপলস মিল	৮১.৮২	,,
আদিল মিল	১৬৪.৫১	,,
এ্যাজার মিল	৩৮.৮৬	,,
আলীম মিল	৩৪.৭৮	,,
এ আর হাওলাদার জুট মিল	৪১.২৫	,,
মোহসিন জুট মিল	৩৭.৭০	,,
নওয়াপাড়া মিল	৬.৫৩	,,
প্লাটিনাম জুবলী মিল	১৯.৯০	,,
কার্পেটিং মিল	৩১.৬০	,,

উল্লেখ্য জুট মিলে ১০২.৯৬ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে।

—গণকণ্ঠ জুলাই ১৮, ১৯৭২

রফতানীর জন্য পাট কোথায় ?

আগামী মাসে বিদেশে বাংলাদেশের পাট রফতানী হ্রাস পাইবে বলিয়া ওয়াকিফহাল মহল আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন।

পক্ষান্তরে সম্প্রতি চোরাপথে হাজার হাজার মণ পাট অন্যত্র পাচার হইয়া যাইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। অপরদিকে বিদেশে বাংলাদেশের পাটের প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও জাহাজের অভাবে পাট রফতানী করা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া প্রকাশ।

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৯, ১৯৭২

চলতি মাসে জুট মিলগুলিতে ৪০ হইতে ৫০ কোটি টাকা লোকসানের আশংকা

রাষ্ট্রায়ত্ত বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক অযোগ্যতা এবং উৎপাদনের স্বল্পতাহেতু দেশের জুট মিলসমূহ চলতি বৎসরে ৪০ হইতে ৫০ কোটি টাকা লোকসান দিবে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে। এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতেছে যে, দেশের পাটকল হইতে উৎপাদিত প্রতি টন চটের বিক্রয় মূল্য ৪ হাজার টাকা, কিন্তু সে ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ পড়িতেছে টন প্রতি সাড়ে ৫ হাজার টাকা। অন্যদিকে প্রতি টন বস্তার চটের বিক্রয় মূল্য ২৬ শত টাকা এবং তাহার উৎপাদিত খরচ পড়িতেছে টন প্রতি ৩৬ শত টাকা।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৭২

সুষ্ঠু পাটনীতি নেই—মূল্য নির্ধারিত হয়নি—ব্যাপক চোরাচালান চলছে: পাট চাষীরা শোষণের শিকার হচ্ছে

—গণকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ১১, ১৯৭২

খুলনায় স্মরণকালের বৃহত্তম অগ্নিকাণ্ড: অন্যূন দশ কোটি টাকার পাট ভস্মীভূত

খুলনায় স্মরণকালের বৃহত্তম অগ্নিকাণ্ডে আমিন এজেন্সী, হেলাল জুট বেলিং ফার্ম ও জুট মিলস কর্পোরেশনের ২৯টি গুদামের বিপুল পরিমাণ পাট সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ অন্যূন ১০ কোটি টাকা বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১৬, ১৯৭২

সোনার বাংলার সোনালী আঁশ পুড়িতেছে নারায়ণগঞ্জে পাটের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

খুলনা ও গৌরীপুরের পাটের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের দগদগে ঘা শুকাইতে না শুকাইতেই গতকাল (সোমবার) সকালে নারায়ণগঞ্জের পাটের গুদামসমূহে সংঘটিত হইয়াছে আর এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। প্রায় কোটি টাকার পাট ভস্মীভূত করিয়া আগুনের লেলিহান শিখার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটে নাই।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২৮, ১৯৭২

পাটের গুদামে আবার আগুন

—ইত্তেফাক নভেম্বর ৩০, ১৯৭২

সরিষাবাড়ী পাট ক্রয় কেন্দ্রে আমলাদের কাণ্ড—৮০ হাজার টাকার পাট উদ্ধারে খরচ দেখানো হয়েছে মাত্র ৩০ হাজার টাকা।

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২৭, ১৯৭২

ক্রিসেন্ট জুটের এক নম্বর মিল ভস্মীভূত

গতকাল (বৃহস্পতিবার) খুলনার খালিশপুরস্থ ক্রিসেন্ট জুট মিলে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এক নম্বর মিলটি প্রায় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১৯, ১৯৭৩

বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও থাইল্যাণ্ডের যৌথ উদ্যোগে জুট ইন্টারন্যাশনাল: সদর দফতর ভারতে: টেক্নিক্যাল সেন্টার ঢাকায়

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২০, ১৯৭৩

কওমী জুট মিল লক-আউট ঘোষণা

কওমী জুট মিলে অদ্য লক-আউট ঘোষণা করা হইয়াছে। মিলের শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পাদককে গ্রেফতারের ফলে উদ্ভূত শ্রমিক অসন্তোষের ফলেই এই লক-আউট ঘোষণা করা হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২১, ১৯৭৩

শ্রমিকদের জবরদস্তি ও নেতাদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী কার্যকলাপের অভিযোগ: ধ্বংসের মুখে উত্তরাঞ্চলের একমাত্র বৃহৎ শিল্প কওমী জুট মিলস

উত্তরাঞ্চলের একমাত্র সম্পদ কওমী জুট মিল গতকাল লক-আউট ঘোষণা করিয়াছে। স্বাধীনতার পর হইতেই এই মিলটি নানাবিধ সমস্যা ও শ্রমিক অসন্তোষের মধ্য দিয়া চলিতেছিল। জানা গিয়াছে, মিলটিতে গত কিছুদিন আগে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের উৎপাদিত মাল গুদামজাত হইয়া পড়িয়া আছে। এমন কি ফ্যাক্টরীর মাঝেও ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে ঐ সমস্ত সম্পদ পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৯, ১৯৭৩

দশ লক্ষাধিক টাকার পাট ভস্মীভূত

গতকাল (সোমবার) নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে আর সি এম পাটের গুদামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দশ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সাড়ে ৩ হাজার পাকা বেল পাট ভস্মীভূত হয়।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৭৩

কপাল পুড়ছে, জনগণ নির্বাক, তদন্ত কমিশন লাপাত্তা পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের অন্তরালে—

গত বছর পাট মৌসুমের শুরু থেকে এই পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন পাট ব্যবসা কেন্দ্রে বিশেষ করে নারায়নগঞ্জ ও খুলনায় অগ্নিকাণ্ডের ফলে কমকরে হলেও ৮ কোটি টাকার পাট পুড়ে গেছে। অনেকের মতে ভস্মীভূত পাটের আর্থিক মূল্য ১২ কোটির অংক ছাড়িয়ে যেতে পারে।

—সোনার বাংলা মার্চ ১৮, ১৯৭৩

পাট শিল্প ধ্বংসের পথে : দুই মাসে সোয়া চার কোটি টাকা লোকসান

ইস্টার্ণ রিফাইনারী কর্তৃক গোয়ালপাড়া পাওয়ার হাউসকে পর্যাপ্ত পরিমাণে 'ক্রুড অয়েল' ও 'ন্যাপথা' সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হওয়ার এবং এই সংকট মোকাবিলা করিবার জন্য গোয়ালপাড়া পাওয়ার হাউস কর্তৃক খুলনা ও যশোর শিল্পাঞ্চলে সমস্ত পাট কলে বিদ্যুৎ সরবরাহে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করায় উক্ত পাটকলসমূহকে গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে এই পর্যন্ত বেসরকারী মতে প্রায় সোয়া চার কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৫, ১৯৭৩

উদ্বেগজনক!

বাংলাদেশের চটকলগুলি সম্পর্কে আতঙ্কজনক খবর পাওয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে অধিকাংশ পাটকলেই উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পাইয়াছে। চলতি অর্থ বৎসরের ৯ মাসে শুধু ঢাকা বিভাগীয় পাট কলগুলিতে অন্তত: ২০ কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৪, ১৯৭৩

গুদাম বোঝাই : ওয়াগনের অভাব : চলতি মৌসুমের পাটের কি হবে?

নেত্রকোনা মহকুমা শহরের বিভিন্ন গুদামে দুইলক্ষ নব্বই হাজার মণ পাট পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

—ইত্তেফাক মে ১৩, ১৯৭৩

জুট ইন্টারন্যাশনালের খবর কি? পাট মন্ত্রণালয় কিছু বলবেন?

অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জুট ইন্টারন্যাশনাল নামে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, পাট উৎপাদনকারী ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও থাইল্যাণ্ডের স্বার্থে আন্তর্জাতিক বাজারে রক্ষা করাই এই সংস্থার কাজ হবে; বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পাট উৎপন্নকারী দেশ বাংলাদেশের রাজধানীর পরিবর্তে দিল্লীতে যখন জুট ইন্টারন্যাশনালের সদর দফতর স্থাপন করার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। সোনার বাংলায় তখনই বলা হয়েছিল যে, 'বানরের পিঠা ভাগ' শুরু হয়েছে। অবশেষে সোনার বাংলার বক্তব্যই সত্য প্রমাণিত হল।

সাম্প্রতিক এক খবরে জানা গেছে যে, সুদীর্ঘ আলোচনার পর ভারত ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। যার ফলে ই. ই. সি. এলাকায় ভারতের পাটজাত দ্রব্যের উপর টেরিফ বা শুল্ক উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে। বর্তমানে ই. ই. সি. যুক্ত দেশগুলিতে ভারতের চট, থলি, কার্পেট, ব্যাকিং-এর উপর শুল্কের হার ১৫ হইতে ২২ শতাংশ। চুক্তির ফলে সেই শুল্কে চট ও থলির ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ এবং ব্যাকিং-এর ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ হ্রাস পাবে।

—সোনার বাংলা জুন ৩, ১৯৭৩

দেশের পাটকলে উৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ হ্রাস

গত বৎসরের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশের পাটকলসমূহ তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৪২ ভাগ দ্রব্য উৎপাদন করে। চলতি আর্থিক বৎসরের শুরুতে ইহাদের উৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ১২, ১৯৭৩

পাটজাত দ্রব্য রফতানী হ্রাস: শিল্পমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি

শিল্পমন্ত্রী গত মঙ্গলবার আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য জনাব মহিউদ্দিন আহমদের এক প্রশ্নোত্তরে সংসদে জানান যে, বিশ্বের বাজারে পাটজাত দ্রব্যাদি রফতানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অংশ ১৯৭০ সনের শতকরা ৪৫ ভাগ হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৭২ সালে শতকরা ৩১ ভাগে নামিয়া আসিয়াছে।

—ইত্তেফাক জুলাই ১২, ১৯৭৩

সোনার আঁশ পাট পানির দামে বিকাইতেছে

—ইত্তেফাক জুলাই ২২, ১৯৭৩

রাজশাহীতে অগ্নিকাণ্ড: ৬ হাজার মণ পাট ভস্মীভূত

গতরাত্রে কাদিরগঞ্জ পাট ক্রয়কেন্দ্রে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৬ হাজার মণ পাট ভস্মীভূত হইয়াছে। উক্ত পাটের মূল্য হইবে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। প্রায় ১২ ঘণ্টা চেষ্টার পর দমকল বাহিনী আগুন আয়ত্তে আনে। পাট ক্রয়কেন্দ্রের ম্যানেজার ও ট্যালী ক্লার্ককে গ্রেফতার করা হইয়াছে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণ নির্ণয়ের জন্য জোর তদন্ত চলিতেছে।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৭৩

সংসদে মন্ত্রীর স্বীকারোক্তি
পাট চাষীরা সরকার নির্ধারিত মূল্য পায় না

গতকাল (শনিবার) জাতীয় সংসদে আইনমন্ত্রী মিঃ মনোরঞ্জন ধর স্বীকার করেন যে, সরকার প্রতিমণ পাটের মূল্য ৫০ টাকা ধার্য করিলেও পাট চাষীরা উহা অপেক্ষা কম দাম পায়।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৭৩

পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশের পাটকলগুলো অবশেষে পাটের অভাবে বন্ধ হতে চলছে।

খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশে মওজুত পাট দিয়ে সকল পাটকলগুলো আর তিন মাসের বেশী চলতে পারবে না। এর পর কাঁচা পাটের অভাবে দেশের সমস্ত পাটকল বন্ধ হয়ে যাবে।

—সোনার বাংলা অক্টোবর ১৪, ১৯৭৩

উৎপাদন হ্রাস

এবছর পাট চাষীরা পাট চাষ করছে অনেক কম জমিতে। গত বছর যেখানে ২২·৫৮ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ করেছে, এবছর সেখানে ২০ লাখেরও কম একর জমিতে পাট চাষ করা হয়েছে। পাট চাষ কমে যাওয়ার কারণ বর্তমানে পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

—সোনার বাংলা অক্টোবর ১৪, ১৯৭৩

বিদ্যুতের অভাবে ১৫টি পাটকলে উৎপাদন বন্ধ

গত শনিবার রাত্রি হইতে গোয়ালপাড়া প্রোজেক্টের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের দরুন খুলনা ও যশোরের ১৫টি পাটকলসহ প্রধান প্রধান শিল্প-গুলির উৎপাদন বন্ধ রহিয়াছে। পাটকল সংস্থা সূত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রতিদিন পাটকলসমূহ ৩ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে বঞ্চিত হইতেছে, যাহার মূল্য ১২ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২১, ১৯৭৩

পাট শিল্পে ৩৫ কোটি টাকা লোকসানের আশংকা

উৎপাদিত দ্রব্যের মান-উন্নয়ন এবং উৎপাদন ও পরিবহন ব্যয় হ্রাস না করিলে ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশের পাট শিল্পে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা লোকসান হইবে বলিয়া অভিজ্ঞ মহল আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন।

পাট শিল্পের সহিত ঘনিষ্ট মহল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রতি টন হেসিয়ানের উৎপাদন ব্যয় হইবে ৪ হাজার ৬ লক্ষ ১ টাকা, সেকিং-এর উৎপাদন ব্যয় হইবে ২ হাজার ৮ শত ৪৭ টাকা, কার্পেট ব্যাকিং-এর উৎপাদন ব্যয় হইবে ৪ হাজার ৯ শত ৯৯ টাকা ও অন্যান্য পাটজাত দ্রব্যের প্রতি টনের উৎপাদন ব্যয় হইবে ২ হাজার ৭ শত ২৫ টাকা।

পক্ষান্তরে আলোচ্য সময়ে বিক্রয় মূল্য হইবে টন প্রতি যথাক্রমে ৩ হাজার ৬ শত টাকা, ২ হাজার ৪ শত টাকা, ৪ হাজার ৬ শত টাকা ও ২ হাজার ৬ শত টাকা।

আর উক্ত সময়ে দেশের পাটকলসমূহে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫ শত টন হেসিয়ান, ২ লক্ষ ৭০ হাজার ৬ শত ৮১ টন সেকিং, ৭৩ হাজার ৯ শত ৮২ টন কার্পেট ব্যাকিং ও ৩০ হাজার টন অন্যান্য পাটজাত দ্রব্য উৎ-পাদিত হইবে।

পণ্য	উৎপাদন টন হিসাবে	উৎপাদন প্রতি টনে	বিক্রয় মূল্য প্রতি টনে	নিট লোকসান
হেসিয়ান	১,৯৩,৫০০	৪৬০১	৩৬০০	১৯,৩৬,৯৩,৫০০
সেকিং	২৭০৬৮১	২৮৪৭	২৪০০	১২,০৯,৯৪,৪০৭
কার্পেট ব্যাকিং	৭৩৯৮২	৪৯৯৯	৪৬০০	২,৯৫,১৮,৮১৮
অন্যান্য পণ্য	৩০০০০	২৭২৫	২৬০০	৩৭,৫০,০০০
	৫৬৮৯৬৩			৩৪,৭৯,৫৬,৭২৫

কাজেই আলোচ্য পরিসংখ্যানে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশের পাট শিল্পে ৩৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা লোকসান হইবে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২২, ১৯৭৩

চট্টগ্রামের ১৪টি চটকলে উৎপাদন হ্রাস প্রতি মাসে সোয়া কোটি টাকা লোকসান

চট্টগ্রামের ১৪টি চটকলে মাসিক প্রায় এক কোটি ৩০ লক্ষ টাকা লোকসান দিতেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাকু অকেজো হওয়া, পেপার টিউবের দুষ্প্রাপ্যতা, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহে খুচরা যন্ত্রাংশের অভাব ও শ্রমিক বিরোধ এই লোকসানের কারণ।

এনার প্রতিনিধিকে মিল কর্তৃপক্ষ জানান যে, উল্লেখিত অসুবিধা দূর করা না হইলে মিলগুলির উৎপাদন আরও হ্রাস পাইবে। বিভিন্ন চটকলে নিম্নলিখিত হারে লোকসান ও উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে।

আমিন জুট মিল: মাসিক লোকসান ৩ লক্ষ টাকা। বর্তমান দৈনিক উৎপাদন ৭৫ টন। পূর্বের দৈনিক উৎপাদন ৮৫ টন।

আনোয়ারা জুট মিল: মাসিক লোকসান ২০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। বর্তমান দৈনিক উৎপাদন ২৭·৪৯ টন। পূর্বে দৈনিক উৎপাদন ছিল ৪০ টন।

সুলতানা জুট মিল: মাসিক লোকসান ৬১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। বর্তমান দৈনিক উৎপাদন ৭ টন। পূর্বে ছিল ১২ টন।

মোখলেসুর রহমান জুট মিল: মাসিক লোকসান ৪ লক্ষ টাকা। বর্তমান উৎপাদন দৈনিক ১৫ টন। পূর্বে ছিল ২৫।

গুল মোহাম্মদ জুট মিল: মাসিক লোকসান ৮ লক্ষ টাকা। উৎপাদন দৈনিক বর্তমানে ২৩ টন। পূর্বে ৪৮ টন।

ভিক্টোরিয়া জুট মিল: মাসিক লোকসান ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উৎপাদন বর্তমানে দৈনিক ৪০ টন। পূর্বে ছিল দৈনিক ৬৫ টন।

ইহা ছাড়া চট্টগ্রাম জুট মিল ম্যানুফেকচারিং কোম্পানীও মাসিক ১২ লক্ষ টাকা ও কাশেম জুট মিল মাসিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে।

উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় আরও ৬টি জুট মিল ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২৫, ১৯৭৩

পরিবহনের অভাবে আড়াই লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য গুদামজাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে

গত ৩ মাস যাবৎ দেশের বিভিন্ন পাটকল গুদামে প্রায় আড়াই লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য রফতানীর অপেক্ষায় পড়িয়া রহিয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১০, ১৯৭৩

প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার পাট ভস্মীভূত নারায়ণগঞ্জে পাটের গুদামে পুনরায় অগ্নিকাণ্ড

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১৭, ১৯৭৩

আদমজী পাটকলে বঙ্গবন্ধুর আকস্মিক উপস্থিতি: জেনারেল ম্যানেজার অপসারিত: অপর ৪ জন ম্যানেজার সাসপেণ্ড: তদন্তের জন্য মিল ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ রাখার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (মঙ্গলবার) আকস্মিকভাবে আদমজী পাটকল পরিদর্শন করেন এবং অবিলম্বে মিলের জেনারেল ম্যানেজারকে অপসারণ এবং অপর ৪ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সাসপেণ্ড করার নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার জন্য উহা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন যাহাতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি তদন্ত দল এই অন্যতম পাটকলের অবস্থা তদন্ত করিয়া একটি রিপোর্ট পেশ করিতে পারেন।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২৮, ১৯৭৩

আরেকটি পাটের গুদামে আগুন

গতকাল (বুধবার) নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর অপর তীরে আরেকটি পাটের গুদামে আগুন লাগিয়া ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের সাড়ে ৭ হাজার মণ পাট ভস্মীভূত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭৩

গুদাম নাই, তাই পাট ক্রয় বন্ধ

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭৩

লোকসানের সাগরে আলহাজ জুটমিল : কিন্তু কেন?

বৈদ্যুতিক জেনারেটর বিকল হওয়ার জন্য সরিষাবাড়ী আলহাজ জুট মিলে লে-অফ থাকায় গত ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত ২১ লাখ টাকা লোকসান হইয়াছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কলহে ইতিপূর্বে আরও ৩২ লাখ টাকা লোকসান হইয়াছে বলিয়া মিল সূত্রে জানা গিয়াছে। দেশ মুক্ত হওয়ার পর হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত সরিষাবাড়ী আলহাজ জুট মিলের মোট লোকসানের পরিমাণ হইতেছে ৫৩ লাখ টাকা।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ২৫, ১৯৭৩

নয়াদিল্লী যাত্রার প্রক্কালে বিমানবন্দরে পাট মন্ত্রীর মন্তব্য—'ভারতের কাঁচা পাট রফতানীতে আমরা উদ্বিগ্ন'

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ২৭, ১৯৭৩

ভারত সফর শেষে পাট-মন্ত্রীর স্বীকারোক্তি : পাট চোরাচালান হচ্ছে : ভারতে আমাদের চেয়ে বেশী পাট জন্মে

—গণকন্ঠ জানুয়ারী ৩, ১৯৭৪

হিসাবের পাট আছে কি?

বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়া প্রত্যহ প্রায় ২০ হাজার বেল পাট পাচার হইয়া যাইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়। সম্প্রতি ভারতের পাট সম্পর্কিত একটি সংস্থা প্রত্যহ প্রায় ১৮ হইতে ২০ হাজার মণ পাট পাচারের কথা বাংলাদেশ পাট মন্ত্রণালয়কে জানাইয়াছেন বলিয়াও বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে। একই সংস্থা হইতে প্রায় ২ মাস পূর্বে বাংলাদেশ পাট মন্ত্রণালয়কে জানান হয় যে, প্রত্যহ প্রায় ১০ হইতে ১২ হাজার মণ পাট বাংলাদেশ হইতে পাচার হইতেছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১০, ১৯৭৪

দুই লক্ষ বেল পাট চুক্তি : এমন কি স্থানীয় মূল্য অপেক্ষাও কম?

সম্প্রতি পাট মন্ত্রণালয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের নিকট যে ২ লক্ষ বেল পাট বিক্রয়ের চুক্তি করিয়াছে উহা আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যে তো নয়ই, বরং স্থানীয় মূল্য অপেক্ষা কম।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১৫, ১৯৭৪

জুট মিল কর্পোরেশন চেয়ারম্যানের মন্তব্য : রাষ্ট্রায়ত্ত নীতির দোষে পাট শিল্পে এই দুরবস্থা

সরকারের তাড়াহুড়া করে জাতীয়করণের ফলেই দেশের পাট কলগুলোর এই দুরবস্থা হয়েছে। তাছাড়া পাট কলগুলো পরিচালনার জন্য যোগ্য ব্যক্তিরও অভাব রয়েছে। গত বছর পাট শিল্পে বাংলাদেশের মোট ক্ষতি হয়েছে ২৫ কোটি টাকা।

—গণকন্ঠ জানুয়ারী ১৮, ১৯৭৪

জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর : জুট মিলে ২৫ হাজার অতিরিক্ত শ্রমিক : ৮ লক্ষ টাকার পাট ভস্মীভূত : সর্বনিম্ন দরে পাট বিক্রয় হইতেছে কিনা মন্ত্রী জানেন না

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৩, ১৯৭৪

দুর্নীতির পুরস্কার

অল্প কিছুদিন পূর্বে আদমজী জুট মিলের একজন শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তাকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছিল। জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি তাঁহাকে খুলনা জোনের ম্যানেজার করা হইয়াছে এবং তাঁহার অধীনে ১৭ হইতে ২০টির মত জুট মিল রহিয়াছে। সাসপেণ্ড হইবার মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাকে আর এক গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোর ফলে বিভিন্ন মহলে নানা ধরনের প্রশ্ন দেখা দিয়াছে।

কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, ভদ্রলোককে এতগুলি জুট মিলের কর্তা বানানো হইল, সেই ভদ্রলোককে কিসের অভিযোগে সাসপেণ্ড করা হইয়াছিল উহা কি তাঁহার অযোগ্যতার জন্য, নাকি দুর্নীতির জন্য? নাকি এমন কোন ঘটনার জন্য, যাহার দরুন উক্ত ভদ্রলোককে সরাইয়া দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না? কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছেন যে, যে-কোন অভিযোগেই হউক না কেন, যিনি সাসপেণ্ড হইয়াছেন তাঁহাকে আরও বিরাট দায়িত্বে পুণ বহাল করার পিছনে কি যুক্তি থাকিতে পারে? তবে কি তাঁহাকে বিশেষ কোন কারণে সাসপেণ্ড করিয়া রাখা যায় নাই?

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৩, ১৯৭৪

নারায়ণগঞ্জে মাত্র ১৮ ঘণ্টার মধ্যে রহস্যজনকভাবে ৩টি বাজার ও ৫টি পাটগুদাম ভস্মীভূত

এ আগুনের শেষ কোথায়? আরো ৪০ লাখ মণ পাট গেল

—গণকন্ঠ জানুয়ারী ২৬, ১৯৭৪

জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইতেছে বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড: নারায়ণগঞ্জে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৬ কোটি টাকার সম্পত্তি ভস্মীভূত

নারায়ণগঞ্জের আকাশ আবার আগুনের তাপে রক্তবর্ণ হইয়াছে। আগুনের জিহ্বার লেলিহানে গতকাল (শুক্রবার) জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে নারায়ণগঞ্জের কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট্রের ৯টি পাটের গুদাম। আগুন গ্রাস করিয়াছে আনুমানিক ৬ কোটি টাকার পাট ও পাট শিল্পের সম্পদ।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৬, ১৯৭৪

আগুন এবার কার্পেটিং জুট মিলে

আগুনের লেলিহান গ্রাসে গতকাল (রবিবার) যশোরের নওয়াপাড়াস্থ কার্পেটিং জুট মিলের ফিনিশিং গুদাম ও স্টক রুমের যাবতীয় পাট পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। প্রাথমিক হিসাবে এই ক্ষতির পরিমাণ দুই কোটি টাকা।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৮, ১৯৭৪

আসকারী জুট মিলটি দু'বছর যাবত বন্ধ: এক কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে: কর্তৃপক্ষ উদাসীন কেন?

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৭৪

মিল হইতে ৮০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি উধাও?

আড়াইশত তাঁতবিশিষ্ট খালিশপুরের পিপলস জুট মিলের ২ নং শাখা হইতে প্রায় আনুমানিক ৮০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি গায়েব হইয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৭৪

আফিল জুটমিলে অগ্নিকাণ্ড: ৩ লক্ষ টাকার মালামাল বিনষ্ট

গতকাল (শনিবার) আত্রার আফিল জুটমিলে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১ লক্ষ টাকা মূল্যের পাট ও পাটজাত দ্রব্যসহ ৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ৩, ১৯৭৪

রংপুরে ১৩ শতাধিক বেল পাট পুড়িয়াছে

পলাশবাড়ীতে অবস্থিত জুট ট্রেডিং কর্পোরেশনের পাটের গুদামে গতকাল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে পাকা ১৩ শতাধিক বেল পাট আংশিক বা সম্পূর্ণ পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া প্রাথমিক খবরে জানা গিয়াছে।

আগুন লাগায় কর্পোরেশনের গুদাম এবং অন্যান্য সম্পত্তিরও ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার মত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯৭৪

রফতানীর জন্য রক্ষিত সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার পাট ভস্মীভূত কুমুদিনী ট্রাস্টের গুদামে আবার অগ্নিকাণ্ড

গতকাল (সোমবার) নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যার অবস্থিত কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ন্যাশনাল এণ্ড কোম্পানী ও রায় এণ্ড কোম্পানীর প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের পাট ভস্মীভূত হয়।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১৯, ১৯৭৪

পাটমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন: ৭২-৭৩ সালে পাট কলগুলোতে ২৫ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯৭৪

আদমজী জুট মিলে ২ বছরে ৬ কোটি টাকা লোকসান ব্যাঙ্ক দেনা ২৩ কোটি টাকা

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৭৪

আলীজান পাট মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড: ক্ষতি প্রায় তিন কোটি টাকা

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৭৪

পাটজাত দ্রব্যের রফতানী—লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার আশঙ্কা

বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৭৩-৭৪) সরকার পাটজাত দ্রব্যের যে রফতানী লক্ষ্য নির্ধারণ করিয়াছিলেন, উহা অর্জন করা সম্ভব হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

এই বৎসরের রফতানী লক্ষ্য হইল: ৫ লক্ষ টন। কিন্তু জুলাই হইতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মাত্র ১ লক্ষ ৫১ হাজার টন রফতানী করা হইয়াছে। উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করা হইয়াছিল ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টন। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৫১ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদিত হইয়াছে। উৎপাদনের এই মন্থরগতির ফলে সরকার এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবেন না বলিয়া অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

—ইত্তেফাক মার্চ ২, ১৯৭৪

দৌলতপুরে ২৩টি পাটের গুদামে আগুন

নরসিংদি আলীজান জুট মিলের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর দিন যাইতে না যাইতেই গতকাল (সোমবার) খুলনার দৌলতপুরের ২৩টি পাটের গুদামে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আড়াই কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানীযোগ্য পাটসহ প্রায় ৪ কোটি টাকার সম্পদ ভস্মীভূত হইয়াছে বলিয়া প্রাথমিক রিপোর্টে আশংকা প্রকাশ করা হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, চৌদ্দ মাস আগে ১৯৭২ সালের ১৫ই নভেম্বর এই দৌলতপুরে ২৯টি গুদামে আগুন জ্বলিয়া ৬ কোটি টাকার পাট ভস্মীভূত হইয়াছিল।

—ইত্তেফাক মার্চ ৫, ১৯৭৪

ছাব্বিশ মাসে ১৪ কোটি টাকার পাট আগুনে পুড়িয়াছে

—ইত্তেফাক মার্চ ১১, ১৯৭৪

বৃটিশ পাট বিশেষজ্ঞ মিশনের অভিমত : ব্যবস্থাপনায় অসঙ্গতি ও বিশৃংখল অবস্থাই আদমজী মিলে লোকসানের কারণ

—ইত্তেফাক মার্চ ১৬, ১৯৭৪

দু'বছরের পাট পোড়ার খতিয়ান—ক্ষতি ২৮ কোটি টাকা

বাংলাদেশ হবার পর থেকে গত ২৪ মাসে দেশের বিভিন্ন জুট মিলে ৩৬টি এবং গুদামে ৪৪টি মোট ৮০টি বড় রকমের অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এসব অগ্নিকাণ্ডে ১৩ কোটি ২৪ লাখ টাকা এবং ছোট-খাট আরো শতাধিক ঘটনার ইন্স্যুরেন্স ছাড়া আরো ৭৫ লাখ টাকার পাট পুড়ে ছাই হয়েছে। এইভাবে বাংলাদেশের এককালের স্বর্ণসূত্র ১৪ কোটি টাকার পাট ভস্মীভূত হয়েছে। বীমাকৃত ১৩ কোটি ২৪ লাখ টাকা পরিশোধ করতে রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা প্রতিষ্ঠানকে তল্পী-তল্পা গুটাতে হবে বলে ওয়াকেফহাল মহলের আশংকা।

বীমার টাকা যোগ করলে পাট পুড়ে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ কোটি টাকা।

পরিসংখ্যাণ রিপোর্ট-এ জানা যায় যে, ১৯৭২ সালে বাওয়া জুট মিলে (১৫/১২) তারিখে ২ কোটি ৪১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, আশরাফ জুট মিলে (৩/১১) ২৩ হাজার টাকা, গুল আহমদ জুট মিলে (৪/১০) ৪৯ হাজার টাকা, নিউ ঢাকা ইণ্ডাস্ট্রিজ (২৪/১) ১৭ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা, আনোয়ারা জুট মিলে (২০/১২) ২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, নবারুন জুট মিলে (১৯/১০) ৯৯ হাজার টাকা, ন্যাশনাল জুট মিলে (৩১/১০) এবং (১১/১২) ১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা, সোনালী জুট মিলে (২৭/১২) এবং (৩/১) ৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা, কওমী জুট মিলে (২০/১০) এবং (২২/২) ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, মহসিন জুট মিলে (২৩/১২) ১ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা, মনোয়ার জুট মিলে (১১/৬) ৩ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, আলিম জুট মিলে (১৪/১) ৫৮ হাজার টাকা, করিম জুট মিলে (৩১/৮) ৫৪ হাজার টাকা, ভিক্টোরিয়া জুট মিলে (১৯/১) ৪৪ হাজার টাকা, কো-অপারেটিভ জুট মিলে (১৩/৯) ২৩ হাজার টাকা, ক্রিসেন্ট জুট মিলে (১১/১২) ৩১ হাজার টাকা, এবং ৭৩ সালে জব্বার জুট মিল, হাওলাদার জুট মিল, লতিফ বাওয়ানি জুট মিল, স্টার জুট মিল, সাভার জুট মিল, এস. কে. এম. জুট মিল, আশরাফ জুট মিল, আদমজী জুট মিল, এসোসিয়েট বেগিং ও আর. আর. জুট মিলের ১২টি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার পাট সম্পদ ভস্মীভূত হয়েছে। গত ২৭শে জানুয়ারী কার্পেটিং জুট মিলে ১১ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা এবং গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী আলীজান জুট মিলে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমাণ ৩২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দাবী করিয়াছে।

গত ২৬ মাসে দৌলতপুর, নারায়ণগঞ্জ ও দেশের অন্যান্য স্থানে ৪৪টি অগ্নিকাণ্ডে গুদামে রক্ষিত মোট ৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার পাট পুড়েছে। এর মধ্যে একমাত্র নারায়ণগঞ্জেই ৩৫টি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

—সোনার বাংলা মার্চ ৭, ১৯৭৪

পাট শিল্পে চরম বিপর্যয় : বাড়তি ও ভুয়া শ্রমিকের অস্তিত্ব ১৫ ভাগ! পাচার এখনও হইতেছে—পাটমন্ত্রী

পাটমন্ত্রী জনাব শামসুল হক এক সম্বর্ধনা সভায় বলেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে বিশৃঙখল অবস্থা ও ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ বাংলাদেশের পাট শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। তিনি বলেন, বর্তমানে পাট শিল্পে ২৫ হাজার বাড়তি ও ভুয়া শ্রমিক ও ৩ হাজার ৬ শত বাড়তি অফিসার রহিয়াছে।

—ইত্তেফাক মার্চ ২২, ১৯৭৪

পাট চাষে অনীহা

পাট মন্ত্রণালয়ের কাছে কথাটা অরুচিকর হইবে, এ কথা জানিয়াও না বলিয়া পারিতেছি না যে, এবার পাট চাষ গত বারের চেয়েও কম হইতে যাইতেছে। চারদিক হইতে খবর আসিতেছে যে, পাট-বোনার মওসুম দ্রুত অতিবাহিত হইতে থাকা সত্ত্বেও চাষীরা পাট-বোনায় গা করিতেছে না। লোকে দেড়শ' টাকা মণের বীজধান কিনিয়াও যত বেশী পারিতেছে আউশের আবাদ করিতেছে, কিন্তু পাট-বোনার দিকে গরজ নাই।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১২, ১৯৭৪

ছাত্তার জুট মিলের গুদামে অগ্নিকাণ্ড : ২০ লক্ষ টাকার পাট ভস্মীভূত—৮ জন গ্রেফতার

গতকাল রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চনস্থ ছাত্তার চটকলের গুদামে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে কমপক্ষে ২০ লক্ষাধিক টাকার পাট ভস্মীভূত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২০, ১৯৭৪

ওয়াগনের অভাবে তিন লক্ষাধিক মণ পাট পঁচিতেছে

ডোমার, দেবীগঞ্জ এবং চিলাহাটিতে জুট মার্কেটিং করপোরেশন, জুট ট্রেডিং করপোরেশন এবং পাট মূল্য স্থিতিকরণ করপোরেশনের তিন লক্ষাধিক মণ পাট ওয়াগনের অভাবে পড়িয়া রহিয়াছে এবং 'ডেচপাচ' হইতেছে না বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৩, ১৯৭৪

চট্টগ্রামে ১২ লক্ষ টাকার পাট ভস্মীভূত

গত শনিবার দ্বিপ্রহরে আকস্মিকভাবে সুলতানিয়া জুট মিলে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের পাট ভস্মীভূত হইয়াছে। এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত ৯ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তাহারা সকলেই মিলের নিরাপত্তা রক্ষী।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৩, ১৯৭৪

পাট বাঁচান—নইলে সব পাট চুকে যাবে

পাটের গুদামে অসংখ্যবার আগুন লেগেছে। আগুন লাগার সাথে সাথে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু কোন তদন্ত কমিটি আজ পর্যন্ত আগুন লাগার রহস্য উৎঘাটিত করতে পারে নি। সরকারী

নেতা-উপনেতারা মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা-বিবৃতিতে বলেছেন, রাষ্ট্র বিরোধী চক্রই এই ধ্বংসাত্মক কাজ করে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ বলেন রাজাকার-আলবদররা এইসব কাজ করছে। কিন্তু বাস্তবে কারা এই কাজ করছে তার কোন হদিস মিলেনি। তদন্ত কমিটি গঠনের আগে ও পরে পুলিশ সন্দেহজনকভাবে কিছু লোককে গ্রেফতার করে বিবৃতি দিয়েছে, 'জোর তদন্ত চলছে।' এরপর কোন খবরই মেলেনা। একটা রহস্যজনক নীরবতা বিরাজ করে।

প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য সারা দেশে এখন সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে কম্বিং অপারেশন শুরু হয়েছে। সেই সুযোগে আমাদের কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ পাট পোড়ার কারণ উদঘাটনের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সহোযোগিতা কাজে লাগান। পাট পোড়া মানে বাঙালীর কপাল পোড়া। আমাদের অস্তিত্বের সাথে পাটের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। একে বাঁচানোর জন্য আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। জনগণ আশা করে সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় পাট পোড়ার রহস্য উৎঘাটিত হবে।

—সোনার বাংলা এপ্রিল ২৮, ১৯৭৪

ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা : খুলনায় পাটের গুদামে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড

আবার পাটের গুদামে আগুন লাগিয়া ভস্মীভূত হইয়াছে ৭০ লক্ষ টাকার রফতানীযোগ্য পাট—জলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়াছে এক কোটি টাকার সম্পত্তি।

—ইত্তেফাক মে ৩, ১৯৭৪

ফলন অর্ধেক হ্রাস : পাটকলের চাহিদা মেটানোর জন্য অবশেষে কাঁচাপাট আমদানী

এককালের স্বর্ণ প্রসবিনী বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য আগামী অর্থ বছরে বিদেশ থেকে পাট আমদানী করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ মহল আশংকা প্রকাশ করছেন। কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শী ও আত্মঘাতি পাটনীতির দরুন দেশের পাট চাষীরা তাদের পাট চাষ বন্ধ করে ধান চাষ করতে শুরু করেছে। ফলে আগামী মৌসুমে পাটের ফলন অর্ধেকেরও বেশী হ্রাস পাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন যে, এর প্রেক্ষিতে বিদেশে পাট রফতানী করে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সুদূর পরাহত। বরং আগামীতে দেশের কল-

কারখানাগুলো চালু রাখার জন্য বাংলাদেশকে মূল্যবান বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে কাঁচা পাট কেনার জন্য অপরাপর পাট রফতানীকারী দেশের দুয়ারে ধর্ণা দিতে হবে।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে যে, বর্তমান পাট মৌসুমে মোট ২২ লক্ষ একর পাট জমির মধ্যে মাত্র ১০ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ করা হয়েছে। ঝড়, বন্যা, শিলাবৃষ্টি ইত্যাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়িয়ে এ সব জমিতে ভাল ফলন হলেও মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৩৫ থেকে ৪০ লাখ বেলের বেশী হবে না।

—সোনার বাংলা মে ৫, ১৯৭৪

পাটকলগুলো লিজ দেওয়া হচ্ছে ?

পাট দফতরের সুযোগ্য মন্ত্রী গতকাল বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের সর্বশেষ পাট পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বয়ান করেছেন তা সর্বহারা জনগণের মনে হয়তো কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করবে না। কেননা একটা কথা আছে, 'অল্প দুঃখে কাতর অধিক দুঃখে পাথর'।

মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানিয়েছেন, ৩৫০ কোটি টাকার পুঁজি খাটিয়ে দেশের পাট শিল্প ৭২-৭৩ সালে মাত্র ২৫ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। মন্ত্রী ৭২-৭৩ সালের লোকসানের জন্য মালিক-পরিচালকদের দায়ী করেছেন। অপরদিকে পাটকল মালিক সমিতি মন্ত্রীর এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, দেশের পাটকল সংস্থার ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার জন্যই এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত মন্তব্য করা হয়েছে। মন্ত্রীর মন্তব্য তথ্য-নির্ভর নয় বলে উল্লেখ করে সমিতি প্রশ্ন করেছেন: শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ তাঁতের পাটকলসমূহ গত জানুয়ারী মাস পর্যন্ত সাবেক বাংগালী মালিকদের পরিচালনাধীন ছিল।

—সোনার বাংলা মে ১৯, ১৯৭৪

পাটের ফলন বৃদ্ধির ইনটেনসিভ মেথড স্কীম বুমেরাং-এ পরিণত

—ইত্তেফাক মে ২৩, ১৯৭৪

পাটের চাষ আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস

পাটের স্বল্প মূল্য, বীজের অভাব এবং অতিবৃষ্টির ফলে এই বৎসর দেশের বিভিন্ন স্থানে পাটচাষ আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া আমাদের সংবাদদাতাদের প্রেরিত বার্তায় জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক মে ২৮, ১৯৭৪

দিল্লী চুক্তি এদেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু ও পরনির্ভরশীল করবে

ভারত বাংলাদেশের পাট বিদেশে রফতানীর অধিকার পেল

সম্প্রতি স্বাক্ষরিত দিল্লী চুক্তি অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশ থেকে আমদানী করা পাট বিদেশে রি-এক্সপোর্ট করার অধিকার পেয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ। এ চুক্তি কার্যকর হলে প্রায় ৫০ হাজার জুট বেলিং শ্রমিক সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়বে, পাট নির্ভর অর্থনীতির ওপর আসবে মারাত্মক আঘাত।

—গণকণ্ঠ জুন ১২, ১৯৭৪

সরকার দলীয় সদস্যদের অভিযোগ: পাটের অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে মন্ত্রীরা অবাস্তব বক্তব্য দিচ্ছেন: সংসদে তুমুল বিতর্ক

—গণকণ্ঠ জুন ১৩, ১৯৭৪

পাটে আগুন—১৪ কোটি টাকা ক্ষতি

স্বাধীনতার পর এই পর্যন্ত বিভিন্ন পাটকল ও পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে মোট ১৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬ শত ৫৯ টাকার পাট ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ১৩, ১৯৭৪

ইতিমধ্যেই পাটের আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন

আমাদের পাটকে রক্ষার জন্য আশু একটি সার্বিক এবং বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হইলে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে একটি অর্থকরী ফসলরূপে আমরা পাটের কোন অস্তিত্ব দেখিব না। সরকারের পাট নীতিজনিত বর্তমান পাট পরিস্থিতিতে পাট শিল্প এবং উৎপাদক মহল ইতিমধ্যেই পাটের সকল আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

—ইত্তেফাক জুন ১৪, ১৯৭৪

আগামী মৌসুমে ৩০ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য রফতানী হ্রাসের আশংকা

আগামী অর্থ বৎসরে পাট জাত দ্রব্য রফতানীর ক্ষেত্রে দেশে অন্যূন ৩০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা কম অর্জিত হইবে।

নির্ভরযোগ্য মহল সূত্রে জানা গিয়াছে যে, খুচরা যন্ত্রপাতির অভাবে আলোচ্য সময়ে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ২০ হইতে ২৫ ভাগ হ্রাস পাইতে

পারে। জানা গিয়াছে যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অভাবে দেশের পাট-কলসমূহের প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানী করা সম্ভব হয় নাই।

প্রকাশ, ১৯৭৩ সালের জুলাই-ডিসেম্বর মৌসুমে পাটকল কর্তৃপক্ষ ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন চাহিয়াছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মাত্র ৩ কোটি টাকার অর্থাৎ প্রয়োজনের মাত্র ৬৬ ভাগ যন্ত্রপাতি আমদানীর অর্থ বরাদ্দ করে।

—ইত্তেফাক জুন ১৭, ১৯৭৪

সংসদে পাটমন্ত্রীর তথ্য প্রকাশ : পাটকলের লোকসান ৪২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা

—ইত্তেফাক জুন ২৯, ১৯৭৪

কর্তৃপক্ষ দয়া করে বলবেন কি—তিন বছর আগে রাষ্ট্রায়ত্ত পাট শিল্পে ইনডেন্টারী কবে শেষ হবে ?

দেশের পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ যে একেবারেই ঝরঝরে হয়ে গেছে, এ কথা আর নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। পাটকল এখন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হাতিয়ার নয়। জাতীয় উন্নয়নের চাবীকাঠিও নয়। জনগণের রক্ত শোষণের যন্ত্র। পাটমন্ত্রী তথ্য প্রকাশ করেছেন, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পাট শিল্প জাতীয়করণ করার পর থেকে এ যাবৎ দেশের পাট শিল্প ৪২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়েছে। পাট শিল্প ঋণের পাশে জড়িয়ে পড়েছে আষ্টেপৃষ্টে। চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত পাট কলগুলো মোট ৬৬ কোটি ৯ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে।

—সোনার বাংলা জুন ৩০, ১৯৭৪

জুট ব্যাচিং অয়েল ও সফট সোপের অভাবে ছ'মাসে দেশের পাটকলগুলোর উৎপাদন ২৫ ভাগ হ্রাস

—গণকণ্ঠ জুলাই ১৪, ১৯৭৪

ভারতের বাজীমাত—পাট রফতানীতে বাংলাদেশ আরেক দফা মার খেল

পাটমন্ত্রী জনাব সামশুল হক গত রোববার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। তার পদত্যাগের ঠিক পূর্বদিন শনিবার তিনি রোটারীক্লাবের সদস্যের কাছে খুব নরম সুরে হলেও একটি তথ্য তুলে ধরেছেন। জনাব সামশুল হক পাট-মন্ত্রী হিসাবে সম্ভবত তাঁর সর্বশেষ ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে, ভারতীয় পাটনীতির দরুন বাংলাদেশকে যথেষ্ট ক্ষতির সমুখীন হতে হয়েছে।

মন্ত্রী বলেছেন : ভারত পাট রফতানীর ক্ষেত্রে রফতানী শুল্ক কমিয়ে দেয়ার ফলে এই একটি মাত্র ক্ষেত্রেই বাংলাদেশকে পাঁচ কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

—সোনার বাংলা জুলাই ১৪, ১৯৭৪

পাট ৪৫ টাকায় বিক্রয় হইতেছে

সোনালী আঁশ পাট মাত্র ৪৫ টাকা হইতে ৫৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ১, ১৯৭৪

৫ কোটি টাকার পাট নষ্ট হইতেছে

দিনাজপুর জুট প্রেসের অঙ্গণে প্রায় ৫ কোটি টাকা মূল্যের ৪২ হাজার গাইট পাট উজ্জ্বল আকাশের নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। এই পাট বর্তমানে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। জানা গিয়াছে যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রেলওয়ে ওয়াগনের অভাবে উক্ত পাট যথাস্থানে পাঠাইতে পারিতেছেন না, অপরদিকে প্রেসের অঙ্গণে নূতন পাট আনিয়া গাইট বাঁধাও সম্ভব হইতেছে না। আরও জানা গিয়াছে যে, উক্ত প্রেসে গাইট রাখার জন্য রক্ষিত আরও ৪০ হাজার মণ পাট দিনাজপুর ও রংপুরের বিভিন্ন পাট কেন্দ্রে অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ৬, ১৯৭৪

চট্টগ্রামের ১৬টি জুট মিল বন্ধ হইয়া যাইতে পারে

বাংলাদেশের প্রত্যেক এলাকা হইতে রেলযোগে পাট যথাসময়ে আসিয়া না পৌঁছায় স্থানীয় ১৬টি পাটকল বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ২০, ১৯৭৪

পাটের গুদামে আবার আগুন

গতকাল (বুধবার) ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, ময়মনসিংহ হইতে ৭ মাইল দূরে শম্ভুগঞ্জ বাজারে মেসার্স মজুমদার জুট বেলিং-এর একটি পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ২ হাজার মণ পাট ভস্মীভূত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১০, ১৯৭৪

পাটকলগুলোর চাহিদা মেটানোর জন্য ভারত থেকে পাট আমদানী করতে হবে?

চোরাচালান বন্ধ না হলে কানাডা সাহায্য বন্ধ করে দেবে

বাংলাদেশ এবং ভারতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নাকি এ মাসেই নতুন মোড় নেবে। এ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন কলিকাতার দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা।

কানাডার ওয়াকিফহাল সূত্রের বরাত দিয়ে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড জানাচ্ছেন যে, বাংলাদেশ হতে খাদ্যশস্যের চোরাচালানের ব্যাপারে কার্যকরী পন্থা গৃহীত না হলে ভবিষ্যতে কানাডীয় সাহায্য হ্রাস করে দেয়া হবে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে বাংলাদেশকে।

—সোনার বাংলা ডিসেম্বর ৮, ১৯৭৪

বিশ্ব বাজারে যথেষ্ট চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও ১০ লাখ বেলের বেশী পাট রফতানী হবে কি?

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ৯, ১৯৭৪

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গুদামে ৩০ কোটি টাকার পাট পচছে

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২৯, ১৯৭৪

অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ২১ লক্ষ টাকার পাট ভস্মীভূত

আজ সকালে বিজেএমসি'র গোদনাইলস্থ ২টি পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ডে ষোল সহস্রাধিক মণ পাট সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। বিপিআই জানান, ভস্মীভূত পাটের মূল্য ২১ লক্ষাধিক টাকা।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২, ১৯৭৫

ছাব্বিশ মাসে ১৪ কোটি টাকার পাট আগুনে পুড়িয়াছে

এক পরিসংখ্যান রিপোর্টে জানা যায় যে, '৭২ সালে জুট মিলে ২২টি এবং পাট গুদামে ১৭টি; '৭৩ সালে জুট মিলে ১২টি এবং পাট গুদামে ১৫টি এবং '৭৪ সালের গত দুই মাসে জুট মিলে ২টি এবং পাট গুদামে ১২টি বড় রকম অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। সাধারণতঃ নভেম্বর হইতে মার্চ পর্যন্ত এই ৫ মাসের মধ্যে অধিকসংখ্যক ঘটনা ঘটিয়াছে '৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বাওয়া জুট মিলে। দুইটি অগ্নিকাণ্ডে এই মিলের ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার উপর দাবী করা হইয়াছে।

দৌলতপুরের দুইটি ঘটনাকে গত ছাব্বিশ মাসের মধ্যে বৃহত্তম দুর্ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। '৭২ সালের ১৫ই নভেম্বরে সংঘটিত ২৯টি গুদামে ৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা এবং গত ৪ঠা মার্চের অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার পাটসম্পদ ভস্মীভূত হয়। গত ১৩ই ডিসেম্বর জব্বার জুট মিলে আরেকটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার উপর পাট সম্পদ ভস্মীভূত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২, ১৯৭৫

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রমিক নেতা মান্নানের দাবি

জুট ইন্টারন্যাশনালের সদর দফতর ঢাকায় আনিতে হইবে

"বাংলাদেশের পাটশিল্প চলতি বৎসর এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে। চলতি বৎসর পাটের উৎপাদন ৪০ হইতে ৪৫ লক্ষ বেলের বেশী হইবে না! পাট বোর্ড পাটের উৎপাদন ৫৮ লক্ষ বেল মওজুত পাট ২১ লক্ষ বেল বলিয়া ঘোষণা করিলেও ৪৫ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন এবং ১৫ লক্ষ বেল পাট মওজুত অর্থাৎ চলতি বৎসর সর্বমোট ৬০ লক্ষ বেল পাটের বেশী কোনমতেই হইবে না।"

[গতকাল বুধবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় শ্রমিকলীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান দাবি জানাইয়াছেন অবিলম্বে জুট ইন্টারন্যাশনালের সদর দফতর ঢাকায় আনিতে হইবে।]

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২, ১৯৭৫

গত বছর পাটকলে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমাণ ৬২ লক্ষ টাকা

১৯৭৪ সনে ৩৪টি জুট মিলের সংশ্লিষ্ট গুদামে ৩৪ বার অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে। বীমা কোম্পানীর দায় পরিশোধ এবং চুলচেরা হিসাব-নিকাশের পর সরকারী হিসাব মতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৬২ লক্ষ টাকা।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৯, ১৯৭৫

কুড়িগ্রামের গুদামে দেড় লক্ষ মণ পাট পড়িয়া আছে

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১৫, ১৯৭৫

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২ কোটি টাকার পাট ভস্মীভূত

গত শুক্রবার দিবাগত রাত্রে খুলনার দৌলতপুরের সন্নিকটে একটি গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে দুই কোটি টাকা মূল্যের পাট ভস্মীভূত হইয়াছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশনের একটি গুদামে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১৮ হাজার পাকা গাইটের পাট ভস্মীভূত হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডে আরও একটি বেসরকারী পাটের গুদামে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৭৫

পাটের গুদামে আবার আগুন

মাত্র তিনদিনের মধ্যে আবার পাটের গুদামে আগুন লাগিয়াছে। আবার পুড়িয়াছে প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের পাট। পাটসহ সম্পত্তির ক্ষতি পৌণে দুই লক্ষ টাকার মত। এবার আগুন লাগিয়াছে নারায়ণগঞ্জের স্টীল ওয়েজের গুদামে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১৯, ১৯৭৫

জুট ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে চিন্তা ভাবনা : আন্তর্জাতিক পাটের বাজারে ভারত বাংলাদেশের প্রতিযোগী

সাবেক মন্ত্রী জনাব তাজুদ্দীনের আমলে বাংলাদেশ ভারত, বার্মা ও থাইল্যাণ্ডকে নিয়ে '৭৩ এর শেষদিকে গঠিত জুট ইন্টারন্যশনাল নিয়ে বাংলাদেশ নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করছে। গত বুধবার ১৯৭৫-৭৬ সালের পাটনীতি ঘোষণা করতে গিয়ে একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে পাট মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান একথা জানান। সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ পাটের আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ ও ভারতকে সহায়ক মনে করতেন। কিন্তু বর্তমান পাটনীতি ঘোষণাকালে জনাব আসাদুজ্জামান খান বলেছেন পাটের আন্তর্জাতিক বাজারে ভারত বাংলাদেশের প্রতিযোগী। এমতাবস্থায় পারস্পরিক সহায়তার জন্যে গঠিত জুট ইন্টারন্যাশনালের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? জনাব আসাদুজ্জামান জবাবে বলেন—'আমরা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছি এর বেশী এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।"

—সোনার বাংলা মার্চ ১৭, ১৯৭৫

বত্রিশটির মধ্যে একত্রিশটিই লে-অফ

উৎপাদিত পাটজাত পণ্য কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ ও ব্রডলুম প্রোডাক্টসের রপ্তানী হ্রাস পাওয়ায় এবং মাল মওজুত রাখার অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার জুট ইণ্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের অধীন ৩২টি ব্রডলুম ও কার্পেট ব্যাকিং মিলের মধ্যে ৩১টি মিলই গত জানুয়ারী হইতে লে-অফ করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহাতে ১৫ হাজারের অধিক শ্রমিককে ঘরে বসাইয়া অর্ধেক বেতন দিতে হইতেছে এবং করপোরেশনের আরও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাড়িতেছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১, ১৯৭৫

৫ লক্ষ টাকার পাট ভস্মীভূত

গত সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টায় ক্রিসেন্ট জুট মিল্‌স বাংলাদেশ লিঃ-এর গুদামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার পাট ভস্মীভূত হয়।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৭, ১৯৭৫

লোকসান ১০৭ কোটি টাকা : অবমূল্যায়নের পনের দিন পরও মূল্য নির্ধারিত হয়নি : পাট রফতানী বন্ধ

আমদানী রফতানী বাণিজ্য বিশেষ করে পাটের রফতানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার সম্প্রতি পাউণ্ড স্টার্লিং-এর সাথে টাকার মানের অবমূল্যায়ন করেন। এশিয়ার দেশগুলোই আমাদের পাটের বৃহৎ খরিদ্দার। স্বভাবতঃই আশা করা গিয়াছিল যে, টাকার অবমূল্যায়নের সাথে সাথেই আমাদের গুদামের স্তূপীকৃত অর্ডার আসতে শুরু করবে এবং প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত না হলেও গুদাম ভাড়া ও অন্যান্য রাহা খরচ বহন করা থেকে জাতি অব্যাহতি লাভ করবে। কিন্তু টাকার মানের অবমূল্যায়নের পর অর্ধ মাস হতে চলল আমাদের পাটের রফতানী বাজারে তেজীভাব দেখা দেওয়া ত দূরের কথা এযাবত বিনিময় হার পুনর্নির্ধারণ করা পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে অবমূল্যায়নের সাথে সাথে হার পুনর্নির্ধারিত হলে হয়ত বৈদেশিক বাজারে পাটের চাহিদা বাড়ত।

সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় মতামত

পাট কি নীলের পথে ?

এবার পাট উৎপাদন অসম্ভব রকম কমিয়া যাইতেছে, এই সতর্কবাণী আমরা একবার নয়, বার বার উচ্চারণ করিয়াছি। শুধু সতর্কবাণীই উচ্চারণ করি নাই, পাট, পাটচাষী, পাটশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য কি কি করা দরকার, সে বিষয়ে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কিছু সাজেশনও দিয়াছি। কিন্তু আমাদের হুঁশিয়ারি, আমাদের পরামর্শ সবই অরণ্যে রোদন হইয়াছে। পাট মন্ত্রণালয় একটা কথাও কানে তোলেন নাই। আমরা যতদূর জানি, বাংলাদেশ পাট সমিতিও তাহাদের বিভিন্ন নোটে, বিভিন্ন স্মারকলিপিতে আশঙ্কাজনক পাট পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করিয়াছেন এবং কি করণীয় তদ্বিষয়ে বিজ্ঞ পরামর্শ দিয়াছেন কিন্তু সেসবও হইয়াছে নিতান্তই কাকস্য পরিবেদনা।

এবারকার মওসুমে পাট উৎপাদনের টার্গেট নির্ধারণ করা হইয়াছিল ৭৫ লক্ষ বেল। আমরা ২রা এপ্রিলের এক নিবন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, পাট চাষে কৃষক শ্রেণীর যেরূপ অনীহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সুকঠিন। এই অনীহা অবিলম্বে দূর করিতে না পারিলে উৎপাদন নিঃসন্দেহেই অনেক কম হইবে। এখন যে-সব রিপোর্ট বাহির হইতেছে তাহা দেখিয়া ধারণা হয়, আমাদের সেই আশঙ্কাই সত্য হইতে চলিয়াছে। ৪ঠা জুন পত্রান্তরে প্রকাশিত এক দীর্ঘ রিপোর্টে জানা যায়, চলতি মওসুমে পাটের উৎপাদন বড় জোর ৩৫ হইতে ৪০ লক্ষ বেল হওয়ার সম্ভাবনা। বিগত ২৫ বৎসরের মধ্যে এটাই হইবে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন পাট উৎপাদন। যতদূর জানা যায়, ১৯৫২-৫৩ সনের উৎপাদন ছিল সর্বোচ্চ—অর্থাৎ এক কোটি বেল। আর ১৯৭১-৭২ সনে (যুদ্ধের বৎসর) হয় সর্বনিম্ন অর্থাৎ ৪২ লক্ষ ৮৬ হাজার বেল। এবারকার অনুমিত উৎপাদন সেই সর্বনিম্নের রেকর্ডও ভঙ্গ করিতে যাইতেছে। বাংলার পাটের ইতিহাসে ইহা নিশ্চয়ই অনন্য রেকর্ড।

গত ১০ই মে সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছিল যে, ১৯৭৩-৭৪ সালে অন্যূন ৩৫ লক্ষ বেল কাঁচাপাট রফতানী করিয়া বাংলাদেশ ১২৫ কোটি টাকার অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। দেশের ৭৭টি পাটকলের কাঁচাপাটের চাহিদা কারিওভার বাদেই অন্ততঃ ৩৫ লক্ষ বেল। ঘর-গৃহস্থালী ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে লাগে পাঁচ লক্ষ বেল। আগুনে পুড়িয়া, পানিতে ডুবিয়া ও অন্যান্য দুর্বিপাকে নষ্ট হয় কমপক্ষে

তিন লক্ষ বেল। চোরাচালানের পরিমাণও নিঃসন্দেহেই কয়েক লক্ষ বেল। অতএব, আমাদের কাঁচাপাট উৎপাদনের প্রয়োজন অন্ততঃ ৮০ লক্ষ বেল। সেক্ষেত্রে বর্তমান ক্রপপজিশন দৃষ্টে ১৯৭৩-৭৪ সালে কাঁচাপাটের উৎপাদন আশা করা যাইতেছে মাত্র ৩৫ কি ৪০ লক্ষ বেল। ইহার দ্বারা আমরা ঘরের চাহিদাই কি মিটাইব, আর বাহিরের চাহিদাই কি মিটাইব ? দেশের পাটকলসমূহের চাহিদা মিটাইতে গেলে বিদেশের বাজার ছাড়িয়া দিতে হয়। বিদেশের বাজার দেখিতে গেলে দেশের পাটকলগুলিকে অভুক্ত রাখিতে হয়। এই সামান্য উৎপাদন দ্বারা আমরা কোন্ দিক সামলাইব ? এবার বর্ষা-বন্যায় যে প্রাবল্য দেখা যায়, তাহাতে জলপ্লাবনে যদি পাটের ফসল আরও নষ্ট হয় তবে অবস্থা নিঃসন্দেহেই অধিকতর বেসামাল হইয়া পড়িবে। এব্যাপারে গুদামের পাট নষ্ট হওয়ার কথা কখনও শুনি নাই। নীলফামারী হইতে বজ্রপাতে ১১ লাখ টাকার পাট ভস্মীভূত হওয়ার খবরও আসিয়াছে। আমাদের কি অদৃষ্ট!

আরও কথা আছে। সেটা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের কথা। পাটই আমাদের শতকরা ৮৩ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সূত্র। প্লানিং কর্তৃপক্ষ নাকি আশা করেন, ১৯৭৩-৭৪ সালে ৪০০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইবে। তন্মধ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্য রফতানী দ্বারা আয় হওয়ার কথা কমবেশী তিনশত কোটি টাকা। কিন্তু পাটের উৎপাদনই যদি অর্ধেকে নামিয়া আসে তবে বৈদেশিক মুদ্রার্জনও সেই অনুপাতে হ্রাস পাইবে। এদিক দিয়াও যদি আমরা এভাবে মার খাই, তবে আমাদের খাদ্য ও বস্ত্র আমদানী, ভোগ্যপণ্য আমদানী, শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ও জ্বালানি আমদানী, উন্নয়নের উপাদান ও যন্ত্রপাতি আমদানীর কি হইবে ? দান ও ত্রাণ ত এরই মধ্যে অনেক কমিয়া গিয়াছে। বৈদেশিক ঋণ এবং সুরাহা বা পাকাপাকি ব্যবস্থা এ যাবৎ হইয়া উঠিল না। আমাদের তবে বাঁচার উপায় কি? পাটই বাংলাদেশ, বাংলাদেশেই পাট। সেই পাটই যদি নীলের মত ক্রমান্বয়ে উঠিয়া যায়, তবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি ? পাটকলগুলি নাকি ষোল মাসে শতেক কোটি টাকা লোকসান দিয়া লালবাতি জ্বালাইবার দশায় পৌঁছিয়াছে। পাট রফতানী খাতে সরকারের শুল্ক ও কর বাবত আয়েও নাকি শতেক কোটি টাকা গচ্চা গিয়াছে। ওদিকে ইউরোপীয় অভিন্ন বাজারে আমরা পাটের ক্ষেত্রে এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। এই বিষয়েও কাগজে লেখালেখি হইয়াছে। পাট মন্ত্রণালয়ের কোন

জবাব নাই। তাই ভাবি, আমরা আছি কোথায়? বলিতে দ্বিধা নাই, পাটের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এবং পাট মন্ত্রণালয়ের কাজ কারবার (?) দেখিয়া আমরা রীতিমত উদ্বিগ্ন। পাট মন্ত্রণালয় কি জনসাধারণের এই উদ্বেগ নিরসনের জন্য কোন বক্তব্য রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন না? নাকি বেড়ার আগুন চালে ধরার আগে বক্তব্য রাখার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবে না?

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় জুন ৬, ১৯৭৩

সোনার বাংলায় সোনালী আঁশ কি অনাবশ্যক সাব্যস্ত হইল?

পাটের কথা অনেক বলা হইয়াছে। অনেকেই বলিয়াছেন। খবরের কাগজে রিপোর্টার, সম্পাদক, নিবন্ধকার সবাই বলিয়াছেন। রোজই বলিতেছেন। সরকার পক্ষ হইতেও বলা হইতেছে।

কারণ পাট-সম্পদ ও পাটশিল্প গোটাটাই আজ একটা সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। পাট লইয়া বিপদ আমাদের আগেও ছিল। বহুদিন ছিল। বরাবরই ছিল। কিন্তু সে বিপদের ধরন ও পরিমাণ ছিল অন্যরূপ। সেটা ছিল পাট চাষীর বিপদ। আর আজকার বিপদ খোদ পাটের বিপদ। গত ফেব্রুয়ারী মাসে 'পাট বাঁচিলে আমরা বাঁচিব' শীর্ষক প্রবন্ধে এই 'ইত্তেফাকেই' আমি যে কথা বলিয়াছিলাম তাতে পাঠকের মনে হইতে পারে, পাটের বিপদ মানে তবে আমাদেরই বিপদ। সেটা ঠিক। কিন্তু সকলে সেটাকে সত্য বলিয়া মানিতে নাও পারে। অথবা আগে সত্য বলিয়া মনে করিলেও আজকাল আর নাও করিতে পারে। সময়ের পরিবর্তনে এমন অনেক সত্যই ত মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। এমন হইয়াও থাকে। পাকিস্তানী আমলে আমরা যেসব আইন ও কাজের নিন্দা করিতাম স্বাধীনতার পর আমরা নিজেরাই তা করিতেছি। তার মানে আমরা মত বদলাইয়াছি। অথবা আমাদের দৃষ্টিকোণই বদলাইয়া গিয়াছে। কিম্বা আমাদের প্রয়োজনের রূপান্তর ঘটিয়াছে। এই ধরুন, আমাদের বঙ্গবন্ধু বলিয়াছেন, 'সোনার বাংলা গড়িতে সোনার মানুষ চাই।' সরকার এই কথার অর্থ করিলেন : 'সোনালী আঁশ' চাই না। পাট সম্পর্কে সরকারী কাজ-কর্ম দেখিয়া এমন মনে না হইবার উপায় নাই।

পাটটা বাংলার বড় নগদী ফসল, ক্যাশ ক্রপ। ইংরেজের আমলেও ছিল, পাকিস্তানী আমলেও ছিল। স্বাধীনতার আমলেও আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু সরকারের কাজ-কর্ম দেখিয়া মনে হয়, সরকারের

বিশ্বাস তা নয়। এমন ধরনের কাজ কর্ম তারা অনেক করিয়াছেন। তাঁর মধ্যে তিনটিই প্রধান। এক, সরকার স্বতন্ত্র জুট মিনিস্ট্রি সৃষ্টি না করিয়া একটি জুট ডিভিশন বানাইয়াছেন। দুই, প্রস্তাবিত জুট ইন্টারন্যাশনালের হেড অফিস দিল্লীতে স্থাপনে রাযী হইয়াছেন। তিন, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য পঞ্চাশ টাকা বাঁধিয়া দিয়াছেন। এই তিনটাই বাংলাদেশের পাটের সর্বনাশ হইতে পারে।

প্রথমে জুট মিনিস্ট্রির বদলে জুট ডিভিশন সৃষ্টির কথাটাই আলোচনা করা যাউক। পাট-উৎপাদন, বাণিজ্য ও শিল্প তিনটি বিষয়ই একই নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্দেশ্যেই জুট মিনিস্ট্রি সৃষ্টির দাবি উঠিয়াছিল। জুট ডিভিশন সৃষ্টি করা এবং সে ডিভিশন অর্থমন্ত্রীর হেফাযতে দেওয়ার এ উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই, বরঞ্চ জটিলতা আরও বাড়িয়াছে। পাট উৎপাদন আগের মতই কৃষি-দফতরের হাতে ও পাটকলগুলি আগের মতই শিল্প দপ্তরেই রহিয়াছে। পাট রফতানীটাই শুধু বাণিজ্য দফতরের হাত হইতে এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের হাতে আনা হইয়াছে। জুট ডিভিশন কেন করা হইয়াছে, এই ডিভিশনের হাতে কি কি দায়িত্ব সত্য সত্যই দেওয়া হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মন্ত্রীরাই পরিষ্কার ধারণা করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কাজটা সত্যই কঠিন।

গত সপ্তাহে এক 'শুভখরিদ' অনুষ্ঠানে অর্থ ও পাটমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ নিজেই বলিয়াছেন, গত বছর চুক্তি মোতাবেক পাট রফতানী হয় নাই। খবরটা শুভ নয়। বিদেশী পাট খরিদ্দাররা যদি চুক্তিমত পাট না পান, তবে তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। পাট ব্যবসায় ন্যাশনালাইজড হওয়ায় এখন পাট রফতানীর দায়িত্ব 'জুট এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের' উপর। কর্পোরেশন যদিও তাঁদের নিয়োজিত এজেন্টদের মারফত এ কাজ করিয়া থাকেন, তবু চুক্তিতে পাট রফতানীর আসল দায়িত্ব কর্পোরেশনেরই। এজেন্টগণের গাফিলতির অজুহাত দিয়া কর্পোরেশন আত্মরক্ষা করিতে পারে না। কর্পোরেশনের কর্তব্যচ্যুতির দায়িত্বও আসলে সরকারেরই। কাজেই বিদেশী খরিদ্দারের সহিত চুক্তি রক্ষা না করিয়া পাটের রফতানী বাণিজ্যের ক্ষতি করিয়াছেন সরকার নিজেই। প্রাইভেট শিপার ভুল বা বদমায়েশি করিয়া বিদেশে পাটের বাজার নষ্ট করিলে সরকার তার প্রতিকার করিতে পারেন। কিন্তু সরকার নিজে তা করিলে প্রতিকার করিবার কেহ থাকেন না। বিদেশী খরিদ্দাররাও পাট

কলওয়ালারা আমাদের এই সরকারী চুক্তি ভঙ্গের দরুন আমাদের প্রতি কি পরিমাণ আস্থা হারাইয়াছেন, তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, এদের কেহ কেহ সম্প্রতি বাংলাদেশের পাট খরিদ করিবার জন্য কলিকাতার বাজারে অর্ডার দিতেছেন। এতে কলিকাতার শিপার ও সরবরাহকারীদের প্রতি বিদেশী খরিদ্দারদের আস্থা প্রমাণিত হইতেছে। এই আস্থার প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা বেল প্রতি তিন স্টার্লিং পাউন্ড দাম বেশী দিতেও সম্মত হইয়াছেন। বিদেশী পাট ক্রেতার কলিকাতার পাট ক্রয়ের যে অর্ডার দিয়াছেন, সেটা যে বাংলাদেশেরই পাট, তাতেও সন্দেহ নাই। কারণ ভারতে যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়, তাতে কাঁচা পাট রফতানী করিবার মত উদ্বৃত্ত পাট ভারতের হাতে কোনও দিন থাকে না। তাছাড়া ভারতে যে শ্রেণীর পাট উৎপন্ন হয়, বিদেশী কলওয়ালারা তা কিনেন না। সেইগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট। অতএব, বিদেশী খরিদ্দাররা যদি কলিকাতার বাজারে কোনও উন্নত শ্রেণীর পাট খরিদ করিতে পারেন, সেটা নিশ্চয়ই বাংলাদেশে উৎপন্ন। সে পাট ভারত সরকার আমাদের নিকট হইতে নর্মাল ব্যবসায়িক পন্থায়ই নিয়া থাকুন, অথবা কলিকাতার স্মাগলাররা তাদের নর্মাল চোরাপথেই নিয়া থাকুন। বাংলাদেশের কাঁচাপাট যে কলিকাতার বাজার হইতে বিদেশে বিক্রি শুরু হইয়াছে, এটা আসলে জুট ইন্টারন্যাশনালের অগ্রিম সূচনা। বাংলাদেশের চামড়াও বিদেশী জুতার কলওয়ালারা কলিকাতা হইতে কিনা শুরু করিয়াছেন।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় আগস্ট ২৪, ১৯৭৩

যা জানতেন ভুলে যান : নতুন পাঠ নিন
বিশ্বে পাটের রাজা ভারত

"পাকিস্তান আমলে যখন এদেশ থেকে সরকারীভাবে ভারতে পাট রপ্তানী হত না তখনো কলকাতার পাটকলগুলো পাটের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়নি। কারণ পাকিস্তান আমলে চোরা পথে এদেশের পাট ভারতে যেত।" গতকাল (সোমবার) অর্থ ও পাট বিষয়ক মন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এম. এম. ইস্পাহানির শুভ পাট খরিদের উদ্বোধনী সমাবেশে ভাষণদানকালে উক্ত তথ্য প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, 'এতকাল আপনারা জানতেন, বিশ্বে পাট উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্থানই ছিল প্রথম। কিন্তু এ বছর আপনাদের সে

ধারণা বদলাতে হবে। বর্তমানে ভারতই বিশ্বে পাট উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে প্রথম। কারণ এ বছর ভারতে মোট ৭৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে এ বছর মোট পাট উৎপাদন বড় জোর ৫৫ লক্ষ বেল বা আরো কম।"

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় আগস্ট ২৯, ১৯৭৩

সাবসিডি নয়, সুষ্ঠু পরিচালনাই
পাট-শিল্পের রক্ষা-কবচ

...আমাদের শিল্প-কারখানাকে বাড়িতে না দেওয়ার জন্য এমনকি যা আছে তাও ধ্বংস করিবার জন্য, কোনও অদৃশ্য শক্তি যেন অবিরাম তার অশুভ প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছে। এটা যেন ঘটিতেছে পরিকল্পিত উপায়েই। সে প্রয়াসও যেন বিরামহীন। ব্যাপকভাবে যেন তা সর্বগ্রাসী। পাট, চা, বস্ত্র, চামড়া, সিমেন্ট, কাগজ, লবণ ইত্যাদি সব শিল্পেই যেন এই অশুভ চক্রের অক্টোপাস তার সহস্র আংগুল বিস্তার করিতেছে। রোজই একটা-দুইটা মারাত্মক দুর্ঘটনা খবরের কাগজে ছাপা হইতেছে। সরকার নিশ্চয়ই এসবের প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গরীবের সংসারের অভাবের মতই আমাদের বিপদগুলি এমনি ঝড়ের বেগে একসংগে আসিতেছে যে, গোটা জাতির সামগ্রিক ও সর্বাত্মক প্রতিরোধ ছাড়া এই অশুভ শক্তিকে পরাভূত করা সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে সবগুলি শিল্প-কারখানা সম্বন্ধেই কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু আজকার আলোচনা শুধু পাটশিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতেছি। গত নিবন্ধে এমন ওয়াদা করিয়াছিলাম, এও একটা কারণ। পাটশিল্পই আমাদের সর্বপ্রধান শিল্প, এও আরেকটা কারণ। তাছাড়া সন্ত্রাস-সৃষ্টিকারী ঐ অশুভ চক্র যেন আমাদের পাটশিল্পের উপরই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আঘাত হানিতেছে। মহাশক্তিধর কোনও দানব যেন দেশের সমস্ত পাট গুদামে আগুন লাগাইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। 'উড়িয়া বেড়াইতেছে' বলিলাম এইজন্য যে, আজ দেশের পশ্চিমে, কাল পূর্বে, পরশু উত্তরে, তরশু দক্ষিণে এইসব অগ্নিকাণ্ড ঘটিতেছে। একরাত্রে একাধিক মিল-গুদামে অগ্নিকাণ্ড হইতেছে। যেমন পাট-গুদাম, তেমনি পাটকল। পাট-কলের মওজুদ স্টক পুড়িতেছে, ইঞ্জিন বিকল হইতেছে, স্পেয়ার পার্টস চুরি হইতেছে, শ্রমিকরা মারামারি করিতেছে, মিল লক্‌আউট ও ক্লোজ হইতেছে।

কেন এমন হইতেছে? কল্পিত এই অশুভ শক্তিটা আসলে কি? এসব কথা খুব ঠাণ্ডা মাথায় নিরপেক্ষভাবে বাস্তববাদী মনোভাব লইয়া

বিচার করিতে হইবে। বিচার নির্ভুল করিবার জন্য আত্মসমালোচনা করিতে হইবে। নিজের দোষ-ত্রুটির সন্ধান করিতে হইবে। প্রমাণ পাওয়া গেলে অসংকোচে ও নির্ভয়ে নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করিতে হইবে। সাহসের সংগে তার প্রতিকার করিতে হইবে। পরকে দোষ দিয়া নিজের ব্যর্থতা ঢাকিবার চেষ্টা করা চলিবে না। নিজেদের অযোগ্যতা ও গাফিলতি, অদূর-দর্শিতা ও নির্বুদ্ধিতার ফল আমাদেরই ভোগ করিতে হইবে। দায়িত্বও আমাদের মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। এটার জন্য আমলাতন্ত্রকে, ওটার জন্য ভারতকে এবং সেটার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করিলেই আমাদের সংকট কাটিয়া যাইবে না। সংকট দূর করিয়া দেশকে বাঁচাইতে হইলে, দেশবাসীর কল্যাণ সাধিতে চাহিলে, সব সমস্যার গভীরে যাইতে হইবে। চলুন, পাটশিল্প সম্বন্ধে আজ সকলে মিলিয়া সে চেষ্টাই করি।

প্রথমেই ধরা যাক, আমাদের পাট শিল্পের দুশমন কে হইতে পারে ? এই আলোচনা করিতে গেলেই সকলের আগে মনে পড়ে একশ্রেণীর লোকের কথা। সরকারী লোকের মধ্যেই এমন কিছু লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, আমাদের দেশে পাটশিল্প স্থাপন করাই অর্থনীতির দিক দিয়া ভুল হইয়াছে। তাঁরা নাকি সরকারকে এই মতবাদে দীক্ষা দিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের সরকার স্বভাবতঃই এই মতবাদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সরকার অগ্রাহ্য করিলেও ঐসব লোক তাঁহাদের মত বদলাইতেছেন, একথা বলা যায় না। অনেকেই মনে করেন, ভারত তথা বাংলা ভাগ হওয়া ভুল হইয়াছে। আগেরটার মত এটাও একটা মতবাদ। যে-কোনও মতবাদ পোষণ করিবার গণতান্ত্রিক অধিকার সকলেরই আছে। শুধু সরকারী কার্য-পরিচালনায় সেই মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হইলেই হইল।

তবু এই প্রসংগে মনে পড়ে তাঁহাদের কথা যাঁরা বলেন যে, বাংলাদেশের পাটশিল্প সরকারী অর্থ সাহায্য মানে সাবসিডি ছাড়া কোনও দিনই চলিতে পারে না। আমরা শুনিতেছি, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বিভাগ (এন-আই. ডি.) মন্ত্রিসভাকে লিখিতভাবে এই কথা জানাইয়াছেন এবং এই যুক্তির-বলে সাবসিডি দাবি করিয়াছেন। আমাদের পাটশিল্প কেন সাবসিডি ছাড়া চলিতে পারে না ? এন. আই. ডি. কারণ দেখাইয়াছেন যে, এই শিল্পে যে-সব জিনিস তৈয়ার হয় তাতে লাভ হওয়া ত দূরের কথা, খরচা দামেই বিক্রি হয় না। পাঠকগণ হয়ত মনে করিতেছেন, এন. আই. ডি. স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণামস্বরূপ সাময়িক লোকসানের কথাই বলিতেছেন। জি, না। এন.

আই.ডি. তেমন সাময়িক লোকসানের কথা বলিতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন আমাদের পাটশিল্পের 'ম্যাকসিমাম এফিসিয়েন্সি লাভ হইবার পরও' এটা আমাদের লাভের কারবার হইবে না। সাবসিডি দিয়া এই লোকসান পোষাইয়া নিতেই হইবে। বরাবর। চিরকাল।

হায় বাংলাদেশের পাটকল! বাংলাদেশের পাটচাষীর মতই দেখিতেছি, তোমারও বরাত মন্দ। বাংলাদেশের পাটচাষীরা কোনও দিন তাদের উৎপন্ন পাটের ন্যায্য মূল্য পায় নাই। পাটের আবাদী খরচাই উঠে নাই। তাই পাট চাষটা চাষীদের জন্য ছিল বরাবরই লোকসানের কারবার। সেই লোকসানটা তারা পোষাইত উপাস করিয়া। বিদেশী ব্যাপারীরা ন্যায্য মূল্য না দিয়া আমাদের পাটচাষীদের ঠকাইত। তাই আমরা নিজের দেশে পাটকল করিলাম পাট-চাষীদের বিদেশী ঠকদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু ঐ যে শাস্ত্রে আছে, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বাড়া ভানে!' পাটকল করিয়াও আমরা ন্যায্য মূল্য অর্থাৎ আবাদ খরচা পাইলাম না। পাট-চাষীরা উপাস করিয়া লোকসান পোষাইয়া আসিয়াছে। পাট-কলেরা ত আর উপাস করিতে পারে না। তাই তাদেরে সাবসিডির 'তোলা দুধ' খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে কি ? 'তবে'টা বলা হয় নাই সত্য, কিন্তু তাৎপর্যটা সুস্পষ্ট। আমাদের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা মনে করেন, বাংলাদেশে পাট-কল স্থাপন করাটাই ভুল হইয়াছে তাঁদের প্রতিপাদ্যের সাথে কিন্তু এন. আই. ডি-র কথার তাৎপর্যের আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কলিকাতায় এত-এত পাটকল থাকা সত্ত্বেও এবং সেখানে আমাদের সাকুল্য-পাট যাওয়ার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে পাট কল করা নির্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছে। এন. আই. ডি. বলিতেছেন, বাংলাদেশে পাটশিল্প লোকসানের কারবার ; আর কলিকাতায় ওটা লাভের কারবার। তাঁদের হিসাবটা এইরূপ : ১৯৭২-৭৩ সালে প্রতি টন চটে খরচ হইয়াছে ৪৯৪২ টাকা। বিক্রয়মূল্য ৩৯০০ টাকা। ছালা তৈয়ার-খরচা ৩০২১ টাকা। বিক্রয়মূল্য ২৭৫০ টাকা। কার্পেট-ব্যাকিং তৈয়ার-খরচা ৫৫০৫ টাকা। বিক্রয় মূল্য ৪৮৫০ টাকা। বলিয়া রাখা দরকার, উপরে যে বিক্রয়-মূল্যের উল্লেখ করা হইল তা সাম্প্রতিককালের বিশ্ববাজার মূল্যের সর্বোচ্চ দর। তার মানে, পাটজাত দ্রব্য বর্তমানে বিশ্বের বাজারে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এই সর্বোচ্চ মূল্য পাইয়াও আমাদের পাট শিল্প বিপুল পরিমাণ লোকসান দিতেছে। এর ভেদ কি ? উত্তর : আমাদের উৎপাদন খরচা বেশী।

একই বাজারে একই দামে বরঞ্চ কোনও কোনও ক্ষেত্রে কম দামে বিক্রয় করিয়াও ভারতের পাটশিল্প মুনাফা করিতেছে কেমন করিয়া? উত্তর: তাদের উৎপাদন-খরচা কম বলিয়া। বলা হয়, ভারতীয় পাট-শিল্পের উৎপাদন খরচা আমাদের খরচের চেয়ে গড়ে শতকরা ৬০ ভাগ কম।

এই হিসাব আমরা পাইলাম কই? আমাদের সরকারী বিশেষজ্ঞেরা ও এন. আই. ডি-র কর্তৃপক্ষ কাজে নামিয়াছেন দুই বছরেরও কম সময় হইল। তাঁরা আমাদের পাটশিল্পের খরচাটা কষিলেন কখন? তাঁরা নিজেরা কষেণ নাই। কষা-কষির দরকার বা সময় তাঁদের ছিল না।

··বিনা প্রস্তুতিতে সবগুলি শিল্প একসংগে রাষ্ট্রায়ত্ত করা ভুল হইয়াছে, এই কথা আমি বহুদিন আগে বহুবার বলিয়াছি। পাটশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করার ব্যাপারেও সে কথারই পুনরুক্তি করিয়া আজ আরও বলিতেছি যে, শুধু নীতির দিক হইতে নয়, পদ্ধতিগত দিক হইতেও এ ব্যাপারে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-প্রমাদ ঘটিয়াছিল। বাণিজ্য দফতর ও শিল্প দফতরের মধ্যে পাটশিল্পের টানা-হ্যাঁচড়া এবং তজ্জনিত মারাত্মক অব্যবস্থাটাই ঐ সব ত্রুটি-প্রমাদের প্রধান। পাটের খানিকটা শিল্প ও খানিকটা বাণিজ্য বলিয়াই এই ভুল বুঝাবুঝি হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কৃষি দফতরের কথা এই টানা-হ্যাঁচড়ায় যে কারণে বাদ পড়িয়াছিল, সেই কারণেই স্বাধীনতার পর পরই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে জুট বোর্ডের প্রাধান্যই মানিয়া লওয়া মন্ত্রীদের উচিত ছিল। কারণ ঐ অবস্থায় পাটশিল্প ও বাণিজ্য উভয় ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞ লোক তখন জুট-বোর্ডেই ছিলেন। এই বাস্তবতা না মানিয়া জুট-বোর্ডকে পাকিস্তানী আমলের মতই বাণিজ্য-দফতরের বিভাগ মনে করা হইয়াছিল। তাতেই শিল্প-বাণিজ্য দফতরের মধ্যে একটা ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ফলে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওদল-বদলের যে ধাক্কাধাক্কি লাগে এবং তার পরিণামে সব পাটকলে যে অরাজকতা সৃষ্টি হয় তাতেই পাটশিল্পের বারটা বাজিয়া যায়। পাটকলের সঞ্চিত স্টক, ক্যাশ, যন্ত্র-পাতি ও কাঁচা-মালের যে ক্ষতি এই মুহূর্তে হইয়া যায়, পাট-শিল্প সে টাল আজও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। শিল্পমন্ত্রী পার্লামেন্টে পাটশিল্পের যে সাড়ে পঁচিশ কোটি টাকা লোকসানের কথা বলিয়াছেন এবং এন. আই. ডি. 'স্বাধীনতা-পূর্ব দায়-দায়িত্ব' রূপে যে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা লোকসানটা ক্যাপিটেলাইজ করিতে বলিয়াছেন, এই সত্তর কোটির সব ক্ষতিই ঐ মুদ্দতের লুটপাটের ফল। জুট-বোর্ডের অফিসারদের সুপারিশমত ঐ সময় পাটকলসমূহের

সম্পত্তির কোনও ইন্‌ভেন্ট্রি করা না হওয়াতে ঐ লোকসানের আসল পরিমাণ আর কোনও দিন জানা যাইবে না। এই অবস্থায় আমাদের অর্থমন্ত্রী ব্যাংকের কাগজ-পত্রের ভিত্তিতে যে দুইশ কোটি টাকা লোকসানের কথা বলিয়াছিলেন সেইটাই বোধ হয় সত্যের অধিকতর কাছাকাছি। দুইশ কোটিই হক, আর সত্তর কোটিই হক, ওটা স্বাধীনতা খরিদের দাম হিসাবে খরচের খাতায় লিখিতেই হইবে। কিন্তু ঐ খরচকেই পাটশিল্পের বার্ষিক স্বাভাবিক খরচ ধরাতেই আমাদের আপত্তি। কোনও এক বছরে আপনার বাড়িতে ডাকাতী হইলে কিম্বা কোনও এক মাসের বেতন পাইবার দিন আপনার পকেট মারা গেলে সেইটাকে আপনি ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে বরাবরের বার্ষিক ও মাসিক খরচ ধরিতে পারিবেন না। পাটের ঐ লোকসানটা পাটশিল্প চলাকালে বা পরিচালন ব্যাপদেশে এক বছরের বার মাসে হয় নাই। হইয়াছে মাত্র শিল্প বাণিজ্য দফতরের ধাক্কাধাক্কির সুযোগের ঐ কয়টা মাসে।

অতএব আসুন আমাদের পাটশিল্পের আসল আয়-ব্যয় হিসাব করিতে বসি। কার বন্ধু আর কার শত্রু কত টাকা মারিয়াছে। এই তর্ক ও বিতণ্ডা এখন ভুলিয়া যাইতে হইবে। তবেই আমরা ঠাণ্ডা মাথায় সবই হিসাব করিতে পারিব।

...তেমন হিসাব করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন, আমাদের পাট-শিল্প একটি সুস্থ, সবল, লাভজনক জাতীয় সম্পদ। এই শিল্পকে অন্য কোনও দফতরের সাবসিডি দিতে হইবে না। পাটশিল্পই সব দফতরকে এবং গোটা জাতিকে সাবসিডি দিবে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, পাট শিল্প যদি এতই লাভজনক, তবে পশ্চিমা মিল মালিকরা এবং তাঁদের এক্সপার্টরা এমন লোকসানের হিসাবটা দিলেন কেন এবং কেমন করিয়া? 'কেন'র উত্তর আগেই দিয়াছি। 'কেমন করিয়া'র উত্তর এখন দিতেছি। নিজেদের লোক-দেরে রাজসিক বেতন-ভাতা ও ভ্রমণ-ভাতা দিয়া মাথাভারী প্রশাসনের খরচ ত ছিলই, তার উপর পাট ও সরঞ্জামাদি খরিদেও কারচুপি করা হইত। প্রায় সব কলওয়ালারই সরবরাহ ঠিকাদার থাকিত। এই সব ঠিকাদার আসলে মিল মালিকদেরই বেনামদার। এই ঠিকাদাররা ধরুন, পঁচিশ টাকা দরে পাট কিনিয়া পঁয়ত্রিশ টাকা দরে মিলের কাছে ঐ পাট বেচিল। মণ-প্রতি দশ টাকা লাভ হইল। অপরদিকে কাঁচামালের দাম মণ-প্রতি দশ টাকা তার মানে, টন-প্রতি দুইশ পঁচাত্তর টাকা বাড়িল। শিল্পজাত দ্রব্যের দামও ঐ হারে বাড়িয়া গেল। ব্যাচিওয়েল, স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি আবশ্যক দ্রব্যাদিও

এমনি করিয়া বেনামদার ঠিকাদারের মারফত অতিরিক্ত বেশী দামে খরিদ দেখান হইত। তাতে একদিকে মিল-মালিকের লাভের অংক, অপরদিকে উৎপাদন খরচা বাড়িয়া যাইত। যে-সব মিল-মালিক এমন অসাধুতা করিতেন না, তাঁদের মিলের উৎপাদন-খরচা কম হইত। তাঁদের মিলে প্রচুর মুনাফা হইত। শিল্প মন্ত্রীর পার্লামেন্টের বিবৃতিতেই প্রকাশ, ষাটটি 'বড় বড় কলে ৭২-৭৩ সালে ২৬ কোটি সাড়ে চার লাখ টাকা লোকসান হইয়াছে; আর ঐ মুদ্দতে দশটি 'ছোট ছোট' কলে এক কোটি দুই লাখ টাকা লাভ হইয়াছে। আড়াই শ তাঁতের দুইটি মিলের একই মুদ্দতের হিসাবে দেখা যায় একটিতে খরচ হইয়াছে চটে টন প্রতি ৪৮১০ টাকা ৩৫ পয়সা এবং ছালায় খরচ পড়িয়াছে প্রতি টনে ২৩১৩ টাকা ৭৫ পয়সা। অপর খরচ হইয়াছে প্রতি টন চটে ৭১৭৭ টাকা ৮৯ পয়সা, আর প্রতি টন ছালায় খরচ পড়িয়াছে ২৪৭৫ টাকা ৮২ পয়সা। বহু নযিরের মধ্যে এই একটি হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, পাটকলওয়ালারা উৎপাদন, খরচার কি পরিমাণ চতুরালি করিতে পারেন এবং অধিকাংশেই করিতেনও।

এখন সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের কাঁচামালের খরিদ-দামে অমন কারচুপি করার কেহ থাকিবেন না। ফলে উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধির দরুন পাটশিল্প আর লোকসান বহন করিবে না। এন. আই. ডি-র দাবি মত সাবসিডি দিবারও আর দরকার হইবে না। এখন দরকার শুধু সুষ্ঠু পরিচালনের ব্যবস্থা করা।

এই একটি কাজে সরকারকে 'বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন' আনিতে হইবে। কারণ বর্তমান ব্যবস্থাটাও তাঁরা করিয়াছেন। 'বিপ্লবাত্মক উপায়েই।' পশ্চিমা টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাণ্ড ও দক্ষ লোকেরা চলিয়া যাওয়ায় এমনিতেই আমাদের দক্ষ লোকের অভাব হইয়াছে। তাঁর উপর জুট মিল কর্পোরেশন করিয়া আমরা ড্যাণ্ডি-ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিল্প পরিচালনার যোগ্য লোকদেরে মিল হইতে সরাইয়া আনিয়াছি। মতিঝিল অফিসে তাঁদেরে ডিরেক্টরের গালভরা নামে কেরানীর কাজে বসাইয়াছি। যাঁরা শিল্প-পরিচালনার যোগ্য তাঁদেরে এইভাবে টেবিলে বসাইয়াছি; যাঁরা শিল্পের কাজ জানেন না তাঁদের উপর শিল্প-পরিচালনার ভার দিয়াছি। তাই শিল্পে আজ এই অরাজকতা। এঁদেরে যাঁর-তাঁর কাজে আবার বসাইতে হইবে। তাঁদেরে দায়িত্ব, অধিকার ও ক্ষমতা দিতে হইবে। কর্পোরেশনের ক্ষমতাও বাঁটিয়া দিতে হইবে।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় নভেম্বর ২৩, ১৯৭৩

মঞ্চে নেপথ্যে

..পাট সমিতির সভাপতি বলিয়াছেন: কৃষক ন্যায্যমূল্য বা সরকারের নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্য না-পাওয়ায় পাট-চাষে উৎসাহ হারাইয়া ফেলিতেছে। অনেক জায়গায় মণকরা চল্লিশ টাকারও কম দরে পাট ক্রয়-বিক্রয়ের রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। কৃষকদের অনীহার দরুন পাট চাষের জমি বা একরেজ ২৩ লক্ষ একর হইতে ১৭ লক্ষ একরে এবং একর প্রতি উৎপাদন ৩.৬ বেল হইতে ২.৫ বেলে নামিয়া আসিয়াছে। অতএব, শুধু সাবেক দিনের মত 'প্যায়স উইশ' বা সদিচ্ছাতেই আর কাজ হইবে না। একর-পিছু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। উৎপাদন ব্যয় ও পাট-চাষীর নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্যের অনুপাতে পাটের ন্যূনতম মূল্য পুনঃনির্ধারণ করিতে হইবে এবং কৃষকের ঘরের দুয়ারে সেই মূল্যপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত করিতে হইবে। পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের অবমূল্যায়ন ও দুনিয়াজোড়া মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষিতে এফ. এ. ও'র ইণ্ডিকেটিভ প্রাইজ বা নির্দেশক মূল্য শতকরা ১০ ভাগ বর্ধিত করাইতে হইবে এবং আভ্যন্তরীণ বাজার দর বেলিং, পরিবহণ ও অন্যবিধ কস্টের অনুপাতে পাটের আন্তর্জাতিক মূল্য পুনঃনির্ধারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাটের সেস, ব্যাঙ্কের সুদ, ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম ইত্যাদি লিবারেশনের পর শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইগুলি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করিয়া পাটের রফতানী বাণিজ্যকে সরকারের মদদ যোগাইতে হইবে। জাহাজ ভাড়া ও আভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যয় হ্রাসের জন্য সরকারীভাবে প্রবল প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে।

..পাট সমিতির সভাপতি অনুযোগ করেন যে, প্রাইভেট সেক্টরের পার্টিসিপেশনের গুরুত্বটা যেন সরকার যথেষ্ট পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না। অথচ পাবলিক সেক্টর—বিশেষতঃ বিজেইসির দক্ষতার অভাবের দরুন পাট ব্যবসা ও রফতানী ব্যাহত হইতেছে। তিনি বিজেইসি'র 'অদক্ষতা' সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কতিপয় অভিযোগ ও বিরূপ মন্তব্যের উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত অক্টোবরে পূর্বতন পাট-মন্ত্রীর লণ্ডন সফরকালে লণ্ডন জুট এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তাঁহার (মন্ত্রীর) সম্বর্দনানুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতায় বিজেইসি'র 'অদক্ষ কর্মপদ্ধতির' কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক মন্তব্য করেন যে, 'বিজেইসি' শিশুর দন্তোদগমে মাত্রাতিরিক্ত সময় লাগিয়া যাইতেছে ('দি টিথিং পিরিয়ড হ্যাড লাস্টেড টু লং')।

বাংলাদেশ পাট সমিতির সভাপতি পাটের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী। 'জুট ইন্টারন্যাশনাল' প্রতিষ্ঠারও তিনি সমর্থক। তবে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। তিনি দীর্ঘমেয়াদী সমঝোতার ভিত্তিতে ভারতের কাঁচাপাটের বাৎসরিক চাহিদা বাংলাদেশের রফতানী দ্বারা পূরণের পক্ষপাতী। তবে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা একদিকে বাংলাদেশ হইতে পাট আমদানী করিবেন, অপর দিকে বিদেশের বাজারে কাঁচাপাট রফতানী করিবেন, ইহা পাশাপাশি চলিতে পারে না। জনাব খায়েরের মতে বাংলাদেশ হইতে ভারতের কাঁচাপাট আমদানী করা এবং ভারত হইতে বিদেশের বাজারে কাঁচাপাট রফতানী না করার নীতি একই বন্ধনীভুক্ত হওয়া উচিত। তিনি মনে করেন বাংলাদেশ হইতে পাটের চোরাচালান বন্ধ করার ইহাই কার্যকর পন্থা।

..সে যাহাই হউক, পাট সমিতির সভাপতির ভাষণে যে সকল অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহার সবগুলির সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে না-পারিলেও যে-কোন লোক স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উহাতে অনেক সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে বাংলাদেশের 'সোনালী আঁশে'র বর্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে এসব কথা অনেকেরই মনে উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। জনাব আবুল খায়ের সেই কথাগুলি সাহসিকতা ও সত্য-নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়া জনমতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। পাটের চোরাচালান ও আন্তর্জাতিক বাজারে অসম প্রতিযোগিতা বন্ধের যে উপায় তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত উহার অন্য কি উপায় আছে, আমার জানি না। কোন দেশ, আমাদের যত বন্ধুই হউক, যে-নাকি আপন কাঁচা-পাটের ঘাটতি মিটাইবার জন্য আমাদের দেশ হইতে এদিকে পাট আম-দানী করিতেছে, সে আবার কি করিয়া ওদিকে নিজস্ব কাঁচাপাটে 'উদ্বৃত্ত' হইয়া বহুলক্ষ বেল পাট বহির্বিশ্বে রফতানী করিতে পারে, তাহা সত্যই সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। এক জার্মান দার্শনিক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'গডও কি একই টাইম-স্পেসের মধ্যে একটি দরজা খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারেন?' গডের পারা-না পারার প্রশ্ন বাদ দিলেও বলিতে হয়, বন্ধুরাষ্ট্রের জুট-ব্যারনরা উপরোক্ত অসাধ্য কার্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। দৃশ্যতঃ সরকারী চ্যানেলের বাহিরে ভিন্ন উপায়ে আমাদের পাটই আমদানী করিয়া তাঁহারা উহা রি-এক্সপোর্ট করিতেছেন। 'জুটব্যারনদের' এই ধরনের অবাঞ্ছিত

কার্যকলাপ বন্ধ না-হওয়া পর্যন্ত দুই বন্ধুরাষ্ট্রের মধ্যে পাটের ব্যাপারে দীর্ঘ-মেয়াদী সহযোগিতামূলক সমঝোতা কি করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে, আমরা বুঝি না।

..পাটের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও রফতানী বাণিজ্যে সরকারী সংস্থাসমূহের দক্ষতার অভাব কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বিদেশী মহলের সমা-লোচনা উহাদের ন্যায্যপ্রাপ্য। সরকারী সংস্থার কাজকর্ম যেভাবে চলিতেছে তাহা দেখিয়া মনে হয় দুই বৎসর কেন, দশ বৎসরেও উহাদের দাঁত উঠা শেষ হইবে না। কিন্তু দাঁত উঠা শেষ না হইলে কি হইবে, দাঁত দেখাইতে উাহারা যে বেশ পটু হইবে তাহার লক্ষণ এই শৈশবেই সুস্পষ্ট। সমালো-চনায় তাহারা অসহিষ্ণু, সাজেশনে তাহাদের বীতশ্রদ্ধা। তাই অনৈপুণ্য ও অসাফল্য ইতিমধ্যেই উহাদিগকে মারাত্মকভাবে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। মহা-করণের মন্ত্রণালয়ের খুঁটিতে বাঁধা থাকিয়া এভাবে উহাদের কাজ করিতে হইলে পাট ত যাইবেই, উহাদের দন্তোদ্‌গমও কোন কালেই হইবে না।

..মাননীয় পাটমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, 'কৃষকরা পাট উৎপাদনের উৎসাহ হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং পাটের একরেজ সঙ্কুচিত হইয়াছে, ইহা সত্য নয়।' এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৭১ সালের মার্চের পূর্ববর্তী পাঁচটি পাট-বপন মওসুমে গড়ে প্রতি বছর সাড়ে তেইশ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করেন। সেটা ত সেই গোলযোগপূর্ণ ১৯৭১ সালের পাট-মওসুমের কথাও না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালের একরেজ কত ছিল? তেহাত্তর সালে কি পাটের একরেজ কার্যতঃ সর্বনিম্ন কোথায় (অর্থাৎ ষোল-সতের লক্ষ একরে) নামিয়া আসে নাই? এবার কৃষকদের যে ভাব-গতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাহাদের কমপক্ষে মণকরা আশি টাকা মূল্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা এই মুহূর্তেই না দিতে পারিলে পাটের একরেজ গত বৎসরের চেয়েও কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা কি অমূলক?

..আমাদের বাজার রক্ষার জন্য কি কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে? আরেকটা কথা। পাটের বিশ্ব-চাহিদা যদি এতই কমিয়া গিয়া থাকে তবে প্ল্যানিং কমিশন কোন্ ভরসায় বার্ষিক আশি লক্ষ বেল পাট উৎপাদনের বিরাট পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন? মন্ত্রীরা আজকাল প্রায়ই বলেন, সাংবাদিকরা না জানিয়া না বুঝিয়া কথাবার্তা বলিয়া থাকেন। মানিয়া লইলাম, আমরা অজ্ঞান। বিজ্ঞ পাটমন্ত্রী দয়া করিয়া উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান দান করুন। বিশ্ব-চাহিদা যে ক্ষেত্রে এত

সঙ্কোচনশীল সে ক্ষেত্রে ভারত হঠাৎ কি করিয়া দশ লাখ বেল কাঁচা-পাট রফতানীর কার্যসূচী গ্রহণ করে? আর বিশ্ব-বাজারে সকলের হিস্যা নেওয়ার পর আমাদের জন্য রফতানীর হিস্যা যেখানে মাত্র ১১-১২ লাখ বেল অবশিষ্ট রহিয়াছে সেখানে আমাদের সরকার কি করিয়া ৮০ লাখ বেল পাট উৎপাদনের অমন উচ্চাভিলাষপূর্ণ স্কীম গ্রহণ করেন?

যাক, আরেকটা কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া আজিকার আলোচনা শেষ করি। কথাটা হইতেছে, ২১শে জানুয়ারী সংসদে পাট বিভাগীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত ভাষণের দুই-একটি উক্তি সম্পর্কে। ১৫ই জানুয়ারী ইত্তেফাকের একটি খবরে বলা হইয়াছিল যে, ভারতের নিকট সম্প্রতি যে দুই লক্ষ বেল পাট বিক্রয়ের চুক্তি করা হইয়াছে উহা আন্তর্জাতিক বাজার দরে ত নয়ই, এমনকি স্থানীয় বাজার দর অপেক্ষাও প্রতি মণে পাঁচ টাকা কম। উহাতে দুই কোটি টাকা লোকসান দেওয়া হইয়াছে। উক্ত খবরে প্রশ্ন করা হইয়াছিল "ডবল ক্রশ" গ্রেডটা কি? পাট দফতরের নির্ধারিত দেশী পাটের পাঁচ প্রকার গ্রেডে 'ক্রশবটম' থাকিলেও 'ডবল ক্রশের' কোন উল্লেখ নাই। ইত্তেফাকের খবরে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই অভিনব 'ডবল ক্রশ' গ্রেডটা কে সৃষ্টি করিল এবং কোন্ ভিত্তিতে ইহার মূল্য মণকরা ৫২ টাকা নির্ধারণ করা হইল। জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখন এম. পি. এতদ সম্পর্কে সংসদে একটি প্রস্তাব আনিলে পাটের প্রতিমন্ত্রী এক বিবৃতি দিতে গিয়া আর যাহাই বলিয়া থাকুন, একথা সত্য যে, তিনি 'ডবল ক্রশের' কোন ব্যাখ্যা দেন নাই বা দিতে পারেন নাই। তিনি জানান নাই ডবল ক্রশের স্পেসিফিকেশন কি? কোন্ স্পেসিফিকেশনের ভিত্তিতে প্রয়োজনের মুহূর্তে কলিকাতায় আর্বিট্রেশনের 'মামলা' মীমাংসিত হইবে? সবাই জানেন 'ডবল ক্রশ' কথাটা একটা ইংরেজী স্ল্যাং—যাহার ভাবার্থ কাহারও সঙ্গে চালিয়াতি করা। এখন প্রশ্ন, ৫২ টাকা রেটের এই ডবল ক্রশ ডিলে কে কাহাকে 'ডবল ক্রশ' করিয়াছে? যে-কোন শ্রেণীর পাটই হউক বাংলাদেশে উহার সরকারী সর্বনিম্ন মূল্য মণকরা ৫০ টাকা। কাঁচা বেল করার খরচ মণে ধরুন এক টাকা। ইনসিওরেন্স, ব্যাঙ্কের সুদ, গুদাম ভাড়া, স্টাফ খরচা ইত্যাদি তিন টাকা। রেল স্টেশনে পেঁাছাইবার খরচা বর্তমান অস্বাভাবিক পরিবহণ ব্যয়ের প্রেক্ষিতে যদিও বেশী হইবার কথা, তবু আমরা এক টাকাই ধরিলাম। আরও আছে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত রেল ভাড়া দুই টাকা। একুনে ৫৭ টাকা। নারায়ণগঞ্জের সেদিন কার 'বিজে এ'-রেট ছিল মণকরা

৬০ টাকা। আর নারায়ণগঞ্জের রেটই আমাদের মার্কেট রেট। সরকারীভাবে দাবি করা হইয়াছে, উপরোক্ত ডিলে আমাদের বাজার দরের চেয়েও অধিক দরে দুই লক্ষ বেল পাট বেচা হইয়াছে। এখন মন্ত্রীই বলুন ভারতের কাছে 'ক্রশবটম' মণকরা ৫৫ ও তথাকথিত 'ডবল ক্রশ' ৫২ টাকায় বেচিয়া লাভ হইয়াছে, না লোকসান হইয়াছে। একেই কি বলে 'আন্তর্জাতিক মূল্যে' বিক্রি করা? এরই নাম 'অনেক লাভজনক দরে, সুবিধাজনক শর্তে' পাট বেচা? সাতে-পাঁচে চৌদ্দ বুঝাইলেই যে সকলে বুঝিবে তার কি নিশ্চরতা? বিশেষতঃ অজ্ঞান সাংবাদিকদের অত বোঝার মত জ্ঞান-বুদ্ধি কোথায়? মাননীয় ব্যক্তিদের ন্যায় সাংবাদিকদের 'সিক্সথ সেন্স' ওয়ার্ক করে না বলিয়াই ত শুভঙ্করের অতবড় ফাঁকটা কি করিয়া পুরা হইল তাহা সবিস্তারে বুঝাইয়া বলা দরকার। দুঃখের বিষয়, প্রতিমন্ত্রী তাহা বলেন নাই।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় মাঘ ১৯, ১৩৮০

পাট শিল্পের লোকসান

জনৈক সহযোগী গতপরশু এক নিজস্ব প্রতিবেদনে লিখিয়াছেন যে, ১৯৭৪-৭৫ সালে আমাদের পাটকলগুলিতে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা লোকসান হইতে পারে। পূর্ববর্তী দুই বৎসরে পাটশিল্পের লোকসান দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ২৮ কোটি ৩৫ লক্ষ এবং ৩৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। সহযোগীর অনুমান অনুযায়ী এবার যদি ৪৫ কোটি টাকা লোকসান ঘটে তবে তিন বৎসরের লোকসান একুনে দাঁড়াইবে ১০৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। ইহা সম্ভবতঃ দেশের গোটা পাটশিল্পে নিয়োজিত মোট পুঁজির এক চতুর্থাংশেরও অধিক। সহযোগীর দীর্ঘ রিপোর্টের উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, 'টাকার অবমূল্যায়নের পর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু পাটকলগুলো সমস্ত সমস্যা উৎরিয়ে লাভজনক হয়ে যাবে—এ আশা করা বোধ হয় বাস্তব হবে না বলেই সকলের ধারণা।' বলা বাহুল্য, এটা আরও নৈরাশ্যজনক চিত্র।

পাটশিল্পের সঙ্কট ও লোকসানের কথা কিছু নতুন নয়। তবে পাট প্রতিমন্ত্রী গত ৫ই জানুয়ারী সংবাদ-সংস্থার সহিত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলিয়াছিলেন: "পাটকলসমূহের 'বিপুল লোকসানের' জল্পনা-কল্পনা সত্য নয়। সামগ্রিক হিসাবে কিঞ্চিৎ লোকসান আদৌ দেখা দিলেও মিলসমূহের উৎপাদন সন্তোষজনক এবং গত বছরের তুলনায় কিছু বেশীই। মিলগুলির

'ব্যাপক লোকসান' ত হয়ই নাই। বরং কয়েকটি মিল বেশ লাভ করিয়াছে।'' প্রতিমন্ত্রীর সেই বক্তব্য পাঠ করিয়া আমরা আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, পাঠশিল্প সঙ্কট ও লোকসান কাটাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সহযোগীর উপরোক্ত তথ্যবহুল প্রতিবেদন পাঠে আমরা আবার উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছি।

পাটশিল্প সংস্থার পূর্বতন চেয়ারম্যানও গত বছর তাঁহার এক তথ্যপূর্ণ রিপোর্টে এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, '১৯৭৪-৭৫ সালের নীট লোকসান আগের বছরের অঙ্ককে শতকরা একশত ভাগ ত ছাড়াইয়া যাইবেই, এরপরও লসের হার তাহা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে বলিবার উপায় নাই'। তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, প্রফিটেবিলিটির দিক দিয়া ১৯৭৪-৭৫ সালে পাট শিল্পের অবস্থা 'ভীতিপ্রদ'। তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে, মিল-সমূহের লিকুইডিটি বা ব্যাঙ্ক হইতে ধার করা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যে-হারে মাসে মাসে উঠিয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় 'আর কয়েক মাসের মধ্যেই ব্যাঙ্কের টাকার বৃহদাংশ ভাঙ্গিয়া খাওয়া শেষ হইবে এবং তাহার ফলে মিলসমূহ ও ব্যাঙ্কসমূহের জন্য এবং সম্ভবতঃ সামগ্রিকভাবে দেশের জন্যও গুরুতর অমঙ্গলজনক পরিণতি দেখা দিবে'। কিন্তু উহার পর পাটপ্রতি-মন্ত্রীর বক্তব্যে আমরা অনেকটা আশান্বিত হইয়াছিলাম।

..দায়িত্বশীল মহল স্বীকার করিয়াছেন যে, পাট-শিল্পের দুইটি প্রধান সমস্যা। এক, উৎপাদন দক্ষতা ভারতের তুলনায় কম ত বটেই, এমনকি প্রাক-স্বাধীনতাকালের তুলনায়ও অনেক কম। পূর্বে দক্ষতা সূচক সংখ্যা ছিল যে-ক্ষেত্রে ৮৫ সেক্ষেত্রে বর্তমানে মাত্র ৬০। আরেক সমস্যা হইতেছে, গণিত ভূয়া শ্রমিক। ইহাদের নামে হপ্তার মজুরী যাথারীতিই ড্র করা হয় বটে, কিন্তু প্রকাশ, বাস্তবে ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। এছাড়াও নাকি নানাভাবে ন্যাপারা দৈ মারিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহ বিশেষতঃ পাটশিল্পকে ফতুর করিতে চেষ্টা করিতেছে। আন্তর্জাতিক মন্দা কাটিয়া গেলেও আমরা যদি পাটশিল্পকে এইসব দুর্নীতি ও সমস্যামুক্ত করিতে এবং উৎপাদন দক্ষতা বাড়াইতে না পারি তবে মুদ্রামূল্য পুনঃনির্ধারণ ও অন্যান্য বাস্তববাদী ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও হয়ত ক্রনিক লোকসান কাটাইয়া উঠিতে পারিব না।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় জ্যৈষ্ঠ ১৩, ১৩৮২

মঞ্চে-নেপথ্যে

..পাট মওসুম শুরু হইয়াছে জুলাই মাস হইতে। প্রায় সাড়ে তিন মাস গিয়াছে। প্রকৃত মওসুমের আর বাকী বড়জোর দুই-আড়াই মাস। এই সাড়ে তিন মাসে সীমান্ত পথে কত লক্ষ বেল পাট পাচার হইয়া গিয়াছে সে প্রশ্ন তোলা বৃথা। কারণ, এই ধরনের খবরপত্র ভারতীয় পাট মহল হইতে সেখান-কার সংবাদপত্র মারফৎ কচিৎ কদাচিৎ পাওয়া গেলেও এখান হইতে কোন দিনই পাওয়া যায় না। কর্তা ব্যক্তিরা কেহ ধানচাল-পাটের চোরা-চালানের কথা করিয়া ফেলিলেও 'খুড়ি' দিয়া পরক্ষণেই উহা সংশোধন করেন অথবা 'বিকৃত' সংবাদ প্রকাশের দায়িত্ব চাপান বলির পাঁঠা স্লিপ-অব-টাংগ কখনও স্বীকার সংবাদপত্রের উপর। কাজেই সে প্রশ্ন তুলিয়া কাহাকেও বিব্রত করিব না। কিন্তু পাট-মন্ত্রণালয়কে একটা কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া পারি না। তাঁহারা কি মনে করেন যে, শুধু বর্ডার বেল্টেরই পাট পাচার হয়, অভ্যন্তর-ভাগের পাট পাচার হয় না? পাটের বিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতার অধিকারী এক বন্ধু সেদিন বলিলেন যে, কয়েকজন কর্তা ব্যক্তি সম্প্রতি ফরিদপুরের গ্রামাঞ্চলে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন, ১২০ টাকা মণদরে পাট কেনাবেচা হইতেছে, কিন্তু সরকারী পাট সংস্থাগুলির গুদামে সেই পাট জমা হইতেছে না। এখন নারায়ণগঞ্জের বাজার অনূর্ধ ১০৫ টাকা। কাজেই প্রশ্ন উঠে, ১২০ টাকা মণের পাট যাইতেছে কোথায়? শুধু ফরিদপুর নয়, দেশের আরও অনেক জায়গায়—অভ্যন্তরভাগে দেশী পাট এক শ' পনের/বিশ টাকায় কেনাকাটা চলিতেছে। অথচ নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন মিল এলাকা ও পাক্কা বেলিং কেন্দ্রে দাম বড়জোর এক শ' পাঁচ টাকা। ইহারই বা মাজেজা কি? কেহ কেহ বলেন, এইসব কেন্দ্রে আনার পর পানি ছিটা দিয়া একমণকে সোয়া মণ বানাইয়া বেপারীরা ক্ষতি পোষাইয়া লয়। কিন্তু এই ভিজা পাট বিদেশে পাঠাইলে বৈদেশিক মুদ্রার পেনাল্টি দিতে হইবে। আর গুদামে রাখিলে মাস দুই পরেই উহা পঁচিয়া ছাতুর মত রেণু রেণু হইয়া যাইবে। সেটা যে কতবড় ক্ষতি, সেকথা কে ভাবে?

আরেক বন্ধু উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গায় পরিভ্রমণ করিয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লবণ ও পাটের বেসরকারী বিনিময় বাণিজ্যের কাহিনী শোনাইলেন। লবণের সঙ্গে পাটের বিনিময়ের কথাটা শুনিতেও কেমন অদ্ভুত শোনায়। ভারতে এক বস্তা লবণের দাম নাকি ৩৬ টাকা। বাংলাদেশে

এক মণ পাটের দাম ১২০ টাকা। তবু এক মণ পাট দিয়া এক বস্তা লবণ আনা হয়, কারণ কোনক্রমে আনিতে পারিলেই লবণের বস্তাটার দাম কম-ছে-কম আড়াই শ' টাকা।

..এবারকার সর্বমোট য়্যাভেলিবিলিটি ত দূরের কথা, এ যাবৎ কে কতটা কিনিয়াছে এবং মিলগুলির কত দিনের খোরাক হাতে আছে, সেই ফিগারটাও কেউ পাকাপাকিভাবে দিতে পারে না। কেউ কেউ এমন কথাও বলে যে, এই মুহূর্তে মিলের হাতে কয়েক সপ্তাহের বেশী খোরাকি নাই। কোন কোন মিলের নাকি 'দিন-ভিক্ষা তনু-রক্ষা' চলিতেছে। তাহারা দিন আনে দিন খায়। এইসব কথা শুনিয়া তাজ্জব হই। পাটের ভরা মওসুমেই যদি এইরূপ অবস্থা হয়, তবে ত আরও দিন বাকীই।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় আশ্বিন ২৬, ১৩৮১

পাটে না, কপালে আগুন

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের গুদামে রক্ষিত জে-টি-সি ও জে-এম-সিসহ অন্যান্য সংস্থার পাট ভস্মীভূত হওয়ার কারণ তদন্ত করার জন্য সরকার একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন। কমিটিকে 'যথা সত্বর সম্ভব' রিপোর্ট পেশ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত সপ্তাহ অন্তে উপরোক্ত পাটের গুদামে এক রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তাহাতে পাট-মন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী দুই কোটি টাকার পাট ও এক কোটি টাকা মূল্যের গুদামঘর এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র বিনষ্ট হয়। বেসরকারী তথ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী অবশ্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশী। অর্থাৎ চার হইতে ছয় কোটি টাকা।

..আন্তর্জাতিক পাটের বাজারে আমরা কোণঠাসা। 'পাটের রাজা' আমরা নই, এই নূতন পাঠ আজ আমাদের বেদনা ও ক্ষোভের সাথে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইতেছে। আগুনের লেলিহান শিখায় পাট পুড়িয়া ছারখার হওয়া আর বাঙালীর কপাল পোড়ার মধ্যে কোন তফাৎ নাই। সোনার অঁশ পাট রক্ষা করিতে না পারিলে 'সোনার বাংলা' গড়ার সাধও হয়ত বিসর্জন দিতে হইবে।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় মাঘ ১৪, ১৩৮০

মঞ্চে-নেপথ্যে

গত মঙ্গলবার সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে শিল্পমন্ত্রী জানান যে, বিশ্বের বাজারে বিভিন্ন দেশের পাটজাত দ্রব্য রফতানীতে বাংলাদেশের হিস্যা ছিল ১৯৭০ সালে ৪৫ শতাংশ। ১৯৭২ সালে উহা ৩১ শতাংশে নামিয়াছে।

কয়েকদিন আগে পাট বিভাগীয় মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদের বক্তব্য হইতে জানা যায়, যে-ক্ষেত্রে ১৯৬৫-৬৬ সালে এই দেশ হইতে প্রায় সাড়ে চুয়াল্লিশ লক্ষ বেল কাঁচাপাট বিদেশে রফতানী হইয়াছিল সেক্ষেত্রে ১৯৭২-৭৩ সালে রফতানী হইয়াছে ২৮ লক্ষ বেল। ১৯৪৭-৪৮ সালের সংগে তুলনা করলে (সে বৎসর সাড়ে ষাট লক্ষ বেল রফতানী হইয়াছিল) ৭২-৭৩ সালের কাঁচাপাট রফতানী সাড়ে বত্রিশ লাখ বেল কম। ১৯৪৭-৪৮ সালে কাঁচাপাট রফতানীতে অর্জিত হইয়াছিল দেড়শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। সেক্ষেত্রে ১৯৭২-৭৩ সালে অর্জিত হইয়াছে অবমূল্যায়িত টাকায় ১০৪ কোটি অর্থাৎ সাবেক রেটে মোটামুটি ৫৭ কোটি টাকা।

এই কয়েকটি তথ্য হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায়, কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্য রফতানীর ক্ষেত্রে আমরা ক্রমেই কিভাবে মার খাইতেছি এবং আন্ত-র্জাতিক বাজার অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া কিভাবে ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করিতেছি।

গত ২৮শে মে ভারতীয় সংবাদপত্রে খবর বাহির হইয়াছে যে, ইউরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলিতে পাটজাত জিনিস রফতানীর ব্যাপারে ভারত ই.ই. সি'র নিকট হইতে শুল্ক ও কোটা সম্পর্কিত কতিপয় বিশেষ সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছে। উহার ফলে ভারতীয় চট ও থলির উপর শতকরা ৬০ ভাগ ও কার্পেট ব্যাকিং-এর উপর ৫০ ভাগ শুল্ক হ্রাস পাইয়াছে। তাছাড়া ঐসব দেশে ভারতীয় পাটজাত জিনিস রফতানীর ব্যাপারে আর কোন কোটা সিস্টেম থাকিল না। ভারত যত খুশি মাল অবাধে রফতানী করিতে পারিবে। বাংলাদেশ সেইরূপ কোন সুবিধা আদায় করিতে পারে নাই। উহার কোন চেষ্টা চালান হইয়াছে কিনা তাহাও এযাবৎ জানা যায় নাই। আমরা এই বিষয়ে এযাবৎ একাধিকবার লেখালেখি করিয়াছি। জুট ডিভিশন অন্যান্য ব্যাপারে প্রেসনোট জারি করিতে খুবই তৎপর। কিন্তু এই গুরুতর প্রশ্নে তাহারা মুখের তালা খুলেন না।

সম্প্রতি পত্রিকান্তরে আরেকটি সাংঘাতিক অভিযোগ বাহির হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, ভারতীয় জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন ও বাংলাদেশের পাট কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি বুঝাপড়ার ভিত্তিতে সাতটি দেশে পাটজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য উভয় দেশ হইতে অভিন্ন রেটের টেণ্ডার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় পাটকলওয়ালারা নাকি চারটি মহাদেশে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া টেণ্ডারের রেটের চেয়ে দুই শতাংশ দাম কমাইয়া সেই বিরাট

অর্ডারটা সম্পূর্ণরূপেই আদায় করিয়া লইয়াছে। অভিযোগে বলা হইয়াছে যে, ইহার ফলে অন্ততঃ ত্রিশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাগত আয় হইতে বাংলাদেশ বঞ্চিত হইয়াছে। ২৪শে জুন এই অভিযোগ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তিন সপ্তাহের ভিতর আমাদের জুট ডিভিশন বা পাট রফতানী সংস্থা এ সম্পর্কে তাহাদের কোন বক্তব্য রাখেন নাই।

জনৈক সরকার পক্ষীয় সংসদ-সদস্য পাটের ব্যাপারে ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার বিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলিয়াছেন, "আন্তর্জাতিক পাটের বাজারে ভারত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের নিকট কাঁচাপাট রফতানীর কোন যুক্তি আমি দেখি না। সীমান্ত পথ দিয়া বিপুল পরিমাণ পাট ভারতে পাচার হইয়া যাইতেছে। সীমান্ত বন্ধ করা সম্ভব না হইলে আমাদের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া পড়িবে।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশ হইতে বিশ কোটি টাকার পাট ক্রয় করিবে। ভারতীয় সংবাদপত্রের খবরে জানা যায়, সে-দেশে এবার পাটের 'বাম্পার ক্রপ' হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও তাহারা বাংলাদেশ হইতে বিশ কোটি টাকার কাঁচাপাট কিনিতেছে দৃশ্যতঃ তাহাদের পাটকলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পাটজাত জিনিসের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যেই। এটা তাহাদের জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় ১৯৭৪ সাল

দুই বৎসরে পাটে বৈদেশিক মুদ্রায় লোকসান মাত্র ৯০ কোটি টাকা

১৯৭৩-৭৪ সনে পাট মন্ত্রণালয় পাট রফতানীতে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারিলেও ১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪ এই দুই বৎসরে 'মাত্র' ৯০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা লোকসান দিবে।

জানা গিয়াছে যে, গত দুই বৎসরে বিশ্বে মুদ্রামান হ্রাস এবং দেশের রফতানী সংস্থার অদূরদর্শিতার ফলেই বাংলাদেশকে এই ৯০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খোয়াইতে হইতেছে।

চলতি ১৯৭৩-৭৪ মৌসুমে পাট মন্ত্রণালয়ের বিদেশে প্রায় ৩৩ লক্ষ বেল পাট রফতানীর লক্ষ্য রহিয়াছে। টনের হিসাব করিতে গেলে (৫.৬ বেল পাট = ১ টন) দাঁড়াইবে প্রায় ৬ লক্ষ টন। ভারতের নিকট

২ লক্ষ বেল পাট বিক্রয়ের সাম্প্রতিক চুক্তিসহ বর্তমান সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট রফতানীর পরিমাণ দাঁড়াইবে প্রায় ২১ লক্ষ বেল।

অপরদিকে, ১৯৭২-৭৩ সনে জুট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন বিদেশে পাট রফতানী করিয়াছেন মোট ২৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৫১৩ বেল। রফতানীকৃত বেশীর ভাগ পাটই 'বাংলা হোয়াইট বি' এবং 'বাংলা হোয়াইট সি' গ্রেডের। বর্তমান বৎসরের ৩৩ লক্ষ এবং গত বৎসরের ২৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৫ শত ১৩ বেলসহ সর্বমোট ৫৮ লক্ষ ২৩ হাজার ৫ শত ১৬ বেল বা বেশী করিয়া ধরিলে দুই বৎসরের রফতানী দাঁড়াইবে ৬০ লক্ষ বেল অর্থাৎ প্রায় পৌণে ১২ লক্ষ টন পাট।

শতকরা ৩৫ ভাগ গচ্চা

জানা গিয়াছে, স্বাধীনতা উত্তরকালের পাটের মূল্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ব বাজারের মূল্য অপেক্ষা শতকরা ৩০ হইতে ৩৫ ভাগ মূল্য কম পাইতেছে। কারণ ১৯৭২ সন হইতে বর্তমানে বিশ্বের মুদ্রামান পাটের বাজারে প্রায় শতকরা ৩০ হইতে ৩৫ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৬৯-৭০ বা ১৯৭০-৭১ সনে যে পাট (গ্রেড বি. ডব্লিউ. সি. এবং বি. ডব্লিউ. ডি.) যথাক্রমে টন প্রতি ১২৫ পাউণ্ড এবং ১১৬ পাউণ্ড বিক্রয় হইত সেই গ্রেডের পাট আজ একই দামে বিক্রয় করা হইতেছে। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য পাট রফতানীকারী দেশ পূর্বের মূল্য অপেক্ষা বাড়তি মূল্য ঠিকই আদায় করিয়া লইতেছে।

আসল মূল্য অপেক্ষা ৯০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা নাই

বর্তমানে বাংলাদেশ যে মূল্য ইউরোপীয় বাজারে ক্রেইট অন বোর্ড সহ বি. ডব্লিউ. স্পেশাল ১ শত ৪৮ পাউণ্ড, বি. ডব্লিউ, এ ১ শত ৪১ পাউণ্ড বি. ডব্লিউ. বি. ১ শত ৩৪ পাউণ্ড, বি. ডব্লিউ. সি. ১ শত পাউণ্ড, বি. ডব্লিউ. ডি. ১ শত ১৬ পাউণ্ড এবং বি. ডব্লিউ. ই. ১ শত ৫ পাউণ্ড দরে পাট বিক্রয় করিতেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বি. ডব্লিউ. ডি. এবং বি. ডব্লিউ. সি. ধরনের পাটই বেশীর ভাগ বিক্রয় করিতেছে বলিয়া জানা যায়।

বি. ডব্লিউ. ডি. ধরনের পাটের মূল্য নিয়া হিসাব করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, ১৯৭০-৭১ সালের মূল্য ধরিয়া প্রতি টন এফ ও বি ১ শত ১৬ পাউণ্ডে দরে বিক্রয় করিলে ৩৫% মুদ্রামান হ্রাস ধরিয়া লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি টনে ৪০ পাউণ্ড অর্থাৎ বর্তমান বিশ্ববাজারে পাটের

মূল্য হওয়া উচিত ছিল এফ ও বি ১ শত ৫৬ পাউন্ড। প্রতি টনে ৪০ পাউন্ড লোকসান ধরিলে এবং ৩০ টাকা প্রতি পাউন্ড হিসাবে ৬ লক্ষ টন পাটের লোকসান দাঁড়ায় ৪৫ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া গত ১৯৭২-৭৩ সালের রফতানী প্রায় অনুরূপ ধরিলে লোকসান দাঁড়াইবে আরও প্রায় ৪২ হইতে ৪৩ কোটি টাকা। এই মোট ৮৮ কোটি টাকা লোকসান ১৯৭৩-৭৪ সালের শেষ মৌসুম পর্যন্ত।

পর্যবেক্ষক মহলের প্রশ্ন, পাট ক্রয়কারী দেশগুলি হইতে বাংলাদেশ যন্ত্রপাতি বা যে-কোন জিনিস বর্তমানে ক্রয় করিলে ১৯৭০-৭১ সালের মূল্য অপেক্ষা ৩০%বেশী দিতে বাধ্য হয়। অথচ যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পাট বিক্রয় এত উদারনীতি কেন যাহার ফলে ২ বৎসরে পাটেই প্রায় ৯০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খোয়াইতে হইল ?

বিশ্ব-বাজারে বাংলাদেশ ও ভারত 'কমপেটিটিভ'

জানা গিয়াছে যে, ভারত বিশ্বের বাজারে বর্তমানে যে পাট বিক্রয় করিতেছে উহা প্রতি গ্রেডেই বাংলাদেশ অপেক্ষা প্রতি টনে ৩ হইতে ৪ স্টার্লিং পাউন্ড বেশী।

অথচ এই সকল ইউরোপীয় বাজারে বাংলাদেশের পাট তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে ভারতের পাট অপেক্ষা প্রতি মণে ৩ হইতে ৪ পাউন্ড বেশী বিক্রয় হইত। কারণ গুণগত বিচারে এবং শুধু সরবরাহের জন্যই বিদেশী ক্রয়কারীরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু সেই সকল ইউরোপীয় ক্রেতারাই আজ 'তৎকালীন ভারতীয় নিম্নমানের পাট' বর্তমানে তৎকালীন পাকিস্তানের 'উন্নতমানের পাট' অপেক্ষা বেশী পছন্দ করিতেছে কেন? ওয়াকিফহাল মহলের মতে, বাংলাদেশের পাট রফতানী এজেন্সি 'কোম্পানীকা মাল দরিয়ামে ঢাল' নীতির ফলেই নাকি বিশ্বের বাজারে এদেশের পাটের এই দুর্দশা। ইহা ছাড়া ভারতের রফতানী বাণিজ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ আর বাংলাদেশের রফতানী বাণিজ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৮০ হইতে ৮৫ ভাগ। অতএব, পাটের ব্যাপারে বন্ধু রাষ্ট্র ভারত কি করিল উহা না ভাবিয়া আমরা কি করিলাম উহাই আমাদের বেশী করিয়া ভাবা উচিত বলিয়া সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় জানুয়ারী ১৪, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

..পাট-মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, এতকাল যাহা জানিতেন, তাহা ভুলিয়া যান, আমরা এখন আর পাটের রাজা নই। কথা তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন। পাটের রাজ্য-পাট যে আমাদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ আমরা প্রতিদিনই লাভ করিতেছি। গত শনিবার এক সহযোগী "পাট রফতানী বিপর্যস্ত" শীর্ষক এক উদ্বেগজনক খবর দিয়াছেন। সরকার-চালিত এক সহযোগী ৩১শে ডিসেম্বর পাটের নিদারুণ অবস্থা সম্পর্কে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন, "বর্তমানে আমাদের শতকরা ৯০ ভাগ — বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী একমাত্র ফসলটির যা হাল, তাতে এই স্বর্ণ-সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত ভস্মে পরিণত হয় কিনা হলফ করে বলা সম্ভব নয় এই মুহূর্তে। অপর এক সরকার-পক্ষীয় সহযোগী ৩০শে ডিসেম্বর সম্পাদকীয় কলামে লিখিয়াছেন, "ভালোই হবে। পাট নিয়ে প্রশাসনের এত ঝামেলা পোহাতে হবে না আর। পাটকলগুলোর চাকা ত এক এক করে বন্ধ হচ্ছে। ২ মাস পর যদি একেবারেই অচল হয়ে যায় ত অনেক দায়-দায়িত্বের হাত থেকে অনেকেই ত রেহাই পেতে পারেন।..অব্যবস্থার রাজ্যে পাটের ক্ষেত্রে অব্যবস্থা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সর্বত্র বিরাজিত অরাজকতা এখানেও ছায়া বিস্তার করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পাটের বেলায় এই অস্বাভাবিকতা গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়নি কি? সীমাহীন ব্যর্থতা আর অযোগ্যতা কি বয়ে বেড়াচ্ছেন না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ? সমান তালে এগিয়ে চলেছে অরাজকতা। তাই যত অঘটনই ঘটুক, তার জন্য আমাদের আর অবাক হবার কিছু নেই।" গত ২৮শে ডিসেম্বর এই স্তম্ভে প্রকাশিত পাট-সম্পর্কিত নিবন্ধে আমরা বিশিষ্ট সরকার দলীয় এম. পি. ও শ্রমিক নেতা বাংলাদেশ চটকল শ্রমিক ফেডারেশন, লণ্ডনের ফাইনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকা ও অন্যান্য দায়িত্বশীল মহলের মন্তব্য ও প্রস্তাব হইতে কতিপয় উদ্ধৃতি দিয়াছিলাম। সবারই মুখে এক কথা : বাংলাদেশের পাট লাটে উঠিবার উপক্রম। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের অন্ধত্ব নিবারণী কেন্দ্রে পাট-মন্ত্রীর সেদিনকার ভাষণের পর এ বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না যে, এঁরাও যাহা বলিতেছেন, সবই অজ্ঞানতাপ্রসূত। এঁদের জন্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয় : প্রভু! ইহারা অজ্ঞান। না-জানিয়া, না-বুঝিয়া কথা বলিতেছে।

..মন্ত্রী নিজেই বলিয়াছেন যে, পাটকলসমূহের ২৫ হাজার ভুয়া শ্রমিকের খাতে বার্ষিক ছয় কোটি টাকার অধিক গচচা যাইতেছে। এই গচচা বন্ধ

করার জন্য ত কোন নয়া পাটনীতির প্রয়োজন পড়ে না। ইহার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাই যথেষ্ট। সেই ব্যবস্থাটুকু কেন অবলম্বিত হয় না, এটাও আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। আমরা এতই অজ্ঞান! অথচ এই যে ২৫ হাজার ভূয়া শ্রমিকের খাতে কোটি কোটি টাকা অবিরাম ঢালা হইতেছে, নিশ্চয়ই ইহারও পিছনে একটা জোরালো যুক্তি বা কার্যকারণ-সম্পর্ক আছে। আমরা অজ্ঞান বলিয়াই এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য উপলব্ধি করিতে পারি না। দোষ আমাদেরই অজ্ঞানতার। দোষ অন্য কারও নয়।

..২৯শে ডিসেম্বর এক সরকার সমর্থক সহযোগী সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন, "ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের আগের দিনগুলিতে কখনো কাঁচাপাট রপ্তানী করেছে বলে আমরা শুনিনি। নিজ দেশের পাট-কলগুলির খোরাক যোগাতেই তাকে হিমশিম খেতে হতো। বছরের ১২ মাসই অর্ধেক পাটকল বন্ধ থাকতো বলে শোনা যায়। অথচ গেল দু'বছর ধরে কি ঘটনা ঘটেছে—ভারতে পাটের 'বাম্পার ক্রপ' আর বিদেশে লাখ লাখ বেল কাঁচা পাট রপ্তানির খবর শোনা যাচ্ছে।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় জানুয়ারী ১৫, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

গত মে মাসে সংবাদপত্রে যখন লেখালেখি চলিতেছিল যে, পাটকল-গুলির চাহিদা পূরণের জন্য এবার দশ-বার লক্ষ বেল পাট আমদানী করিতে হইবে তখন উর্ধতন সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রবলভাবে উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, এ-বছর 'পাটকলগুলির চাহিদা পূরণের পরও ২০ লক্ষ বেল পাট উদ্বৃত্ত থাকিবে।' জুন মাসে পাট-পরিস্থিতির শোচনীয়তা যখন আরও প্রকট হইয়া পড়ে তখনও পাট-মন্ত্রণালয় দুঃসাহসের চরমে উঠিয়া বলেন যে, এবার কাঁচাপাট আমদানী করিতে হইবে এরূপ কথা নিছক অতিরঞ্জন ও আজগুবি জল্পনা-কল্পনা। তাঁহারা আরও বলেন যে, এস্টিমেটের চেয়ে উৎপাদন যদি অর্ধেকও কম হয় তবু আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা মিটাইবার মত কাঁচাপাটের কোন অভাব কিছুতেই ঘটিতে পারে না। কারণ আগের বছরের ক্যারিওভার স্টক রহিয়াছে ১৭ লক্ষ বেল।

..তবে, ইতিমধ্যেই যে দেশের পাটকলসমূহে কাঁচাপাটের নিয়মিত ও পর্যাপ্ত যোগান দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে তা ত আমরা চোখের সামনেই দেখিতে পাইতেছি। ২২শে সেপ্টেম্বর খবর বাহির হইয়াছে যে, পাটের

অভাবে চট্টগ্রামের ১৭টি পাটকল বন্ধ হইবার উপক্রম। মিলসমূহে পাটের স্টক 'সর্বকালীন ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে'।

..ঘোড়াসাল, নরসিংদি, কাঞ্চন, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, খুলনা প্রভৃতি প্রধান পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলের পাটকলগুলি কাঁচাপাটের অভাবে বন্ধ হইয়া যাইতে বসিয়াছে কেন? ইতিমধ্যেই এইসব মিলের উৎপাদন অর্ধেক বা তারও নীচে নামিয়া গিয়াছে কেন? কেন মিলে মিলে শিফ্‌ট কমানো হইতেছে? কেন তাঁত বন্ধ করা হইতেছে? নদীকূলে অবস্থিত মিলগুলি নৌ-যোগাযোগের উপরই নির্ভরশীল। সেই যোগাযোগ ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তবু কেন এসব মিলে কাঁচাপাট সরবরাহের অভাব?

..আমরা বছরের পর বছর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি যে, পাটকে রক্ষা করিতে হইলে পাটচাষীকে ধান-চালের মূল্যের অনুপাতে ন্যায্যমূল্য দিতেই হইবে। নচেৎ কৃষক নেহাত অর্থনৈতিক কারণেই পাটের ক্ষেতে ধান চাষ করিতে আরম্ভ করিবে। কারণ পাটের চেয়ে ধানই এখন অনেক বেশী অর্থকরী ফসল। ধানের আবাদ খরচাও অনেক কম। আমরা বলিয়াছি যে, কৃষককে পাটের উচিত মূল্য না-দিলে এমন এক সময় আসিবে যখন গরুর দড়ি তৈরী এবং ঘর-গৃহস্থালীর কাজের জন্য যেটুকু পাটের দরকার তাহার অতিরিক্ত পাট উৎপাদন করিতে কৃষক উৎসাহবোধ করিবে না। এই কলামে গত ২৬শে মার্চের নিবন্ধেও লিখিয়াছিলাম, "কৃষককে পাট চাষে উৎসাহিত এবং তাহাকে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করার জন্য ভর্তুকী দিয়া হউক আর অন্য যেভাবেই হউক পাটের দাম, আমার বিবে-চনায়, অন্ততঃ আশি টাকা দেওয়া উচিত ছিল। তবু উহা ধানের নীচেই থাকিত।"।

..প্রকাশ, চলতি মওসুমের জুলাই-আগস্টে চারটি সরকারী পাট সংস্থা মাত্র এগার লক্ষ মণ পাট কিনিতে পারিয়াছেন। তন্মধ্যে সীমান্ত অঞ্চলে কিনিয়াছেন মাত্র আড়াই লক্ষ মণ। ইহা হইতেই এবারকার পাট পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করা যায়। পাটের এই ভরা মওসুমে পাটকলসমূহ পাটের অভাবে কেন বন্ধ হয় তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। মওসুমের গোড়ার দিকে যখন আশি টাকা দাম দিলেও অনেক পাট পাওয়া যাইত, তখন সরকার গা করেন নাই। এখন আশি-নব্বই ত দূরের কথা, এক শ' টাকা দিয়াও পাট ধরিয়া রাখা যাইতেছে না। এঁরা সত্যি বুদ্ধিবিবেচনার কী কুতুব-মিনার!

..লণ্ডনে পাটের দর এখন টনপ্রতি ২২৩ পাউণ্ড, আর আমাদের রফতানী মূল্য ১৬০ পাউণ্ড। কেন এই ৬৩ পাউণ্ডের বিরাট তফাৎ? মাসাধিককাল আগেই রফতানীমূল্য ২০০ পাউণ্ড করা যাইতে পারিত। কেন করা হয় নাই? উহা না করার দরুন বৈদেশিক মুদ্রার যে কোটি কোটি টাকা গচচা গেল এবং এখনও যাইতেছে, এর জন্য দায়ী কে?

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় আগস্ট ১, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

..'দশ লক্ষ বেলের' হিসাব কোথায়—যে দশ লক্ষ বেল পাট 'আন-অফিসিয়াল চ্যানেলে' বাংলাদেশ হইতে এবার ইতিমধ্যেই পাইয়া যাওয়ার কথা ভারতের পাট শিল্প-বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট মহল পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। ১৬ই মার্চের হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ভারতের মিলসমূহের খোরাকী (৬৫ লক্ষ বেল) বাদেও ৩৫ লক্ষ বেল উদ্বৃত্ত স্টকের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, গত বৎসরের ১২ লক্ষ বেল ক্যারিওভার, এবারকার ৭৮ লক্ষ বেল (নতুন ক্রপ) উৎপাদন, বাংলাদেশ হইতে সরকারী বাণিজ্যিক পথে (সেই তারিখ পর্যন্ত) ৩ লক্ষ বেল আমদানী এবং 'আন-অফিসিয়াল চ্যানেলে' দশ লক্ষ বেল প্রাপ্তি যোগ করিয়া চলতি মওসুমে ভারতের পাটের স্টক দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৩ লক্ষ বেল। ভারতীয় সংবাদপত্রে এই তথ্য বাহির হইবার পাঁচদিন পর জনাব শামসুল হক চট্টগ্রামে এক বক্তৃতায় স্বীকার করেন যে, সীমান্তের ওপারে এখনও পাট পাচার হইয়া যাইতেছে এবং ইতিমধ্যে 'প্রায় সাত লক্ষ গাইট' পাট পাচার হইয়া গিয়াছে। আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতে এই দশ লক্ষ বেলের (না হয় মন্ত্রী-বর্ণিত ৭ লক্ষ বেলই ধরা যাক) হিসাব কোথায়? 'আন-অফিসিয়াল চ্যানেলে' দশ লক্ষ বেল চলিয়া গেলে ৭৯ লক্ষ বেল স্টকের হিসাব মিলে কি প্রকারে?

..পূর্ববর্তী বৎসরেও বাংলাদেশ হইতে বিপুল পরিমাণ পাট 'ইউজুয়াল সোর্সে' ভারতে যাওয়ার কথা কলিকাতার সংবাদপত্রে স্বীকৃত হয়। এমনকি ভারতের বহির্বাণিজ্য-মন্ত্রী ভারতীয় পাটকল সমিতির সভায় 'বাংলাদেশের দুর্যোগ ও পাটচাষীর দুর্ভাগ্যের এহেন সুযোগ নেওয়ায়' ভারতের জুট-ব্যারনদের ভর্ৎসনা করেন। পক্ষান্তরে জুট-ব্যারনর, 'বাংলাদেশ পরিস্থিতি হইতে সৃষ্ট ভারতের উক্ত জুট-বুমকে একটি উইণ্ডফল' বলিয়া উল্লাস প্রকাশ

করেন (২৭-৭-৭৩ তারিখের 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

..বস্তুতঃ, নিষ্ঠুর সত্য ইতিমধ্যেই খবরদান শুরু করিয়া ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে খবর বাহির হইতেছে যে, পাটের অভাবে কোন কোন চটকলে "সি" শিফ্টের উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খবরে আরও বলা হইয়াছে যে, অনেক চটকলেই এখন আর মওজুদ পাট নাই। বছরের এই শেষ দিকটায় পাট পাওয়াও যাইতেছে না। ঘোড়াশাল, নরসিংদী, কাঞ্চন প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের পাটকলগুলি কাঁচাপাটের অভাবে অচিরেই বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা। এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও মন্ত্রী কি করিয়া বলিতে পারেন যে, 'পাটশিল্প ইতিমধ্যে চরম বিপর্যয় কাটাইয়া উঠিয়াছে, আগামী বৎসর পাটশিল্প হইতে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হইবে'—তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

. যে সরকারী সংস্থাটি আন্তর্জাতিক তৈল-সঙ্কটজনিত মূল্য-বৃদ্ধির দিনেও বাংলাদেশের পাটকে 'অকশন সেলে' বা নিলামে তুলিয়াছে এবং ভারতের বিক্রয়-মূল্যের চেয়েও টনপ্রতি দুই-তিন পাউণ্ড হ্রাসকৃত মূল্যে ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক টন (সাড়ে পাঁচ লক্ষাধিক বেল) পাট কতিপয় পার্টির কাছে বিক্রি করিয়া দেশকে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, সেই সংস্থার কি সত্যই কোন শিরোপা প্রাপ্য? কিন্তু সে কেচ্ছা-কাহিনী বলিতে গেলে পূর্বতন 'মগনমল কুশলচাঁদ'-এর মালিক বর্তমানে লণ্ডন-প্রবাসী লালচাঁদ সুরানাসহ অনেক বিজেইসি-আদৃত পার্টির কথা আসিয়া পড়ে। সে অনেক লম্বা কেচ্ছা।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় মার্চ ২৬, ১৯৭৪

মঞ্চে নেপথ্যে

..১৩ই অক্টোবরের নিবন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম, (বিদেশী ক্রেতাদের) আমাদের পাট নিতেই হইবে এবং উচ্চমূল্যেই নিতে হইবে। অন্ততঃ এবার কাঁচাপাটে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিলেই চলে। এফ. এ. ও-র ইণ্ডিকেটিভ প্রাইস যাই থাকুক (কারণ এবার উহা খাটিবে না), আমরা এই মুহূর্তেই রফতানীমূল্য ২০০ পাউণ্ড কেন ২২৫ পাউণ্ড পর্যন্ত উঠাইতে পারি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, লণ্ডন-মার্কেট-রেট যে ক্ষেত্রে ২২৩ পাউণ্ড সেক্ষেত্রে আমরা রফতানীমূল্য ১৮০ পাউণ্ডের ঊর্ধ্বে উঠাইতে সাহস পাইতেছি না। এর কারণ কি? জানিয়া-শুনিয়া আমরা এই বিপুল বৈদেশিক

মুদ্রা গচ্চা দিতেছি, এর দায়িত্ব কাউকে না কাউকে ত বহন করিতেই হইবে।'

..মওসুমের গোড়ার দিকে সরকার পাটের অবাস্তব (ষাট টাকা) মূল্যে অটল থাকিয়া যে ভুল করিয়াছেন, সে-ভুলের আর কোন প্রতিকার নাই। সেই ফাঁকে প্রচুর পাট পাচার হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এখনও প্রায় প্রতিদিনের কাগজে সীমান্ত অঞ্চলে পাটের চোরাচালানের হিড়িক ও 'বারোয়ারী দলের পাঁয়তারার' লম্বা লম্বা রিপোর্ট বাহির হইতেছে।

..সরকারী পাট কর্পোরেশনরা স্বভাবতঃই উচ্চমূল্যে ভেজা পাট কিনিতে পারেন না। কিন্তু বারোয়ারী মহাজনদের ফড়িয়া এজেন্টরা ভেজা-শুকনা সব রকমের পাট উন্মাদের মত কিনিয়া চলিয়াছে। তারা নাকি বলে, 'পাট দাও, যত টাকা লাগে দেব'। যে-কোন মূল্যে উহাদের পাট কেনার এই হিড়িকের অর্থনৈতিক তাৎপর্য আমার বোধগম্য না-হওয়ায় এক অভিজ্ঞ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা আসলে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, আমাদের মুদ্রায় একশ' ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা দরে পাট কিনিলেও ভারতীয় টাকায় উহার যে মূল্য দাঁড়ায় তাহা সেই দেশের বাজারদরের অনুপাতে অধিক বা আন্‌ইকনমিক নয়।

..এক সহযোগী খবর দিয়াছেন যে, 'পাটকলের খুচরা যন্ত্রাংশ পাচারকারী একটি দলেরও সন্ধান' পাওয়া গিয়াছে। আমাদের পাটশিল্পকে বিকল ও অচল করাই যে উক্ত পাচারকারীদলের উদ্দেশ্য, তাহা বলাই বাহুল্য।

পাট সম্পর্কে এই কলামে অনেক কিছু লিখিয়াছি। অনেক শক্ত কথা বলিয়াছি। কিন্তু আর শক্ত কথা বলার শক্তি পাই না। সরকারের কাছে শুধু এইটুকু অনুরোধ, দেশী-বিদেশী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লুটেরাদের ষড়যন্ত্রের কবল হইতে পাট ও পাটশিল্পকে রক্ষা করার জন্য আপনারা কি করিবেন সে বিষয়ে চূড়ান্তভাবে মনস্থির করুন।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় নভেম্বর ৪, ১৯৭৪

এটাই কি শেষ কথা ?

পাট দফতরের প্রতিমন্ত্রী সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণকরা ৬০ টাকা হইতে বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা এখন সরকারের নাই। তিনি আরও বলেন, চাষীরা যে বর্তমানে পাটের

বদলে অন্যান্য অর্থকরী ফসল উৎপাদনের কথা চিন্তা করে, এ বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল আছেন।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় শ্রাবণ ৪, ১৩৮১

মঞ্চে-নেপথ্যে

..পাটশিল্পের গতমাসের এক বিবরণে জানা যায় যে, পাটকলসমূহের ঘাটতি মিটাইবার জন্য প্রতিমাসে গড়ে সাড়ে তিন কোটি টাকা করিয়া অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করিতে হইতেছে। প্রকাশ, মেশিনারির ডেপ্রিসিয়েশন বাবত ১১ কোটি টাকা এবং সম্ভাব্য লোকসান ৪৩ কোটি টাকা যোগ করিয়া এবারকার মোট লোকসান দাঁড়াইবে ৫৪ কোটি টাকা। ১৯৭২-৭৩ সালে লোকসানের পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে ৩৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালের অনুমিত ৫৪ কোটি টাকা যোগ করিলে পাটশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করার পরবর্তী তিন বৎসরের মোট লোকসান দাঁড়াইবে ১১৫ কোটি টাকা। আরও জানা যায় যে, পাটকলসমূহের সামগ্রিক দায়-দেনা উহাদের স্থির সম্পদকে (এ্যাসেট) অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। বস্তুতঃ, লোকসানের মাত্রা যে-হারে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণ এ্যাসেট কর্পূরের মত উড়িয়া যাওয়া আশ্চর্যজনক কিছু নয়।

..পরিকল্পনা কমিশনের এক রিপোর্টে জানা যায় যে, বাংলাদেশ ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রতিটন পাটজাত জিনিসে দেড় পার্সেন্টের বর্ধিত মূল্য পাইতে পারে নাই। স্পষ্টই বোঝা যায়, বাংলাদেশের পাটশিল্প এক সাংঘাতিক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। বৃটেন ও ভারতীয় পাটশিল্পের তুলনায় বাংলাদেশের পাটকলগুলির উৎপাদন দক্ষতার মান অনেক নিম্নে। এই তারতম্যের হার মোটামুটি ত্রিশ শতাংশ। ১৯৬৯-৭০ সালে আমাদের পাটশিল্পের উৎপাদন দক্ষতা ছিল ষাট শতাংশ। বর্তমানে তাহা পঁয়তাল্লিশ শতাংশে নামিয়া আসিয়াছে। শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ ও সমাজতন্ত্রীকরণের পর আমাদের অর্থনৈতিক কমিটমেন্ট বা ব্যয়ভার অনেক বৃদ্ধি পাইলেও কর্মীদের উৎপাদন-আগ্রহ ও নৈপুণ্য বাড়ে নাই। বরং তাহা ক্রমশঃ হ্রাসই পাইতেছে। প্রধানতঃ ইহাই আমাদের পাটশিল্পের এই একটানা লোকসানের কারণ।

..অবক্ষয়ের কারণ অবশ্য আরও আছে। কাঁচামালের মূল্যের স্থিতিহীনতা, যন্ত্রাংশের দুষ্প্রাপ্যতা, জ্বালানির অভাব বা অনিয়মিত সরবরাহ, বিদ্যুৎবিভ্রাট, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, প্রশাসনিক অব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক কারণ রহিয়াছে পাটশিল্পের এই অবক্ষয় ও অবিরাম লোকসানের পিছনে।

এক সহযোগীর খবরে প্রকাশ, নানাবিধ কারণে গত কয়েক মাস যাবৎ অধি-কাংশ পাটকলের উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। কোন কোন মিলে এই উৎপাদন হ্রাসের হার শতকরা ত্রিশ-চল্লিশ ভাগ। সহযোগী লিখিয়াছেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় প্রতি বছরই পাটকলগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, বিপুল সংখ্যক নতুন শ্রমিক নিয়োগ এবং ভুয়া শ্রমিকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে মোটা অংকের অর্থ দিতে হচ্ছে। একটি সূত্রে জানা গেছে যে, পাটকলগুলোতে ভুয়া ও অপ্রয়োজনীয় শ্রমিক-দের সংখ্যা হবে ১২ হতে ১৫ হাজার। এক শ্রেণীর শ্রমিক নেতা ও প্রভাব-শালী ব্যক্তিদের চাপের ফলে প্রায় প্রতি মাসেই পাটকলগুলোতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে'।

এই 'ভুয়া শ্রমিকের' কথা পূর্বতন পাটমন্ত্রীও স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি শুধু স্বীকারই করেন নাই, অনতিবিলম্বে উহাদের অপসারণের সঙ্কল্পও ঘোষণা করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেন নাই, একথা নিশ্চয়ই বলিব না। তাঁহারা চেষ্টা করিয়াও পরিস্থিতির চাপে সফল হইতে পারেন নাই, ইহাই আমরা ধরিয়া লইব। পাট দফতরের প্রতিমন্ত্রী অবশ্য সম্প্রতি আশার কথা শুনাইয়াছেন যে, পাটশিল্পে বর্তমানে কোন শ্রমিক সমস্যা নাই। কিন্তু তিনি কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে, ভুয়া শ্রমিক ঘটিত সমস্যারও অবসান হইয়াছে?

পাট-প্রতিমন্ত্রী পাটশিল্পকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিমুক্ত করার যে আহ্বান জানাইয়াছেন তাহা অত্যন্ত জরুরী আহ্বান। আর শুধু পাটশিল্পই নয়, সমস্ত জাতীয় শিল্পকে রাজনীতি মুক্ত করার অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানী ও জাপানের শ্রমিক শ্রেণী ও সর্বসাধারণ বহু বৎসর পর্যন্ত রাজনীতির হুজ্জত-হাঙ্গামা হইতে দূরে থাকিয়া দেশ পুন-র্গঠনে সাধ্যের অতিরিক্ত শ্রম দান করিয়াছিল বলিয়াই আজ সে সব দেশ বিশ্বে সর্বাধিক অর্থনৈতিক সাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী। আর আমরা কি করিতেছি? আমরা দাবি-দাওয়ার শ্লোগানেই মত্ত। কিন্তু আজ তিন বৎসরেও যে শিল্প উৎপাদনের মাত্রা ১৯৬৯-৭০ সালের স্তরে পৌছিতে পারিল না, বরং উহা ক্রমশঃ হ্রাসই পাইতেছে এবং শিল্প-কারখানাসমূহ লোকসানে লোকসানে রক্তশূন্য হইতে চলিয়াছে, সেইদিকে খেয়াল করি না। এইসব শিল্প একদা সম্পূর্ণই অচল হইয়া গেলে শ্রমজীবীরাই যে সবচেয়ে আগে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এটাও আমরা ভাবিয়া দেখি না।

'আমাদের দাবি মানতে হবে' তা বটেই। কিন্তু মুমূর্ষু জাতীয় শিল্পের বাঁচার দাবিটার কি? সে দাবি কে কানে তোলে? হাজার হাজার 'ভুয়া শ্রমিক' লইয়া আমরা অবিরাম পলিটিক্সের খেলা খেলিতেছি এবং অনেকে এই খেলায় নিজেদের আখের গোছাইয়া লইতেছি। কিন্তু এইভাবে আর কিছু-দিন চলিলে রাজনীতিসমেত সবকিছুই যে ভুয়া হইয়া পড়িবে এবং আমরা সকলেই এক অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইব, সেই নিদারুণ সত্য কথাটা কি একটিবারও ভাবিয়া দেখিতেছি?

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় নভেম্বর ১৯, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন হ্রাস, নিদারুণ আর্থিক সঙ্কট, অবিরাম-ভাবে লোকসান প্রভৃতি কারণে গত ১০ই ডিসেম্বর হইতে ডবু, রহমান জুট মিলে লে-অফ ঘোষিত হইয়াছে। মিলটি বন্ধ হওয়ায় তিন হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। সেই দিনেরই যশোহরের খবরে প্রকাশ, যশোহর খুলনার ১৭টি পাটকলের ব্রডলুম সেকশন বন্ধ করিয়া দেওয়ায় কয়েক হাজার শ্রমিক বেকার হইয়াছে। বাংলাদেশ চটকল শ্রমিক ফেডা-রেশনের মতে, গত নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই চটকলগুলির শতকরা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ভাগ তাঁত বন্ধ হইয়া গিয়াছে; পাট ও পাটের ব্যাচের অভাবে জানুয়ারী হইতে জুন নাগাদ দেশের অধিকাংশ পাটকল বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ১২ই ডিসেম্বর এক সহযোগী খবর দিয়াছেন যে, আমাদের পাটকলের উৎপাদিত জিনিস (বিশেষতঃ কার্পেট ব্যাকিং ও চট) বিদেশে বিক্রি না হওয়ায় ষাট-সত্তর কোটি টাকার মাল মিলসমূহের গুদামে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অপর এক সূত্রের খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন দেশের পাটকলসমূহকে হেসিয়ান ও কার্পেট ব্যাকিং-এর উৎপাদন 'সাংঘাতিকভাবে হ্রাস করার জন্য' নির্দেশ দিয়াছেন, কারণ বৈদে-শিক ক্রেতারা বাংলাদেশের এসব পাটজাত দ্রব্যের চেয়ে ভারতীয় দ্রব্য কিনিতেই অধিকতর আগ্রহী।

সরকার বা পাট-শিল্প সংস্থার পক্ষ হইতে এসব খবরের কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই। বরং সংস্থার চেয়ারম্যান ১৯৭৩-৭৪ সালের পারফর্মেন্স সম্পর্কে মাস তিনেক আগে যে তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতেও পাটশিল্পে চরম শোচনীয় অবস্থারই আভাস পাওয়া যায়। চেয়ারম্যান কিছু গোপন করার পরিবর্তে অতীব সত্যনিষ্ঠা সহকারে দেশের পাট শিল্পের

প্রকৃত চিত্রই তুলিয়া ধরিয়াছেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশের পাটকলসমূহের গ্রস লোকসান দাঁড়াইয়াছিল ৩৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ও নীট লোকসান ২২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯৭৪-৭৫ সালে নীট লোকসান শতকরা একশত ভাগও ছাড়াইয়া যাইবেই, এর পরও লসের পার্সেনটেজ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা বলার উপায় নাই। কারণ, পাটের দাম মণকরা একশত টাকার মধ্যে থাকিবে ইহা ধরিয়া লইয়া এবার ৪৩ কোটি টাকা লোকসান অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু পাটের দর ইতিমধ্যেই উহাকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কাজেই এবারকার লস ষাটের কোঠায় উঠাও বিচিত্র নয়। চেয়ারম্যান স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, 'প্রফিটেবিলিটির' দিক হইতে ১৯৭৪-৭৫ সালে পাট শিল্পের অবস্থা 'ভীতিপ্রদ'। চেয়ারম্যান আরও সাংঘাতিক কথা শোনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মিলসমূহের লিকুইডিটি বা ব্যাঙ্ক হইতে ধার করা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যে হারে মাসে মাসে উবিয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় 'আর কয়েক মাসের মধ্যেই ব্যাঙ্কের দেওয়া টাকার বৃহদাংশ ভাঙ্গিয়া খাওয়া শেষ হইবে এবং তাহার ফলে মিলসমূহ ও ব্যাঙ্কসমূহের জন্য এবং সম্ভবতঃ সামগ্রিকভাবে দেশের জন্যও গুরুতর অমঙ্গলজনক পরিণতি দেখা দিবে।'

চেয়ারম্যানের এই সকল উক্তি হইতেই সম্যক উপলব্ধি করা যায় যে, তিন বছরে বাংলাদেশের পাটশিল্প কি গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। চেয়ারম্যানের ভাষাতেই বলা যাইতে পারে যে, পাটশিল্প বাংলাদেশের অন্যতম শিল্প নয় বরং ইহাই বাংলাদেশের আসল শিল্প কিন্তু যেভাবে ইহার পুঁজি-পাটা ভাঙ্গিয়া খাওয়া চলিতেছে সেভাবে আর কিছুকাল চলিলে দেশের গোটা অর্থনীতিকে লইয়াই ইহা একদিন হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে। অবক্ষয় ও লস-লোকসান যে-হারে চলিতেছে তাহাতে আর কিছু ভরসাও পাওয়া যাইতেছে না।

অথচ আমাদের পাটশিল্প ভারতের পাটশিল্পের চেয়ে অনেক নতুন। মেশিনারী অনেক আধুনিক। আমাদের কাঁচাপাট পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট। এতদসত্ত্বেও ভারতের পাটশিল্প হেসিয়ানে টনপ্রতি প্রায় বার শ' টাকা ও স্যাকিংয়ে পাঁচ শ' টাকা লাভ করিতেছে। লাভ করিতেছে থাইল্যাণ্ড, বর্মা এবং অন্যান্য দেশের পাটশিল্পও। এমনকি সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়ে যাহারা আমাদের কাঁচাপাট কিনিয়া লইয়া যায় তাহারাও পাটশিল্পে প্রচুর লাভই করে---লোকসান দেয় না। পক্ষান্তরে এতসব সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমরা একটানা লস-ই দিতেছি। লসে লসে আমাদের পাটশিল্প আজ রক্তশূন্য। তাঁত তপ্রায় অর্ধেক বন্ধ হইয়াছেই, এখন পটাপট মিলের পর মিল লে-অফ হইতেছে। আমাদের ষাট-সত্তর কোটি টাকার পাটশিল্পজাত জিনিস গুদামে পড়িয়া থাকে---বিক্রি হয় না। একদা আমাদের পাটশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে অন্যরা হিমসিম খাইত। আজ আমরাই অপরের সহিত প্রতিযোগিতায় একটানা পিছু হটি। ভারত, বার্মা, থাইল্যাণ্ড কারো সঙ্গে কম্পিটিশনে আমরা টিকিতে পারি না। এর মাজেজাটা কি? সহযোগী 'সংবাদ' গত ১০ই ডিসেম্বর বাংলা ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে এক দীর্ঘ ডেসপাচে লিখিয়াছেন, ''পাট প্রসঙ্গে একথা এখন উভয়ের রেকর্ডে এসে গেছে যে, বাংলাদেশে উৎপাদিত পাটের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় ১৫ লাখ বেল পাচার হয়ে গেছে।'' স্বভাবতঃই পাচারকৃত পাটের পড়তা বেশী। আমাদের পাট স্মাগলিং-এর পথে বেশী দামে লইয়া গিয়াও তদ্দ্বারা হেসিয়ান ও কার্পেট ব্যাকিং তৈরী করিয়া অপরে প্রচুর লাভ করে। আর আমাদের পাটকলগুলি দেশের কাঁচামাল দ্বারা সেইসব জিনিস উৎপাদন করিয়া দুনিয়ার বাজারে বিক্রি করিতে পারে না। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার। আমাদের পাটশিল্পের উৎপাদিত কার্পেট ব্যাকিং-এর ৯৫ শতাংশ এবং হেসিয়ানের ৪০ শতাংশ একা আমেরিকা কিনিত। অধুনা সেই আমেরিকা আমাদের হেসিয়ান ও কার্পেট ব্যাকিং-এর পরিবর্তে ভারতীয় পাটকলের তৈরী হেসিয়ান ও ব্যাকিং কিনিতেছে। ইউরোপীয় ক্রেতারাও বাংলাদেশ ছাড়িয়া ভারতের দিকে ঝুঁকিতেছে। প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া আজ দুর্নীতি, অপচয়, অপরিণামদর্শিতা। আছে অবাস্তব প্ল্যান-পরিকল্পনার বিলাসিতা। আছে ভ্রান্ত পথ অনুসরণের একগুঁয়েমি। আছে আত্ম-সংশোধনের পরিবর্তে আত্ম-নিধনের উন্মত্ততা। আছে যে-কোন জিনিসকে লণ্ডভণ্ড করিয়া তোলার অদ্ভুত প্রতিভা ও পারদর্শিতা। বলা হইয়াছিল যে, পাটশিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ, কেমিক্যাল দ্রব্যাদি ও অন্যান্য অপরিহার্য সামগ্রী আমদানীর জন্য এই শিল্পের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা হইতে শতকরা ৫ ভাগ সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনকে সরাসরি ব্যবহারের অথরিটি দেওয়া হউক। কিন্তু অন্যান্য পণ্য রফতানীকারক শিল্পকে আমরা আমাদের চিরাচরিত বাজার হারাইতেছি।

এক্সপোর্ট পারফর্মেন্স লাইসেন্সের আকারে উহাদের জরুরী সামগ্রী আমদানীর সুযোগ দেওয়া হইলেও দেশের ৫৫ পার্সেন্ট বৈদেশিক মুদ্রা

অর্জনকারী শিল্প অর্থাৎ পাটশিল্পকে এই সুযোগটি দেওয়া হয় নাই। ফলে যন্ত্রাংশ ও অপরিহার্য জিনিসপত্রের অভাবে পাটশিল্পের কোটি কোটি টাকার উৎপাদনগত লোকসান হইতেছে। বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের দরুন ১৯৭২-৭৩ ও ৭৩-৭৪ সালে পাটশিল্পের উৎপাদনগত লোকসান হইয়াছে সাড়ে ২৮ কোটি টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালেও সেই ট্রাডিশন সমানেই চলিতেছে। পাটকল সংস্থা তাই প্রতিটি পাটকলের নিজস্ব স্ট্যাণ্ড-বাই জেনারেটর বসানোর জন্য ১৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ ২৫ কোটি টাকার একটি স্কীম সরকারের বিবেচনার্থ পেশ করিয়াছিলেন। সোয়া বৎসরেও সেই বিবেচনা শেষ হয় নাই। পাটশিল্পের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এই ধরনের আরও বেশ কিছু সাজেশন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেইগুলি গৃহীত হয় নাই।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় ডিসেম্বর ২২, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

বিজ্ঞ পাঠকদের কেহ কেহ আমাকে প্রশ্ন করেন : আজকাল আর আমি পাট সম্পর্কে লিখি না কেন? পাট প্রসঙ্গ কি তবে শেষ হইয়া গিয়াছে?

না, শেষ এখনও হয় নাই, তবে বোধ করি, হওয়ার বড় একটা বাকীও নাই। মাথা থাকিলে ত মাথা ব্যথা! মাথাই যদি না থাকে তবে আর মাথা ব্যথা কি? প্রায় অর্ধ-ডজন পাট-সংস্থা বানাইয়া এবং তাহাও যথেষ্ট না-হওয়ায় শেষ পর্যন্ত জুট ইন্টারন্যাশনাল সৃষ্টি করিয়া যে-ভাবে অবিরাম পাটের 'কল্যাণ' সাধন করা হইতেছে তাহাতে আমাদের স্বর্ণসূত্রের ভবিষ্যৎ লইয়া আর ভাবনা-চিন্তার কতটুকু অবকাশ আছে?

. . পাট উৎপাদনে পাটচাষীর অনীহার দরুন এবার পাটের আবাদ ও উৎপাদন সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পাইবে বলিয়া মাস ছয়-সাতেক পূর্বে যখন আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম জুট ডিভিশন তখন অনেক 'তথ্য-পরিসংখ্যান' দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, আমাদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অসার ও অমূলক। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, বন্যা ও অন্যান্য কারণে ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও উৎপাদন কোনক্রমেই ষাট লাখ বেলের কম হইবে না। কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই তাঁহারা স্বীকার করেন যে, ষাট লাখ বেল পাট উৎপন্ন হইবার আশা নাই, বড় জোর পঞ্চান্ন লাখ বেল উৎপাদিত হইতে পারে। পূর্ববর্তী বৎসরের 'মওজুদ স্টকের বাইশ লাখ বেল (?) পুড়িয়া তাঁহারা ১৯৭৩-৭৪ সালের পাটের য্যাভেলেইবিলিটি দেখান সাতাত্তর লাখ বেল। তন্মধ্যে ৩৩ লাখ বেল দেশীয় পাটকলসমূহে ব্যবহার করিয়া এবং ৩৩ লাখ বেল বিদেশে রফতানী করিয়া আগামী মওসুমের জন্য উদ্বৃত্ত থাকিবে অন্ততঃ সাড়ে নয় লাখ বেল। এই তাঁহাদের হিসাব।

পাট মন্ত্রণালয়ের এই হিসাবের নির্ভুলতা সম্পর্কেও আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল এবং এখনও আছে। আমাদের ধারণা সব মিলাইয়া এবারের মওসুমে উহার চেয়ে অন্ততঃ দশ লাখ বেল কম পাট পাওয়া গিয়াছে। আগুনে পুড়িয়া, নৌকাডুবি হইয়া, গুদামে পঁচিয়া অনেক পাট নষ্ট হয়। তাছাড়া চোরাই পথে প্রচুর পাট পাচার হইয়া যায়। সরকারী হিসাবে এইসব ক্ষয়-ক্ষতি ধরাই হয় নাই। যতদূর জানা যায়, সরকারের পাট-নীতি ঘোষণার ও সরকারী ক্রয় কেন্দ্র খোলার বিলম্বের দরুন মওসুমের প্রথম দিককার পাট (যাহাকে আষাঢ়ী পাট বলা হয়) বহুলাংশেই পাচার হইয়া গিয়াছে। কোন কোন সরকারী অফিসার চোরাচালান 'ডেডস্টপ' বলিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে চাহিলেও নতুন পাটমন্ত্রী উহার অস্তিত্ব কার্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন—অবশ্য পরিমাণ তিনি বলিতে পারেন না। আমরাও পাচারের প্রকৃত পরিমাণ বলিতে পারি না। তবে যতটা জানা গিয়াছে, পরিমাণটা বিরাট ও বিপুল এবং উহা ক্রমবর্ধমান।

বস্তুতঃ, প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে পাটের যতই 'বাম্পার ক্রপ' হইয়া থাকুক, নিশ্চয়ই উহা এত বেশী হয় নাই যে, দেশের বিপুলসংখ্যক পাট-কলের তিন শিফ্‌টে উৎপাদনের সাকুল্য চাহিদা মিটাইয়াও ভারত দশ লাখ বেল কাঁচাপাট বিদেশে রফতানী করিতে পারে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত শোনা যাইতেছিল যে, সে দেশে এবার ৭৫ লাখ বেল পাট উৎপন্ন হইবে। কিন্তু গত ১৫ই নভেম্বর 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে'র এক খবরে বলা হয় যে, 'সমস্ত চিরাচরিত সূত্র হইতে যত সরবরাহ আসিয়া জমিতেছে' তাহা যোগ করিয়া সে দেশে এবারকার কাঁচাপাটের মোট য্যাভেইলেবিলিটি দাঁড়াইবে প্রায় এক কোটি ৫ লক্ষ বেল। সেই 'চিরাচরিত সূত্র' ('ইউজুয়াল সোর্স') বলিতে কি বোঝান হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলার প্রয়োজন করে না। এর উপরও সেই দেশ আমাদের দেশ হইতে কাঁচাপাট কিনিতেছে। নয়াদিল্লীর ২৪শে ডিসেম্বরের খবরে প্রকাশ, চুক্তির পরিমাণের চেয়েও অতিরিক্ত পাট, মানে বার্ষিক আট-নয় লক্ষ বেল ও পাঁচ বৎসরে অন্ততঃ চল্লিশ লক্ষ বেল কাঁচাপাট এদেশ হইতে ক্রয় করিতে তাহারা আগ্রহশীল। দৃশ্যতঃ এসব বিষয় আলো-

চনার জন্যই আমাদের পাটমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল ২৬শে ডিসেম্বর নয়াদিল্লী গিয়াছেন।

..বিলাতের বিখ্যাত 'ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকাও গত মাসে লিখিয়াছেন যে, 'বাংলাদেশের পাটের উপর ভর করিয়াই ভারত কাঁচা পাট রফতানী করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। এমতাবস্থায় আমাদের পাট-রফতানীর নীতি পুনর্বিবেচনা করা উচিত নয় কি? কথায় বলে, আপন স্বার্থ পাগলেও বুঝে। আমরা কি আমাদের পাট সংক্রান্ত স্বার্থ সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন রহিয়াছি? আশা করি, আমাদের এই কথা হইতে কেহ 'ভারত-বিরোধিতার গন্ধ' আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু করিবেন না। ভারত-বিরোধিতার কোন প্রশ্নই নাই। ইহা একান্তই আপন জাতীয় স্বার্থের কথা। যার যার স্বার্থ তার তার দেখিতে হইবে। আমাদের পাটের চোরা-চালান বন্ধ করা যেমন আমাদের স্বার্থ, তেমনি আমাদের পাটের রি-এক্স-পোর্ট যাতে না হইতে পারে, সেটাও দেখা অপরিহার্য। আর সেই জাতীয় স্বার্থের তাগিদেই আমাদের পাটমন্ত্রী বলিয়াছেন, 'বিদেশে ভারতের কাঁচা-পাট রফতানীতে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন।'

..কাঁচাপাট ও খুচরা যন্ত্রাংশের দুষ্প্রাপ্যতা এবং পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের দরুন চলতি বছর ৭৭টি জুট মিল গড়ে তিন মাস বন্ধ থাকিবে'। কাঁচা-পাটের অভাবে বাংলাদেশে পাটকল বন্ধ থাকার আশঙ্কা ব্যাঙের সর্দি লাগা বা নিউক্যাসলে কয়লার অভাব পড়ার মতই শোনায় না কি? কিন্তু চটকল শ্রমিক ফেডারেশন একেবারে না-জানিয়া কথা বলিয়াছেন, এরূপ মনে করি-বারও কোন কারণ নাই। পাটের ব্যাপক চোরাচালান দৃষ্টে ইতিপূর্বেও কোন কোন বিশিষ্ট শ্রমিক-নেতা ও সংসদ্-সদস্য অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। সম্প্রতি এই মর্মে একাধিক খবর বাহির হইয়াছে যে, ইতিমধ্যেই কোন জুট মিলের স্টকে নাকি কয়েক সপ্তাহের বেশী 'খোরাকী' নাই।

..কয়েকটি বড় বড় মিলের উৎপাদন একেবারে বন্ধ। দুই-চারিটি মিল উৎপাদন হ্রাসের ধারা বন্ধ করিতে সক্ষম হইয়া থাকিলেও অন্যগুলির অবস্থা বড় শোচনীয়। মূলধনের অভাব, কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের অভাব, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি-বিভ্রাট, ভূয়া শ্রমিক সংখ্যার চাপ, শ্রম-অশান্তি, পরিচালনার ত্রুটি, দুর্নীতি, পরিবহণের অভাবে উৎপন্ন দ্রব্য যথাসময়ে রফতানী না-হওয়ায় কোটি কোটি টাকা ব্লক হইয়া থাকা, মাথাপিছু উৎপাদনের নিম্নগতি,

উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্যের বিরাট ব্যবধান—প্রভৃতি কারণে পাটকল-গুলির এই সূচনীয় অবস্থা চলিতেছে। কয়েকদিন আগে খবর বাহির হইয়াছে যে, পঞ্চাশ কোটি টাকা মূল্যের পাটজাত জিনিস সময়মত রফতানী না হওয়ায় গুদামে পড়িয়া রহিয়াছে। এদিকে টাকার অভাবে মিলগুলি জর্জরিত। পাট কেনার মত টাকা অনেক মিলের হাতে নাই। ব্যাঙ্ক হইতে ওডি'র পর ওডি লইয়া মজুরী-মায়না দিতে হইতেছে ও দৈনন্দিন কার্য চালাইতে হইতেছে। ব্যাঙ্কসমূহে পাটশিল্পের দেনার পরিমাণ শতেক কোটি টাকা। ইহার জন্য বার্ষিক সুদই দিতে হইতেছে আট-নয় কোটি টাকা। গত বছর পাটশিল্পের লোকসান দাঁড়াইয়াছিল অফিসিয়ালি সাড়ে পঁচিশ কোটি টাকা। এবার সংশ্লিষ্ট মহলের মতে ক্ষতি দাঁড়াইবে পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার উপর।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় ডিসেম্বর ২৪, ১৯৭৩

মঞ্চে-নেপথ্যে

২৭শে মে এফ. এ. ও-র এক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, উহার উদ্যোগে রোমে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক বৈঠকে ১৯৭৫-৭৬ সালের জন্য পাটের কোন 'নির্দেশক মূল্য' নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই। এফ. এ. ও. এই ব্যর্থতার তিনটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। তার একটা হইতেছে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির দরুন পাটের চেয়ে ধান চাষের দিকে কৃষকদের ঝোঁক বাড়িয়াছে। ফলে পাটের উৎপাদন গত মওসুমে শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

.. আসলে এটা রোম সম্মেলনের ব্যর্থতাজনিত হতাশাকে ঢাকা দেওয়া এবং নিজেদের মনকে কিঞ্চিৎ প্রবোধ দেওয়া। দুনিয়ার এত পাকা মাথা একত্রিত করিয়াও পাট মওসুমের শুরুতে যাহা করা গেল না, সাত মাস পরে ছিয়াত্তরের জানুয়ারীতে মওসুম যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন তাহা করা যাইতে পারিবে, তাহার ভরসা কি? আর তখন নির্দেশক মূল্য দিয়া লাভই বা কি?

..পাটকে আমাদের টিকাইয়া রাখিতে হইবে। পাট ও পাট জাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমাদের পজিশন শুধু রক্ষা নয়, পূর্বেকার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাও করিতে হইবে। পাটমন্ত্রী কয়েকদিন আগে বলিয়াছেন, 'সমস্যা এত প্রকট যে, ত্বরিত কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে জুন মাসের মাঝামাঝি তিনি নাকি

বিস্তারিত কিছু জানাইতে পারিবেন'। তা' তিনি বক্তব্য রাখিতে সময় নিন, আপত্তি নাই। কিন্তু অবস্থানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণে যেন তিনি এতটুকু বিলম্ব না করেন।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় জুন ৩, ১৯৭৫

মঞ্চে-নেপথ্যে

বাংলাদেশে 'বিজেইসি'ই কাঁচাপাটের একক এক্সপোর্টার। বাকী সবাই এজেন্ট, সাপ্লায়ার, যোগানদার। আগে কিন্তু এমন ছিল না। এই নব বিধান শুরু হইল ১৯৭২ সালের ১৯শে জুন— যেদিন 'পি. ও. ৫৭' জারি করিয়া 'বিজেইসি'কে [illegible]র কাঁচাপাট রফতানীর একমাত্র চ্যানেল বা চোঙ বানানো হইল। বেসরকারী ব্যবসায়িগণের ত দূরের কথা, সরকারী পাট সংস্থা কয়টিরও 'বিজেইসি'র চ্যানেল ছাড়া সরাসরি পাট রফতানী করার অধিকার থাকিল না। পরবর্তী এক অর্ডারে অবশ্য সরকারী পাট সংস্থাগুলি তাদের 'নিজস্ব মার্কায় বিনা প্রিমিয়ামে 'বিজেইসি'র মাধ্যমে বিদেশী ক্রেতাদের কাছে পাট বিক্রয়ের ব্যাপারে সরাসরি নিগোসিয়েশন বা যোগাযোগ করার' অধিকার পান। কিন্তু সেটাও 'বিজেইসি'র চোঙকে এড়াইয়া নয়। বেসরকারী ব্যবসায়ীদেরকে সেই সুযোগটুকুও দেওয়া হয় নাই। মাত্র গত ২০শে সেপ্টেম্বরের এক সিদ্ধান্তক্রমে নয়া সরকার বেসরকারী পাট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও সেই সুযোগ সম্প্রসারণ করেন। কিন্তু তবু স্মর্তব্য যে, গোকুলে-ব্রজে-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'পুরুষ'। বাকী সবাই নারী স্বভাবা। বাংলাদেশে পাট রফতানীকারক বলিতে এখনও একজনকেই বোঝায়। এবং তাঁর নাম 'বিজেইসি'।

সেই একক চ্যানেলের পারফমেন্স সম্পর্কে ইতিমধ্যে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই কলামে গত ২৫শে সেপ্টেম্বরের নিবন্ধে আমরাও কিছুটা আলোচনা করিয়াছি। নিবন্ধের একস্থলে বলিয়াছি, 'বস্তুতঃ অনেকেরই মতে বিজেইসি'র চ্যানেল বা চোঙের অবস্থা হইয়াছে সুঁচের ছিদ্রপথ দিয়া উষ্ট্রকে প্রবিষ্ট করানোর মতো এক অসাধ্য ব্যাপার।

..আমি লিখিয়াছিলাম, 'পাটের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে এত তীব্র প্রতিযোগিতা যে, প্রতিদিন দূরের কথা প্রতি ঘণ্টায় তার ভাও বদলায়।' ইহার জবাবে বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, 'আন্তর্জাতিক বাজারে ভাও কখনও ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলায় না'। দুঃখের বিষয়, আন্তর্জাতিক বাজার সন্ধান ও সংগ্রহে

বিজেইসি'র ভূমিকা অনুল্লেখযোগ্য। বাজার সন্ধানে যাঁহারা পারতপক্ষে বাহির হন না, তাঁহাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক বাজারের ভাও দ্রুত উঠা-নামার প্রকৃতি জানার কথা নয়। এবং সেজন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে একচেটিয়া রফতানীকারিক হওয়ার সুযোগ ডিসকাউন্ট প্রাইসে এমনকি গিভ এ্যাওয়ে প্রাইসে পাট বেচার অনন্য 'ঐতিহ্য' তাঁহারা অবশ্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। এবিষয়ে আমার নিবন্ধে মাত্র গোটা তিনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম। ১৯৭২ সালের এক ডিলে প্রতিটন পাট পাঁচ হইতে পনের পাউণ্ড কম দরে লাখ খানেক টন লণ্ডন মার্চেন্টদের কাছে বিক্রয় করা হয়। ১৯৭৩ সালে পুনরায় লণ্ডনস্থ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী লালচাঁদ সুরানা ও অন্যান্যের কাছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাট সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম রফতানী মূল্যের চেয়ে প্রতিটনে দুই পাউণ্ড কম দরে (যখন বিশ্ববাজারে দর ছিল ক্রমবর্ধমান) বিক্রি করা হয়। সে কথা সংসদীয় কমিটির রিপোর্টেও উল্লেখ করা হইয়াছে। আমার তৃতীয় দৃষ্টান্ত ছিল, গত জুলাইয়ে লণ্ডনস্থ দুইটি মাড়োয়ারী পার্টির কাছে সরকারের ন্যূনতম মূল্যের চেয়ে প্রতিটনে পাঁচ পাউণ্ড কম দরে (এবং আরও কতিপয় অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব সুবিধাদানের শর্তে) প্রায় তিন লক্ষ বেল পাট বিক্রির টাটকা ঘটনা—যাহার দরুন এখন আমাদের সরকারী বেসরকারী বিক্রেতাগণকে উক্ত 'মোস্ট ফেভার্ড' মাড়োয়ারী পার্টিদ্বয়ের আণ্ডার রাইটিং-এর আশঙ্কায় সদা ম্রিয়মাণ থাকিতে হইতেছে এবং কথা উঠিয়াছে যে, বিজেইসি'র উক্ত আত্মঘাতী চুক্তি বাতিল না করিলে অপরাপর আন্তর্জাতিক ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা ও নিগোসিয়েশনে সফল হওয়া সুকঠিন। কিন্তু এই দৃষ্টান্তত্রয়ই সব নয়—আরও আছে। আছে ১৯৭৪ সালে অদ্ভুত 'ডবল ক্রস' নামে এক অভিনব 'স্ট্যাণ্ডার্ড' সৃষ্টি করিয়া প্রচলিত দরের চেয়ে মণকরা প্রায় দশ টাকা করে তিন লক্ষ মণ পাট বিক্রির দৃষ্টান্ত।

পাট রফতানী জাতীয়করণের পর সব সার্ভের একক দায়িত্ব গ্রহণ করে বিজেইসি। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, ১৯৬৮-৬৯-এর তুলনায় বর্তমানে রফতানীকৃত পাটের নিকৃষ্ট মানগত ত্রুটির দরুন ক্লেইম দাঁড়াইতেছে চতুর্গুণ অর্থাৎ আগেকার ত্রিশ পঁয়ত্রিশ লক্ষ বেল বার্ষিক রফতানীর উপর গড়পড়তা আট নয় লাখ টাকার ক্লেইমের স্থলে এখন লাখ পনের বেলের জন্য ক্লেইম দাঁড়ায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। পাট প্রতিমন্ত্রীর মধ্যপ্রাচ্য সফরকালে তাঁহাকে ইরাক ও মিসরে যে পঁচা পাটের 'মণ্ড' নমুনাস্বরূপ দেখানো হয়, সেগুলিও বিজেইসি-রই 'চোঙে' প্রবাহিত সোনার বাংলার স্বর্ণসূত্র।

..জিজ্ঞাসা করি, গত জুলাইয়ে লণ্ডনে সুরানা শেঠিয়াদের কাছে সরকার বিঘোষিত '১৮০ পাউণ্ড দরের চেয়েও কম দরে পাট বিক্রির প্রস্তাবসহ উক্ত সংস্থারই পক্ষ হইতে জনৈক কর্মচারীকে কি লণ্ডন পাঠানো হয় নাই? তৎকালে ইউরোপে অবস্থানরত পাট মন্ত্রণালয়ের কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সুস্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও সেই অধস্তন অফিসার কোন্ অথরিটিতে সুরানা শেঠিয়াদের কাছে 'ডিসকাউন্ট সেলের' অফার দিয়াছিলেন? জিজ্ঞাসা করি, সরকার-নির্ধারিত ন্যূনতম রফতানী মূল্যের চেয়ে টনপ্রতি পাঁচ পাউণ্ড কম দরে ও কতিপয় অদ্ভুত শর্তে প্রায় তিন লাখ বেল পাট বিক্রির সেই বহু বিতর্কিত 'সুরানা শেঠিয়া বিজেইসি চুক্তিটি' কি সংশ্লিষ্ট অকর্তা ব্যক্তিদের দ্বারা সজ্ঞানে, সুস্থমস্তিষ্কে ঢাকাতেই স্বাক্ষরিত হয় নাই?

..আরও কথা আছে। অনেকের বিষয়ে অনেক কথা। আর সেগুলি যাঁদের কথা তাঁরাও বিলক্ষণ জানেন আলীবাবা নাটকে মর্জিনার সেই বিখ্যাত গানটি: 'এত্তা বড়া বাড়ীমে এত্তা জঞ্জাল।' কিন্তু এতো জঞ্জাল ঘাঁটায় আমার কোন স্পৃহা নাই।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় আশ্বিন ২৭, ১৩৮২

পাটের ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু—

পাট-প্রতিমন্ত্রী প্রায় এক মাসব্যাপী মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ সফরের পর দেশে ফিরিয়া বলিয়াছেন, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে বাংলাদেশের পাটের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, তবে পাটের মান উন্নয়ন ও সুষ্ঠু রফতানীর নিশ্চয়তা দিতে না-পারিলে এই সম্ভাবনা বিলীন হইয়া যাইবে। মন্ত্রী বলেন, "আমরা ভাল পাট উৎপাদন করিতে পারি,—বিদেশে এদিক দিয়া আমাদের পাটের যথেষ্ট সুনামও রহিয়াছে,—কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা ভাল ব্যবসায়ী নহি; ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের পাটের সমস্যা দেখা দিয়াছে"। ইরাকের পাট আমদানীকারকরা তাঁহাকে বাংলাদেশের রফতানীকৃত পাটের মধ্যে ভিজা পাট এবং এক গ্রেডের পাটের মধ্যে অন্য গ্রেডের পাট সরবরাহের নমুনা দেখাইয়াছেন— ইহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এক জিনিসের পরিবর্তে অন্য জিনিস দেওয়া সত্যই দুঃখজনক। দৃশ্যতঃ বিদেশে এই ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার দরুনই প্রতিমন্ত্রী দেশে ফিরিয়া সখেদে বলিয়াছেন, 'আমরা ভাল পাট উৎপাদন করি বটে, কিন্তু ভাল ব্যবসা জানি না'। অথচ আমরা বরাবর জানিতাম, আমরা আর কিছু ভালোভাবে জানি বা না-জানি, পাটের ব্যবসাটা জানি।

আমাদের মনে পড়ে, পূর্বতন একজন পাটমন্ত্রী যখন বিলাতে গিয়াছিলেন তখন তাঁর সম্বর্ধনা সভায় বৃটিশ পাট সমিতির সভাপতি তাঁর মুখের উপর বলিয়াছিলেন যে, বাংলাদেশের পাট রফতানীকারক সংস্থার 'দন্তোদ্গমে বড়-বেশী সময় লাগিয়া যাইতেছে'। বৃটেন এবং অন্যান্য বৈদেশিক ক্রেতা মহল হইতে এরূপ অভিযোগও উত্থাপিত হইয়াছে যে, তাঁহারা বাংলাদেশের পাটসংস্থার কাছে বিজনেস ইন্‌কোয়ারি করিয়া যথাসময়ে জবাব পান না এবং পাট কিনিয়া সময়মত তাহার ডেলিভারি পান না। এবার পাট প্রতিমন্ত্রী নিজেই দেখিয়া আসিলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ভিজা এবং নিম্নমানের পাটও রফতানী করা হয়।

পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রফতানী ব্যবসা বাংলাদেশে সম্পূর্ণরূপেই রাষ্ট্রায়ত্ত। পূর্বে যখন প্রাইভেট ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে রফতানী করিতেন তখন না-হয় বলা যাইত যে, তাঁহারা বেশী মুনাফার আশায় এসব ফাঁকি-ঝুঁকি ও ফের-চক্কর করেন। কিন্তু এখন যখন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের হাতেই রফতানীর সম্পূর্ণ মনোপলি তখন ত ফাঁকি-ঝুঁকির কোন প্রশ্ন উঠে না। তবে কেন এখন ভিজা পাট সরবরাহ এবং ভাল পাটের মধ্যে নিম্নমানের পাট ভেজাল দেওয়ার লজ্জাজনক অভিযোগ উঠে? সরকারী পাট সংস্থাসমূহের কর্মচারীর অভাব নাই। তবু কেন অভিযোগ উঠে যে বিদেশী ক্রেতামহল যথাসময়ে তাঁহাদের ইন্‌কোয়ারির উত্তর পান না? দন্তোদ্গমে আর কত সময় লাগিবে?

এফ. এ. ও-র রিপোর্টে জানা যায়, আমাদের পাট উৎপাদন এবং পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রফতানী নিম্নমুখী। পক্ষান্তরে ভারতের উৎপাদন ও রফতানী উভয়ই উর্ধ্বমুখী। আমাদের পাটের মান উন্নততর হওয়া সত্ত্বেও কেন আমরা কেবলই মার খাইতেছি? সমস্যার আসল গিঁঠ টা কোথায়? আমাদের চিরাচরিত বাজার অপরে অধিকার করিয়া নেয়, আর আমরা ক্রমাগত পিছু হটিয়া আসি, এর কারণ কি? তবে কি আন্তর্জাতিক বাজারের সহিত আমাদের যোগাযোগে আগ্রহ ও তৎপরতার কোন অভাব ঘটিয়াছে? প্রতিযোগীদের সহিত ব্যবসাদারী কৌশলে আমরা কি হারিয়া যাইতেছি? পাট ও পাটজাত দ্রব্য আমাদের সর্বপ্রধান রফতানী পণ্য। কাজেই আমাদের জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই এই বিষয়গুলির বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা হওয়া দরকার।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় বৈশাখ ১৬, ১৩৮২

চামড়া ও চা

চামড়াজাত শিল্পে সংকট

দেশের সমৃদ্ধ চামড়াজাত শিল্প বর্তমানে চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল, খুচরা যন্ত্রপাতির অভাবে এবং অন্যান্য সমস্যার দরুন দেশের অনেকগুলো চামড়াজাত শিল্প-কারখানা ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বিপুল পরিমাণ দক্ষ কারিগরের জীবনে বেকারত্বের অভিশাপ নেমে এসেছে। যে সব কারখানা কোনোমতে এখনো অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে সেগুলোর অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। এক খবরে জানা গেছে, একমাত্র ঢাকা শহরেই বন্ধ হয়ে যাওয়া জুতার কারখানার হার শতকরা আশি ভাগ। বাকী কুড়ি ভাগের অবস্থাও নাকি বন্ধ হওয়ার মতো।

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ৪, ১৯৭২

পরিকল্পনা নাই, তাই রফতানীও নাই
শতকরা ৮০টি চা বাগান বন্ধ হইবার পথে
চলতি মাসে চায়ের উৎপাদন ২২ লক্ষ
পাউণ্ড হ্রাসের আশংকা

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সুযোগ্য পরিচালনার অভাবে বাংলাদেশের চা-শিল্প এক নিদারুণ সংকটের মধ্যে পতিত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২৭, ১৯৭২

সিলেটের ১২টি বন্ধ চা-বাগানের ৭ হাজার কর্মচারীর চরম দুর্দশা

স্বাধীনতার পর হইতে বন্ধ হইয়া পড়া সিলেটের ১২টি চা বাগানের ৭ হাজার কর্মচারী চরম অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে কাল কাটাইতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জুলাই ১৮, ১৯৭৩

শীঘ্রই কর্পোরেশন গঠন—
চা শিল্পে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা লোকসান

পরিত্যক্ত চা-বাগানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নততর ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার শীঘ্রই একটি চা কর্পোরেশন গঠন করিবেন বলিয়া গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় সরকারীসূত্রে বলা হয়।

বর্তমানে চা-শিল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির হাতে ন্যস্ত ৪০টি চা-বাগান 'রুগ্ন' দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। জনৈক সরকারী কর্মকর্তা অকপটে স্বীকার করেন যে, 'অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকেই যাইতেছে' এবং চা-শিল্পে ব্যবস্থাপনা কমিটি গত ৩১শে জুনে সমাপ্ত ১ বৎসরে প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, সরকার নিজের হাতে তুলিয়া নওয়ার পূর্বে সবগুলি বাগানই ভাল মুনাফা অর্জন করিতেছিল।

—ইত্তেফাক আগস্ট ৩, ১৯৭৩

চর্ম শিল্পের কর্ম শেষ

বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ক্ষেত্রে পাটের পরেই চামড়ার স্থান হইলেও সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনে অব্যবস্থা, অনিয়ম ও খামখেয়ালীর ফলে আজ বাংলাদেশের চর্মশিল্প এক মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে।

অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে যে, কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল ট্যানারীর প্রায় দেড় কোটি টাকার চামড়া ও দিলখুশা ট্যানারীর প্রায় ১ কোটি টাকার চামড়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, দেশে বর্তমানে ছোট বড় প্রায় ২ শত ট্যানারী রহিয়াছে তন্মধ্যে ১ শত ২৫টি ট্যানারী সরকার অনুমোদিত।

স্বাধীনতাত্তোরকালে দেশের বৃহৎ ৩০টি পরিত্যক্ত ট্যানারী সরকারের অধীনে আনয়ন করা হয় এবং এই ৩০টি ট্যানারী সমন্বয়ে "বাংলাদেশ ট্যানারীজ কর্পোরেশন" নামক একটি সংস্থা গঠন করা হয়।

আলোচ্য ৩০টি ট্যানারীর মধ্যে ৬টি ট্যানারী স্বাধীনতার পূর্বেই বন্ধ ছিল কিন্তু কর্পোরেশন গঠন করার পরও উক্ত ৬টি ট্যানারী চালু করার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। অভিজ্ঞ মহলসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ট্যানারীগুলি সঠিকভাবে চালু করা হইলে প্রতি বৎসর ৪০।৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

অথচ কর্পোরেশন নিয়মিত আলোচ্য ৩০টি ট্যানারী সুষ্ঠুভাবে চালু করা ত দূরের কথা বর্তমানে ট্যানারীসমূহে যে কাঁচা চামড়া ও 'ব্লু' রহিয়াছে, উহার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিও কর্তৃপক্ষ নজর দিতেছেন না। ফলে ন্যাশনাল ও দিলখুশা ট্যানারীর প্রায় আড়াই কোটি টাকার চামড়া

নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে যে, বিদেশে চামড়া বিক্রয়ের ব্যাপারেও নানারকম অসদুপায় অবলম্বন করা হইতেছে।

প্রকাশ, ইতিপূর্বে ট্যানারীজ কর্পোরেশন বাংলাদেশ ক্রোম ট্যানারী হইতে ৬০ হাজার বকরীর চামড়া প্রতিটি মাত্র ৮৭ পেন্স দরে বিক্রয় করিয়াছে। অর্থাৎ প্রতিটি চামড়ার মূল্য পড়িয়াছে ১৩।১৪ টাকার মত। পক্ষান্তরে কর্পোরেশন আলোচ্য বকরীর চামড়া কাঁচা অবস্থায় প্রতিটি গড়ে ২২ টাকায় ক্রয় করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

দফতর 'ডেকোরেশন' ব্যয় ৫ লক্ষ টাকা

এদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা গচচা দিলেও দপ্তর 'ডেকোরেশন' এর ব্যাপারে ট্যানারীজ কর্পোরেশন বোধ হয় সকল সংস্থাকে 'টেক্কা' দিয়াছে। প্রকাশ, ভাড়া করা ভবনে কর্পোরেশনের সদর দফতর স্থাপন করা হইলেও সুদৃশ্য পারটেক্স, হার্ডবোর্ড, কাঠ ইত্যাদি দিয়া বহু মনোরম 'কেবিন' ও আরামপ্রদ এবং সুদৃশ্য আসবাবপত্র তৈয়ার করিতে নাকি কর্পোরেশন 'মাত্র' ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে।

অপরদিকে কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের আক্ষেপ যে, প্রচুর পরিচালন তহবিল না থাকায় সুষ্ঠুভাবে ইহার কাজকর্ম চালনা হইতেছে না।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২১, ১৯৭৩

কোরবানীর পশুর চামড়া কেলেঙ্কারী

ট্যানারীজ কর্পোরেশনকে জবাব দিতে হবে

ট্যানারীজ কর্পোরেশনের কিছু লোক ও তাদের নিয়োজিত ফড়িয়ারাই এবার কোরবানীর পশুর চামড়া কেলেঙ্কারীর জন্য দায়ী বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল অভিমত প্রকাশ করেছেন। কর্পোরেশন যে দামে চামড়া কেনার জন্য দর বেঁধে দিয়েছিলেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ফড়িয়ারা সে দামে চামড়া কিনলে তাদের আকাঙ্ক্ষিত মুনাফা টেকে না। সে জন্য তারা সুপরিকল্পিতভাবে চামড়া সংগ্রহে অনিচ্ছা দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা থেকে দেশকে বঞ্চিত করেছে।

কর্পোরেশন তাদের নির্ধারিত হারে গরুর চামড়া গড়ে ২০ থেকে ২৫ টাকা এবং খাসীর চামড়া ১২ থেকে ১৫ টাকায় ক্রয় করেছেন। তারা প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়া এক টাকা হারে এবং খাসীর চামড়া ৫ টাকা

হারে ফড়িয়াদের কাছ থেকে কিনেছেন। কর্পোরেশনের হারে ২০ থেকে ২৫ টাকায় গরুর চামড়া সরবরাহ করে ফড়িয়া ও এজেন্টরা খুব বেশী মুনাফা দেখছিল না। তাই তারা পানির দরে ২ থেকে ৩ টাকায় চামড়া কিনে কর্পোরেশনকে ২০ থেকে ২৫ টাকায় সরবরাহ করেছে। এই কারণেই তারা গ্রামাঞ্চল থেকে চামড়া সংগ্রহ করতে খুব একটা উৎসাহ দেখায়নি।

কেউ কেউ লবণের দুষ্প্রাপ্যতার অজুহাত তুলেছেন। কিন্তু আসলে কোরবানী উপলক্ষে চামড়ার জন্য কর্পোরেশনকে পর্যাপ্ত লবণ সরকার সময়মত সরবরাহ করেছিলেন। অভিজ্ঞ মহলের মতে, লবণসংক্রান্ত কারণে চামড়ার এই কেলেঙ্কারী হয়নি।

চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং কুমিল্লা জেলা থেকে চামড়া ক্রয় করার জন্য ট্যানারীজ কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক দফতরকে ১২ লাখ টাকা দেয়া হয়েছিল। শুধু চট্টগ্রাম জেলার জন্য এই টাকার বরাদ্দ ছিল সাড়ে চার লাখ।

কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম জেলা থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা মূল্যের চামড়া মাত্র গতকাল নাগাদ কেনা শেষ হয়েছে। মোট ২০ থেকে ৩০ হাজার খণ্ড চামড়া চট্টগ্রাম জেলা থেকে ঐ টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে।

নোয়াখালী ও কুমিল্লা থেকে এখনও চামড়া কেনা শেষ হয়নি বলে জানা গেছে। যাঁরা কিনতে গেছেন তারা কেউ ফেরত আসেননি। বরং সেখান থেকে তাঁরা খবর পাঠিয়েছেন যে, চামড়ার দর বেশী। কর্পোরেশনের নির্ধারিত মূল্যে চামড়া কেনা যাচ্ছে না। তাদের মতে খাসীর চামড়া প্রতিবর্গ ফুট ৫ টাকার বদলে ৬ টাকা ও গরুর চামড়া ১ টাকার স্থলে ২ টাকার কমে পাওয়া যাচ্ছে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, দেশে সর্বত্র এবার যে দরে কোরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি হয়েছে তাতে কর্পোরেশনের নির্ধারিত দর ও ফড়িয়াদের দাবি কোন্‌টা সত্য সেটাই এখন যাচাই করে দেখার বিষয়। তাদের সৃষ্ট এই কেলেঙ্কারীর জন্য শুধু লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রাই হারাতে হয়নি বরং কোরবানীর চামড়া বিক্রয়লব্ধ পয়সা যে গরীবদের পাওয়ার কথা ছিল তাও তাঁরা পাননি।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল এই কেলেঙ্কারীকে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন। এই অবস্থায় ট্যানারীজ কর্পোরেশন কে এবারের কোরবানীর চামড়া ক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা উচিত বলে কোন মহল মনে করেন। কত টাকার চামড়া ও কি হারে চামড়া কেনা হয়েছে এটা প্রকাশ করা হলে ফড়িয়াদের স্বার্থান্বেষী চক্রান্ত ফাঁস হয়ে পড়বে বলে তারা নিশ্চিত। এ ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্তের জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে উক্ত মহল মনে করেন।

যথা সময়ে লবণ সরবরাহ করা হলেও এর ধুয়া তুলে দেশকে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবশ্যই খুঁজে বের করে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে।

—পূর্বদেশ জানুয়ারী ৩, ১৯৭৪

চামড়ার দাম পঞ্চাশ পয়সা

সাতকানিয়াসহ মহকুমার সর্বত্র পবিত্র ইদ্‌জ্জোহা উদ্‌যাপিত হয়েছে। অনেকে এবার কোরবানী দেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে বলে এবার কোরবানীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

কোরবানীর পশুর চামড়া খুবই অল্প মূল্যে বিক্রি হয়েছে। গরুর চামড়া পঞ্চাশ পয়সা থেকে পাঁচ টাকা, ছাগলের চামড়া পঁচাত্তর পয়সা থেকে চার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে।

লবণের উচ্চ দাম হওয়ার কারণেই এবারে চামড়ার দাম কমেছে।

হবিগঞ্জ থেকে পূর্বদেশ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ঈদের দিনে হবিগঞ্জ মহকুমায় কয়েক হাজার গরু জবাই করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোর চামড়া কেউ কিনছেন না। এমন কি বিনামূল্যেও নিতে রাযী হচ্ছে না।

কারণ হিসাবে জানা গেছে, গরুর চামড়া শুকাতে প্রচুর লবণের প্রয়োজন হয়।

—পূর্বদেশ জানুয়ারী ৩, ১৯৭৪

সিলেটের চা-বাগান হইতে ৩৩ হাজার টাকা লুট
আরও একটি পাটগুদামে অগ্নিকাণ্ড

গত শনিবার নারায়ণগঞ্জ হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, গত শুক্রবার রাত্রে আরও একটি পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ৫ হাজার টাকা মূল্যের পাট ভস্মীভূত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৮, ১৯৭৪

৩৪টি চা-বাগানে উৎপাদন বন্ধ

আর্থিক সাহায্য ও সরকারী আনুকূল্যের অভাবে এ পর্যন্ত মোট ৩৪টি চা-বাগানে উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকার ফলে ২৫ সহস্রাধিক চা শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং দেশ কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

—ইত্তেফাক মার্চ ৪, ১৯৭৪

বাংলাদেশের বৃহত্তম ট্যানারীর এই দশা কেন?

১২ একর জমির উপর অবস্থিত বাংলাদেশের বৃহত্তম ট্যানারী 'ময়মনসিং ট্যানারী' বর্তমানে বন্ধ হওয়ার পথে।

—ইত্তেফাক মে ২৭, ১৯৭৪

চামড়া শিল্পকে রসাতলে পাঠানোর ষড়যন্ত্র

দেশের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ চামড়াশিল্প আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এক শ্রেণীর আমলা মুষ্টিমেয় গণস্বার্থবিরোধী লোক এবং কর্তৃপক্ষের ভ্রান্ত নীতির ফলে এই অর্থকরী সম্পদ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ফসল হলো পাট। পাটের পর পরই চামড়া হলো আমাদের দ্বিতীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ। সেই চামড়া শিল্পের সংকটের কারণে তৈরীকৃত জিনিসের মূল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে চামড়ার জিনিসপত্র সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। চামড়া শিল্পকে সংকটের মুখে ঠেলে দেয়ার পেছনে এক গোপন হাত সক্রিয় রয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য মহল জানিয়েছেন।

—সোনার বাংলা জুন ২, ১৯৭৪

চামড়া শিল্পে সঙ্কট সৃষ্টির মূলে কারা?
চট্টগ্রামের ২০০ চামড়া কারখানা বন্ধ
লাইসেন্স বণ্টনে দুর্নীতির জের

—গণকণ্ঠ জুন ১০, ১৯৭৪

লবণ সংকট: চামড়া পাচার: ২০ লাখ চামড়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত: এবার কি গায়ের চামড়া খুলে লবণ লাগাতে হবে?

দেশে বর্তমানে তীব্র লবণ সংকট চলছে। লবণ সংকটের ফলে দেশের চর্মশিল্প প্রায় ধ্বংস হতে চলছে। প্রকাশ, ইতিমধ্যে অনেক ট্যানারী বন্ধ হবার পথে। ট্যানারীগুলো ধ্বংস হবার সাথে সাথে হাজার হাজার ট্যানারী শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছে এবং এ সুযোগে চামড়ার চোরাচালানী দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

—সোনার বাংলা নভেম্বর ২৪, ১৯৭৪

২৫ হাজার টাকার চামড়া ধলেশ্বরী নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে: হাজার হাজার টাকার চামড়া নষ্ট হয়ে গেছে

অভিযোগে প্রকাশ, দেশব্যাপী লবণের অগ্নিমূল্য ও দুষ্প্রাপ্যতার দরুন পাবনার চামড়া ক্রয় কেন্দ্রগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ চামড়া ক্রয় করতে পারছে না। অপরদিকে পাবনা, ঈশ্বরদি, চাটমহর ও ভেড়ামারা থেকে যে সকল চামড়া ক্রয় করা হয়েছিল, লবণের অভাবে তা পঁচে নষ্ট হয়ে গেছে।

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২৮, ১৯৭৪

মাসে তিন লাখ টাকা লোকসান

প্রয়োজনীয় লবণের অভাবে গত দু'মাসে পাবনায় তিনটি চামড়া ক্রয় কেন্দ্রে তিন লাখ টাকা লোকসান হয়েছে বলে জানা গেছে।

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২৮, ১৯৭৪

চামড়া ত আর বাঁচে না

চামড়া ত আর বাঁচে না। রফতানী কমিতে কমিতে এমন এক পর্যায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে যে, চলতি অর্থ বৎসরে অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হিসাবে চামড়াকে চিহ্নিত করা যাইবে কিনা বলা মুশকিল। ১৯৭৪-৭৫ বাণিজ্য মওসুমের জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত কাঁচা চামড়া রফতানী হইয়াছে ২২ লক্ষ ২ হাজার ৫৩৮ টাকার। এই হিসাব পাওয়া গিয়াছে রফতানী উন্নয়ন ব্যুরোর সূত্র হইতে। হাইড এণ্ড স্কীনে রফতানীর পরিমাণ ১৯৭৩-৭৪ সনে ছিল ১ কোটি ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৩৮ টাকা।

—ইত্তেফাক মার্চ ৬, ১৯৭৫

কয়েক কোটি টাকার কাঁচা চামড়া নষ্ট হইয়াছে

লবণের অভাবে এবারের কোরবানীর পশুর চামড়া নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কাঁচা চামড়াকে পাকা করিবার জন্য লবণের প্রয়োজন। কিন্তু লবণ ১০ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। এই যখন অবস্থা তখন চামড়া ব্যবসায়ীরা চামড়া কিনিতে দ্বিধা করিয়াছেন। প্রকাশ, গ্রামাঞ্চলে লবণের উচ্চমূল্যের কারণে কোরবানীর পশুর চামড়া এবার পানির দরে বিক্রয় হইয়াছে। ১টি গরুর চামড়াকে পাকা করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ৪ হইতে ৫ সের ও ১টি ছাগলের চামড়ার জন্য ৩ পোয়া হইতে ১ সের লবণের প্রয়োজন হয়। এই অনুপাতে ১টি গরুর চামড়া পাকা করার প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু লবণ খরচই লাগে ৬০ হইতে ৭৫ টাকা এবং ১টি ছাগলের চামড়া সোয়া ১১ হইতে ১৫ টাকা। ফলে কোন ফড়িয়াই এবার চামড়া ক্রয় করিতে সাহস পাইতেছে না। গ্রামাঞ্চলে অধিক সংখ্যক চামড়াই আজও গৃহস্থের নিকট পড়িয়া রহিয়াছে এবং নষ্ট হইবার পথে।

সীমান্ত এলাকায় এই সুযোগে চামড়ার চোরাচালান জোরদার হইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে হাজার হাজার চামড়া নাকি পাচার হইয়াও গিয়াছে।

চট্টগ্রাম অফিস হইতে ইত্তেফাকের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত খবরে প্রকাশ, এবার কোরবানীর গরু-ছাগলের চামড়া ক্রয়ের ব্যাপারে ট্যানারী-সমূহ ব্যবস্থা গ্রহণ না-করার ফলে চট্টগ্রামে কয়েক কোটি টাকার কাঁচা চামড়া সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ট্যানারীসমূহের অবহেলায় এই বিপুল পরিমাণ চামড়া সংগ্রহ ও বিক্রয় করা হয় নাই। ফলে আগামী বৎসর চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের রপ্তানি ব্যাহত হইবে। উল্লেখযোগ্য যে, পাট ও চায়ের পর চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

—ইত্তেফাক মার্চ ৬, ১৯৭৫

সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় মতামত

চামড়া তো আর বাঁচে না—(১)

চামড়া ত আর বাঁচেনা! রফ্তানী কমিতে কমিতে এমন এক পর্যায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে যে, চলতি অর্থ বৎসরে অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হিসাবে চামড়াকে চিহ্নিত করা যাইবে কি-না বলা মুশকিল। ১৯৭৪-৭৫ বাণিজ্য মওসুমের জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত কাঁচা চামড়া রফতানী হইয়াছে ২২ লক্ষ ২ হাজার ৫৩৮ টাকার। এই হিসাব পাওয়া গিয়াছে রফতানী উন্নয়ন ব্যুরোর সূত্র হইতে। হাইড এন্ড স্কীনের রফতানীর পরিমাণ ১৯৭৩-৭৪ সনে ছিল ১ কোটি ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৩৪ টাকা। সাধারণতঃ জুলাই হইতে ডিসেম্বর এই সময়টাতেই চামড়া বেশী সংগৃহীত হয়। কারণ, সময়টা থাকে শুকনা। বর্ষার সময়ে চামড়া সংগ্রহ করা একটু মুশকিল। তাছাড়া এবার কোরবানীর ঈদও এই সময়ের মধ্যেই অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই ঈদে চামড়া সংগ্রহের পরিমাণও অত্যন্ত কম। অতএব, রফতানীর পরিমাণ যে খুব একটা বাড়িবে তাহা বলা যায় না। ট্যানারীজ কর্পোরেশন এবং প্রাইভেট এক্সপোর্টার সবাই নিজ নিজ সমস্যা লইয়া তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়াছেন। কর্পোরেশন যে লোকসান দিয়াই চলিয়াছে তাহা স্বীকার করিয়াছেন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সাহেব স্বয়ং। আর প্রাইভেট চামড়া রফতানীকারকদেরও দাবি চামড়া ব্যবসায় বড় লোকসান হইতেছে—সরকার কিছু সুবিধা-টুবিধা না দিলে ব্যবসা ডকে উঠিবে।

...এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় চামড়ার এ দশা হইল কেন? বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হিসাবে চামড়ার স্থান ছিল দ্বিতীয়। এখন প্রাইভেট রফতানীকারকদের পাশাপাশি আছে সরকার পরিচালিত কর্পোরেশন। তবুও কেন চামড়ার এই দুরবস্থা?

রফতানীযোগ্য চামড়া বিভিন্ন ধরনের। এক নম্বর, দুই নম্বর, তিন নম্বর, চার নম্বর হিসাবে চামড়ার নাম্বারিং হয়। সবচেয়ে ভাল চামড়া এক নম্বর—পরেরটি দুই নম্বর—এইভাবেই সিরিয়াল। চামড়া বাচাই করিয়া মান নির্ধারণ করা হয়। রফতানীর চামড়ার হিসাব হয় ফুট হিসাবে। আন্তর্জাতিক বাজারে এই দর ওঠানামা করে। বর্তমানে প্রতিফুট ছাগলের চামড়ার রফতানী মূল্য সর্বোচ্চ ৩৩।৩৪ পেন্স। অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ৬ টাকা ৩৯ পয়সা। প্রতি ফুটে কমিশন শতকরা ৩ ভাগ অর্থাৎ ১৯ পয়সার মত। এই কমিশন বাদ দিলে প্রতি ফুট চামড়ার রফতানী মূল্য দাঁড়ায় ৬ টাকা

২০ পয়সা। সাড়ে তিন ফুট মাপের চামড়ার রফতানীর দর ২১ টাকা ৭০ পয়সা।

বেসরকারী চামড়া রফতানীকারকদের রফতানীযোগ্য চামড়ার জন্য যে খরচ পড়ে কর্পোরেশনের খরচ পড়ে তার চাইতে বেশী। এখন বেসরকারী চামড়া রফতানীকারকদের হিসাবটি তুলিয়া ধরা যাক। বর্তমানে ঢাকায় একটি ছাগলের চামড়ার দাম ১৯ টাকা হইতে ২৫ টাকা। বাচাই করা, পাকাই করা ইত্যাদি মিলাইয়া খরচ পড়ে গড়ে ২৮ টাকার মত। অতএব প্রতি সাড়ে তিন ফুট চামড়ায় রফতানীকারককে লোকসান দিতে হইবে ৮ টাকা ৩০ পয়সার মত। প্রাইভেট ট্যানারী অপেক্ষা কর্পোরেশনের খরচ বেশী। কারণ কর্পোরেশনের লোকজন বেশী—খরচপাতিও বেশী। একটি সাড়ে তিন ফুট চামড়ায় প্রাইভেট এক্সপোর্টারদের চাইতে অন্ততঃ দেড় টাকা হইতে দুই টাকা বেশী খরচ পড়ে।

...আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়া আমদানীকারক দেশগুলির মধ্যে রহিয়াছে পশ্চিম জার্মানী, ইটালী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং রাশিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়াসহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ। বাংলাদেশ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাঁচা চামড়া রফতানী করে ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ।

ইহা ছাড়া কাঁচা চামড়া রফতানীকারকদের দেশগুলির মধ্যে রহিয়াছে মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, সৌদী আরব, মিসর এই সমস্ত আরব-দেশ। সাধারণ নিয়মে উন্নয়নশীল দেশ হইতেই আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা চামড়া আসে এবং ক্রেতা হয় উন্নত দেশগুলিই।

এখন প্রশ্ন থাকে, রফতানী মূল্য কম হইলে ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় চালাইতেছে কিভাবে? সত্যই কি চামড়ার ব্যবসায়ে লোকসান হয়? দেশীয় বাজারে যদি চামড়া ক্রয় হ্রাস পায় তাহাহইলে এত চামড়া যাইতেছে কোথায়? এত দাম দিয়া চামড়া কিনিতেছে কেন ব্যবসায়ীরা? বাংলাদেশের এক শত টাকার মূল্য যদি অন্য কোন দেশের ৩৭ টাকার সমান হয় তাহা-হইলে বাংলাদেশের ৩০ টাকায় একটি সাড়ে তিন ফুটের ছাগলের চামড়াও সাড়ে তিন টাকা লাভ আনিয়া দিতে পারে। এ রকম ক্রেতার অভাব নাই। লবণের সাম্প্রতিক সঙ্কটে যখন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের চামড়া ক্রয়ে কিছুটা

ইতস্তত: ভাব ছিল তখন এই ধরনের ক্রেতারা জলের দামেও চামড়া কিনিয়াছে।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় মার্চ ৬, ১৯৭৪

চামড়া তো আর বাঁচে না—(২)

স্বাভাবিকভাবেই কেমিক্যাল গ্র্যাকারেরা এক নম্বরের চামড়ার সহিত কমদরের চামড়া মিলাইয়া মার্কেটে ছাড়িয়া দেওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের ফাঁকি-ঝুঁকি চালাইয়া নিজেদের বিজনেসের মুনাফা টিকাইয়া রাখিয়াছেন। আর ট্যানারীজ কর্পোরেশনের অবস্থা হইয়াছে আরও করুণ। এমনিতেই এই কর্পোরেশনটি সবচেয়ে ছোট। তদুপরি ঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত লইতে না পারার ফলে ব্যাঙ্কে ওভার ড্রাফটের পাহাড় জমিয়াছে আর গুদামগুলি বোঝাই হইয়াছে খারাপ চামড়ায়। ঢাকায় কর্পোরেশনের গুদামের সংখ্যা ১৭টি এবং চট্টগ্রামে ৭টি। সবগুলি গুদামেরই এই দশা।

গত কোরবানীর ঈদের সময় কর্পোরেশন চামড়া কেনার ব্যাপারে দারুণভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন।

ঈদের দিনে সাধারণত: দুপুর দুইটা-আড়াইটা হইতেই মার্কেটে চামড়া আসতে শুরু করে। এবারও সে-রকমই হইয়াছিল। ঢাকায় চামড়ার মার্কেট পোস্তায়। রাস্তার দুই পাশে বসিয়া থাকে ক্রেতারা। আর ফড়িয়ারা বিভিন্ন মহল্লা হইতে চামড়া কিনিয়া ওখানে আনিয়া বিক্রয় করে। এবারে লবণের সঙ্কট এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণে চামড়ার দর প্রথম দিকে বেশ পড়িয়া গিয়াছিল। ঢাকায় ঈদের দিনের দুপুরে পোস্তার বাজারে একটি গরুর চামড়া ২২ টাকায় এবং ছাগলের চামড়া ২৪ টাকায় বিক্রয় হয়। সন্ধ্যার দিকে এই দাম বাড়িতে থাকে। কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে যাঁহারা চামড়া ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা কিছুতেই গরুর চামড়ার জন্য ৮ টাকা এবং ছাগলের চামড়ার জন্য ১২ টাকার বেশী উঠিতে চাহিলেন না। এ দোষও অবশ্যই তাঁহাদের নহে। কিন্তু ফল হইল এই কর্পোরেশনকে শুধু তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে হইল আর রয়াল, গুলশান, চায়নীজ প্রভৃতি ট্যানারীর এজেন্টরা ঐ দরে সমানে মাল কিনিয়া গেল। পরদিন দুপুর তিনটার দিকে কর্পোরেশনের প্রতিনিধিরা যখন বাড়তি দাম দিয়া চামড়া কেনার ক্লিয়ারেন্স পাইলেন তখন চামড়ার দাম চড়িয়া গিয়াছে। ঈদের দ্বিতীয় দিবসে গরুর চামড়ার দাম ৩০ টাকায় এবং ছাগলের চামড়ার দাম ২৮ টাকায় উঠিল। কর্পোরেশন চামড়া কিনিলেন—তবে অধিকাংশ

ইনডাইরেক্ট পারচেজ। অর্থাৎ, ফড়িয়াদের নিকট হইতে না কিনিয়া তাঁহারা বেশীর ভাগ চামড়া কিনিলেন ট্যানারীগুলির নিকট হইতে। ফলে ভাগ্যে জুটিল অপেক্ষাকৃত খারাপ জিনিস। ট্যানারীজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকে এ ব্যাপারটি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই ঘটনাকে 'ডাহা মিথ্যা' বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তবে এবারের 'ঈদ পারচেজ' যে তেমন সুবিধার হয় নাই সেটা তিনি কথায় কথায় স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। এ তো গেল ঢাকা শহরে কর্পোরেশনের 'ঈদ পারচেজ'। মফস্বলের অবস্থা আরও এক কাঠি উপরে। কর্পোরেশনের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি মফস্বল টাউনে একটি করিয়া গ্রুপ পাঠান হইল। ম্যানেজার, একাউনটেন্ট এবং জাতনদার সমন্বয়ে একটি করিয়া টিম। তাঁহারা টাউন হেড কোয়ার্টারে থাকেন, ফড়িয়াদের আনা চামড়া কিনিয়া পাঠান। মফস্বলে চামড়ার দাম এবার প্রথমে অনেক কম ছিল। কারণ, সেই লবণ সঙ্কট। এই পরিস্থিতিতে যে সমস্ত টিম গিয়াছিল তাঁহাদের উচিত ছিল লবণ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া। কারণ, চামড়ার জন্য লবণ অপরিহার্য। প্রতি সাড়ে তিন ফুট চামড়ার জন্য তিন সেরের মত লবণ প্রয়োজন কিন্তু টিম সে লবণ লইলেন না। ফলে পারচেজও ঠিকমত হইতে পারিল না। কারণ, এমনিতেই দূর গ্রামাঞ্চল হইতে কাঁচা চামড়া টাউনে আসিয়া পৌঁছাইতে দুই একদিন সময় লাগিয়া যায়। চামড়া আসিয়া পৌঁছিলে অন্তত: সাথে সাথেই লবণ দেওয়া দরকার। লবণ না থাকায় টিমগুলির নাকের ডগা হইতে অন্যরা চামড়া কিনিয়া লইয়া গেল এবং তাঁহাদের কেবল ঘাড় চুলকাইয়াই ফেরত আসিতে হইল।

কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সাহেবকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, টিমগুলির সঙ্গে লবণ পাঠানো হয় নাই। তবে এই সঙ্গে একথাও বলিয়াছেন, লবণ বহন করার দায়িত্ব তাঁহার কর্পোরেশনের উপর বর্তায় না। মফস্বলে লবণের বাজার এমনিতেই চড়া; যদি তাঁহার টিম কোথাও কোন অঘটন ঘটাইয়া ফেলে তাহা হইলে সে দায় মাথায় লইবে কে? তাঁহার মতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরই উচিত ছিল প্রয়োজনমত টিমগুলিকে স্থানীয় স্টক হইতে ন্যায্যমূল্যে লবণ সরবরাহ করা।

..চেয়ারম্যান সাহেবের যুক্তি যত 'জেনুইন-ই' হউক না কেন বাস্তব ঘটনা হইল কর্পোরেশনের 'ঈদ পারচেজ' ঠিকমত হইতে পারে নাই।

এবারের কোরবানীর চামড়া সংগ্রহে কর্পোরেশনের ব্যর্থতার ফলে চলতি মৌসুমে রফতানীর ক্ষেত্রে কর্পোরেশনকে বেশ অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

যেমন এক্সপোর্টের জন্য সমস্ত ট্যানারী হইতে ঝারিয়া-পুঁছিয়া ভালো ভালো চামড়া দিয়া কোটেশন পুরা করিতে হইবে—ফলে শেষের দিকের কোটেশন পুরা করা সম্ভবও হইবে না, এক্সপোর্ট করাও মাথায় উঠিবে।

অবশ্য ট্যানারীজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সাহেব এ ধরনের আশঙ্কা নাকচ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য ট্যানারীগুলিতে রফতানীযোগ্য চামড়ার পরিমাণ কম নাই।

কর্পোরেশনের ট্যানারীগুলিতে স্তূপীকৃত হইয়া আছে চামড়া। ঢাকায় আমি যে কয়টি ট্যানারী ঘুরিয়াছি সেগুলিতে রাশি রাশি চামড়া দেখিয়াছি। সেগুলির অধিকাংশই রফতানী করার মত নহে। যতই দিন যাইতেছে ততই চামড়াগুলি ছোট হইয়া যাইতেছে—পরিচর্যার অভাবে সেগুলি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

কর্পোরেশনের 'অসময়ের নয় ফোঁড়ের' আর একটি দৃষ্টান্ত আছে। কিছু-দিন আগে কর্পোরেশনের ন্যাশনাল ট্যানারীর একটি দেওয়াল মেরামত করিতে এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। দীর্ঘদিন যাবত এই দেওয়াল ভাঙ্গা ছিল। প্রথম অবস্থায় মেরামত করিলে হাজার দশেকের মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন করা যাইত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গা জায়গার পরিসর বড় হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত দশগুণ বেশী খরচ করিতে হইয়াছে।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় মার্চ ৭, ১৯৭৪

চামড়া তো আর বাঁচে না—(৩)

চামড়া লইয়া চর্মশিল্প কর্পোরেশনের ব্যর্থতার ফিরিস্তি দিয়া লাভ নাই। ছোট কর্পোরেশন। কাজও শুরু হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে ১৯৭২ সনের নভেম্বর মাস হইতে। অভিজ্ঞতাও কম। ব্যাঙ্কে ওভারড্রাফটের অঙ্ক বৃদ্ধি পাইবে তাহাতেই বা বিস্মিত হইবার কি আছে। কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায় রফতানী বাণিজ্যের চামড়া বাঁচিবে কিনা।

শুধু কাঁচা চামড়ার মূল্যই যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে। ফরেন কেমিক্যালের আগে দাম ছিল টন পিছু ৩ শত ডি. এম., এখন হইয়াছে ১৩ শত ডি.এম.; পরিবহন খরচ ২ হইতে ৭ গুণ বাড়িয়াছে, শ্রমিকদের বেতন বাড়িয়াছে ৩ গুণ। বিদ্যুতের চার্জ আগে ছিল ফ্যাক্টরী ইউনিট পিছু ১৫ হইতে ১৬ পয়সা এখন উহা করা হইয়াছে ৫২ পয়সা। ব্যাঙ্ক

উহার উপর শতকরা ১৩ ভাগ সুদ বসায়। অথচ পাট রফতানীকারকদের ওভার ড্রাফটের উপর সুদ ধরা হয় শতকরা ১০ ভাগ। চামড়া ব্যবসায়ীরা এই সুদের হার কমানোর জন্য আগ্রহী। রফতানী বাণিজ্য সংক্রান্ত ওয়া-কিফহাল মহল মনে করেন, যেহেতু চামড়া দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য, সেইহেতু এক্ষেত্রেও পাটের মত সুবিধা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রাইভেট চামড়া ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, এত লোকসান দিয়া তাহারা দাঁত কামড়াইয়া চামড়ার ব্যবসা ধরিয়া রাখিয়াছে কেন? কারণ অবশ্যই আছে। এক গ্রেডের চামড়ার সহিত অন্য গ্রেডের চামড়া মিশাইয়া এক্সপোর্ট করা, কেমিক্যাল ব্ল্যাকে বিক্রয় করা ইত্যাদি ত আছেই—ইহা ছাড়া আছে এক্সপোর্ট পারফরমেন্স লাইসেন্স। যদিও এই লাইসেন্স বিক্রয় করার কোন এখতিয়ার ব্যবসায়ীদের নাই তথাপি অনেকেই উহা বিক্রয় করিয়া লোকসান পুষাইয়া নেন। গোপন বিক্রয় ধরিবে কে? অধিকাংশ প্রাইভেট ব্যবসায়ীর সহিত ফরেন বায়ারদের একটি অলিখিত শর্ত থাকে। এক্সপোর্ট পারফরমেন্স লাইসেন্সের অধীনে কেবল চামড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যালসই আমদানী করা যায়। এই লাইসেন্সের হার হইল মোট রফতানীর ২০ ভাগ। কেমিক্যালসগুলি যে কেবল চামড়াতেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। এমন অনেক কেমিক্যালস আছে যেগুলি পাট, কাগজ ইত্যাদির জন্যও ব্যবহার করা যায়। ব্যবসায়ীরা এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করিয়া ব্ল্যাক করে। ফরেন বায়ারের সহিত অলিখিত শর্ত অনুযায়ী টন পিছু ১৩ শত ডি. এম.-এর জায়গায় হয়ত ১৫ শত ডি. এম.-এর হিসাবে ফরেন এজেন্ট কেমিক্যাল পাঠায়। এই বাড়তি দুই শত ডি. এম. ফরেন ব্যাঙ্কে ব্যবসায়ীর নামে জমা থাকে।

আর একটি ইনকাম হইল 'আণ্ডার ইনভয়েস'। মুনাফার জন্য ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

বর্তমানে ফরেন মার্কেটে প্রতি ফুট ছাগলের চামড়ার দাম ৩৪ পেন্স। এখানকার রফতানীকারক ফরেন বায়ারকে জানাইয়া দেয় ফুট প্রতি ৩০ পেন্স হিসাবে এল. সি. খোলার জন্য। তদনুযায়ী এল. সি. খোলা হয়। এখানকার ব্যবসায়ীর কৈফিয়ৎ, মাল অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের বলিয়াই দাম কম। কিন্তু আসল ব্যাপারটি হইল ফরেন বায়ারের সহিত যোগসাজশে প্রতি ফুটে ৪ পেন্স করিয়া 'নেট প্রফিট'। এই 'আণ্ডার ইনভয়েস'-এর

২৪—

কোন লিখিত প্রমাণাদি নাই—কিন্তু ইহা চামড়া ব্যবসায়ীদের জন্য কোন নূতন ঘটনা নহে। 'আণ্ডার ইনভয়েস' বন্ধ করিতে হইলে যে চেকিং-এর প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা নাই। কেমিক্যালস ব্ল্যাকে বিক্রয় রোধ করাও অসম্ভব। এইগুলি যদি বন্ধ করা যায় তাহা হইলেও আর এক বিপদ। চামড়া রফতানী একেবারেই ডকে উঠিবে এবং চামড়া অন্য দেশে পাচার হইবার রাস্তা আরও খোলাসা হইবে।

..কাজেই চামড়া বাঁচাইতে হইলে প্রয়োজন কর্পোরেশনকে পুনর্বিন্যাস করা, ছোট কর্পোরেশন বলিয়া হেলা-ফ্যালা না করিয়া এদিকে একটু যত্নের সহিত নজর দেওয়া। প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের অসাধুতা দূর করিতে হইলে তাহাদেরও কিছু সুবিধা দেওয়া দরকার। এক্সপোর্ট পারফরমেন্স লাইসেন্সে যদি অন্য দ্রব্যাদির আমদানী অনুমোদন করা যায় তাহা হইলে এদেশে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমিতে পারে। ঔষধপত্র আমদানীর সুযোগ দিয়াও এদেশের রোগীদের অনেক উপকার হইতে পারে। পাশাপাশি এই লাইসেন্স বিক্রয় অনুমোদন করিলে অন্যান্য পণ্যের ব্যবসায়ীরা কিছুটা লাভবান হইতে পারেন।

তবে বন্দরে যথোপযুক্ত 'চেকিং' রাখিতে হইবে—'আণ্ডার ইনভয়েস' এর ব্যাপারে সতর্ক হইতে হইবে এবং এক ধরনের চামড়ার সহিত অন্য ধরনের চামড়া মিশাইয়া যেন বিদেশী বাজারে বদনাম কিনিতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পাশাপাশি পাচার রোধ, এদেশে চামড়া ক্রয়ে সুবিধা ইত্যাদির নিশ্চয়তা থাকিতে হইবে। অন্যথায় চামড়া রফতানী আরও কমিবে। এবং চামড়ার রফতানী না বাঁচিলে রফতানী বাণিজ্যের চামড়াও বাঁচানো দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় মার্চ ৮, ১৯৭৪

দ্রব্য মূল্য

কোন লিখিত প্রমাণাদি নাই—কিন্তু ইহা চামড়া ব্যবসায়ীদের জন্য কোন নূতন ঘটনা নহে। 'আণ্ডার ইনভয়েস' বন্ধ করিতে হইলে যে চেকিং-এর প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা নাই। কেমিক্যালস ব্ল্যাকে বিক্রয় রোধ করাও অসম্ভব। এইগুলি যদি বন্ধ করা যায় তাহা হইলেও আর এক বিপদ। চামড়া রফতানী একেবারেই ডকে উঠিবে এবং চামড়া অন্য দেশে পাচার হইবার রাস্তা আরও খোলাসা হইবে।

..কাজেই চামড়া বাঁচাইতে হইলে প্রয়োজন কর্পোরেশনকে পুনর্বিন্যাস করা, ছোট কর্পোরেশন বলিয়া হেলা-ফ্যালা না করিয়া এদিকে একটু যত্নের সহিত নজর দেওয়া। প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের অসাধুতা দূর করিতে হইলে তাহাদেরও কিছু সুবিধা দেওয়া দরকার। এক্সপোর্ট পারফরমেন্স লাইসেন্সে যদি অন্য দ্রব্যাদির আমদানী অনুমোদন করা যায় তাহা হইলে এদেশে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমিতে পারে। ঔষধপত্র আমদানীর সুযোগ দিয়াও এদেশের রোগীদের অনেক উপকার হইতে পারে। পাশাপাশি এই লাইসেন্স বিক্রয় অনুমোদন করিলে অন্যান্য পণ্যের ব্যবসায়ীরা কিছুটা লাভবান হইতে পারেন।

তবে বন্দরে যথোপযুক্ত 'চেকিং' রাখিতে হইবে—'আণ্ডার ইনভয়েস' এর ব্যাপারে সতর্ক হইতে হইবে এবং এক ধরনের চামড়ার সহিত অন্য ধরনের চামড়া মিশাইয়া যেন বিদেশী বাজারে বদনাম কিনিতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পাশাপাশি পাচার রোধ, এদেশে চামড়া ক্রয়ে সুবিধা ইত্যাদির নিশ্চয়তা থাকিতে হইবে। অন্যথায় চামড়া রফতানী আরও কমিবে। এবং চামড়ার রফতানী না বাঁচিলে রফতানী বাণিজ্যের চামড়াও বাঁচানো দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় মার্চ ৮, ১৯৭৪

দ্রব্য মূল্য

উৎপাদন পর্ণোদ্যমে চালু করা সম্ভব হয় নাই: ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা প্রায় আড়াই কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন

স্বাধীনতার ৯ মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও দেশের বৃহত্তম ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানাটি পূর্ণোদ্যমে চালু করা সম্ভব হইতেছে না।

উৎপাদন হ্রাসের ফলে এই সার কারখানা কমপক্ষে ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা লোকসানের সম্মুখীন হইয়াছে।

যদি পরবর্তী বৎসরে উক্ত কারখানার উৎপাদন পূর্ণোদ্যমে না চলে তাহা হইলে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৩ কোটি টাকাতে দাঁড়াইতে পারে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১৪, ১৯৭২

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সংখ্যা দ্রব্য	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৭১		২৬।৩।৭১-১৫।১২।৭১		জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৭২		জুন-জুলাই ১৯৭২		২৮শে আগস্ট ১৯৭২	
সংখ্যা	সরকারী সূত্র	সংবাদপত্র	সরকারী সূত্র	সংবাদপত্র	সরকারী সূত্র	সংবাদপত্র	সরকারী সূত্র	সংবাদপত্র	সরকারী সূত্র	সংবাদপত্র
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। চাউল (প্রতি মণ টাকার অংকে)	৩৪.৬৩	নাই	৪২.৩৭	নাই	৪২.২৩	৭০.০০	৬১.৪৪	৭৬.০০	৭৭.৬৮	৯৩.৭৫
২। সরিষার তৈল (প্রতি সের টাকার অংকে)	৫.২৭	নাই	৬.৬১	নাই	৭.০৮	নাই	৮.৫৯	১০.০০	১২.০০	১৪.০০
৩। কেরোসিন তৈল (আউন্স বোতল)	২২০.৩৯	নাই	০.৪৬	নাই	০.৮০	২.২৫	১.১৭	নাই	০.৯৪	নাই
৪। লবণ (প্রতি সের টাকার অংকে)	০.৩১	নাই	০.৪৮	নাই	০.৪৪	০.৭৫	০.৪৫	নাই	০.৩০	নাই
৫। চিনি (প্রতি সের টাকার অংকে)	২.২৭	নাই	২.৭৯	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	৯.০০
৬। কাপড় (লং ক্লথ প্রতি গজ)	২.২৫	নাই	২.৪২	নাই	৩.২৬	নাই	৪.৮১	৫.৫০	নাই	নাই
৭। ডানো দুধ (প্রতি ৫ পাউণ্ড টাকায়)		১৫.০০		২২.০০		২৫।২৬.০০		৩৭.০০		৪৮.০০
৮। হরলিকস		৬.০০		৮.০০		১০.০০		১৪.০০		১২.০০

বিঃ দ্রঃ বাজারে দোকানদারের দেওয়া মূল্য।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৭, ১৯৭২

তফসিলী ব্যাঙ্কসমূহে ২ শত কোটি টাকা পড়িয়া আছে বিনিয়োগের উদ্যোগ নাই

সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে দুই শতাধিক কোটি টাকা অলাভজনক অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১৮, ১৯৭২

বার্ষিক মাশুল ১ শত কোটি টাকা

বাংলাদেশ ও ভারতের মুদ্রামান সরকারীভাবে এক থাকিলেও বেসরকারীভাবে বাংলাদেশের মুদ্রার মান ভারতীয় মুদ্রার মানের প্রায় অর্ধেক। ইহার ফলে বাংলাদেশকে প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১০, ১৯৭২

৪ কোটি টাকার কয়লা আমদানীতে গচ্চা ৪৪ লাখ টাকা

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ১২, ১৯৭২

১৩৬ কোটি টাকা ডেড্‌লক?

বাংলাদেশের বৃহত্তম তফসিলী ব্যাংক সোনালী ব্যাংকে প্রায় ১৩৬ কোটি টাকা শুধু পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণের অভাবে অবিনিয়োগকৃত অবস্থায় 'ডেড-লক' হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ২০, ১৯৭২

একই নম্বরের একাধিক নোটে বাজার ছেয়ে গেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ১৪, ১৯৭৩

আয়-ব্যয় বাজেটে প্রথম নয় মাসে পঞ্চাশ কোটি টাকা ঘাটতির আশংকা

আগামী জুন মাসে বাংলাদেশে যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আর্থিক বৎসর শেষ হইতে যাইতেছে, উহার আয়-ব্যয় বাজেটে এই নয় মাসেই অন্যূন পঞ্চাশ কোটি টাকা ঘাটতি দেখা যাইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক মার্চ ১২, ১৯৭৩

বলিষ্ঠ পদক্ষেপ: ভারতে মুদ্রিত নোট বাতিল

বিলম্বে হলেও সরকার অবশেষে ভারতে মুদ্রিত ১ শত, দশ ও পাঁচ টাকার নোট আগামী ১লা মে থেকে বাতিল ঘোষণা করেছেন। এই আদেশের প্রেক্ষিতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বৈধ নোটের বাইরেও অবৈধ নোটের সংখ্যা এতো বেড়ে গিয়েছিল যা সরকার বহু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত আয়ত্তে আনতে পারলেন না।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২, ১৯৭৩

জলছাপহীন নোট অচল

ভারতে ছাপা নোটগুলি বদলাইয়া লইবার জন্য কর্তৃপক্ষ ৩১শে মে পর্যন্ত যে সময় দিয়াছেন তাহাকে দীর্ঘ সময়ই বলিতে হয়। দেশে বিদেশে 'কালোমুদ্রা' যাহাদের হাতে সঞ্চিত আছে তাহারাও উদারভাবে প্রদত্ত এইসব সুযোগ গ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই তৎপর হইয়া উঠিবে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৪, ১৯৭৩

খবরটি কি সত্য?

ভারতে বাংলাদেশের মোট তিন শ' কোটি টাকা মুদ্রিত হলেও বাংলাদেশের বাজারে এখন চালু রয়েছে তার চারগুণ অর্থাৎ বারোশ' কোটি টাকা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বিবিসি গত ১২ই এপ্রিল রাতে এ সংবাদ প্রচার করেছেন।

—সোনার বাংলা এপ্রিল ১৫, ১৯৭৩

জীবন যাত্রার ব্যয় গত এক বছরে শতকরা ১৬৫ ভাগ বৃদ্ধি

বিগত এক বছরে দেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া ঢাকা, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় শতকরা ১ শত ৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

—ইত্তেফাক মে ১১, ১৯৭৩

অবিলম্বে জরুরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য
জাতীয় অর্থনীতি প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ার পর্যায়ে

দ্রুত অবনতিশীল জাতীয় অর্থনীতি ও উহার ক্ষয়িষ্ণু প্রাণশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলার জন্য অর্থমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ অবিলম্বে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

—ইত্তেফাক মে ১২, ১৯৭৩

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ১ শত হইতে ৪ শত ভাগ বৃদ্ধি

বাংলাদেশে খাদ্যশস্য, খাবার তেল, চিনি, মাছ, মাংস ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা একশত হইতে চারশত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গতকল্য (বুধবার) ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে প্রকাশিত পরিকল্পনা কমিশনের এক সমীক্ষায় এই তথ্য জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ২৮, ১৯৭৩

সাংবাদিক সম্মেলনে বাণিজ্য-মন্ত্রীর স্বীকারোক্তি—
জনগণের দুর্ভোগের জন্য সরকারই দায়ী

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ৩, ১৯৭৪

পংগু শিশুর আতুড় ঘরেই মৃত্যু
৯০ হাজার টাকাসহ মুদ্রা পাচারকারী গ্রেফতার

সম্প্রতি বাংলাদেশ রাইফেলস-এর জোয়ানরা সিলেট সীমান্ত হইতে ৯০ হাজার বাংলাদেশী টাকাসহ একজন মুদ্রা পাচারকারাকে গ্রেফতার করে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৯, ১৯৭৪

সংসদে খাদ্য মন্ত্রীর স্বীকারোক্তি: নানা কারণে সংগ্রহ অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে: লক্ষ্য হয়ত অর্জিত হইবে না

খাদ্য মন্ত্রী মিঃ ফণী মজুমদার স্বীকার করেন যে, বাজারে ধানচাউলের মূল্য সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং নানাবিধ কারণে সংগ্রহ অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৭৪

নীতি মোতাবেক নগদ সাবসিডি না দেওয়ায় রফতানী বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত

সরকার রফতানীকারকদের নগদ 'সাবসিডি' প্রদান না করার ফলে রফতানী বাণিজ্য মারাত্মকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রফতানীকারক মহল অভিযোগ করেন যে, সরকার গত বৎসর ২৪শে জুলাই হইতে রফতানীকারীদের নগদ সাবসিডি প্রদানের নীতি প্রবর্তন করিলেও এখন পর্যন্ত কোন রফতানীকারীকে নগদ সাবসিডি দেওয়া হয় নাই।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১০, ১৯৭৪

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন পাঁচশালা পরিকল্পনা নামে যে পংগু শিশুটির জন্ম দিয়েছিলেন, আতুড় ঘরেই তার মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে। পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম বছর প্রায় উত্তীর্ণ হতে চললেও এ পর্যন্ত তার রূপায়ণের কোন উদ্যোগই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সরকারী মহল পরিকল্পনা সম্পর্কে গোড়াতে খুব আশাবাদ প্রকাশ করলেও বর্তমানে তাঁরাও সমালোচকদের মত নৈরাশ্যের সুরে কথা বলছেন। অর্থমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ সম্প্রতি স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, পরিকল্পনার প্রথম বছরের রূপায়ণ সম্ভবপর হবে না। পরবর্তী বছরগুলোর রূপায়ণও যে সম্ভবপর হবে তেমন কোন আশাবাদও তিনি শোনাতে পারেননি। তাঁর এই দ্ব্যর্থহীন উক্তির পর এখন অনেকেই নিশ্চিত হয়েছেন যে, এত সাধের পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত সিঁকেয় উঠেছে।

—সোনার বাংলা এপ্রিল ৭, ১৯৭৪

মধ্যবিত্ত সমাজ বিলুপ্তির পথে মূল্য নিয়ন্ত্রণ কমিশন চাই

অর্থনীতি বিশারদ মহল মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের প্রতিক্রিয়ায় ধনিক শ্রেণী আরও ধনী হইতেছে, দরিদ্র শ্রেণী আরও নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে এবং শহর ও গ্রাম-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১২, ১৯৭৪

অবৈজ্ঞানিক পন্থায় গুদামজাতকরণের ফলে

প্রয়োজনীয় কীটনাশক ঔষধ ও অবৈজ্ঞানিক পন্থায় খাদ্যশস্য গুদামজাতকরণের ফলে গত বছরের জানুয়ারী মাস হইতে চলতি বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত খাদ্য বিভাগের ৮১ হাজার ৫৪৬ মণ চাল ও গম অর্থাৎ ২৮ হাজার ৬ শত ৩৬ মণ ৩৮ সের চাউল, ৫২ হাজার ৯ শত ৯০ মণ ২৫ সের গম, ২ হাজার ২ শত ৫৯ মণ ১০ সের চিনি এবং ৬ শত ২৬ মণ সয়াবিন তৈল বিনষ্ট হইবার খবর পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৯, ১৯৭৪

অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় : প্রতিকারের জন্য বলিষ্ঠ ব্যবস্থা চাই

—ইত্তেফাক মার্চ ৭, ১৯৭৪

তীব্র খাদ্যাভাব, গগনচুম্বী দ্রব্যমূল্য ও ব্যাপক বেকারত্বে গ্রাম বাংলার জনজীবন দুর্বিষহ

—ইত্তেফাক মার্চ ১৭, ১৯৭৪

রেকর্ড ! রেকর্ড !! রেকর্ড !!!

১৯৭২ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র ২২ মাস। ৬৬৮ দিন। একটি জাতির অর্থনৈতিক জীবনে এত অল্প সময়ে তেমন কোন প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে অসাধ্য সাধিত হয়েছে।

এ ২২ মাসের ইতিহাস বাংলাদেশের জনজীবনে মূল্যবৃদ্ধির সর্বাত্মক রেকর্ড সৃষ্টির ইতিহাস। সৃষ্টির জন্য সময় যা লেগেছে তাও অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙেছে। ১০০ ভাগ নয় ২০০ নয় কোন কোন ক্ষেত্রে ৮০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। বিশেষ ক্ষেত্রে তা হাজারের কোটা ছাড়িয়ে ১৫০০ ভাগ হতেও দেখা যাচ্ছে। আর তা সরকারী হিসাব মতেই। উক্ত সময়ে সরষের তেল ও নারিকেল তেলের দাম বেড়েছে যথাক্রমে ১৩২ ভাগ ও ২১৮ ভাগ। হলুদের দাম বেড়েছে ২২০ ভাগ। আদার দাম বেড়েছে ৩৫০ ভাগ। চালের দাম বেড়েছে ১৪০ ভাগ। আর সবচেয়ে দাম বেশী বেড়েছে কাঁচা লংকার। একেবারে ১৫০০ ভাগ। উক্ত সময়ে সরকার রেশনের চালের দাম বাড়িয়েছেন ২৯ টাকা থেকে ৪০ টাকায়। বৃদ্ধির হার ৩৮%, ১৯৫২ সালের ১লা জুলাই প্রতিমণ সরু আমন চালের খুচরো দাম ছিল বাজারে ৭৫ টাকা। '৭৩-এর জুলাইতে হয়েছে ১১৫ টাকা। '৭৪-এর মার্চে তা বেড়ে হয়েছে ১৬০ টাকা। বৃদ্ধির হার ২১৫%।

মশুর—১৯৭২-এর ১লা জুলাই প্রতিমণ ৪১ টাকা, '৭৪-এর মার্চে ১৫০ টাকা। বৃদ্ধির হার ১৫৪ ভাগ।

মুগ—১৯৭২-এর ১লা জুলাই প্রতিমণ ৫০ টাকা, ১৯৭৪-এর মার্চে ১৮০ টাকা, বৃদ্ধির হার শতকরা ২৬০ ভাগ। মটর—৭২ সালের জুলাইতে প্রতিমণের দাম ৩৫ টাকা, বৃদ্ধির হার শতকরা ২৭০ ভাগ হয়ে '৭৪-সালের মার্চে ১৩০ টাকা।

সরিষার তৈল, '৭২-এর জুলাই মাসে প্রতিমণ ২৮০-৩২৫ টাকা। '৭৪ এর মার্চ মাসে প্রতিমণ ৬২০-৬৫০ টাকা। বৃদ্ধি হার শতকরা ১৩২ ভাগ।

সয়াবিন, '৭২-এর ১লা জুলাই প্রতিমণ ২৩০ টাকা, '৭৪-এর মার্চ মাসে ৫৯০ টাকা, বৃদ্ধির হার শতকরা ১৫৬ ভাগ। ঘি—পাইকারী বাজারে ৭২-এর জুলাই প্রতিমণ ৪২৬ টাকা হইতে ৪৫০ টাকা, '৭৪-এর মার্চ মাসে ১০০০-১১০০ টাকা। বৃদ্ধির হার ১৩০ ভাগ।

গরুর গোশত—'৭২-এর জুলাই মাসে প্রতি সের-এর দাম ছিল ৩·০০-৩·২৫ পয়সা। '৭৪-এর মার্চ মাসে ৯·০০-১০·০০ টাকা। বৃদ্ধির হার ২৩৩ ভাগ।

খাসির গোশতের দাম বেড়েছে শতকরা ২০০ ভাগ। মোরগের দাম বেড়েছে ১৫৫ ভাগ।

মসল্লা—গত ২২ মাসে জিরার দাম বেড়েছে শতকরা ৩১৭ ভাগ, আদার দাম বেড়েছে ৩৫০ ভাগ। শুকনো মরিচের দাম বেড়েছে ৩০০ ভাগ। হলুদের দাম ২৬০ ভাগ, লম্বা হলুদের দাম ২৫৩ ভাগ। ধনিয়ার দাম ১৫০ ভাগ। ছোট ও বড় এলাচীর দাম বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ২৫০ ভাগ ও ১৫০ ভাগ। কালজিরার দাম বেড়েছে ৩৭১ ভাগ।

সুপারির দাম বেড়েছে ২২৫ ভাগ। গরুর দুধের দাম বেড়েছে ১১০ ভাগ। '৭২-এর জুলাই মাসে জ্বালানির কাঠের দাম ছিল প্রতিমণ ৬ টাকা। '৭৪-এর মার্চ মাসে তা বেড়ে হয়েছে ১৪ টাকা থেকে ১৬ টাকা। বৃদ্ধির হার ২৪০ ভাগ।

উক্ত সময়ে কেরোসিন তেলের দাম বেড়েছে ২৪৩ ভাগ। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে প্রতি তোলা তেজাবী সোনার দাম ছিল ৩০০ টাকা, বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৯৫০ টাকা। বৃদ্ধির হার ২১২। গিনি সোনার দাম বেড়েছে শতকরা ২০৩ ভাগ ও রূপার দাম বেড়েছে ২০৮ ভাগ।

—সোনার বাংলা এপ্রিল ২১, ১৯৭৪

বিভিন্ন স্থানের খাদ্য পরিস্থিতি

দেশের বিভিন্নস্থানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ ধান, চাল, গম-আটা ও আলুর দাম আরও বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে ক্রয় ক্ষমতা হারাইয়া গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ অনাহারে দিন কাটাইতেছে বলিয়া আমাদের সংবাদদাতাদের প্রেরিত তারবার্তায় জানা গিয়াছে। সংবাদদাতারা সেই সমস্ত স্থানে অবিলম্বে খাদ্য-শস্য প্রেরণের জন্য সরকারের প্রতি জনগণের আবেদনের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

—ইত্তফাক এপ্রিল ২৪, ১৯৭৪

সোয়া লক্ষাধিক টাকার জাল নোটসহ নোট জালকারী দল গ্রেফতার

নোট জালকারী একটি সুসংগঠিত দল জাল নোটসমেত হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে। তাহাদের সংগে পাওয়া গিয়াছে এক লক্ষ আটাশ হাজার পাঁচ শত আশি টাকার জাল নোট। ধরা পড়িয়াছে ১৩ জন। তাহাদের মধ্যে তিনজন কলেজের ছাত্র। ভারতে ছাপা এক টাকার নোট জাল করিয়া বাজারে ছাড়াই ছিল তাহাদের ব্যবসা।

—ইত্তেফাক মে ১, ১৯৭৪

২৬ কোটি টাকা এখনও হিসাবের বাহিরে

স্বাধীনতার পর হইতে বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশনে (টিসিবি) উহার আমদানী পণ্যের উপর চট্টগ্রাম শুল্ক কালেক্টরকে আমদানী নগদ দেয় হিসাবে ২৬ কোটি টাকার অধিক যে অর্থ পরিশোধ করিয়াছে, উহার হিসাব এখন পর্যন্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপযুক্ত খাতাগুলিতে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। ইহার ফলে রাজস্ব হিসাবে অর্জিত ২৬ কোটি টাকা চলতি অর্থ বৎসরের জাতীয় বাজেটে দেখান সম্ভব হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক মে ১১, ১৯৭৪

পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম বছরেই 'পরি' উড়ে গিয়ে শুধু 'কল্পনায়' পর্যবসিত হয়েছে

শূন্যের উপর দাঁড়িয়ে আকাশ-কুসুম কল্পনা করা হয়ত যায়, কি কোনো পরিকল্পনা যে তৈরী করা চলে না, বাংলাদেশের প্রথম পাঁচসালার পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কারিগরি বিশেষজ্ঞ দলের অভিমত ও সুপারিশ পড়ে এ তিক্ত কথাটাই আমাদের বরাবর মনে পড়ছে।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশের উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এই পরিকল্পনাটি তৈরী করা হয়েছিল। তৈরী করেছিলেন আমাদের নামী-দামী সুপণ্ডিত পরিকল্পনাকাররা। অর্থনীতির নানাশাখা প্রশাখায় প্রচুর বিদ্যাবত্তার অধিকারী হয়েও পাকিস্তানী আমলে তা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেনি তাঁরা। স্বাধীনতার পর সে সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন পুরোপুরিভাবে। তার সদ্ব্যবহারও তাঁরা করছেন অকৃপণভাবে। বহু অর্থ'

ও শ্রমের বিনিময়ে তাঁরা জাতিকে উপহার দিয়েছেন একটি পরিকল্পনা। কিন্তু পরিকল্পনা কালের প্রথম বছরেই তার 'পরি' উড়ে গিয়ে শুধু 'কল্পনায়' পর্যবসিত হয়েছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত জাতির বহু মূল্যবান একটি বছর মাটি হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনাটির পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। এ উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংকের কারিগরি বিশেষজ্ঞের সুপারিশ প্রার্থনা করা হয়েছে। সে অনুসারে বিশ্বব্যাংকের উচ্চক্ষমতা বিশিষ্ট কারিগরি বিশেষজ্ঞরা ব্যাপক জরিপ চালিয়ে তাঁদের মূল্যবান অভিমত ও সুপারিশ সম্বলিত একটি খসড়া রিপোর্ট দাখিল করেছেন। এই রিপোর্ট পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তা আমাদেরকে কল্পনা থেকে বাস্তবে উত্তরণের সঠিক পথ নির্দেশ করে দিয়েছে।

—সোনার বাংলা মে ১২, ১৯৭৪

অগ্নি বীমা ব্যবসায় অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন

স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অভাব, অবৈজ্ঞানিক পন্থায় গুদামজাতকরণ, নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ইত্যাদি কারণে চটকল ও পাট গুদামগুলিতে প্রায়ই অগ্নিকান্ড সংঘটিত হইতেছে। ইহার ফলে 'অগ্নিবীমা' ব্যবসা এক বিরাট অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। অত্যধিক অগ্নিকান্ডের দরুন 'বিদেশী রি-ইন্সিওয়ার' কোম্পানীগুলি অগ্নিবীমা বন্ধ করার কথা ভাবিতেছে।

—ইত্তেফাক মে ১৮, ১৯৭৪

রেশনের মূল্য বৃদ্ধি ও প্রতিক্রিয়া

আজ (সোমবার) হইতে রেশনের চাউল ৬০ টাকা এবং গম ৫০ টাকা। রাজধানীর সীমিত আয়ের নাগরিকদের কাছে এই সরকারী সিদ্ধান্ত একটি প্রচন্ড চপেটাঘাত।

—ইত্তেফাক মে ২৭, ১৯৭৪

মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বেতন-ভাতার হার সংশোধনের দাবি

"মুদ্রাস্ফীতির সমান তালে সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বাড়াইয়াছেন ২ শত হইতে ৪ শত ভাগ। উপর্যুপরি, রেশনের মূল্য বৃদ্ধি আজ গণ কর্মচারীদের নিকট 'মরার উপর খাড়ার ঘা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ৪, ১৯৭৪

বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে দেশ লাটে উঠতে বসেছে

বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে দেশ বর্তমানে এক চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল সূত্রে জানা গেছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার শূন্যপ্রায়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট মাত্র ৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা জমা আছে। অর্থবছর শেষে এই নগণ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা জমার খবরে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল আঁতকে গেছেন। শুধু তাই নয় বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে দেশের জনগণ ভবিষ্যতে যে অকল্পনীয় দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত হবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই বলে অভিজ্ঞ মহল মত প্রকাশ করেছেন।

—সোনার বাংলা জুন ১১, ১৯৭৪

ভারতীয় নোট জালকারী দলের ৫ ব্যক্তি গ্রেফতার

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয় যে, স্পেশাল পুলিশ ভারতীয় ১ শত টাকার ১০ হাজার টাকা জাল নোটসহ ভারতীয় মুদ্রা জালকারী একটি দলের ৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং জাল নোটের ১টি ডাইস উদ্ধার করিয়াছে। গ্রেফতারকৃত দলটি বাংলাদেশের ১০ এবং ২০ টাকার স্ট্যাম্প জাল করার কথাও স্বীকার করিয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ১৯, ১৯৭৪

মুদ্রা সরবরাহ বাড়িয়াছে ৪৪১ কোটি টাকা

১৯৭১-এর ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭৪ সনের ২৪শে মে পর্যন্ত দেশে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ মোট ৪৪১ কোটি টাকা বাড়িয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ২৮, ১৯৭৪

অর্থমন্ত্রীর অর্থহীন বুলি আর কতদিন?

দেশের বহির্বাণিজ্য চরম সংকটের সম্মুখীন। চলতি বাণিজ্যিক মৌসুমে বৈদেশিক মুদ্রার ৬০০ কোটি টাকার দরকার। অথচ দেশের রফতানী বাণিজ্য থেকে আয় দেড়শ কোটি টাকার বেশী আশা করা যায় না। কলকারখানার উৎপাদন বন্ধ হতে চলেছে। দ্রব্য মূল্য হুহু করে বেড়ে চলেছে। যেখানে শতকরা ৪ ভাগ মুদ্রাস্ফীতি থাকলে কোন দেশের অর্থব্যবস্থা চলতে পারে না। সেখানে একটি বিদেশী পত্রিকার ভাষ্য মতে বাংলাদেশের মুদ্রামাণ অনেক আগেই ৩৫ পয়সায় নেমে এসেছে। আমদানী বাণিজ্য

৪ গুণ বেশী প্রতিকূল। এহেন পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতি কিভাবে চলে তা অর্থনীতিবিদদের কাছে এক বিরাট বিস্ময়।

—সোনার বাংলা জুলাই ১৪, ১৯৭৪

বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরে

ত্রুটিপূর্ণ কর্মপদ্ধতিই আর্থিক ক্ষতি ও দুর্নীতি বাড়াচ্ছে

—গণকণ্ঠ জুলাই ২৮, ১৯৭৪

অনাকাঙ্ক্ষিত

দেশের আমদানী বাণিজ্য এক অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইয়াছে। গত মাসে আমদানী নীতি ঘোষণা করা হইলেও এখনও পর্যন্ত লাইসেন্সের কোন ভিত্তি নির্ধারণ করা হয় নাই। ফলে ঘোষিত আমদানী নীতি অনুযায়ী লাইসেন্সও ইস্যু করা হইতেছে না।

—ইত্তেফাক আগস্ট ১৭, ১৯৭৪

অর্থমন্ত্রী বলেন: সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক তৎপরতার সমন্বয় প্রয়োজন: মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার মানের ক্রমাবনতি

—ইত্তেফাক আগস্ট ৩১, ১৯৭৪

গতকালের ঢাকার বাজার

গতকাল ঢাকার বাজারে খাদ্যসহ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যে আরও উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়।

তুলনামূলকভাবে চাউল এবং আটার মূল্যই অধিক বাড়ে। চাউল প্রকার ভেদে প্রতিসের ৭ টাকা হইতে ৯ টাকা পর্যন্ত বিক্রয় হয়। কোন কোন এলাকায় নিম্নমানের চাউলের মূল্যও ৯ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। মালিবাগ বাজারে আউশ, বোরো ও ইরি চাউল ৯ টাকা সের দরে বিক্রয় হইয়াছে।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৭৪

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে ২৬ মাসে জীবনযাত্রার ব্যয় ১১২ ভাগ বৃদ্ধি

চলতি বৎসরের মার্চ পর্যন্ত জীবনযাত্রার ব্যয় ১৯৭১-এর জানুয়ারীর তুলনায় ১১২ ভাগ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৮৪ কোটি ২৮ লক্ষ

টাকায় নামিয়া আসায় ঐ মাসেও বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির সংকট অব্যাহত থাকে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১১, ১৯৭৪

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কাহার হাতে?

বাজারের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এখন কাহার হাতে? প্রতিদিনই চাল, ডাল, নুন-তেল মরিচের দাম বাড়িতেছে। দাম বাড়ার গতিটিও এত দ্রুত যে ক্রেতাসাধারণ কোন তাল পাইতেছেন না। চাউলের সর্বনিম্ন দাম ছিল নয় টাকা। গম বিক্রয় হইয়াছে সাড়ে পাঁচ-ছয় টাকায়, কাঁচা মরিচ উঠিয়াছে ২৪ টাকায়, শুকনা মরিচের দাম ৬০ টাকা। এ সমস্ত হিসাবই সেরের।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২৮, ১৯৭৪

বাজার পরিক্রমা

শুকনা ও কাঁচা মরিচের মূল্য বাড়িয়া সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার অনেক উর্ধ্বে উঠিয়াছে। শুকনা মরিচ ৯০ হইতে ৯৫ এবং কাঁচা মরিচ ৩২ টাকা সের দরে বিক্রয় হইতেছে। চাউলের সের ৮।৯ টাকা, গম ৬ টাকা, চিনি ১৪।১৫ টাকা।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৩১. ১৯৭৪

টাকা জালকারী গ্রেফতার

অদ্য নারায়ণগঞ্জ থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পাইয়া স্থানীয় দুইটি হোটেল হইতে দুইজন টাকা জালকারীকে গ্রেফতার করে। পুলিশ তাহাদের নিকট হইতে ১০০ টাকা এবং দশ টাকা ও একটাকা সাইজের কিছু কাগজ ও কেমিক্যালস উদ্ধার করে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১' ১৯৭৪

'১৯৭৫ বেকার বর্ষ'

১৯৭৪ সাল ছিল 'মুদ্রাস্ফীতির বছর।' মুদ্রাস্ফীতির গতি এত দ্রুত ছিল যে কোন যুদ্ধকালীন চরম সংকটময় অবস্থায়ও এত দ্রুতগতিতে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৭৪ সালে কোন কোন দেশে দ্রব্য মূল্য ১৫০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৭৫ সাল হবে বেকারের বছর। 'জবলেছ ইয়ার' মুদ্রাস্ফীতিজনিত কারণে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানই অলাভজনক হয়ে পড়বে।

—সোনার বাংলা জানুয়ারী ১২, ১৯৭৫

টাকার মূল্য সোয়া ছয় পয়সা

ভারতীয় টাকার সাথে বাংলাদেশের টাকার বেসরকারী বিনিময় মূল্য বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১০০ : ২৫ টাকা। অর্থাৎ বাংলাদেশের ১০০ টাকার বিনিময়ে ভারতের ২৫ টাকা দেয়া হচ্ছে। ভারতীয় টাকার মূল্য যদি ২৫ পয়সা দাঁড়ায় সে অনুপাতে বাংলাদেশের এক টাকার বর্তমান মূল্য দাঁড়াচ্ছে সোয়া ৬ পয়সা।

—সোনার বাংলা ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৭৫

চুয়াত্তরের দ্রব্যমূল্য

৭১ সাল	৭৫ সাল
চাল প্রতিমণ ৫০ টাকা	প্রতিমণ ২৪০ টাকা।
আটা প্রতিমণ ৩০ টাকা	প্রতিমণ ২০০ টাকা।
মরিচ প্রতিসের ৩ টাকা	প্রতিসের ৪০ টাকা।
সরিষার তৈল প্রতিসের ৬ টাকা	প্রতিসের ৪০ টাকা।
জ্বালানী প্রতিমণ ৩ টাকা	প্রতিমণ ১৮ টাকা।
কাপড় প্রতিগজ ৩ টাকা	প্রতিগজ ১৩ টাকা।
কাগজ প্রতি দিস্তা ০·৬০ টাকা	প্রতি দিস্তা ৩ টাকা।

—সোনার বাংলা মার্চ ২৬, ১৯৭৫

সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় মতামত

ঘরে-বাইরে

..বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের আগস্ট সংখ্যা বুলেটিনে প্রকাশিত ডাঃ এ. এম. এ. রহিমের তথ্যবহুল প্রবন্ধটি যিনি পাঠ করবেন, তার মনেই এ প্রশ্ন দেখা না দিয়ে পারে না। প্রবন্ধটির নাম 'এন্ এনালাইসিজ অব স্মাগলিং ইন বাংলাদেশ।' বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারী জনাব ওয়ালিউল ইসলাম এবং সহযোগী গবেষক জনাব তাহের উদ্দিন, জনাব সোহরাব উদ্দিন ও জনাব মহসীন আলীর সহযোগিতায় তিনি এ প্রবন্ধটি তৈরী করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অবশ্য ফুটনোট দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, উল্লিখিত প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, এর সঙ্গে সরকারী মতের সম্পর্ক নেই। ডঃ রহিম বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টা। সহযোগিতাকারীরাও পদস্থ সরকারী কর্মচারী। পক্ষান্তরে স্টেট ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি যে নামেই ডাকা হোক, উহার বার্ষিক রিপোর্ট বা বুলেটিন সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক দর্পণ। এ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় দেশের চেহারা। এবং তা থেকে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন মহল জ্ঞান সঞ্চয় করে থাকেন। ফুটনোটের ঘোষণায় যা কিছু বলা হোক প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হতেই বুঝা যায় উহাতে প্রদত্ত মতামতকে সংশ্লিষ্ট মহলও তাৎপর্যপূর্ণ এবং সকলের জানার যোগ্য ভাবেন। উক্ত প্রবন্ধে ডঃ রহিম ১৯৬৯-৭০ সাল হতে ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরের লোক-সংখ্যার বার্ষিক চাহিদা, আভ্যন্তরীণ উৎপাদন, সরকারী গুদাম হতে ছাড়, অপচয়, বীজ ইত্যাদির হিসাব উল্লেখ করে দেখিয়েছেন বাংলাদেশ খাদ্য-শস্যে আসলে তেমন কিছু ঘাটতি অঞ্চল নয়। তিনি বলেছেন, ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৪০ লক্ষ। তন্মধ্যে দুধের বাচচা বাদ দিয়ে চালডাল যাদের জন্য দরকার তেমন জনসংখ্যা শতকরা ৮৭ ভাগ হারে ছিল মোট ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ। মাথাপিছু দৈনিক ১৬ আউন্স হিসাবে এই লোকের জন্য বার্ষিক ১ কোটি ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টন খাদ্য-শস্য প্রয়োজন। সে বছর দেশে উৎপন্ন হয় ১ কোটি ২০ হাজার টন। বীজ এবং অপচয় শতকরা ১০ ভাগ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৯০ লক্ষ ১৮ হাজার টন। সরকারী গুদাম হতে উক্ত বছর সরবরাহ করা হয় ২৬ লক্ষ ১৮ হাজার টন। অতএব আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্তি দাঁড়ায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টন। ডঃ রহিম বলেছেন, প্রাপ্তি হতে প্রয়োজন বাদ দিলে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ১১ লক্ষ ৪২ হাজার টন। পক্ষান্তরে, ১৯৭৩-৭৪ সালে তিনি জনসংখ্যা ধরেছেন ৭ কোটি ১৩ লক্ষ (লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ বছর জনসংখ্যা ২৭ লক্ষ কম ধরা হয়েছে। এর কারণ দুর্জ্ঞেয়)। তন্মধ্যে 'ইফেকটিভ' জনসংখ্যা ৬ কোটি ২০ লক্ষ। প্রতিজনে ১৬ আউন্স হিসাবে এই লোকের জন্য বার্ষিক ১ কোটি ১ লক্ষ ২ হাজার টন খাদ্য-শস্য প্রয়োজন। সে বছর দেশে উৎপন্ন হয় ১ কোটি ১৮ লক্ষ ১ হাজার টন। বীজ এবং অপচয় বাবত শতকরা ১০ ভাগ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ১ কোটি ৬ লক্ষ ২১ হাজার টন। সরকারী গুদাম হতে উল্লিখিত বছরে ছাড় করা হয় ১৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টন। ফলে আভ্যন্তরীণ প্রাপ্তি দাঁড়ায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টন। প্রাপ্তি থেকে প্রয়োজন বিয়োগ করলে এ বছরও ২২ লক্ষ ৬৪ হাজার টন উদ্বৃত্ত থাকার কথা। এই তথ্য-পরিসংখ্যান পেশ করার পর ডঃ রহিম ফুটনোটে বলেছেন, 'তবে দৈনিক মাথা-পিছু প্রয়োজন হিসাবে ১৬ আউন্স বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। বাস্তবে ফসলকাটা মৌসুমে ফলন যখন ভাল হয় তখন কৃষক সমাজ দৈনিক মাথাপিছু ষোল আউন্সের অনেক বেশী খেয়ে থাকে'।

..কিন্তু তবু বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং তাতে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কও 'বিস্ময়' প্রকাশ করেছেন। সদ্যপ্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্টের প্রতি তাকালেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, "১৯৭৩-৭৪ সালে দেশে খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায় এ বছর 'চালের' উৎপাদন 'উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও' এই অবনতি অব্যাহত থাকে। ১৯৭২-৭৩ সালের ৯৯ লক্ষ ৩০ হাজার টনের জায়গায় এ বছর 'চাল' উৎপাদিত হয় ১ কোটি ১৭ লক্ষ ২২ হাজার টন (সম্ভবতঃ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উৎপন্ন গম জাতীয় খাদ্য হিসাবে না ধরার ফলেই ডঃ রহিম প্রদত্ত হিসাবের সঙ্গে কয়েক লক্ষ টনের ব্যবধান রয়েছে)। হিসাব করে দেখা গেছে, ১৯৭৪ পঞ্জিকা বর্ষে ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার টনের মত খাদ্য ঘাটতি হবে। ১৯৭৪ সালের জন্য খাদ্যশস্যের আমদানী চাহিদা হিসাব করা হয় ২২ লক্ষ ৪২ হাজার টন। এই হিসাবের মধ্যে আছে অতিরিক্ত সংরক্ষণের জন্য ২ লক্ষ ৬২ হাজার টন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের ২ লক্ষ টন গমের বদলীকরণ। ১৯৭৩ সালের পয়লা জুলাই হতে ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানীকৃত মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬ লক্ষ ৭৯ হাজার টন।" এই হিসাবের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ১৯৭৪ সালের মোট আমদানী চাহিদা অপেক্ষা প্রকৃত আমদানী পরিমাণ

৫ লক্ষ ৬৩ হাজার টন কম। মোট আমদানী হতে বাকার স্টকের (যার প্রশ্ন উঠে না) ২ লক্ষ ৬২ হাজার টন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের গমের বদলী ২ লক্ষ টন বাদ দিয়ে হিসাব করলেও ঘাটতি দাঁড়ায় ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টন। ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুনের পরও বহু খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম এবং চালনা বন্দরে নোঙ্গর করেছে বলে পত্র-পত্রিকায় খবর বের হয়েছে। তাতে করে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য আনা হয়েছে উল্লিখিত হিসাবে তা নেই। তদ্রূপ মিষ্টি আলু, কাঁঠাল, কলাই প্রভৃতি ভোগ্যপণ্য এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উৎপন্ন গম চাহিদা কতটা লঘু করে তাও হিসাবে ধরা হয়নি। দু' বেলার পরিবর্তে বহুদিন যাবৎ মানুষ যে একবেলা ভাত খেতে শুরু করেছে, সে প্রসঙ্গ না হয় বাদই দেওয়া গেল। শেষেরটি বাদ দিয়ে অবশিষ্টগুলো হিসাবে ধরা হলেও ঘাটতি পরিমাণ কি দাঁড়াতো বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট সে বিষয়ে নীরব। তবে এতে স্পষ্টতঃই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ''১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে চালের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও অবনতি অব্যাহত থাকে।'' এতে আরও বলা হয়েছে যে, 'মুদ্রা সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে খাদ্যশস্যের দাম বাড়েনি। বেড়েছে অধিক হারে।' প্রশ্ন হচ্ছে কেন? বাংলাদেশ ব্যাঙ্কই উহার বার্ষিক রিপোর্টে এর জবাব দিয়েছেন। বলা হয়েছে, ''বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী এবং ভাল ফলন হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে চোরাকারবার ও মজুতদারী। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ডঃ রহিমও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রভেদ শুধু এই, তাঁর বক্তব্য আরও বিস্তারিত এবং তথ্যপ্রমাণভিত্তিক।

আমরা বিশেষজ্ঞ নই। 'বাবা শুভঙ্কর' আমাদের কাছে প্রকৃতই 'বড় ভয়ঙ্কর'। এ ভয়ঙ্কর-শুভঙ্করের প্যাঁচ কোথায় জানি না। বিশেষজ্ঞদের অভিমত হতে শুধু এটুকু উপলব্ধি করি যে, প্রকৃত জনসমস্যা, প্রকৃত চাহিদা, প্রকৃত আভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য পরিসংখ্যানের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। কতটা আছে, কতটা দরকার, এ যদি ভালভাবে জানা না থাকে কিংবা কোথা দিয়ে কি ঘটে যাবার ফলে দুর্ভোগ বাড়ে তৎপ্রতি যথার্থ অর্থে সচেতন হওয়া না যায়, তাহলে সকলই গরল ভেল হতে বাধ্য। কিন্তু তা কাম্য নয় বলেই উপরোক্ত বিষয়াদি এবং বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্টের মন্তব্যের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৭৪

স্থান-কাল-পাত্র

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই। যাহা পাই তাহা চাই না। কিন্তু না চাইলে কি হবে। বিষফল রোপণ করে তা থেকে অমৃত আশা করার মত বেওকুফী আর কি হতে পারে। আমি কি তাহলে সেই বেওকুফ? আমি জানি না।

..অবশ্য আমি এখনো হিরো। তবে সে হিরোর বীরত্ব জীবন থেকে পলায়নপরতায় সীমাবদ্ধ। মন্ত্রী-মিনিস্টারদের বক্তব্য অনুসারে নিজেকে কোন বিশেষ বাহিনীর সদস্য মনে করে ক্রেতা-প্রতিরোধের মহড়া দিতে যাই। দোকানদার ব্যাঙের হাসি হাসে। শ্লেষের সাথে কথা ছুঁড়ে দেয়,—নিলে ওই দরেই নিতে হবে। না নিলে পথ দেখেন।

কিন্তু আমি তো বেওকুফ নম্বর ওয়ান। মুফতে না হোক ন্যায্য মূল্যেও দু'একটা কিছু প্রাপ্তির দিক-দিশাও আমার জানা নাই। আমি যা চাই, তা পাই না। আবার কষ্টে-সৃষ্টে যা পাই তা চাই না। আজ কতদিন ধরে এক কৌটা 'ডানো' খুঁজে ফিরছি। পাই না। পাঁচ পাউণ্ডের ডানো খোলাবাজারে ১২০ টাকার উপরে। বন্ধু বলেন, টাকা দিয়ে দাও, কয় ডজন চাও, এনে দিচ্ছি। আমি টাকা দিতে পারি না। 'ডানো' আমার নিকট দিল্লীর লাড্ডুর মত মনে হয়। আমি কাউকে কিছু বলতে পারি না। শুধু ভাবতে পারি। কিন্তু সে ভাবনাটাও প্রকাশ করতে পারি না। সেই যেমন বাউল গানে রয়েছে: বোবায় যেমন স্বপ্ন দেখে, মনের কথা মনে রাখে গো!'' —আমার হয়েছে সেই দশা।

আমি যদি বোবা না হতাম, তাহলে আকাশ থেকে বজ্রের আওয়াজ ছিনিয়ে এনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ডেকে বলতে পারতাম, এই যে হুজুর সাহেবান, আপনাদের ন্যায্যমূল্যের কার-কারবারে পাঁচ পাউণ্ডের এক ডানো এখন ১২০ টাকার উপরে। অথচ ডানো আমদানী থেকে শুরু করে খোলাবাজারে তা প্রকাশ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা যদি উপযুক্ত ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দিতেন, তাহলে ওই ডানো বড় জোর ৪০।৪৫ টাকায় উঠত। আর সে ডানো পেতে পারত সবাই। কিন্তু জনকল্যাণের নাম করে আপনারা তা করলেন না। তবে, এখন যা হচ্ছে তাতে জনকল্যাণ কতটা হচ্ছে, তা খোলাসা করে বলবেন কি? আমি যদি বোবা না হতাম, তাহলে সমুদ্রের সব গর্জন কণ্ঠে পুরে ঘোষণা করতে পারতাম, আপনারা বাহিনী দিয়ে লাঠির জোরে

বাজার দর ঠিক করতে চান: আপনারা দাগ-চিহ্ন এঁকে পুঁতে দিয়ে নদীর বান ও বান-ভাসির তাণ্ডব ঠেকাতে চান। আপনারা দোকানে দোকানে দ্রব্যমূল্যের তালিকা টাঙ্গিয়ে দিয়ে রাজা ক্যানিউটের মতই ঢেউরূপী মূল্য বৃদ্ধির প্রতি তর্জনী কাঁপিয়ে নির্দেশ জারি করেন: 'দিস ফার এণ্ড নো ফারদার'!

কিন্তু,---না, এ কিন্তুর আর কোন কিন্তু নাই। যেহেতু আমি বেওকুফ, আমি বোকা এবং আমি বোবাও। চোখ আছে তাই দেখে যাই। কান আছে তাই শুনে চলি। কিন্তু অদৃষ্টের চরম পরিহাস এই যে, মুখ থাকা সত্ত্বেও কিছু বলতে পারি না।..কান পাতলে আজও আমি হাহাকার শুনি; চোখ খুললে আজো দেখতে পাই হাড্ডিসার মানুষের মিছিল। তাই আমিও আজ পা ফেলতে ভয় পাই। একবার পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে সাতবার ভাবি, কেউ দেখে ফেলল না তো। তাই আমি সাংবাদিক হয়ে একটা হরিণ শিশুর জীবন রক্ষা পাওয়ার বাহাদুরী নিতে চাই। শত শত মানবশিশুর অকাল মৃত্যুর প্রতিরোধ সাহস খুঁজে পাই না। বাইরের বিশ্বসুন্দরীর নগ্ন ছবি প্রকাশ করে আনন্দিত হই; কিন্তু দেশ জুড়ে নগ্নতার যে মিছিল শুরু হয়ে গেছে, তার চিত্র সামনে এলে কুঁকড়ে যাই। বাইরে ছোট-বড় রাষ্ট্রের রাজনীতি, শাসননীতি---শোষণ ও নির্যাতননীতির সমালোচনায় মুখর হই, ঘরের কোন নীতি নিয়ে কথা বলতে গেলেই হই নীতিনিষ্ঠ। তাই বাইরের বহু দেশের বহু রাজাবাদশাহ শাসন ও স্বৈরাচারের উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত আঁকতে গিয়ে অপার আনন্দ অনুভব করি। কিন্তু নিজের সঙ্গে, নিজের কাজ কর্মের সঙ্গে তাদের তুলনা করতে ভয় পাই। তাদের দর্পণে নিজের চেহারা দেখে ক্ষেপে গিয়ে লাঠি-সোঁটা খুঁজি।

আমি বেওকুফ। আমি বোবাও। তাইত সত্য করে সত্য বলতে পারি না।..আমি চাই দ্রব্যমূল্য কমুক। ন্যায্যমূল্যের প্রহসন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া বন্ধ করুক। কিন্তু টাকার মূল্যমান না বাড়িয়ে—আমি বেওকুফ—অযথাই টানা-হেঁচড়া করি; অযথাই কামড়া-খামচির মহড়া-চালাই। এদিকে আমারই চোখের সামনে আধহাত মরিচের গাছ---মরিচসুদ্ধ আকাশছোঁয়া হয়।..তাদের একজন যদি মারা যায় না খেয়ে, আরেকজন মারা যাবে বেশী খেয়ে। একজন যদি মরিয়া হয়ে অন্যজনের বাড়ী গাড়ী, বিত্ত-বেসাতের প্রতি চড়াও হতে গিয়ে মারা পড়ে, অন্যজন তবে মারা পড়বে শত শত বুভুক্ষু ক্ষুধিত ক্ষুব্ধজনের রোষানলে পড়ে। আব্রুহীনা তার আব্রু-ইজ্জতের জন্য হাজার টাকার শাড়ীওয়ালার আঁচল চেপে ধরবেই।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

..খাদ্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া এখন কদমে নয় বরং চারপায়ে লাফাইয়া চলিতেছে। এক সহযোগী খবর দিয়াছেন যে, ঝালকাঠিতে চালের দাম 'গত দু'দিনের মধ্যে দুইশ' সত্তর-আশী টাকা হইতে বাড়িয়া তিনশ' টাকায় উঠে এবং তার পরই বাজার হইতে চাল উধাও হইয়া যায়। আরেক সহযোগীর খবর—'নেত্রকোনায় চালের দর সাড়ে তিনশ' টাকা'। ভাবিয়াছিলাম, নেত্রকোনাতেই বুঝি চালের দাম সর্বোচ্চ। এখন দেখি, রাজধানী ঢাকাকে কেহ 'ডাউন' দিতে পারে নাই। এই রেসে ঢাকাই ফার্স্ট, নেত্রকোনা রানার্স আপ। ইত্তেফাকের খবর অনুযায়ী গত শনিবারে ঢাকার কোন কোন বাজারে আউশ, ইরি ও বোরো চালের দাম নয় টাকা সের উঠিয়াছে। আর আটার সের ছয় টাকা—মানে মণকরা যথাক্রমে তিনশ' ষাট ও দুইশ' চল্লিশ টাকা।

এক সহযোগী লিখিয়াছেন, একদিকে আকস্মিকভাবে চালের দর এক লাফে মণপ্রতি চল্লিশ থেকে আশি টাকা বেড়ে গেছে,—অন্যদিকে চালের আমদানী মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। চাল না-থাকায় প্রায় প্রতিটি বাজারে বেশীর ভাগ দোকানে বিক্রি বন্ধ রেখেছে। একই দিনে অপর এক সহযোগী লিখিয়াছেন, 'ক্রেতা সাধারণের দুর্ভোগকে ব্যঙ্গ করে দর হঠাৎ এক লাফে মণপ্রতি ৬০ থেকে ৭০ টাকা বেড়ে যাবার ঘটনার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।---শনিবার খাদ্যমন্ত্রী জনাব আবদুল মোমেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এহেন মূল্যবৃদ্ধির কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না বলে জানান।---এ ব্যাপারে রাজধানীর মোহাম্মদপুর, নিউমার্কেট, কাওরানবাজার, ঠাঠারীবাজার ও মৌলভী বাজারে চাল ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির কোন সদুত্তর দিতে পারেননি।

সত্যি এর কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এখন আর সপ্তাহে সপ্তাহে নয়, বরং দিনে দিনে এমনকি ঘণ্টায় ঘণ্টায় অবস্থা বদলাইতেছে। শুধু ঝালকাঠি, নরসিংদি, মুক্তাগাছা, জামালপুর, নেত্রকোনা ও ঢাকায় নয়,

দেশের আরও কতকগুলি জায়গায় চালের দাম তিনশ' টাকায় উঠিয়াছে বা উহা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ভূষি-মিশানো আটাও অনেক স্থানে ছয় টাকা সেরের কমে পাইবার উপায় নাই। খাদ্যমূল্য সত্যই আর কোন যুক্তি বা কারণের ধার ধারিতেছে না। পাগলা ঘোড়ার মতো উহা লাফাইয়া বাড়িতেছে তো বাড়িতেছেই।

..প্রশাসন কর্তৃপক্ষ একবার নয় বার বার বলিয়াছেন, 'একটি লোককেও না খেয়ে মরতে দেওয়া হবে না'। এটা দুর্গত মানুষকে বাঁচাইবার জন্য তাঁদের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু তবু মানুষ মরে। দলে দলে মরে। অনাহারেও মরে, পুষ্টির অভাবেও মরে, অনাহার অপুষ্টিজনিত রোগব্যাধিতেও মরে। একটা কিছু হইয়া তারা পড়ে আর মরে। এখন অনাহার-অপমৃত্যুর খবর গা-সহা হইয়া গিয়াছে। ও-খবরে আর কোন সেন্সেশন নাই, চাঞ্চল্য নাই। কোন মহলের উহাতে এখন আর আপত্তি-প্রতিবাদও নাই। অগণিত লোকের অকালমৃত্যু—এই যেন বিধিলিপি।

কর্তৃপক্ষ বহুবার খাদ্যমূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে নামাইয়া আনার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু একটানা চেষ্টা করিয়াও খাদ্য-মূল্যের পাগলা ঘোড়াকে বাঁধা যায় নাই। বরং যতই তাকে বাঁধার চেষ্টা করা হইয়াছে ততই তার পাগলামি ও ছুটা-ছুটি বাড়িয়া গিয়াছে। এ ঘোড়া যেন একেবারেই আয়ত্তের অতীত।

গ্রামাঞ্চল হইতে নিরন্ন নর-নারীরা হাড় জিরজিরা শিশু এবং ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে লইয়া ভাতের আশায়, কাজের আশায়, বাঁচার আশায় শহরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। এ যেন পতঙ্গের আলোর দিকে ছুটিয়া আসা। কিন্তু শহরেই বা কোথায় এদের জন্য রুটির ব্যবস্থা, কোথায় রুজির ব্যবস্থা, কোথায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা? আমরা অফিসিয়ালি স্বীকার করি বা না-করি, এরই নাম কি দুর্ভিক্ষাবস্থা নয়? প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় অবস্থা বদলাইতেছে। আজ যে-অবস্থা দৃষ্টে এই লেখা লিখিতেছি কাল সে-অবস্থা থাকিবে না, পরন্তু অন্যরূপ অবস্থা দেখা যাইবে, তরশু দেখা দিবে ভিন্নতর অবস্থা। কিন্তু অতঃপরম্! এর পর কি?

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৭৪

ঘরে-বাইরে

..তবু যে প্রসঙ্গটির অবতারণা এর গূঢ় একটা কারণ আছে এবং সে হলো জীবন-মৃত্যুর লীলা-খেলা। জীবন এদেশে এখন বড় বেশী বিড়ম্বিত।

চারিদিকে মৃত্যুর হোলিখেলা। অথচ এই মৃত্যু, যে মৃত্যু জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি নয়, তা মানুষের কাম্য হতে পারে না। কবি যদিও বলেছেন, 'মরণ তু আওরে আও'—তবু তার মনের আসল কথা এই যে, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' কিন্তু বাঁচতে চাইলেই বাঁচা যায় না। মাত্র দু'দিন আগের কথা। সম্পাদক সাহেবের গাড়ীতে চড়ে অফিসে আসছি। সন্ধ্যার প্রারান্ধকারে সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে উঠলেও উজ্জ্বল আলোর নীচে শয়ান প্রৌঢ়ের চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে শুয়ে আছে 'বঙ্গভবনের' প্রাচীর ঘেঁষে। গোল-বাহুতে একটি মাংসহীন হাড়ডি ধরে চিবোচ্ছে। আর প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে প্রাণবায়ু। ইচ্ছে হয়েছিল একটা টাকা দিই। কিন্তু দিয়ে কী লাভ! বেঁচে থাকার যন্ত্রণা প্রলম্বিত হবে মাত্র, কারণ, বাঁচার যত চেষ্টা করুক যে পর্যায়ে সে পেঁৗছে গেছে দু-এক টাকা সাহায্যদানে তাকে বাঁচানো যাবে না। হয়তো এ কথা সেও বুঝে। কিন্তু তবু এই পৃথিবী ও পৃথিবীর জীবনের প্রতি ভালবাসার আকর্ষণে বেঁচে থাকার সেকি প্রাণান্ত প্রয়াস।

এমনি প্রয়াস আজ একের জীবনে নয়, বহুর জীবনে সত্য।

..খরা ও বন্যার প্রতি বছর বিশ্বের দেশে দেশে বহু কোটি টাকার শস্যসম্পদ বিনষ্ট হয়, আবার কিছু কিছু ধনী রাষ্ট্র, কণ্ঠে যাদের মানবপ্রেম গাথা সদা উচ্চারিত, তাঁরা অপচয় করেন প্রচুর, দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু কিছু রাষ্ট্র কর্তৃক মানুষের খাবার যোগ্য খাদ্যশস্যের যে পরিমাণ মানবেতর প্রাণী অর্থাৎ গরু, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতিকে খাওয়ানো হয় তার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এক হিসাবে জানা যায়, এই খাতে বিত্তশালী দেশগুলো প্রতি বছর যে খাদ্যশস্য নষ্ট করে তার পরিমাণ প্রায় ৩৭ কোটি টন। বলাবাহুল্য, এই খাদ্যে বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জন-সমষ্টির নয়-দশ মাসের খাদ্য সংস্থান হতে পারে। পক্ষান্তরে অন্যান্যভাবেও বিপুল খাদ্য-শস্য বিনষ্ট হচ্ছে। এই বিনষ্ট আর অপচয় প্রতিরোধ করা গেলে ৪০ কোটি কেন, বিশ্বের ৪ কোটি লোকেরও পুষ্টিহীনতায় তিলে তিলে মৃত্যু পথযাত্রী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তবু হচ্ছে এবং তা উপরোক্ত প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এসব কারণ হতে আমরাও মুক্ত নই। একদিকে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা, অন্যদিকে মানবিক খাম-খেয়ালী দুইয়ে মিলে জীবন আজ মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। বিরূপ প্রকৃতি সোনার ফসল নষ্ট করছে, পোকামাকড়

আর প্রতিরোধযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে শস্যসম্পদ রক্ষা করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। তদুপরি চলছে চেনা-অচেনা আঁধার মাণিকদের কাণ্ডকীতি। ফাও-এর হিসাবে জানা যায়, গত বছর বাংলাদেশে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টন। পক্ষান্তরে সরকারী হিসাবে বলা হয়, ১ কোটি ২০ লক্ষ টন। সরকারী হিসাবও যদি নির্ভুল ধরে নেয়া যায় তাহলে ঘাটতি থাকে ১৮ লক্ষ টন। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ২২ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৮ লক্ষ টনের ব্যবস্থা পাকা হয়েছে বাকী চার লক্ষ টনের কথা কিঞ্চিৎ কাঁচা রয়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন, উদ্বৃত্ত ৪ লক্ষ টন 'বাফার স্টক' অর্থাৎ দুর্দিনের সঞ্চয় হিসাবে রাখা হবে। সরকারী ভাষাকে অসত্য বলার দুঃসাহস আমার নেই। তাই জানতে মন চায়, কোথায় সেই বাফার স্টক ? কেন এই মৃত্যু ? তবে কি এ শুধুই আশ্বাস বা পাচারের পরিণতি ?

আমরা তা বলতে চাই না, শুধু অতীত ও বর্তমানের কতিপয় ছোটখাটো অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বাহুল্য, তাও যে কাজ তারা শুরু করতে যাচ্ছেন বলে ঘোষণা করছেন তার ললাটে যাতে পুনরায় ব্যর্থতার কলঙ্কতিলক অঙ্কিত না হয় তারই স্বার্থে। গত মৌসুমে কর্তৃপক্ষীয় মহলের খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযান যখন 'জোরেসোরে' চলছিল তখনই এইমর্মে খবর বের হয়েছিলো যে, প্রত্যহ কুমিল্লার বাজারে হাজার হাজার মণ ধান চাল উঠছে। নাম-গোত্র পরিচয়হীন একশ্রেণীর ব্যবসায়ী তা কিনে নিচ্ছেন। কিন্তু এ মাল সরকারী গুদামে যাচ্ছে না। কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না। অবিকল এক না হলেও অনুরূপ খবর বের হয়েছে ইদানীংকালেও। শোনা যাচ্ছে, সীমান্তের নিকটবর্তী কোন কোন স্থানে এ দেশের নাগরিক নয় এমন কিছু লোক কখনও নিজেরা আবার কখনো দেশীয় দালাল গোষ্ঠীর মাধ্যমে দাদনের ব্যবসা শুরু করেছে। ধান উঠার আগেই প্রতি মণ ৪০ টাকা দরে কিনে নিচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, খবরটি উদ্বেগজনক। এর প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়া হলে অবস্থা শুধু দাদনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, গত বছর কুমিল্লায় যা ঘটেছিল তারও পুনরাবৃত্তি ঘটবে বিভিন্ন স্থানে। তাই সাধু সাবধান। এই সাবধানতার প্রয়োজন এখন আরও বেশী এ জন্য যে, আমন ফসল কাটা মৌসুমে যে ফসল উঠবে এমনি তা পর্যাপ্ত নয়। ছয় মাসের খোরাকি হবে বলে যাঁরা আশা করেছিলেন তাঁদের অনেকের তিন মাসের খোরাকি হবে কিনা তাও সন্দেহ। তবু ধান-কাটা মৌসুমে কৃষক বাজারে ধান আনবে, বিক্রি হবে। কারণ এ ছাড়া অনেক কৃষকের পক্ষেই দায়-দেনা শোধ করা সম্ভব হবে না। পক্ষান্তরে, যারা বড় দরের কৃষক বা মজুতদার তাঁরাও সব ধান ঘরে রাখবেন না, কিছু না কিছু বাজারে বিক্রি করবেন। সাধারণতঃ বাজারের এই ধানচালের একটা অংশ ক্রেতা-সাধারণ খোরাকির জন্য কিনে, অন্যটা কিনে অন্য। এই অন্য অংশটা যদি সরকার কিনে রাখতে অসমর্থ হন তাহলে নিশ্চিতভাবেই উহা চোরাকারবারী ও মজুতদারদের অতলান্ত গুহায় পাচার হবে। এর পরিণতি যে কি হবে তা ভাবতেও লোমকূপ শিউরে উঠে। তাই বলতে চাই না। শুধু এটুকু বলি, বাজারের এই খাদ্যশস্য যাতে আঁধার মাণিকদের আঁধার-গুহার অদৃশ্য হয়ে 'মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা' আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তজ্জন্য সরকারকে যথার্থ তৎপরতার মত তৎপরতা নিতে হবে।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় নভেম্বর ৬, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

..'ইত্তেফাক'-এর গতকালের খবর, নওগাঁয়ে লবণের সের বত্রিশ টাকা। সহযোগী 'সংবাদ' ১৯শে নভেম্বর খবর দিয়াছেন যে, ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও লবণের সের উঠিয়াছে পঁয়ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ টাকায়। মানে চালের দামের আট-নয় গুণ। প্রায় প্রতিদিন প্রতিটি কাগজে লবণের অভাব ও অগ্নিমূল্যের এধরনের খবর।

..ওয়েজ আর্নার স্কীমে প্রচুর ভোগ্য জিনিস আমদানী হইতেছে। এক সহযোগী খবর দিয়াছেন যে, এই স্কীমের আওতাধীনে ইতিমধ্যেই ৩৫ কোটি টাকার জিনিসপত্র বাংলাদেশে আসিয়া পৌছিয়াছে। এর মধ্যে প্রচুর শিশু-খাদ্য, ব্লেড, ড্রাইসেল ব্যাটারী ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য এবং টায়ার-টিউব, মোটর গাড়ীর খুচরা যন্ত্রাংশ ইত্যাদি রহিয়াছে। শুধু ব্লেডই নাকি আসিয়াছে ত্রিশ লাখ টাকার মতো এবং ড্রাইসেল ব্যাটারী ২৫ লাখ টাকার। কিন্তু এই বিপুল আমদানীর পরও মূল্যমাত্রা কি আদৌ কমিয়াছে ? কমিয়া থাকিলে কতটুকু কমিয়াছে ? শহর-নগরের বড় বড় ব্যবসায়ী বলেন বটে, দাম কমতির দিকে। কিন্তু পুরাতন শীতবস্ত্রসহ প্রতিটি জিনিসের এত আগুন দাম যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে উহাতে হাত দেওয়া অসম্ভব। মোটকথা, এই বিশেষ সুবিধাজনক স্কীমের আওতাধীনে এতো কোটি কোটি টাকার জিনিসের

আমদানী চলিতে থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে জিনিসের দাম কমে নাই। প্রশ্ন এই যে, দাম কেন কমে না?

..এক সহযোগী গত মঙ্গলবার খবরে লিখিয়াছেন, 'রাজধানীতে চালের দাম আবার বাড়তির দিকে। সাত টাকা সেরের নীচে কোন চাল নেই। তাও আবার নতুন, ভেজা।---দাম কমছে না। ইরি ও পাইজন ৩০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে'।

..আরেক সহযোগী একইদিনে এক খবরে বলিয়াছেন, 'ঢাকার বাজারে পুনরায় চালের মূল্য বৃদ্ধি শুরু হয়েছে।----গত তিনদিনে পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধির মাধ্যমে চালের মূল্য গড়ে মণপ্রতি ১০ থেকে ১৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারে নিম্নমানের চাল গড়ে পৌণে সাত থেকে সাড়ে সাত টাকা'। প্রায় সব কাগজেই এ ধরনের খবর। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, হার্ভেষ্টিং এর সময়েও কেন এমন হয়? এ কি অদ্ভুত ব্যাপার।

..এক সহযোগী খবর দিয়াছেন যে, কক্সবাজারে 'সরকার অপরিশোধিত লবণ পনর টাকা এবং পরিশোধিত লবণ পঁচিশ টাকা মণদরে ক্রয় করছেন, কিন্তু মওজুদদার ব্যবসায়ীরা সেখানে গিয়ে গোপনে দেড়শ' থেকে দুইশ টাকা মণদরে লবণ কিনতে শুরু করেছে, ফলে একদিকে যেমন সরকার লবণ সংগ্রহ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন অন্যদিকে তেমনি লবণের বাজারদরে কোন স্থিতিশীলতা ফিরে আসছে না। বস্তুতঃ এটা শুধু লবণ নয়, ধান, চাল, পাট সবকিছুর ব্যাপারেই সত্য।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় নভেম্বর ২৩, ১৯৭৪

'তোরা সব জয়ধ্বনি কর'

আরও একটি ক্ষেত্রে বাঁধনের পালা শুরু হইয়া গেল। কতদিন এই বাঁধন থাকবে কিংবা আদৌ কেহ বাঁধনের প্রতি ফিরিয়া তাকাইবে কিনা বলার সাধ্য নাই। তবে একবার যখন বাঁধা শুরু হইয়াছে তখন আবারও বাঁধা হইবে, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। অতএব আর ভয় কি এবার বরং বলা যাইতে পারে, 'আয় ভাই, তোরা সব জয়ধ্বনি কর।'

করিবে না কেন? লংকার বাজারে আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। অবশেষে ঢাকা জেলা প্রশাসন ফায়ার ব্রিগেডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। খবরে প্রকাশ, দশদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রতিসের শুক্‌না ও কাঁচা মরিচের দাম নির্দিষ্ট করা হইয়াছে যথাক্রমে ২৫ টাকা ও ১০ টাকা। অন্য আর

একটি জিনিসেরও দাম তাঁরা বাঁধিয়া দিয়াছেন। সেটি হইল সরিষার তৈল। দাম প্রতিসের ২৫ টাকা মাত্র। এই 'ন্যায্য মূল্য' নির্ধারণের সংবাদ পাঠ করিয়া দেশের বৃহদাংশটার তালু শুকাইয়া কাঠ হইয়া যাওয়ার উপক্রম করিতে পারে।

..হয়তো কেহ ভাবিতে পারেন সদ্য নির্ধারিত দামে বিক্রি হইলেও না হয় একটা কথা ছিল, কিন্তু বিক্রি যে হইবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? স্বীকার করি, এ ভাবনা অমূলক নয়। 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ভয় পায়।' দেশবাসী জনসাধারণের হইয়াছে সে দশা। গত দুই আড়াই বছরে কর্তারা কষ্ট স্বীকার করিয়া অনেক কিছুর মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। দুই দুইবার দোকানে দোকানে মূল্য তালিকা টাঙ্গানোরও 'ফরমান' জারি হইয়াছে। কিন্তু এই বাঁধনে-কষণে, আদেশে-নির্দেশে লাভের মধ্যে লাভ হইয়াছে সব কিছুর আকাশ মার্গে উড়া। এতদিন একটা প্রবাদ ছিল যে, নুন আর খুন বাংলাদেশে সবচেয়ে সস্তা। এখন পরেরটা না হইলেও আগেরটা মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে। এর কারণ, বাঁধিয়া দেওয়াই বাজার দরে স্থিতাবস্থা রক্ষার সব নয়। বাজারদর স্থিতিশীল রাখার জন্য সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নত করা, সরকারী ন্যায্যমূল্যের জিনিস ন্যায্য উপায়ে ন্যায্য দামে বিক্রি করা হইতে শুরু করিয়া নির্দেশের কি গতি হইল, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা পর্যন্ত অনেক কিছু জড়িত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বাঁধা-বাঁধি আর আদেশ নির্দেশের পর অন্য কিছুই করা হয় নাই।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় নভেম্বর ২৩, ১৯৭৪

'আনরব'-প্রধানের আশাবাদ

..মিঃ লাকষ্টে সাংবাদিকদের জানান যে, গত দুই বৎসরে 'আনরব'-এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে দুইশত কোটি ডলার, মানে আমাদের মুদ্রার হিসাবে ষোলশত কোটি টাকা পরিমাণ সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। তন্মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ বিতরণ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ পাইপলাইনে আছে। তিনি আরও জানান যে, গত দুই বছরে জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশ ৪৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য লাভ করিয়াছে। মিঃ লাকষ্টের ভাষায় 'জাতিসংঘের ইতিহাসে ইহাই সর্ববৃহৎ ত্রাণ-কার্যসূচী।'

উপরোক্ত জাতিসংঘ-সাহায্য দ্বারা আমাদের খাদ্য-সংকট মোচন ও দুর্ভিক্ষ এড়ানো, মহামারী রোধ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, কৃষির পুনরুজ্জীবন

ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিসাধন সম্পর্কে মিঃ লাকষ্টে তাঁহার বিদায়ী বিবৃতিতে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আশাবাদের কিঞ্চিৎ আধিক্য এমনকি একটু-আধটু অতিশয়োক্তিও ঘটিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, জাতিসংঘের উদ্যোগে এই আন্তর্জাতিক সহায়তা ব্যতিরেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে খাড়া রাখা সম্ভব হইত না এবং উহাকে আজিকার অবস্থাতেও আনা যাইত না। মিঃ লাকষ্টে তাঁহার বিবৃতিতে একথার দ্বারা অন্যায় কিছু দাবি করেন নাই যে, 'আনরব' তাঁহার দায়িত্ব যথাযথভাবেই পালন করিয়াছে। 'আনরব' দুই বৎসরে নিঃসন্দেহেই একটি বিরাট কর্ম সাধন করিয়াছে। 'আনরব'-এর এই অবদান বাংলাদেশ কখনও ভুলিতে পারিবে না।

কিন্তু সেই সঙ্গেই আমাদের নিজেদের মনে প্রশ্ন জাগে : আমরা কি আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছি? দুই বৎসরে ষোলশ' কোটি টাকার সাহায্য তো কম নয়। আটচল্লিশ লক্ষ টন খাদ্য-সাহায্যও সামান্য নয়। জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রাপ্ত এই বিপুল সাহায্য ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক জগত ও অপরাপর সূত্র হইতে সরাসরি আরও অনেক সাহায্য আসিয়াছে। আসিয়াছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্যঋণ, প্রকল্প-ঋণ ও নানান অপরিশোধ্য দান। জানি না, দুই বৎসরে দুনিয়ার সকল সূত্র হইতে প্রাপ্ত দান, ত্রাণ ও ঋণের প্রকৃত পরিমাণ একুনে কত। অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনকে একাধিকবার অনুরোধ জানাইয়াছি এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্বেতপত্র প্রকাশ করিতে। সে অনুরোধ এ যাবৎ রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, ধারণা করা হয়ত অন্যায় হইবে না যে, দুই বৎসরে অন্যূন দুই হাজার কোটি টাকার সাহায্য আসিয়াছে। এতো অল্প সময়ে এতো সাহায্য, বোধ করি দুনিয়ার কোন দেশ কোনকালে পায় নাই। কিন্তু এই সাহায্য কি আমরা সদ্ব্যবহার করিয়াছি? ইহার সত্যিকার প্রাপক বে-দুর্গত জনগণ, তাহাদের হাতে কি ইহা সম্পূর্ণ পৌঁছাইতে পারিয়াছি? এই বিপুল সাহায্য দ্বারা আমাদের অর্থনীতিকে যে পরিমাণ পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করা উচিত ছিল, তাহা কি আমরা করিতে পারিয়াছি? যদি না পারিয়া থাকি, কেন পারি নাই? যদি এই সাহায্য জনগণের দুয়ারে পুরাপুরি না পৌঁছিয়া থাকে, তবে ইহা কে পাইয়াছে, কে মারিয়া খাইয়াছে, উহা কোথায় গিয়াছে? 'আনরব'-এর কাজ শেষ হইল বটে, কিন্তু আমাদের হিসাব-নিকাশের মাত্র শুরু। সে হিসাব-নিকাশ এড়াইয়া গেলে চলিবে না।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় পৌষ ৭, ১৩৮০

'দাও ফিরে সে অরণ্য'

প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়ছে, নিত্যদিন বেড়ে চলেছে, এই তথ্য খবরের কাগজ পাঠে যতটা জানা যায়, বাজারে গেলে অনুভব করা যায় ঢের বেশী। মনে হয় আগুনের হল্কা যেন চামড়া ভেদ করে হৃৎপিণ্ড ছাই করে ফেলছে। সদাশয় সরকার বাহাদুর এর মোকাবিলায় হাম্বি-তাম্বি মেলাই করছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যতই তাম্বি করছেন 'তাম্বুরা' ততই ফেটে যাবার উপক্রম করছে জিনিসপত্রের দামদরের লাফ-ঝাঁপে।

এই লাফ-ঝাঁপ অবশ্য নতুন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই জিনিসপত্রের বাজারদরে উর্ধ্বগামিতা শুরু। কিন্তু তবু সেদিনের সাথে আজকের তুলনা করলে মনে হয় উচ্চকণ্ঠে স্বর করে বলি: 'ফিরে দাও সে অরণ্য লহ এ নগরী'। প্রশ্ন উঠতে পারে, আধুনিক সভ্যতা, যে সভ্যতা দিয়েছে জীবনকে উপভোগ করার সহস্র সুযোগ, সে সভ্যতা ছেড়ে তপোবন সভ্যতার প্রার্থনা কেন? এর একটিই জবাব, শুধু স্বস্তি আর প্রশান্তির জন্য। কেননা, সেদিন ওষ্ঠ রঞ্জিত করার উপাচার না থাকলেও চিত্তসুখ ভোগ করার উপায় ছিল প্রচুর! আর আজ? সব খেয়েছে লঙ্কার বাঘে। সে বাঘ যে কি বাঘ সেদিনের সাথে আজকের তুলনা করলেই ঠাহর করা যাবে।

১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় বিশ্বব্যাপী যখন অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তখনও এ দেশের বাজারদর ছিল নিম্নরূপ:

সরু চাল পনর সের ৩ টাকা। মোটা চাল আধ মণ দু' টাকা চৌদ্দ আনা। চিনি আট সের দু' টাকা বার আনা। গুড় চার সের বার আনা। ময়দা তিন সের দশ আনা। একটি মাজন (যাতে পাঁচজনের একটি পরিবারের সারা মাস চলে যেত) সাত আনা। হলুদ আধ সের তিন আনা। শুকনা মরিচ আধ সের পাঁচ আনা। দারচিনি এক ছটাক এক আনা। ১৯৭০ সালে এ দর বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় চাল এক মণ ৪০ টাকা। সরিষার তৈল এক সের সাড়ে চার টাকা। পিঁয়াজ এক সের বার আনা। মসুরী ডাল এক সের ১ টাকা বার আনা। ডালডা এক সের ৫ টাকা। ডিম প্রতি ৪টার এক হালি আট আনা। মরিচ এক সের ১ টাকা ৮ আনা হতে দুই টাকা। নারিকেল তৈল প্রতি সের ছয় টাকা। প্রতি দিস্তা সাদা কাগজ বার আনা। আর এখন? চাল এক মণ ২০০ টাকা। মরিচ এক সের ৪২ টাকা। ভেজাল নারিকেল তৈল এক সের ৪৫ টাকা। কাঁচা-মরিচ এক সের ১২ টাকা। ভেজাল সরিষার

তেল এক সের ২৪ টাকা। ডিম চারটার প্রতি হালি আড়াই টাকা। দাঁতের মাজন (এক জনের এক মাস চলার মত) ৮।৯ টাকা। সাদা কাগজ প্রতি দিস্তা সাড়ে তিন টাকা। অন্যান্য জিনিসপত্রের অবস্থাও তথৈবচ। এক হিসাবে জানা যায়, বর্তমানের ১ টাকা ১৯৪০ সালের দুই পয়সার সমান। ১৯৪০ হতে ১৯৭৪ এই চৌত্রিশ বছরের স্বল্প ব্যবধানে টাকার মূল্য-হারানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও কতকগুলো চারিত্রিক গুণ ও সুকুমার বৃত্তি হারিয়েছি। তন্মধ্যে সততা অন্যতম। আজকের দিনে কোন খাঁটি জিনিস এবং খাঁটি মানুষ পাওয়া প্রকৃতই দুষ্কর। ফল হচ্ছে, উত্তরোত্তর জীবন-যন্ত্রণা বৃদ্ধি। এ যন্ত্রণা কবে শেষ হবে জানি না। তবে দিন যত যাচ্ছে জীবন ততই দুর্বহ হচ্ছে। বোধ হচ্ছে, দুঃখনিশি পাড়ি দিয়ে আনন্দ প্রভাতে উঠে আসার আশা যেন নিছক দুরাশা মাত্র।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় ভাদ্র ১৮, ১৩৮১

যোগাযোগ ও পরিবহণ

- ২৪টি জাহাজের মধ্যে ৩টি চালু
- রেলওয়ের দেউলিয়া অবস্থা
- ডাক ধর্মঘটে প্রতিদিন দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতি
- রোজ ১২ শত টেলিফোন বিকল থাকে
- পাঁচশত ওয়াগণ অচল

তেল এক সের ২৪ টাকা। ডিম চারটার প্রতি হালি আড়াই টাকা। দাঁতের মাজন (এক জনের এক মাস চলার মত) ৮।৯ টাকা। সাদা কাগজ প্রতি দিস্তা সাড়ে তিন টাকা। অন্যান্য জিনিসপত্রের অবস্থাও তথৈবচ। এক হিসাবে জানা যায়, বর্তমানের ১ টাকা ১৯৪০ সালের দুই পয়সার সমান। ১৯৪০ হতে ১৯৭৪ এই চৌত্রিশ বছরের স্বল্প ব্যবধানে টাকার মূল্যহারানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও কতকগুলো চারিত্রিক গুণ ও সুকুমার বৃত্তি হারিয়েছি। তন্মধ্যে সততা অন্যতম। আজকের দিনে কোন খাঁটি জিনিস এবং খাঁটি মানুষ পাওয়া প্রকৃতই দুষ্কর। ফল হচ্ছে, উত্তরোত্তর জীবন-যন্ত্রণা বৃদ্ধি। এ যন্ত্রণা কবে শেষ হবে জানি না। তবে দিন যত যাচ্ছে জীবন ততই দুর্বহ হচ্ছে। বোধ হচ্ছে, দুঃখনিশি পাড়ি দিয়ে আনন্দ প্রভাতে উঠে আসার আশা যেন নিছক দুরাশা মাত্র।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় ভাদ্র ১৮, ১৩৮১

যোগাযোগ ও পরিবহণ

- ২৪টি জাহাজের মধ্যে ৩টি চালু
- রেলওয়ের দেউলিয়া অবস্থা
- ডাক ধর্মঘটে প্রতিদিন দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতি
- রোজ ১২ শত টেলিফোন বিকল থাকে
- পাঁচশত ওয়াগণ অচল

ডিজেলের অভাবে চট্টগ্রামে পরিবহণ ব্যবস্থায় অচলবস্থা

—ইত্তেফাক মার্চ ৩১, ১৯৭৩

৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে আনরবের মিনি বাঙ্কার প্রত্যাহার চট্টগ্রাম বন্দরে অচলবস্থার আশংকা

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১১, ১৯৭৩

২৪টির মধ্যে মাত্র তিনটি চালু

চট্টগ্রাম বন্দরের মোট ২৪টি পাইলট জাহাজ, গাদা বোট ও লঞ্চের মধ্যে মাত্র তিনটি চালু রহিয়াছে। অবশিষ্টগুলি মেরামত বা ড্রাই ডকিং করার জন্য ফেলিয়া রাখা হইয়াছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ২১, ১৯৭৩

যন্ত্রাংশের অভাবে ৬০ ভাগ ইঞ্জিন অচল অতঃপর ট্রেন চলাচলের ভবিষ্যৎ?

প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রপাতির অভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের শতকরা ৫০ ভাগ রেলইঞ্জিন অচল হইয়া রহিয়াছে এবং আগামী কিছুদিনের মধ্যে সমগ্র রেল চলাচল ব্যবস্থা ব্যাহত হইবার আশংকা করা হইতেছে।

জানা গিয়াছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, লালমনিরহাট ও পাহাড়তলী এই চারটি ডিভিশনে ১৩০টি ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে ৪০টি, দুর্ঘটনায় ১২টি এবং যন্ত্রাংশের অভাবে ২০টি ইঞ্জিন সম্পূর্ণ অচল হইয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ২৮, ১৯৭৩

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রায় দেউলিয়া অবস্থা

বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রায় দেউলিয়া অবস্থায় আসিয়াছে। ১৯৭৪ সালের পয়লা জানুয়ারী বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক হইতে বাংলাদেশ রেলওয়ের লওয়া 'ওভার-ড্রাফটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে সাড়ে এগার কোটি টাকা। স্বাধীনতা পূর্ব-কালে ১৯৬৬ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান পূর্ব রেলওয়ে একবার পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্ক হইতে সর্বাধিক পরিমাণ দেড় কোটি টাকা 'ওভার ড্রাফট' লইয়া-ছিল, উহাতে বিশেষ হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। বাংলাদেশ রেলওয়ে এখন উহার দশ গুণ অধিক পরিমাণ 'ওভার ড্রাফট' লইয়াও থই পাইতেছে না।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১২, ১৯৭৪

রূপসা—বাগেরহাট লাইনে কয়লার অভাবে খুলনা-বাগেরহাটে ট্রেন চলাচল বন্ধ

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৩, ১৯৭৪

ডাক ধর্মঘটের ফলে প্রতিদিন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতি

ডাক ধর্মঘট অব্যাহত থাকার ফলে ডাক বিভাগকে প্রতিদিন প্রায় দেড়লক্ষ টাকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৭৪

ডাক ধর্মঘটে ১৩ দিনে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতি

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৭৪

ছাব্বিশ মাসে অষ্টম প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুর্ঘটনা

৪৩ জন হতাহত

—ইত্তেফাক মার্চ ৫, ১৯৭৪

আবার মুখোমুখী ট্রেন সংঘর্ষ

—ইত্তেফাক মার্চ ৮, ১৯৭৪

১২ দিনে চতুর্থ ট্রেন দুর্ঘটনা : ১০ জন নিহত শতাধিক আহত

আবার ট্রেন দুর্ঘটনা। কমপক্ষে আবার দশটি জীবনের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি, শতাধিক আহত যাত্রীর যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ। কুমিল্লা হইতে মাত্র ৬ মাইল দূরে লাইনচ্যুত ঢাকা-চট্টগ্রাম দুই নম্বর ডাউন মেল।

—ইত্তেফাক মার্চ ১২, ১৯৭৪

টায়ার-টিউবের অভাব : সড়ক পরিবহণ সঙ্কটের আশঙ্কা

—ইত্তেফাক মার্চ ১৪, ১৯৭৪

গতকাল চট্টগ্রাম হইতে কোন ট্রেন ছাড়ে নাই

রেলওয়ে গার্ড-পুলিশ সংঘর্ষজনিত পরিস্থিতির অবনতি

রক্ষীবাহিনী মোতায়েন, বিডিআর তলব

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৩, ১৯৭৪

আর একটি মুখোমুখি ট্রেন দুর্ঘটনায় ৩ জন নিহত : ৭ ব্যক্তি আহত

দৈনিক ইত্তেফাকে আর ট্রেন দুর্ঘটনার আশঙ্কা নাই বলিয়া রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর আজ বিকাল সোয়া ৬টার দিকে মেহেরুল্লাহ্ নগর ও বারোবাজারের মাঝামাঝি স্থানে পুনরায় একটি মালবাহী ট্রেন ও একটি ইঞ্জিনের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন নিহত ও ৭ জন আহত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল, ১৩, ১৯৭৪

কোস্টারগুলো নিলামে উঠার দিন গুনছে

যান্ত্রিক গোলযোগ, যন্ত্রাংশের অভাব ও মেরামত সুবিধার অভাবে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের মোট ৫টি কোস্টারের মধ্যে চারটি অচল হয়ে পড়েছে।

—সোনার বাংলা এপ্রিল ২৮, ১৯৭৪

রোজ গড়ে ১২ শত টেলিফোন বিকল থাকে

রাজধানী শহরের মোট ৩৩ হাজার ৫৭টি টেলিফোনের মধ্যে গড়ে ১ হাজার ২ শতটি অর্থাৎ শতকরা ৪ ভাগ টেলিফোনই প্রতিদিন অকেজো হইয়া থাকে।

—ইত্তেফাক জুন ১১, ১৯৭৪

খুলনায় ৫ শতাধিক ওয়াগন অচল হইয়া রহিয়াছে

—ইত্তেফাক জুন ১৭, ১৯৭৪

খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানী না করিলে জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়া যাইবে

প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশের তীব্র অভাব বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকারী অনীহা বা অপারগতা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ এবং সর্বোপরি জ্বালানি ও কয়লা সংকটে বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ সংস্থার অবস্থা শোচনীয়। অবিলম্বে খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানী না করিলে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে চরম অচলাবস্থা দেখা দিবে এবং আগামী মার্চ মাসের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশের নদী পথে ও উপকূলীয় এলাকায় জাহাজ চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২৪, ১৯৭৪

সপ্তাহকালের ব্যবধানে আর একটি লঞ্চ ডুবিবে তিন শতাধিক যাত্রীর প্রাণহানি

আবার লঞ্চডুবি। ধলেশ্বরীতে এম. এল. তিতাস ডুবির পর ৭ দিন যাইতে না যাইতেই মাত্রাতিরিক্ত যাত্রীবহন করিয়া খুলনার ঢাকিয়া নদীতে এম. এল. জয়নাব নামে আরেকটি লঞ্চডুবির খবর পাওয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনায় তিনশতাধিক যাত্রী প্রাণ হারাইয়াছে বলিয়া আশংকা প্রকাশ করা হইয়াছে।

—**ইত্তেফাক** অগ্রহায়ণ ৫, ১৩৮১

শতকরা ৬০ ভাগ অচল: মাসে প্রায় ২০ লাখ বিআরটিসি কা মাল দরিয়ামে ঢাল

পরিকল্পনা কমিশনের এক জরিপে জানা গেছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত সড়ক পরিবহণ সংস্থা বিআরটিসি বর্তমানে শুধু একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানই নয় প্রতি মাসে এর গচচার পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ টাকা।

—সোনার বাংলা জুন ৮, ১৯৭৫

সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় মতামত

ঘরে-বাইরে

..ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত বুধবার রাত্রে সুরমা মেলের শত শত যাত্রী স্ত্রী-পুত্র পরিজনসহ ট্রেনের জন্য ঢাকা স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ঘণ্টাখানেক পরও যখন ট্রেন প্লাটফর্মে দেখা গেল না তখন যাত্রীরা খবর নিয়ে জানতে পারলেন বগি নেই, বগির বড্ড অভাব। বগি যোগাড় করা যাচ্ছে না বলেই যাত্রা বিলম্বিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়সূচীর ঘণ্টা দুই পর সুরমা মেল গন্তব্যস্থল অভিমুখে রওয়ানা হয়। গভীর রাত্রের ট্রেন, কিন্তু তাহলে কি! পেটে-পিঠে-ছাদে সর্বত্র মানুষ আর মানুষ। যেখানে পরিষ্কার ভাষায় '১৫ জন বসিবেক' লেখা সেখানে ১১৫ জন যাত্রী। মাথার উপর ফ্যানগুলো নিথর-নিস্তব্ধ। সামনের দিকে কয়টি কামরা অন্ধকার। চারদিকে হৈচৈ, ছেলে-মেয়ের চীৎকার। এরই মধ্যে যাত্রা শুরু করে রাত্রি প্রায় দেড়টায় ট্রেন পুবাইল ব্রিজ অতিক্রম করে। তারপর স্তব্ধ হয়ে পড়ে উহার চলার গতি। কর্তব্যরত গার্ড তখন ব্যাপারটা কি জানার জন্য ইঞ্জিনের দিকে ধাবিত হন। কিন্তু বিধি বাম। কিছুদূর যেতেই একটি ফার্স্টক্লাসের কিছু যাত্রী গার্ডকে ট্রেন থেমে পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করে। গার্ড কারণ বলার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা ক্ষিপ্ত হয়ে 'যার মুখে যা আসে' তাই বলতে শুরু করে দেয়। বেচারা গার্ড অধোবদনে সামনের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই বিক্ষুব্ধ সেকেণ্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের পাল্লায় পড়ে যান। জনৈক যাত্রী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'ট্রেন ছাড়বার পূর্বে ইঞ্জিনের অবস্থা পরীক্ষা করেননি কেন?' গার্ড জবাব দেন, 'এ দায়িত্ব আমার নয়। এসব কারিগরি বিষয় দেখার দায়িত্ব অন্যদের।' সরকারী পত্রিকা খবর দিয়েছেন, এতে বিক্ষুব্ধচিত্ত যাত্রীরা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। শুরু হয়ে যায় 'হাটুরে হামলা।' বিপদগ্রস্ত গার্ড তখন 'পুলিশ পুলিশ' বলে চীৎকার করতে শুরু করেন। কিন্তু ট্রেনে কর্তব্যরত পুলিশ সাড়াদানে বিরত থাকে।

..খুব বেশী দিনের কথা নয়, ঢাকা আগত চাটগাঁ মেলের এক সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টের কোণায় বসে আছি। ভোর হয় হয় অবস্থায় ট্রেন ভৈরব বাজার স্টেশনে পেঁৗছে। অমনি শুরু হয়ে যায় আর একদফা-তুল-কালাম কাণ্ড। প্লাটফর্মের উল্টাদিকে দণ্ডায়মান এক ভদ্রলোক স্ত্রীর কোলে শিশু সন্তানটিকে দিয়ে জানালা দিয়ে অতিকষ্টে ভিতরে ঢুকেন। তারপর বাচচাটিকে টেনে তুলে ধরেন স্ত্রীর প্রসারিত বাহু। আস্ত একটা যুবতী মেয়েকে জানালার

ছিদ্রপথে এত উপরে টেনে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। ঘর্মাক্ত ভদ্রলোক তখন এক কলাফেরীওয়ালার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফেরীওয়ালা পরনারীর দেহ স্পর্শ করতে ইতস্ততঃ শুরু করলে ভদ্রলোক চীৎকার করে বলে উঠেন 'আমার স্ত্রী আমি অর্ডার দিচ্ছি, পিছন দিকে ধাক্কা দিন। তার পরের দৃশ্য অবর্ণনীয়। আমাকে মাফ করবেন। ক্ষোভে-দুঃখে-লজ্জায় কাঁপতে কাঁপতে আমি শুধু বললাম, 'আচ্ছা বেইজ্জত তো আপনি!' ট্রেন-যাত্রায় এমনি বেইজ্জত দৃশ্য ঘটছে অহরহ। ৬ হাজার বগি এরই মধ্যে বিকল হয়ে পড়েছে এবং 'আণ্ডাল গিয়ার' ও অন্যান্য খুচরা যন্ত্র-পাতির অভাবে প্রত্যহ দু' একখানা করে ডিপোতে আশ্রয় নিচ্ছে। ঐদিকে বিদেশ হতে যে পাঁচ হাজার বগি আমদানীর কথা ছিল, এখনও তা কথায়ই সীমাবদ্ধ রয়েছে। জনৈক রেলওয়ে অফিসারের ভাষায়, "রেলের অবস্থা অতিশয় খারাপ। বগি যা কিছু আছে ইঞ্জিনের অবস্থা ভয়াবহ।"

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় অক্টোবর ২২, ১৯৭৪

রজানৈতিক নিপীড়ন

- লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেবো
- ঢাকার রাজপথ রক্ত রঞ্জিত
- জাতির জনকের বিরুদ্ধে কুৎসাকারীকে
- নিশ্চিহ্ন করা হবে চারশ শ্রমিক হত্যা!
- বিরোধীদলীয় পাঁচ জন কর্মীকে
  পিটিয়ে হত্যা
- পুলিশের উপর রক্ষীবাহিনী চড়াও

গাবতলীর জনসভায় কৃষক নেতা আবদুল মালেক

"স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যদি কোন দল চক্রান্ত করে থাকে তাহলে আও-য়ামী লীগই করছে।" —গণকণ্ঠ অক্টোবর ১০, ১৯৭২

জাসদ নেতার ১৬টি জিজ্ঞাসা

সিলেটের সুনামগঞ্জে গত বৃহস্পতিবার জাসদ নেতা সরকারের নিকট ১৬টি প্রশ্ন তুলে ধরেন। তার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন ছিল, মিথ্যা স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করে কোন বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ অবদানকে মিথ্যা ফলাও করার চেষ্টা করা হয় নাই কি? শ্রমিক ও চাকুরীজীবীদের শতকরা ২৫ টাকা বেতন বাড়ালেও ১০০ টাকার মূল্য ষাট টাকা হয়ে যাওয়ার বেতন শতকরা ২০ টাকা কমে যায়নি কি? ন্যায্যমূল্যের দোকানের নামে কি জনগণকে ভাওতা দেওয়া হয়নি? 'মুসলিম বাংলা' গেরিলা ফ্রন্টের নামে কেন এখনও মৃত্যু পরোয়ানা আসছে? ভারতীয় কারাগারে এখনও মুক্তি-যুদ্ধারা আটক রয়েছে কেন? প্রভৃতি। তিনি বিজয় দিবসকে একটা প্রহসন বলে উল্লেখ করেন। —সোনার বাংলা ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭২

সোহরাওয়ার্দী ময়দানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি—'লালঘোড়া দাবড়িয়ে দেবো'

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করে বলেন, "আমার নির্বাচন দেয়ার উদ্দেশ্য আছে। এমনি এমনি নির্বাচন দেই নাই। ৭ই মার্চের পর আমি 'লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেবো।'
—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ১৮, ১৯৭২

ছাত্র জনতার প্রতি সরকারের নববর্ষের উপহার
ঢাকার রাজপথ রক্তরঞ্জিত
পচিশ মিনিট ধরে পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষনে ২ জন নিহত : বহু আহত

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ২, ১৯৭৩

পল্টনে মুজিববাদী ছাত্র সংগঠনের সভায় ভাষণ
'জাতির জনকের বিরুদ্ধে কুৎসাকারীকে বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন করা হবে

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ৬, ১৯৭৩

আওয়ামী লীগের সশস্ত্র গুণ্ডাদের হামলায় ৪শ' শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদ

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৭৩

মতিঝিলের জনসভায় জাসদ নেতা : '৭১ সালে স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল

—গণকণ্ঠ মার্চ ৪, ১৯৭৩

ভাসানী ন্যাপ নেতার অভিযোগ

ভাসানী ন্যাপের সহ-সভাপতি ডঃ আলিম আল রাজী গতকাল (শুক্রবার) সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল "অসদুপায় অবলম্বন এবং প্রশাসনিক যন্ত্রকে ব্যবহার করিয়াছেন" বলিয়া অভিযোগ করেন। তিনি বলেন : "দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন নিরপেক্ষ হয় নাই"। —ইত্তেফাক মার্চ ১০, ১৯৭৩

মোজাফফর ন্যাপের বিবৃতি : আওয়ামী লীগারদের গুণ্ডামী হত্যা সন্ত্রাসের পরিণতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে

—গণকণ্ঠ মার্চ ১১, ১৯৭৩

গোপালগঞ্জে মোজাফফর ন্যাপ প্রার্থীসহ বিরোধীদলীয় ৫ জন কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা

—গণকণ্ঠ মার্চ ১১, ১৯৭৩

রক্ষীবাহিনী এবার পুলিশের উপর চড়াও হয়েছে

'রক্ষীবাহিনী' নামের যে আধা সামরিক বাহিনীটি সরকারকে আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে সহায়তা দান করছে, সেই বাহিনীটিকে নিয়ে নানা মহলে নানা প্রতিক্রিয়া। দেশের বিরোধী-দলগুলোর প্রত্যেকটিই রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি বিশেষ দলের লেজুড় বৃত্তি করার অভিযোগ এনেছে। সারা দেশে দুষ্কৃতিকারী দমানোর নামে এই বাহিনীর লোকেরা আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধীদেরকে শেষ করার কাজে নেমেছে বলে বিরোধী-দলগুলো অভিযোগ করে আসছে। রক্ষীবাহিনীর সব কার্যকলাপকে ম্লান করে দিয়ে গতকাল ঘটেছে এক অবাক কাণ্ড। রাজধানীর একটা থানাকে তারা 'টার্গেট' করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

—গণকণ্ঠ মে ৪, ১৯৭৩

রাষ্ট্রপতির ৮, ৯, ৫০, ৬৯, ৮৮, ১৪২ নং আদেশ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতি : 'এই আদেশ মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী'

—গণকণ্ঠ জুলাই ৪, ১৯৭৩

আলীগ নেতার দাপট : চেয়ার ছেড়ে না দিলে চাকুরী নটের সম্ভাবনা

—গণকণ্ঠ জুলাই ৫, ১৯৭৩

দিনাজপুরের সরকারী কর্মচারীদের অবস্থা—'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'

ছাত্রলীগের সেমিনারে সৈয়দ নজরুল : বাংলার আকাশে মেঘের ঘনঘটা : এই মেঘ সরাইতে হইবে

—ইত্তেফাক আগস্ট ২২, ১৯৭৩

পুলিশদের অবস্থা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' পাবনা, সিরাজগঞ্জ, শাহজাদপুর ও উল্লাপাড়ায় এখন গুণ্ডাবাহিনী বেড়াচ্ছে

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ৩, ১৯৭৩

দুষ্কৃতিকারী দমনের নামে চরম সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম : পাবনার যুবতী মেয়েরা ইজ্জতের ভয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭৩

জেলখানায় স্থানাভাব : কয়েদীদের দুরাবস্থা

ঢাকা ও রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারসহ দেশে ৫৪টি জেলখানায় বর্তমানে ৫৪ হাজার লোক বন্দী রহিয়াছে।

এই ৪৪ হাজার বন্দীর মধ্যে অধিকাংশই বিচারাধীন কয়েদী। ইহাছাড়া দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদেরও উক্ত হিসাবে ধরা হইয়াছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭৩

আজকের পাবনা জেলার সুজানগর : হত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ গণ-নির্যাতন

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ১৯, ১৯৭৩

সিরাজগঞ্জে রক্ষী ও মুজিববাদী গুণ্ডাবাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ : ২১টি ক্যাম্প থেকে অপারেশন চালনো হয় ৫ শতাধিক বামপন্থী কর্মী হত্যা

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২৬, ১৯৭৩

প্রধানমন্ত্রীর নিকট য়্যামনেস্টি ইণ্ডারন্যাশনালের পত্র ক্ষমাপ্রাপ্তদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের সুপারিশ

বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আওতায় মুক্তিপ্রাপ্ত সকল বন্দীর পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'য়্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল' প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট প্রেরিত এক পত্রে আবেদন জানাইয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১১, ১৯৭৪

১৪ই জানুয়ারী হইতে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা শহরের শহরতলী ও নারায়ণগঞ্জে জনসভা, গণজমায়েত পথসভা ও মিছিল নিষিদ্ধ

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১৪, ১৯৭৪

'৭০ মাসের হিসাব: রক্ষীবাহিনী ৪১৯৬ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ২৫, ১৯৭৪

গেল হপ্তার রাজনীতি : রক্ষীবাহিনীর রুদ্র মূর্তির সামনে ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়েছিল

গত সপ্তাহে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেশ কিছু চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে। সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারি এবং জাসদ কর্তৃক তা ভাংগনের ফলে দেশের রাজনীতিতে যে বন্ধাত্ব নেমে এসেছিল তা কিছুটা দূরীভূত হয়েছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে তামাক খাইবার খায়েস যারা করেন তারাও গত সপ্তাহে কিছুটা খোরাক পেয়েছেন।

পত্র পত্রিকার লোকেরাও গেল সপ্তাহে পত্রিকার স্বাধীনতা নতুনভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছে। সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলো ঘটনার কোন গুরুত্ব দেয়নি। অপরদিকে বিরোধী পত্রিকাগুলো বিরোধী ভূমিকার জন্য বাজারে হট কেকের মত বিক্রি হয়েছে। টিয়ার গ্যাস, রাইফেলের বাট

এবং বেয়নেটের প্রদর্শনীর মধ্যে রিপোর্টাররা বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করেছে। কাঁদুনে গ্যাস আর পুলিশ রক্ষীর রাইফেলের মুখে জীবন ও ইজ্জতের ঝুঁকি নিয়ে রিপোর্ট করার আনন্দ অনুভব করেছেন। কিন্তু পত্রিকার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশিত তিন স্লিপ নিউজ করে অনেকে সাংবাদিকতা ছেড়ে দেয়ার কথা ভেবেছেন।

—সোনার বাংলা জানুয়ারী ২৭, ১৯৭৪

রাষ্ট্রপতির ৫০ নম্বর সেন্সরশীপের বিধানসহ বিশেষ ক্ষমতা বিল পাস

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৭৪

রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার বিশেষ ক্ষমতা আইন ও নিপীড়নমূলক আইন সম্পর্কে আতাউর রহমান খান : 'আমরা কেয়ামতের কাছাকাছি এসে পৌছেছি'

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে গতকাল জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, আইনের প্রতি ক্ষমতাসীনদের অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলেই দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। রক্ষীবাহিনী বিভিন্নস্থানে আইনের অপপ্রয়োগ করছে। এক কথায় বলতে গেলে আমরা 'কেয়ামতের' কাছাকাছি এসে পৌছেছি।

—গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ২০, ১৯৭৪

সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ভ্যানাপ নেতৃবৃন্দ : 'যারা লুটপাট করে খেতে পারে না তাদের পক্ষে বাঁচার কোন উপায় নেই'

—গণকন্ট এপ্রিল ৮, ১৯৭৪

২৯শে এপ্রিল হইতে ভাসানীর আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আজ স্থানীয় বিন্দুবাসিনী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক জনসমাবেশে ভাষণদানকালে বলেন যে, তিনি দেশের বর্তমান খাদ্য সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য আগামী ২৯শে এপ্রিল হইতে আমরণ অনশন শুরু করিবেন।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১১, ১৯৭৪

দেশের সংকটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকার-সমর্থক কমিউনিস্ট পার্টি : দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনযন্ত্র ও শাসকদলের একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সরকার-সমর্থক বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলী গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, দেশ আজ চরম সংকট ও বিপর্যয়ের মুখে উপস্থিত। মওজুদদার, মুনাফাখোর, কালোবাজারী, চোরাচালানী ও লাইসেন্স পারমিট শিকারীদের চক্রান্তের সাথে দুর্নীতিগ্রস্ত ও আমলাদের যোগসাজস সর্বোপরি শাসক দলের একাংশ উক্ত সমাজ বিরোধীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিচ্ছে বলেই বর্তমান সময়ের সংকট ও বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে।

—গণকণ্ঠ এপ্রিল ১৯, ১৯৭৪

জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা আতাউর রহমানের ভাষণ—নিয়মতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ হলে বিপ্লব অনিবার্য : ক্ষমতাসীন সরকার বিশ্বাসঘাতক : প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব ফ্যাসিস্ট

জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা জনাব আতাউর রহমান খান বলেছেন, ক্ষমতাসীন সরকার বিশ্বাসঘাতক, এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব হচ্ছে ফ্যাসিস্ট। তিনি মুখে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা বলেন কিন্তু কার্যতঃ এর কোন কিছুই তিনি বিশ্বাস করেন না।

—গণকণ্ঠ আগস্ট ৩০, ১৯৭৪

কর্মীসভায় কামরুজ্জামান : 'সমস্যার সমাধান করিতে পারি নাই—এই সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে'

গত মঙ্গলবার ঢাকা নগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মী-সভায় বিশেষ অতিথির ভাষণে জনাব কামরুজ্জামান বলেন যে, জাতি সংকটের মধ্যে অবস্থান করিতেছে এবং আমরা সমস্যার সমাধান করিতে পারি নাই—এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১৪, ১৯৭৪

সোহরাওয়ার্দীর মাজারে আয়োজিত আলোচনা সভায় আবুল ফজল : সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থ হলে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না তিনি প্রধানমন্ত্রীই হোন আর বঙ্গবন্ধুই হোন

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ৬, ১৯৭৪

জনগণ গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্র বিশ্বাস করবে না —আতাউর রহমান খান

"গত মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের অবস্থার ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। প্রতিদিনই আমরা বেশী বেশী করে পর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। এভাবে চলতে থাকলে দেশ কোথায় গিয়ে ঠেকবে বলা মুশকিল। আপাততঃ দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

তিনি বলেন, বর্তমান অযোগ্য অথর্ব সরকার সাহায্য ভিক্ষা ছাড়া আর কোন চিন্তা করেন না। খাদ্যদ্রব্য সব বাইরে থেকে আসছে। শিল্প কার-খানায় উৎপাদন বন্ধ। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের প্রধান মাধ্যম ছিল পাট। সেই পাটের ভাগ্য নীলের সাথে একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে গেছে। চা, চামড়া-সহ আর সব কিছুর অবস্থাও তাই। বর্তমান সরকারই এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

—সোনার বাংলা ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭৪

জরুরী অবস্থা ঘোষণা

গতকাল (শনিবার) সমগ্র বাংলাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে। সংবিধানের ১৪১-ক অনুচ্ছেদের-১ নম্বর ধারা-বলে রাষ্ট্রপতি জনাব মুহম্মদুল্লাহ্ এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। জরুরী অবস্থা ঘোষ-ণার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র বলেন: "আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুন নিরাপত্তা ও দেশের অর্থনৈতিক জীবন হুমকির সম্মুখীন হওয়ায় সরকারের এহেন ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত বিকল্প কোন পথ ছিল না।"

গতকাল জারিকৃত 'জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স—১৯৭৪'-বলে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসহ সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকার কার্যকরীকরণের জন্য আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়ার অধিকারও সাময়িকভাবে স্থগিত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির জারিকৃত নির্দেশ অনুযায়ী সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮,

৩৯, ৪০, ৪২ ও ৪৩ ধারা বর্ণিত অধিকারসমূহ কার্যকরীকরণের জন্য যে-কোন ব্যক্তির যে-কোন আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়ার অধিকারও এই কার্যকরীকরণের জন্য যে-কোন আদালতে বিচারাধীন সকল মামলা জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালে স্থগিত থাকিবে। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির ঘোষণাপত্রে প্রতি-স্বাক্ষর দান করিয়াছেন। —ইত্তেফাক ডিসেম্বর ২৯, ১৯৭৪

বিদেশী পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিতে "জরুরী অবস্থা এক অনন্যোপায় পদক্ষেপ"—স্টেটসম্যান
"বর্তমান অবস্থায় পর্যাপ্ত ক্ষমতা হাতে নেয়া যুক্তি-যুক্ত হয়েছে"—প্রাভদা

—সোনার বাংলা জানুয়ারী ১২, ১৯৭৫

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট : সৈয়দ নজরুল ভাইস প্রেসিডেন্ট : একটি মাত্র রাজনৈতিক দল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসন চালু করা হয়েছে। এখন থেকে দেশ প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে। সর্বময় ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত থাকবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য গতকাল শপথ গ্রহণ করেছেন। সংবিধানের এই সংশোধনী অনুযায়ী দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে এবং তার নাম হবে ন্যাশনাল পার্টি। —সোনার বাংলা জানুয়ারী ২৬, ১৯৭৫

২৫শে এপ্রিল সংসদ সদস্যদের বাকশালে যোগদানের শেষ সময়সীমা

প্রেসিডেন্ট এক আদেশবলে জাতীয় সংসদের সদস্যদের জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্যপদ গ্রহণের সময়সীমা ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত নির্ধারিত করিয়াছেন। —ইত্তেফাক এপ্রিল ১৮, ১৯৭৫

আতাউর রহমান খানের বাকশালে যোগদান

অধুনালুপ্ত বাংলাদেশ জাতীয় লীগের সভাপতি, সংসদ্-সদস্য জনাব আতাউর রহমান খান কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৬, ১৯৭৫

সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় মতামত

ফ্যাসিবাদের মহামারী

সব মহল থেকেই হুমকি-ধমকি শোনা যাচ্ছে। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার সমানে চলছে। দেশটা যেন হুমকি-ধমকির মহামারীতে ছেয়ে গেছে। সবাই আক্রান্ত। সরকারী বেসরকারী শ্রমিক, ছাত্র, রাজনৈতিক দল কেউই এই মহামারী থেকে রেহাই পাইনি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত আমাদের দেশের সব মহলের রাজনীতিকরাই এ ব্যাপারে চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন। সচেতন দেশ প্রেমিকদের সাথে গলা মিলিয়ে আমরা মহামারীর আশঙ্কার কথা জাতিকে জানিয়েছিলাম। আমাদের সে আশা আদৌ পূরণ হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে কিনা এক্ষণে তা নিশ্চিত করে বলাও যায় না।

দেশময় মহামারী লেগে গেলে যা হয় আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক দিগন্তে তারই ঘনঘটা দেখা দিয়েছে। চরম সংকটের মধ্যে গোটা জাতি আজ হাবুডুবু খাচ্ছে। সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য কেউ এগিয়ে আসতে পারছে না। কেননা সবাই সে রোগে আক্রান্ত। মুমূর্ষু অবস্থায় সবাই যে কাতরাচ্ছে। কে কাকে উদ্ধার করবে, প্রতিষেধকের যারা ব্যবস্থাপক তারাই তো বেশী।

অথচ যে জীয়নকাঠি আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে সংরক্ষিত ছিল তার সুষ্ঠু ব্যবহার হলেই দেশটা এমন সংকটাবর্তে ঘুরপাক খেত না। সাড়ে সাত কোটি পীড়িত আদম সন্তান এমন লাঞ্ছনা গঞ্জনার শিকারে পরিণত হতো না। হাঁ, গণতন্ত্রের কথাই বলছি। বর্তমানে সরকার গণতন্ত্রের উত্তরসুরী হয়েও গণতান্ত্রিক রাজনীতির পবিত্র পথে চলেননি। চলছেন আঁকা বাঁকা পথে। তাই অদৃশ্যভাবে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়ে গেছে। ফ্যাসিবাদের মরণ ছোবলে সরকারী, বিরোধী সবাই আক্রান্ত। শত চেষ্টা করেও কেউ আর এর থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। সরকারী কর্তৃপক্ষ আবোল তাবোলভাবে অসংযত কথাবার্তা বলেন। জনসমর্থনহীন এক নায়ক সরকারের মত হুঙ্কার ছাড়েন।

—সোনার বাংলা সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৭২

ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ : যত আগে তত ভাল

..."দালালি" এমন একটা সাংঘাতিক অপরাধ যে কারো বিরুদ্ধে দালালির অভিযোগ আনা মাত্র তিনি দালাল হইয়া যান। দালালের পক্ষে ওকালতি করাও দালালি। কাজেই দালালি অপরাধে অভিযুক্ত আসামীরা প্রায়ই

উকিল পাইতেন না। এ দালালি ত আর পাটের দালালি নয়, শেয়ার-মার্কেটের ব্রোকারিও নয়। এ দালালি মানে "কলেবোরেশন'। 'কলেবোরেশন' হইলেও এটা কিন্তু 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কলেবোরেশন' নয়। 'লিটারারি বা আর্টিষ্টিক কলেবোরেশন' ত নয়ই। এ 'কলেবোরেশনের' অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রুর সহিত সহযোগিতা। কাজেই গুরুতর অপরাধ। অপরাধ এমন গুরুতর বলিয়াই তার অভিযোগটাই যথেষ্ট। প্রমাণের দরকার নাই। এই কারণেই দালালি অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থনের জন্য উকিল পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। কারণ দেশপ্রেমিক তরুণরা ইচ্ছুক উকিলদের বাড়ি বহিয়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া আসিতেন।

..এইখানেই নতুন সমস্যা উদ্ভবের আশংকা দেখা দিয়াছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ঘোষণায় আমরা জানিতে পারিলাম, গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন হাজার আসামীর বিচার হইয়া গিয়াছে। আরও সাঁইত্রিশ হাজার বাইশ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট হইয়াছে। বাইশ মাসে যদি তিন হাজার জনের বিচার হইয়া থাকে, তবে মাসে গড়ে ১৩৬টা, তার মানে দৈনিক চারটা বিচার হইয়াছে। স্মরণীয় যে, দেশপ্রেমিক তরুণদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ খুব বেশী-সংখ্যক উকিল দালালদের পক্ষে ওকালতি করেন নাই। যাঁরা করিয়াছেন, তাঁরাও খুব বেশী জেরা-জবানবন্দির ঝামেলায় যান নাই। এখন সরকার দালালদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করায় উকিলরাও জেরা-জবানবন্দিতে স্বভাবতঃই অধিকতর সহৃদয় সাহস প্রদর্শন করিবেন। তাতে প্রতি মোকদ্দমায় তুলনামূলকভাবে সময় বেশী লাগিবে। বেশী সময়ের কথা বাদ দিয়া এই হিসাবে ধরিলেও বাকী ৩৭০২২ জন আসামীর বিচার করিতে ২৩ বছর সময় লাগিবে। এতদিন মন্ত্রীরা সকলে খোদার ফযলে বাঁচিয়া থাকিলেও সব আসামী এবং অনেক সাক্ষী বাঁচিয়া থাকিবেন কিনা, সন্দেহ আছে।

রাখেন, রাখেন, পাঠক ভাই-বোনেরা। আপনারা আগেই আমার ভুল ধরিবেন না। আমি নিজেই আমার হিসাবের ভুল ধরিয়া ফেলিয়াছি। এই সোজা কথাটা আমার বোঝা উচিত ছিল যে, আমাদের সরকার গদিতে বসিয়াই বিচার শুরু করিতে পারেন নাই। গদিতে বসিয়াই গ্রেপ্তার শুরু করিয়াছিলেন ঠিকই, কিন্তু বিচার শুরু করিতে বেশ কিছুদিন সময় লাগিয়াছিল। সব রাজনৈতিক অপরাধের মতই দালালির বেলাও আগে গ্রেপ্তার, তারপর অভিযোগ, তার আরও পরে সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড়। সব জনপ্রিয় সরকারের মতই বাংলা সরকারও গোড়ায় ঘোষণা করিয়াছিলেন

বটে যে, তাঁরা 'উইচ হান্টিং' করিবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ওয়াদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। স্বভাবতঃই পারেন নাই। দুনিয়ার কয়টা সরকার নিজেদের সব ওয়াদা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন? অতএব গ্রেপ্তার করা দালালদের বিরুদ্ধে সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড় করিতে সময় লাগিয়াছিল। কতদিন সময়? যেখানে একটা শিশু-সন্তান তৈয়ার করিতে দশ মাস সময় লাগে, সেখানে দালালদের বিরুদ্ধে সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড়ে ওর কম সময় নিশ্চয়ই লাগে নাই। বিশেষতঃ ঘটনার সময় ত আমাদের সরকারও তাঁদের কর্মচারীরা মুজিবনগরে ছিলেন। এই সব অবস্থা বিচার করিয়া ধরা যাক, বিচার শুরু করিতে দশ মাস সময় লাগিয়াছিল। বাইশ হইতে বিয়োগ করুন দশ। হাতে থাকে বার। এই বার মাসে তিন হাজার আসামীর বিচার হইয়াছে, এটা ধরা যায়। বার মাসে তিন হাজার হইলে মাসে হইল আড়াইশ'। দালালির বিচার ছাড়াও হাকিমদের আরও মামলা-মোকদ্দমা আছে। সে হিসাবে মাসে আড়াই শ ভাল পারফর্মেন্স। সরকার অনুকম্পা দেখাইবার পর আসামী-দের পক্ষে উকিলের ভিড় হইতে পারে। ফলে এই রেইট ঠিক নাও থাকিতে পারে। তবু যদি এই রেইট ধরা যায়, তবে মাসে আড়াইশ' হারে সাইত্রিশ হাজারে ১৪৮ মাস, মানে বার বছর লাগিবে বিচার শেষ হইতে। হায়াত-মওতের ব্যাপারে আমার আগের হিসাব ঠিক না থাকিলেও খুব কমও হইবে না।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় সরকার যখন একবার অনুকম্পার দরজা খুলিয়া-ছেন, ষোল হাজারের মত বন্দীকে মাফ করিয়া দিয়াছেন, তখন বাকী সবার ক্ষেত্রেও তেমনি উদারতা-প্রদর্শন করুন। অন্যথায় দুই বছর পরে আজ যেমন চারশ' লোককে প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিতে হইল, বার বছর পরে মানে গ্রেপ্তারের সময় হইতে চৌদ্দ বছর পরে আরও অনেক লোককে তেমনি মুক্তি দিতে হইতে পারে। সেটা কি ভাল দেখাইবে?

সরকারের সর্বশেষ প্রেসনোটে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার ও সহজ হইয়াছে। আগের সংবাদে বলা হইয়াছিল যে, আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়াতেই তাঁদেরে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।..আমি একাধিক-বার বলিয়াছি, আজো বলিতেছি, সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন আসামীদের প্রায় সকলেই রাজনৈতিক ভিন্নমতের দরুনই কথিত কাজ করিয়াছিলেন। সে সব কাজ তখন অপরাধ ছিল না। আমার বিশ্বাস, ওদের মধ্যে বাংলাদেশ-বিরোধী একজনও পাওয়া যাইবে না। দেশের প্রতি আনুগত্যে তাঁরা

কেউ আমাদের পিছনে পড়িবেন না। আমার বিনীত প্রস্তাব, এই শর্তে দণ্ড-প্রাপ্ত ও বিচারাধীন সকলকে মুক্তি দেওয়া হউক। দি-আয়রিয়ার দি বেটার।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় নভেম্বর ৩, ১৯৭৩

মঞ্চে-নেপথ্যে

..সত্য বটে, দেশের বাহিরে দুই-একটি বিশেষ মহল এই সাধারণ অনু-কম্পা প্রদর্শনে উৎকণ্ঠিত না-হউক অস্বস্তির মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ-বা ইহার পিছনে একটা 'ক্যালকুলেটেড রিস্ক' আবিষ্কারের কষ্ট-কল্পিত চেষ্টাও করিয়াছেন। এই দুই-একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে বঙ্গবন্ধুর 'জেনারেল য়্যামনেষ্টি' সারা বিশ্বে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হইয়াছে। 'য়্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল' এবং 'ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস' এর ন্যায় যে সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বন্দীদের জন্য সহজাত উৎকণ্ঠার দরুন কিঞ্চিৎ সমালোচনামুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখেও ইহার অকুণ্ঠ প্রশংসা। বিলাতের বিখ্যাত 'গার্ডিয়ান' পত্রিকা ইহাকে 'বছরের মহত্তম কার্য' বলিয়া জানাইয়াছেন। ক্ষমা একটি মহৎ কার্য। ইহাকে কে খাটো করিয়া দেখিতে পারে?

..সে যাই হউক, আমরা উপরে সাধারণ অনুকম্পার স্পিরিটের কথা বলিয়াছি। য়্যামনেষ্টির স্পিরিটের কথা প্রসঙ্গে আরও দুই-একটা কথা বলা দরকার। বস্তুতঃ এর কিছু কিছু আমরা এই সংবাদপত্রে পূর্বেও বলিয়াছি। আরো কেহ কেহ এর কোন কোন দিক উত্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রবীণ পার্লামেন্টারিয়ান ও আইনবিদ জনাব আসাদুজ্জামান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বার কাউন্সিলের সাম্প্রতিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির ৮ নং ও ৫০ নং আদেশ সংশোধনের দাবি জানাইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রস্তাবে ৮ নং আদেশের ব্যাপারে উপযুক্ত ক্ষেত্রে জামীন-দানের ক্ষমতা আদালতের উপর অর্পণ করিতে এবং ৫০ নং আদেশের যে-ধারায় (অর্থাৎ দশম ধারা) জামিনদানের ক্ষমতা আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত রাখা হইয়াছে তাহা বাতিল করিতে বলা হইয়াছে। বিচারে অব্যা-হতি পাওয়া সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কোর্টে সরকার পক্ষের আপীল করা বা অন্য কোন অজুহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে আটক রাখার ব্যবস্থাও ৫০ নং আদেশবলে ধৃত ব্যক্তিদের সামারি ট্রায়ালের ব্যবস্থা বিলোপ এবং

শাস্তির ন্যূনতম মেয়াদ সংক্রান্ত ধারা সম্পূর্ণ রহিত করার দাবীও জানানো হইয়াছে। ৫০ নং আদেশের অধীনে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের পরিবর্তে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার অনুষ্ঠানের জন্য বার কাউন্সিলের বিজ্ঞ আইন-বিদগণ সুপারিশ করিয়াছেন। উক্ত আদেশের ২(৪) ধারায় বর্ণিত অগ্নি-সংযোগের অপরাধের আওতা সংকুচিত করিয়া শুধু সরকারী সম্পত্তির ক্ষেত্রে সীমিত করার পরামর্শও দেওয়া হইয়াছে। বার কাউন্সিল হইতেছে দেশের আইনজীবীদের সর্বোচ্চ সরকারস্বীকৃত সংস্থা। ইহার সুচিন্তিত সুপারিশ-সমূহ নেহাত আইন ও ইনসাফের দৃষ্টিকোণ হইতেই উপস্থাপন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, লিবারেশনের পর তাড়াহুড়া করিয়া জারি করা রাষ্ট্রপতির এসব আদেশ যে ত্রুটিমুক্ত আদর্শ আইন নয়, আইন-প্রণেতাগণও তাহা বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু আইনমন্ত্রীও গত ২৪শে নভেম্বর এক ভাষণে ৫০ নং আদশ-কে 'খুবই দুঃখজনক আইন' এবং 'একজন সত্যিকার আইনজ্ঞের দৃষ্টিতে বড়ই বেদনাদায়ক' বলিয়া মন্তব্য করেন। কাহারও বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি, দোকান-পাট, কল-কারখানা জবরদখল হইয়া থাকিলে তাহাও সরকারী সহায়তায় উদ্ধার ও মালিকের হস্তে প্রত্যর্পিত হওয়া উচিত। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, 'সুনির্দিষ্ট অভিযোগও' এমন একটা বিশেষ পরিবেশে বিশেষ অবস্থার চাপে তাড়াহুড়া করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে যে, সেগুলি আইন ও ইনসাফের দিক হইতে যতটা সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত, অনেক ক্ষেত্রেই ততটা সুনির্দিষ্ট নয়। কাজেই যেসব কেসে অভিযোগ যথেষ্ট পরিমাণে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রতীয়মান হয় না সেগুলি সম্পর্কেও কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা, অন্ততঃপক্ষে নূতনভাবে ইনকোয়ারী করা সমীচীন।

..৮নং আদেশ ব্যতীত অপরাপর আদেশ ও আইন-বলেও এমন কিছু কিছু লোককে কারাগারে আটক রাখা হইয়াছে অথবা কিছু লোকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা ও হুলিয়া জারি করা হইয়াছে যাহারা মূলতঃ রাজ-নৈতিক কর্মী বা সাংবাদিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবী। তাঁহাদের বিষয়গুলিও সম্ভবতঃ উদার পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। এসব বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্ততঃ জামিন না-পাওয়ার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। এঁদের কেহ কেহ ইতি-মধ্যেই বৎসরাধিককাল হাজত খাটিয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, ৯ নং আদেশ সরকারী চাকুরিয়াদের কাঁধের উপর 'ডেমোক্লিসের তরবারির' ন্যায় ঝুলাইয়া রাখা আর আদৌ চলিতে পারে না। উহাও বাতিল বা আমূল সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

৮ নং আদেশই যখন কার্যতঃ বিলুপ্ত তখন ৯ নং আদেশ বহাল রাখার কোন যুক্তি নাই। অফিসিয়াল ক্লিক জিনিসটা সাংঘাতিক। শোনা যায়, কিছু কিছু কর্মচারী কপালের ফেরে সেরূপ ক্লিকের শিকার হইয়া চাকুরী হারাইয়া-ছেন। আজিকার পরিবর্তিত পরিবেশে তাঁহাদের এবং কার্যতঃ অনেকেরই কেস উদার পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষায়-তনের শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উদারনীতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এই দুর্দিনে এদেরে কর্মহীন বেকার ও সমাজের গলগ্রহ করিয়া না রাখিয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গীসহকারে নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে জাতির সেবা করার সুযোগ দান করা কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান-রত যে-সকল বাঙালীর নাগরিকত্ব বাতিল ও সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হইয়াছে তাহারা কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ ও বাংলাদেশের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য প্রদর্শন করিলে তাহাদের সকলের না-হউক অনেকের কেস সম্ভবতঃ পুনর্বিবেচনার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় ডিসেম্বর ২২, ১৯৭৩

বিদায়ী সতর্কবাণী

গত শনিবার খুলনায় অনুষ্ঠিত ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স-এর বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী অনেক কথার মধ্যে এমন কয়েকটি কথা বলিয়াছেন যাহা যে-কোন দেশপ্রাণ নাগরিকের চিন্তায় রীতিমত নাড়া দিবে। বিচারপতি চৌধুরী বলিয়াছেন: 'ইতিহাস বার বার প্রমাণ করিয়াছে, কোন সমাজ-ব্যবস্থাই নৈতিকতা-বিবর্জিত অবস্থায় বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না।'

..রাষ্ট্রপতি হিসাবে খুলনায় ভাষণই ছিল বিচারপতি চৌধুরীর কোন সম্মেলনে প্রদত্ত শেষ ভাষণ। তাই সে-ভাষণের উপরোক্ত অংশগুলিকে তাঁহার বিদায়ী সতর্কবাণী বলিলেও, বোধ করি অন্যায় হইবে না।

..আমরা 'সার্টিফিকেট' দেখাইয়া লাইসেন্স, পারমিট, কোটা-ডিলার-শিপ বাগাইতে ও বিক্রি করিতে, পরিত্যক্ত বাড়ী, গাড়ী, বিষয়সম্পত্তি দখল করিতে, আরও বেশী বড়লোক হওয়ার জন্য অনায়াসলব্ধ অর্থ-সম্পদ বিদেশে পাচার করিতে শুরু করিলাম। দুর্নীতি, অনাচার, অপকর্মে দেশটাকে ভরিয়া তুলিলাম। মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্র লইয়া রাস্তায় নামিয়া লুটপাট, হাইজ্যাক, ছিন-তাই, ভ্রাতৃহত্যা শুরু করিলাম। আত্মস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে বসাইয়া পূজা আরম্ভ করিলাম। কোথায় গেল

মুক্তি সংগ্রামকালীন সেই চরিত্র, কোথায় গেল সেই নৈতিকতা। পিপী-
লিকার পাখা গজাইলে যা হয়, আমাদেরও তাহাই হইল। অল্প দিনেই
আমরা অগ্নি-দগ্ধ হইয়া মুখ থুবড়াইয়া কঠিন সঙ্কটের গহ্বরে পতিত হইলাম
আশ্চর্য! তবু আমাদের অনেকের আজও চেতনা নাই। দিন যেন ফুরাইয়া
আসিল, তাই আমরা উন্মাদের মত আপন আপন আখের গোছাইতে ব্যস্ত ও
ব্যাপৃত। দেশ ও জাতির কথা ভাবিবার আমাদের ফুরসৎ কোথায়?

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় পৌষ ১২, ১৩৮০

রাজনৈতিক অপরাধী বনাম সাধারণ অপরাধী

বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে দালাল আইনে আটক
বন্দীদের ব্যাপক ভিত্তিতে মুক্তি প্রদানের সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া
'য়্যামনিষ্টি ইন্টারন্যাশনাল' প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট পত্র
দিয়াছেন।...রাজনৈতিক অপরাধ করিয়া যেমন দখলদার বাহিনীর সহিত
সহযোগিতা বা কোন উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়া যাঁহারা দালাল আইনে
অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, কেবল তাঁহাদিগকে সরকার ক্ষমা করিতে পারেন।
এক্ষেত্রে কথা থাকিয়া যাইতেছে যে, অভিযোগ আনয়নকালে এক বা-
একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঢালাওভাবেই অভিযোগ আনা হইয়াছিল এবং
কোন কোন ক্ষেত্রে ৩।৪ জন, এমনকি ২০।২২ জনের বেলায়ও বাঁধা গৎ
হিসাবেই ঢালাওভাবে দায়ের করা হইয়াছিল খুন, ধর্ষণ ও লুটতরাজের
অভিযোগ। সুতরাং কাহারা সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়িতেছেন, আর
কাহারা পড়িতেছেন না, তাহা লইয়া অসুবিধার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।
ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ছাড়িয়া দেওয়া
হইতেছে না বলিয়া একাধিক মহল হইতে যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে,
তাহার মূল কারণও ইহাই বলিয়া মনে হয়। তাছাড়া এমন ধরনের অভি-
যোগও ইতিমধ্যে উঠিতে শুরু করিয়াছে যে, যাঁহারা ভালমত তদবির করিতে
পারিতেছেন, কেবল তাঁহারাই ছাড়া পাইতেছেন। পক্ষান্তরে উপযুক্ত তদ-
বিরের অভাবে ক্ষমার আওতাধীন ব্যক্তিরা বিভিন্ন অজুহাতে এখনও বন্দী-
দশায় রহিয়াছেন।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় পৌষ ২৯, ১৩৮০

সেই মহা-অঙ্গীকার চির অধিকার লিপি

সম্প্রতি সংসদে 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ' সংশোধন করা হইয়াছে।
..যে সমস্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা রক্ষীবাহিনীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে
তাহা হইতেছে, রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা সন্দেহক্রমে যে-কোন লোককে
বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিতে পারিবেন, বিনা পরওয়ানায় যে-কোন
স্থান, গৃহ, যানবাহন বা ব্যক্তিকে তল্লাশী করিতে পারিবেন, যে-কোন
দ্রব্য আটক করিতে পারিবেন।

এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে সংসদে অপজিশন হইতে প্রবল আপত্তি
উত্থাপন করা হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, রক্ষীবাহিনীর ন্যায় একটি
অনিয়মিত ও আইন-সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বাহিনীর হাতে এরূপ ব্যাপক ক্ষমতা
প্রদানের ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার হইবে, গণতন্ত্র বিপন্ন হইবে, জনগণের
মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হইবে এবং মানুষের মনে স্বস্তির চেয়ে
শঙ্কাই অধিক সৃষ্টি হইবে।

..এক্ষেত্রে বলা দরকার যে, বিল পাস হইল। রক্ষীবাহিনী সংক্রান্ত
আইন এমনি এক সময়ে সংশোধন করিয়া উক্ত বাহিনীর হাতে অতিরিক্ত
ক্ষমতা দেওয়া হইল সেই সময়ে, যখন সরকারের অনুকূল কোন এক সহ-
যোগীর ভাষায় 'যে কারণেই হোক, রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে দেশবাসীর অনেকে-
রই ধারণা অনুকূল নয়' যখন মাত্রালঙঘনের অভিযোগ, অপারেশনের
নামে নিরীহ মানুষের হয়রানির অভিযোগ, ধৃত মানুষ 'গায়েব' হইয়া
যাওয়ার অভিযোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে; যখন নানা ধরনের বর্ণিত
'বাড়াবাড়ি'র দরুন ক্ষমতাসীন পার্টি মেম্বাররাও অনেক জায়গায় জনগণের
সম্মুখে বিব্রতবোধ করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। স্বাধীনতার অব্যবহিত
পরে তৎকালীন বিশেষ অবস্থাধীনে সংবিধানের অনুপস্থিতিতে, সরকার
রাষ্ট্রপতির আট, নয় ও পঞ্চাশ নম্বর আদেশ নামক যেসকল আইন জারি
করিয়াছিলেন সেগুলিরই বিলোপ বা ব্যাপক রদবদলের দাবিতে জনমত
আজ যখন সোচ্চার, যখন দেশের আইন মন্ত্রীও স্বীকার করেন যে, সত্যিকার
আইনজ্ঞের দৃষ্টিতে এসব আদেশের কতিপয় ব্যবস্থা 'দুঃখজনক', যখন
উহাদের বিলোপ বা সংশোধন আসন্ন বলিয়া মানুষের মনে একটা ধারণা
জন্মিয়াছে, তখন রক্ষীবাহিনী সংক্রান্ত আদেশটিকে কঠোরতম করা সত্য
সত্যই দুর্বোধ্য। প্রকাশ, প্রশাসনের উদর হইতে এতদপেক্ষাও কঠোরতর
একটি নিবর্তনমূলক আইনের জন্মলাভ অত্যাসন্ন।

জনমনে তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য, ওয়াদা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের সহিত সঙ্গতিবিহীন এই সকল পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ কাহারা দিতেছেন? কি উদ্দেশ্যে দিতেছেন? একটার পর একটা আইনে কোর্টের এখতিয়ার সঙ্কুচিত করিয়া রুল-অব-ল' বা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? ক্ষমতাসীন মহল অহরহই 'গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ রক্ষার' নিশ্চয়তা দিয়া থাকেন। উহা রক্ষা করিবার এই কি প্রকৃষ্ট উপায়? গণতন্ত্রের চোখে নাগরিকের লিবার্টি সবচেয়ে পবিত্র জিনিস। সেই লিবার্টি সংরক্ষণের এই কি সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা?

..দমননীতির স্টীমরোলার চালাইয়া তাঁহারা সামরিকভাবে কবরের শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বহু সংগ্রামী মানুষকে ও মানুষের জন্মগত অধিকারকে সেই কবরে মাটি চাপা দিয়াছেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই কবরের ভিতর হইতেও অশান্ত আত্মার আর্তনাদ ও বিক্ষোভ উত্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে এক দুর্নিবার আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু ইতিহাসের বড় শিক্ষা এই যে, ইতিহাসের শিক্ষা অনেকেই গ্রহণ করে না। তবু একথা কে অস্বীকার করিতে পারে যে, ইতিহাস বড় কঠোর টাস্কমাস্টার, ইতিহাস কাহাকেও ক্ষমা করে না, কাহাকেও ছাড়িয়া কথা বলে না।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় মাঘ ১৯, ১৩৮০

গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে গণতন্ত্রের ভিক্ষা

স্বাধীনতা বার্ষিকীতে রেওয়াজ অনুযায়ী সালতামামী করতে হয়। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি সালতামামী করার সৎসাহসটুকুও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কি জানি পাছে দেনার হিসাব বেড়ে যায় কিনা।

..সকলের স্মরণ আছে পাকিস্তান আমলে জনসাধারণ যখন অনুধাবন করলো বাক স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা তথা চিন্তার স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে তখনই নিজেদেরকে তারা শোষিত তথা পরাধীন বলে সাব্যস্ত করেছে। এই বদ্ধমূল ধারণাই পাকিস্তানী শাসনের অবসান ডেকে এনেছে অতি দ্রুত। শুধু উদরখালি ছিল বলেই পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে জনসাধারণ রুখে দাঁড়ায়নি; রুখে দাঁড়িয়েছিল গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়েছিল বলে।

স্বাধীনতার এই তিনটি বছরে জনগণের সরকার অন্নবস্ত্রসহ মৌলিক দাবিসমূহ পূরণ করতে পারেননি। কি কারণে পারেননি সে কথা স্বতন্ত্র।

মৌলিক ও প্রয়োজনীয় এই দাবিসমূহ পূরণের জন্য যে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অপরিহার্য ছিল, সরকারের হাতে তা ছিল না। কেন ছিল না সে কথা এখানে বাড়ন্ত। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা তথা গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার কি কমতি ছিল? মৌলিক অধিকারের এই দাবিসমূহ পূরণ করতে কি আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রয়োজন ছিল?

তৃতীয় স্বাধীনতা বার্ষিকীর এই শুভ মুহূর্তে উপরোক্ত কথাগুলি আমরা গণতান্ত্রিক সরকারের কাছেই রাখছি। গণতান্ত্রিক সরকারের কাছেই আমরা পুনরায় গণতন্ত্রের ভিক্ষা চাচ্ছি।

—সোনার বাংলা সম্পাদকীয় মার্চ ২৬, ১৯৭৪

নেতারা যা বলেন—

মাওলানা ভাসানী

"দেশের মানুষ না খেয়ে মরে যাচ্ছে। আইনের শাসন নেই। রক্ষীবাহিনী লোকজনকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে খুন করছে এবং লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। রক্ত পানি করা উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে খাদ্যের বদলে বিদেশ থেকে সিনেমা আমদানী করা হচ্ছে। রাজবন্দীদের অপরাধ কি পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের চাইতেও বেশী?--- পিটিয়ে, জেলে পাঠিয়ে গুলি করে মুজিববাদের আদর্শ গ্রহণ করতে জনগণকে বাধ্য করা যাবে না। জনগণ একমাত্র এখন আল্লাহ্‌র আদর্শ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবে না।"

আতাউর রহমান খান

"লুটতরাজ, রাহাজানি, ডাকাতি, গুপ্ত হত্যা, অত্যাচার ও নির্যাতনে মানুষের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। গ্রামঞ্চলে বর্গীর হাঙ্গামা অপেক্ষাও গুরুতর হাংগামা ব্যাপক আকারে শুরু হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টন চাল ও পাট অবাধে পাচার হচ্ছে। তবুও, সরকার সদর্পে ঘোষণা করছেন— 'চোরা চালান ডেড্‌স্টপ'---এটা আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর"।

—সোনার বাংলা এপ্রিল ২১, ১৯৭৪

মাওলানা ভাসানী

সামরিক বাহিনীর সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আওয়ামী লীগ সরকারের পরিচালক মণ্ডলী ও তাহাদের সমর্থকরা যখন দলীয় আদর্শ

বিসর্জন দিয়া লুটপাট সমিতির সদস্য হইয়া দেশের সর্বনাশ করিতেছিল, তখনই আমি বারবার তাহাদিগকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার উপদেশ সরকার ও সরকারের সমর্থক কেহই শুনে নাই।"

আমার দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সামরিক বাহিনীও যদি আমার শেষ উপদেশ না শুনে তবে বাংলাদেশের যে সর্বনাশ হইবে তাহা হইলে দীর্ঘকাল বাংলাদেশকে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইবে না।"

"প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের শায়েস্তার পরিবর্তে যদি বিরোধীদলীয় কর্মীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন, তাহাহইলে শুধু দেশের আপামর জনসাধারণের কোপানলেই পড়িবেন না, বিশ্বের স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের গজবে ধ্বংস হইয়া যাইবেন।"

—সোনার বাংলা মে ৫, ১৯৭৪

ছহি বড় বাকশাল নামা

—জুলমত খান

প্রথমে বন্দনা করি প্রভু নিরঞ্জন,
তার পরে বন্দনা করি নবীর চরণ।
তার পরে বন্দনা করি যতেক কুতুবগণ,
আখেরেতে বন্দনা করি যত মোমেনগণ।
এবে তবে শুনেন সবে বাকশালী বিবরণ!!
শাহে শেখ কহে শোন তাজু নজু মনু জামান,
খায়েশ হইয়াছে মোর জারি করিতে ফরমান।
জোড় হাতে কয় তারা হুকুম করেন আলমপনা,
গোলামেরা থাকিতে কি আছে আর ভাবনা!
হাত জোড় করিয়া তেনারা কহে বাদশা নামদার,
আপনার মত আদমী আছে কি সয়াল-সংসার।
এসাই অরি শাহে শেখ মুলুকের বাদশা বনিল,
তারপর খোদাই কহর মুলুকে নাজেল হইল।
শাহ ছিলেন যেমন নাদান তেমনই পালোয়ান,
দিবা নিশি প্রণাম পাঠান দেবীর চরণ।
দেবী যদি গোস্বা হন কি হবে উপায়,
শেখের মুলুকে ফণি মণি মনা লাফায়,

আলেম ফাজেল আর হাফেযে কুরআন।
একে একে কমজাতেরা করিল সব বিরান,
আল্লাহ্‌র ঘরে ভাই বাতি দেওয়া হইল বন্ধ,
শেখের ছাওয়ালরা হইল বেদ্বীনের ফরজন্দ।
চোর ডাকু শয়তান হারমাদ ছিল যত,
শাহের ডাইনে বাঁয়ে ছুটিত অবিরত।
শাহের ছিল তিন খুবসুরত শাহজাদা,
হাসিন নাড়কি কাড়িয়া নিতে নাহি ছিল বাধা।
শাহজাদা সব এসাই ছিল পালোয়ান,
কতুলে আম্ করে কত হাসিন জোয়ান।
মা বোনের ইজ্জত নিয়া করে টানাটানি
ভয়ের চোটে কেহ করে না জানাজানি।
আশি মণী তেগ নিয়া ঘুরে মর্দ কামাল,
এসাই পালোয়ান ছিল বাবা জামাল।
বড় মক্তবের যত ছিল তালেবে এলেম,
একে একে খতম করে আওয়ামী জালেম।
খোদার আরশ কাঁপে আদমের আহাজারিতে,
বাপবেটারা ভাই কাটে খুশীখোশালিতে।
এইভাবে কত রোজ গুজারিয়া গেল,
হাজার হাজার বান্দা মুলুকে মরিতে লাগিল।
ফণি মণি মোজাফফর আর মহিউদ্দিন,
এই কত জনা মিলে শলা করে রাতদিন।
আখেরে নিকালিল এসাই কি্ম্তি দাওয়া,
যার মাজেজায় তামাম আদমী হইল হাওয়া।
কি চিজ্ ভাই জানেন কি মোমেনগণ,
তামাম জাহান জোড়া নাই তাহার মতন।
শাহে শেখ এক রোজ ডাকিয়া বলে মোজাফফরে,
শোন শোন দোস্ত মোর কহি' যে তোমারে।
আমার শাহী তখ্তে তুমি হ'বে ডাইনের উজির,
কি করিয়া মারিব বেয়াড়া মর্দ করহ ফিকির।
নাদান রায়ত মোর নিশিদিন করে জ্বালাতন,
তাদের কলিজায় জ্বালাইয়া দাও হুতাশন।

অষ্টপ্রহর কমজাতেরা করিবে পেটের ধান্দা,
নইলে আসার আঘাতে করিব জান ঠাণ্ডা।
ফণি মণি করজোড়ে কহেন, শুনেন, জাঁহাপনা,
অধমেরা থাকিতে হুজুরে নাহি ভাবনা।
এই মুলুকে যত আছে বেয়াড়া যবন প্রজা
একে একে ধরিয়া দিব আচ্ছা করে সাজা।
এক রোজ শাহে ডাকিয়া কহে শোন হে গাজী
তোর মতন নাদান দুনিয়াতে আছে পাজি?
রোজ রোজ কড়ির ভাবনা করিতে হয় আমারে
কমবখ্‌ত কেন তোর পয়দাস হইল এই সংসারে।
শাহে কহে এই মুলুকে যত আছে ধন-দৌলত
সবই পয়মাল করিতে করহে কসরত।
তারপর শাহে তখ্‌তে বসিয়া করেন বিচার
কত আদম ফরজন্দ মরে নাহি তাহার শুমার।
তারপর আসিয়া পেঁ ৗছিল হালাত এসাই
কত আদমী মরিল পথে লেখাজোখা নাই।
ষাট্‌ হাজার লাখ আইল খেদাই দেওয়া কড়ি
আওয়ামী নাদানেরা নিয়ে দেয় বিদেশে পাড়ি।
লোটা কম্বল সম্বল যত ছিল পাণ্ডা
তামাম ধন-দৌলত কাড়ি নেয় মারিয়া ডাণ্ডা।
রেশনের চালে ভেজাল দিল পাথরখণ্ড
কন্ট্রোলের দোকান করে পাণ্ডারা লণ্ডভণ্ড।
হাইজ্যাকার যত বাকশালী পাণ্ডা আর বাটপার,
খুন-খারাবী করিয়া মুলুক করে ছারখার।
খেমটা বেশ্যা কত যে হইল আমদানী,
চোর চোট্টা ডাকু বদমাইশ হইল আমদানী।
তিরছি নজরে কাবু করে যতেক জোয়ান মর্দ
পথে ঘাটে পড়ে থাকে কচি আদম ফরজন্দ।
এক সের তেল নুন, হলুদ আদা কাঁচালঙ্কা
এক লাফে উঠে চল্লিশ, ষাট সত্তর দেড়শো তঙ্কা।
সতর ঢাকা দায় হইল কি বলিব ভাই।
মা বোনের কোমরে এক রত্তি কাপড় নাই।

মুর্দা লাশ পড়িয়া রহিল কাফনের অভাবে
চোখের পানি রাখিতে নাহি পারি বলিব কিভাবে।
এসাই হালতে কতদিন গুজারিয়া গেল,
আচম্বিতে খোদাই কুদ্‌রৎ আসিয়া পৌঁছিল।
এক রাতে কি করিল কুদ্‌রতে এলাহি
এসাই খতম হয় জান যত জালেমশাহী।
যখন মুলুকের হালাত এসাই পেঁ ৗছিল
সিপাহী লস্কর আল্লাহ এই মুলুকে ভেজিল।
মুলুকের হাল ধরিল এবে সিপাহা
আল্লাহ্‌র কুদরতে সুখে আছে সবাই।
মুখে আল্লাহ দেলে ইসলামী জোশ্‌
তামাম মুলুকের আদমী এছাই হ'লো খোশ্‌।
দানা-পানি পায় এবে আদমজাত
আল্লাহ্‌র দরগায় করে সবে মোনাজাত।
আল্লাহ্‌র মেহেরবানী আর কুতুবের দোয়া
বন্ধ হইল ধন-দৌলত বেদ্বীনের দেশে যাওয়া।
শোকর গোজার করে এবে লোক বেশুমার
খোদার নেয়ামত ভরিয়া গেল ক্ষেত খামার।
সিপাহী লস্কর মিলে শোকর করে পাকজাতে
আল্লাহ্‌র পথে ঈমান আনিলে হয় সব ফতে।
যদি মোরা হই আবার খোদার নেক বান্দা
রহমানের কুদরতে নিকালিবে সব ধান্দা।
চল ভাই সকল মোমেন করি মোনাজাত
আমার মুলুক করিয়া দাও আল্লাহ্‌ নাজাত।
মোনাফেক, বুজদিল নালায়েক যত কমবখ্‌ত
আল্লাহ্‌ যেন কোন দিন না দেয় তখ্‌ত।
গরীব-গোরবা যত বান্দা আছে মোমেন
মোনাজাত কর আল্লাহ্‌ না ভেজ আর কমিন।
জিয়াকে পানা দাও আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জাত
তোমার পাক দরবারে এই আখেরি মোনাজাত!

—বৈশাখ ২৫, ১৩৮৪

সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় মতামত

মঞ্চে-নেপথ্যে

অনেকেই আজকাল বলেন, শুধু অর্থনীতিই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না, শুধু রাজনীতিই বারুদের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে না, শুধু আইনের শাসনই অপস্রয়মান হইয়া পড়িতেছে না, প্রশাসনও আজ বিপর্যস্ত, ভগ্নোন্মুখ। প্রশাসনযন্ত্রের ভাঙ্গিয়া পড়ার দশা দেখা দিয়া থাকুক আর না-থাকুক, এর গতি যে নিদারুণভাবে শ্লথ হইয়া উঠিয়াছে, এর ইনিশিয়েটিভ বা উদ্যোগের যে অনেকখানি অভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেন একটা স্ট্যাগনেশন বা আবদ্ধতা প্রশাসন যন্ত্রকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, সেই বেড়া হইতে উহা বাহির হইয়া আসিতে পারিতেছে না।

..এক সহযোগী হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সচিবালয়ে যে ক্ষেত্রে সপ্তাহে অন্ততঃ সাড়ে একচল্লিশ ঘণ্টা কাজকর্ম হওয়ার কথা, সেক্ষেত্রে কাজের কাজ হয় মাত্র সাড়ে ষোল ঘণ্টা। বাকী পঁচিশ ঘণ্টাই ফাও। কর্মকর্তারা আসেন দেরীতে, যান সকাল-সকাল। দুই দিক দিয়াই তো আর তাঁহারা অ-সময়নিষ্ঠ হইতে পারেন না!

কোর্ট কাচারীতে শুনি কয়েক লাখ পেণ্ডিং কেস। এর পিছনে না-হয় বোধগম্য কারণ আছে—প্রয়োজনের অর্ধেকও জজ-ম্যাজিস্ট্রেট নাই। কিন্তু প্রশাসনের আপিসে আপিসে কেন শত-সহস্র পেণ্ডিং ফাইল? কেন ফাইলের মুভমেন্ট এত ধীর-মন্থর? কেন ডিসিশনে এত দীর্ঘসূত্রতা? জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের না-হয় নিদারুণ অভাব আছে, কিন্তু অফিসার-কর্মচারীর তো কোন অভাব নাই? এইটুকু দেশে শুনিয়াছি, কর্মচারী-কর্মকর্তার সংখ্যা বাড়িয়া সাড়ে ছয় লাখ ছাড়াইয়া গিয়াছে। রাজস্বের সিংহ ভাগ ব্যয় হইতেছে অফিসার পুষিতে। তবু কেন কাজ হয় না? গলদ কোথায়?

..সত্য কথা বলিতে কি, সরকারী কর্মচারীরা আজ অনেকখানি নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ, বোধ করি, কিছুটা অসন্তুষ্টও। টোকা দিয়া দেখুন, তন্ত্রীতে যে সুর বাজে সে-সুর খুব মধুর নয়। প্রত্যেকের কি যেন একটা ক্ষোভ, আক্ষেপ, অসন্তোষ অভিযোগ। এরা পলিটিক্সে মাতিয়াছে, তা নয়। অর্থনৈতিক সঙ্কট ও অভাব-অনটনের চাপে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে, তাও নয়। এরা শিক্ষিত, সচেতন। এরা জানে, অর্থনৈতিক সঙ্কট শুধু এদেরই নয়—সবারই।

..সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে, সচেতন ও চিরকাল নিয়ম-শৃংখলায় অভ্যস্ত সরকারী কর্মচারিগণ এসব বিষয় সম্যক অবগত আছেন। কিন্তু

তবু কেন তাঁহাদের মধ্যে এই অনীহা, এই অসন্তুষ্টি? কেন এই উদ্যম-উৎসাহের অভাব? আর এটা তো শুধু প্রশাসনেই নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে এবং গোটা পাবলিক সেক্টরেও একই অবস্থা। সেখানেও কর্মোদ্যমের অভাব, উদ্যোগ ইনিশিয়েটিভের অভাব। কল-কারখানা পা খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছে। চলিতেছে উৎপাদন হ্রাস। কোম্পানীর মাল দরিয়ার ঢালা হইতেছে। লোকসান আর ওভার-ড্রাফটের বোঝা স্ফীত হইতেছে। রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির ব্লাড-ট্রান্সফ্যুশন দিয়া চলিতেছে পাবলিক সেক্টরের এই রক্তশূন্য রোগীকে বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টা। আর মাঝে মাঝে দেওয়া চলিতেছে, বঙ্গবন্ধুর সারপ্রাইজ ভিজিটের শক-থিরাপি। কোথায় পাট কলে ভিজা পাট, পোড়াপাট চালানো হইতেছে, কোথায় চলিয়াছে পিলফারেজ-পাচার, কোথায় 'নো-ম্যানস-ল্যাণ্ডে' লাখ লাখ টাকার আমদানী করা কাপড় খোলা জায়গায় পড়িয়া পঁচিতেছে, তাহা ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে হেলিকপ্টারে ছুটাছুটি করিতে হইতেছে। প্রশাসন কোন্ পর্যায়ে নামিয়া আসিলে এসব ঘটনা ঘটিতে পারে এবং এসব বিষয় লইয়া দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ছুটাছুটি করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

..গত পয়লা সেপ্টেম্বর এক সহযোগী "প্রশিক্ষণ নেই, অভিজ্ঞতা নেই—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট" শীর্ষক এক সংবাদে ১৬১ জন নব্য রিক্রুট অফিসারকে বিনা ট্রেনিং-এ বড় বড় পদে বসাইয়া দেওয়ার সমালোচনা করিয়াছিলেন। অথচ এরই পাশাপাশি আবার দেখা যায় বিশ-পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বহু অফিসারকে ও. এস. ডি. নাম দিয়া কার্যতঃ বিনা কর্মে দীর্ঘকাল বসাইয়া রাখা হইয়াছে। কী দুর্বোধ্য এই নীতি! সরকারী প্রশাসনযন্ত্রে তো এইরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য আছেই, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পেও অনেক জায়গায় কুমারকে কামারের স্থলে এবং কামারকে কুমারের স্থলে বসানো হইয়াছে। একজন ঝানু পাবলিক রিলেসন্সের অফিসারকে অকস্যাৎ সেলস্ বা পার্চেজ ম্যানেজারের পদে বসাইয়া দিলেই যে তিনি সুদক্ষভাবে সেই দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন, তাহার কি নিশ্চয়তা? অথচ অনেক ক্ষেত্রেই যার যেটা কাজ নয়, তাকে সেই কাজের বোঝা চাপাইয়া দিয়া রীতিমত বিপদে ফেলা হইয়াছে। হয়ত তার অনভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তার হাতে অপর কোন করিতকর্মা লোকে 'ছোট কল্কি' খাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ধরা পড়িয়াছে সেই অনভিজ্ঞ, গোবেচারী। তাকে জেলের ভাত খাইতে হয়, মামলায় ঝুলিতে হয়। চূড়ান্ত পর্যালোচনায় হয়ত দেখা যায়, দোষ তার যতটা না, তার চেয়ে

অনেক বেশী দোষ সেই উর্ধ্বতন নিয়োগকর্তার—যিনি তাকে তার অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ঐ পদে বসাইয়াছিলেন, ঐ বোঝা তার ঘাড়ে চাপাইয়াছিলেন।

..কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে সবার আগে যে জিনিসটি চোখে পড়ে সেটা হইতেছে কর্মচারীদের মনের পটভূমিতে একটা সার্বক্ষণিক আশংকার ভাব। উদ্বেগ-আতঙ্ক যেমন বাহিরেও, তেমনি প্রশাসনের ভিতরেও। কর্মচারীরা সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে একটানা কখন না-জানি ৯ নম্বরের খড়গ গর্দানে নামিয়া আসে, আসে 'পাকিস্তানী-মনা'র ইলজাম, আসে পদচ্যুতি -পদাবনতি বা পিনাল স্টেশনে বদলীর হুকুম। এর জন্য কুড়ালের বাটরূপী কোন কোন সুপার-পেট্রিয়ট কনসেন্স-কীপার উল্লম্ফনে অনেক ধাপ ডিঙ্গাইয়া গিয়া প্রশাসনের কী-পজিশন অলঙ্কৃত করিয়া তো বসিয়া আছেনই। 'তলের মানুদকে উপরে উঠানো, উপরের মানুদকে তলে নামানোই তো তাদের সর্বোচচ দেশসেবা। সত্যি, কি বিচিত্র এই দেশ! কি বিচিত্র-এর প্রশাসন ! ইহারা ৯ নম্বর আদেশকে এমনি এক সুপার-ল' করিয়া তুলিয়াছেন যাহা কোন কারণ না-দর্শাইয়া, ভিক্টিমকে কোন আপীল বা আইনগত প্রতিকার লাভের সুযোগ না-দিয়া সামারিলি বরখাস্ত করার মাত্রাহীন ক্ষমতা সরকারের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। সংবিধানে নাগরিককে চাকরি-নকরী ও জীবিকান্বেষণের যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থন ও সুবিচার লাভের যে শাশ্বত অধিকার দান করা হইয়াছে, চাকুরিয়ার চাকুরীর নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার পরিপন্থী ৯ নম্বর আদেশ সেই মৌলিক অধিকার কার্যতঃ উঠাইয়া লইয়াছে। এ এক সাংঘাতিক আইন।

..কর্মচারীদের মনে তাই স্বস্তি আসে না। ডেমোক্লিসের তরবারি কখন নামিয়া আসে, এই তাদের সার্বক্ষণিক ভয়। এরপর আছে রাজনৈতিক তদবির ও চাপ। প্রভাবশালী মহল হইতে অনুরোধের নামে যে-সব আদেশ আসে তাহা পালন করিতে গেলেও বিপদ, না করিলেও ততোধিক বিপদ। ভালোয় ভালোয় রাজী না হইলে অমনি হয়ত 'কানকথার' ক্রিয়া শুরু হইয়া যাইবে। চিত্রিত হইতে হইবে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' রূপে। নিগ্রহের আর সীমা থাকিবে না। এই তো চাকুরী-জীবন!

..লিবারেশনের পরপরই শ্লোগান উঠে যে, প্রশাসনে শুদ্ধি অভিযান চালানো হইবে, অবাঞ্ছিতদের স্ক্রিনিং করা হইবে। শুধু শ্লোগানই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কায়দায় 'শুদ্ধি ' অপারেশন চালানো শুরুও হইয়া যায় এবং কতিপয় সিনিয়র অফিসারকে নিগৃহীত

করাও হয়। উহার যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া কর্মচারীদের মনে পড়িয়াছে, তাহা আজও নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই।

অফিসাররা মেশিন নয়—মানুষ। কাজ করিতে গেলে ভুল-ত্রুটি হয়ই। উহার পিছনে যদি কোন মতলব, অসাধুতা বা ইচ্ছাকৃতভাবে দায়িত্ব পরিহারের প্রমাণ না-থাকে, যদি উহা জেনুয়িন মিস্টেকেই হয়, তবে উহা ক্ষমার চোখেই দেখা উচিত। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে দেওয়া উচিত নিজেকে সংশোধনের সুযোগ। তৎপরিবর্তে যদি তাহাকে প্রকাশ্য তিরস্কারে জর্জরিত করা হয়, অবিশ্বাসের চোখে দেখা হয়, তাহার পদাবনতি ঘটানো হয় অথবা অন্য প্রকার শাস্তিবিধান করা হয়, তবে সাহস, মনোবল, উৎসাহ, উদ্যোগ কাহার থাকিতে পারে? সেই কর্মচারী পেটের দায়ে হয়ত চাকুরী করিয়া যান, কিন্তু ইনিশিয়েটিভের মনোবৃত্তি তাঁহার আর থাকে কি? থাকে না।

..কাজেই যত দোষত্রুটিই থাকুক, এই ব্যুরোক্র্যাসিই আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার অবলম্বন। আমরা যতই হিয়া করেংগা হুয়া-করেংগা বলি না কেন, যা করার করেন কিন্তু আমলা-অফিসাররাই। আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু জনাব আবুল মনসুর আহমদের ভাষাতেই বলি, এই পার্মানেন্ট ব্যুরোক্র্যাসি আমাদের বিলাতী ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শুধু অঙ্গই নয়, এই সিস্টেমের বুনিয়াদও বটে। এই আমলাতন্ত্র দলীয় রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এই ব্যুরোক্র্যাসি ক্ষমতার আসনকে সালাম করে, সেখান হইতেই নির্দেশ গ্রহণ করে এবং যতদিন রাজনীতিক পট-পরিবর্তন না-হয়, ততদিন উহা কার্যকর করে। ইহার নিজস্ব কোন রঙ নাই।

..স্বাধীনতার তৃতীয় বৎসরে কম্বলের আর লোম না বাছিয়া অভিজ্ঞ ও প্রতিভাসম্পন্ন অফিসারগণকে তড়া করিয়া যোগ্য স্থানে যোগ্য লোককে বসাইয়া দিন। কারো কোন অতীত ভুল-ভ্রান্তি থাকিলেও তাহা ক্ষমা করুন। যোগ্যতার যথোপযুক্ত দাম দিন। তাঁদেরে আস্থায় লউন। বিভাগীয় মন্ত্রীর তদারকিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীরা কাজ চালাইয়া নিক। উপর হইতে শুধু দেখুন, কাজ কেমন চলে। সাপ্তাহিক ক্যাবিনেট মিটিং তো আছেই। কিছু বলার থাকিলে সেই মিটিংয়েই বলা যাইতে পারে। অফিসারদের কাজকর্মের উপর সর্বক্ষণ খবরদারি করার দরকার নাই। একজনে গাড়ী চালাইবে, অন্যজনে পাশে বসিয়া বার বার ব্রেক চাপিবে, ইহাতে পিকআপও আসে না, গাড়ীও চলিতে পারে না। ইহাতে বরং দুর্ঘটনারই আশঙ্কা। আপনার গন্তব্যস্থল বলিয়া দিন, চালকই গাড়ী চালাইয়া আপনাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিবে।

..মন্ত্রণালয় হইতে রোজ রোজ সকাল-বিকাল হুকুমজারি, খবরদারি ও প্রস্তাবিত স্ট্যাটুটরি অটোনমির খেলাফে উহাদের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ একেবারে নিষিদ্ধ করা উচিত। সচিবালয়ের জেনারেলিস্টরা ঐ সব কমার্শিয়াল বা টেকনিক্যাল ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করিতে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশী। ভারতের মুদ্র প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত এল. আই. সি-ট্রান্‌জাকশনের কেলেঙ্কারির বিষয়ে তদন্ত করিয়া চাগলা-কমিশন পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, "উপর তলার" অবাঞ্ছিত ও অনধিকারমূলক হস্তক্ষেপই উক্ত অটোনমাস বডির বিপুল গচচার জন্য দায়ী। আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের একটানা ক্ষতি ও অসাফল্যের পিছনেও অনুরূপ কারণ বর্তমান বলিয়া অনেকের ধারণা।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় ফেব্রুয়ারী ১৯, ১৯৭৪

ফুড কর্পোরেশন

সরকার ইতিমধ্যে বোধ করি, ডজন-দুই কর্পোরেশন ও সংস্থা গঠন করিয়াছেন। শুধু পাট সেক্টরেই গোটা পাঁচেক কর্পোরেশন। শিল্প-বাণিজ্য সেক্টরে ততোধিক। এছাড়া কৃষি, বন, চা, বিমানবন্দর, টেলিভিশন, বীমা, পর্যটন, বিদ্যুৎ, জলসম্পদ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বহু কর্পোরেশন ও সংস্থা। বস্তুতঃ-পক্ষে চারিদিকে কর্পোরেশন, কমিশন, ব্যুরো, বোর্ড ও অথরিটির ছড়াছড়ি। একটাকেই ভাঙ্গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচটা করা হইতেছে। তাহাতেও কুলাইতেছে না। আরও সংস্থা গঠনের আয়োজন চলিতেছে যেন সংস্থা স্থাপনের বাতিকে আমাদের পাইয়া বসিয়াছে।

সব সংস্থাই অপ্রয়োজনীয়, একথা কেহ বলে না। কিন্তু যখন অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হইবার উপক্রম হয়, তখনই দেখা দেয় সমস্যা। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, যত সংস্থা বাড়িতেছে, তত বাড়িতেছে লাল ফিতার বাঁধন, অনিয়ম, অপচয়, অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা এবং তজ্জনিত বিপুল আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান। কর্পোরেশন বা সংস্থা গঠনের পিছনে উদ্দেশ্য থাকে সংশ্লিষ্ট সেক্টরে সেই কর্পোরেশন অথবা সংস্থাকে অটোনমি দিয়া কাজকর্মের গতি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করা। কিন্তু সরকারী আদেশ ও উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, বাস্তবক্ষেত্রে সংস্থাগুলি সত্যিকার অটোনমি ভোগ করে না। উহারা মহাকরণের আমলাতান্ত্রিক নিয়ম-কানুনের খুঁটিতে থাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ইচ্ছা অভিরুচি এবং 'সুপার-গভর্নমেন্ট' সদৃশ প্ল্যানিং কমিশনের সুকঠিন নিয়ন্ত্রণের বাহিরে এতটুকুও করার ক্ষমতা

তাহাদের নাই। কাজেই একএকটা অতিকায় ও মাথাভারী কর্পোরেশন বা সংস্থা গঠন করিয়া রাষ্ট্রের ওভারহেড ব্যয়ভার বাড়ানোই সার হইতেছে। বাণিজ্যিক এলাকায় তো বটেই, অধুনা আবাসিক এলাকাতেও সরকারী সংস্থা-গুলি অট্টালিকার পর অট্টালিকা ভাড়া লইয়া শহরের গৃহ-সমস্যা জটিলতর করিয়া তুলিতেছে। বস্তুতঃ, এদের বাড়ী, গাড়ী, টেলিফোন, এয়ারকণ্ডি-শনার, আসবাবপত্র, বেতনভাতা ও বৈদেশিক সফরের ক্রমবর্ধমান ব্যয় বহন করা দরিদ্র রাষ্ট্রের সীমিত রাজস্বের পক্ষে আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। তদুপরি দুই একটি ব্যতিক্রম বাদে প্রতিটি সংস্থার বিপুল লোকসানের ভর্তুকী দিতে দিতে সরকার সারা। এতদসত্ত্বেও কাজের কাজ তেমন কিছু যদি হইত তবু না হয় বোঝা যাইত। কাজের বেলায় কার্যতঃ নাস্তি।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত দেখিয়া ও ভুগিয়াও সরকারের চৈতন্যো-দয় হইতেছে না। তাঁহারা সংস্থার পর সংস্থাই গঠন করিয়া চলিয়াছেন। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, সরকার আরও একটি কর্পোরেশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ফুড কর্পোরেশন। প্রস্তাবিত কর্পোরেশনের কার্য হইবে খাদ্য সংগ্রহ, বণ্টন, গুদামে সংরক্ষণ ও খাদ্যচলাচলের সুব্যবস্থা করা। দৃশ্যতঃ ভারতের ফুড কর্পোরেশনের ছকেই ইহা করা হইবে। তাই ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার কার্যকলাপ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১২ দিনের সফরে তিন সদস্যের এক প্রতিনিধিদল দিল্লী প্রেরণ করা হইয়াছে।

ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া-র সাফল্য-অসাফল্য ও কর্মপ্রণালী সম্পর্কে জানিবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া ভারতে ডেলিগেশন পাঠাইবার কি প্রয়োজন পড়ে, আমরা বুঝি না। ঘরে বসিয়াই তো উহা জানা যায় এবং দরকার হইলে আমাদের দূতাবাস মারফৎ ভারত হইতে সব কাগজপত্রও সংগ্রহ করা যায়। অত কিছু করারও প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় সংবাদ-পত্রগুলির পৃষ্ঠায় চোখ বুলাইলেই জানিতে পারা যায় যে, ফুড কর্পোরেশনের ইতিহাস একটানা ব্যর্থতারই ইতিহাস। 'যুগান্তর' পত্রিকা গত ১৬ই মে 'খাদ্য কর্পোরেশনের কেলেঙ্কারি' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে কর্পোরেশ-নের 'দুর্নীতি, অপচয় ও অযোগ্যতার' বিষয়ে অনেক তথ্য-পরিসংখ্যান পেশ করিয়াছেন। খাদ্য কর্পোরেশনের পিছনে সরকারের ভর্তুকী ১৯৭১-৭২ সালে ৪৯ কোটি টাকা হইতে ৭৩-৭৪ সালে ২৫১ কোটি টাকায় উঠিয়াছে। রাষ্ট্রপতি গিরি পর্যন্ত এক বিশেষ নোটে ফুড কর্পোরেশন

চালিয়া সাজার পরামর্শ দিয়াছেন। উক্ত কর্পোরেশন এবারকার খারিফ শস্য সংগ্রহেও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল সাড়ে ছেষট্টি লক্ষ টন। কর্পোরেশন সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে মাত্র ৩১ লক্ষ ৮২ হাজার টন। মানে অর্ধেকেরও কম। বহু চিন্তাভাবনার পর ভারত সরকার ১৯৭৩ সালের রবি-মওসুমে সারা দেশে গমের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ফুড কর্পোরেশনের উপর উহার একচেটিয়া কারবারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে লাল বাতি জ্বলিল। কর্পোরেশনের ব্যর্থতাজনিত নিদারুণ খাদ্য সঙ্কটে সরকারের 'ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা দেখা দিল। তাঁহারা চরম বিপর্যয় এড়াইবার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত গম ব্যবসার নীতিগত মার্চের শেষ সপ্তাহে বাতিল করিয়া গমের পাইকারী ব্যবসা ফুড কর্পোরেশনের হাত হইতে বেসরকারী ব্যবসায়ী মহলের হাতে ফিরাইয়া দেন। কিন্তু এই বিলম্বিত ব্যবস্থাতেও পাড়ি পাওয়া ও দুর্ভিক্ষ এড়ানো যাইবে না জানিয়া সরকার আমেরিকা ও অন্যান্য সূত্র হইতে প্রায় অর্ধকোটি টন খাদ্য আমদানীর প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। বিশ্বের বাজারে দাম কিন্তু ইতিমধ্যে বাড়িয়া গিয়াছে তিনশ' পার্সেন্ট। সেই দামেই কিনিতে হইতেছে। তাই বলি, কর্পোরেশনের অনেক গুণ, দাম দিতে হয় তিনগুণ।

ফুড কর্পোরেশনের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণের এই-ই ফলশ্রুতি। শুধু ফুড কর্পোরেশন কেন, আমাদের দেশের ন্যায় ভারতেরও প্রায় সবকয়টি কর্পোরেশনের এহেন অবস্থা। কেবলই ক্ষতি আর ব্যর্থতা। এত সব অভিজ্ঞতার পরও আমরা ভারতীয় ধাঁচে ফুড কর্পোরেশন গঠন করিতে যাইতেছি এবং তদসম্পর্কে জ্ঞান আহরণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে ভারতে ডেলিগেশনও প্রেরণ করিয়াছি। আমাদের সবকিছু সত্যই কী অদ্ভুত, কী বিচিত্র!

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় জ্যৈষ্ঠ ১০, ১৩৮১

মঞ্চে-নেপথ্যে

আতাউর রহমান খান তাঁর "ওজারতির দুই বছরে" লিখিয়াছেন, "আমলাতন্ত্র কুরসী কুর্নিশ করে; সে কুরসীতে যেই আসীন হয়—সালাম পায়।"

আবার কেউ কেউ বলেন, আমলাতন্ত্র সাদা পানি। যে গেলাসে রাখা যায়, সেই গেলাসের রং ধারণ করে। আসলে আমলাতন্ত্রের নিজস্ব কোন রং নাই।

বাউল কবি বলিয়াছেন, "আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, যেমন বাজাও তেমনি বাজি।"

শাসনযন্ত্রও একটা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সরকার বা সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষ হইতেছেন যন্ত্রী। যন্ত্রীরা যেভাবে বাজান, শাসন-যন্ত্র সেভাবেই বাজে।

আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না' গ্রন্থের ভূমিকা 'আয়নার ফ্রেমে' কাজী নজরুল ইসলাম লিখিয়াছেন, "আমি একবার এক ওস্তাদকে লাঠি দিয়ে স্বরোদ বাজাতে দেখেছিলুম। সেদিন সেই ওস্তাদের হাত সাফাই দেখে তাজ্জব হয়েছিলুম।"

সত্য সত্যই যিনি কুশলী যন্ত্রী তিনি ছড়ি দিয়াও স্বরোদের বুকে সুর সৃষ্টি করিতে পারেন, ছড়ের দরকার হয় না। যন্ত্রীর কুশলীর হাতের উপর সুর-সৃষ্টি নির্ভর করে। যিনি সে কৌশল জানেন না তিনি সুর-যন্ত্রে অসুরের হাত চালাইয়া তার-তুর ছিঁড়িয়া মিসমার করেন। দোষ হয় যন্ত্রের। কথায়ই বলে : 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।'

মক্কারও গাধা আছে। ব্ল্যাকশীপও দুই-চারিটা সবখানেই থাকে। সেটা বড় কথা নয়, বড় সমস্যাও নয়। সাধারণভাবে প্রশাসনযন্ত্র সাদা পানির মতো রং-বিহীন। উহা রাজনৈতিক বর্ণবিহীন, নিরপেক্ষ। কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মতবাদ যাহাই থাক, সরকারী কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে ও প্রতিষ্ঠিত সরকারের গৃহীত নীতি রূপায়নের বেলায় বিশাল প্রশাসনযন্ত্রের তাঁহারা যন্ত্রাংশ মাত্র। এবং যন্ত্র যন্ত্রই। উহাকে বাজাইতে জানিলে কাঙ্ক্ষিত সুর বাহির হইবেই। সেতারের কান মোচড়াইয়া তার ছিঁড়িতে হইবে না।

বৃটেনে লেবারের পর কন্‌সারভেটিভ, কন্‌সারভেটিভের পর লেবার গভর্নমেন্ট আসেন। কিন্তু পার্মানেন্ট ব্যুরোক্র্যাসি অপরিবর্তিতই থাকে। বৃটেনের ব্যুরোক্র্যাসি প্রতিষ্ঠিত সরকারের নীতি বাস্তবায়নে অনীহা বা অসহযোগিতা দেখাইয়াছেন, এরূপ দোষারোপ করার সাধ্য কাহারও নাই। লেবার সরকার হয়ত কোন একটা বৃহৎশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। কন্‌সারভেটিভ সরকার আসিয়া উহা বাতিল করিয়া দেন। লেবাররা আবার আসিয়া উহা পুনঃ রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। এই উপর্যুপরি বহাল ও বাতিলাদেশ কার্যকর করেন কিন্তু সেই একই পার্মানেন্ট ব্যুরোক্র্যাসি। যে-কোন সরকার আসুন, বৃটিশ ব্যুরোক্র্যাটদের একনিষ্ঠ সেবা ও সহযোগিতা সুনিশ্চিত। এই ট্রাডিশনের কোন ব্যতিক্রম নাই।

..যুগের পর যুগ ধরিয়া বৃটেনে এটা সম্ভব হইয়াছে এই কারণে যে, সেদেশে প্রশাসন যন্ত্র ইনস্টিটিউশনালাইজড, নিয়ম-প্রণালীবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

যে রুল বিধিবদ্ধ রহিয়াছে, সরকার বা প্রশাসন কর্মচারীদের হস্তে উহার ব্যত্যয় হইবার জো নাই। সেখানে নিয়োগ, পোস্টিং, পদোন্নতি বিধিবদ্ধ নিয়ম-প্রণালী দ্বারা নির্ণীত। 'পার্সন্যাল লয়ালটির' নিরিখে উহা নির্ণীত বা নির্ধারিত হয় না। সেই নিরিখে তলের 'মামুদ'কে উপরে উঠানো বা উপরের 'মামুদ'কে তলে নামানো কল্পনাতীত ব্যাপার। বাদশানামদার হঠাৎ কাহারও উপর খুশী হইয়া নিজের গলার মুক্তার মালা খুলিয়া এনায়েৎ করিলেন অথবা কাহারও উপর অকস্মাৎ না-রাজ হইয়া তাকে শূলে দিলেন, কাহাকেও একযোগে তিনচারটা প্রমোশন দিয়া কারণিক হইতে উচ্চ-কর্মকর্তা বানাইলেন অথবা কাহাকেও কথা নাই বার্তা নাই উচ্চপদ হইতে সরাইয়া কর্মবিহীন ও-এস-ডি পদে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলাইয়া রাখিলেন, এরূপ স্বৈরাচার ঘটিবার উপায় নাই।

বৃটেনে রাজা বা রাণী থাকিলেও রাজতন্ত্র নাই। রাজা হউন, রাণী হউন, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, হউন আর রাজ পুরুষ বা রাজকর্মচারী হউন, সবাই নিয়মতন্ত্রের অধীন ও অনুগত। রাজারাণী হইতে প্রজা-প্রশাসন কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই একই মেশিনের অংশ হিসাবে আপন-আপন দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। কাজেই সেখানে সরকারের পরিবর্তনে প্রশাসন যন্ত্র পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই উঠে না। যথারীতি যার যা' কাজকর্ম করিয়া যান। কিন্তু আবার এমন দেশও আছে যেখানে রাজা নাই তবু আছে রাজ-তন্ত্রের রীতিরেওয়াজ ও রাজসিক ক্রিয়া-কলাপ। বস্তুতঃ, মুকুটহীন এই 'রাজারা' নিজেদের গদি ও ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার জন্য যখন খুশি তখন সংবিধান বদলান বা বাতিল করেন, সংসদের ভেসেক্টমি করিয়া খোজা বানান, 'ব্যক্তিগত আনুগত্যের' নিরিখে প্রশাসন কর্মচারী নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, পদাবনতি, অপসারণ বা বিতাড়ন ঘটাইয়া প্রশাসনযন্ত্রকে আপন পাশ বালিশে পরিণত করেন। মোসাহেবি, চাটুকারিতা ও অসাধুকর্মে সহযোগিতার দ্বারা, এক কথায় 'পার্সন্যাল লাইনআপের' প্রক্রিয়ায় অসৎ, অযোগ্য, অনভিজ্ঞ, অর্বাচীন স্বজনেরা বহুজনকে ডিঙ্গাইয়া বা কনুইয়ের গুত্তায় কাৎ করিয়া সুউচ্চ পদ বাগাইয়া নেন। উহাদের দাপটে তখন মানীর মান রাখা দায়। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তখন অনেকেই তাহাদের সঙ্গে লাইন লাগান এবং তাহাদের ইচ্ছা-অভিরুচির পায়রবি শুরু করেন। এইভাবে গোটা প্রশাসন আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অবিচার ও অনাচারের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। চরিত্র বলিয়া তখন এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কিছু থাকে না।

থাকে না রীতিনীতি ও নিয়ম-কানুনের কোন বালাই। এহেন আপাদমস্তক কলুষিত প্রশাসনেও যাঁহারা চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা ও নিয়মনিষ্ঠা দেখাইতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের নিগ্রহের অবধি থাকে না। 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হওয়ার মত হয় তাঁহাদের অবস্থা। কোন দেশের প্রশাসনের যখন এরূপ টোটাল ডিমরালাইজেশন বা সামগ্রিক নীতিচ্যুতি ও চরিত্রস্খলন ঘটে তখন সেদেশের সামগ্রিক অবক্ষয় ও অপচয়ই অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়। তখন সোনা ছুঁইলেও মাটি হইয়া যায়। হাজার হাজার কোটি টাকার সাহায্য ও অনুদান বিদেশ হইতে আসিলেও উহা দুর্নীতির অতল গহ্বরে তলাইয়া যায়। দরিদ্র দেশ ও দুর্গত দেশবাসীর কোন কাজে উহা আসে না।

আমাদের দেশের প্রশাসন সম্পর্কে এই সংবাদপত্রে আমরা কত লিখিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশের প্রবীণতম জননেতা মাওলানা ভাসানী গত জানুয়ারীতে এক বিবৃতি মারফত সখেদে বলিয়াছিলেন যে, দিনের পর দিন 'ইত্তেফাক' যাহা লিখিতেছে অন্ততঃ সে কথাগুলির প্রতিও যদি কিছুটা কর্ণপাত করা হইত তবে দেশের এ অবস্থা হইত না। মাওলানা সাহেব বলেন, "দৈনিক ইত্তেফাকে যে সমস্ত পরামর্শ দেওয়া হইতেছে সরকার ইহা কেন গ্রহণ করিতেছেন না, কিছুতেই বুঝিতে পারি না। সমস্যার বাস্তব সমাধান করিতে না-পারিলে সরকার যত রকম আইনই পাস করুন না কেন, তাহার পরিণাম ভবিষ্যতে আরও খারাপ হইবে। নিজে না বুঝিলে অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করা সরকারের একান্ত উচিত।" আফসোস! প্রশাসন কোন 'উচিত'কেই আমল দেন নাই, কাহারই কোন কথা কানে তোলেন নাই। বস্তুতঃ রাজনৈতিক টাণ্ডলরা যখন কোন প্রশাসনে কেউ-কেটা হইয়া বসে তখন সুযুক্তি, সদুপদেশ কে-ইবা শোনে? শুনিবার মত অবস্থাইবা উহার থাকে কোথায়? দেশদরদী প্রবীণ অফিসাররাও কখনও কখনও দেশের সামগ্রিক বিপর্যয় রোধের জন্য বাস্তববাদী পরামর্শ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সদুপদেশও মাঠে মারা গিয়াছে। অর্থনীতিবিশারদ ডক্টর নূরুল ইসলামের ন্যায় কেহ কেহ বোধ করি শেষ পর্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হইয়াই দীর্ঘ ছুটি লইয়াছেন অথবা একেবারেই চলিয়া গিয়াছেন। আহা এই একটা 'উন্নয়নকামী' দেশ যাহার বিরাট পরিকল্পনা দফতর আছে, কিন্তু কোন পরিকল্পনা কমিশন নাই।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'বুল্ ইন্ এ চায়না শপ্।' আমাদের প্রশাসনের চীনা মাটির বাসনপত্রের দোকানেও কতিপয় পোষ্য এঁড়ে ষাঁড়

ঢুকিয়া সবকিছু তছনছ করিয়া গিয়াছে। ইহার চরিত্র, মনোবল, সততা, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, রীতি-পদ্ধতি, ঐতিহ্য, জনসেবার ধর্ম সবকিছু প্রায় হৃত ও অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি বহুবার ইহাকে জমিদারী শেরেস্তার সহিত তুলনা করার মতো শক্ত কথাও বলিয়াছি। কিন্তু পুরা সত্য বলিলে বোধ করি, বলা উচিত যে, জমিদারী শেরেস্তার চেয়েও ইহার অবস্থা শোচনীয়তর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এবং ততোধিক শোচনীয় হইয়াছিল স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের অনেকেরই অবস্থা। 'স্কোয়ার পেগ্ ইন এ রাউণ্ড হোল' বা 'গোলাকার ছিদ্রপথে চৌকোনা পেরেক ঢুকানো' কথাটা এদের ক্ষেত্রেই বোধ করি সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য। কামারকে কুমার, জেলেকে তাঁতীর কাজে লাগাইয়া প্রায় সবকিছু লণ্ডভণ্ড করা হইয়াছে। 'টাইটানিক এবিলিটি টু চুজ দি রং পার্সনস্' কথাটার সত্যতা আমাদের চেয়ে বেশী সম্ভবতঃ আর কেহ প্রমাণ করিতে পারে নাই।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭৫

শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত

ঢুকিয়া সবকিছু তছনছ করিয়া গিয়াছে। ইহার চরিত্র, মনোবল, সততা, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, রীতি-পদ্ধতি, ঐতিহ্য, জনসেবার ধর্ম সবকিছু প্রায় হৃত ও অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি বহুবার ইহাকে জমিদারী শেরেস্তার সহিত তুলনা করার মতো শক্ত কথাও বলিয়াছি। কিন্তু পুরা সত্য বলিলে বোধ করি, বলা উচিত যে, জমিদারী শেরেস্তার চেয়েও ইহার অবস্থা শোচনীয়তর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এবং ততোধিক শোচনীয় হইয়াছিল স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের অনেকেরই অবস্থা। 'স্কোয়ার পেগ্ ইন এ রাউণ্ড হোল' বা 'গোলাকার ছিদ্রপথে চৌকোনা পেরেক ঢুকানো' কথাটা এদের ক্ষেত্রেই বোধ করি সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য। কামারকে কুমার, জেলেকে তাঁতীর কাজে লাগাইয়া প্রায় সবকিছু লণ্ডভণ্ড করা হইয়াছে। 'টাইটানিক এবিলিটি টু চুজ দি রং পার্সনস্' কথাটার সত্যতা আমাদের চেয়ে বেশী সম্ভবতঃ আর কেহ প্রমাণ করিতে পারে নাই।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭৫

শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত

ডাকসুর দাবি : হলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিতে হবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের কার্যকরী কমিটি বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশে পরিণত করবার প্রধানমন্ত্রীর বাসনাকে চরিতার্থ করতে বিশ্ব বিদ্যালয়-এর সমস্ত হলসমূহকে অনতিবিলম্বে সার্বজনীন হলে নির্দিষ্ট করতে এবং হলসমূহের অসাম্প্রদায়িক নামকরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়েছেন।

তাঁরা সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল প্রভৃতি হল থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়ার দাবি জানান।

—সোনার বাংলা জানুয়ারী ২৫, ১৯৭২

২০ জন বুদ্ধিজীবীর যুক্ত বিবৃতি—কোরবানীর পুণ্য দুস্থ পুনর্বাসন সংস্থায় জমা দিন

২০ জন বুদ্ধিজীবী সমাজসেবী ও সেবিকা পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে এক বিবৃতিতে "পশুর প্রাণের বিনিময়ে পুণ্য না করে মানুষের প্রাণ বাঁচাবার পুণ্য সঞ্চয়ের আবেদন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ মযহারুল ইসলাম, জনাব কবির চৌধুরী, বেগম সুফিয়া কামাল, মিসেস ফিরোজা খাতুন, সুলতানা জামানসহ ২০ জন স্বাক্ষর দান করেছেন।

তারা কোরবানীর পরিবর্তে সে জন্য ধার্য অর্থ মানুষের সেবার্থে 'দুস্থ পুনর্বাসন সংস্থা' ৬৫৮/এ ধানমন্ডি আবাসিকএলাকা, (রোড নম্বর ৩২) অথবা সংস্থার নামে ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের যে-কোন শাখায় জমা দেবার আহ্বান জানিয়েছেন।

—সোনার বাংলা জানুয়ারী ২৬, ১৯৭২

পাসের হার ৯৩.৫৩ : রাজশাহী বোর্ডের এস. এস. সি. পরীক্ষার ফল

মোট ৫৫৯৭৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫২৩৫৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। পাসের হার শতকরা ৯৩.৫৩ ভাগ। প্রথম বিভাগে ১৬১৪৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩১৯৭১ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৪২৪৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জুলাই ১৩, ১৯৭২

এবারে সব পাস

বাংলাদেশের ৪টি শিক্ষাবোর্ডের ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোহর অধীনে, ১৯৭২ সালে গৃহীত ১৯৭১ সালের এস. এস. সি. পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। পাসের হার হচ্ছে শতকরা ৯১ থেকে ৯৭ জন। অর্থাৎ বোর্ডের মতে এবার পরীক্ষায় ফেল করেছে মাত্র শতকরা তিন থেকে নয় জন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ পরীক্ষায় কেউ কি আদৌ ফেল করেছে? মনে হচ্ছে না। তবে পাসের হার শতকরা একশ' হলো না কেন?

—সোনার বাংলা জুলাই ১৬, ১৯৭২

কয়েকটি কচিকণ্ঠের শ্লোগান : আমাদের বই দাও, আমরা পড়তে চাই

ঢাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অভিনব কায়দায় তাদের দাবি আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত কিছুদিন ধরে ওরা গণকণ্ঠসহ ঢাকার কয়টি দৈনিক পত্রিকা কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সাংবাদিকদেরকে তাদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে কলম চালাতে অনুরোধ জানায়।

—গণকণ্ঠ জুলাই ১৮, ১৯৭২

আত্মঘাতী দাবি

শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর ত্বরিত হস্তক্ষেপের ভিতর দিয়া বিষয়টির আপাততঃ নিষ্পত্তি ঘটিয়াছে এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্মানজনক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রথম পর্বের যথারীতি পরীক্ষা গ্রহণ ও অটো-প্রমোশন দান না করার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পরীক্ষার্থীদের এক ক্ষুদ্রাংশের আত্মঘাতীমূলক অটো-প্রমোশনদানের দাবির নিকট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন অবস্থাতেই নতি স্বীকার করিবে না।

—ইত্তেফাক জুলাই ২২, ১৯৭২

অটো প্রমোশন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেলেংকারী

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে নতুন বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, আগামী '৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে লব্ধ কোন ডিগ্রীই বহির্বিশ্বে গৃহীত

হবে না বলে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থা বাংলাদেশকে জানিয়ে দিয়েছে। এর কারণ সুস্পষ্ট, একে তো সংক্ষিপ্ত সিলেবাস। তদুপরি, ইতিহাসের নজিরবিহীন নকলবাজী। জানা গেছে, পরীক্ষার হলগুলোতে যে নকলবাজী হয়েছে, তা নিয়ে ইউরোপের বহু দেশের টেলিভিশনে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান দেখানো হয়েছে।

—সোনার বাংলা জুলাই ২৫, ১৯৭২

সারা দেশে সাদা কাগজ ও নিউজপ্রিন্টের সংকট : সাধারণ মানুষ দু'ধারী তলোয়ারের নীচে জবাই হচ্ছে— প্রকাশনা শিল্পে বিপর্যয়—বই-পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি— ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়া বিঘ্নিত—পরীক্ষা স্থগিত অথবা মৌখিক : পরীক্ষার সাদা কাগজের দিস্তা সাত টাকা

—সোনার বাংলা জুলাই ২৮, ১৯৭২

পরীক্ষা নামক—

পরীক্ষা নামক প্রহসন নাটকের আর একটি বেদনাদায়ক অংক অভিনীত হইয়াছে ঢাকার ইডেন কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে। বহিরাগত অত্যুৎসাহী 'পরোপকারীদের' ইট-পাটকেল নিক্ষেপ এবং সংঘবদ্ধ হামলার মুখে রক্ষীবাহিনীকে ১০ রাউণ্ড ফাঁকা গুলী ছুড়িতে ও মৃদু লাঠিচার্জ করিতেও হইয়াছে। ঘটনা এমন চরম পর্যায়ে যায় যে, উত্তেজিত বহিরাগতরা পরীক্ষা কেন্দ্রে জোরপূর্বক ঢুকিয়া পড়িয়া প্রিন্সিপালের অফিস কক্ষের সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ ও অফিস রুম লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলে। পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিদর্শকরা প্রাণভয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৩, ১৯৭২

তীব্র অর্থনৈতিক সংকট : উত্তরবঙ্গে দুই হাজার বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পথে

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ৫, ১৯৭২

চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অসদুপায় বন্ধের ব্যাপারে আগাইয়া আসার জন্য সর্বস্তরের নাগরিকদের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন পরীক্ষায় যে

ব্যাপক দুর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বন করা হইতেছে তাহা সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর এক প্রচণ্ড আঘাতস্বরূপ। এই ব্যবস্থা পরিণামে সমাজের মৌল কাঠামোকেই ধ্বংস করিবে।

পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বনের কিছু কিছু নজির বরাবরই পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর যে হারে পরীক্ষায় নকলচর্চা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নজিরবিহীন। আগে পরীক্ষায় নকল করিলে বা নকল করিতে গিয়া ধরা পড়িলে উচ্চতম ও ন্যূনতম শাস্তির বিধান কার্যকর করা চলিত। অধুনা উচ্চতম ও ন্যূনতম কোন রকম শাস্তিই নকলবাজদের বেলায় কার্যকর করার উপায় নাই। পরীক্ষার হলে নকল চলিতেছে অবাধে। ইহার বিরুদ্ধাচরণ হইলে উত্থিত হয় শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া কড়া গালি ও শ্লোগান, বিস্ফোরিত হয় গ্রেনেড।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ২৫, ১৯৭২

কাগজের অভাবে পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ বন্ধ

সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গত ১৫ই ডিসেম্বর হইতে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করিলেও এই কর্মসূচীতে নানারকম উপসর্গ দেখা দিয়াছে। ১ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সকল পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের উদ্দেশ্যে বোর্ড মোট ৪ কোটি পুস্তক মুদ্রণের কাজে হাত দিয়াছিল। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণ শুরু হয় এবং সংগে সংগে বিতরণের কাজও চলিতে থাকে। কিন্তু বর্তমানে বোর্ডের পুস্তক মুদ্রণের কাজ বন্ধ রহিয়াছে। কারণ, কাগজের অভাব।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ৩০, ১৯৭৩

যশোহরে নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের হাতে অধ্যাপকগণ নাজেহাল

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৩, ১৯৭৩

নির্ধারিত মূল্যে ডিলারদের কাছে পুস্তক পাওয়া যায় না উচ্চমূল্যে মুদি দোকানেও পাওয়া যায়

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৪, ১৯৭৩

কুমিল্লায় শিক্ষক প্রহার : ৬০ জন গ্রেফতার

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৫, ১৯৭৩

পঞ্চপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নাই ছাত্রদের ধর্মঘট

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৫, ১৯৭৩

নকলে বাধাদানের কারণে

স্থানীয় সিটি কলেজে বি. এস. সি. পরীক্ষা চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক্সটার্নাল ইনভিজিলেটর হিসাবে আগত ৬ জন অধ্যাপক নকলের প্রচেষ্টায় বাঁধা দেওয়ায় অপরাহ্ন ৩টার দিকে কিছুসংখ্যক মারমুখী ছাত্র তাঁহাদের উপর ধাওয়া করে। ৩ জন অধ্যাপক কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষসংলগ্ন বাথরুমে আত্মগোপন করিয়া রক্ষা পাইলেও অপর ৩ জন প্রহৃত ও গুরুতর-ভাবে আহত হন।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১০, ১৯৭৩

শিক্ষাঙ্গণে প্রায় অচলাবস্থা বিরাজ করিতেছে আবুল ফজলের সহিত একটি সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে কোন্ পরিস্থিতিতে আছি?

উত্তর : শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা চরম অব্যবস্থায়, এমনকি প্রায় অচলাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১১, ১৯৭৩

বালিকা বিদ্যালয়ে দুর্বৃত্তের হানা অভিভাবক মহল স্তম্ভিত

—ইত্তেফাক মে ১৭, ১৯৭৩

যশোহরের পল্লী অঞ্চলে দু'মাস রেশন দেয়া হয়নি খাদ্য ও বস্ত্রাভাবে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না

—গণকণ্ঠ মে ২৩, ১৯৭৩

এই তামাসার কি প্রয়োজন ছিল?

সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী বেতন মওকুফ করার পর পাঁচটি মাস অতিবাহিত হইতে না হইতেই পুনরায় উহা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী পর্যায়ে উহা বাতিলের দরুন দেশের

বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক বেতন ও অন্যান্য বাবত আয় ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে জানা গিয়াছে।

দেশে হাইস্কুলের সংখ্যা ৪৮৫ টি ও জুনিয়র হাইস্কুলের সংখ্যা ৩৭৪টি এবং আনুমানিক ১ লক্ষ ৭০ হাজার ছাত্রী এই সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দরুন অসুবিধায় পড়িয়াছে।

—ইত্তেফাক জুলাই ১৪, ১৯৭৩

এ কি পৈশাচিক নৃশংসতা !

গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাত সাড়ে দশটা। নিস্তব্ধ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, অন্ধকার রাস্তা। সেই নৈঃশব্দকে বিদীর্ণ করিয়া একটি জীপ আসিয়া দাঁড়াইল শামসুন্নাহার হল আর জগন্নাথ হলের মাঝখানে। জীপ হইতে নামানো হইল হাত পিছমোড়া দিয়া বাঁধা, মুখ-চোখ বাঁধা পাঁচটি তরুণকে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া স্টেনগানের গুলীতে ঝাঁজরা করিয়া দেওয়া হইল পাঁচটি তরুণ বক্ষ। একবার, দুইবার কয়েকবার। শিহরিত হইল মানবতা। রাত্রি সাড়ে দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাঁচটি রক্তাপ্লুত তরুণ আর পৈশাচিক বিভীষিকাকে পিছনে ফেলিয়া জীপটি ফিরিয়া গেল। পিছনে একটি সাদা মাজদা গাড়ী রক্ষক হিসাবে।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৭৩

লুট ও ভাড়াটিয়া উচ্ছেদে সরকারী গার্লস কলেজের গাড়ী রক্ষীবাহিনীর সহিত গুলীবিনিময় : এক ব্যক্তি নিহত : ৮ জন আহত : ১২ জন গ্রেফতার

—ইত্তেফাক নভেম্বর ৭, ১৯৭৩

পাঠ্যপুস্তক মওজুত : মূল্য ৫০ ভাগ বৃদ্ধি

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১, ১৯৭৪

নকল ভার্সিটি স্টাইল?

বর্তমানে অনুষ্ঠানরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস. সি., বি এস সি, বি. কম অনার্স ও প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় যথেচ্ছহারে নকল হইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৪, ১৯৭৪

ঢাকা বোর্ড এস. এস. সি. পরীক্ষায় ৭০.২ জন উত্তীর্ণ

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৯৭৪

জহুরুল হক হলের পুকুর হইতে অস্ত্র উদ্ধার

গোপনসূত্রে খবর পাই॥ গতকাল (শুক্রবার) দুপুরে সিটি পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহরুল হক হলের পুকুর হইতে ৪টি রাইফেল, ১টি গ্রেনেড, ৯৯২ রাউন্ড চাইনীজ গুলী এবং টিনের বাক্স হইতে ১০টি খালি এলএমজি ম্যাগজিন উদ্ধার করিয়াছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২০, ১৯৭৪

আয়-ব্যয়ের হিসাবে গরমিল : স্বজনপ্রীতি ও অব্যবস্থার ফলে এ বছরের বাজেটে ১২ লাখ টাকা ঘাটতি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে দুর্নীতির আখড়া

—গণকণ্ঠ মে ১৩, ১৯৭৪

লাকসামে কাগজ নাই

—ইত্তেফাক মে ২৭, ১৯৭৪

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণ হইতে ২৯৭ বাক্স গুলী উদ্ধার

রমনা পুলিশ গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু সাঈদ ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণ হইতে ১ শত ৮০ বাক্স চাইনীজ রাইফেলের গুলী (প্রতি বাক্সে ৭ শত ২০ রাউণ্ড), ১ শত ১৭ বাক্স ৩০৩ রাইফেলের গুলী (প্রতি বাক্সে ৭ শত ৬৮ রাউণ্ড) মোট ২৯৭ বাক্স গুলী উদ্ধার করিয়াছেন।

—ইত্তেফাক জুন ১২, ১৯৭৪

শিক্ষাঙ্গণে কি আবার তাল ও কলাপাতা স্থান পাইবে ?

সম্প্রতি রূপগঞ্জ, বৈদ্যের বাজার, আড়াই হাজার থানা ও ডেমরা এলাকার সাদা ও রুল করা কাগজের তীব্র অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

—ইত্তেফাক জুন ১৬, ১৯৭৪

বিভিন্ন স্থানে কাগজের তীব্র অভাব

বেশ কিছুদিন যাবৎ এতদঞ্চলে কাগজ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। কাগজের অভাবে লক্ষ্মীপুর, রায়পুর, রামগতি ও রামগঞ্জ থানার প্রায় ৩ শত

স্কুলের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়ায় দারুণ ব্যাঘাত হইতেছে। কাগজের অভাবে উক্ত থানাগুলির ৮টি কলেজের কাজকর্ম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

—ইত্তেফাক জুন ২২, ১৯৭৪

আবার কলার পাতায় লিখিতে হইবে

দেশব্যাপী চরম কাগজের সংকট দেখা দিয়াছে। প্রতিদিনই পত্রিকায় দেখতে পাই কাগজের সংকটের খবর। নড়াইলে কাগজ নেই। ঠাকুর গাঁয়ের ডিলার নিখোঁজ। কিশোরগঞ্জ কাগজ ডিলারের সাইনবোর্ড আছে কিন্তু কাগজ নেই।

—সোনার বাংলা জুন ২৩, ১৯৭৪

অক্সিজেনের অভাবে সিলেট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যে-কোন মুহূর্তে অস্ত্রপচার বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা

—ইত্তেফাক জুন ২৬, ১৯৭৪

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের হুঁশিয়ারী ৮ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ হতে যাচ্ছে

—গণকণ্ঠ জুলাই ৭, ১৯৭৪

দেশের ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বছরে ২ হাজার ডিগ্রীপ্রাপ্ত যুবক বেকার পৌণে ১১ হাজার উচ্চ শিক্ষা পাচ্ছে না

—গণকণ্ঠ আগস্ট ২৮, ১৯৭৪

পাঁচ শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ধ্বংসের পথে

—ইত্তেফাক আগস্ট ৩০, ১৯৭৪

বাংলাদেশ পত্রিকা পরিষদের প্রথম সম্মেলনে সুধীবৃন্দ :

নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশের দ্বারা সরকার ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়ছেন। এই আদেশ কখনো টিকিবেনা, কিছুতেই টিকিতে পারে না।

—কবি জসিম উদ্দিন

ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর হামলার চেয়ে নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশের হামলা আরো জঘন্য। এর ফলে দেশ 'আইয়ামে জাহেল্লিয়াতে' ফিরে যাবে।

—আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

নিউজপ্রিন্টের নিয়ন্ত্রণাদেশ সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ও ভারতীয় বই পত্রের বাজার সৃষ্টির মারাত্মক ষড়যন্ত্র—বায়ান্নতেও জাতি এমন বিপদজনক চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হয়নি—বাহাত্তর সন থেকে সুপরিকল্পিতভাবে সংবাদপত্রের কণ্ঠ-রোধ শুরু হয়েছে—নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ এই কণ্ঠরোধের সর্বশেষ পদ-ক্ষেপ।

—নির্মল সেন

যেভাবে দেশে আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছে তাতে বিশেষ করে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে আজ আমরা শংকাগ্রস্ত।

—ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন

সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো দেশকে সিকিমে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে।

—আলী আশরাফ

বিজ্ঞাপন ও কাগজ নিয়ন্ত্রণাদেশ অব্যাহত থাকলে শীঘ্রই দেশের সব পত্রপত্রিকার অন্তিম সংখ্যা প্রকাশ করে দেশ বরেণ্য নেতার নামে তা উৎসর্গ করতে হবে।

—আবদুল্লাহ আবু সাঈদ

নিউজপ্রিন্টের নিয়ন্ত্রণাদেশের ফলে ১০ লাখ শ্রমিকের জীবিকার পথ রুদ্ধ হবে।

—চিত্তরঞ্জন সাহা

—সোনার বাংলা সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৭৪

হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা : শিক্ষাকে বনবাসে পাঠানোর চক্রান্ত চলছে

সারাদেশে এক ভয়াবহ শিক্ষা সংকট দেখা দিয়াছে। এই সংকট শুধু পরীক্ষার নকল, ভূয়া প্রবেশপত্র নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রদেরকে নকল সরবরাহে শিক্ষকের সহায়তা দান আর শিক্ষাবোর্ডে দুর্নীতির মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই বরং এসবের চাইতেও মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের হাজার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে চলছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব জয়নুল আবেদিন চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, অর্থের অভাবে দেশের সাড়ে আট

হাজার বেসামরিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮ হাজার বিদ্যালয়ই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

—সোনার বাংলা সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৭৪

নিউজপ্রিন্ট সমাচার: সোনার পাত রফতানী করে কত সোনা এল?

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান শস্য পাট, চা ও তামাক ইত্যাদি কোনটা বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে গিয়ে, কোনটা অবাস্তব ভ্রান্তনীতির মাশুল যোগাতে গিয়ে, কোনটা বর্ডার ট্রেড প্যাক্টের সেলামী যোগাতে গিয়ে যখন অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে তখন সরকারের দৃষ্টি পড়ল 'সোনার পাত' নামে খ্যাত নিউজপ্রিন্টের উপর। সভ্যতা ও সংস্কৃতির গলায় ছুরি বসিয়ে, স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির পরীক্ষা বন্ধ করে, সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো যাদুঘরে উঠিয়ে, স্কুল শিক্ষকদের মনোহারী দোকানের চাকুরী দিয়ে আমাদের সদাশয় সরকার দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যে নিউজপ্রিন্ট রফতানী করার প্ল্যান নিয়েছেন তার বয়স আজ তিন মাস অতীত হতে চলল। কিন্তু আজ পর্যন্ত নিউজ প্রিন্ট রফতানী বাবদ কত ডলার বা রুপিয়া অর্জিত হয়েছে জনগণ তা জানেন না। চরম কৃচ্ছ্রতা সাধনকারী জনগণ জানতে চায় নিউজপ্রিন্ট রফতানি করে অর্জিত অর্থ দিয়ে কি দ্রব্য আনা হয়েছে। বা কোন্ খাতে তা ব্যয় করা হয়েছে?

—সোনার বাংলা নভেম্বর ১০, ১৯৭৪

এইচ. এস. সি. পরীক্ষার প্রথম দিনে প্রায় ৫ শত পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত

গতকাল (বৃহস্পতিবার) দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের উচচ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। প্রথমদিনে বাংলা (আবশ্যিক) প্রথম-পত্রের পরীক্ষার সময় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রায় ৫ শত পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১০, ১৯৭৫

৬ হাজারেরও বেশী পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত: পরীক্ষা না দিয়ে বহু ছাত্র হল ত্যাগ করেছে

—সোনার বাংলা জানুয়ারী ২৫, ১৯৭৫

পরীক্ষার ফি কেলেঙ্কারী

আসন্ন এইচ. এস. সি. পরীক্ষার ফি বাবত বেশ কয়েক লক্ষ টাকা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের হিসাব বিভাগে জমা পড়ে নাই।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, বোর্ডের ভিতরের ও বাহিরের লোকদের একটি সংঘবদ্ধ দল ভুয়া 'ব্যাঙ্ক স্ক্রল' জমা দিয়া বোর্ডকে এইভাবে ফাঁকি দিয়াছে।

গত বুধবার পর্যন্ত পাওয়া হিসাবে এ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে। হিসাব বিভাগে এখন এ ব্যাপারে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। প্রতারিত অর্থের পরিমাণ বেশ কয়েক লক্ষ টাকা হইতে পারে বলিয়া সংশ্লিষ্ট মহল আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। বোর্ড ভুয়া 'ব্যাঙ্ক স্ক্রলের' দরুন যে সকল মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের ফি লইতে প্রতারিত হইয়াছে উহার মধ্যে রহিয়াছে ঢাকা সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয় (৫৮ হাজার ৮ শত ৩৭ টাকার ভুয়া স্ক্রল), সিদ্ধেশ্বরী (পুরুষ) মহাবিদ্যালয় (২৮ হাজার ৫ শত ৪৩ টাকা), আবদুর রহমান কলেজ ময়মনসিংহ (১৫ হাজার ২ শত ৭০ টাকা), এম. এ. রউফ কলেজ, ঝিটকা, ঢাকা (৭ হাজার ৩ শত ৫০ টাকা), পুরানা পল্টন মহিলা মহাবিদ্যালয় (৭ হাজার ২ শত ৩৯ টাকা), বঙ্গবাসী কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা (৩ হাজার ৮ শত টাকা), তেজগাঁও মহিলা মহাবিদ্যালয়, মতিঝিল নৈশ মহাবিদ্যালয়, নজরুল মহাবিদ্যালয় (ত্রিশাল), শামসুল হক কলেজ (টাঙ্গাইল), গফরগাঁও কলেজ। ইহার মধ্যে গফরগাঁও কলেজের ভুয়া ব্যাঙ্ক স্ক্রলের টাকা ছিল প্রায় ৫ হাজার। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ এই টাকা পুনরায় বোর্ডে জমা দিয়াছে।

গত কিছুদিন আগে ভুয়া ব্যাঙ্ক স্ক্রল সমেত ফরম জমা দেওয়ার সময় গফরগাঁও কলেজের একজন কেরাণীকে বোর্ড অফিসে হাতেনাতে ধরিয়া পুলিশে সোপর্দ করা হইয়াছিল।

—ইত্তেফাক আশ্বিন ১০, ১৩৮১

বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের তীব্র সমালোচনা ও ওয়াক আউটের মুখে ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন) (সংশোধনী) বিল পাস

জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে গতকাল (বুধবার) বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের তীব্র সমালোচনা ও ওয়াক আউটের

মুখে 'ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন) (সংশোধনী) বিলটি' কণ্ঠভোটে পাস হয়। অধিবেশনে স্পীকার জনাব আবদুল মালেক উকিল সভাপতিত্ব করেন।

..স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন (সংশোধনী) বিলটি সংসদে উত্থাপন করিলে স্বতন্ত্র সদস্য জনাব আবদুল্লাহ্ সরকার ও মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সদস্যদ্বয় জনাব আবদুস সাত্তার ও জনাব মইনুদ্দিন আহমদ মানিক উহাকে একটি কালাকানুন ও সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বাক-স্বাধীনতা তথা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত বলিয়া অভিহিত করিয়া বিলটি জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচার করার আহ্বান জানান।

আবদুল্লাহ সরকার

স্বতন্ত্র সদস্য জনাব আবদুল্লাহ সরকার বলেন যে, বিলটি দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও চমকিত হইয়াছেন। কারণ ইহা একটি 'কালাকানুন'। তিনি বলেন, এই প্রস্তাবিত আইনটি স্বাধীন বাংলাদেশে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নহে।

তিনি বলেন: আইয়ুব আমলে এই ধরনের কালাকানুন জারি করা হইয়াছিল। সেদিন আওয়ামী লীগ উহার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিল এবং উহার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন হইয়া আজ আওয়ামী লীগ কেন এইসব করিতেছে, তাহা বোধগম্য নহে।

আবদুস সাত্তার

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জনাব আবদুস সাত্তার আলোচ্য বিলটির সমালোচনা করিয়া ইহাকে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্নকারী কালাকানুন বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, আইনটি দূরভিসন্ধিমূলক এবং ইহার ফলে দেশের অবস্থা জনগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরা যাইবে না। তিনি বলেন যে, এইরূপ আইন পাস করিলে জনগণ পার্লামেন্টের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিবে। কারণ এই পার্লামেন্ট শুধু মন্ত্রীদের পার্লামেন্ট নহে, জনপ্রতিনিধিদের পার্লামেন্ট।

মঈনউদ্দিন মানিক

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জনাব মঈনুদ্দিন আহমদ মানিক আলোচ্য বিলটিকে স্বাধীনতা নস্যাৎ করার একটি 'সুপরিকল্পিত চক্রান্ত' বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন, আইয়ুব আমলেও এমন হইয়াছিল, সেদিন মানিক মিয়া তাঁহার 'ইত্তেফাক' লইয়া উহার বিরোধিতা করিতে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। ফলে ইত্তেফাক বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ও মানিক মিয়াকে জেলে আটক রাখা হয়। কিন্তু আজ আইন পাস হইতেছে—উহা দেখিলে মরহুম মানিক মিয়ার আত্মা আঁতকাইয়া উঠিবে।

তিনি বলেন যে, সংবাদপত্রে চাউল, পাট ইত্যাদি পাচারের কথা, বাংলাদেশের কৃষিশিল্পকে ধ্বংস করার কথা লিখিলে সরকার উহার জবাব দিতে পারে না। তাই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

মানবেন্দ্র লারমা

স্বতন্ত্র সদস্য মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেন যে, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতাকে হরণ করিয়া ও সংবিধানের ৩৯ বিধিকে খর্ব করিয়া আলোচ্য বিলটি সংসদে উত্থাপন করা হইয়াছে। তিনি প্রশ্ন করেন যে, সত্যই কি দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা বন্ধুরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক নষ্ট হইতেছে? না-কি আমাদিগকে চিয়াং কাইশেক, সিংম্যানরী ও নগো দিন দিয়েমের ভূমিকা পালন করিতে হইবে?

—ইত্তেফাক ১৯৭৪

সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় মতামত

পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিতে ছাত্রদের অটো প্রমোশন দাবি

'অটো বিপ্লবীদের প্রতি' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'দৈনিক গণকণ্ঠ' বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অটো প্রমোশন-এর দাবীতে কিছু সংখ্যক ছাত্র উপাচার্যসহ বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান, ডীন, প্রভোষ্ট ও প্রক্টরদের ছয় ঘণ্টা আটক করে রাখে। এইসব 'দেশ প্রেমিক' কৃতীছাত্রদের অবরোধের ভেতর একজন বৃদ্ধ শিক্ষক অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিন্তু ঘেরাওকারীরা তাদের স্বীয় সিদ্ধান্তে রাজাকারদের মতই প্রায় অবিচল থাকেন।... বিকেলে প্রধানমন্ত্রী এসে অটো বিপ্লবীদের হাত থেকে বন্দী শিক্ষকদের উদ্ধার করেন।.. প্রবেশিকা পরীক্ষায় শতকরা ৯৫ জন ছাত্রের অনায়াসে পাসের সংবাদে অশিক্ষিত মানুষ প্রলোভিত হতে পারে, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সেই প্রবণতা যদি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে অটো প্রমোশনের দাবীতে ঠেকে তাহলে একে জাতির দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলবো।

..অটো প্রমোশন আন্দোলনের নির্ভীক কর্মীদের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন, অনেক হয়েছে আর নয়। অটো ফটো ভুলে যান। অটোর অদৃশ্য কুঁটো দিয়ে আমাদের আর রসাতলে পাঠাবেন না।

'আত্মঘাতী দাবি' শিরোনামায় প্রকাশিত এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'দৈনিক ইত্তেফাক' বলেন, .. অটো প্রমোশন একটি আত্মঘাতী ব্যবস্থা। ইহা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও জ্ঞান চর্চার পরিপন্থী।..পরীক্ষা গ্রহণ ব্যতিরেকে যদি প্রমোশন দেওয়া হয় তাহা হলে অনটন ও অভাবগ্রস্ত অভিভাবকদের অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসা যাওয়ার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। বৎসর শেষে ডাকযোগে একখানা সার্টিফিকেট পাঠাইয়া দিলেই চলিতে পারে।

'শর্টকাটে' ডিগ্রী শীর্ষক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে দৈনিক বাংলা বলেন, অটো প্রমোশনের দাবি ছাত্রসমাজের সুনাম ও ঐতিহ্যের সংগে মোটেই সংগতিপূর্ণ নয়। কেন এই ফাঁকতালে ডিগ্রী অর্জনের প্রচেষ্টা? .. পরীক্ষা না দিয়ে পাওয়া ডিগ্রী পত্র কি ছেঁড়া কাগজের ঝুঁড়িতে নিক্ষিপ্ত বস্তুর চাইতে বেশী মূল্যবান হবে?

..সংক্ষিপ্ত কোর্সে পরীক্ষা, গণটোকা-টুকি, পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেবার আন্দোলন ইত্যাদি ইতিমধ্যেই আমাদের ছাত্রসমাজের সুনামের উপর আঘাত হেনেছে।

—সোনার বাংলা সম্পাদকীয় জুলাই ৮, ১৯৭২

ইহা কি সত্য?

ইত্তেফাকের এক বিশেষ রিপোর্টে প্রকাশ, বাংলাদেশের সকল মেডি-ক্যাল কলেজ হইতে বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিল উহার অনুমোদন প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছে। খবরে আরও প্রকাশ, রোগীদের অসম্ভব ভিড়ে মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রদের প্রাক্‌টিক্যাল ক্লাসের দারুণ অসুবিধা হইতেছে। অনুরূপ অব্যবস্থার দরুন শিক্ষার্থীদের সম্মুখে অধ্যাপকগণের প্রয়োজনীয় লেকচার প্রদানেরও অসুবিধা ঘটিতেছে। ধারণা করা হইতেছে যে, উল্লিখিত অনেক কারণেই বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিল আমাদের মেডিক্যাল কলেজসমূহের উপর হইতে উহার অনুমোদন প্রত্যাহার করিয়াছেন। বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুমোদন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অনুষঙ্গ বলিয়াই বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার পরিবেশ সংক্রান্ত যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, জাতীয় স্বার্থেই সে সম্পর্কে নূতন করিয়া চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রহিয়াছে।

বস্তুতঃ শুধু মেডিক্যাল কলেজেই শিক্ষার পরিবেশ নিদারুণ অব্যবস্থার শিকারে পরিণত হইয়াছে, তাহা নহে। গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্যালোচনার পটভূমিতে রাখিলে দেখা যাইবে কোথাও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অবশিষ্ট নাই। আজ মেডিক্যাল কলেজ হইতে বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিল উহার অনুমোদন প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু সমগ্র শিক্ষার ক্ষেত্রে এহেন রুগ্ন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে এদেশের সকল পরীক্ষার ফলাফল তথা সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিক অনুমোদন হইতে বঞ্চিত হইবে না, উহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? এবারের এস. এস. সি. পরীক্ষাসমূহে নকলের যে অবাধ রাজত্ব ছিল, তাহা স্বীকৃত সত্য। এই অবস্থায় পাসের হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৯০, ৯৩ এমনকি ৯৭ ভাগ। সুতরাং পরীক্ষার মানের পাশাপাশি শিক্ষার মান কোথায় গিয়া ঠেকিতেছে, তাহা আজ প্রত্যেককেই ভাবিয়া দেখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে লুকোচুরি, কারচুপি আর টালবাহানা করিয়া আমরা নিজেদের মনকে প্রতারিত করিতে পারি, কিন্তু বাস্তবকে কোনক্রমেই ফাঁকি দিতে পারি না। কেননা, প্রকৃত শিক্ষা ছাড়াই সার্টিফিকেটধারী কোন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার অথবা কোন বিজ্ঞানী যে-কোন প্রশাসক কিছুতেই বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াইতে পারিবেন না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অন্তরালবর্তী ফাঁক ও ফাঁকি ধরা পড়িবেই। অথচ এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিয়া, সস্তায় বাজিমাত করার প্রবণতাই লক্ষ্য করা যাইতেছে।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় জুলাই ১৬, ১৯৭২

অযথা শিক্ষিতের হার বাড়িয়ে কি লাভ ?

সারা বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা বললে ভুল হবে, বলতে গেলে বলতে হয় নকলের প্রতিযোগিতা। নকলকে আজকাল আবার গণটোকা-টুকি বলা হয়। কেননা ব্যাপারটা এখন আর ২।৪ জন না পড়ুয়া ছাত্রের মধ্যে সীমিত নয়। ছাত্র-অছাত্র মিলে সব পরীক্ষার্থী নির্বিঘ্নে নিদ্বিধায় বই দেখে দেখে প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়ে থাকে। তাই নকল করাটা বর্তমানে গণ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করিলে ব্যাপারটাকে 'গণ নকল' বলে অভিহিত করা যেত। তা না করে হায়ার করে কেন 'গণটোকা-টুকি' শব্দটাকে আমদানী করা হল আমরা তা জানি না।

স্বাধীনতার পর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রীসহ অনেক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের খবর আমরা জানি। আশা করা গিয়েছিল কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল শিক্ষকবৃন্দ খাতা দেখার সময় নকল আর আসল বাছাই করবেন। যারা নকল না করে নিজের জ্ঞান, মেধা এবং বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে তারা এই সততার জন্য বোর্ডের স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু আমাদের সেই আশা ফলবতী হয়নি। পরীক্ষার ফল বের হলে আমরা লক্ষ্য করলাম পরীক্ষকরা ভাল ছাত্রদের এবং যারা সততার সাথে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তাদের প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি দেননি। ভালো ও মন্দের মাঝে এবং আসল ও নকলের মাঝে কোন তফাৎ-এর সৃষ্টি করা হয়নি। গড়ে সবাই পাস করেছে, শুধু পাস নয়--- অর্থাৎ কৃতিত্বের সাথে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিভাগে। দেশ শুদ্ধ মানুষ জানে পরীক্ষা কেন্দ্রে কি হয়েছে। কারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। দেশে-বিদেশে এই নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়েছে। দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রামাণ্য চিত্র ছাপা হয়েছে। এ সব দেখে শুনেও কর্তৃপক্ষ এবং পরীক্ষক-বৃন্দের মাথা হেঁট হয়নি। তাঁরাও পরীক্ষার্থীদের মত গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। —সোনার বাংলা সম্পাদকীয় ডিসেম্বর ৩, ১৯৭২

এ কলঙ্কের অপনোদন অত্যাবশ্যক

এ লজ্জা শুধু প্রধানমন্ত্রীর নয়, এ লজ্জা গোটা জাতির। বিদেশে আজ বাঙ্গালী ছাত্রদের ডিগ্রীর কোন সমাদর নাই, বরং কোন কোন বৈদেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাঙালী ছাত্রদের ডিগ্রীকে স্বীকার করিতেই চাহিতেছে

না। বিষয়টা একান্তভাবেই লজ্জার এবং পরিতাপের। প্রশ্ন জাগে, এ জন্য দায়ী কে'? জওয়াব অবশ্যই দেওয়া হইবে। এবং বিভিন্ন মহল এ জন্য একে অপরকে দায়ী করিতে বা দোষারোপ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু আসল সত্য তলাইয়া দেখিলেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে কবির সেই বাণীর সুগভীর সত্যতা : "কার নিন্দা করো তুমি? মাথা কর নত, এ আমার এ তোমার পাপ।"

সেই পাপ, সেই কলঙ্ক আর সেই লজ্জার কাহিনীই তুলিয়া ধরিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গত রবিবারের ঐতিহাসিক জনসভায়। ছাত্রদেব উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "তোমরা নকল কর আর আমি লজ্জায় মরিয়া যাই। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, যখন শুনি মা-বাবারাই ছেলে মেয়েদের নকল সরবরাহ করিতেছে, তখন লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়।" আগেই বলিয়াছি, এ লজ্জা শুধু তার নয়, গোটা জাতির। স্বাধীনতার মুক্ত পরিবেশে বিশ্ব-সভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে। এমতাবস্থায় পাইকারী নকল প্রবণতার কলঙ্ক-তিলক অঙ্কিত মস্তকে বিশ্বসভায় দাঁড়াইবার যোগ্যতা অর্জিত হওয়ার আশা ও আশ্বাস জাতি কোথায় খুঁজিবে? ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক নির্বিশেষে সব মহলকেই আজ এই জলন্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় মার্চ ২০, ১৯৭৩

আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি চাই

একুশে ফেব্রুয়ারী বা শহীদ দিবসে আমরা আর কলমবাজী করব না। শপথ নিয়েছি এই কলামে শহীদ দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার পুরানো ভাওতাবাজীতে আর মন দিব না। ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনার নামে ইতিহাস বিকৃতকারীদের সাথে আর সামিল হব না। আর দশজনের সাথে শহীদদের জন্য লোক দেখানোর মায়াকান্নার শরিক হতে চাই না। সোজা কথা মোনাফেকী ও গাদ্দারী থেকে মুক্ত হতে চাই। বিভ্রান্ত ও আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে চাই।

....

....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এবারের একুশে পালন করছেন না। উদ্দেশ্য তারা কথায় ও কাজের গরমিল, ধোকাবাজী ও শঠতার পরি-

সমাপ্তির কামনা করে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার একটা সময় সীমা তারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। উক্ত সময় সীমার মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি তাঁরা নতুন করে রচনা করবেন। নতুন সংগ্রামে তাঁরা অবতীর্ণ হবেন। আমরা এই ব্যাতিক্রমধর্মী সাহসী যুবকদের প্রাণ খোলা বক্তব্যের সাথে একমত। গডডালিকা প্রবাহের প্রবল স্রোতের বিপরীতে তাঁদের এই দুঃসাহসী যাত্রাকে আমরা স্বাগত জানাই।

—সোনার বাংলা সম্পাদকীয় ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯৭৪

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসে পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ

বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে আবার রক্ত ঝরিয়াছে। আবার স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রের হিংস্র গর্জনে প্রকম্পিত হইয়াছে রাত্রির অন্ধকার। আবার মানবতার হৃদপিণ্ড হিংস্রতার কুটিল নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি দুইটা এগার মিনিটে মহসিন হলের টি. ভি. রুমের সম্মুখস্থ করিডরে একইসংগে সাতটি ছাত্রের দেহ ঝাজরা হইয়া গিয়াছে বুলেটের সুতীক্ষ্ণ আঘাতে। রক্তাপ্লুত প্রাণহীন সাতটি তরুণের দেহ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি বিবেকের নিকট প্রশ্ন রাখিয়াছে, এ হত্যাকাণ্ড যদি রাজনীতির পরিণতি হয়, তাহা হইলে সাতটি তরুণ দেহে বিদ্ধ প্রতিটি বুলেট কি রাজনীতিকেই হত্যা করিবার জন্য বর্ষিত হয় নাই? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি নিহত তরুণের আত্মা চিৎকার করিয়া প্রশ্ন করিয়াছে, কোথায় সুস্থ জীবনযাত্রার নিরাপত্তা? হত্যাকারীর সদম্ভ প্রস্তুতি প্রতিহত করার দায়িত্ব যাহাদের হাতে সরকারীভাবে ন্যস্ত, কোথায় তাঁহাদের তৎপরতা? রাত্রির অন্ধকারে এভাবে আর কত রক্ত ঝরিবে?

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় এপ্রিল ৬, ১৯৭৪

- দেশ স্বাধীন হইলেও সাংবাদিকরা পেশাগতভাবে স্বাধীন নন
- নতুন বোতলে পুরাতন মদ আসছে না তো?
- তোগলকী কাণ্ড
- কোন্ পত্রিকা কত নিউজপ্রিন্ট পায়
- নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশে সংবাদপত্র পরিষদ উদ্বিগ্ন

সমাপ্তির কামনা করে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার একটা সময় সীমা তারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। উক্ত সময় সীমার মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি তাঁরা নতুন করে রচনা করবেন। নতুন সংগ্রামে তাঁরা অবতীর্ণ হবেন। আমরা এই ব্যাতিক্রমধর্মী সাহসী যুবকদের প্রাণ খোলা বক্তব্যের সাথে একমত। গডডালিকা প্রবাহের প্রবল স্রোতের বিপরীতে তাঁদের এই দুঃসাহসী যাত্রাকে আমরা স্বাগত জানাই।

—সোনার বাংলা সম্পাদকীয় ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯৭৪

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসে পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ

বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে আবার রক্ত ঝরিয়াছে। আবার স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রের হিংস্র গর্জনে প্রকম্পিত হইয়াছে রাত্রির অন্ধকার। আবার মানবতার হৃদপিন্ড হিংস্রতার কুটিল নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি দুইটা এগার মিনিটে মহসিন হলের টি. ভি. রুমের সম্মুখস্থ করিডরে একইসংগে সাতটি ছাত্রের দেহ ঝাজরা হইয়া গিয়াছে বুলেটের সুতীক্ষ্ণ আঘাতে। রক্তাপ্লুত প্রাণহীন সাতটি তরুণের দেহ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি বিবেকের নিকট প্রশ্ন রাখিয়াছে, এ হত্যাকান্ড যদি রাজনীতির পরিণতি হয়, তাহা হইলে সাতটি তরুণ দেহে বিদ্ধ প্রতিটি বুলেট কি রাজনীতিকেই হত্যা করিবার জন্য বর্ষিত হয় নাই? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি নিহত তরুণের আত্মা চিৎকার করিয়া প্রশ্ন করিয়াছে, কোথায় সুস্থ জীবনযাত্রার নিরাপত্তা? হত্যাকারীর সদম্ভ প্রস্তুতি প্রতিহত করার দায়িত্ব যাহাদের হাতে সরকারীভাবে ন্যস্ত, কোথায় তাঁহাদের তৎপরতা? রাত্রির অন্ধকারে এভাবে আর কত রক্ত ঝরিবে?

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় এপ্রিল ৬, ১৯৭৪

সংবাদ পত্র

- দেশ স্বাধীন হইলেও সাংবাদিকরা পেশাগতভাবে স্বাধীন নন
- নতুন বোতলে পুরাতন মদ আসছে না তো?
- তোগলকী কাণ্ড
- কোন্ পত্রিকা কত নিউজপ্রিন্ট পায়
- নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশে সংবাদপত্র পরিষদ উদ্বিগ্ন

গণকণ্ঠ সম্পাদকের সাংবাদিক সম্মেলন

গতকাল (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্নে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দৈনিক 'গণকণ্ঠের' সম্পাদক জনাব আল মাহমুদ অভিযোগ করেন : "গণকণ্ঠ অত্যন্ত বেআইনীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে তথাকার পৌণে তিনশত সাংবাদিক ও কর্মচারী বেকার হইয়া পড়িয়াছেন। সাংবাদিক অথবা কর্মচারীদের মুহূর্তমাত্র সময় না দিয়া অফিস হইতে কাজ অসমাপ্ত রাখা অবস্থায় বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

—ইত্তেফাক মার্চ ৩০, ১৯৭৩

দেশ স্বাধীন হইলেও সাংবাদিকরা পেশাগতভাবে স্বাধীন নন

ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী নির্মল সেন আগামী ৩১শে আগস্টের মধ্যে পাকিস্তান আমলের কালাকানুন প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশান্স অর্ডিন্যান্স বাতিলের জন্য সরকারের নিকট আবার দাবি জানাইয়াছেন।

—ইত্তেফাক আগস্ট ১১, ১৯৭৩

চট্টগ্রামের দৈনিক 'দেশবাংলা' পত্রিকা অফিস ঘেরাও সম্পাদকসহ কয়েকজন আটক

গতকাল (শনিবার) গভীর রাত্রে চট্টগ্রাম হইতে টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পুলিশ দৈনিক 'দেশবাংলা' পত্রিকা অফিসটি ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে এবং পত্রিকার সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক ও স্টাফ রিপোর্টারকে আটক করিয়াছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ১২, ১৯৭৩

নতুন বোতলে পুরাতন মদ আসছে না তো ?

তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজ গত বুধবার জানিয়েছেন যে, প্রেস এণ্ড পাবলিকেশান্স অর্ডিন্যান্স বাতিল করা হচ্ছে এবং এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

তদানিন্তন আইন-মন্ত্রীও একবার বলেছিলেন, এক মাসের মধ্যে সমস্ত কালাকানুন বাতিল করা হবে। প্রেস এণ্ড পাবলিকেশান্স সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন : 'এই অর্ডিন্যান্সটি নামে মাত্র আছে। কামে নাই।' তথ্য ও বেতার মন্ত্রী বলেন: 'প্রেস এণ্ড পাবলিকেশান্স

অর্ডিন্যান্স বাতিল করা হবে এ কথা প্রধানমন্ত্রী বার বার বলেছেন। এর কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন অতীতে আওয়ামী লীগ এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। তথ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন এই বক্তব্য তো সাংবাদিক মহলেরও। তথ্যমন্ত্রী বলেন সুতরাং এই দাবি নিয়ে আর আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। কথাটা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু দাবি মেনে নিলে আর সংগ্রাম কেন?

—সোনার বাংলা আগস্ট ২৬, ১৯৭৩

নূতন প্রেস অর্ডিন্যান্স গ্রহণযোগ্য নহে

বাংলাদেশে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ সরকার জারিকৃত প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশান্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৩, পুংখানুপুংখরূপে আলোচনা করিয়া নূতন অর্ডিন্যান্সটিতে আইয়ুবী আমলের কালাকানুনের মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই বিধায় উহা গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করে।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৭৩

তোগলকী কাণ্ড

বাংলাদেশের সংবাদপত্র শিল্পকে চরম সংকটের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। স্বাধীনতার পর হইতে অবশ্য অন্যান্য শিল্পের ন্যায় নানা সমস্যা এই শিল্পকেও আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। আশাকরা গিয়াছিল যে, গণতান্ত্রিক কাঠামোতে জনমত সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এই শিল্পের সমস্যা ক্ষিপ্রতার সহিত দূর করা হইবে। বিভিন্ন সময় কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনাকালে আমাদের সেই ধারণারই সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরদিন হইতে আজ পর্যন্ত এই ২২ মাসে সমস্যা দূর করার কার্যকর কোন ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ নিয়াছেন এইরূপ দাবি তাহারাও করিতে পারেন না।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ৬, ১৯৭৩

বিশ্ব-বাজারে প্রতি টন ৩৫০ ডলার ভারতকে দেয়া হচ্ছে ১৯৭ ডলার দরে ভারতে নিউজপ্রিন্ট রফতানী করে সোয়া কোটি টাকা লোকসান

ভারতে কমদামে নিউজপ্রিন্ট রফতানী করে বাংলাদেশ সরকার বছরে কমপক্ষে সোয়া কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা হারাতে বসেছে। ভারতীয় শোষক ও ক্ষমতাসীন টাউট শ্রেণীর বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাট, চামড়া, চাসহ অন্যান্য পণ্যের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও অলাভজনক করে তুলেছে। তার ওপর আবার নিউজপ্রিন্টের উপর শোষণের কালো থাবা বিস্তৃত হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তাদের অদূরদর্শিতা ও কর্তব্য-গাফলতি, দুর্নীতি ও নীতিহীনতাও দায়ী। নিউজপ্রিন্ট রপ্তানী ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় সংশ্লিষ্ট কর্তাদের জন্যই ঘটেছে বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিযোগ।

— গণকণ্ঠ ফেব্রুয়ারী ২০, ১৯৭৪

কোন্ পত্রিকা কত নিউজপ্রিন্ট পায়

কোন্ পত্রিকা প্রতিমাসে কত টন নিউজপ্রিন্ট পায় তাহার একটা হিসাব গতকাল (বুধবার) জাতীয় সংসদে তথ্য ও বেতার দফতরের প্রতিমন্ত্রী জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর পেশ করিয়াছেন। তাহার পেশকৃত তালিকা হইল: দৈনিক বাংলা ১৫০ টন, আলহেলাল গ্রুপ ২ শত টন, মর্নিংনিউজ ২৫ টন, ইত্তেফাক ২০০ টন, জনপদ ২৫ টন, আজাদ ২৫ টন, সংবাদ ২৫ টন, গণকণ্ঠ ২৫ টন, সমাজ ৫ টন, পিপল ২৫ টন, চট্টগ্রামের দৈনিক স্বাধীনতা ৫ টন, পিপলস ভিউ ৩ টন, ঢাকার বাংলাদেশ টাইমস ১৫ টন ও বগুড়ার দৈনিক বাংলাদেশ ৮ টন।

—ইত্তেফাক জুন ২৭, ১৯৭৪

নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশে সংবাদপত্র পরিষদ উদ্বিগ্ন

—ইত্তেফাক আগস্ট ২, ১৯৭৪

নিউজপ্রিন্টের মূল্য : অযোগ্যতা : অব্যবস্থা

দেশে নিউজপ্রিন্ট চাহিদার চাইতে অনেক বেশী উৎপাদিত হয়। তবুও সারাদেশে এখন নিউজপ্রিন্ট লইয়া বিতর্ক চলিতেছে। দৈনিক পত্রিকাগুলির নির্দিষ্ট কোটা কাটিয়া দিবার পর হইতে সংকট আরও প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। শতকরা ৪০ ভাগ কাগজ হইতে ৬০ ভাগ কোটা করিয়া দেওয়া হইতেছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ৩১, ১৯৭৪

পত্রিকা পরিষদ সম্মেলনে বক্তাদের অভিমত নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ পত্রিকা নিয়ন্ত্রণেরই আদেশ

"নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশ এবং মুক্তি চেতনাকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে উদ্যত।"

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭৪

বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের তীব্র সমালোচনা ও ওয়াক আউটের মুখে ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন) (সংশোধনী) বিল পাস

জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে গতকাল (বুধবার) বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের তীব্র সমালোচনা ও ওয়াক আউটের মুখে 'ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন) (সংশোধনী)' বিলটি কণ্ঠভোটে পাস হয়। অধিবেশনে স্পীকার জনাব মালেক উকিল সভাপতিত্ব করেন।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২১, ১৯৭৪

গণকণ্ঠ অফিস "সিজ" করা হইয়াছে

অননুমোদিত সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য পুলিশ ১৯৭৩ সনের মুদ্রণ ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও রেজিস্ট্রেশন) আইনের অধীনে গত ২৭।১।৭৫ তারিখে ঢাকার ৫৪-সি, টিপু সুলতান রোডস্থ দৈনিক সংবাদ-পত্র গণকণ্ঠের অফিস 'সিজ' করিয়াছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২৯, ১৯৭৫

সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় মতামত

নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ আদেশ

সরকার ১৯৭৪ সালের নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করিয়াছেন। ইহার ফলে সরকারী অনুমোদনক্রমে নিউজপ্রিন্ট সংগ্রহ করিয়া সংবাদপত্র মুদ্রণ এবং সরকারী গেজেট নোটিশে বর্ণিত ও সাধারণভাবে পঠিত স্বল্প-মূল্যের ধর্মীয় পুস্তক ছাড়া অন্য কোন কাজে নিউজপ্রিন্ট ব্যবহার করা চলিবে না। তাছাড়া সরকারী অনুমতি ভিন্ন অনুরূপভাবে সংগৃহীত নিউজ-প্রিন্ট ধার দেওয়া, বিক্রয় করা বা হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

..তবে প্রশ্ন হইল, বর্তমান ব্যবস্থার দ্বারা উহা কতদূর সম্ভব। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য সর্বশেষ কোন তথ্য-পরিসংখ্যান নাই। তবে একটা বিষয় সবার জানা যে, প্রাক-স্বাধীনতা আমলে বাংলাদেশের নিউজপ্রিন্টের সাহায্যে করাচী, লাহোর, পিণ্ডির সমুদয় সংবাদপত্র পরিচালিত হইত। ১৯৬৯-৭১ সালে একমাত্র 'দৈনিক জং'-এর প্রচারসংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ। নিয়মিত প্রচার সংখ্যা ছাড়াও তখন বৎসরে কমপক্ষে পনর-বিশটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইত। তজ্জন্য শুধু জং-এর জন্যই প্রয়োজন হইত প্রায় সাত-আট শত টন কাগজ। এছাড়া 'ডন,' 'পাকিস্তান টাইমস,' 'নওয়া-ই-ওয়াক্ত'সহ ছোট-বড় বহু সংবাদ-পত্রের জন্য বিপুল পরিমাণ কাগজের প্রয়োজন পড়িত। মাসিক যা কোন-ক্রমেই আড়াই তিন হাজার টনের কম হওয়ার কথা নয় এই বিপুল পরিমাণ চাহিদা পূরণ করার পরও কিছু কিছু নিউজপ্রিন্ট বিদেশে রফতানী করা হইত। বর্তমানে পাকিস্তানে কাগজ সরবরাহ হয় না। বাংলাদেশী কাগজ-গুলির 'বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশের পরিমাণও নাম-কা-ওয়াস্তে পরিমাণে নামিয়া আসিয়াছে। এই অবস্থায় উৎপাদন ১৯৭১ সালের মার্চ পূর্ব পর্যায়ে থাকিলেও বিপুল পরিমাণ রফতানীযোগ্য নিউজ প্রিন্ট থাকার কথা।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় শ্রাবণ ১৩, ১৩৮১

স্থান-কাল-পাত্র

অনেক ঘটনার অনেক সংবাদের মতই আইপিআই-এর (ইন্টার-ন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট) এই রিপোর্টের বিবরণীও এদেশে এসেছে ভায়া নয়াদিল্লী। আর নয়াদিল্লীতে যে 'নিউজ ক্রিয়েট' করা হয়েছে, তার থেকেও অনেক কাট-ছাঁট ও বাছাই-ছাঁটাই করে এদেশের পত্র-পত্রিকাগুলি ভিতরের

পৃষ্ঠায় ওই রিপোর্টের জন্য যৎসামান্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু রিপোর্টটি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা যে শুধু এদেশের সংবাদপত্রের জন্য নয়,—দেশের তথ্য মন্ত্রণালয় তথা সরকারের জন্যও একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তা এদেশের সাংবাদিকরা বুঝতে পারেন নাই,—একথা বিশ্বাস করা কঠিন। তবুও, আইপিআই-এর বার্ষিক রিপোর্টে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলিতে কেন যে খণ্ডিত ও মার্জিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে, তা ভাববার কথা। "বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাই"—আইপিআই-এর এই বক্তব্যের দরুনই কি এমনটি হয়েছে? অথবা দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও পাকিস্তানের মত বাংলাদেশেও "সরকার সংবাদপত্রের উপর কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছেন; কে কত বেশী প্রভুকে সন্তুষ্ট করছে—ভক্তি দেখাচ্ছে তার উপর ভিত্তি করেই এসব দেশে সরকারী বিজ্ঞাপন মায় নিউজপ্রিন্ট পর্যন্ত বরাদ্দ করা হচ্ছে"—এই বক্তব্যের দরুনই কি রিপোর্ট এ দেশে তার যথাযোগ্য আসন (অন্য কথায়—ট্রিট-মেন্ট) থেকে বঞ্চিত হয়েছে?

..তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। সত্যি কি বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাই? আইপিআই কি বিদেশে বসে চোখ-কান বুঁজে জনকয়েক "বাংলাদেশবিরোধী" লোকের মুখ দিয়ে ঝাল খেয়েছেন? অথবা দেশের অভ্যন্তরে সংবাদপত্রের পুরা দস্তুর স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু 'জাতীয় স্বার্থেই' সে কথাটা বাইরে আমরা প্রকাশ হতে দিচ্ছি না? এ প্রশ্নের সঠিক জওয়াব একমাত্র সংশ্লিষ্ট মহলই দিতে পারেন। কিন্তু "বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাই" আইপিআই-এর এ বক্তব্য দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশের 'সুনাম'কে যে খর্ব করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

..এদিকে নিউজপ্রিন্টের মূল্য করা হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। ফল এই দাঁড়িয়েছে, যাঁরা সরকারী পত্রিকার তকমা এঁটে রয়েছেন, তাঁরা ইচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও সহজ কথাটা সোজাভাবে বলতে পারছেন না। কোন কোন কলাম লেখক বা রিপোর্টার কিছুটা 'সৎসাহস' দেখালেও যেহেতু কাগজ 'সরকারী' সেহেতু জনজীবনে সে সংবাদ বা লেখার তেমন কোন প্রতিক্রিয়া শুভ হয়ে দেখা দিচ্ছে না।

বস্তুতঃ 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' এমন একটি বিষয়, যা মুখের কথায় হয় না, কাগজে লিখে পড়ে ফাইলবন্দী করে রাখলেও তা হওয়ার নয়, একমাত্র বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়ে তার প্রতিফলন ঘটাতে হয়। 'ফলেন

পরিচিয়তে' কথাটার একমাত্র উদাহরণ হচ্ছে এই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা কেউ কাউকে দেয় না। এ স্বাধীনতা দেশের স্বাধীনতার মতই অর্জন করতে হয়।

..সবাই জানেন, আইয়ুব আমলে আওয়ামী লীগের সংসদ্-সদস্য 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে' বলে পরিষদ কক্ষ বর্জন করেছিলেন। আমরা আরো জানি, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার প্রশ্নে জেল-জুলুমসহ বিভিন্ন নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম ও মর্যাদা কুড়িয়েছিলেন। আর আজ সেই আওয়ামী লীগের শাসনামলে বাংলাদেশের বুকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাই, কথাটা শুনতেও লজ্জায় মাথা কাটা যায় নাকি?

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় জানুয়ারী ৭, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

'আমি একজন সাংবাদিক। কিন্তু স্টেনগানকে আমিও অস্বীকার করতে পারি না। হরতাল সম্পর্কে আমাকে লিখতে দেয়া হয় না। শিক্ষক-ধর্মঘট প্রসঙ্গেও ঐ একই কথা। আমি নিজে যা বিশ্বাস করি না, দিনের পর দিন আমাকে তাই লিখে যেতে হয়'।

কথাগুলি আমার নয়। ইহা বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সুযোগ্য সভাপতি শ্রী নির্মল সেনের কথা। গত আগস্টের এক সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে সাংবাদিকতা বিভাগের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

নির্মল সেন সেদিন আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তাঁর কথাগুলিও বড় নির্মল, বড় পরিষ্কার। কোন অস্পষ্টতা অস্বচ্ছতা, উহাতে নাই। সে সময়কার তথ্য-বেতার মন্ত্রীকে পাশে বসাইয়া রাখিয়া তিনি 'ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট' শ্রেণীর উপর নিষেধ-নির্দেশের বিড়ম্বনার কাহিনী ব্যক্ত করেন। বিশেষ করিয়া সরকার-নিয়ন্ত্রিত কাগজগুলির কর্মরত সাংবাদিকদের (তিনি নিজেও যাহাদের একজন) দুরবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'এগুলোর ওপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এমনকি একজন পিয়ন পর্যন্ত আমরা নিতে পারি না। (অথচ) আমরা কারো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নই। আমরা সাংবাদিক। আমরা শুধু একটুখানি সত্যি কথা বলতে চাই।'

ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি যখন এসব কথা বলিয়াছিলেন তখন 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' জারি হয় নাই। কিন্তু এখন বিশেষ ক্ষমতা

আইনের আওতাধীনে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের কাজ করিতে হয়। ঘাড়ের উপর ডিমোক্লিসের তরবারি সর্বক্ষণ উদ্যত। এই আইনে প্রতিটি সংবাদের সূত্র প্রকাশ বাধ্যতামূলক, যদিও ইহার মাত্র এক দিন পূর্বে পাস-করা 'প্রেস কাউন্সিল' আইনে সংবাদের সূত্র গোপন রাখার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিশেষ-ক্ষমতা আইনে প্রেসক্রিপশন ও প্রিসেন্সরশিপের বিধান করা হইয়াছে। আরও করা হইয়াছে জামানত তলব, প্রেস ও কাগজের প্রকাশনা বন্ধ করার ব্যবস্থা। 'বন্ধুরাষ্ট্রের' সঙ্গে সম্পর্কের পরিপন্থী কার্যকে 'প্রিজুডিশিয়াল এ্যাক্ট' বা অনিষ্টকর কর্মের সংজ্ঞায় ফেলিয়া এই আইন অনুসারে উহাকে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে গৃহীত দুইটি আইনের একটি দ্বারা সংবাদপত্রকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, অপরটির দ্বারা তাহা কার্যতঃ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। তথ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী সেদিন প্রেস কাউন্সিল আইনকে গর্বভরে 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক দলিল' ও সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকারের ম্যাগনাকার্টারূপে আখ্যায়িত করেন। যদিও বিজ্ঞ আইনমন্ত্রীর স্থির প্রচেষ্টায় উহার পরদিনই ভূমিষ্ট অপর আইনটি, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের নিন্দা-প্রস্তাবের-ভাষায়, এই সবকিছুকে 'একটি প্রহসনে' পরিণত করিয়াছে।

..জানি না, পর পর দুই দিনে গৃহীত দুইটি আইনের এই পরস্পর বিরোধী বিধান বিচারালয়ের চক্ষে কি দাঁড়াইবে। অবশ্য বিচারের কথা তোলাও নিরর্থক। কারণ, বিশেষ-ক্ষমতা আইন অনুসারে গৃহীত যে-কোন ব্যবস্থা বিচারালয়ের এখতিয়ার বহির্ভূত। অতএব, চূড়ান্ত পর্যালোচনায় এই দাঁড়ায় যে, প্রেস কাউন্সিল আইন 'আইওয়াশ' না-হউক, নিছক একটি 'পায়াস উইশ,' আর বিশেষ-ক্ষমতা আইন একটি প্রচণ্ড 'রিয়ালিটি'। কঠোর রিয়ালিটির সমুখে একটা নম্র-ভদ্র পায়াস উইশের মূল্য কতটুকু!

অথচ আমাদের সত্য কথা বলিতে হইবে। নির্মল সেনের কথা আমাদের সবারই কথা। আমরা কারো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নহি। আমরা সাংবাদিক। আমরা শুধু একটুখানি সত্য কথা বলিতে চাই। 'সরকারের স্তুতি স্তাবকতা' ছাড়িয়া সাংবাদিকদের সত্য কথা বলার জন্য মূল্যবান উপদেশ দান করিতেছেন আমাদের মন্ত্রীগণও। জনাব শামসুল হক বলিয়াছেন, 'অন্ধ স্তাবকতা পরিহার করিয়া আজ সত্য বলা প্রয়োজন। জাতীয় সংসদে বিরোধীদল, বলিতে গেলে, অনুপস্থিত। কাজেই সরকারের ভুল-ত্রুটি দেখাইয়া

দিবার জন্য সংবাদপত্রকেই প্রধান দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।' জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বলিয়াছেন, 'সরকারের মিথ্যা সাফাই গাওয়া আর নয়। আপনারা সরকারের আর সাফাই গাহিবেন না। সরকারের দোষত্রুটি তুলিয়া ধরুন। নতুবা আগামী দিনে জনগণ আপনাদেরও ক্ষমা করিবে না।'

ক্ষমা যে করিবে না, তাহার আলামতও সুস্পষ্ট। ৬ই ফেব্রুয়ারীর 'জনপদে' মফস্বলের জনৈক সাংবাদিক 'স্তাবকতা ছেড়ে সত্যি কথা বলুন' শীর্ষক একটি পত্রে স্থানীয় জনতার সামনে তাঁর অসহায় অবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন, 'আলামতের' উহা একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। উক্ত সাংবাদিক ভ্রাতা লিখিয়াছেন যে, রাজশাহী, পাবনা ও অন্যান্য স্থানে চাউলের দাম চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে বলিয়া কোন সংবাদ সংস্থার প্রেরিত যে খবর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে কতিপয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাহা পাঠ করিয়া রাজশাহী বাজারের লোকেরা তাঁহাকে ও অপর একজন সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে ঘিরিয়া ধরিয়া বলিতে আরম্ভ করেন, 'চলুন আমাদের ৪০ টাকা দরে চাউল কিনে দিতে হবে। স্তাবকতার একটা সীমা থাকা চাই। আর কত ভাঁড়ামি করবেন?' সাংবাদিক ভ্রাতা সর্বশেষ লিখিয়াছেন, 'রাজশাহীতে বর্তমানে একশো থেকে একশো কুড়ি টাকায় চাউল বিক্রি হচ্ছে'। অতএব, কোন অবাস্তব, ইন্সপায়ার্ড নিউজ বা স্তুতি-স্তাবকতা-মাখা মন্তব্যের অপরাধ যে মানুষ আর ক্ষমা করিবে না, এর চেয়ে তাহার বড় আলামত আর কি? অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেব আমাদের ওয়ার্নিং দিয়াছেন, "নতুবা আগামী দিন আপনাদেরও ক্ষমা করিবে না।" কিন্তু 'আগামী দিন' ইতিমধ্যেই আসিয়া পড়ার আর কি কিছু বাকী আছে?

কাজেই আমাদের সত্য কথা বলিতে হইবে। সেটা ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক। সত্য না-বলিলে জনতার কাছে ক্ষমা নাই। 'তাহারা যাহা বলিয়াছেন ভালই বলিয়াছেন; ভালো ছাড়া খারাপ কোন দিনই বলেন না ও করেন না; চিরকালই তাহারা ভালো বলিবেন ও করিবেন' এই শ্রেণীর স্তাবকতার দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন সত্য কথা বলিতে হইবে। মানুষ প্রতিটি মুদ্রা বাজাইয়া নেয়। মেকী মুদ্রা চালাইতে গেলে জান-মান দুই-ই বিপন্ন।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আইনের নামে যে ক্রমবর্ধমান বাঁধন-কষণ আরম্ভ হইয়াছে তাতে কি সত্য বলা যায়? গেলে কতটুকু বলা যায়? নির্মল সেন বলিয়াছেন, "লৌহজংয়ের ঘটনা ছাপতে বারণ করা হ'ল। আমরা ঐ

সংবাদ ছাপালাম না। তিনদিন পর সরকারী প্রেসনোটে বলা হল লৌহজংয়ের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। যেখানে কোন ঘটনাই ঘটেনি, সেখানকার অবস্থার আবার স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক কি?" নির্মল সেনের সর্বশেষ প্রার্থনা, 'আমি নির্দেশ থেকে মুক্তি চাই।'

কিন্তু কোথায় মুক্তি? মুক্তির দিগন্ত কতদূর? কায়রোর আলআহরামের বিশ্ববিখ্যাত সম্পাদক মোহাম্মদ হাসনায়েন হাইকলের চাকরি গিয়াছে। তাঁর অপরাধ? তিনি আমেরিকার সম্ভাব্য 'নিগূঢ় অভিসন্ধি' সম্পর্কে মিসরকে সতর্ক থাকিতে বলিয়াছিলেন। শুধু হাইকলেরই চাকরি যায় নাই। সকল মিসরীয় সংবাদপত্রকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, ইউ. এস. এবং ইউ. এস. এস. আর-এর সমালোচনামূলক কিছু লেখা চলিবে না। সংবাদপত্র-জগতের এটা একটা বিরাট ঘটনা।

আমাদেরও 'বিশেষ ক্ষমতা আইনের' বিধান অনুযায়ী কোন 'বন্ধুরাষ্ট্রের' সহিত 'প্রীতির সম্পর্কের' পরিপন্থী কোন কিছু করা, বলা বা লেখা প্রিজুডিশিয়াল এ্যাক্ট বা অনিষ্টকর কার্য। অতএব, দণ্ডনীয়। এই বিধানের প্রেক্ষিতে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, 'বন্ধুরাষ্ট্রের' সংজ্ঞা কি? 'প্রীতির সম্পর্কেরই' বা সংজ্ঞা কি? যে ১১৯টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে এবং যাহারা ইহাকে সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়া আসিতেছে, তাহারা সবাই তো 'বন্ধুরাষ্ট্র'। বলি, বন্ধুরাষ্ট্র নয় কে? আমাদের রাষ্ট্রের বিঘোষিত নীতি হইতেছে 'সবার সঙ্গে সম্প্রীতি, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়'। পাকিস্তান ও চীনও আমাদের স্বীকৃতি দিলে এবং তাহাদের সহিত আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলে তাহারাও আমাদের 'বন্ধুরাষ্ট্র' হইতে পারে; তাহাদেরও সহিত একদা স্থাপিত হইতে পারে 'প্রীতির সম্পর্ক'। পীরিত ও বিচ্ছেদ-ত একই মুদ্রার এপীঠ ওপীঠ।

এখন প্রশ্ন এই যে, কোন নাগরিক বা সংবাদপত্র অথবা কোন সাংবাদিকের কোন্ ধরনের কার্য, উক্তি, মন্তব্য বা সংবাদপ্রকাশ বন্ধুরাষ্ট্রের সহিত 'প্রীতির সম্পর্ক' রক্ষার পক্ষে প্রিজুডিশিয়াল বা অনিষ্টকর বিবচিত হইবে? ধরা যাক, পাকিস্তান বা চীনের সহিত আমাদের কূটনৈতিক যোগাযোগ তথা 'প্রীতির সম্পর্ক' স্থাপিত হইল। ধরা যাক, তাহারা আমাদের সাগাই-সাঙাৎ, ইষ্টি-কুটুম হইয়া উঠিল। কিন্তু আমরা তাহাদের কোন অন্যায়-অত্যাচার বা অপকার্যের নিন্দা-সমালোচনা করিলে তাহা কি 'প্রীতির সম্পর্কের' উপর আঘাত, অতএব, 'প্রিজুডিশিয়াল এ্যাক্ট' বলিয়া গণ্য হইবে?

আরেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমাদের অন্যতম বন্ধুরাষ্ট্র সোভিয়েট সরকার নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক আলেকজাণ্ডার সলঝেনিৎসিনকেও টাসের ভাষায়, 'প্রিজুডিশিয়াল এ্যাক্ট' ও সোভিয়েট সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর মত পোষণ ও প্রকাশের দায়ে গ্রেফতার ও আটক করার পর সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে (যতদূর জানা যায় বিনা বিচারে নির্বাসিত) করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, সোভিয়েট সরকার আরও কতিপয় রুশ লেখক ও বুদ্ধিজীবীকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা সলঝেনিৎসিনের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি দেখাইলে তাঁহাদিগকে সোভিয়েৎ লেখক সংঘ হইতে বহিষ্কার করা হইবে ; তাঁহাদের কোন বই সোভিয়েৎ রাশিয়ায় প্রকাশ করিতে দেওয়া হইবে না। প্রকাশ, ইয়েভজেনি ইয়েভতুশেঙ্কো নামক জনৈক রুশ কবি সলঝেনিৎসিনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করায় ইতিমধ্যে ক্রেমলিনের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন। 'প্রিজুডিশিয়াল' মতবাদ প্রকাশের দরুন রুশ হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কারক আন্দ্রেই শাখারভেরও ভাগ্য অনিশ্চিত। আমি বিনা বিচারে আটক, সাজা বা বহিষ্কারের বিরোধী হইয়াও ব্যক্তিগতভাবে শাখারভ সলঝেনিৎসিনের প্রতি বড় একটা সহানুভূতি বোধ করিতে পারিতেছি না। কারণ, দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তাহাদের লেখা ও অভিমতের যে সকল উদ্ধৃতি পাঠ করিয়াছি তাহা হইতে ধারণা হয়, তাঁহারা সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ত বটেই, সোভিয়েটেরও প্রতি ইহুদিসুলভ বৈরী-ভাবাপন্ন। তাঁহাদের সমালোচনা সংস্কারমূলক নয়, নিন্দা ও ধিক্কারমূলক। অনেকের মতে, সলঝেনিৎসিনের ন্যায় লেখকের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পিছনে যে বিশেষ প্রতিভাটি কাজ করিয়াছে তাহা হইল সোভিয়েত বিরোধিতা ও সোভিয়েত ব্যবস্থার নগ্ন নিন্দা। স্ট্যালিনামলে এর সিকিভাগ বৈরিতা প্রকাশ করিলেও হয়ত যে-কোন লোককে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াইতে হইত। বর্তমান সোভিয়েত সরকারকে বরং আমি ধন্যবাদ জানাইব যে, তাঁহারা অতটা কঠোর হন নাই, সলঝেনিৎসিনকে দেশ হইতে বহাল-তবিয়তে বিদায় করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁর পরিবারকেও বিদেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু আমাদেরই মধ্যে আবার অনেকে সোভিয়েত সরকারের এই 'নিপীড়নমূলক কার্যে' সাংঘাতিক বিক্ষুব্ধ ও সমালোচনামুখর। আমার প্রশ্ন এই যে, বন্ধুদেশের সরকারের এহেন কোন কার্যের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ ও নিন্দা-সমালোচনা কি 'প্রীতির সম্পর্কের' পরিপন্থী 'প্রিজুডিশিয়াল এ্যাক্টরূপে গণ্য হইবে?

..আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ৩৬ জাতির 'ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন' অনুষ্ঠানকে সুনজরে দেখিতেছেন না, সেটা বোধগম্য। তিনি একাধিক স্থানে বলিয়াছেন যে, উক্ত সম্মেলনকে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ শিবিরে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তিও অতি প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। কিন্তু বন্ধুরাষ্ট্রের কোন কোন মহল "ঐস্লামিক" জরাক্রান্ত হইয়া বেড়ায় যেভাবে লাথালাথি আরম্ভ করিয়াছেন এবং কাজী নজরুল ইসলামের নামে 'ইসলাম' শব্দটি যুক্ত থাকায় সেই সর্বজন শ্রদ্ধেয় নামটি লইয়াও যেরূপ উৎকট ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আরম্ভ করিয়াছেন (১০ই ফেব্রুয়ারীর স্টেটসম্যান, ১১ই ফেব্রুয়ারীর 'আনন্দবাজার' এবং উহাদের জবাবে ১৭ই ফেব্রুয়ারীর 'জনপদ'-এর উপ-সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য), কেহ যদি উহার বিরুদ্ধে মুখ খুলেন তবে কি তাহা 'প্রীতির সম্পর্ক' হানিকর বিবেচিত হইব?

..বন্ধুরাষ্ট্রের অনেকে বলিয়া থাকেন, সেদেশের সহিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিযোগিতামূলক নহে, বরং পারস্পরিক পরিপূরক। কিন্তু এটা অনেকের মতে একটি অবাস্তব ধারণা বা 'পায়াস উইশ' মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, যে ক্ষেত্রে দুই দেশের টাকার বেসরকারী বিনিময় মূল্যে পঞ্চাশ শতাংশের ব্যবধান, অর্থাৎ ১০০কে ৫০-এ নামানো হইয়াছে, যেক্ষেত্রে মারোয়াড়ী শ্রেণী ও চোরাচালানীদের যোগসাজশে বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ ভগ্নোন্মুখ, যেক্ষেত্রে আমাদের পাট-মন্ত্রীর ভাষাতেই 'ভারতের বিপুল কাঁচাপাট রফতানী বাংলাদেশের উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে' সেক্ষেত্রে এই দুইটি স্বতন্ত্র, সার্বভৌম, দেশের অর্থনীতিকে 'পরিপূরক' বলা কি বাস্তবের অপলাপ নহে? কিন্তু এই বিষয় লইয়া কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে তাহা কি বন্ধুরাষ্ট্রের সহিত 'প্রীতির সম্পর্ক' হানিকর 'প্রিজুডিশিয়াল এ্যাক্ট' হইয়া দাঁড়াইবে?

দৃষ্টান্ত দিতে গেলে আরও অনেক 'বন্ধুদেশের' এমন অনেক কার্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেগুলি আমরা সমর্থন ত করিতেই পারি না, করিলে বরং তিক্ত সমালোচনাই করিতে হয়। বন্ধুস্থানীয় কতিপয় আরব রাষ্ট্রের তৈল নীতিও আমাদের ন্যায় উন্নয়নকামী দেশসমূহের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এসব বিষয়ে আমাদের সরকারের অভিমতের 'ভিটো' দিতে অক্ষম হইয়া আমরা যদি স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করি (জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও জনাব শামসুল হক সাহেব স্তুতি-স্তাবকতা ছাড়িয়া সত্য

কথা বলিতেই আমাদের উপর নির্দেশ দিয়াছেন) তবে কি তাহা বন্ধুরাষ্ট্রের সহিত 'প্রীতির সম্পর্ক' বিনাশক 'প্রিজুডিশিয়াল এ্যাক্ট' বলিয়া গণ্য হইবে এবং 'বিশেষ-ক্ষমতা আইন' অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে? 'প্রীতির সম্পর্কের' খাতিরে যদি কারোরই সম্বন্ধে কিছু না-বলা যায় তবে স্তুতি-স্তাবকতা ও সাফাই গাওয়া ছাড়া সত্য কথা বলার ক্ষেত্রই-বা কতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে? যাই হউক, আমার ধারণা, উক্ত আইনে বৈদেশিক বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে 'প্রীতির সম্পর্ক রক্ষার পক্ষে অনিষ্টকর' কথাটাকে কোনরূপ সংজ্ঞা দ্বারা সুনির্ণীত না করিয়া যেভাবে (হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবেই) সম্পূর্ণ 'ভেগ্' বা অস্পষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা আইনের চক্ষে টিকিতে পারে না। কিন্তু মুশকিল এই যে, এ বিশেষ ক্ষমতা আইনানুসারে অবলম্বিত যে-কোন ব্যবস্থা আইন-আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত। কাজেই যে-কোন নাগরিকের ন্যায় সাংবাদিকেরও বিপদটা সেখানেই দৃশ্যতঃ তাই শ্রী নির্মল সেনের সভাপতিত্বে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন এই আইনকে 'দেশের সংবাদ-পত্রসমূহের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক' বলিয়া রায় দিয়া ইহার আশু-প্রত্যাহারের দাবি জানাইয়াছেন। গণতান্ত্রিক সরকার কি সে দাবি পূর্ণ করিবেন? অন্ততঃপক্ষে কি সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি সংশোধনে যত্নবান হইবেন?

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় ফেব্রুয়ারী ২৩, ১৯৭৪

স্থান-কাল-পাত্র

মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মত নাজুক বিষয় নিয়ে কলম ধরতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে কোন কোন লেখায় ছাড়া-আড়া-ভাবে সংবাদপত্র বা তার স্বাধীনতার বিষয়টা যে আসে নাই, তা নয়। কিন্তু বাক-স্বাধীনতা তথা গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রধানতম মাধ্যম সংবাদ-পত্র নিয়ে সার্বিক আলোচনার অবকাশ জুটেছে খুবই কম। পাঁচ মাস আগে (৭ই জানুয়ারী,—'৭৪) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে যে লেখাটা লিখে-ছিলাম, তা ছিল ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট (সংক্ষেপে—আইপি আই)-এর বার্ষিক রিপোর্টের উপর। আর আজ যা লিখছি, সেটিও ওই আইপিআই-এর এক আহ্বানকে কেন্দ্র করে। পাঁচ মাস আগের বার্ষিক রিপোর্টে আইপিআই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে, বাংলাদেশে সংবাদপত্রের কোন স্বাধীনতা নাই। ওই রিপোর্টে আইপিআই আরো বলেছিলেন, পাকিস্তানের মত বাংলাদেশেও "সরকার সংবাদপত্রের উপর কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছেন।

কে কত বেশী 'প্রভুকে' সন্তুষ্ট করছে,—ভক্তি দেখাচ্ছে, তার উপর ভিত্তি করেই এসব দেশে সরকারী বিজ্ঞাপন—যার নিউজপ্রিন্ট পর্যন্ত বরাদ্দ করা হচ্ছে।"

৭ই জানুয়ারীর সেই লেখায় সেদিন উল্লেখ করেছিলাম যে, আইপিআই-এর বার্ষিক রিপোর্টের ওই অংশটুকু এতদ্দেশীয় কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পায় নাই। এ দেশের মানুষকে রিপোর্টের ওই অংশটুকু জেনে নিতে হয়ে-ছিল বিদেশী কাগজ থেকে। বলা বাহুল্য, এবারেও "আইপিআই-এর আহ্বান" নামক যে সংবাদটি এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে, তাতেও কোথাও বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। ডেট লাইন—কিয়েটো-জাপান থেকে ১৩ই মে তারিখে এএফপি জানিয়েছেন, পৃথিবীর মাত্র ২০ থেকে ২৫টি দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে। জাপানের উক্ত এলাকায় অনুষ্ঠিত আইপিআই-এর বার্ষিক সভায় আইপিআই পরিচালক আর্নেস্ট মেয়ের একথা বলেছেন। প্রকাশ, যে সব দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাই, সে সব দেশের কার্যরত সাংবাদিকদের কতিপয় শর্তাধীনে ইনস্টিটিউটে গ্রহণের সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত বার্ষিক সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয়। সেই সংশোধনে এই শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় যে, একজন সাংবাদিক—যিনি তাঁর দেশের সরকারের দ্বারা আংশিক বা পুরাপুরিভাবে পরিচালিত সংবাদপত্রে কাজ করেন, তাঁকে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, তিনি আইপিআই-এর গঠনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী কাজ করতে ইচ্ছুক।

এ. এফ. পি. পরিবেশিত ও আমাদের দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংবাদটি আমার নিকট এত দায়সারা গোছের বলে মনে হয়েছে যে, কিভাবে এর আলোচনা করব, ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু সে আলোচনায় যাওয়ার আগে, আইপিআই-এর উক্ত অনুষ্ঠানে সংস্থার কার্যনির্বাহী সভাপতি এল. কে. জাকান্দে (নাইজিরিয়া) তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে যে বক্তব্য রেখে-ছিলেন তার উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি। উদ্বোধনী ভাষণে মিঃ জাকান্দে বলেছেন, সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে। তিনি আরো বলেছেন, কোন দেশের কোন সরকারই স্বেচ্ছায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন না। এ স্বাধীনতা জোর করে আদায় করে নিতে হয়। ৩৩টি দেশের ৩২০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে মিঃ জাকান্দে আরো বলেন, গত দুই বৎসরে এই মহাদেশে (এশিয়া) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সিঙ্গাপুর, মালয়ে-

শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান ও ফিলিপাইনে সংবাদপত্রাদির স্বাধীনতা হয় একেবারেই নাই ; কিংবা সে স্বাধীনতা বন্দী অবস্থায় গুমরে মরছে।

পাঁচ মাস আগে প্রকাশিত আইপিআই তাঁদের বার্ষিক রিপোর্টে বলেছিলেন, এশিয়ার মাত্র দুটি দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রয়েছে,—একটি ভারত অন্যটি জাপান। এই পাঁচ মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোন অলৌকিক কাণ্ড ঘটে নাই যে, এশিয়ার অপরাপর দেশ আপষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লাভ করে ফেলেছে। আর তা যখন হওয়ায় কথা নয়, তখন এটা ধরে নিতে হবে যে, এশিয়ার উল্লিখিত দেশগুলিতে তো বটেই বাদবাকী দেশগুলিতেও সংবাদপত্র হয় "স্বাধীনতাহীন, নয় তো বন্দী অবস্থায় গুমরে মরছে।"

..জানি, অনেকেই আজ অস্বস্তি বোধ করবেন, তবুও সংবদপত্রের স্বাধীনতার এই আলোচনা প্রসঙ্গে মরহুম মোসাফিরের একাধিক বক্তব্য এস্থলে টেনে না এনে পারছি না। ১৯৬৬ সালে যখন এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, তখন—৭ই জুন তারিখে মোসাফির তাঁর 'রাজনৈতিক মঞ্চে' লিখেছিলেন : "মানুষের হাত পা ভাঙ্গা অবস্থার জীবনধারণ যেমনি যন্ত্রণাদায়ক, তেমনি বাক-স্বাধীনতা, সাধারণ নিরাপত্তা এবং সংবাদপত্রের অধিকার খর্বিত হইলে উহা মানুষের মনকে পীড়িত এবং সংবাদপত্র পরিচালনা বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়ায়। সংবাদপত্র যদি জনগণের সমস্যা, গণমনের জিজ্ঞাসা এবং দেশের চলতি ঘটনাপ্রবাহের উপর স্বাধীনভাবে খবরাদি পরিবেশন করিতে না পারে, সংবাদপত্রকে যদি বিধিনিষেধ ও কড়া আইনের অনুশাসনের মধ্যে কাজ করিতে হয় তাহা হইলে সংবাদপত্র পরিচালনার কোন সার্থকতা থাকে না। বিশ্ব সুন্দরী বা অর্ধ উলঙ্গ ছবি ছাপিয়া অথবা পাতায়-পাতায় গুরুত্বহীন সংবাদের উপর বড় বড় টাইপের ব্যানার হেড লাইন আঁটিয়া কিংবা দেশীয় সমস্যা ছাড়িয়া বিদেশী সমস্যা নিয়া ঝুলাঝুলি করিয়া সংবাদপত্র জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে পরিচালিত করিবার নিস্ফল চেষ্টা চালাইতে পারে। কিন্তু এই ধরনের সাংবাদিকতা করিয়া সংবাদপত্র দেশবাসীর আস্থা অর্জন এবং জনমতকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারে না। সংবাদপত্রের উপর হামলা করা কিংবা সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা ক্ষমতাসীন মহলের দুর্বলতারই প্রমাণ .... আমরা বিশ্বাস করি যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের উপরই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।"

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় মে ১৯, ১৯৭৪

স্থান-কাল-পাত্র

আজ দেশ জুড়ে চলছে মহামন্বন্তর। এই মন্বন্তর যে শুধু খাদ্যাভাবের তা মনে করার কোন কারণ নাই। বরং শারীরিক প্রয়োজনীয় খাদ্যের মতই সমাজের সর্বস্তরের মন ও মগজের মেধা ও প্রতিভার প্রয়োজনীয় খোরাক ও পুষ্টির অভাবও এখন নিদারুণ। আজ আমাদের পত্রিকা-শিল্প বিরাট এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। প্রকাশনা শিল্প অনেক শিল্পের মতই ধ্বংসোন্মুখ। তার সাথে তাল মিলিয়ে চলছে সাহিত্য-শিল্পের সৃজনশীলতার বন্ধ্যাত্ব। ইতিমধ্যেই আমরা সবকিছুকেই রাজনীতিকরণ করে ফেলেছি। মিথ্যা অহমিকায় সত্যকে বিকৃত করতে চাইছি। ফাঁপাগর্বে মাঝে মাঝে অস্বীকার করতে চাইছি পায়ের তলার মাটিকেও। এদিকে পাঠাগার, গ্রন্থাগার, বিদ্যায়তন বা সাংস্কৃতিক অঙ্গণ—সর্বত্রই চলছে সস্তার বেসাতি। সস্তার সেই বেসাত শুধু মানসিকতার দৈন্যকেই প্রকট করে না—মন ও মগজকেও বিষবাষ্পে করে আচ্ছাদিত। দেশীয় বা বিদেশী রম্য পত্রিকা, বা চটকদার পর্ণগ্রাফির সিন্দাবাদী দৈত্য আজ নবীন-প্রবীণ নির্বিশেষে গোটা সমাজের ঘাড়েই চেপে বসেছে। এর থেকে মুক্তি খুঁজে না নিলে যে প্রবীণের উত্তরাধিকারের কথা আমরা বলি অথবা যে নবীনের নেতা, দ্রষ্টা ও দিশারী হওয়ার কথা আমরা বলি, তা শুধু কথার কথা হয়েই বিরাজ করবে। তাছাড়া বর্তমানে বসে স্বপ্ন দেখি যে সমৃদ্ধ তা যে ভবিষ্যতের কোন্ অতলান্তে হারিয়ে যাবে, কেউ তা বলতে পারবে না। অথচ এ জন্য ভবিষ্যতের নিকট দায়ী হতে হবে আমাদেরই।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় নভেম্বর ৫, ১৯৭৪

নিউজপ্রিন্টের মূল্য : অযোগ্যতা : অব্যবস্থা

দেশে নিউজপ্রিন্ট চাহিদার চাইতে অনেক বেশী উৎপাদিত হয়। তবুও সারাদেশে এখন নিউজপ্রিন্ট লইয়া বিতর্ক চলিতেছে। দৈনিক পত্রিকাগুলির নির্দিষ্ট কোটা কাটিয়া দিবার পর হইতে সংকট আরও প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। শতকরা ৪০ ভাগ হইতে ৬০ ভাগ কোটা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই লইয়া অনেক বিবৃতি হইয়াছে, নিন্দাবাদ হইয়াছে। সাংবাদিক, ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতারা কোটা কাটার বিরোধিতা করিয়াছেন। প্রকাশক ও মুদ্রাকর বা ছাপাখানার মালিকগণ নিউজপ্রিন্ট সমস্যা লইয়া সরকারের সহিত দেন-দরবার করিতেছেন। সরকার এখনও এই ব্যাপারে

কোন কিছু বলেন নাই। যতদূর শোনা যাইতেছে, সরকার নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকিবেন। অর্থাৎ নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ বলবৎ থাকিবে। সংবাদ-পত্রের কোটা বাড়ানো হইবে না।

সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। বেসরকারী পত্রিকাগুলি কর্মচারী সংখ্যা লইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। হাজার হাজার ছাপাখানা, শত শত প্রকাশক হতাশ হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। কাগজ না পাইলে তাহাদের ছাপা বা প্রকাশনার ব্যবসা কিভাবে চলিবে। . . আসল সমস্যা হইতেছে অনুৎপাদন ও অযোগ্যতা। আমাদের সকলকে অযোগ্যতার মূল্য দিতে হইতেছে।

তাহা না হইলে যে মিলের উৎপাদন ক্ষমতা ৫২ হাজার টন, সেখানে ২৬ হাজার ৫৮৩ টন উৎপাদিত হইবে কেন?

খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে উৎপাদন এত কম হইতেছে কেন এবং এই জন্য কোন তদন্ত হইতেছে কিনা জানিতে চাহিয়াছিলাম। কাগজ কর্পো-রেশনের নিকট হইতে তেমন কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই।

কর্পোরেশনের কাছে একটা সার্বজনীন উত্তর আছে, তাহা হইতেছে যন্ত্রাংশ নাই, কাঁচামাল নাই, কেমিক্যালস্ নাই, বিদ্যুৎ নাই, জ্বালানি নাই। তাই উৎপাদন কম হইতেছে।

প্রশ্ন করিয়াছিলাম—সমস্যা সমাধানের জন্য আপনারা কি কোন উদ্যোগ লইয়াছেন? কর্পোরেশনের উত্তর—আমরা সরকারকে জানাইয়াছি। এখন ফরেন এক্সচেঞ্জের দারুণ অভাব, তাই কিছু করা যাইতেছে না।

প্রশ্ন করিয়াছিলাম—মিল চলিলে প্রতিদিন কত টন উৎপাদন করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাই।

মিলে এখন তিনটি মেশিন আছে। প্রথম মেশিনের বার্ষিক ক্যাপাসিটি ২৬ হাজার টন, দ্বিতীয় মেশিনের ক্যাপাসিটি ১৮ হাজার টন ও তৃতীয় মেশিনের ক্যাপাসিটি ৮ হাজার টন। কর্পোরেশন অবশ্য এ ক্যাপাসিটির কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বক্তব্য মিলের উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ হাজার টন। ৪০ হাজার টন নিউজপ্রিন্ট ও ১০ হাজার টন মেকানিক্যাল প্রিন্ট। '৭৩-৭৪ সালে মাত্র ১১৮ টন মেকানিক্যাল প্রিন্ট উৎপাদিত হইয়াছে। মূলতঃ মেকানিক্যাল প্রিন্টও এক ধরনের নিউজপ্রিন্ট। ইহাছাড়াও মিলে উৎপাদিত নিউজপ্রিন্টের ওজন দুই রকম। একটা ৫২ গ্রাম ও অপরটা ৪০ গ্রাম।

প্রথম ও দ্বিতীয় মেশিনে প্রতিমিনিটে ১৫শ' ও ৯শ' ফুট কাগজ উৎ-পাদিত হয়। তৃতীয় মেশিনে ৪০ গ্রাম ওজনের ৭শ' ফুট কাগজ প্রতিমিনিটে উৎপাদিত হয়। এইসব তথ্য সরবরাহের ব্যাপারে কোন গোপনীয়তা থাকার কথা নয়। তবুও কর্পোরেশনের কর্তাদের নিকট হইতে এই তথ্য পাওয়া যায় নাই। প্রতিটন নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনে কত খরচ হয় তাহা জানিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছি। কর্পোরেশনের কাছে ইহা একটা 'ট্রেড সিক্রেট।' তাই কর্তাব্যক্তিরা এই হিসাব দেন নাই।

. . উৎপাদনের খরচের ব্যাপারে সাধারণতঃ শতকরা ৬০ ভাগ কাঁচামাল ব্যয় ও শতকরা ৪০ ভাগ স্থায়ী ব্যয় ধরা হয়। স্থায়ী ব্যয় বা 'ফিক্সড কস্ট' খুব বেশী একটা উঠানামা করে না। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের ক্ষেত্রেও এই বক্তব্য প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের দাম বাড়িলেও আভ্য-ন্তরীণ ক্ষেত্রে 'ফিক্সড কস্ট' খুব বেশী বাড়ে নাই। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের প্রধান কাঁচামাল গেওয়া কাঠ। সুন্দরবন হইতে এই কাঠ আহরণ করা হয়। প্রতিটন কাঠ সংগ্রহ করিতে মিলের ১১০ টাকা হইতে ১২৫ টাকা লাগে। ১২৫ টাকার মধ্যে বন বিভাগ সামান্য পরিমাণে 'রয়ালিটি' পাইয়া থাকেন। বাকীটা পরিবহণ খরচ।

মিলে আনিবার পর ডিবার্কিং মেশিন দিয়া ছাল তুলিতে হয়। এর পরে পাল্প তৈয়ার করিবার জন্য 'কেমিগ্রাউণ্ড' করিতে হয়। গেওয়া কাঠ হইতে তৈয়ার করা শতকরা ৮৬ ভাগ পাল্প নিউজপ্রিন্টে ব্যবহার করা হয়। বাকী শতকরা ১৪ ভাগ কেমিক্যাল পাল্প কানাডা ও সুইডেন হইতে আম-দানী করিতে হয়। স্বাধীনতার আগে 'কমোডিটি গ্রান্ট' হিসাবে কেমিক্যাল পাল্প পাওয়া যাইত। জ্বালানি ও কেমিক্যাল হিসাবে এই মিলে সোডা এ্যাশ, কস্টিক সোডা, সালফার, ফার্নেস অয়েল ইত্যাদি লাগে। ৫২ হাজার টন কাগজ উৎপাদন করিতে ২ হাজার টন সোডা এ্যাশ, ৪শ' টন সালফার ও প্রায় ৫৪০ টন কেমিক্যাল পাল্প লাগে।

বলা যাইতে পারে, প্রতিটন নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন করিতে মিলের ২৬শ' টাকার বেশী খরচ হওয়া উচিত নয়। অবশ্য যদি—(১) মেশিনের স্পীড ঠিক মতো বজায় থাকে; (২) বছরে ৩শ' দিন নিয়মিত ১৬ ঘণ্টা করিয়া কাজ হয়; (৩) সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ৫২ হাজার টন যদি উৎপাদন করা যায়; (৪) কাঁচামাল সংগ্রহ করিবার জন্য যথাসময়ে কর্মসূচী তৈয়ার হয়; (৫) উৎপাদন ব্যবস্থাপনা যদি ঠিক মতো সংগঠিত হয়।

বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক অযোগ্যতার অভিযোগ উঠিয়াছে।

১৯৬৮-৬৯ সালে এই মিলে ৪৮ হাজার ৩১৪ টন কাগজ উৎপাদিত হইয়াছে। এই প্রতিটনে উৎপাদন খরচ ছিল ৯৬২ টাকা। তবে স্বাধীনতার আগে উৎপাদন খরচ গড়ে কোন সময়েই প্রতিটনে ১১শ' টাকার বেশী পড়ে নাই। তখন খবরের কাগজগুলোকে প্রতিটন কাগজ ১১শ' টাকা করিয়া দেওয়া হইত। এই দামে কাগজ বিক্রি করিয়াও মিল স্বাধীনতার আগের ৪।৫ বৎসরে প্রায় সোয়া দুই কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছে। স্বাধীনতার পর আন্তর্জাতিক বাজারে কেমিক্যাল পাল্প, সোডা, এ্যাশ, কস্টিক সোডা, জ্বালানি ইত্যাদির দাম ২।৩ গুণ বাড়িয়া গেলেও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কাঠ ও মজুরীর দাম শতকরা একশ' ভাগের বেশী বাড়ে নাই। তবে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অযোগ্যতা বাড়িয়াছে কয়েকশ' গুণ। অযোগ্যতার 'কস্ট' বা খরচ হিসাব করিলে অবশ্য নিউজপ্রিন্টের উৎপাদন খরচ বাড়িয়া-যাওয়ার যুক্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন উঠিয়াছে—অযোগ্য প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পুষিবার জন্য সমগ্র জাতি আর কতকাল খরচ চালাইয়া যাইবে? যে মিলে ৫২ হাজার টনের জায়গায় ২৬ হাজার টন মাল উৎপাদিত হয় (শতকরা ৫০ ভাগ কম) সেই মিলের 'ফিক্সড কস্ট' কি শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়াছে? উত্তর—না, কমে নাই। বরং বাড়িয়াছে। কারণ, নূতন নূতন সংস্থা হইয়াছে, অফিস হইয়াছে, পরিচালক বাড়িয়াছে।

কর্পোরেশন বলেন: দেশের ভিতরে খবরের কাগজের কাছে নিউজপ্রিন্ট বিক্রি করিলে তাঁহাদের প্রতিটনে ১৪শ' টাকা লোকসান হয়। দৈনিক কাগজগুলো এখন প্রতিটন কাগজ ২৩শ' টাকা হিসাবে কিনিয়া থাকে। কর্পোরেশনের বক্তব্য অনুযায়ী (২৩০০+১৪০০) প্রতিটনের উৎপাদন খরচ ৩৭শ' টাকা পড়ে।

তাহা হইলে প্রতিটন নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনে এখন মিলের 'ফিক্সড কস্ট' হইতেছে প্রায় ১৫শ' টাকা। স্বাধীনতার আগে এই খাতে ৪শ' টাকার বেশী খরচ পড়িত না। এই খাতে প্রায় ৪ গুণ খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। বাংলাদেশের কোথাও (প্রাইভেট সেক্টরে) 'ফিক্সড কস্ট' ৪ গুণ বাড়ে নাই। বলা যাইতে পারে অযোগ্যতার মূল্য হিসাবে মিলের 'ফিক্সড কস্ট' বাড়িয়া গিয়াছে।

অপরদিকে 'প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট'-এর যোগ্যতাও কমিয়া গিয়াছে। উৎপাদন যত বাড়িবে ততই খরচ কমিতে থাকিবে এ বক্তব্য এই মিলে অনুপস্থিত। এই মিলের আদর্শ হইল উৎপাদন যোগ্যতা যতই কমিবে ততই দাম বাড়াইয়া দিব এবং দাম বাড়ানোর পক্ষে যুক্তি দেখাইব। তবে ইহা ঠিক যে, মিলে বয়লার সংখ্যা দুইটা হওয়াতে অনেক অসুবিধা হইতেছে। কোন কারণে একটা বয়লার বন্ধ থাকিলে অপরটার উপর চাপ পড়ে এবং উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মিলে তিনটি বয়লারের প্রয়োজন। তাহা হইলে দুইটা নিয়মিত চালু থাকতে পারে। এই ব্যাপারে কর্পোরেশন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই। তবে মিলের ব্যাপারে কয়েকটি আন্তর্জাতিক টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। কোন ফল হয় নাই। কর্পোরেশন কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নাই। শোনা যাইতেছে ব্যালান্সিং এণ্ড মডার্নাইজেশনের নামে কর্পোরেশন মিলটি সম্প্রসারিত করিতে চাহেন। এই জন্য তাহারা সরকারের কাছে কয়েক কোটি টাকা চাহিয়াছেন। অথচ মিলে উৎপাদন কম হইতেছে কেন সেই ব্যাপারে কোন তদন্ত করিতেন তাহারা রাজী নন। এই তো গেল ঘটনার একদিক। অন্যদিকের ঘটনা হইতেছে সরকারের নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ এবং ভারতের কাছে অতিরিক্ত রফতানী।

উৎপাদনযোগ্যতা বাড়াইবার ব্যাপারে কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া সরকার নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করিয়াছেন। ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অযোগ্যতার দোষে দোষী ব্যক্তিদের পোয়াবারো। তাহারা এখন আরো সুখে দিন কাটাইতেছে। জনসাধারণের দৃষ্টি এখন নিয়ন্ত্রণাদেশের উপর। উৎপাদন বাড়িল কি কমিল উহা এখন মুখ্য বিষয় নয়।

এখন মুখ্য বিষয় হইতেছে :—

(১) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, (২) সংবাদপত্র-শিল্পের অস্তিত্ব, (৩) সাংবাদিক ও শিল্পের অন্যান্য কর্মচারীদের চাকুরীর নিরাপত্তা।

অর্থাৎ উৎপাদন বিষয়ক সমগ্র আন্দোলনটা এখন বলতে গেলে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে। সরকারের ভুলের জন্যে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিলে অন্যায় বলা হইবে না।

নিউজপ্রিন্ট রফতানী করিয়া ডলার বা স্টার্লিং পাউণ্ড আয় করিবার উদ্যোগকে কেউ বিরোধিতা করে না। রফতানী স্বাধীনতার আগেও হইয়াছে।

১৯৬৫ সাল হইতে '৭০-৭১ সাল পর্যন্ত গড়ে বাৎসরিক ২০ হাজার টন নিউজপ্রিন্ট পাকিস্তানে রফতানী হইয়াছে। '৬৮-৬৯ সালে পাকিস্তান

২৭,৬২১ টন নিউজপ্রিন্ট বাংলাদেশ হইতে নিয়াছে। এই বৎসর পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য দেশে ১৮৭২ টন নিউজপ্রিন্ট রফতানী হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বাংলাদেশে ১৫৬২ টন নিউজপ্রিন্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। '৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশে ১০১৪৩ টন নিউজপ্রিন্ট ব্যবহার করিবার পরও পাকিস্তানে এবং অন্যান্য দেশে ২৩ হাজার টন রফতানী করা সম্ভব হইয়াছে।

স্বাধীনতার পর '৭২-৭৩ সালে ২৭৪৯৩ টন এবং '৭৩-৭৪ সালে ২৬৪৬৫ টন নিউজপ্রিন্ট উৎপাদিত হয়।

আলোচ্য দুই বৎসরে দেশে গড়ে ১৪২৫০ টন কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছে। ৭২-৭৩ সালে ১৪০৮৭ টন ও ৭৩-৭৪ সালে ১০৫৮৬ টন নিউজপ্রিন্ট 'রফতানী হইয়াছে।

এই দুই বৎসরে দেশের খবরের কাগজগুলি ব্যবহার করিয়াছে গড়ে প্রায় ৯৫০০ টন। বাকী ৪৫০০ টন ডিলারদের মাধ্যমে বিলি করা হইয়াছে। ডিলার মাধ্যমে বিলিকৃত নিউজপ্রিন্ট খোলা বাজারে ৪০।৫০ টাকা করিয়া বিক্রি হইয়াছে।

..প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বাধীনতার পর দেশের ভিতরে নিউজপ্রিন্টের যে চাহিদা বাড়িয়াছে তাহা যুক্তিসঙ্গত কিনা। ইহার উত্তর সরকারের কাছে এক রকম। জনসাধারণের কাছে অন্য রকম। সরকারের বক্তব্য, নিউজপ্রিন্টের কালোবাজার হইতেছে। বাজে বই ছাপা হইতেছে।

প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের বক্তব্য, স্বাধীনতার পর প্রকাশনা ও সাধারণ ছাপার কাজ অনেক বাড়িয়াছে। প্রকাশনা ও মুদ্রণ-শিল্পে হাজার হাজার লোক কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। সরকার সম্ভবতঃ এই বক্তব্য মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাই প্রকাশনা ও মুদ্রণ-শিল্পকে নিউজপ্রিন্ট সরবরাহ করা এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

স্বাধীনতার পর দৈনিক, সাপ্তাহিক মিলিয়া বহু পত্রিকা বাহির হইয়াছে। সরকারের নিকট হইতে অনুমোদন লইয়া এই সব পত্রিকা বাহির হইতেছে। অধিকাংশ পত্রিকার সহিত সরকারদলীয় লোকজন জড়িত রহিয়াছেন।

তবে একটি স্বাধীন দেশে প্রকাশনা শিল্পের উন্নতি হইলে আনন্দিত হওয়ার কথা। ইহা একটি শুভ লক্ষণ। জানি না, সরকার কেন দেশের সংবাদপত্র ও প্রকাশনা-শিল্পকে নিউজপ্রিন্ট না দিয়া ভারতকে বাড়তি ৭ হাজার টন নিউজপ্রিন্ট সরবরাহ করিতেছেন।

অথচ প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারত নিজের দেশের সংবাদপত্র-শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যে বাৎসরিক দুই লাখ টন নিউজপ্রিন্ট আমদানী করিয়া থাকে।

বিশ্বের বাজারে নিউজপ্রিন্ট সংকট থাকা সত্ত্বেও ভারত নিজের সংবাদপত্র বন্ধ করে নাই ; বরং নগদ ও উচ্চ দামে নিউজপ্রিন্ট ক্রয় করিয়া সংবাদপত্র-শিল্পকে উৎসাহ দান করিতেছে।

ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট হইতে এখন প্রতিটন নিউজপ্রিন্ট ৪৩শ' টাকা করিয়া কিনিতেছে। একই সময়ে আমরা ভারতকে প্রতিটন নিউজপ্রিন্ট ৩২শ' টাকায় সরবরাহ করিতেছি। ভারত বর্তমানে রাশিয়া, কানাডা ও বাংলাদেশ হইতে নিউজপ্রিন্ট কিনিতেছে। বাংলাদেশ হইতে ভারত সব চাইতে কমদামে নিউজপ্রিন্ট কিনিবার সুযোগ পাইয়াছে।

নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ ও সংবাদপত্রের কোটা কমাইবার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সরকারের সুনাম নষ্ট হইতেছে। নিউজপ্রিন্টের অপব্যবহার হউক ইহা কেহ চাহেন না। সুতরাং দেশের চাহিদা যথাযথ পূরণ করিয়া বিদেশে নিউজপ্রিন্ট রফতানীর জন্য সরকারকে কর্মসূচী নিতে হইবে। এই জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইবে উৎপাদন বাড়ানো। বর্তমানে উৎপাদন কেন কম হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা অতীব জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।

কিভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তজ্জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। প্রয়োজন হইলে বিদেশ হইতে অভিজ্ঞ কারিগরও আমদানী করা যাইতে পারে।

উৎপাদন বাড়িলে দেশের চাহিদাও পূরণ হইবে, বিদেশেও রফতানী করিয়া পাউণ্ড, ডলার আয় করা যাইবে।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় শ্রাবণ ১৩৮১

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ

লণ্ডনে এম. সি. এ., আমলা, প্রশাসক ও ব্যবসায়ীদের 'হলি-ডে': বৈদেশিক মুদ্রার এ অপচয় কেন?

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ যখন চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তখন এক শ্রেণীর এম. সি. এ., সরকারী উচ্চ পদস্থ আমলা, প্রশাসক, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী ও কন্ট্রাক্টর বিদেশে 'হলি-ডে' যাপনের নামে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যয় করছে। অভিযোগে আরও প্রকাশ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাটের রপ্তানী এখনও শুরু হয়নি। লণ্ডনে বসবাসকারী বাঙালীদের কষ্টার্জিত অর্থই সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার একমাত্র ভাণ্ডার। অথচ এ মুদ্রা ভাণ্ডারও এভাবে ব্যয়িত হচ্ছে দেখে প্রবাসী বাঙালীরা আশংকা প্রকাশ করেছেন। এ পর্যন্ত লণ্ডনে সরকারীভাবে অথবা 'হলি-ডে' যাপন করার উদ্দেশ্য যে সব প্রভাবশালী এম. সি. এ., আমলা ও ব্যবসায়ী ভীড় জমাচ্ছেন, তারা কোন না কোনভাবে ক্ষমতারও অপব্যবহার করছেন বলে অভিযোগে প্রকাশ।

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ২৮, ১৯৭২

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাংলাদেশ চরম মার খাচ্ছে: যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে কি?

যুদ্ধাপরাধীদের কি বিচার হবে? সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর নির্ভরশীল বাংলাদেশের দেউলিয়া পররাষ্ট্রনীতির চরম ব্যর্থতার পর এ প্রশ্নটি এখন প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কাছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দফতর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য পেশ করছেন।

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ৩০, ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রীর জনৈক সফর সহযাত্রীর স্বীকারোক্তি— সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ অজুহাতে বেরুবাড়ী ভারতকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে

সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা এবং ভারতীয় চাপের মুখে নতি স্বীকার করেই অবশেষে বেরুবাড়ী হস্তান্তর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে বিশ্বস্ত মহল থেকে পাওয়া সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে।

দিল্লী চুক্তি সম্পাদনের সময় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যে দলটি ভারতীয় রাজধানী সফর করেছেন তাদের একজন কথা প্রসঙ্গে গণকণ্ঠ প্রতিনিধিকে

জানিয়েছেন : "বেরুবাড়ীর ওপর বাংলাদেশের দাবি ছিলো এবং তা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।"

কিন্তু হলে কি হবে। বেরুবাড়ীর ব্যাপারে আরো কিছু প্রসঙ্গ আমাদের চিন্তা করতে হয়েছে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ১৯, ১৯৭৩

আওয়ামী লীগ জয়ী হইলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকিবে —আবদুস সামাদ

আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের পক্ষে ভোট প্রদানের আহ্বান জানাইয়া জনাব সামাদ বলেন যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের ফলে দেশে স্থিতিশীলতা আসিবে এবং অব্যাহতভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পাওয়া যাইবে।

—ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯৭৩

ধামরাইয়ের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী : আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতা নিশ্চিত রাখার জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট দিন

—ইত্তেফাক মার্চ ১, ১৯৭৩

যুদ্ধবন্দী প্রশ্নে ভারত বাংলাদেশের সম্মতি ছাড়া কিছুই করিবে না—ইন্দিরা

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১, ১৯৭৩

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন—
আমরা ভারতের না রাশিয়ার অধীনে ভেবে দেখতে হবে

"আমরা স্বাধীন হয়েছি। তবে সত্যিকারভাবে স্বাধীন হয়েছি, নাকি রাশিয়া কিংবা ভারতের অধীনে রয়েছি, সেটা আজ ভেবে দেখা দরকার।"

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ২৭, ১৯৭৩

টেলিফোন কাট্

চার সহস্রাধিক সুইস ফ্রাঙ্কের (প্রায় ৬ শত স্টার্লিং পাউণ্ড) টেলিফোন বিল পরিশোধ না হওয়ায় জেনেভাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের টেলিফোন লাইনসমূহ চলতি মাসের ২০ তারিখ হইতে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গিয়াছে।

সুইস টেলিফোন বিভাগ প্রদত্ত 'বিশেষ অতিরিক্ত সময়ের' মধ্যে এই বকেয়া বিলের অর্থ পরিশোধ করায় দূতাবাস ও বাসভবনের মোট ৮টি টেলিফোন-সংযোগ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্রই জাতিসংঘস্থ মিশন কার্যালয়ে অনুরূপ টেলিফোন সংযোগ কর্তনের নোটিশ পাঠানো হইবে।

গত আগস্ট মাসে সুইস টেলিফোন বিভাগ বকেয়া বিলের অর্থ পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদান করে কিন্তু তখন সেদিকে কেহ দৃষ্টিপাত করে নাই। বার বার 'রিমাইণ্ডার' দিয়া কোন সাড়া না পাইয়া তাহারা মিশনের অর্থ বিষয়ক অফিসারের সহিত কথা বলিতে চায় কিন্তু তিনি তখন ব্রাসেলস ও বন-এ সপ্তাহব্যাপী ছুটি ভোগ করিতেছিলেন। উহার প্রেক্ষিতে টেলিফোন বিভাগ 'বিশেষ অতিরিক্ত সময়' মঞ্জুর করে। বিল পরিশোধ না করায় দূতাবাসের টেলিফোন সংযোগ কাটিয়া দেওয়ার ঘটনা সম্ভবতঃ কূটনৈতিক ইতিহাসে ইহাই প্রথম।

জেনেভা মিশনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও গুরুতর অভিযোগ শুনা যাইতেছে। যে এসিস্টেন্টের উপর একাউনটেন্টের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তিনি চাকুরীলব্ধ আয়বহির্ভূত বিলাসবহুল জীবন-যাপন করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। তিনি বর্তমানে গাড়ী, টি. ভি., সেলাই মেশিন, টেপরেকর্ডারসহ বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও বেশ কয়েকটি হীরার আংটির মালিক। সম্প্রতি অডিট পার্টি মিশনের হিসাবে ৫০ হাজার ফ্রাঙ্কের (৭ হাজার স্টার্লিং পাউণ্ড) গরমিল দেখিতে পান।

সম্প্রতি মিশনের কন্সাল আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাতের জন্য ৯ দিন বন ও ব্রাসেলসে অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি কাহাকেও ভিসা স্বাক্ষরের দায়িত্ব না দিয়া যাওয়ায় সেনেগালের একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও রেডক্রসের জনৈক কর্মকর্তাকে ভিসার জন্য অসহায়ভাবে ১০ দিন অপেক্ষা করিতে হয়।

আরও জানা গিয়াছে যে, জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশন গত আগস্ট মাস হইতে টাকা পয়সা পাইতেছে না। ফলে ব্যাঙ্ক হইতে ওভার ড্রাফট লইয়া স্টাফদের বেতন দেওয়া হইতেছে এবং ব্যাপারটি স্থানীয় কর্মচারীদের হাস্য-কৌতুকের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক ১৯৭৩

পাওয়ার পাম্পের অভাবে ২ লক্ষ একর
জমির ইরি শুকাইয়া যাইতেছে

—ইত্তেফাক মার্চ ১৫, ১৯৭৪

ডিজেল ও খুচরা যন্ত্রাংশের অভাবে ঠাকুরগাঁয়ে
৫৫ হাজার একর জমির ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৩০, ১৯৭৪

দিনাজপুরে পাট ও ইক্ষু ক্ষেতে পোকার আক্রমণ
কীটনাশক ঔষধের অভাবে ফসল রক্ষার প্রচেষ্টা
ব্যর্থ হইতেছে

—ইত্তেফাক মে ২৮, ১৯৭৪

ইউনিয়ন পরিষদের অর্ধ-লক্ষ কর্মচারী বেতন পাইতেছে না

—ইত্তেফাক জুন ১, ১৯৭৪

গফরগাঁয়ে পানীয় জলের তীব্র সংকট
১৫টি ইউনিয়নের পাঁচ শতাধিক নলকূপ অকেজো

—ইত্তেফাক জুন ২৯, ১৯৭৪

বীজ ও সারের অভাবে জয়পুরহাটে আমন ধানের
চাষ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা

—ইত্তেফাক জুন ৩০, ১৯৭৪

বিভিন্ন স্থানে কলেরা-মহামারী : ঔষধের অভাব :
বহু প্রাণহানি

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২৪, ১৯৭৪

অনিশ্চয়তার মুখে ৪০ হাজার ইরি স্কীম

পাওয়ার পাম্পের সাহায্যে পানি সেচ করার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় দেশের ১৯টি জেলার অনুমোদিত ৪০ হাজার ইরি স্কীম অনিশ্চয়তার মুখে পতিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ১৫ হাজার ইরি স্কীম পাওয়ার পাম্পের অভাবে অনুমোদিত হইতে পারে নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ৯, ১৯৭৪

দুর্ভিক্ষ

- গ্রামাঞ্চলে অন্ন-বস্ত্রের হাহাকার
- পেটের দায়ে কন্যা বিক্রি
- চোরাবাজারে কাফনের কাপড় বিক্রি হচ্ছে
- এখানে ওখানে ডোবায় পুকুরে লাশ
- বগুড়ায় অন্নাভাবে অসহায় কর্তারা স্ত্রী তালাক দিচ্ছে

যশোহরে ভুখামিছিল

—গণকণ্ঠ আগস্ট ১২, ১৯৭২

খাদ্যের অগ্নিমূল্য কমাও : লজ্জা নিবারণের বস্ত্র দাও

খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অগ্নিমূল্য সাধারণ মানুষের জন্য এক প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ২০, ১৯৭২

গ্রামে হাহাকার: চাল দাও
আটা কচু সিদ্ধ খেয়ে আর কদ্দিন?

—গণকণ্ঠ আগস্ট ২৩, ১৯৭২

দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে
সংসার চালাইতে আমরা হিমশিম খাইতেছি

দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের দাবিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আওয়ামী লীগ মহিলা শাখা ও বাংলাদেশ মহিলা সমিতি যৌথভাবে আগামী ২৯শে আগস্ট 'দাবি দিবস' পালন করিবে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ২৪, ১৯৭২

গ্রামাঞ্চলে অন্নবস্ত্রের হাহাকার
জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ চাই

—গণকণ্ঠ আগস্ট ২৮, ১৯৭২

লাইসেন্স-পারমিটের জমজমাট ব্যবসা
যাঁতাকলে পড়ে মানুষ খাবি খাচ্ছে

সিরাজগঞ্জ, ফেণী, ভৈরব, ঈশ্বরগঞ্জ ও নাচোলে তীব্র খাদ্যাভাব, অনাহারী মানুষের আহাজারী: শুধু একটি কথা, খাবার দাও

—গণকণ্ঠ আগস্ট ২৯, ১৯৭২

গরীব মানুষ খাদ্য পায় না: টাউটরা মজা লুটছে
গুণবতীতে চাল আটা নিয়ে হরিলুটের কারবার

—গণকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৭২

পেটের দায়ে কন্যা বিক্রি

সম্প্রতি সংবাদদাতা প্রেরিত 'পেটের দায়ে কন্যা বিক্রি' খবরটি আমাদের যেমন বিস্মিত করেছে তেমনি করেছে উৎকণ্ঠিত। প্রকাশ, কিছু দিন পূর্বে কুড়িগ্রাম পৌরসভার সন্নিকটস্থ মণ্ডলের হাটনিবাসী রোস্তম উল্লাহ্‌র স্ত্রী রাবেয়া খাতুন তার আদরের দুলালী ফাতেমা খাতুনকে (৭ বছর) পৌর-সভার জনৈক পিয়ন জমির উদ্দীনের কাছে মাত্র ছ' টাকায় (৬ টাকা) বিক্রি করে দেয়।

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ২১, ১৯৭২

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে জাতিসংঘ প্রধানের আবেদন আসন্ন দুর্ভিক্ষ থেকে বাংলাদেশকে বাঁচান

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ৭, ১৯৭৩

রেশনের চাউল সংকট : ডিলার ও কর্তৃপক্ষের ঠেলাঠেলিতে জনসাধারণের নাভিশ্বাস

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১৮, ১৯৭৩

চোরাবাজারে কাফনের কাপড় বিক্রি হচ্ছে

সম্প্রতি নাগরপুর থানার একটি ইউনিয়নের রেশনিং-এর কাফনের কাপড় কালোবাজারে ক্রয় বিক্রয় করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

—সোনার বাংলা মার্চ ১৮, ১৯৭৩

'খাদ্য সংকটের আশংকা নাই'

পরিকল্পনা কমিশনের জনৈক কর্মকর্তা গত বৃহস্পতিবার এক সাং-বাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, 'চলতি বৎসরে দেশে খাদ্য সমস্যা প্রকট হইবে না' এবং 'খাদ্য সংকটের কোন আশঙ্কা নাই', প্ল্যানিং কমিশনের উক্ত কর্মকর্তা এই তথ্য প্রকাশ করার পর মন্তব্য করেন যে, খাদ্য ঘাটতি লইয়া তেমন উদ্বেগের কিছু নাই।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১, ১৯৭৩,

বগুড়ায় রেশনে চাউলও নাই, আটাও বন্ধ

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৩, ১৯৭৩

একদিকে মানুষ অনাহারে দিন যাপন করিতেছে : অপরদিকে সরকারী গুদামের গম কালোবাজারে বিক্রয় হইতেছে

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৭, ১৯৭৩

রেশনে চাউল সরবরাহ বন্ধ থাকায় জামালপুরে খাদ্য পরিস্থিতির চরম অবনতি

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৮, ১৯৭৩

এখানে ওখানে ডোবায়-পুকুরে লাশ

—সোনার বাংলা এপ্রিল ১৫, ১৯৭৩

জাল নাই-নৌকা নাই আছে ইজারাদার ও আমলাদের অত্যাচার জামালপুর মহকুমার জেলে পরিবারের ২৮ হাজার লোক অনাহারের সম্মুখীন

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৬, ১৯৭৩

চাউল আকাশচুম্বী : আটা উধাও : কেরোসিন ও ঔষধ নাই শুধু আছে অনাহার আর আত্মহত্যা

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২২, ১৯৭৩

এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অনাহারে ৫ জনের মৃত্যু দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

—গণকণ্ঠ এপ্রিল ২৬, ১৯৭৩

বগুড়ায় অন্নাভাবে অসহায় কর্তারা স্ত্রী তালাক দিচ্ছে

—সোনার বাংলা এপ্রিল ২৯, ১৯৭৩

রামগড়ে চরম খাদ্য সংকট

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৩০, ১৯৭৩

চালের অভাব : পেটের জ্বালায় ছেলেমেয়ে বিক্রি হবিগঞ্জে হাহাকার : অনাহারে এ পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু

—গণকণ্ঠ মে ৩, ১৯৭৩

কোন কোন এলাকায় মানুষ আটা গুলিয়া ও শাক-পাতা সিদ্ধ করিয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করিতেছে

—ইত্তেফাক মে ৩, ১৯৭৩

নোয়াখালী, রাজশাহী, কুমিল্লার গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব

—ইত্তেফাক মে ৪, ১৯৭৩

অনাহারে দশজনের মৃত্যু: বিভিন্ন স্থানে আর্ত মানবতার হাহাকার: শুধু একটি ধ্বনি: ভাত দাও

—গণকণ্ঠ মে ১০, ১৯৭৩

লতাপাতা, গাছের শিকড়, বাঁশ ও বেতের কচি ডগা, শামুক, ব্যাঙের ছাতা, কুচু-ঘেচু পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যে পরিণত: গ্রামাঞ্চলে লেংটা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি

—ইত্তেফাক মে ১০, ১৯৭৩

পটুয়াখালীর চিঠি: অনাহারে একজনের মৃত্যু
সংসার চালাতে না পেরে আত্মহত্যা

—গণকণ্ঠ মে ১১, ১৯৭৩

খাদ্যাভাব: দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী: ফড়িয়াদের বিড়ম্বনা
নেত্রকোণায় পাটের চাষ আশংকাজনকভাবে হ্রাস

—ইত্তেফাক মে ১৫, ১৯৭৩

ওরা খাদ্যাভাবে জর্জরিত: বস্ত্রাভাবে বাহির হইতে পারে না

—ইত্তেফাক মে ৩০, ১৯৭৩

চাল ১৩০ টাকা: আটা ৯০ টাকা: লুঙ্গী ৩০ টাকা
শাড়ী ৭০ টাকা: রেশন ৭ মাস বন্ধ: ক্ষুধাকাতর পাবনার পাঁচালী: অনাহারে মৃত্যু
আত্মহত্যা ও ইজ্জত বিক্রির করুণ কাহিনী

—গণকণ্ঠ জুন ১, ১৯৭৩

ঈশ্বরদীতে চালের মণ ১২০ টাকা: শাড়ী একটা ৫০ টাকা
অভাব মানুষের স্বভাব নষ্ট করিতেছে: ওরা এখন আগাছা খেয়ে বেঁচে আছে

—গণকণ্ঠ জুন ১৪, ১৯৭৩

খোলা বাজারে চাল ছোঁয়া দায়: মানুষ দিশেহারা
কিশোরগঞ্জে ৭ মাস যাবত রেশনে চাল নেই

—গণকণ্ঠ জুন ১৯, ১৯৭৩

ফেন চুরি

সাত রাজার ধন নয়। বাঁচার তাগিদে এক মালসা ফেন। দু'দিন না খেয়ে থাকার পর এক বাড়ির রান্না ঘর থেকে ফেন চুরি করলো সে। চুরি করে ধরা পড়লো। শুকনো মুখো হাড্ডীসার ছেলেটির গালে ঠাশ ঠাশ পড়লো কয়েকটি সজোরে থাপ্পর। চোখে অন্ধকার দেখলো সে এবং মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

গ্রামের নাম দরগাপুর, থানা আশাশুনি, জেলা খুলনা। গাজী বাড়ির বাচ্চা। বয়স সাত-আট বছর। গুটি বসন্তে পিতা মারা গিয়েছে। মা কাজ করে যা পায় তাতে কোলের ভাই-বোন দুটোর হলেও বাকী দুইবোন আর বাচ্চার হয় না। বাচ্চা তাই প্রতিদিন একটা ভাড়া নিয়ে বের হয়। দ্বারে দ্বারে ফেন মাগে, এই ভাবেই তিন ভাই বোন চলে।

—সোনার বাংলা জুলাই ৮, ১৯৭৩

"বাকীতে দাফন: ভিক্ষায় শোধ"

গলাচিপা থানার ডাকুয়া ইউনিয়নের একরাম হাওলাদার আর তার বড় ছেলে জালাল হাওলাদার বসন্তে মারা গেছে। ছোট ছেলে শাহজামাল অনন্যোপায় হয়ে জনৈক মহাজনের কাছ থেকে বাকীতে কাপড় কিনে তাদেরকে দাফন দিয়েছে।

মাসাধিককাল পর্যন্ত সে টাকা পরিশোধ করতে না পেরে এখন শাহজামাল হাওলাদার গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করে।

—সোনার বাংলা জুলাই ১৪, ১৯৭৩

স্বাধীন বাংলার আরেক রূপ: জামাই বেড়াতে এলে
অর্ধ-উলঙ্গ শ্বাশুরী দরজা বন্ধ করে দেয়

—সোনার বাংলা জুলাই ১৫, ১৯৭৩

ন্যায্যমূল্যে দাফনের কাপড় কোথায় পাওয়া যায়

ঢাকার জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ মাত্র ৫ দিন আগে এক বিজ্ঞপ্তিতে ন্যায্যমূল্যে কাফনের কাপড় বিক্রয়ের কথা শহরবাসীকে জানাইয়াছেন। স্থানীয় সংবাদপত্রে ন্যায্যমূল্যে কাফনের কাপড় বিক্রির জেলা প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত ৭টি দোকানের নাম ঠিকানাও ছাপা হয়।

—ইত্তেফাক আগস্ট ৫, ১৯৭৩

ঢাকার ডাস্টবিনে প্রতিদিন জমা হয় তিন-চারটি মানব শিশুর লাশ

গত শুক্রবার সকাল ৮টায় যাঁরা পুরাতন স্টেশনের রোড অতিক্রম করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই একটা অনভিপ্রেত দৃশ্য দেখেছেন যা আপনাদের ব্যাখ্যা না দিয়ে পারেনি। শুক্রবার সকালে যখন মিউনিসিপালিটির কর্মচারীরা একটি আবর্জনা স্তূপ ঘাটছিল তখন হঠাৎ আবর্জনার ভিতর থেকে বেড়িয়ে আসে একটি মাসুম বাচ্চার লাশ। সেও আজ শহরের আবর্জনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রাকে করে তাকে শহরের বাহিরে ফেলে দেয়া হবে। কথাটা ভাবতে বুকের ভিতর মোচর দিয়ে উঠল। কর্মরত লোকদের মতে দৈনিক ৩।৪টি মাসুম বাচ্চার লাশ পাওয়া বিচিত্র নয়।

—সোনার বাংলা আগস্ট ২৬, ১৯৭৩

জঠর জ্বালায় ঝিনাইদহে ৪৪১ জনের আত্মহত্যা

গত এক বছরে ঝিনাইদহ মহকুমায় মোট ৪৪১ ব্যক্তি জঠর জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে ৩৩৮ জনই মহিলা এবং বাকী ৯৭ জন পুরুষ।

—সোনার বাংলা অক্টোবর ৭, ১৯৭৩

রমজান মাসে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা ভানুমতির খেল দেখাচ্ছে গাইবান্ধার গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখন কচু-ঘেচু খেয়ে জীবন বাঁচাচ্ছে

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ৯, ১৯৭৩

মানুষের মূল্য ৮ টাকা

একধারে চারদিন অনাহার। কোন দানা পড়েনি পেটে। ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় অনন্যোপায় হয়ে নিজের পেটের সন্তানকে সে অন্যের হাতে তুলে দিল মাত্র আট টাকার বিনিময়ে। ঘটনাটি ঘটছে গাইবান্ধা শহরের মাস্টার পাড়ায়। জানা গেছে, একনাগারে চারদিন অনাহারে থাকার পর আনোয়ারা নাম্নি এক মহিলা তার ১৮ দিন বয়স্কা কচি নিষ্পাপ মেয়েকে স্থানীয় পতিতালয়ে ৮ টাকা দামে বিক্রি করে দিয়েছে।

—সোনার বাংলা অক্টোবর ১৪, ১৯৭৩

ভূষি ও কাঠের গুড়া মিশ্রণে তৈরী আটার মণ ৭৫ টাকা

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২০, ১৯৭৩

নিঃস্ব জনগণ গাছের তলায় ঠাঁই নিয়েছে : কসবা থানার রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রভাবশালী নেতাদের কারসাজিতে তারা সামান্য সাহায্য থেকেও বঞ্চিত

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ৩, ১৯৭৩

ঢাকায় চালের মণ ৪শ' টাকা

ঢাকার বাজারে গতকাল চালের সের সাড়ে ৮ টাকা থেকে ১০ টাকা। রোববারের বাড়তি দাম নিয়ে ৪ দিনে গড়ে সের প্রতি ২ টাকা দাম বাড়ছে।

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ৬, ১৯৭৪

উদ্বেগজনক খাদ্য পরিস্থিতি

দেশের কোন কোন এলাকার ধান, চাউল ও গমের অস্বাভাবিক মূল্য-বৃদ্ধি এবং সেই সংগে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে বলিয়া বিভিন্ন সূত্রে খবর পাওয়া যাইতেছে। খাদ্যের চোরাচালান, এক শ্রেণীর লোকের কারসাজি, পরিবহণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি, সরকারী নিয়ন্ত্রণ তৎপরতার অভাব প্রভৃতিই এই পরিস্থিতির জন্য মূলতঃ দায়ী বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়।

জামালপুরের ইটাইল বাজারে ধান কিনিতে গিয়া জনৈক ব্যক্তি ৯৫ টাকা দাম শুনিয়াই সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছে—এ খবরও বাহির হইয়াছে। সহযোগী 'দৈনিক বাংলা' ও 'জনপদ' মাগুরা, মানিকগঞ্জ ও ঝিকরগাছায় অনাহারে মৃত্যু ও আত্মহত্যার কয়েকটি খবরও প্রকাশ করিয়াছেন।

মরা গরুর গোশ্‌ত খাইয়া ভোলা মহকুমার বোরহানুদ্দিন থানার ১০ ব্যক্তি মারা গিয়াছে এবং ৬০ জন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, এই খবরে বিস্মিত হইবার বা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন না-করিবার কিছু নাই। স্বয়ং সরকারদলীয় স্থানীয় এম. পি. সাংবাদিকদের এই খবর দিয়াছেন। জান বাঁচানোর জন্য মানুষ মরা গরু খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তবু বাঁচিতে পারিতেছে না, বরং মরা গরুর গোশ্‌ত খাইয়া আরও আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, এ-খবর বড় মর্মান্তিক, বড় সাংঘাতিক। একদিকে নির্মম প্রকৃতি, আরেক দিকে নির্দয় লুটেরারা কি তবে বাঙালীকে কাঙালী না বানাইয়া ছাড়িবেই না?

—ইত্তেফাক মার্চ ২৩, ১৯৭৪

চাল-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বেড়ে চলছে গ্রাম বাংলার পথে-ঘাটে শুধু বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার

—গণকণ্ঠ এপ্রিল ৩, ১৯৭৪

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ খাদ্যশস্যের অবিশ্বাস্য রকম মূল্য বৃদ্ধি ও তীব্র খাদ্যাভাবের দরুন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দুঃখজনক খবর পাওয়া যাইতেছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ৪, ১৯৭৪

যাদের হাতে কালো টাকা নেই, যারা হাইজ্যাক করতে অভ্যস্ত নয়, যাঁরা লুটপাট করে খেতে পারে না, যাঁরা মন্ত্রী মেম্বর নয়, তাদের পক্ষে চালের এই অগ্নিমূল্যের বাজারে বাঁচার কোন উপায় নেই" ডঃ আলীম আল রাজী ও জনাব মশিউর রহমানসহ ১৫ জন ভান্যাপ নেতৃবৃন্দ গত শুক্রবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে এ কথা বলেছেন।

—গণকণ্ঠ এপ্রিল ৮, ১৯৭৪

গ্রাম বাংলায় হাহাকার কচু-ঘেচুই বর্তমানে প্রধান খাদ্য

—ইত্তেফাক এপ্রিল ১৬, ১৯৭৪

রংপুরে ভূখা মিছিল

খাদ্যের দাবিতে আজ এখানে ভুখা-নাংগা মানুষের মিছিল বের হয়েছে। মিছিলকারীরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে খাবার দাবি করেছে।

—গণকণ্ঠ এপ্রিল ১৯, ১৯৭৪

চাউলের দেশ পটুয়াখালীতে আটার জন্য ভীড়

বাংলার শষ্য ভাণ্ডার বলিয়া কথিত এবং যে শহর হইতে আজও প্রত্যহ শত শত মণ চাউল ঢাকার লঞ্চে চালান হইতেছে সেই পটুয়াখালীতে গম ও আটার জন্য হাজার হাজার মানুষ মার্কেটিং অপারেশনে ভীড় জমাইতেছে।

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৪১৯৭৪

শ্রীপুরে দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বগতি

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৪, ১৯৭৪

কুড়িগ্রামে চাউলের দোকান লুট

—ইত্তেফাক এপ্রিল ২৮, ১৯৭৪

তারাই বলুন এবার মানুষ খাবে কি—

বাংলার অধিকাংশ মানুষ এখন ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বাংলার মাঠে, বাংলার প্রকৃতিতে আজও শ্যামলের সমারোহ, বাংলার আকাশে আজও মেঘ ডাকে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনায় আজও জোয়ার ভাঁটা হয়। বাংলার গাছে গাছে আজও ফুল ফোটে, পাখী ডাকে, কিন্তু বাঙালী তার আবহমানকালের ভাত টিকিয়ে রাখতে পারছে না।

—সোনার বাংলা এপ্রিল ২৮, ১৯৭৪

অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলছে—পরিবার পরিজনসহ আত্মহত্যার হিড়িক

'অনাহারে কাউকে মরতে দেয়া হবে না' এ কথাকে চরমভাবে মিথ্যা প্রমাণ করে প্রতিদিনই আসছে অনবরত অনাহারজনিত মৃত ও আত্মহত্যার খবর। এক বেসরকারী পরিসংখ্যানে জানা যায় যে গত সপ্তাহে দেশে অনাহার-জনিত হত্যা আত্মহত্যার সংখ্যা ৪০ ছাড়িয়ে গেছে। তিনদিন চারদিন এমনকি কোথাও ৭।৮ দিন অনাহারে থাকার পরও মৃত্যুবরণ করেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন স্থান থেকে একযোগে পরিবারের সকল সদস্য বিষপানে অথবা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার খবর পাওয়া গেছে।

—সোনার বাংলা মে ১২, ১৯৭৪

অস্বাভাবিক মৃত্যুর হার দৈনিক গড়ে ১০ জন

এ বৎসর দেশে প্রতিদিন গড়ে ১০ জন লোককে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিতে হইতেছে বলিয়া এক পরিসংখ্যানে জানা যায়।

চুয়াত্তরের ১লা জানুয়ারী হইতে এ পর্যন্ত গত ১৩৪ দিনে লঞ্চ ডুবিয়া, ট্রেন দুর্ঘটনায়, গুলী খাইয়া, মুণ্ডচ্ছেদ হইয়া, পিটুনী খাইয়া ৮২৮ জনকে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়াও এ বৎসর আগুনে পুড়িয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হইয়া, বিষপান কিংবা গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়া প্রায় ৪০০ জন প্রাণ হারাইয়াছে।

—ইত্তেফাক মে ১৫, ১৯৭৪

বরিশাল জেলার সর্বত্র চরম খাদ্য সংকট

—ইত্তেফাক মে ২৬, ১৯৭৪

সর্বত্র হাহাকার : রেশনে চাউল নাই

—ইত্তেফাক মে ২৯, ১৯৭৪

লাশের মিছিল ভারী হচ্ছে

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই এ দেশে খাদ্যশস্য এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চলছে। শহরসহ গ্রামবাংলার যে খবর আসছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং মারাত্মক। খাদ্যের অভাবে দেশের বেশীর ভাগ জনগণ বহুদিন ধরে একবেলা আধপেটা খেয়ে কোনমতে জীবন ধারণ করে আসছিল। অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়ার ইতিহাস তো বহু পূর্বেই ম্লান হয়ে গেছে। খাদ্যের অভাবে জীবন ধারণ করতে না পেরে আত্মহত্যার খবরও অনেকটা বাসী হয়ে গেছে।

—সোনার বাংলা জুন ২, ১৯৭৪

ক্ষুধা : দারিদ্র্য : অশান্তি : অস্থিরতা
৬ শো ৭৫ জনের আত্মহত্যা

দীর্ঘদিন যাবত দেশে ভয়াবহ খাদ্য সংকট বিরাজ করেছে। দিন যতই যাচ্ছে, সমস্যার তীব্রতা ততই বাড়ছে। জিনিসের দাম এতই বাড়ছে যে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে তা' চলে গেছে। তাই জনগণ অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে প্রাণ ধারণের চেষ্টা করছে।

কুড়িগ্রাম : এক বেসরকারী পরিসংখ্যানে প্রকাশ, ১৯৭৩ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে এ বছরের মে মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একমাত্র ঝিনাইদহ মহকুমার ৫ শত ৬০ জন নরনারী আত্মহত্যা করেছেন।

ঝিনাইদহে, গত মাসে ৪০ জন আত্মহত্যার খবর পাওয়া গিয়াছে।

নেত্রকোণা : গত ৯ মাসে মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৫ জন আত্মহত্যা করেছে।

—সোনার বাংলা জুন ১১, ১৯৭৪

দেশবাসীর কাটা ঘায়ে আর নুন দেবেন না

খাদ্যমন্ত্রীর অখাদ্য ভাষণ ও বক্তৃতা শুনতে শুনতে গোটা জাতি শ্রান্ত ও ক্লান্ত। যখন চালের দাম দু'শ টাকারও বেশী তখন তিনি ঘোষণা করেন 'প্রতি মণ চালের দাম কিছুতেই একশো টাকার উর্ধ্বে উঠতে দেয়া হবে না।' পত্রিকায় যখন অনাহারে মৃত্যুর খবর ছাপা হয়, তখন তিনি বলেন, 'অনাহারে মরতে দেব না।' সরবরাহের অভাবে যখন খাদ্যদ্রব্যের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে, তখন তিনি দরাজ গলায় ঘোষণা করেন, 'গুদামে প্রচুর খাদ্য শস্য মওজুত আছে'। চালের মণ যখন দু'শ টাকার বেশী তখনও তিনি এলান করেন, 'চালের দাম কোথাও দু'শ টাকা হয়নি।' রেশনের দাম বাড়তে থাকলে তিনি বলেন, 'দাম আর বাড়তে দেয়া হবে না।'

এমতাবস্থায় মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, আর গলাবাজি করবেন না, কথা বাড়াবেন না, সমস্যার সমাধান না করতে পারেন চুপ করে থাকুন। অযথা আবোল-তাবোল বকে দেশবাসীর কাটা ঘায়ে নুন দেয়ার চেষ্টা করবেন না।

—সোনার বাংলা জুন ১৬, ১৯৭৪

এক মুঠ নুন দ্যাও

''রিলিফের চাউল গম চাও না। বানের পানিতে হামার গুলার সউগ গেইছে, জমি গেইছে, ঘর গেইছে, বিচন ধান গেইছে। ওগের ঔষধ পাই না। ইলিফ আইলে নেতাপোতা, মেম্বোর চেয়ারম্যানরা চুরি করি খাইবে। তোমরা হামাক গুলাক এক মুট নুন দ্যাও। পাটর পাতা-কলার পাতার মাকিয়া আজরাইলের হাত থাকি জানটাক বাঁচাবার চাই।''

—ইত্তেফাক আগস্ট ১, ১৯৭৪

মা মরিয়াছে রোগে, বাবা অনাহারে : 'মোর বাবা কোটে গেইল মুই কোনটাই যাইব'

—ইত্তেফাক আগস্ট ২, ১৯৭৪

গৃহ হারার দল আশ্রয়ের সন্ধানে যখন পথে পথে ঘুরিতেছে—

ভয়াবহ বন্যা আর নদীর ভাঙ্গনে হাজার হাজার লোক গৃহহারা হইয়া আশ্রয়ের সন্ধানে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারই পাশাপাশি স্বল্প-মূল্যে গৃহ নির্মাণ কর্মসূচীর অধীনে ভারত হইতে রিলিফ হিসাবে প্রাপ্ত প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের কাঠ, বাঁশ ও ছন 'লুটপাটের শিকারে' পরিণত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক আগস্ট ৩, ১৯৭৪

ঢোল পিটিয়ে মানুষ বিক্রি : মানবশিশু আজ নিত্য দিনের কেনা বেচার পণ্য

হাটের নাম মাদারীগঞ্জ। মহকুমার নাম গাইবান্ধা। সেই মাদারীগঞ্জ হাটে ঘটেছে একটা ঘটনা। একদিন নয় দু'দিন, ১০ই এবং ১৩ই জুলাই।

১০ই জুলাই এক হাটে এক ব্যক্তি মাত্র একশ বার টাকার বিনিময়ে তার ৬৷৭ বছরের শিশু পুত্রকে বিক্রি করে। দ্বিতীয় দিনে ১১ই জুলাই একই হাটে ৫-৬ বছর বয়সের একটি মেয়ে বিক্রি হয়েছে মাত্র ২৮ টাকায়। প্রথমে বাজারে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয় মেয়ে বিক্রি করার ঘোষণা। ঢোল পিটানোর মেয়ে কিনতে ও দেখতে অনেক লোক জমা হয়। অবশেষে আ-টা-শ টাকা দামে মেয়েটি বিক্রি হয়।

—সোনার বাংলা আগস্ট ৪, ১৯৭৪

'দুঃখিনী বাংলাকে বাঁচাও'

—ইত্তেফাক আগস্ট ১০, ১৯৭৪

জামালপুরে অনাহারে ১৫০ জনের মৃত্যুর খবর

—ইত্তেফাক আগস্ট ১১, ১৯৭৪

ত্রাণ শিবিরগুলির অবস্থা ভয়াবহ—আতাউর রহমান

জাতীয় বন্যা ত্রাণ কমিটির কার্যকরী আহ্বায়ক জনাব আতাউর রহমান খান গতকাল (শনিবার) এক বিবৃতিতে বলেন, "অদ্য জাতীয় বন্যা ত্রাণ কমিটির সদস্যবৃন্দসহ আমি শহরের বিভিন্ন রিলিফ ক্যাম্প পরিদর্শন করি। সেখানকার অবস্থা এক কথায় ভয়াবহ।"

—ইত্তেফাক আগস্ট ১৮, ১৯৭৪

প্রতিদিন ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল আসছে শহরে

ক্ষুধার্ত মানুষের ছোট ছোট মিছিল প্রতিদিন আসছে শহরে। অন্ন-বস্ত্র আশ্রয়হারা এ মানুষেরা ছড়িয়ে পড়ে শহরে। এখানে-ওখানে। ঠাঁই খোঁজে রিলিফ ক্যাম্পে।

—গণকণ্ঠ আগস্ট ২০, ১৯৭৪

ইহার নাম কি জীবন?

রাজধানীর ত্রাণ শিবিরগুলিতে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও মর্মবেদনা ধুকিয়া ধুকিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে। এইগুলি পরিদর্শন করিয়া প্রশ্ন জাগিল ইহার নাম কি জীবন?

—ইত্তেফাক আগস্ট ২১, ১৯৭৪

গ্রামের মানুষ ভাত খাওয়া ভুলে গেছে

—কেউ বলেন এটা খোদার অভিশাপ।
—কেউ বলেন কপালের লেখা বা কর্মের ফল।

—বুড়োরা বলেন এমন তো জীবনে দেখিনি।
—ডাক্তাররা বলেন এ অবস্থা চললে মানুষ দৃষ্টিশক্তি হারাবে, পংগু হয়ে যাবে।

—সোনার বাংলা আগস্ট ২৫, ১৯৭৪

১০ দিনে জামালপুর ও ঈশ্বরদীতে অনাহার ও অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ৭১ জনের মৃত্যু

—গণকণ্ঠ আগস্ট ২৭, ১৯৭৪

অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে

গ্রামবাংলায় বর্তমানে চরম দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজ করছে। অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। এক নাগাড়ে ১০৷১৫ দিন অনাহারে থেকে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। গড়ে প্রতি সপ্তাহে সহস্রাধিক লোক অনাহারে প্রাণ হারাচ্ছে।

—সোনার বাংলা সেপ্টেম্বর ১, ১৯৭৪

রেকর্ড সৃষ্টিকারী খবর : জঠর জ্বালায় বমি ভক্ষণ

একজন অসুস্থ ব্যক্তি গাইবান্ধার রেলওয়ে প্লাটফরমে প্রচুর পরিমাণে বমি করে। বমির মধ্যে ছিল ভাত ও গোশত। দু'জন ক্ষুধার্ত মানুষ জঠর জ্বালা সংবরণ করতে না পেরে সেগুলো গোগ্রাসে খেয়ে ফেলেছে।

—সোনার বাংলা সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৭৪

গাইবান্ধায় দেড় মাসে ৩০০ লোক না খেয়ে মরেছে

গাইবান্ধা মহকুমায় ভয়াবহ খাদ্যাভাব বিরাজ করছে। ফলে তারা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে চলছে। প্রতিদিনই মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে।

—সোনার বাংলা সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৭৪

দু'শ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য আমাদের বেঈমানী বিবেককে যেন আর বিরক্ত না করে : রিলিফ ক্যাম্পগুলোতে সুটিং চলছে

—সোনার বাংলা সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৭৪

"ইট্টু ফেন দেবেন মা"

ইফতার করার লাইগা ইট্টু ফেন দেবেন মা?' মাগো তিনদিন কিছু খাই নাই, পোলাডা না খাইয়া দাপাইতেছে। এক টুকরা রুটি দেন না', 'বাবা

তোমরা আমারে মাইরা ফেলাও আর সইতে পারি না।' এগুলো আজকের ঢাকার সাধারণ সংলাপ। রাজধানীর ফুটপাত, অফিস-বারান্দা, কমলাপুর, তেজগাঁও রেলওয়ে স্টেশন, সদরঘাট টারমিনাল, স্টেডিয়ামের চত্বরে তাদের আস্তানা। ওরা মরছে দল বেঁধে। মরার আগে প্রাণপণ চেষ্টা করছে বেঁচে থাকতে। যুবক, যুবতী তরুণ, তরুণী বৃদ্ধা লাখ লাখ মানুষ বাঁচার জন্য যে-কোন অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরছে। এক টুকরো রুটির জন্য যুবতী কিশোরী মেয়েরা সতীত্বকে সপে দিচ্ছে হিংস্র হায়েনার কাছে। বাপ মায়ের চোখের সামনে যুবতী মেয়ের দর-দাম চলছে। হাজার হাজার সখিনা, সালেহা গুণবতী, মালেকারা তাদের দেহের বিনিময়ে নিজের এবং বাপ-মার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করছে।

—সোনার বাংলা সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৭৪

খাদ্যাভাব ঃ শহরে ক্ষুধার্ত মানুষের ভীড় ঃ অবিলম্বে লঙ্গরখানা খোলার দাবি

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২০, ১৯৭৪

ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তচীৎকারে ঘুম ভাঙ্গে

নিরন্ন, অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন ও কঙ্কালসার অসহায় মানুষের আহাজারি ও ক্ষুধার্ত শিশুর আর্তচীৎকারে এখন রাজধানীর সমস্যা পীড়িত মানুষের ঘুম ভাঙ্গে। অতি প্রত্যুষ হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত দ্বারে দ্বারে করুণ আর্তি: 'আম্মা, একখানা রুটি দ্যান'। গৃহিনীরা কখনো বিরক্ত হন, আবার কখনও আদম সন্তানের এ হেন দুঃসহ দুর্দশা দেখিয়া অশ্রুসজল হইয়া ওঠেন।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৭৪

রাজধানীতে ভূখামিছিল

ভূখা-নাঙ্গা মানুষের পদভারে কম্পিত হয়েছে ঢাকার রাজপথ। শত শত কণ্ঠের বজ্রনিনাদে উচ্চারিত হয়েছে, অন্ন দাও, বস্ত্র দাও।

---গণকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৭৪

ওরা বুভুক্ষু মানুষের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে

খাদ্যদ্রব্য বণ্টন ব্যবস্থায় কারচুপি এবং দুর্নীতিবাজদের ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির হীন চক্রান্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় খাদ্যাভাব তীব্রতর করিয়া

তুলিতেছে। রেশন ও রিলিফের দ্রব্য আত্মসাৎ এবং কালোবাজারে বিক্রয়ের ঘটনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৭৪

৪ হাজার ৩ শতটি লঙ্গরখানা খোলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৭৪

গ্রাম বাংলায় ক্ষুধার্ত মানুষের কান্না

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৭৪

রাজধানীর পথে পথে জীবিত কঙ্কাল

শীর্ণকায় কঙ্কালসার আদম সন্তান। মৃত না জীবিত বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর। পড়িয়া আছে রাজধানী ঢাকা নগরীর গলি হইতে রাজপথের এখানে-সেখানে। হাড় জিরজিরে বক্ষে হাত রাখিয়াই কেবল অনুভব করা যায় ইহারা জীবিত না মৃত।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৭৪

জীবিত না মৃত কে জানে?

রাজপথে শায়িত শিশু। জীবিত না মৃত, কে জানে। কে-ই বা খবর রাখে? দুই একটি মৃতদেহ অথবা জীবন্মৃত কঙ্কালসার এখন ঢাকার রাজপথে সহজেই নজরে পড়ে। অন্ন বস্ত্রের সমস্যায় জর্জরিত পথচারী ফিরিয়া তাকায়। হয়ত চোখ অশ্রুসজল হয়।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৭৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ জন শিক্ষকের বিবৃতি দেশ মন্বন্তরের করাল গ্রাসে : জরুরী ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী প্রণয়ন করিতে হইবে

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৭৪

ক্ষুধার তাড়নায় পানিতে সন্তান নিক্ষেপ

সম্প্রতি ডিবুয়াপুরা ইউনিয়নের বলগাছিয়া গ্রামের জনৈক মজিদ তার ১ বছরের একটি মেয়েকে পুকুরে নিক্ষেপ করেছে।

অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, মজিদ কয়েকদিন অনা-হারে থাকার পর অন্ন সংস্থানের জন্যে হন্যে হয়ে কোথাও কোন কাজ বা

খাবার যোগাড় করতে অপারগ হয়ে অনাহারক্লিষ্ট ছোট মেয়েটিকে পুকুরে ফেলে দেয়।

উল্লেখযোগ্য যে, এ এলাকায় ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে সন্তান বিক্রয়, আত্মহত্যা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে সংঘটিত হচ্ছে।

—গণকণ্ঠ সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৭৪

৭০ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি—দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্ন

বাংলাদেশের ৭০ জন বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী গতকাল (বুধবার) এক যুক্ত বিবৃতিতে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন: "বাংলাদেশের বর্তমান খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক সঙ্কট অতীতের সর্বাপেক্ষা জরুরী সঙ্কটকেও দ্রুতগতিতে ছাড়াইয়া যাইতেছে এবং ১৯৪৩ সনের সর্বগ্রাসী মন্বন্তরের পর্যায়ে পৌঁছাইয়া গিয়াছে।"

তাঁহারা অভিযোগ করেন: 'বর্তমান পরিস্থিতিকে সরকার 'প্রাক-দুর্ভিক্ষাবস্থা' বলিয়া অভিহিত করার মাধ্যমে দুর্দশার প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। মন্বন্তরের মোকাবিলায় দেশের বিভিন্ন সামাজিক শক্তিসমূহের উপর কোন প্রকার আস্থা স্থাপন না করিয়া সরকার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছেন কতিপয় বৈদেশিক শক্তির সাহায্য ও ঋণের উপর। এবং আভ্যন্তরীণ একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ, টাউট, বদমাতব্বর ও অনুশোচনাহীন আত্মসাৎকারীদের উপর।"

তাঁহারা লঙ্গরখানার পরিবেশকে 'নির্যাতন কেন্দ্রের পরিবেশের শামিল' বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন: "দুর্ভিক্ষ মানুষ দ্বারা সৃষ্ট এবং একটি বিশেষ অর্থের শ্রেণীর অবাধ লুণ্ঠন ও সম্পদ পাচারের পরিণতি। ১৭৬১ সনের মন্বন্তর, ১৯৪৩ সনের মন্বন্তরের ন্যায় ১৯৭৪ সনের মন্বন্তরও মনুষ্য সৃষ্ট এবং উৎপাদন যন্ত্রের সহিত সম্পর্কবিহীন একশ্রেণীর মজুতদার চোরাচালানী ও রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ব্যবসায়ীরাই ইহার জন্য দায়ী।"

তাঁহারা বলেন: 'খাদ্য ঘাটতি কখনও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ হইতে পারে না। সামান্যতম খাদ্য ঘাটতির ক্ষেত্রেও শুধু বণ্টন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা যায়। যদি দেশের উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা নিম্নতম ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত, দেশের প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিচারকে নিশ্চিত করার সামান্যতম আন্তরিক

চেষ্টাও থাকিত তাহা হইলে যুদ্ধের তিন বছর পর এবং দুই হাজার কোটি টাকারও বেশী বৈদেশিক সাহায্যের পর '৭৪ সনের শেষার্ধে আজ বাংলাদেশে অন্ততঃ অনাহারে মৃত্যুর পরিস্থিতি সৃষ্টি হইত না। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও মন্বন্তরের মোকাবিলা কোন মানবিক প্রশ্ন নয়, ইহা একটি মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্ন।'

বিবৃতিতে বলা হয়: "সরকার ও দেশের সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মসূচী ও কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। ইহা ছাড়া রেশনিং এর পরিধি আরও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে।"

বিবৃতিতে দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি ও ক্ষমতাসীন দলের দেশ প্রেমিক অংশকে একতাবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার এবং ১লা নভেম্বর বিকাল ৩টায় বায়তুল মোকাররমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, আইনজীবী, প্রকৌশলী এবং শ্রমজীবী মানুষের গণজমায়েতে যোগদানের আহ্বান জানান হয়।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১, ১৯৭৪

ক্ষুধার আগুন জ্বলিতেছে

গ্রাম-বাংলার ঘরে ঘরে আজ ক্ষুধার আগুন জ্বলিতেছে। সে আগুন জ্বলিয়াছে রংপুরের ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিক্ষারিণীর জঠরে, অন্ন সংস্থানে ব্যর্থ নেত্রকোণার দুঃখিনী মাতার কোঁঠরাগত চক্ষুতে, ক্ষুধার আগুন বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জের রিক্ত নিঃস্ব মানুষের বাঁচিয়া থাকার স্বপ্ন-সাধকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ছারখার করিতে উদ্যত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১, ১৯৭৪

রাজধানীতে জঙ্গী ভুখা মিছিলের দাবি 'ভাত দাও, কাপড় দাও, নইলে গদী ছেড়ে দাও'

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ৩, ১৯৭৪

এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার

মৃত্যুর লোমশ থাবা হানা দিয়া চলিয়াছে রাজধানীর ফুটপাথে---নিরন্ন অনাহারক্লিষ্ট মানুষের অস্থি কঙ্কালসার দেহ প্রতিদিনই ঢলিয়া পড়িতেছে স্টেডিয়ামের চত্বরে, গুলিস্তানের জনাকীর্ণ ফুটপাথে, সদরঘাটের টার্মিনালে কিংবা কমলাপুর স্টেশনের সদাব্যস্ত প্লাটফর্মে। শুধু এক মুষ্টি অন্নের জন্য হন্যে হইয়া ঘোরে নগ্ন-অর্ধনগ্ন নারী পুরুষের দল। পাষাণ প্রাচীরে

মাথা ঠুকিয়া অবশেষে যখন তাহারা ফিরিয়া আসে তাহাদের ভাসমান আস্তানায়, তখন হয়তো দেখিতে পায়, আদরের সন্তান, পতিপরায়ণা স্ত্রী, স্নেহময়ী মাতা-পিতা অথবা পরমপ্রিয় অনুজ সমস্ত দুঃখকষ্টের অনেক উর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৪, ১৯৭৪

শুধুই খাবার চাই

হিংস্র ক্ষুধার কাছে পরাভব মানিয়া নীতিবোধকে বিসর্জন দিয়া মানুষ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে বিত্তবানদের গোলায়। ধান চাউল, আহার্য, বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে। ময়মনসিংহের নালিতাবাড়ী, ঘাগড়া, ভাটপাড়া, রাজনগর, মারোয়ারপাড়া হইতে সংবাদদাতারা এই খবরই দিতেছেন যে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসে। খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করে না। শুধু খাদ্য, প্রাণ ধারণের অন্ন চাহে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৫, ১৯৭৪

আজ বিশ্ব শিশু দিবস

আজ ৭ই অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবস। এবারের শ্লোগান 'প্রত্যেকটি শিশুর জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ চাই।' এক মর্মভেদী প্রেক্ষাপটে এবার বাংলাদেশে বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হইতেছে। রাজপথে কঙ্কালসার শিশুর অসহায় কান্না।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৭, ১৯৭৪

বিভিন্ন স্থানে অনাহারে মৃত্যুর খবর

দিনাজপুর হইতে ২২ জন, ময়মনসিংহের শেরপুর টাউন হইতে ১৫ জন, ঢাকার ৩টি থানা হইতে ১৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৮, ১৯৭৪

ক্ষুধার একচ্ছত্র রাজ্যে জীবন্ত কঙ্কাল

সাত কোটি মানুষের ভাগ্যের প্রতিনিধি—প্রতিবাদহীন এক কিশোর দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলাদেশে আজ সর্বভুক ক্ষুধার একচ্ছত্র আধিপত্য। কি নিষ্ঠুর যন্ত্রণার শিকার হয়ে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ধুকে ধুকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। গত একমাস ধরে ঢাকা শহরের দোরে দোরে মাথা খুঁড়ে মরা পনেরো বছরের হায়দার তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ১০, ১৯৭৪

খাদ্যাভাব : মৃত্যু : ত্রাণ তৎপরতা ও মিছিল

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১১, ১৯৭৪

ঢাকায় প্রতিদিন গড়ে ৮৪ জনের লাশ দাফন

রাজধানীতে মৃত্যুর হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক বেসরকারী পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, শহরে প্রতিদিন গড়ে ৮৪ ব্যক্তি প্রাণ হারাইতেছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১৩, ১৯৭৪

'একটু ফেন দাও গো পুরবাসী ....'

একটু ফেন দাও গো পুরবাসী ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০০ ০। তিরিশ বছর পর এ বাংলায় আবার ফিরে এসেছে সেই আহ্বান। ফিরে এসেছে সেই অতি পরিচিত দৃশ্য, ফেনের প্রতীক্ষায় কুকুর মানুষের পাশাপাশি অবস্থান আর ফেন নিয়ে কাড়াকাড়ি।

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ১৫, ১৯৭৪

"শতাব্দির ভয়াবহতম এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী কারা ক্ষমতাসীনরা জবাব দাও

—সোনার বাংলা অক্টোবর ১৬, ১৯৭৪

কোটি কণ্ঠের আর্তিতে এবারের ঈদ বিবর্ণ

দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার ক্ষত প্রান্তরে অনাহারক্লিষ্ট, মৃত্যুব্যথিত বাঙালীর জীবনে ঈদুল ফিতর সমাগত। শুধু 'আধমরা কৃষকের' ঘরেই নহে এবার লক্ষ লক্ষ পরিবারেই 'হররোজ রোজা', প্রতিটি সূর্যোদয়ের ন্যায়ই ঈদের দিনের সূর্যও একই সংবাদ বহন করিয়া আনিবে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ১৬, ১৯৭৪

লঙ্গরখানার নামে মৃত্যুর ফাঁদ

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভুখা মানুষের দু'মুঠো অন্ন সংস্থানের উদ্দেশ্যে সারা দেশে হাজার লঙ্গরখানা ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই লঙ্গরখানা চালু করা হয়েছে তা শুধু ব্যর্থতায় পর্যবসিত। লঙ্গখানায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্যে তা চরম অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে।

—সোনার বাংলা অক্টোবর ১৬, ১৯৭৪

রাজধানীতে গড়ে ২০টি লাশ দাফন

ঈদের দিন হইতে গতকাল (রবিবার) পর্যন্ত রাজধানীতে ৪১টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হইয়াছে বলিয়া গতকাল আঞ্জুমান-ই-মফিদুল ইসলামের প্রধান কর্মসচিবের সহিত যোগাযোগ করিয়া জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২১, ১৯৭৪

এই ক্ষুধার রাজ্যে আর পারিলাম না

চরম খাদ্যাভাব ও অনাহারের করুণ কাহিনী জানাইয়া প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিভিন্ন সূত্রে খবর আসিতেছে। খোদ রাজধানীর পথে-ঘাটেও ঝরিয়া পড়িতেছে অনেক প্রাণ।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২২, ১৯৭৪

রংপুর জেলায় প্রতিদিন অনাহার ও কলেরায় সহস্রাধিক লোক মরিতেছে

রংপুর জেলায় প্রতিদিন গড়ে এক হাজারেরও বেশী লোক অনাহার এবং কলেরায় মৃত্যুবরণ করিতেছে। পথে-ঘাটে মানুষের মৃতদেহ এক বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২৩, ১৯৭৪

"প্রধানমন্ত্রীর উক্তি অবাস্তব : বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে।' মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি'র উদ্যোগে ৫৭ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ২৪, ১৯৭৪

সে দৃশ্য বর্ণনাতীত

সমগ্র রংপুর জেলার ক্ষুধার্ত মানবতার কান্না সভ্যতার দুয়ারে আঘাত হানিতে শুরু করিয়াছে। শহরে-গ্রামে-গঞ্জের পথে-ঘাটে যেন লাশের মিছিল। পরিস্থিতি এমনই ভয়াবহ যে, একমাত্র রংপুর জেলাতেই প্রায় ৫ লক্ষ নারী পুরুষ ও শিশু মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২৪, ১৯৭৪

'হেরিনু জননী মাগিছে ভিক্ষা, ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ'

দুঃখিনী বাংলার লাখো-কোটি ভুখা নাঙ্গা মানুষের জীবনে আজ ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর মৃত্যুর অন্ধ-তমসা। মৃত্যুর ছায়া এখানে দীর্ঘতর হইতেছে—অনাহারের লোমশ থাবা ক্রমশঃ সমগ্র জনশক্তির টুটি টিপিয়া ধরিতে উদ্যত। রংপুরের কুড়িগ্রামে, গাইবান্ধায়, নীলফামারীতে সন্তানহারা মায়ের বিলাপ-ধ্বনি, ক্ষুধার্ত শিশুর আর্তক্রন্দন আজ অনুরণন তোলে গোটা বাংলাদেশে। সারি সারি মৃতদেহের শেষনিঃশ্বাসে ঝড় ওঠে। লাশের বক্র দেহভঙ্গীতে জিজ্ঞাসার চিহ্ন 'আমরা কি বাঁচার অধিকারটুকুও হারাইয়াছি।'

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২৪, ১৯৭৪

ক্ষুধা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য

কয়েকদিন ক্রমাগত উপবাসের পর ক্ষুধা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য একটি হতভাগ্য পরিবারের ৭ জন সদস্যই আটার সংগে বিষ মিশাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২৫, ১৯৭৪

চারিদিকে শুধু মৃত্যুর বীভৎস চিত্র

মৃত্যু আর মৃত্যু। গাইবান্ধা তথা সমগ্র রংপুর জেলার চারদিকে শুধু মৃত্যুর বীভৎস চিত্র। গাইবান্ধা মহকুমায় বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় সাত শত লোক অনাহার, কলেরা এবং পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করিতেছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২৭, ১৯৭৪

বাজার দরের রকেট গতি

চাল—৯, আটা—৭।।, লবণ—৮, শুকনা মরিচ—৮০, কাঁচা মরিচ—৩০ টাকা

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ২৮, ১৯৭৪

খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও আমদানীর পরিমাণ চাহিদার চেয়ে দেড়গুণ বেশী—তবুও দুর্ভিক্ষ কেন? ৩ বছরে ৫০ লক্ষ টন চাল পাচার করা হয়েছে

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ২৯, ১৯৭৪

রংপুরের লঙ্গরখানায়

দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ক্ষুধার গ্রাস আজ এক শ্রেণীর অসাধু টাউট দুর্নীতিবাজের লোভের রসনাকেই পরিতৃপ্ত করিতেছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ২৯, ১৯৭৪

২৭টি লাওয়ারিশ লাশ দাফন

আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম গতকাল (বুধবার) রাজধানীর বিভিন্ন স্থান হইতে ২৭টি লাওয়ারিশ লাশ দাফন করিয়াছে।

—ইত্তেফাক অক্টোবর ৩১, ১৯৭৪

বরিশালে অনাহারে ১২৬ ব্যক্তির মৃত্যু

বরিশাল জেলায় গত ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত ১২৬ ব্যক্তি অনাহারে মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং ৩৪ হাজার গবাদিপশু খাদ্যের অভাব ও বিভিন্ন-রোগে মারা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ১, ১৯৭৪

দুর্ভিক্ষপীড়িত নীলফামারীতে প্রতিদিন শতাধিক লোক মৃত্যুর শিকার হইতেছে

নীলফামারী মহকুমায় অনাহার, অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণের বিষক্রিয়া এবং কলেরায় প্রতিদিন গড়ে শতাধিক লোক মারা যাইতেছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২, ১৯৭৪

দাদনের বিনিময়ে ৪০ টাকা মণ দরে ধান?

বিরল থানা ও পঞ্চগড় থানার বিভিন্ন গ্রামের দরিদ্র চাষিগণ ধনী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ধানের উপর দাদন লইতে বাধ্য হইতেছে। দাদনের শর্ত অনুযায়ী আগামী মৌসুমের আমন ফসল কাটার পর ব্যবসায়ীদিগকে ৪০ টাকা মণ হিসাবে ধান দিতে হইবে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে এলাকার অধিকাংশ চাষী ভিক্ষুকে পরিণত হইবে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে।

জামালপুরেও একই অবস্থা

গারো পাহাড়ের পাদদেশীয় এলাকার সন্নিকট হইতে সানন্দবাড়ীর নদীর পাড় পর্যন্ত শতাধিক মাইলের দরিদ্র কৃষকদের বর্তমান আর্থিক অবস্থার সুযোগ লইয়া মাড়োয়াড়িগণ আগাম টাকা দিয়া ধান ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি আদায় করিতেছে। যে কোন অবস্থায় তাহারা দেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে আমন ধান পাচার করিবে বলিয়া বিশেষ সূত্রে জানা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২, ১৯৭৪

দুর্ভিক্ষে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু

গতকাল (সোমবার) রাত্রে বিবিসির খবরে প্রকাশ : বেসরকারী হিসাবে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

বেতারে বলা হয় যে, লণ্ডনের একটি পত্রিকার সংবাদদাতা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা রংপুরে গিয়াছিলেন। তিনি জানান যে, শুধু এ এলাকায়ই ২৫ হাজার লোক মারা গিয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২, ১৯৭৪

১৬টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন

আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম কর্তৃক গতকাল (রবিবার) মোট ১৬টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হইয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২, ১৯৭৪

শহরে অনাহারে মৃত্যু : লঙ্গরখানায় আশ্রিতদের স্থানান্তর

গত ১লা অক্টোবর হইতে ২রা নভেম্বর পর্যন্ত ৩৪ দিনে রাজধানীতে অনাহারে ও রোগে কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ৬, ১৯৭৪

আসন্ন শীতে তিন লক্ষাধিক শিশুর মৃত্যুর আশংকা

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার লঙ্গরখানায় আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় ৫০ লক্ষাধিক লোকের মধ্যে দুই হইতে তিন লক্ষাধিক শিশু আসন্ন শীতে বস্ত্রের অভাবে ও অপুষ্টিতে মৃত্যুবরণ করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ৮, ১৯৭৪

উত্তরাঞ্চলে অনাহারে ও কলেরায় দৈনিক দেড় সহস্র লোকের মৃত্যু

উত্তরাঞ্চলের শহরে-বন্দরে-গ্রামে-গঞ্জে এখন অনাহারজনিত মৃত্যুর নিদারুণ বিভীষিকা। পথে ঘাটে মৃত্যুর এই হৃদয় বিদারক চিত্র এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তরাঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রতিটি পরিবার আজ মৃত্যুর ভয়ে ভীত।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ৯, ১৯৭৪

লঙ্গরখানার গম এবং রিলিফ চুরি চলছেই

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ১২, ১৯৭৪

উত্তরবঙ্গে অপুষ্টি : ১০ হাজার শিশুর মৃত্যু
৫৩ হাজার মৃত্যুর দিন গুণছে

—গণকণ্ঠ নভেম্বর ২৩, ১৯৭৪

সরকারী সূত্রের মতে—অনাহার ও অপুষ্টিতে
কুড়িগ্রামে ১৬ হাজার লোকের মৃত্যু

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২০, ১৯৭৪

খাদ্যমন্ত্রীর হিসাব মোতাবেক অনাহার ও রোগে
সাড়ে ২৭ হাজার লোক মারা গিয়াছে

খাদ্যমন্ত্রী জনাব আবদুল মোমেন প্রদত্ত হিসাব মোতাবেক বাংলাদেশের বন্যাজনিত দুর্ভিক্ষের সময় অনাহার ও ব্যাধির ফলে সাড়ে ২৭ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

—ইত্তেফাক নভেম্বর ২৩, ১৯৭৪

বন্যা নয়, দুর্ভিক্ষ নয়, দুর্নীতিই মৃত্যুর কারণ
সাতাশ হাজার নয় সাতাশ লাখ?

অবশেষে খাদ্যমন্ত্রীর সত্য ভাষণের আড়াল থেকে আসল সত্যটা বেরিয়ে এল। গত শুক্রবার সংসদের অধিবেশনে দেশের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির উপর বিবৃতি দিতে গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, অনাহার ও ব্যাধিতে বাংলার সাড়ে সাতাশ হাজার লোক অকালে মৃত্যুর কোলে চলে পড়েছে। এই কথাটার স্বীকারোক্তি দিতে গিয়ে ক্ষমতাসীনদের হৃদয়ে নিশ্চয়ই বহু তকলিফ হয়েছে। তকলিফটা অবশ্য হাজার হাজার লোক অনাহারে মারা গেছে বলে নয় – দাবী করতেন যে, একটি লোককেও না খেয়ে মরতে দেয়া হবে না সেজন্যে।

—সোনার বাংলা নভেম্বর ২৪, ১৯৭৪

অনাহারজনিত কারণে বরগুণায় পাঁচশত ব্যক্তি মারা গেছে

বরগুণা মহকুমার পাঁচটি থানায় ৫০০ শত ব্যক্তি অনাহারজনিত কারণে মারা গেছে বলে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত সংবাদ-এ প্রকাশ।

—সোনার বাংলা নভেম্বর ২৪, ১৯৭৪

দুর্ভিক্ষ : পাঁচ লাখ মরেছে : দশ লাখ মরবে

ক্ষমতাসীনদের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি সংগ্রামী পরিবার থেকে ইতিমধ্যেই ৫ লক্ষ নরনারীকে কেড়ে নিয়েছে। জীবিতরা লড়াই করছে ক্ষুধা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে। অখাদ্য-কুখাদ্য দিয়ে উদরপূর্তি করেও

সমগ্র জাতি ক্রমাগতই এক সকরুণ মৃত্যুর পথেই ধাবিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে নতুন ফলানো ফসল নবান্ন করার মহালগ্নেও পথে পথে লক্ষ লক্ষ ভুখা মানুষের হৃদয়বিদারী আর্তনাদ।

—গণকন্ঠ ডিসেম্বর ৮, ১৯৭৪

একদিনে ৪৮টি লাশ দাফন

গতকাল (বুধবার) আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম রেকর্ডসংখ্যক লাশ দাফন করিয়াছে। সংখ্যা প্রায় ৫০টি।

—ইত্তেফাক ডিসেম্বর ১১, ১৯৭৪

ক্ষুধার জ্বালায়

ফেণীর হরিপুরে সর্বনাশা ক্ষুধার জ্বালায় "ঘাগরা" পাতা সেদ্ধ করে খেয়ে আকবর আলীর পরিবারের ৩ জন সদস্য মৃত্যুবরণ করেছে।

—গণকন্ঠ ডিসেম্বর ২৯, ১৯৭৪

জীবিকার অন্বেষায়

জীবিকার অন্বেষায় তাহারা গ্রাম হইতে শহরে আসিয়াছে। প্রতিদিন সকালে মগবাজার গোল চত্বর, মালিবাগের মোড়, ফকিরের পুল, নারিন্দা পুল, রায়সাহেব বাজার পুল, শহরের এমনি আরও অনেক জায়গায় শ্রম বিক্রয়ের পসরা জমে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২, ১৯৭৫

বস্তি উচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু—

বস্তি উচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু বস্তির মানুষগুলি আছে। ভাসমান পরিবারের আস্তানা এখন রাস্তার ফুটপাথ অথবা খোলা বারান্দা। ছিন্নমূল বিতাড়িত মানুষগুলির যাযাবর জীবনযাত্রা আজ রাজধানীর রাজপথে-জনপদে ছড়াইয়া-ছিটাইয়া আছে।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১৪, ১৯৭৫

ভাসানীর চিঠি

সন্তোষ হইতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী 'দৈনিক ইত্তেফাকে' প্রেরিত এক চিঠিতে লিখিয়াছেন : দেশের চাষী, জেলে, মাঝি, কুলু, টাঙ্গাওয়ালা, গরুগাড়ীওয়ালারা প্রায় ধ্বংসের পথে। কাগমারীর পিতল-কাঁসা শিল্পের একই অবস্থা। বালুচর পড়ায় আজ অধিকাংশ নদীতে নৌকা চলে না। যাহাও বা চলে তাহাও বন্দুক রাইফেল ও পিস্তলওয়ালা ডাকাতের

ভয়ে বন্ধ। টাঙ্গাইলে এই মাঘ মাসেও ধানের মণ ১ শত ৮০ টাকা, শুকনা মরিচের সের ১ শত ৮২ টাকা, জিরার তোলা আড়াই টাকা, সরিষার তৈলের সের ৪০ টাকা। তদুপরি তৈলের মিলে প্রায় ৮।১০ রকম অখাদ্য জিনিসের রস মিশানো হইতেছে।

"বিদেশ হইতে সুতা আমদানী না করিয়া কোটি কোটি টাকার কাপড় আমদানী করা হইতেছে। ফলে বিদেশী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দেশী কাপড় টিকিতেছে না। আদানীকৃত বিদেশী কাপড় গরীব লোকের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব না হওয়ায় ছেঁড়া চট তাহাদের সম্বল হইয়াছে। তাঁতীরা চরম দুর্দশার সম্মুখীন। তাঁত শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইবার পথে এবং গরীব লোকের পক্ষে কম মূল্যে কাপড় পাওয়ার পথ রুদ্ধ হইতে চলিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাকে যে সমস্ত পরামর্শ দেওয়া হইতেছে সরকার উহা কেন গ্রহণ করিতেছেন না, কিছুতেই বুঝিতে পারি না। সমস্যার বাস্তব সমাধান করিতে না পারিলে সরকার যত রকম আইনই পাস করুন না কেন তাহার পরিণাম ভবিষ্যতে আরও খারাপ হইবে। নিজে না বুঝিলে অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করা সরকারের একান্ত উচিত।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ১৮, ১৯৭৫

২৮৬০টি বেওয়ারিশ লাশ

আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম গত জুলাই মাস থেকে পরশু শুক্রবার পর্যন্ত মোট ২৮৬০টি বেওয়ারিশ লাশ রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে দাফন করেছে।

—সোনার বাংলা জানুয়ারী ১৯, ১৯৭৫

চনপাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্র ঘুরিয়া আসিলাম

গতকাল (মঙ্গলবার) পর্যন্ত চনপাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্রে শিশুসহ ১৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। গতকাল কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় দেড় বৎসরের শিশু সন্তানের লাশ লইয়া বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতার লাশ লইয়া তাঁহার ছেলেকে ডেমরা ঘাটে পয়সা উঠাইতে দেখা যায়। তাহারা চনপাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্রের বাসিন্দা বলিয়া দাবি করে। বলে: 'কদিন খইরা খানা নাই, হের পর কাপড় ছাড়া এই শীতে কদিন দম থাকে।'

গতকাল সেখানে আরও একজনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া লোকজন জানায়। ইতিপূর্বেও এ কেন্দ্রে ১৪ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া পত্র-পত্রিকার খবরে প্রকাশ।

—ইত্তেফাক জানুয়ারী ২২, ১৯৭৫

বিচিত্রার দৃষ্টিতে চুয়াত্তরের মন্বন্তর

৭৫-এর ১৫ই আগস্টের পর পুরো একটি বছর কেটে গেলো। সেদিন ১৫ই আগস্টে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এর আগে সাড়ে তিন বছর ধরে ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী সরকার এ দেশে শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের এক ভয়াবহ রাজত্ব কায়েম করে-ছিলো। এই সময়ে বাংলাদেশে ঘটেছে ভয়াবহ মন্বন্তর।

সরকারী হিসেবে বলা হয়েছে, এই মন্বন্তরে সাড়ে সাতাশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারীভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সূত্রে জানা গেছে, ৭৪-এর দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ছিলো ছয় লক্ষেরও বেশী।

এই দুর্ভিক্ষের সূচনা ঠিক চুয়াত্তরে হয়নি, হয়েছে আরো আগে থেকে। বলা যেতে পারে '৭২ সালেই দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গিয়েছিলো গ্রাম বাংলায় যখন চালের দর প্রতিদিন ধাপে ধাপে বাড়ছিলো, সেই সংগে বাড়ছিলো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দর এবং ক্রমশঃ সেগুলো চলে গিয়ে-ছিলো সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। হাজার হাজার কোটি টাকার ধান ও পাট বিদেশে পাচার হয়েছে চোরাপথে। রাষ্ট্রায়াত্ত কল-কারখানায় দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসকরা যাঁরা ছিলেন ক্ষমতাসীন সরকারেরই প্রতিনিধি, তাঁরা শুরু করলেন অবাধ লুণ্ঠন, বিক্রি করে দিলেন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল এবং অন্যান্য শিল্প সামগ্রী।

জাতীয় অর্থনীতির কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লো। বিদেশ থেকে আমদানী করা কয়েক হাজার কোটি ডলারেও সেই ঘাটতি পূরণ হলো না, বরং বিদেশী ত্রাণ সামগ্রীও পাচার হয়ে গেলো সীমান্তের ওপারে।

'৭৪-এর বন্যার সংগে সংগে গ্রাম বাংলার সমগ্র চিত্র সহসা উদ্ভাসিত হলো নগরবাসীর কাছে এবং সেই সংগে সমগ্র বিশ্বাবাসীর কাছে। প্রতি-দিন দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ মারা যেতে লাগলো, লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল জীর্ণ মানুষ শহরে এসে ভীড় জমালো এবং শহরের রাজপথে প্রতিদিন পড়ে থাকলো শত শত বেওয়ারিশ লাশ। বিচিত্রার আলোকচিত্র শিল্পী শামসুল

ইসলাম আলমাজী এই সময়ে প্রচুর দুর্ভিক্ষের ছবি তুলেছেন। এ সব ছবির অধিকাংশই তখন পত্রিকায় ছাপানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেই দলিল-চিত্রগুলো এখনো রয়ে গেছে। এই সমস্ত ছবি স্বৈরাচার ও দুঃশাসনের সাড়ে তিন বছরের বঞ্চনা, শোষণ ও নির্যাতনের প্রামাণ্য দলিল হয়ে থাকবে।

—বিচিত্রা ১৯৭৫

সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় মতামত

দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার চলমান চিত্র পর্যায়ের একটি লেখা চেয়েছিলাম আমাদের পাঠকদের পরিচিত লেখক জনাব মোবাশ্বের হাসানের কাছে। তিনি অক্ষমতা জানিয়ে সম্পাদকের কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছেন তা-ই আমরা প্রকাশ করলাম 'দুর্ভিক্ষে এই বাংলাদেশ' শিরোনামে—। সম্পাদক।

দুর্ভিক্ষে এই বাংলাদেশ

সম্পাদক সাহেব, আমায় ক্ষমা করুন। চূড়ান্ত অক্ষমতা জানিয়ে আমি ক্ষমা চাইছি দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার চলচ্চিত্র লেখবার এ দায়িত্ব থেকে। বিবেকের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে যারা কলম চালাচ্ছি আমি তো তাদেরই একজন। কী স্পর্ধা রাখি আমরা ইতিহাসের এক নির্মম নিষ্ঠুরতাকে লিপিবদ্ধ করার ?

এ পত্র যখন লিখছি ঢাকা নগরীর বুকে তখন ঈদের মৌতাত। তাতে প্রকট হয়ে উঠেছে এ দেশের আসল চেহারা। একদিকে বিদেশী সেন্টের সুবাসে সুবাসিত চোখ ঝলসানো বসন-ভূষণের প্রাচুর্য। অন্যদিকে ছয় হাজার লঙ্গরখানার সামনে মাথা হেট করে দাঁড়িয়েছে বিয়াল্লিশ লক্ষ মানুষ-এক টুকরা রুটির প্রত্যাশায়। লঙ্গরখানার ভাগ্য যাদের জোটেনি, তারা ডাস্টবিনে, হোটেলের বহিঃচত্বরে সারমেয়দের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে এক কণা খাদ্যের জন্যে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনার চরে চরে অভুক্ত নিরন্ন মানুষগুলো খুঁজছে কচু, ঘেচু, কলার ভাগর কোথাও আর অবশিষ্ট রয়েছে কিনা। রংপুরে, গাইবান্ধায় পঁচাত্তর হাজার বুভুক্ষু মানুষের পাইকারী মৃত্যুর পর সেখানে এবং আরো অনেক শহর, নগর, বন্দর, জনপদে ক্ষুধাতুর মানুষ কঁকিয়ে উঠছে নাগালের বাইরের ভুরিভুরি উপাদেয় খাদ্যের সুঘ্রাণে। আমার এই অক্ষম কলম তাদের বেদনাকে মূর্ত করে তুলতে পারবে না সম্পাদক সাহেব।

মৃত্যুশাসিত এ হতভাগ্য দেশে মানবতার চরম লাঞ্ছনা এমনি করেই উত্তীর্ণ হচ্ছে আর এক কঠিন পরীক্ষায়। প্রমাণিত হয়েছে, গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হবার মত নরপিশাচের অভাব এ দেশেও নেই।

কিন্তু এদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে কে ;সম্পাদক সাহেব ?

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের রণোন্মাদনা পঞ্চাশের মন্বন্তর ঘটিয়েছিল এদেশে। একাশির এই মন্বন্তর সৃষ্টি করেছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ নয়, বিদেশী পুঁজি-

তন্ত্র নয়, এ হত্যাযজ্ঞের উৎসবে মেতেছে এ দেশেরই ক্ষমতা লিপ্সু হায়েনার দল। ইতিমধ্যে এরা স্বাক্ষর করেছে ৩৫ হাজারেরও বেশী মানুষের মৃত্যু পরোয়ানা।

সম্পাদক সাহেব, বিবেক অক্ষত রেখে এ কাহিনী আমি কেমন করে শোনাই ?

দুর্ভিক্ষের হোতারা সবাই তো এই নগরীতে বিচরণ করছে, গদীতে গদীতে কাড়ি কাড়ি টাকার স্তূপে তারা ভবিষ্যতের আয়েশ জমাচ্ছে, হালখাতায় লিখছে মুনাফার অঙ্ক, অন্যদিকে ঢলে পড়ছে মানুষ বিনা প্রতি-বাদে চির মৃত্যুর কোলে। বাস্তুভিটা ছেড়ে গেরস্ত নামছে পথে, পেছনে ফেলে আসা গ্রামে গ্রামে চলছে মহাজনদের দাদন উৎসব। এদের শাস্তির কী হবে সম্পাদক সাহেব ?

আমি বিশ্বাস করি না আপনার আশ্বাস। বিচার, শাস্তি, আইন ? তাও দেখেছি। এই ঢাকার যে থানার মরিচের মওজুতদার গ্রেফতার হয়েছিল সেথাকনকার নাটক দেখেছেন এ নগরীর অনেকে। নিরন্ন অভুক্ত পরিবার মাসে একশ পঁচিশ টাকার মাসোহারা পাবে—এই আশ্বাসে এগিয়ে এসেছে কঙ্কালসার এক মিস্তিকুলী। বলেছে 'আমিই মজুতদার'। সাহেবের ঘরে সে নাকি রেখেছিল মরিচ। জেলখানায় দুবেলা খাবার আর পেছনে ফেলে আসা পরিজনের জন্য একশ পঁচিশ টাকার মাসোহারার আশ্বাসে নিশ্চিত হয়ে যে কুলী আজ হাজত খাটছে, আদৌ যদি ফায়ারিং স্কোয়াড হয়—তাদেরই বুক ছিন্ন হবে তপ্ত বুলেটে। তখনও হয়ত নিজের গদীতে বসে দুর্ভিক্ষের আসল হোতারা গুণবে ভবিষ্যতের সুখ।

কিছুই বাকী নেই সম্পাদক সাহেব। পারবেন, রোমান আর ইংলিশ ল'-এর আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করে এনে দিতে ইনসাফ ? পারবেন, ৮৫ হাজার প্রাণনাশের বদলে ৫ হাজার রক্তচোষার ইহলীলা সাঙ্গ করতে ? তাহলে বলি :

সম্পাদক সাহেব, ঢাকার রাজপথে এত লাশ কখনো দেখিনি। রাজ-ধানীর নিশুতির নিস্তব্ধতা ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তকান্নায় খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়েনি কখনো। গ্রাম জনপদের সংবাদদাতাদের আর কখনো লিখতে হয়নি এত মৃত্যু সংবাদ।

দুভিক্ষ বন্যায় সওয়ার হয়ে আসেনি। প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক যাত্রার প্রাক্কালেও নাজেল হয়নি। দুভিক্ষ মাটি ফুঁড়ে ওঠেনি। দুর্ভিক্ষ এদেশে ছিল না। দুভিক্ষ তৈরী করা হয়েছে। ইচ্ছে করে, সুপরিকল্পিতভাবে, সুনিপুণ কারিগরের নৈপুণ্যে করা হয়েছে সৃষ্টি!

ময়মনসিংহের ৮০ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে 'কোন এক' জহুরুন নেছা বিবি কেঁদেছে, ঢাকার লঙ্গরখানা খোলার প্রথম দিনে নিজের নাম ভুলে যাওয়া লোলচর্ম বৃদ্ধ কাঁদেনি। কিন্তু উভয়ের জিজ্ঞাসা এক—কেন এমন হলো?

যে সমাজ লালন করে চলেছেন সম্পাদক সাহেব, এখানে সেই 'কেন'র জবাব দেওয়া যায় না। এখানে অদৃষ্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, ওই শূন্য আকাশের দিকে ইশারা করে বলা হয়ে থাকে, এমনিই হয়।

মিথ্যে কথা, সম্পাদক সাহেব। এমনিতে এমনি হয় না।

লণ্ডন, বোম্বে, কলকাতা, ইসলামাবাদ সব লুটে নিয়েছে, তাতো ৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের আগে। কিন্তু এর পরে? '৭১ আর '৭২-এ চমৎকার ফসল তুলেছে যারা, যারা পুড়িয়ে দিয়েছে ৬৫ লাখ বেলের পাটের কোটা, যারা ভরিয়ে দিয়েছে ভোটের বাক্স—তাদের মৃত্যুপথ যাত্রী হতে হবে কেন? আপনিতেই? স্বয়ংক্রিয়ভাবে?

হ্যাঁ, সম্পাদক সাহেব, আগের শোষণ হস্তচালিত নিষ্পেশনে চললেও এখন স্বয়ংক্রিয়—দাদন উৎসব শুধু মহাজনদের নয়, আর এক দাদন লুটেরা রাজনৈতিক টাউটদেরও। এদের দাদন শুধতে গিয়ে ৫ কোটি মানুষ আজ ফতুর। ব্রিফকেস নিয়ে এরা ব্যবসা বাড়ায়, রাজনৈতিক দেশপ্রেমের ঔদ্ধত্য নিয়ে গ্রামে-মফঃস্বলে খয়রাত বিলাবার ব্যবসায়ে, জমি সিলিং-এর আইন ভুগুল করে অদৃশ্য জমিদারীতে, আন্তর্জাতিক চোরাচালানে, বিদেশে পুঁজি জমিয়ে নতুন স্কীমের আয়োজন করে আবার ডান-বাম হাতের ভেল্কির খেলায় এরা উজাড় করেছে দেশ।

আপনি তো চেয়েছেন দুভিক্ষের চলচিত্র। স্পষ্টতঃই বারণ ভিন্নতর বিশ্লেষণ। কিন্তু সম্পাদক সাহেব, গাইবান্ধা স্টেশনে ১৯শে আগস্ট ৮৮ নং ডাউন লোক্যাল ট্রেন এসে যখন ভিড়েছিল, প্লাটফরমে পড়ে থাকা ক্ষুধায় মৃতপ্রায় লোকটা বুক ঘষে গিয়ে যখন বেচাইন যাত্রীর ওগলে ফেলা বমির ভাতগুলো গোগ্রাসে চেটে নিয়েছে; গাইবান্ধারই ডাকঘরের সামনে,

বঙ্গভবনের দক্ষিণ পাশে, জঠর জ্বালায় বেদিশা কতিপয় নারী-পুরুষ মরা শিশুরা যখন গোগ্রাসে গিলেছে, তখন কি ওই দুভিক্ষের হোতাদের সনাক্ত না করে আমি শুধু বেদনার ছবি আঁকবো? রক্তমাংসের মানুষের কাছে এত ধৈর্য প্রত্যাশা সত্যিই অনুচিত সম্পাদক সাহেব।

শুধুই চলচিত্র আঁকবো? ১৫ই আগস্টের পূর্বদেশের মত 'আজকের বাংলার মুখ'' দেখবো ঐ দিনের জনপদের ভাষায় "বন্যার জলে নিজেদের ছায়ার" মত? কিন্তু ফরিদপুর থেকে কিশোরী পারুল ভেসে এলো কেন খিলগাঁয়ে, কেন দু'সন্তানকে ফেলে উধাও হলো তার বাব-মা। ১৭ই আগস্ট ফরিদপুর ডেট লাইনে দৈনিক বাংলা গোপালগঞ্জ থেকে চরাঞ্চলের যে চিত্র এঁকেছে তাতে বন্যার চেয়ে দুভিক্ষের পরিচয় বেশী। সেখানে এসেই ১৯শে আগস্ট হতবাক হয়ে গেছে এ দেশের তারুণ্যনন্দিত প্রাণবন্ত কলামিস্ট আবদুল গফফার চৌধুরীর কলম, "বেদনার্ত ধ্বনি নজরুলের কবিতার ছন্দে: বন্ধুগো আর বলিতে পারি না বড় বিষজ্বালা এই বুকে---"। কী বিষ, কেন আমরা নীল হয়ে উঠছি, তা বলতে দেবেন না সম্পাদক সাহেব?

বন্যার ত্রাণ শিবিরেই তো দেখেছি মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ। তখন বলা হলো না কেন, আমরা দুভিক্ষে! 'ত্রাণ শিবিরগুলোতে ক্ষুধা আর মৃত্যুর হাহাকার' (জনপদ)—আশ্রিত মানুষ কি নামবে ভিক্ষুকের মিছিলে (বাংলার বাণী)—আমরা কোথায় যাই (দৈনিক বাংলা)—এ সব শিরোনামেও কি চৈতন্যের উদ্রেক হয়নি মাসখানের আগামে।

সুদূর ওয়াশিংটনে বসে মার্কিন কংগ্রেসের সিনেটর প্রতিনিধিগণ—"দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাবার" আবেদন প্রচার করলেন, এখানকার নিম্নচাপ ওখানকার ব্যারোমিটারে ধরা পড়লো, কিন্তু আমরা নির্বাক! আপনাকে নয় সম্পাদক সাহেব, সম্বোধন করতে চাই সেলুকাসকে।

লাকসামে ক'মুঠি গম নিয়ে অবোধ শিশুদের প্রবোধ দিচ্ছে মা। গোপালগঞ্জে সখীচরণ বালার ক্ষুধা জলে উঠেছে চোখের আগুন হয়ে, রংপুর দিনাজপুরে মৃত্যু হয়েছে কয়েক হাজার লোকের, নোয়াখালীসহ কয়েক জেলায় অখাদ্য ভক্ষণের জেরে কলেরায় মরেছে ১৩ শ' লোক, বরিশালের জয়তুন ক্যামেরাম্যানকে কেঁদে বলেছে, "মোগ ছবি তুইল্যা কী করব্যা, খাওন দিয়া যাও" মধ্যবিত্ত পরিবারের মর্যাদাবান মা রমজান বিবি হাত পেতেছে চোখের জলে নেয়ে, সংবাদদাতারা বাগদীর গ্রামের সোনালীর

বৌ, ঘাঘাড়ার তারু বিবি, মানিকের মা, ফুলদির টেকের পিছুন্যার বউ কার্তৈতেলের হাকিমার কথা লিখেছে, ''ওরা ভিক্ষে করে স্বভাবে নয়, অভাবে'' প্রতিদিন ক্ষুধাতুর মানুষের মিছিল এসেছে শহরে, তারা ফিরে যাবার জন্য আসেনি কেউ, রাজ পথে কান্না জেগেছে, 'মোগ খাওন দাও।' গাইবান্ধার প্লাট ফরমে ক্ষুধার্ত মানুষের কথা লিখেছে সংবাদদাতা। এ দৃশ্য সহ্য করা যায় না—তারপরেও ত্রাণ শিবির বন্ধ হলো। বন্যার পালা শেষ হলো।

কমলাপুর স্টেশনে ভীড়। মানুষ কুকুর ভীড় করেছে একই সমতলে, এসেছে নরপিশাচ নারীলোলুপরা। হুসনা বানুরা ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে দশটি টাকার জন্যে কেমন করে স্বামীর নীচু করে রাখা মাথার সামনে থেকে অন্ধকারে হারিয়ে যায় তাও শুনতে হয়েছে। সিলেটে ক্ষুধাভয়ঙ্করী তৃপ্তি খুঁজেছে ব্যাঘ্র মাংসে, শাপলা সেদ্ধ খেয়ে বহুদিন বেঁচে আছে নিবারণ মহেশ, অভুক্ত মানুষদের নিয়ে দাস শিবির খুলেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থলোলুপ পশুরা। পাবনায় জেলে পাড়ার লোকেরা সাংবাদিকদের দেখে কেঁদেছে, ''আমাদের কিছু ব্যবস্থা কইরে দেবান হুজুর'', বাঘের মাংসের পর সিলেটে খেয়েছে মানুষ কচুরিপানা, সেদ্ধ করে খেয়েছে কলার ভাগর। তখনও শহর পানে ছুটে আসছে মানুষ। আসছে তো আসছেই। সন্তান বিক্রি হয়েছে যত্রতত্র সর্বত্র। দেহ বিক্রি হয়েছে রাজধানীতে। শঙ্কা প্রকাশ করেছে পত্রিকা, এ নগরী যেন রমণীকুলের হাট না হয়ে দাঁড়ায়। তারপর লাশের পালা শুরু। শেরপুরে যে মানুষক'টি গতরাতে রাস্তায় ধুকছিল কি আশ্চর্য, পরদিন প্রাতে তারা নিশ্চুপ, একদম অনড়।

ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তচীৎকারে ঘুম ভাঙ্গার শিরোনাম হলো রাজধানীর প্রতিবেদনে, গ্রামের জরীপ বেরুলো সাংবাদিকদের চেষ্টায়, দেখা গেল শত-করা ৮০টি পরিবারে হাতে সপ্তাহ কাটাবার খাদ্য নেই। জমি বিক্রি চললো জলের দরে। সিলেটে অনাহারক্লিষ্ট পিতামাতা হত্যা করলো কন্যাকে, রাজধানীর পথে পথে বিস্ময় : ''এরা জীবিত না কঙ্কাল।'' কবি শামসুর রাহমানের কলমের বিস্ময় : ''এ কোন্ বাংলাদেশ!'' ইত্তেফাক-এর লুব্ধকের ডাকে সাড়া দিয়ে মরমী কবি ফররুখ আহমদ দিয়ে গেলেন লাশ—তা পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখে লেখা কবিতা 'লাশ', নয়—একাশির মন্বন্তরের চূড়ান্ত স্বাক্ষর কবির নিজের লাশ। লাশ দিয়ে গেছে আরো অখ্যাত প্রখ্যাত অনেকে। ক্ষুধার রাজ্যে রুস্তম তার দুই পুত্র ওলেজা আর নওশাদকে সঁপে দিল চির

নিদ্রার কোলে—২২ দিন অনাহার-অর্ধাহারের পর। অস্বাভাবিক, অসহনীয়, ভয়াবহ বিশেষণগুলোর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হলো মফঃস্বল সংবাদে। ডেট-লাইন নেত্রকোণা, মোহনগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, সোনারগাঁ, শাতঘরা, ছাতক সর্বত্র। বগুড়ায় চেষ্টা চললো হাঁস-মুরগীর খাদ্য খেয়ে বাঁচা যায় কিনা। কলেরা ভেদবমি থেকে যারা বাঁচলো তাদের কেউ আত্মহত্যা, কেউ আত্মীয়াকে দেহ দানে নামালো। যে কবির কলম '৬৯-এ লিখেছিল, ঐতিহাসিক সংবাদ শিরোনাম : 'মৃতের জানাজা মোরা কিছুতেই করিব না পাঠ। কবরের ঘুম ভাঙ্গে—জীবনের দাবি আজ এতই বিরাট।—তিনিই আবার '৭৪-এ উদ্ধৃত করলেন, ''রাজপথে এই সব শিশুর কঙ্কাল—মাতৃস্তনহীন। দধীচির হাড় ছিল এর চেয়ে আরো কি কঠিন?''

তারপর এলো লঙ্গরখানার পদাবলী। লাইনে অভুক্ত মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফুরিয়ে যায় খাবার। 'স্রেফ ভূষিগুলো তুলে দেয়া হয় পাতে।' গ্রামে গ্রামে আর এক দাদন। ''লঙ্গরখানাকে ওরা ভয় পায়—সারা দিনে একবার খেতে দেয়!''

সম্পাদক সাহেব, এই পাঁচালিই চেয়েছেন আপনি?

ভয়ানক কাঁদো কাঁদো ভাব নিয়ে লিখে দেবো এ সব কথা, খুব করুণা-ত্মক দ্যোতনা এনে? কিন্তু সম্পাদক সাহেব, তা পারছি কই। এ জন্যেই তো আমি ক্ষমা চাইছি। এদের মৃত্যুতে বিয়োগ ব্যথা নয়, অনুভব করছি পরা-জিতের গ্লানি। স্পষ্টতঃ দেখছি, যারা মরছে, বমি চাটছে, খুবলে খুবলে কাঁচা মাংস খাচ্ছে এরা সবাই এক পক্ষের। অন্য পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে ভীমদর্শন সেই কাপালিক দল, যারা এই মৃতের বক্ষ পরে বসেই শুরু করবে শক্তির পূজো। আমাদের এই নিম্নবিত্ত, নির্বিত্ত লোকদের পতিত কঙ্কাল-সার দেহগুলো ওদের রূপোর চাকতি, কাগজের তুরুপের তুনে বিদ্ধ। দাদন উৎসবগুলোতে যারা জেতার দলে তাদের সফল আক্রমণে পরাভূত পর্যুদস্ত হয়ে আমি কাঁদতে পারি না। আমি ক্রোধে ফুলে উঠছি। সখীচরণ বালার চোখ থেকে সহস্র আগুনের পিণ্ড এসে স্থান করে নিয়েছে আমাদের চোখে। আমরা সংখ্যায় পাঁচ কোটি, ছয় কোটি, সাড়ে ছয় কোটি। এ রণাঙ্গনে কান্না বাতুলতা সম্পাদক সাহেব। ওদের মারণাস্ত্রের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। ওদের চোখে আমরা চোখ রেখেছি। ওদের ওৎ আমরা দেখে ফেলেছি। ওদের ল্যাজ পাকানোর বঙ্কিম ক্রুর হিংসা আমাদের নজরে পড়েছে। আমরা এখন কাঁদবো কেমন করে?

সম্পাদক সাহেব, এ দেশ মাতৃকার মাটি ছাড়া আমাদের আর কোন গত্যন্তর নেই। বিদেশে অর্থ জমিয়ে দেশান্তরের সুযোগ আমাদের নেই। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারও হয়নি এই সাড়ে ছয় কোটি মানুষ। এদের পিঠ এখন দেয়ালে ঠেখেছে। এখন শোকসভার বিলাপ আমাদের জন্য নয়, সম্পাদক সাহেব।

'৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরেই এ দেশে গদীর রাজনীতির মৃত্যু হয়েছে। ক্ষমতালোলুপদের উস্কানিতে পা দিয়ে তাদের কাঁধে বয়ে আমরা আর প্রতারিত হবার পথে পা বাড়াবো না। এ দেশ গদীর নয়, এ দেশ মাটির। এ দেশ রাজনীতিকদের নয়, এ দেশ খেটে খাওয়া মানুষদের। এ দেশের সম্পদ ভাগ্যবান পরিবার বা গোষ্ঠীচক্রের নয়। এ সব এ দেশের মানুষের।

ক্ষমতার কোন্দলে মেতে যারা ভালো কথা বলে এ জর্জরিত দগ্ধীভূত দেহে শঠতার হাত বুলোতে আসে—তারা হঠে যাও। গুপ্তদলের সাথে দহরম-মহরম রেখে ওজারতির গোঁজামিল যারা করছে—তারা হঠে যাও। মৃত্যুশাসিত এ দেশের মৃত্যুন্মুখ মানবতার লাঞ্ছনা ঠেকাবার শক্তি যদি গণমানুষের থেকে থাকে তারা ঠেকাবেই।

ম্যাক্সিম গোর্কির পাভেলের মত উচ্চনিনাদে যারা বলতে পারবে, কাপুরুষ, ভীতুরা তফাৎ যাও, সৎসাহসীরা এগিয়ে এসো।—সেই কণ্ঠই হবে ওই শোষক মৃত্যুব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আসন্ন লড়াইয়ের রণধ্বনি।

সম্পাদক সাহেব, এ দেশ, এ মাটি, এ মানুষ ছাড়া আশাবাদের বিকল্প ভিত্তি কিছু নেই। মৃত্যুর বিষে নীল হয়ে আত্মীয় পরিজনের মৃত্যু দর্শন করে পরমাত্মীয়ের অনাহারক্লিষ্ট মুখ দেখে যদি আমরা জাগি তবে জাগবোই। এ জাগৃতির সূচনা ও পূর্ণতা বিকাশ ও প্রকাশ হবে এই মাটিতে, এই মাটিতে, এই মাটিতে।

জরায় মরা বাম পাশে রেখে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আমরা মাতবো না। জরায় মৃত্যু ঘটিয়ে, লৌহ কঠিন হস্তে জরার শ্বাসরোধ করে আমরা মাতবো অমর এক কালজয়ী সৃষ্টির উল্লাসে।

বাংলার শাশ্বত পাভেল, নিনাদ তোল, সৎ সাহসীরা এগিয়ে এসো, ভীরু কাপুরুষেরা তফাৎ যাও!

নিনাদ তোল, উচ্চ স্বরে, যেন মৃত্যুন্মুখ আমার আত্মার অংশরা মৃত্যুর আগে শুনে যেতে পারে, বুঝে যেতে পারে, তাদের মৃত্যু বৃথা যাবে না।

সম্পাদক সাহেব, আমায় ক্ষমা করবেন। আপনার আদিষ্ট চলচ্চিত্র আমার পক্ষে লিখা সম্ভব হলো না।

—ঢাকা ডাইজেস্ট

রহস্যময় বিভীষিকা

মৃতের মিছিলে বাঙালীরা শরিক হয়েছিল বাঁচার উদগ্র বাসনা নিয়ে। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও মুক্ত আলো বাতাসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ থেকে অনেকেই বঞ্চিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর আত্ম-হননের জিঘাংসিত শিকারে পরিণত হয়েছে এক এক করে অনেকজন। চোরাগুপ্তাপথে এবং জনারণ্যে প্রকাশ্যে যাদের ভবলিলা সাঙ্গ হয়েছে তারা আর যাই হোন তারা এদেশেরই মানুষ এবং এদেশের একশ্রেণীর মানুষের নির্মম নিষ্ঠুরতার জলন্ত সাক্ষী তারা।

লাখ লাখ প্রিয়জন হারা পিতামাতা বোনের ব্যথাহত কান্নার ভারে যেখানে বাংলার আকাশ-বাতাস আজো ভারাক্রান্ত সেখানে নতুন করে প্রিয় হারানোর কান্নার রোল জাগিয়ে কাদের কি লাভ হচ্ছে আমরা জানি না। আমরা বাংলার মানুষ, নিরবচ্ছিন্ন শান্তিই আমাদের কাম্য। শান্তি, স্থায়ী শান্তির জন্যই আমরা রক্তাক্ত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। অথচ স্বাধীনতার পরও ইপ্সিত সে শান্তি আমাদের দুয়ারে ধর্ণা দিল না। সামষ্টিক এই দুঃখে তাই ঘুরে ফিরে গুমরে গুমরে মরছে। কে এই দুঃখ মোচন করবে? এ প্রশ্নেরও উত্তর নেই কে দেবে তার জবাব।

এ কথা তিক্ত হলেও সত্য যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দাম এ প্রাণ-বন্যায় তোলপার করা পাগল পারা মানুষগুলো আজ নেতিয়ে গেছে। হতাশার বেড়াজালে সংগ্রামী সে মানুষগুলো আজ ধুকে ধুকে মরছে। স্বাধী-নতার যে চিত্র মানসপটে আঁকা ছিল বাস্তবতার নির্মম কষাঘাতে তা মিইয়ে গেছে। একদিকে দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন উর্ধ্বগতি, অন্যদিকে নিরাপত্তাহীন জীবন এই দু'য়ের টানা-পোড়নে বাংলার মানুষ আজ সত্যি দিশেহারা।

—সোনার বাংলা সম্পাদকীয় জুন ১৮, ১৯৭২

দোহাই আটা চলাচলে বাধা দিবে না

জামালপুর হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা তারযোগে জানাইয়াছেন ঢাকা হইতে এখানে আটা আনয়নে পুলিশ বাধা প্রদান করায় গত এক সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে আটা দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে বাজারে

আটার সের পাঁচ টাকা বিশ পয়সা, ভূষির সের তিন টাকা, আউশের চালের সের সাত টাকা, আমন আট টাকা, ধানের মণ একশ ষাট টাকা, লবণের মণ দু'শ টাকা।

ধান, চাল, গম, আটা ও অন্যান্য জিনিসের দাম বাড়াটা এদেশে নতুন নয়। কিন্তু এতদিন বাড়িতেছিল ক্রমে ক্রমে। এখন অর্থাৎ ভাদ্রের শেষ দিক হইতে বাড়িতেছে উল্লম্ফনে। এক সপ্তাহ আগে চাল ও গমের সের নিঃসন্দেহেই অন্ততঃ এক টাকা কম ছিল। সপ্তাহকালের মধ্যে গমের সের সোয়া পাঁচ, সাড়ে পাঁচ টাকা এবং আউশ বা ইরির চাল সাত টাকায় উঠিয়াছে।

১৩৫০-এর মন্বন্তরের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে একমত হইবেন যে, গ্যাপলিং গতিতে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি গুরুতর অশুভ ইঙ্গিতই বহন করে। এই সময়ে লোকে যেভাবে হউক যেখান হইতে হউক যে-কোন ধরনের হউক কিছু খাদ্য জোটাইয়া জান বাঁচাইবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই সময়ে যদি আইনের খুঁটিনাটি প্রশ্ন তুলিয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে খাদ্য চলাচলে বাধা দেওয়া হয় অথবা প্রশাসনিক যষ্টি উদ্যত করিয়া সাত টাকা সেরের চাল সাড়ে তিন টাকায় বেচিতে বাধ্য করা হয়, তবে যে-মহাবিপর্যয়টা দুইদিন পরে আসিত তাহা দুইদিন আগেই আসে। কারণ, বাজার হইতে জিনিসই তাতে উধাও হইয়া যায়।

১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষে বাংলার চল্লিশ লক্ষ লোক মারা গিয়াছিল। অথচ দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের মতে সে-বছর বাংলার খাদ্য ঘাটতি ছিল মাত্র সাত সপ্তাহ বা অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ দিনের। দেশের অন্যান্য উদ্বৃত্ত অঞ্চলে তখনও এত প্রচুর গম ও চাল ছিল যে, উহা সময়মত আনিতে পারিলে বাংলার সাত সপ্তাহের ঘাটতি মিটানো আদৌ কঠিন হইত না। কিন্তু যুদ্ধের কারণে খাদ্য চলাচলে ছিল তখন গুরুতর অসুবিধা।

..আমরা জানি, বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায়, বিশেষতঃ রাজধানী ঢাকায় যেমন বহু লক্ষ অতিরিক্ত রেশনকার্ড আছে তেমনি আছে কার্ডবিহীন কয়েক লক্ষ ভাসমান নাগরিক। এরা বাড়তি কার্ডের গম বা আটা কিছু অতিরিক্ত দামে সংগ্রহ করিয়া মফঃস্বলে লইয়া যায়। কেউবা বেচে। কেউবা খায়। কমলাপুর স্টেশনে গেলে দেখা যাইবে, যাত্রীরা ট্রেনের উপরে বা ভিতরে শত শত আটা বা গমের পুটলি লইয়া চলিয়াছে আগে হয়ত পুলিশ বা রেল কর্মচারীরা হুমকি দিতেন। এখন চারিদিকে ঘনায়মান অবস্থা দেখিয়া

আর কিছু বলেন না। রেশনের মাল এভাবে মফঃস্বলে পাচার আইনসম্মত নয় বটে, কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে, শহরের এই আটা গমটুকু পাইয়াই মফঃস্বল এখনও অনেকটা ঠাণ্ডা আছে। এখন যদি আইনের কঠোর প্রয়োগ দ্বারা এর চলাচল বন্ধ করা হয় তবে মফঃস্বলের হাহাকার অচিরাৎ আরও বাড়িয়া যাইবে, নিদারুণ সঙ্কটাপন্ন পকেটগুলির বাঁচিবার আর কোন উপায় থাকিবে না।

---ইত্তেফাক সম্পাদকীয় আশ্বিন ৪, ১৩৮১

ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে—

ঘরে আগুন লাগিয়াছে। এখন বসিয়া থাকার সময় নয়। ক্ষুদ্র ও দলীয় স্বার্থচিন্তা বিসর্জন দিয়া সবার আগে আগুনের গ্রাস হইতে ঘরকে রক্ষা করা প্রয়োজন। সম্ভবতঃ এই বোধ হইতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ জন শিক্ষাবিদও ঐক্যবদ্ধ জরুরী কর্মপন্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন। গতকাল সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক যুক্ত বিবৃতিতে তাঁহারা বলিয়াছেন, উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদিকা শক্তির ব্যবহারে নিদারুণ ব্যর্থতা, জনশক্তির বিপুল অপচয় ও বন্যার ছোবলে ক্ষতবিক্ষত দেশ আজ মহা-মন্বন্তরের করাল গ্রাসে নিপতিত। পথে-ঘাটে গ্রামে-গ্রামান্তরে প্রত্যহ মানুষ না খাইয়া মরিতেছে। এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকারার্থ তাঁহারা কতিপয় সুপারিশ করিয়াছেন। যথা---জাতীয় পর্যায় হইতে ইউনিয়ন পর্যন্ত সর্বদলীয় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠন, চোরাচালান রোধ ও দেশের অভ্যন্তরে মাল সরবরাহে সেনাবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাবতীয় অনুষ্ঠান পার্বণ-অপব্যয়-উৎসব বর্জন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ব্যক্তিগত ব্যবহার বন্ধকরণ প্রভৃতি অন্যতম। শিক্ষাবিদগণ বলিয়াছেন, অবস্থা আজ এমন স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য অভিভাবকদের দুগ্ধপান বন্ধ করা উচিত। তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ এবং অপচয়-অপব্যয় মুক্ত পরিবেশ গঠন সরকারের পক্ষেই সহজ ও সঙ্গত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় আশ্বিন ১৪, ১৩৮১

এই নিষ্ক্রিয়তা ভয়াবহ

দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছে। সাড়ে সাত কোটি অধিবাসীর মধ্যে অন্ততঃ সাড়ে পাঁচ কোটি লোক বিপন্ন ও ক্ষুধার্ত। প্রতিদিন অনাহারে শত শত মানুষ মৃত্যুবরণ করিতেছে। দেশের প্রত্যেকটা গ্রামে

মৃত্যুর করাল ছায়া, নিরন্ন ও অসহায় মানুষের আর্তরব। গ্রাম ভাঙ্গিয়া
হাজার হাজার মানুষ খাদ্যের আশায় শহরে পাড়ি জমাইতেছে। রাস্তা-ঘাটে
জীবন্ত কঙ্কালের মিছিল। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় নর-
নারী ও শিশুর লাশ। রংপুরসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় আজ দাফন করার
লোকও পাওয়া যায় না। গোদের উপর বিষফোঁড়ার ন্যায় আবার দেশের
নানান স্থানে ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে মহামারী। প্রতীকি ভাষায়
বলিতে গেলে, মৃত্যু যেন দশ হাত বিস্তার করিয়াছে। সরকার দেশের
নানাস্থানে এক অনুমোদিত হিসাব মোতাবেক ৪৫০০টি লঙ্গরখানা খুলিয়া-
ছেন। আরও লঙ্গরখানা খোলার উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে। বেসরকারী
পর্যায়েও কতক কতক স্থানে লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু
দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার তুলনায় এই ব্যবস্থা নিতান্তই ন্যূন। অবস্থা দিন দিনই
ভয়াবহতর হইয়া উঠিতেছে। বলিতে গেলে নৃশংস একটা যুদ্ধজনিত অব-
স্থার চাইতেও শোচনীয় ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছে দেশের মানুষ।

..দেশের এমন ভয়াবহ অবস্থা, অথচ দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় না যে,
তদ্দরুন দায়িত্বশীলদের টনক নড়িয়াছে। চরম দুর্ভিক্ষাবস্থা মোকাবেলা
করার জন্য সরকারী কার্যতৎপরতা পর্যাপ্ত নয়। দেশ গোল্লায় যাউক, দায়িত্ব-
শীলদের যেন তাহাতে বিশেষ কিছু করার নাই, এইরূপ দুর্বহ লক্ষণ পরিদৃষ্ট
হইতেছে। আগের মতই ফাইলের গোলক ধাঁধার নিমজ্জিত প্রশাসন যেমন
নির্জীব, তেমন নিষ্ক্রিয়। জরুরী অবস্থায় প্রশাসনকে এবং অন্যান্য দায়িত্ব-
শীল সংস্থাকে কিভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রয়োজনে সংহত, গতিশীল
ও কার্যতৎপর করিয়া তুলিতে হয়, তাহা যেন সরকারী বড়-কর্তাদের অজ্ঞাত
দেশের অন্ততঃ সাড়ে পাঁচ কোটি লোক আজ ধ্বংসের মুখে পড়িয়াছে, অথচ
আমাদের গোটা প্রশাসন আজও তেমনি নিশ্চল, নিরুদ্বেগ ও নিষ্ক্রিয়!

শুধু তাহাই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও অব্যবস্থা ও দুর্নীতি চরম হইতে
চরমতর পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। রেশন ব্যবস্থায় ফাঁকি দিয়া নিরন্ন মানুষের
জন্য বরাদ্দকৃত লাখ লাখ মণ চাউল ও আটা প্রতি মাসে চুরি হইতেছে।
বণ্টন ব্যবস্থার দুর্নীতিও সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট দফ-
তরসমূহ এই ব্যাপারে কিছুই করিল না, কিছুই করিতে পারিল না। ইহা
ধ্রুব সত্য যে, বণ্টন ব্যবস্থাকে মোটামুটি দুর্নীতির উর্ধ্বে রাখিতে পারিলে
খাদ্যসংকট এমন মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছিত না। দায়িত্বে ন্যস্ত ব্যক্তিবর্গ
এবং সংশ্লিষ্ট দফতরকে আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, বণ্টন-ব্যবস্থার

দুর্নীতি উচ্ছেদের ব্যবস্থা আপনারা কেন করেন নাই, কেন নিতে পারেন
নাই,—আইন বিধিসহ প্রয়োজনীয় ক্ষমতা তো আপনাদের হাতে তুলিয়া
দেওয়া হইয়াছে? বণ্টন ব্যবস্থার এহেন দুর্নীতি, কারচুপি ও অপতৎপরতা,
অন্যদিকে চোরাচালান অব্যাহত চলিয়াছে, চোরাচালানের স্রোত শতমুখী
হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকটা ফসলের মৌসুমে এক শ্রেণীর
অপরিচিত লোক ও তাহাদের স্থানীয় টাউটরা সীমান্তবর্তী এলাকার হাটে-
বাজারে ধান, চাউল ও পাট কিনিতেছে এবং দেশের বাহিরে পাচার
করিয়া দিতেছে। সেই শ্রেণীর বিদেশী লোক এমনকি মাঠের ফসলও নাকি
আগাম কিনিয়া নেয়। শুধু ধান, চাউল ও পাট পাচারই নয়, আমদানীকৃত
বহু যন্ত্রপাতি এবং দ্রব্যসম্ভারও পাচার হইয়া যাইতেছে।

বহুবার আমরা আবেদন জানাইয়াছি যে, সীমান্তের পাহারা কার্যকর ও
জোরদার করা হউক। বহুবার বলিয়াছি যে, সময় থাকিতে চোরাচালানের
রুই-কাতলদের ধরিয়া চরম দণ্ড দেওয়া হউক। চোরাপথে পাচার করিয়া
দেশের কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করা হইতেছে, পাট শিল্পকে প্রায় ধ্বংসের
মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, দেশটাকে স্থায়ী খাদ্যঘাটতির মুখে
ফেলা হইতেছে, অথচ সরকার সীমান্ত পাহারার ব্যবস্থা নিয়া ও আইন-
শৃঙ্খলা এজেন্সির তৎপরতা অব্যাহত রাখিয়াও বড় বড় চোরকে ধরিতে
পারিলেন না? বড় বড় চোর কারা, বড় বড় চোর কোথায় থাকে, অতঃপর
এই প্রশ্নটিই মনে উদিত না হইয়া পারে না।

ইত্তেফাক সম্পাদকীয় কার্তিক ৮, ১৩৮১

কেন শুধু নাই, নাই, নাই

সচী মাতা বলে নিমাই নিমাই, প্রতিধ্বনি বলে নাই, নাই, নাই।
কবির সেই কথাটা দেশে আজ কি নিদারুণভাবেই না বাস্তব সত্য হইয়া
উঠিয়াছে। একটানা নাই, নাই, নাই শুনিতে শুনিতে অবশেষে 'ডাকঘরে
খাম নাই' এ কথাও শুনিতে হইল। খবরে প্রকাশ, গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া
রাজধানীর অনেক ডাকঘরেই খাম পাওয়া যাইতেছে না। এক সহযোগী
লিখিয়াছেন যে, ব্যাপারটা নাকি পি. এম. জি'র জানা নাই। রাজধানীর
ডাকঘরগুলির জনৈক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবশ্য 'খামের কিছুটা সংকটের'
কথা স্বীকার করিয়াছেন। রাজধানী নগরীতেই যদি পোস্টাল এনভেলপের
এরূপ দুষ্প্রাপতা দেখা দিয়া থাকে তবে মফঃস্বলের অবস্থা কি, তা
সহজেই অনুমেয়।

শুধু ডাকঘরেই খামের অভাবে নয়, আয়কর রিটার্ন দাখিলের ফর্মের অভাবে, এমন কি সরকারের ঘরে টাকা জমা দিবার ট্রেজারি চালানের অভাবেও মানুষকে কম দুর্ভোগ পোহাইতে হয় না। নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বহু লোককে সম্প্রতি দুই এক টাকা দামে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফর্ম ও আট আনা এক টাকা দামে টি. আর. ফর্ম কিনিতে হইয়াছে। অথচ এসব ফর্ম কোনকালে পয়সা দিয়া কিনিতে হয়, এরূপ আমরা শুনি নাই। কি জানি কবে টেলিগ্রাম ফর্ম, মনি অর্ডার ফর্ম, এ্যাক-নলেজমেন্ট ডিউ ফর্ম, পোস্টাল রেজিস্ট্রেশন ফর্মও কালোবাজারে কেনার কথা আমাদের শুনিতে হইবে। বস্তুতঃ যে যেভাবে পারিতেছে পাবলিকের গলা কাটিতেছে। কেউ বা ছুরি দিয়া কাটিতেছে, কেউ বা কাটিতেছে ভোঁতা দাও দিয়া। অনুগত নাগরিকের একমাত্র কাজ হইতেছে বিনাবাক্য ব্যয়ে গলাটা পাতিয়া দেওয়া।

ভোগ্য ও ভোজ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণ না হয় বোঝা যাইতে পারে। উহার সহিত মুদ্রাস্ফীতির ন্যায় অর্থনৈতিক কারণ বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু টি. আর. ফর্ম, আয়কর রিটার্ন ফর্ম, পোস্টাল এনভেলপ, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প প্রভৃতির দুষ্প্রাপ্যতার কারণ বোঝা দুষ্কর। স্ট্যাম্পের ব্ল্যাকমার্কেট রেট পাঁচ পার্সেন্ট বা ততোধিক উঠা শুধু অবিশ্বাস্য নয়, একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। এসব জিনিসের ব্যাপারেও শুধু নাই, নাই, নাই আর কতকাল শুনিতে হইবে?

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় কার্তিক ২৬, ১৩৮১

''কি দিয়া ঠেকাইব''

ত্রিশ বৎসর যাবত গ্রামে চৌকিদারি করিতেছেন, এরূপ একজন চৌকিদার গত রবিবার ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারী সমিতির জাতীয় সম্মেলনে গ্রাম্য চৌকিদারদের মানবেতর জীবন যাপনের একটি বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, ''ও. সি. সাহেবের গালি, মেম্বর সাহেবের ধমক, চেয়ারম্যান সাহেবের বাজার, সি. ও. সাহেবের মেয়ের বিবাহে কাজ এবং বাজারের ব্যাগ টানাসহ চোর ধরা, শহর হইতে কোন বড় সাহেব গ্রামে গেলে তাঁহার খেদমত করা, কাজের বিনিময়ে খাদ্যের গম পাহারা দেওয়া---সবই আমাদের করিতে হয়। আর এজন্য বেতন পাই মাত্র ৭৫ টাকা। যাহা দিয়া একমণ চাউলও কেনা যায় না।'' তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, ''এই অবস্থায় আমার ছেলে চোর হইলে কি দিয়া ঠেকাইব?''

দীর্ঘদিনের চৌকিদারি চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই চৌকিদারের জবানীতে চৌকিদার দফাদারদের দুঃসহ জীবন যাত্রা তো বটেই, সেই সঙ্গে বর্তমান গ্রামবাংলার আংশিক সমাজ চিত্রও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

—ইত্তেফাক সম্পাদকীয় অগ্রহায়ণ ১২, ১৩৮৫

মঞ্চে-নেপথ্যে

..দাম বাড়িয়াছে সব কিছুরই। বাড়িয়াছে একশ হইতে আটশ ভাগ।
সোনার ভরির দাম উঠিয়াছে ১০৪০ টাকায়। অর্থনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা এর
ভেদ বোঝা যায় না। এর কারণ-টারণের নাগাল পাওয়া যায় না। কোথাও
চাউল ১২৫ টাকা আবার কোথাও ২২৫ টাকা। জামালপুরে নাকি বীজ
ধানেরই মণ ২৩০ টাকা। বলুন. অর্থনৈতিক তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা এর কি ভেদ
বুঝিবেন!

..রাজকোষে টাকা নাই, তাতে কি? কেন্দ্রীয় ব্যঙ্কের গৌরীসেনরা ত
আছেন। তাঁহারা নোট ছাপাইতেছেন আর 'চাহিবামাত্র দিবার' অঙ্গীকারে
উহা কাঁড়ি কাঁড়ি ইশু করিতেছেন। নোটের গায়ে লেখা 'চাহিবামাত্র
দিবার' কথাটা দ্বারা যে বাস্তবে সরকারের অর্থ দাবি ও আজ্ঞা পূরণই বোঝানো
হইয়াছে, তাহা আগে বুঝি নাই। টাকার যোগান গত জুলাই হইতে জানু-
য়ারী পর্যন্ত সাত মাসে ১১৫ কোটি বাড়িয়া ৮১১ কোটিতে উঠিয়াছে, আর
পয়লা ফেব্রুয়ারী নাগাদ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নামিয়াছে ৮৪ কোটিতে—
যার দ্বারা বড়জোর চার লক্ষ টন গম বা দুই লক্ষ টন চাউল আন্তর্জাতিক
বাজার হইতে কিনা যাইতে পারে। কিন্তু তাতে বাংলার নব্য ডিউকব্যারন
ভাইকাউন্টদের চিন্তা কি। কেন্দ্রীয় তোশাখানার গৌরীসেনদেরইবা কি ভাবনা!
বিজ্ঞ অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, এক কোটি টাকা বাজারে ছাড়িলে তার
ভেলোসিটি দাঁড়ায় আড়াই কোটি টাকা। কিন্তু কোন কোন মুদ্রানীতি বিশারদ-
দের মতে এক কোটির ভেলোসিটি আজকাল চার কোটি। তা যদি হয়, তবে
৮১১ কোটি টাকা মানি সাপ্লাইয়ের ভেলোসিটি দাঁড়াইবে সোয়া তিন হাজার
কোটি টাকার সমতুল্য। সেই অনুপাতে পণ্য সরবরাহ বাড়ে নাই। কাজেই
খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য কি আর সাধে লাফাইয়া-লাফাইয়া বাড়ে। চাউলের
দাম কি সাধে উঠে দুইশ টাকার উপর।

..সংবাদপত্রে সরকারকে বহু ওয়ানিং দেওয়া হইয়াছে। কোন ওয়ানিং
তাহারা কানে তোলেন নাই। বরং কোন কোন কর্তাব্যক্তি সেই ওয়ানিং-
এর কদর্থ করিয়াছেন। চোরাচালান ''ডেড্সটপের'' ঘুমপাড়ানি গানে তাঁহারা

নিদ্রামগ্ন থাকিয়াছেন। তারপর একদা যখন নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন তখন দশ পনের লক্ষ বেল পাটের ন্যায় দশ পনের লক্ষ টন ধান-চাউলও লোপাট। এবারও সেই সনাতন যুক্তি—'এক হাতমে ঢাল, দোস্‌রা হাতমে তরোয়াল, চোর পাকড়েঙ্গে ক্যায়সে?' সত্যই চোর পাকড়ানো গেল না। চোরাচালান থামানো হইল না। চোখের সামনে সব ফক্কিকার হইয়া গেল। সরকারী প্রকিওরমেন্টের কর্তারা যখন হিয়াক্‌রেংগা হুয়া-করেংগা বলিয়া মালকাছা মারিয়া গদাই লশকরী চালে চাল-ধান সংগ্রহে নামিলেন, ততক্ষণে বাংলার দুর্ভাগা মানুষের মুখের গ্রাস পগার পার হইয়া গিয়াছে। টার্গেটের এক পঞ্চমাংশও তাই অর্জিত হইল না। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে অন্ততঃ দশ লক্ষ টন চাল পাচার হইয়া গিয়াছে—যার আন্তর্জাতিক বাজারদর বর্তমানে চারশত কোটি টাকা। এখন চাল ত দূরের কথা। প্রয়োজনীয় গম আমদানী করারও বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের নাই। বৈদেশিক গ্রান্ট ও ক্রেডিট পার্চেজই এখন ভরসা। সেই ক্রেডিট পার্চেজও গা-লাগাইয়া যথাসময়ে করা হয় নাই। অতএব, যেদিক দিয়াই বিচার করা যাক, এই খাদ্য-সঙ্কট স্বাভাবিক নয়, সম্পূর্ণ ম্যানমেড্‌, মানুষের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি।

বলা হয় বটে, খাদ্যঘাটতি আঠার লক্ষ টন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এটাও কোন বস্তুনিষ্ঠ এস্টিমেট নয়, বরং মনগড়া গেস্টিমেট।

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় এপ্রিল ২, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

..কয়েকদিন আগে অর্থমন্ত্রীও দেশবাসীকে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। কেহ কেহ শরীরে 'এ' ভাইটামিনের অভাব পূরণের জন্য অধিক পরিমাণে শাক-সবজি, তরি-তরকারি খাইবার উপদেশ দিয়াছেন।

"এ" ভাইটামিনের বিষয়ে এই অমূল্য উপদেশ দেশবাসী ভাবে-বর্ণে এতই ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করিয়াছে যে, 'এ' ভাইটামিন আহরণের জন্য লোকে লতাপাতা, কচু-ঘেচুর, বন-বাদাড় পর্যন্ত সাফ করিয়া ফেলিতেছে। বাজারে কচুর লতার সেরও এক টাকা-দেড় টাকা। ঝাড়-জঙ্গলে কচুর পাতা, এলেঞ্চা শাক ও অন্যান্য লতা-পাতা পাওয়াও দুষ্কর। লোক কচি কাঁঠালের কোষা ও কলাগাছের থোড় সিদ্ধ করিয়া খাইয়া শেষ করিতেছে। পাটের পাতা, ডাটার পাতা, কচি গাবের পাতা, শামুক এমনকি বাঁশের কচি মূলও বর্তমানে বেদম খাওয়া চলিতেছে।

..কিন্তু কি আশ্চর্য! এতো ভাইটামিন-সমৃদ্ধ খাদ্য খাইয়াও মানুষের শরীরে পুষ্টি সঞ্চারিত হইতেছে না। মানুষগুলি আরও কেমন যেন হাড়-জিরজিরা হইয়া পড়িতেছে। পাঁজরার হাড়গুলি চামড়ার আবরণ ভেদ করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। যেন এক্স-রে'র ফটো-ফিল্ম। ভিতরের সবকিছু তাতে পরিস্ফুট। শিশু ও ছেলে-মেয়েদের বেশীর ভাগ দেখা যায় পেটফোলা, পদযুগল, পাট-খড়ি, মাথাটা অস্বাভাবিক রকম ডাংগর। নিজ চোখে দেখিয়াছি, ক্ষেত-কামলা বা কোদালের কামলারা এক-নাগাড়ে আধঘণ্টা কাজ করিতে পারে না। এটা কিসের ইঙ্গিত? পুষ্টির অভাবে জনশক্তির এই অবক্ষয় জাতিকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিতেছি?

খাদ্যমন্ত্রী জনগণকে খাদ্যাভ্যাস বদলাইয়া ফেলিবার উপদেশ দিয়াছেন। এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ দিনে তিন বেলা পেট পুরিয়া ভাত খাইত। সকালবেলার নাস্তাও তাহারা ভাতেই সারিত। আর এখন? দিনান্তে দুই একটা রুটি জোটে না, আর ত ভাত! কত লোক দিনের পর দিন ভাতের চেহারা দেখে না, দিনান্তে দুই একটা রুটি বা আটা-গুলা পানি অথবা মিষ্টি আলু খাইয়া প্রাণ-ধারণ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। খাদ্যাভ্যাস বদলানোর মহা-পরীক্ষায় কত লোক আত্মাহুতি দিতেছে তারই কি কোন লেখাজোখা আছে? পৃথিবীর নানা দেশে লোকে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করিতেছে সত্য। তাহাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তনের অর্থ হয়ত সাদা ব্রেডের পরিবর্তে লাল রুটি খাওয়া। জ্যাম, জেলী, মাখনের পরিমাণ হ্রাস করা। চাউল বা রুটির পরিবর্তে কেক, বিস্কুট, পুডিং, পোটাটো চিপস, কর্নফ্লেক, পনির, ফলমূল, দুগ্ধ, ইউগার্ট ও মাংস অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করা। কিন্তু আমাদের দেশের লোকে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করিয়া ভাত, রুটির পরিবর্তে খাইবেটা কি? কোথায় তাদের প্রাণধারণের উপযোগী বিকল্প-খাদ্য? কোথায় পাইবে তারা ফলমূল, দুধ, দৈ ও মাংস? এগুলি কিনিতে যে-পয়সার দরকার, সে পয়সা কয়জনের আছে? করাতের গুঁড়া ও ভূষি মিশ্রিত আটার দাম সেরপ্রতি চার-ছয় আনা কম। সেই ভেজাল আটার জন্যই বাজারে কী ভীড়! বস্তুতঃ এদেশের মানুষ নেহাত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খাদ্যাভ্যাস যত বদলাইয়াছে, পৃথিবীর আর কোন দেশে কি তদ্রূপ বদলানো হইয়াছে? নিশ্চয়ই হয় নাই। এর পরও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের অবকাশটা কোথায়?

হ্যাঁ, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। তবে সেটা সমাজের ঊর্ধ্বতন স্তরে, বিশেষতঃ শহরে-নগরে, হোটেলে রেস্টুরেন্টে—যেখানে

চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র যোগান অফুরন্ত। ভোগে আসে যত, উপচাইয়া পড়ে ততোধিক। এই আকাল-দুভিক্ষের দেশেও সেসব মহলে ও হোটেলে রাজসিক পার্টি মজলিস লাগিয়াই আছে। সেসব মজলিসের ধারে-কাছে গিয়া জৌলুস-রওনক ও খাদ্যসম্ভার দেখিয়া কার সাধ্য বোঝে যে, এটা দুভিক্ষের দেশ। সব খবর ছাপা হউক বা না-হউক, এদেশে হাজার-হাজার লোক খাদ্যাভাবে বা 'পুষ্টির অভাবে' অকালে মৃত্যুবরণ করে। সরকারী কর্তৃপক্ষ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের হিতোপদেশ দান করেন ঠিকই। কিন্তু ঐসব মহলে আজও খাদ্যের যে অপচয় চলিতেছে তাহা নিবারণের কোন চেষ্টা নাই। সরকারের মান্ধাতার আমলের গেস্ট-কন্ট্রোল অর্ডার আছে বটে, কেউ সেটা মানে না। মীলাদ-মাহফিলের নাম করিয়া বিবাহ মজলিসে বিরিয়ানী খাওয়ানোর ধুম। আর হোটেলে রিসেপশন এবং লাঞ্চিয়ন ও ডিনার-পার্টির মাত্রা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, নগরীর গুটি কয়েক অভিজাত হোটেলে জায়গাই পাওয়া যায় না।

. . খাদ্যমন্ত্রী খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের আহ্বান জানাইয়াছেন। সাধারণ মানুষ খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্তন করিতে করিতে এখন খাওয়ার অভ্যাস অনেকটা ভুলিতেই বসিয়াছে। কিন্তু দুভিক্ষের দেশে খাদ্যের বড়লোকী বিলাস যাহারা কোনক্রমেই ছাড়িতে পারিতেছে না, খাদ্যমন্ত্রীর উপদেশটি তাহাদেরই প্রতি নির্দেশিত হওয়া উচিত।

কাগজে অনেক অনাহার, অর্ধাহার, মৃত্যু ও আত্মহত্যার খবর। ৬ই মে এক সহযোগী 'সাতক্ষীরার তীব্র খাদ্যসঙ্কট' ও 'দুই জনের মৃত্যুর' খবর দিয়াছেন। একই তারিখে অপর এক সহযোগী লিখিয়াছেন, 'মাদারীপুর মহকুমার সর্বত্র তীব্র খাদ্যসঙ্কট, শতকরা ৮০ জন অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন।'

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় মে ১৪, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

সেদিন টেলিভিশনের পর্দায় দেখিতেছিলাম এক নৃত্যানুষ্ঠান। চমৎকার নৃত্যনাট্য। মনোমুগ্ধকর নৃত্যসঙ্গীত।

. . দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বন্যানিমজ্জিত। চারিদিকে ধ্বংস, মৃত্যু, অশ্রু, মহামারী, আহাজারি, আর্তনাদ। তবু আমাদের উর্বশী-নৃত্য আছেই, উহা থামিয়া যায় নাই। টেলিভিশনের দওলতে এই দিনে নৃত্যনাট্যও দেখি, আবার সর্বধ্বংসী বন্যার প্রলয়-নাচনও দেখিবার সুযোগ পাই। সত্যি, আমরা কী 'ভাগ্যবান'।

দেখার কিন্তু শেষ নাই। অতিদ্রুত ঘটিতেছে দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্তন। পরদিন প্রত্যুষেই ইত্তেফাকের পৃষ্ঠায় দেখি আর এক অদ্ভুত দৃশ্য, অনন্য চিত্র— যে চিত্র জীবনে কোনদিন দেখি নাই। রংপুরের চিলমারী থানার মাঝিপাড়া গ্রামের যুবতী কন্যা বাসন্তী আর দুর্গতির ফটোগ্রাফ-চিত্র। সর্বাঙ্গে জাল-জড়ানো বাসন্তীকে দেখিয়া কোন কবি-মনা মানুষ মৎস্যকন্যা বলিয়া ভুলও করিতে পারেন। কিন্তু না, পাতালের কোন মৎস্য-কন্যা কোন ভাগ্যবানের জালে ধরা পড়ে নাই। বস্ত্রাভাবে মাছধরা জাল দিয়া ষোড়শী বাসন্তী লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছে মাত্র এবং তারই এই দৃশ্য। ফটোগ্রাফের ক্যাপশানে লেখা : 'ঘরে বন্যার পানি, পেটে ক্ষুধার জ্বালা। পরনে বস্ত্র নাই। শরীরে জাল ছড়াইয়া কাঁথা মুড়িয়া লজ্জা ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কোনও মতে। ক্ষুধার আগুন দেহের কমনীয়তা কাড়িয়া লইয়াছে। বাসন্তী তেরদিন ভাতের মুখ দেখে নাই। পাঁচদিন আগে দুর্গতি একবার আটারগোলা খাইয়াছিল। কে বিশ্বাস করিবে পেটের জ্বালা নিবারণের জন্য বাসন্তী আর দুর্গতি কলার ভাগর সংগ্রহ করিতেছে?

. . কাঁথা মুড়িয়া, জাল জড়াইয়া লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত নিরন্ন বাসন্তী-দুর্গতিরা তো আজ বিধ্বস্ত বাংলার প্রায় ঘরে ঘরে। বাসন্তীর শত ছিদ্র 'জাল-বস্ত্র' তাহার লজ্জা নিবারণে নিদারুণভাবে ব্যর্থ। আমরাই কি আমাদের সমাজ-সভ্যতার এই অপরিসীম লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছি? সেই শতছিদ্রযুক্ত জাল আর কাঁথার অঙ্গাবরণ কি আমাদের ঘূণে ধরা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-সভ্যতার দিকেই বিকট বিদ্রূপের মুখ ব্যাদান করিতেছে না?

মনে পড়ে গোলাম কুদ্দুসের ''বিদীর্ণ' কাব্যগ্রন্থের 'জীবনগ্রন্থ' কবিতার কয়টি ছত্র :

''মাঠে-মাঠে পাকা ধান ঝরে,
মা-জননী দেহের বেসাতি করে,
বোন সখিনা কবরের কাফন তুলে নিয়ে
ইজ্জত বাঁচিয়ে
অবশেষে মুখ থুবড়ে
মাটিতে পড়ে,
অথবা যৌবনের ভার নিয়ে
অন্ধকার জীবনের
বন্ধ পথ ধরে!

০ ০ ০

ইতিমধ্যে ইয়াসিন আর
কেনারামের দোকানে
লক্ষ লক্ষ মণ চাল নামে,
তারপর কোথায় শূন্যে
মিলিয়ে যায় বাতাসে!
ইয়াসিন-কেনারাম
দাঁত বের করে হাসে।”

ত্রিশ বছর পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা কবিতা। কিন্তু আমাদের আজিকার অবস্থার সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল! ইয়াসিন কেনারামেরা নিরন্ন মানুষের মুখের গ্রাস লইয়া তাহাদের কারবার করিতেছে। এই মহাদুর্যোগকে মূলধন করিয়া কি প্রকারে লাখপতি হইতে কোটিপতি হওয়া যায় সেই নীল-নকশার ডিজাইনাররাও বোধ করি এই মুহূর্তে বড় কর্মব্যস্ত। অবৈধ অস্ত্রধারীরাও কিন্তু হাত গুটাইয়া বসিয়া নাই। খুন-খারাবি, ডাকাতি-রাহাজানির খবর এই জাতীয় মহাবিপর্যয়ের দিনেও প্রাত্যহিক। কী বিচিত্র এই দেশ, সেলুকাস!

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় আগস্ট ৩, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

..স্বাধীনতা জাতীর ভাগ্য গড়িবার যে সীমাহীন সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল সে সুযোগ আমরা গ্রহণ করি নাই। উহাকে আমাদের একশ্রেণী লুট ও পাচারের মাধ্যমে আপন ভাগ্য গড়ার স্বর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। মুখে শেখ ফরিদ আওড়াইয়াছি, বগলে কিন্তু ইট। জাতীয় সম্পদের বিকাশ বিনিয়োগের পরিবর্তে ভাববাদিতার বিলাসে গা ভাসাইয়া দিয়া যা' কিছু সম্পদ ছিল তাহাও বিনাশ করিয়াছি। আমরা বুঝি নাই, এই কল্পনাবিলাসের স্রোত আমাদের বেশীদূর লইয়া যাইতে পারিবে না। অচিরে এবং অদূরেই বিপর্যয়ের বালুচরে আমরা পথ হারাইয়া ফেলিব।

..আমাদের লক্ষ্য করিয়া কেউ লিখিতেছেন, 'রোড টু রুইন'। কেউ বলিতেছেন, 'আমরা ইকনমিক্যাল ডেড্।' কেউ মন্তব্য করিতেছেন, আমাদের অর্থনীতি 'ক্লোষ টু কোলাপস্।' কেহ বা স্বদেশের শূকরের লিভিং স্ট্যাণ্ডার্ডের সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের লিভিং স্ট্যাণ্ডার্ডের তুলনা করিতেও

ছাড়িতেছেন না। এমনকি কোন কোন পাকিস্তানী পত্র-পত্রিকাও আমাদের প্রতি করুণার সুরে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা সবই নীরবে সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছি। কারণ আমরা দরিদ্র, আমরা অভাবে জর্জরিত। সঙ্কটে-দুর্যোগে আমরা ম্রিয়মাণ। লুণ্ঠিত বাংলার দলিত, মথিত-অর্থনীতির উত্তরাধিকার আমরা লাভ করিয়াছি। স্বাধীনতা-উত্তর আড়াই বছরে যেটুকুও বা আমরা গোছাইয়া তুলিতে পরিতাম, তাহাও করিতে পারি নাই।

---ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় আগস্ট ৬, ১৯৭৪

কেরানীর আর্তনাদ

মরেও জ্যান্ত আছি
আমি হতভাগা, একজন কেরানী,
আমার আর্তনাদ, হাহাকার,
শুনতে চায়নি বড়কর্তা ও গৃহিণী।
বাসায় পালিয়ে থাকি
অনেক রাত বাহিরে কাটাই,
তবু শেষ হয় না, গৃহিণীর গঞ্জনা
তৈল নাই, কাপড় নাই, খাবার নাই।

কোনদিন না খেয়ে, না নেয়ে
অফিসে, আত্মভোলা হয়ে রই,
বড় সাহেব ধম্‌কে বলেন
এই! টপ-প্রায়রিটি ফাইলখানি কই?
খুঁজে খুঁজে হয়রান
ফাইল তো পাওয়া যাচ্ছে না,
চেম্বার হতে আবার হাঁকেন,
এবার চাকুরী আর থাকছে না।

মরা কাঠের চেয়ারে বসে
দিন্ দিন্ আমিও যাচ্ছি মরে,
অনাহার আর অনিদ্রায়
মাথাটিও ঝিমু ঝিমু করে।
মাঝে মাঝে মনে হয়
আজ তো ঘরে ভাত নাই,

ছোট ছেলেমেয়ের কান্না
অফিস থেকেও তাই শুনতে পাই।

কি করবো উপায়
মাসের শেষ যা পাই বেতন,
তাতে দশ দিনের
খোরাকিরও হয় না সংস্থান,
বাকী বিশটি দিন
জীবনের তাগিদে, বাঁচার সংগ্রামে,
হন্যে হয়ে ঘুরি
পরিজনের খাবার অন্বেষণে।

আমায় খোঁজে,
মুদিওয়ালা, খোঁজে গৃহস্বামী,
আমি পলাতক,
আমি অপরাধী, আমি আসামী।

কেন এই বৃথা জন্ম
কেন এই অসহ্য যাতনা,
তার চেয়ে ভাল ছিল
যদি মৃত্যু আমায় না করিত ছলনা।

—ইত্তেফাক মাঘ ২০, ১৩৮১

ঘরে-বাইরে

সরকার এবং মন্ত্রীরা কথাবার্তা বেশ ভালই বলছেন। বিপদ হচ্ছে সব কথার অর্থ আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। কিছুদিন আগে এক মন্ত্রী বলেছেন, 'একজন লোককেও অনাহারে মরতে দেওয়া হবে না।' বটেই ত কলেরা-বসন্তে, অনাহারে-অচিকিৎসায় মৃত্যু যে এ দেশে নিষিদ্ধ! আজ থেকে ত্রিশ-একত্রিশ বছর আগে যখন গণ্ডা গণ্ডা লোক মারা যাচ্ছিল, কংকালসার দেহ জীবনের ভার বইতে অক্ষম হয়ে লুটিয়ে পড়ছিল পথে-প্রান্তরে কিংবা 'বোন সখিনারা দেহের বেসাতী করে' জন্মের ঋণ শোধ করছিল তখনও কর্তৃপক্ষীয় পরিভাষায় অনাহারে মৃত্যু ছিল নিষিদ্ধ।

এক তদন্ত কমিশন পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়ে-ছিলেন, "দুর্ভিক্ষের লক্ষণ কোথাও দেখা গেল না, কারণ গাছে এখনো পাতা আছে, মেয়েরা বেশ্যা হয়ে যায়নি।" সেই ট্রাডিশন বজায় রাখাই তো কর্তৃপক্ষীয় বাহাদুরী! তাই কথা শুনে যারপরনাই পুলকিত বোধ করেছি। আর ফিরে ফিরে তাকিয়েছি ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে। দেখেছি মর্মন্তুদ সব দৃশ্য। পত্র-পত্রিকায় পাঠ করেছি হৃদয় বিদারক সংবাদ। কোথাও সিদ্ধ কচুরীপানা খেয়ে মানুষ প্রাণ ধারণের ব্যর্থ চেষ্টা করছে, আবার কোথাওবা মরা মুরগীর বাচ্চা। গত পরশু বঙ্গভবনের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ফুটপাথে স্বচক্ষে দেখলাম এমনি এক করুণ দৃশ্য। দেখলাম, এক হাড্ডিসার প্রৌঢ়। হাতে একটা মরা মুরগীর বাচ্চা। আপনমনে সে চামড়া ছড়াচ্ছে। পাশে দশ ইঞ্চি সাইজের দু'টি ইট, একটা ভাঙ্গা এলুমিনিয়মের হাড়ি, আর কিছু ছেঁড়া কাগজপত্র। চামড়া ছাড়ানো শেষ হয়ে গেলে হয়ত মরা মুরগীর মাংস সেদ্ধ করা হবে। তারপর ভুরিভোজ সম্পন্ন করে আক্রান্ত হবে দুরা-রোগ্য ব্যাধিতে। পরিণামে একদিন মৃত্যু এসে টেনে নেবে জীবনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। কর্তৃপক্ষীয় ভাষায় কিংবা চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী নিশ্চয় একে অনাহারজনিত মৃত্যু বলা যাবে না, কিন্তু বিবেকের ভাষায়?

---ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান যথার্থ বলিয়াছেন: 'বহু হুঙ্কার শুনিয়াছি, আর হুঙ্কার শুনিতে চাই না। তার বদলে এখন এ্যাকশন চাই। আমরা চাই, এবারে সরকার চাল, লবণ ও প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে এবং মূল্যমাত্রা যুক্তিসঙ্গত স্তরে নামাইয়া আনিতে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করুন'। তিনি আরও বলেন, 'দেশের সম্পদ যদি সম্পূর্ণ দেশেই থাকিত তবে এতটা সমস্যা দেখা দিত না'।

জামান সাহেব জনগণের দাবীরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। অতিরিক্ত কিছু বলেন নাই।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তিন বৎসর আগের তুলনায় চালের মূল্য যখন সাত আটশত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, খাদ্যাভাবে প্রতিদিন মানুষ পথে-ঘাটে হাটে-বাটে মরিতেছে, যখন দুর্ভিক্ষাবস্থার কথা সরকারীভাবেই স্বীকৃত হইতেছে এবং সর্বমুখী সঙ্কটে গোটা সমাজটাই প্রতিমুহূর্তে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতেছে তখন আর এসব উত্তম কথা বলিয়া লাভ কি? রোগীর যখন জা-কান্দানি অবস্থা, তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন এবং

অত্যুত্তম ঔষধেইবা আর কি কায়দা ? হুমকি দিতে দিতে গেল প্রায় তিন বৎসর। এখন যদি এ্যাকশন শুরুও হয় তবু তাতে কতটুকু ফললাভ করা যাইবে এবং ফললাভ করিতে কত দিন সময় লাগিবে ? মারিয়া-পিটিয়া দাম কমাইতে গেলেও কতটুকুইবা কমানো যাইবে ? খাদ্যমন্ত্রী নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁর মতে, ১৮০ টাকা পর্যন্ত চালের মূল্যকে ন্যায্যমূল্য বলা যাইতে পারে। এই উক্তিটিই কি প্রমাণ করে না যে, সরকারী অভিধানেও 'ন্যায্য' কথাটার সংজ্ঞা আমূল বদলাইয়া গিয়াছে ? ইহাই কি প্রমাণ করে না যে, বুকভরা সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ফিরাইয়া আনার সাধ্য বর্তমানে সরকারের নাই ? থাকিলে তাঁহারা আর ১৮০ টাকাকে চালের 'ন্যায্যমূল্য' বলিতেন না। প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী নিজেও একদা সরল বিশ্বাসেই বলিয়াছেন যে, আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম আশাতীতভাবে কমিয়া যাইবে। এর জন্য তিনি চেষ্টাও কিছু কম করেন নাই। কিন্তু দাম কমে তো না-ই, বরং উহার পরও ইতিমধ্যে অন্ততঃ দুইশ' পার্সেন্ট বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার সদিচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই।

দেশের খাদ্য ও পণ্য সম্পূর্ণ দেশেই থাকিলে নিশ্চয়ই সমস্যা এত মারাত্মক হইতে পারিত না। কিন্তু সত্য কথা এই যে, সম্পদ দেশে থাকে নাই। বিগত আমন মওসুমেই অন্ততঃ দশ লক্ষ টন চাল এবং পাট মওসুমে দশ লক্ষ বেল পাট পাচার হইয়া গিয়াছে, একথা কামরুজ্জামান সাহেবের আশা করি, অজ্ঞাত নয়।

পৌণে তিন বছরে দেশে যেক্ষেত্রে প্রায় তিন শত পার্সেন্ট মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে এবং এক শ্রেণীর লোকের পকেট কালোটাকায় ভরিয়া উঠিয়াছে, সেক্ষেত্রে বৃহৎ যষ্টি দেখাইয়া এখানে-সেখানে দুই-চার দিনের জন্য দশ-পাঁচ টাকা দাম কমানো গেলেও সামগ্রিকভাবে দাম তেমনি কমানো সম্ভব হইবে না। চাপাচাপি যাঁতাযাতি করিয়া কাঁঠাল কিঞ্চিত নরম করা যাইতে পারে, কিন্তু পাকানো যায় না। আর অমন 'পাকানো' 'কাঁঠাল খাওয়াও যায় না।

কথাটা তিক্ত হইলেও সত্য যে, দুর্ভিক্ষ বলিতে যাহা বোঝায় তাহা মাসাধিককাল পূর্বেই শুরু হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে বিস্তর লোক মরিতেছে। ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম দুর্ভিক্ষের মুখে দাঁড়াইয়াও আমরা যেন দ্বিধাদ্বন্দ্ব দীর্ঘসূত্রতা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছি না।

---ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

পাশ্চাত্য দেশে বিউটি কম্পিটিশন হইয়া থাকে। বিশ্ব-সুন্দরীদের নগ্নপ্রায় চিত্র প্রায়ই কাগজে বাহির হয়। জীবন্ত মনুষ্য-কঙ্কালের যদি একটা বিশ্বপ্রদর্শনী হইত, তবে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, এবার আমরাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিতে পারিতাম। সংবাদপত্রে এসব সচল মনুষ্য-কঙ্কালের ছবি প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু কাগজের অফিসে যত ছবি আসে তার কয়টাইবা প্রকাশ করা যায় ? অত ছবি ছাপাইবার মতো জায়গাইবা কাগজে কোথায় ?

..ঈদ উপলক্ষে দিনদশেক জামালপুরের মফঃস্বল এলাকায় ঘুরিয়া ঐরূপ কত দৃশ্য দেখিলাম। পঞ্চাশের মন্বন্তরেও অবশ্য বহু মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এবারের দৃশ্য আরও বীভৎস, আরও বিরাট, আরও বর্ণনাতীত। এই কলামে কিছুদিন আগে অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার বায়াফ্রা শিশুর একটি ছবির কথা লিখিয়াছিলাম---জাতিসংঘ সদর দফতরের সম্মুখে পথিপার্শ্বে টাঙ্গানো যে বিরাটাকৃতি ছবিটি বিশ্ব বিবেককে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। আমিও ১৯৬৮ সালে এই চিত্রটি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু এবার আমি মফঃস্বল সফরকালে অমন কত শত জীবন্ত শিশু-কঙ্কাল দেখিয়া আসিলাম তার সংখ্যা বলার সাধ্য আমার নাই। সেপ্টেম্বরে যাহা দেখিয়াছিলাম অক্টোবরে দেখিলাম তার দশগুণ। নভেম্বরে অবস্থা কি দাঁড়াইবে, আল্লাহ্ মা'লুম! এই মর্মান্তিক অবস্থা আরও কতদিন চলিবে, তাহাও আলেমুল গায়েবই জানেন।

রংপুরের অবস্থা সবচেয়ে সাংঘাতিক একথা সরকারীভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে। ইত্তেফাকের খবরে প্রকাশ, সেখানকার ভুখামিছিলে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের জনৈক প্রাক্তন মন্ত্রী বলিয়াছেন, 'লাশ ঢাকিয়া রাখিয়া জনগণকে রাজনৈতিক ধাপ্পা দেওয়ার সময় এখন আর নাই'। কথাটা সত্য। কিন্তু মন্ত্রীত্ব যাওয়ার পর এই ধরনের ভুখা-মিছিলের রাজনীতিরই যে কি সার্থকতা, তাহাও বুঝি না। সে যাই হউক, মফঃস্বল সফরকালে লাশ অনেক দেখিলাম, কিন্তু 'লাশ ঢাকিয়া রাখার' কোন প্রশাসনিক প্রচেষ্টা অন্ততঃ এবার আমি দেখি নাই।

..আমরা অনাহারী মানুষের কচু-ঘেচু, বাঁশের মূল, শাকপাতা খাওয়ার কথা জানি। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় গজারী গাছের কচি পাতা সিদ্ধ করিয়া

খাওয়ার কথা আগে কখনও শুনি নাই। শেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান আমাকে বলিলেন যে, জামালপুরের উত্তর বর্ডারে গজারী বনের কচি পাতাও এবার খাওয়া শেষ। খাওয়ার মত এখন আর লতাপাতাও পাওয়া দুষ্কর। রাস্তার পাশে আটার ভূষি'ও চালের ভূষির চাপড়া ভাজা হইতেছে। বুভুক্ষু লোকেরা গোগ্রাসে সেগুলিই গিলিয়া জীবন বাঁচাইবার কষ্টকল্পিত প্রচেষ্টা চালাইতেছে। এসব দৃশ্য পঞ্চাশের মন্বন্তরে কুত্রাপি দেখি নাই। এবার সর্বত্রই দেখিলাম। দেখিলাম, আমার সোনার বাংলার চিত্র, রূপসী বাংলার দৃশ্য!

..পাঠকগণও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রতিদিন কলেরা ও উদরাময়ে অসংখ্য মৃত্যুর সংবাদ পড়িতেছেন। আমার এলাকার হরচন্দ্র মিউনিসিপ্যাল হাস-পাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আমাকে একটি নতুন 'টার্ম' শোনাইলেন। তাঁর মতে, এর অনেকগুলিই 'স্টারভেশন ডায়রিয়া'র কেস। ভূখা মানুষের পেটে অখাদ্য-কুখাদ্য পড়ার সাথে সাথে উদরাময় দেখা দেয়। এরূপও দেখা গিয়াছে যে, দিনের পর দিন অভুক্ত থাকার পর কোথাও কাহারও বাড়ীতে চাহিয়া-মাগিয়া একমুঠো ভাত খাইয়াই হাড়-জিরজিরা মানুষ, বিশেষতঃ বালক-বালি-কারা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। অর্থাৎ খাদ্যটুকুও উদরস্থ করিয়া উহা বরদাশত করার শক্তি তাহাদের দেহে অবশিষ্ট নাই। অনেকে আশঙ্কা করেন যে, নতুন ধান-চাল নামার পর সেই চালের ভাত খাইয়া বহু জীবনীশক্তিহীন লোকের গায়ে স্রোতের পানি আসিবে। আশু চিকিৎসার ব্যবস্থা না হইলে অনেক কঙ্কালসার মানুষ অনাহারে নয়—আহার করিয়াও মারা যাইবে। কিন্তু যাঁহারা এই দুর্ভিক্ষের চাপে তাহাদের সামান্য জমি জিরাত, বাড়ীভিটা, ঘরের টিন, থালা, ঘটি-বাটি, তামা-কাঁসা পিতল যা ছিল সবই, এমনকি ঢেঁকি, শিল-পাটা, কাঁথা-কম্বল পর্যন্ত বিক্রি করিয়া ছিন্নমূল সর্বস্ব-হারা হইয়াছে, তাহাদের উপায় কি? তাহাদের পক্ষে চালের দাম তিনশ' টাকাও যা' একশ' টাকাও প্রায় তাই; কারণ, ক্রয়শক্তিই তাহাদের সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। শহরের স্কুল, অফিস-আদালত, লোকের বাড়ীঘরের বারান্দা, হাটের চালাঘর এমনকি উন্মুক্ত আকাশতল হইয়াছে তাহাদের আশ্রয়স্থল। এইভাবেই এসব বুভুক্ষু মানুষ রোদে পুড়িতেছে, বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। পাঠক-গণ বিশ্বাস করুন, লঙ্গরখানায় সমবেত হাজার হাজার লোকের একজনেরও গায়ে আমি এমন কাপড় দেখি নাই যাহার দ্বারা সে আসন্ন শীতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। লজ্জা নিবারণের কাপড়ই নাই, আর ত শীত-নিবারণ। ইহাদের উপায় কি? নতুন ধান নামিলেও ইহাদের খাইবার মত নিজস্ব

কিছু নাই, বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার মত ঘর নাই, লজ্জা নিবারণের মত কাপড় নাই—চটের টুকরাও নাই, পৌষমাঘের হাড় কাপুনি শীত নিবারণের মত কাঁথা-কম্বলও নাই।

---ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় অক্টোবর ৮, ১৯৭৪

মঞ্চে-নেপথ্যে

বেওয়ারিশ লাশ দাফনের খবর অধুনা সংবাদপত্রের একটা রেগুলার ফিচার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম কয়েক মাস যাবত প্রতিদিন রাজধানীর রাস্তা হইতে বেওয়ারিশ লাশ কুড়াইয়া আনিয়া দাফন করে। আর সংবাদপত্রে রোজ রোজ সেই সংখ্যা ছাপা হয়। কিন্তু এখবরও আজকাল বৈচিত্র্যহীন ব্যাপার। দেশ বিদেশের লোকে আর তেমন যেন গা করে না। এদেশের 'বেওয়ারিশরা' যে আরও বেশী সংখ্যায় মরে না, এটাই বোধ করি বিশ্বের বিস্ময়।

কিন্তু গত বুধবারের বেওয়ারিশ লাশের খবরে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইত্তেফাকের খবরে বলা হইয়াছে, "গতকাল বুধবার আঞ্জু-মানে মফিদুল ইসলাম রেকর্ড-সংখ্যক লাশ দাফন করিয়াছে। এই দিন শহরের বিভিন্ন এলাকা হইতে ১৫টি নবজাত শিশুসহ মোট ৪৮টি লাশ আঞ্জুমানের সাহায্যে দাফন করা হয়। এত অধিকসংখ্যক লাশ একদিনে এই প্রতিষ্ঠান আর কখনও দাফন করে নাই; গত ১০ দিনে আঞ্জুমান মোট ২৯৮টি লাশ দাফন করিয়াছে।"

একই দিনে আটচল্লিশটি বেওয়ারিশ লাশ দাফন। তার মধ্যে পনেরটি কচি শিশু আর বাইশটি রাজপথে কুড়াইয়া পাওয়া কঙ্কালের মৃতদেহ। বেওয়ারিশ লাশের ওয়ারিশী বহনের দায়িত্ব যে আঞ্জুমানের উপর অধুনা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, ঘরে বসিয়া আমিও তাহা বেশ লক্ষ্য করিতেছি। কারণ, পুরানা আজীমপুর গোরস্থান আর আমার নতুন বাসস্থানের মাঝখানে মাত্র একটা দেওয়াল। এখান হইতে দিবা-রাত্র লাশের কর্মকাণ্ড দেখার বড়ই সুবিধা। নিত্য দেখিতে পাইতেছি, বেওয়ারিশ লাশের মিছিল দীর্ঘতর হইতেছে।

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বরে আঞ্জুমান প্রায় দেড় হাজার বেওয়ারিশ লাশ দাফন করে। দৈনিক গড়ে ষোল-সতেরটি। কিন্তু ডিসেম্বরের প্রথম দশ দিনের গড় দাঁড়াইয়াছে প্রায় ত্রিশ। ১০ই ডিসেম্বরের সংখ্যাটা পূর্বেকার যে-কোন দিনের তুলনায় দেড়-দ্বিগুণের মতো বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয় এই যে, বেওয়ারিশ লাশের মধ্যে শিশু

লাশের সংখ্যা ক্রমেই মাত্রার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। আর শুধু রাজধানীতেই নয়, এইরূপ 'বেওয়ারিশ'দের মৃত্যুর খবর মফঃস্বল হইতেও অনেক পাওয়া যাইতেছে। সহযোগী 'পূর্বদেশ' গত বৃহস্পতিবার খবর দিয়াছেন যে, শুধু নভেম্বর মাসেই কুড়িগ্রামের 'বেওয়ারিশ লাশ সৎকার কমিটি' ২৬৮টি লাশ দাফন করিয়াছে। যতদূর জানা যায়, এই পুষ্টিহীন কঙ্কালসার মানব-সন্তানেরা খাদ্যের অভাবের চেয়ে আশ্রয়ের অভাবে বিশেষতঃ শীতবস্ত্রের অভাবেই এখন বেশী মারা যাইতেছে। এবার আগেভাগেই শীত আসিয়াছে। শীতের প্রাবল্যও এবার বেশী। অগ্রাহয়ণেই মনে হইতেছে পৌষ-মাঘের হাড়-কাঁপানো শীত। এবং এই তীব্র শীতের শিকার হইয়া বিশেষভাবে মরিতেছে পুষ্টিহীন, আশ্রয়হীন, বস্ত্রহীন শিশুরা বালক-বালিকারা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা।

·· 'পাঠকগণ বিশ্বাস করুন, লঙ্গরখানায় সমবেত হাজার হাজার লোকের একজনের গায়েও আমি এমন কাপড় দেখি নাই যাহার দ্বারা সে আসন্ন শীতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারে। লজ্জা নিবারণের কাপড় নাই, আর ত শীত-নিবারণ! ইহাদের উপায় কি?

·· কুড়িগ্রাম হইতে বি. পি. আই. ১১ই ডিসেম্বর খবর দিয়াছেন যে, উক্ত মহকুমায় শিশুখাদ্যের চরম অভাবে শতকরা ৯৫ ভাগ শিশুই পুষ্টিহীনতায় ভুগিতেছে। কয়েকদিন আগে এক সহযোগী খবর দিয়াছেন যে, বরিশাল শহরে এক সপ্তাহের মধ্যে ১৪টি শিশু শীতে ও অপুষ্টিতে মারা গিয়াছে।

·· ডেনিস রেডক্রসের প্রধান প্রিন্স হেনরিক সপ্তাহকাল বাংলাদেশ সফর করিয়া রংপুর, জামালপুর ও সিলেটসহ কতিপয় এলাকার দুর্গত মানুষের অবস্থাকে "চরম শোচনীয়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ ভুখা মানুষকে বাঁচাইবার জন্য' তিনি আন্তর্জাতিক মহলকে অবিলম্বে আগাইয়া আসার আহ্বান জানাইয়াছেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বিদেশ হইতে অবশ্য অনেকেই আগমন করিতেছেন। সাহায্যের আশ্বাসও যথেষ্টই দিতেছেন। কিন্তু সেই সাহায্য আসার গতি বড় মন্থর। প্রতিশ্রুত সাহায্য নিশ্চয়ই একদা আসিবে। কিন্তু যাদের জন্য সেই সাহায্য তারা কি ততদিন অপেক্ষা করিতে পারিবে? নাকি তার আগেই এই দুর্ভাগা মানব সন্তানেরা বিপুলসংখ্যায় অকাল-মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে? বেওয়ারিশ লাশের এই ক্রম-বর্ধমান মিছিল তারই ইঙ্গিত দেয় না কি?

—ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয় ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭৪

বিদেশী পত্র-পত্রিকার মতামত

এ একজনের কাহিনী নয়

—লুই সিমনস

আলীমুদ্দিন ছাতা মেরামতের কাজ করে। এ সময়টা তার জন্য ব্যস্ততার মৌসুম। রোজ বিকেলে বঙ্গোপসাগরের কালো মেঘ পদ্মার উপর দিয়ে ভেসে যায়, আর মানিকগঞ্জে মুষলধারে বৃষ্টি নামে।

শহরের প্রধান বাজারের রাস্তায় আলীমুদ্দিন এক পায়ের উপর আর এক পা আড়াআড়িভাবে রেখে বসে ছেঁড়া ছাতা সেলাই করে, জোড়া তালি দেয় এবং ছাতার সিক মেরামত করে। সাইড বিজনেস হিসেবে পুরান তালা মেরামত করে, পুরান চাবিও সরবরাহ করে।

এমন মৌসুমেও আলীমুদ্দিন ক্ষুধার্ত। বলল, "যেদিন বেশী কাজ মেলে, সেদিন এক বেলা ভাত খাই। যেদিন তেমন কাজ পাই না সেদিন ভাতের বদলে একটা চাপাতি খাই। আর এমন অনেকদিন যায় যেদিন কিছুই খেতে পাই না।"

তার দিকে এক নজর তাকালেই বুঝা যায়, সে সত্যি কথাই বলছে। সবুজ লুঙ্গীর নীচে তার পা দুটিতে মাংস আছে বলে মনে হয় না। আলীমুদ্দিন যে ছাতা মেরামত করে, সেই ছাতার মতই তার নিজের পাঁজর ও মেরুদণ্ড বের হয়ে আছে।

ঢাকার ৪০ মাইল উত্তরে মহকুমা শহর মানিকগঞ্জ। ১৫ হাজার লোকের বসতি। তাদের মধ্যে আলীমুদ্দিনের মত আরো অনেকে আছে। কোথাও একজন মোটা মানুষ চোখে পড়ে না। কালু বিশ্বাস বলল, "আমাদের মেয়েরা লজ্জায় বের হয় না—তারা অর্ধনগ্ন।"

মানিকগঞ্জে এ অবস্থা কেন?—মানুষের খাবার নেই, কাপড় নেই। "মুক্তি যুদ্ধের পর থেকে জিনিস-পত্রের দাম বেড়েই চলেছে। চাল-ডাল কেনার সামর্থ্য কারো নেই। সরকার বলেছিল আজাদীর পর সুদিন আসবে। আমার ভাই মুক্তিযুদ্ধে মারা গেছে। আমি আমার এই পা হারিয়েছি। সরকার কিছু করে নাই"---কথাগুলো বলল মনসুর আলী। মনসুর আলী একজন চাষী। বয়স পঁয়তাল্লিশ। ১৯৭১ সালে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা হয়ে লড়েছে। একটা পা হারিয়েছে।

বাঁশের ক্র্যাচ্ ও লাঠির মাঝে দেহের সমতা রাখতে গিয়ে মনসুর আলীর হাত কাঁপছিল। ঘাড়ে ঝুলান জীর্ণ থলি থেকে লাল সুতায় বাঁধা, শত

হাতের ছোঁয়ায় বিবর্ণ একটা কাগজ বের করে দেখাল। শিরোনামায় লেখা রয়েছে "প্রধানমন্ত্রীর রিলিফ ও ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড"।

মনসুর আলী বলল, শহরের সরকারী কর্মচারীরা তাকে বলেছে, "এ ফাণ্ড থেকে টাকা পাওয়ার কথা ভুলে যাও।" সে অভিযোগ করল, "আমি ভিক্ষুক নই, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে খাবার ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি। নইলে আমি মরে যাব।"

আলীমুদ্দিনের কাহিনী গোটা মানিকগঞ্জের কাহিনী, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাহিনী, শত শত শহর-বন্দরের কাহিনী। এ পর্যন্ত বিদেশ থেকে ৫০ লাখ টনেরও বেশী খাদ্যশস্য বাংলাদেশে পাঠান হয়েছে। কিন্তু যাদের জন্য পাঠান হয়েছে তারাই পায়নি। খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব বেড়ে গেছে, কিন্তু লোকের আয় বাড়েনি, বরং কমেছে।

আবদুল হাদীর মত মধ্যবিত্ত লোকদেরও একই কাহিনী। হাদী স্থানীয় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের একাউটেন্ট। মাসিক উপার্জন তার ১৬ পাউণ্ডের সামান্য বেশী। হাদীর বয়স তিরিশ। বিবাহিত। তার তিনটি শিশু-সন্তান আছে। ব্যাংকের সামনে কর্দমাক্ত রাস্তার ওপাশে একটি করোগেট টিন শেডের এক অংশে হাদী সপরিবারে বাস করে। খাওয়া-দাওয়া ও বাসা ভাড়া বাবৎ যা খরচ হয় তা তার উপার্জনের দ্বিগুণ। হাদী বললেন, "এভাবে আর কতদিন চলবে জানি না।"

মানিকগঞ্জের প্রায় সকলের মত হাদীও গত মার্চ মাসের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এখন, হাদী বলতে লাগলেন, "রেশনের দোকানেও কিছু পাওয়া যায় না। ওদিকে সরকারী মহলে অর্থের একটানা অপব্যয় চলছে। আগামী নির্বাচনে যে কেউ ভাত-কাপড় দিতে পারবে তাকেই ভোট দেব।" হাদীর হিসাব মত মানিকগঞ্জে মুজিবের সমর্থন শতকরা ৬০ ভাগ কমে গেছে।

বাংলাদেশে যে এত বিপুল পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রী এসেছে, তার কি হ'ল? "কি হয়েছে তা' সকলেই জানে। সব ভারতে পাচার হয়ে গেছে।" ---হাদী জবাব দিলেন।

সর্বত্রই শোনা যায় যে, প্রচুর পরিমাণ গম ও চাল ভারতে পাচার হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর আট/দশ মাস পর্যন্ত ধারণা করা হ'ত যে, স্থানীয় রাজনৈতিক চাঁইরা রিলিফের গম ও চাল আত্মসাৎ করে কালোবাজারে

বিক্রী করেন। এখন এসব কালোবাজার পর্যন্ত পৌঁছায় না, পথেই উধাও হয়ে যায়।

বিদেশ থেকে যে খাদ্য-শস্য আসে, তা' চাটগাঁ বন্দরে তদারক করেন জাতিসংঘের বাংলাদেশস্থ রিলিফ অফিস। যেই মাত্র জাহাজ থেকে খাদ্য-শস্য, ময়দা, চিনি, রান্নার তেল ইত্যাদি নামান হ'ল, অমনি তাদের তদারকী শেষ হয়ে গেল। বিতরণ ব্যবস্থার কর্তৃত্ব বাংলাদেশ সরকারের হাতে। শেখ মুজিব আভ্যন্তরীণ বিলি-বণ্টনে বিদেশীদের তদারকী বরদাশত করতে রাজী নন। যদিও বিতরণের সুবিধার জন্যে জাতিসংঘই বাংলাদেশ সরকারকে ৭২৩টি লরী খয়রাত দিয়েছেন। এসব লরীর 'কয়েকশ' ঢাকা ও চাটগাঁর রাস্তায় পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। অনেক রাজনীতিবিদ ও তাদের পরিবারের সদস্যরা এগুলি ব্যক্তিগত বাহন হিসাবেও ব্যবহার করছেন।

চাটগাঁয়ের গুদাম থেকে খাদ্যসামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা বন্দরে আনীত হয়। সেখান থেকে তা' গরু-গাড়ী, লরী, ট্রেন ও ছোট ছোট নৌকায় করে স্থানীয় সরবরাহ ডিপোতে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই পর্যায়েই বিতরণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। প্রাইভেট ডিলাররা তাদের বরাদ্দ ঠিকই নেয়, কিন্তু রেশনের দোকানগুলোতে সম্ভবতঃ অর্ধেক মাত্র সরবরাহ করে। খাতাপত্রে কিন্তু দেখায় যে, পুরা সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে। বাদবাকী খাদ্যশস্য তারা সীমান্তের ওপারে পাচার করে দেয়।

বিদেশ থেকে সাহায্যস্বরূপ যে চাল ও গম আসে, সরকার যা ক্রয় করেন এবং দেশে যা উৎপন্ন হয়, সব মিলে দেশের সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার তিক্ততম পরিহাস এই যে, যাদের প্রয়োজন, তারাই পায় না।

—গার্ডিয়ান, লন্ডন, মার্চ ৩০, ১৯৭৪

দেউলিয়া হতে চলেছে

—ওয়ার্নার এ্যাডাম

"স্বাধীনতার পর বত্রিশ মাসে আমরা যা' কিছু করেছি, বন্যা এসে সব ধ্বংস করে দিয়েছে।"—দুঃখ করে বললেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর মতে বন্যা পাকিস্তানের পঁচিশ বছরের অবহেলার ফল ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি তীব্রভাবে অস্বীকার করেন যে, বাংলাদেশ

বন্যানিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও অধিকাংশ পর্য-বেক্ষকই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। উপরন্তু শেখ মুজিব ফের আশা করছেন যে, বহিঃবিশ্ব বাংলাদেশের জাতীয় বিপর্যয়ে সঠিকভাবে সাড়া দেবে। গত দুই বছরে কমপক্ষেও ৩ হাজার ৫ শত মিলিয়ন মার্ক সাহায্য দেবার পরও উন্নতির কোন লক্ষণ না দেখে বহিঃবিশ্বের ক্রমশঃই ধারণা হচ্ছে যে, বাংলাদেশ একটা 'তলাবিহীন পিপে'।

সে যাই হোক, ১৯৭০ সালের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সময় এবং বার মাস পরে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালীদের আবেদন দুনিয়া জুড়ে যে সাড়া জাগিয়েছিল, সে তুলনায় এবারকার বন্যা পরিস্থিতিতে বিদেশী সাহায্য নেহাৎ নগণ্য। এ সময় জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য ঢাকা যেখানে বৈদেশিক মুদ্রায় ৭৯৩ মিলিয়ন জার্মান মার্ক ও আরো ৩৯৩ মিলিয়ন জার্মান মার্কের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে, সেখানে আজ পর্যন্ত দ্রব্যাদিসহ ২৫ মিলিয়ন মার্কও এসে পৌঁছেনি। একই সময় এই ধারণাও দৃঢ়তর হচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকার নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার জন্য 'স্কেপ গোট' খুঁজে বেড়াচ্ছেন এবং বিশেষ করে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার উপর তাদের নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পাচ্ছেন।

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সরকার এ বছরের বন্যার ক্ষয়-ক্ষতির যে হিসাব দিয়েছেন, তা' চলতি বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার ঘাটতির প্রায় সমান। প্রকাশ থাকে যে, সে ঘাটতি অর্থ দফতর যে-কোনভাবে বৈদেশিক সাহায্যে পূরণ করতে চেয়েছিলেন।

বন্যায় আক্রান্ত হওয়ার আগেই বাংলাদেশে দেউলিয়াপনার ছায়া দেখা যাচ্ছিল। অধিকন্তু, ইহা সত্য যে, গত জুন মাস থেকেই বাংলাদেশ স্টেট ব্যাংকের গ্যারান্টি সত্ত্বেও বিদেশী ব্যাংকগুলো 'লেটার-অব ক্রেডিট' প্রত্যাখ্যান করে আসছে। এক কথায়, বাংলাদেশ সরকার যদি বিদেশে এ বিশ্বাস জন্মাতে অপারগ হন যে, ভবিষ্যতে বৈদেশিক সাহায্যের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা আরো ব্যাপক হবে, তাহলে দেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে দেউলিয়াপনার দিকে এগিয়ে যাবে।

—ফ্র্যাংকফুর্ট'র এলজেনাইন ফ্র্যাংকফুট পশ্চিম জার্মানী, আগস্ট ২০, ১৯৭৪

মিথ্যা আর দুর্নীতি বেড়েই চলেছে

—টাজেস আর্জগার

প্রতি সপ্তাহে বাংলাদেশ থেকে ভয়াবহ খবর আসে। আমরা আমাদের এশীয় সংবাদদাতা মিঃ কারলস উইডামকে 'এশিয়ার পর্ণ কুটীরে' পাঠিয়েছিলাম। সেখানকার পরিস্থিতির তিনি যে মূল্যায়ন করেছেন, তা' অত্যন্ত ভীতিপ্রদ : লোভী বাংলাদেশ সরকারের কর্তারা বন্যাপীড়িত লোকদের জন্য দেওয়া আন্তর্জাতিক খয়রাত আত্মসাৎ করে মোটা হচ্ছেন। সাহায্যকারী দেশগুলো এ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, ফলে তারা আর সাহায্য দিতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু এদিকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ প্রতিদিন গরীব থেকে আরো গরীব হচ্ছে।

এমন কি আদর্শবাদীরাও বাংলাদেশ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। প্রথমদিকে বাংলাদেশ সরকারের হিসাবে বন্যায় মৃতের সংখ্যা ছিল ২,০০০। এখন তা' নেমে ১,৭০০-তে দাঁড়িয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর তথ্যের জন্য কারো কারো মুখে মন্তব্য শোনা যাচ্ছে যে, তারা ঠিক জায়গা মত কমা বসিয়েছিলেন কিনা? আরো সন্দেহ করা হয় যে, বন্যা পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে দেখিয়ে বেশী সাহায্য আদায়ের উদ্দেশ্যে সরকারী হিসাব বাড়িয়ে তোলা হয়েছিল। তবে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ এই বিষয়ে বেশ সচেতন। ফলে পুরান প্রবাদটিরই পুনরাবৃত্তি চলছে : "বাঙালীদের মাথা আকাশে, পা ধূলায় ও হাত অপরের পকেটে"।

এ ব্যাপারে কারোর সন্দেহ নাই যে, দুর্ভিক্ষ সামলাবার জন্য বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু সাহায্যকারী দেশগুলোর ধারণা এই যে, বন্যার অজুহাতে বাংলাদেশ সরকার অধিকতর খয়রাত আদায় করে নিজেদের দুর্নীতির খোরাক যোগাতে চাচ্ছে।

যদিও বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের শেষ নাগাদ প্রায় ৪ হাজার মিলিয়ন ফ্র্যাংক সাহায্য পেয়েছে (এত কম সময়ে এত বেশী সাহায্য আর কোন উন্নয়নশীল দেশ কখনো পায়নি) তবুও সরকার বন্যা প্রতিরোধকল্পে কোন টাকাই বরাদ্দ করেননি। এক কোটি বেকার বাঙালীকে মাটির বাঁধ তৈরী, খাল খনন প্রভৃতি ফলপ্রসূ কাজে নিয়োজিত করা যেত। এভাবে চীন ও ভারতে কাজ হয়েছে।

'নিজের সাহায্যের জন্য নিজেও সাহায্য কর'—একথা বাংলাদেশে অর্থহীন। কেননা, যত সাহায্য এসেছে, তা' আওয়ামী লীগ নেতাদের ব্যক্তিগত

পকেটে গিয়েছে। মিঃ টনি হেগেন—যিনি বাংলাদেশে জাতিসংঘের দেওয়া সাহায্যের চার্জে ছিলেন—প্রকাশ করেছিলেন যে, যাবতীয় খয়রাতি শিশুখাদ্য ও কম্বলের অতি অল্পই ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে। বাদবাকী কালোবাজারে বিক্রী হয়েছে অথবা পাচার হয়ে ভারতে চলে গেছে। সে অবস্থার আজো পরিবর্তন হয়নি। ঢাকার সংবাদপত্রে যখন ঘোষণা করা হ'ল যে বন্যা পীড়িতদের জন্য এক উড়োজাহাজ ভর্তি গুড়া দুধ বিমান বন্দরে আসছে, ঠিক তার পরদিনই ঢাকার হোটেল ম্যানেজাররা ওগুলো কিনতে বাজারে তাদের লোক পাঠিয়ে দিলেন। বস্তুতঃ এইভাবেই বাংলাদেশে বন্যার্তদের জন্য দেওয়া বিদেশী সাহায্য বিতরণ করা হয়ে থাকে।

যে সরকার শিয়ালকে হাঁস পাহারা দিতে দিয়েছেন, অর্থাৎ যে সরকার কুখ্যাত জোচোর (দেশে ও বিদেশে) গাজী গোলাম মোস্তফাকে জাতীয় রেডক্রসের সভাপতি নিযুক্ত করেছেন, সে সরকার সম্পর্কে কোন কিছুতেই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। মোস্তফা এ পদ পেয়েছেন, যেহেতু তিনি ঢাকা আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকায় তার অনেক বেশী মওকা মিলেছে। তিনি শুধু গুড়া দুধই কালোবাজারে বিক্রী করেননি, অনেক ঔষধ-পত্রও আত্মসাৎ করেছেন। বাংলাদেশ রেডক্রসের সভাপতি এখন ৩৭টি ঔষধের দোকানের মালিক।

এ ধরনের বিবেকবর্জিত কাজের ফল চাক্ষুষ দেখতে হলে ৩ মাইল দূরে পুরান ঢাকার গেণ্ডারিয়া স্কুলে যাওয়া যেতে পারে। স্কুলটি এখন বন্যার ঘর-বাড়ী হারিয়েছে এমন দুই হাজার পাঁচশ' লোকের আশ্রয়স্থল। সারি সারি কঙ্কালসার শিশুরা শুয়ে আছে—এত দুর্বল যে, ওদের কাঁদবার শক্তি-টুকুও লোপ পেয়েছে।

'ক্যাম্প'-এর পরিচালককে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান গুলোর কাছ থেকে তিনি কিছু পেয়েছেন কিনা? তিনি জবাব দিলেন: "হ্যাঁ—পেয়েছি, জাতীয় রেডক্রসের কাছ থেকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা' কাজে আসেনি। যে দুইটি সুইডিশ বিস্কুটের ও একটি ফরাসী শিশু-খাদ্যের বাক্স রেডক্রস দিয়েছিল, তা' কীট আর পোকায় ভর্তি ছিল। এ সব খাদ্য গতকালকের উড়োজাহাজে আসেনি। ১৯৭০ সালের বিপর্যয়ের সময় থেকেই এগুলো গুদামজাত হয়ে পড়েছিল।"

—জুরিখ আগস্ট ২৯, ১৯৭৪

বাংলাদেশ আজ দেউলিয়াত্বের পথে

—জন সোয়ালন্

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোক দুনিয়ার দরিদ্রতম মানুষের শ্রেণীভুক্ত। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে বার্ষিক গড়পড়তা মাথাপিছু আয় তিরিশ পাউণ্ডের কাছাকাছি, যা দিয়ে ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে যেখানে অধিকাংশ ইউরোপীয়ানরা অবস্থান করেন— একটি রুম দু'রাতের জন্য ভাড়া নেওয়া যায়। বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে যে বৈদেশিক সাহায্য এসেছে তা ইতিপূর্বেই দুই হাজার মিলিয়ন ডলারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। অন্য কথায়, প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশুর জন্য মাথাপিছু দশ পাউণ্ড করে সাহায্য এসেছে। এ ছাড়া বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানও মোটা রকমের সাহায্য দিয়েছে। এই উদার দান যুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষ এড়াতেও ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ঘাট মেরামতে দেশকে সাহায্য করেছে। কিন্তু ক্রমেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই সাহায্যের উপযুক্ত ব্যবহার হয়নি।

ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থা স্পষ্টতঃই দিনে দিনে আরো ভয়াবহ হয়ে উঠছে। রিলিফের মাল কালোবাজারে বিক্রী এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, রেডক্রস-এর আন্তর্জাতিক সংসদ এক পর্যায়ে বাংলাদেশ থেকে একেবারেই চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সারা দুনিয়া সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশকে প্লাবিত করে দিয়েছে। এর পরিমাণ 'মার্শাল পরিকল্পনা'র সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অথচ ঢাকা থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে গত সপ্তাহে একটি শিশু মেয়ে গাছের পাতা খাচ্ছিল বেঁচে থাকার জন্য। ওর কাহিনী আদৌ নজীরবিহীন নয়।

বাংলাদেশ আজ দেউলিয়া, এর কল-কারখানা স্তব্ধ। শতকরা ৪ ভাগ যানবাহন—যা চাউল পরিবহনে অপরিহার্য—ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দেশটির প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাটের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। পাটকল ও পরিবহন ব্যবস্থা পুরাদমে চালু রাখার জন্য অতিরিক্ত কল-কব্জা আমদানী করার সামর্থ্য এ সরকারের নেই। ২ কোটি ৬০ লক্ষ শ্রমিকের এক তৃতীয়াংশ বেকার। চাউলের দাম বহুগুণ বেড়ে গেছে, অথচ মানুষের আয় বাড়েনি। এই দুঃখ দৈন্যের একটা ফলশ্রুতি বেপরোয়া খুন-খারাবী। দশ দিন আগে বোমা বিস্ফোরণের ফলে বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ঐদিনই চারটি চালের গুদাম লুণ্ঠিত হয়েছে এবং কয়েকজন আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন সদস্য খুন হয়েছে।

—দি সানডে টাইমস্ সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৭৪

বাংলাদেশ ট্রাজেডি

—জনাথন ডিম্বলবী

এমন এক দিন ছিল যখন শেখ মুজিব ঢাকার রাস্তায় বের হলে জনসাধারণ হাত তুলে "জয় বাংলা"—বাংলাদেশের জয়—ধ্বনিতে মেতে উঠত। আর আজ যখন স্বীয় বাসভবন থেকে তিনি অফিসের দিকে যান, তখন দু'দিকে থাকে পুলিশের কড়া পাহারা। পথচারীরা সজ্ঞানে তার যাতায়াত উপেক্ষা করে। জাতির পিতাও আর গাড়ীর জানালা দিয়ে হাত আন্দোলিত করেন না—তার দৃষ্টি থাকে সামনের দিকে নিবদ্ধ।

বাংলাদেশ আজ বিপজ্জনকভাবে অরাজকতার মুখোমুখি। লাখ লাখ লোক ক্ষুধার্ত। হাজার হাজার মানুষ অনাহারে আছে। অনেকে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। মফঃস্বল এলাকার স্থানীয় কর্মচারীরা ভয় পাচ্ছে যে, আগামী তিনটা মাস খুব দুঃসময় যাবে।

ক্ষুধার্ত মানুষের ভীড়ে ঢাকার দম বন্ধ হয়ে আসে। এখন আবার চলছে বন্যা উপদ্রুতদের ভীড়। গত তেত্রিশ মাসে ঢাকার জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিরিশ লাখে। নতুন যারা ভীড় করছে তারা এমন নোংরা বাড়ীতে থাকে যার তুলনা দুনিয়ার কোথাও নেই। কোথাও যদি বিনামূল্যে চাল বিতরণ করা হয়, সেখানে শরণার্থীদের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। বুদ্ধিজীবীরা বলেন, এই ক্ষুধার্ত জনতা ক্ষেপে গেলে তাদের রক্ষা নেই।

বাংলাদেশ আজ দেউলিয়া। গত আঠার মাসে চালের দাম চারগুণ বেড়েছে। সরকারী কর্মচারীদের মাইনের সবটুকুই চলে যায় খাদ্য-সামগ্রী কিনতে। আর গরীবরা থাকে অনাহারে। কিন্তু যতই বিপদ ঘনিয়ে আসছে, শেখ মুজিব ততই মনগড়া জগতে আশ্রয় নিচ্ছেন। ভাবছেন, দেশের লোক এখনও তাঁকে ভালবাসে—সমস্ত মসিবতের জন্য পাকিস্তানই দায়ী—আর বাইরের দুনিয়া তাঁর সাহায্যে এখনো এগিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশ উদ্ধার পাবে। নিছক দিবাস্বপ্ন!

মুজিব সম্পর্কে বরাবরই সন্দেহ ছিল। নেতা হিসেবে থাকার আজো তাঁর আকর্ষণ রয়েছে। তিনি আবেগপ্রবণ বক্তা। তার অহংকার আছে—সাহস আছে। কিন্তু আজ দেশ যখন বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখনও তিনি দিনের অর্ধেক ভাগ আওয়ামী লীগের চাঁইদের সাথে ঘরোয়া আলাপে কাটাচ্ছেন। যিনি বাংলাদেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বহু ছোটখাট বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তিনি আজ আত্মম্ভরিতার মধ্যে কয়েদী হয়ে চাটুকার ও পরগাছা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন।

বাইরের দুনিয়া বাংলাদেশের দুর্নীতির কথা ফলাও করে বলে থাকে। সমাজের নীচুতলায় যারা আছে, তারা হয়ত আজ খেতে পেয়েছে—কিন্তু কাল কি খাবে জানে না। এমন দেশে দুর্নীতি অপরিহার্য।

তবে এমন লোকও আছে যাদের দুর্নীতিবাজ হবার কোন অজুহাত নেই। সদ্য ফুলে-ফেঁপে ওঠা তরুণ বাঙালীরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের শরাবখানায় ভীড় জমায়। তারা বেশ ভালই আছে। এরাই ছিল মুক্তিযোদ্ধা—বাংলাদেশের বীর বাহিনী। গেরিলাযুদ্ধে এরা পাকিস্তানকে হারিয়েছে। তাদের প্রাধান্য আজ অপরিমেয়। রাজনৈতিক দালালী করে ও ব্যবসায়ীদের পারমিট জোগাড় করে তারা আজ ধনাঢ্য জীবন যাপন করছে। সরকারী কর্মচারীদের তারা ভয় দেখাচ্ছে। নেতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে এবং প্রয়োজন হলে অস্ত্র প্রয়োগ করছে। এরাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের বাছাই করা পোষ্য।

আওয়ামী লীগের ওপর তলায় যারা আছেন, তারা আরো জঘন্য। যাদের মুক্ত করেছেন সেই জনসাধারণের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে তারা আজ ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন। অবশ্য তাদের অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ আজ সহসা বিলিয়ে দিলেও সাধারণ মানুষের অবস্থা তাতে ভাল হবে না। প্রতিটি মানুষ কেবল নিজের কথাই ভাবছে—ভাবছে আগামীকাল তার কি হবে?

শুনতে রূঢ় হলেও কিসিঞ্জার ঠিক কথাই বলেছেন: "বাংলাদেশ একটা আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি"। ত্রাসজনক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার বর্তমান বিপর্যয়ের মোকাবেলা করার চেষ্টা করছেন।

আন্তর্জাতিক সমাজ তার পুতুল বাংলাদেশ সম্পর্কে ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছে। গত ৩২ মাসের রিলিফ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে—এই কঠোর সত্যের মুখোমুখি হয়ে রিলিফকর্মী এবং কূটনৈতিক মিশন ও জাতিসংঘের অফিসাররা বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের লোকদেরকেই দোষারোপ করছেন।

—নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান, লণ্ডন, সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯৭৪

অন্তিম দশায় একটি দিন

—জেকুইস লেসলী

একজন মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর অসহায় দৃষ্টিতে তার মরণ-যন্ত্রণাকাতর চর্মসার শিশুটির দিকে তাকিয়ে আছে। বিশ্বাস হতে চায় না তাই কথাটি বোঝাবার জন্য জোর দিয়ে মাথা নেড়ে একজন ইউরোপীয়ান

বললেন, সকালে তিনি অফিসে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক ভিখারী এসে হাজির, কোলে তার মৃত শিশু।

আজ যারা সবচেয়ে বেশী অনাহারক্লিষ্ট—বিধবা, বৃদ্ধ ও শিশু—তাদের ভূমিকা বাংলাদেশের সমাজে একান্তই প্রান্তিক। হাড্ডিসার দেহ ও গর্তে ঢোকা পেট—শিশুদের মধ্যে এটাই আজ সাধারণ দৃশ্য।

বস্তুতঃ বাংলাদেশের আমলারা বন্যাকে বর্তমান দুর্ভিক্ষের কারণ বলে উল্লেখ করলেও, বহু বিদেশী পর্যবেক্ষক মনে করেন যে, বাংলাদেশ সরকারই এর জন্য দায়ী। কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে, সরকারের রেশন প্রথা মূলতঃ রাজনৈতিক অসন্তোষ প্রতিরোধের জন্যই করা হয়েছে, অনাহার নিবারণের জন্য নয়। আরো অভিযোগ করা হয় যে, সরকার বিলি-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম, উপরন্তু খাদ্য-সামগ্রী বিদেশে পাচারে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

"দুর্ভিক্ষ বন্যার ফল ততটা নয়, যতটা মজুতদারী ও চোরাচালানের ফল। তদুপরি দেশের ভূমিহীন কৃষকেরা রেশন প্রথার বাইরে।"—বললেন, স্থানীয় একজন অর্থনীতিবিদ। সম্ভবতঃ লাখ লাখ লোক চাউল জোগাড় করতে পারছে না। এ অবস্থায় একমাত্র উপায় খাদ্য-শস্য আমদানী করা। কিন্তু আমদানীকৃত খাদ্য-সামগ্রী সবই রেশন প্রথা চালু রাখতেই ফুরিয়ে যায়। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে, "সেদিন পর্যন্ত রেশনের খাদ্য-সামগ্রীর শতকরা একভাগ মাত্র জরুরী রিলিফের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। বাদবাকী সবটাই সিপাই, পুলিশ, সরকারী কর্মচারী এবং বাদবাকী যাদের রেশনকার্ড করার মত 'ইনফ্লুয়েন্স' আছে, তারাই পেয়েছে।"

সরকারের রেশনিং প্রায়োরিটির পেছনকার যুক্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন বিদেশী পর্যবেক্ষক বললেন : "যারা অনাহারে আছে তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে না, তাদের সে সামর্থ্য থাকে না। যারা অনাহারকে ভয় করে তারাই হাঙ্গামা করতে পারে।"..."আমরা মূলতঃ একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা লালন করে চলেছি।" বেশ তিক্ততার সাথে বললেন, সাহায্যকারী একটি দেশের অপর একজন পর্যবেক্ষক। "এর ফলে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, এ কারণেই বাংলাদেশ সরকারের সাহায্যের আবেদন উৎসাহজনক সাড়া জাগাতে পারেনি।"

কিছুসংখ্যক পর্যবেক্ষক এ অভিযোগও করেন যে, সরকারী কর্মচারীরা ভারতে চাউল চোরাচালান ব্যবসার লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। প্রতি বছর

যে চাউল চোরাচালান হয়ে যায়, তার পরিমাণ ১০ লাখ টন—অর্থাৎ বন্যার ক্ষয়-ক্ষতির প্রায় সমান।

—গার্ডিয়ান, লণ্ডন, অক্টোবর ২, ১৯৭৪

এই কি আজাদী ?

— ডানিয়েল সাদারল্যাণ্ড

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তিন বছর আগে যেমন জনপ্রিয় ছিলেন, আজ আর তেমনটি নন।

দুর্নীতি, জীবনযাত্রার মানে দারুণ অবনতি এবং ব্যাপক খাদ্যাভাব অনেকেরই মোহ ভেঙ্গে দিয়েছে। দেশের কোন কোন গ্রামে হয়ত আজও শেখ মুজিব সমালোচনার উর্ধ্বে। কিন্তু শহরের গরীব জনগণের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা বেড়েই চলেছে।

গত দু'মাসে যে ক্ষুধার্ত জনতা স্রোতের মত ঢাকায় প্রবেশ করেছে, তাদের মধ্যে সরকারের সমর্থক একজনও নেই। বন্যা আর খাদ্যাভাবের জন্য গ্রামাঞ্চল ছেড়ে এরা ক্রমেই রাজধানী ঢাকার রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু মনে হচ্ছে সরকার এদেরকে রাজপথের ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে না দিতে বদ্ধপরিকর। এরই মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যককে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে সারাদিনে দু' এক টুকরা রুটি খেতে পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে দু'একটা পিঁয়াজ ও একটু আধটু দুধ মেলে।

ক্যাম্পে একবার ঢুকলে আর বের হওয়া যায় না। "যে দেশে মানুষকে এমন খাঁচাবদ্ধ করে রাখা হয় সেটা কি ধরনের স্বাধীন দেশ?"—ক্রোধের সাথে বলল ক্যাম্পবাসীদেরই একজন। ক্যাম্পের ব্ল্যাকবোর্ডে খড়িমাটি দিয়ে জনৈক সরকারী কর্মচারী আমার (রিপোর্টারদের) সুবিধার্থে প্রত্যেকের রুটি খাওয়ার সময়সূচীর তালিকা লিখে রেখেছেন।

"তালিকায় বিশ্বাস করবেন না"—ক্যাম্পের অনেকেই বলল। তারা অভিযোগ করল যে, রোজ তারা এক বেলা খেতে পায়—এক কি দুই টুকরা রুটি।

কোন এক ক্যাম্পের জনৈক স্বেচ্ছাসেবক রিলিফকর্মী জানান যে, "সরকারী কর্মচারীরা জনসাধারণের কোন তোয়াক্কা করে না। তারা বাইরে

জগতে, সরকারের মান বজায় রাখতে ব্যস্ত। এ কারণেই তারা লোকদেরকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বিদেশীরা ভুখা-জনতাকে রাস্তায় দেখুক---এটা তারা চায় না।''

''দুঃস্থ মানুষের অসন্তোষ কখনো সুগঠিত বিরোধী আন্দোলনের খাতে ধাবিত হবে কিনা, ভবিষ্যতই তা জানে। যারা এ দেশে দীর্ঘকাল বসবাস করছেন, তারা বলেন যে, বাঙালী মুসলমানরা অন্তহীন দুঃখ সইতে সক্ষম।

কিন্তু বাংলাদেশে বিরোধীদল রয়েছে---তা' যত ক্ষুদ্র বা বিচ্ছিন্নই হোক না কেন, তারা বিপ্লব চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এই বিরোধী-দলগুলোর দরিদ্র জনগণকে পরিচালিত করার এখনো দেরী আছে। তবে কিছু-সংখ্যক ''মুক্তিযোদ্ধা''---যারা বাংলাদেশের মুক্তির পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছে এবং আজ মনে করছে যে, শেখ মুজিব ও তার অনুচরেরা তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে---তারা বিরোধীদলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।

এই সব বিরোধী মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম হচ্ছেন জনৈক লেফটেন্যান্ট কর্নেল---যিনি মুক্তিসংগ্রামের একজন বীর যোদ্ধা ও পরবর্তীকালে ঢাকার সামরিক ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন--মাস কয়েক আগে তিনি 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে' চলে গেছেন।

—ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর, বোষ্টন, অক্টোবর ১৮, ১৯৭৪

দুঃখ ও দৈন্য ফনা তুলছে

—নরেন্স লিফস্তুলজ্

কয়েক সপ্তাহ ধরেই একটা বড় রকমের আকালের প্রাথমিক আলামত দেখা যাচ্ছিল। বিপুল সংখ্যক চাষীদের গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে আগমন, খবরের কাগজে রোজ অনাহারে মৃত্যুর খবর এবং হালে ঢাকা কর্তৃপক্ষের জেলায় জেলায় লঙ্গরখানা খোলার সিদ্ধান্ত---এই সব কিছুই প্রমাণ করছে যে, দেশে ভয়ানক আকাল দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে, কেননা সরকার খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে মনে হয় না। মূলতঃ গত ছয় মাসে চাউলের দাম অস্বাভাবিক-ভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলেই গরীব শ্রেণীর লোকেরা অনাহারের কবলে পড়ছে। যারা আজ অনাহারে জীবন্ত কঙ্কালে পরিণত হয়েছে, তারা বস্তুতঃ দেশের খাদ্য শস্য ব্যবসায়ে এতদিনকার দুর্নীতি ও মুনাফাবাজীরই শিকার। অথচ বেশী দাম দিতে পারলে বাজারে চাউলের অভাব নেই।

রোজই মন্ত্রীরা খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের কাছে দাম কমাবার জন্য আবেদন জানান। সরকারী ঘোষণা থেকে বোঝা যায়, তারা ভাল করেই জানেন, কারা খাদ্যসামগ্রী মওজুদ করছে ও দাম নিয়ে কারসাজী করছে। তবে এটাও স্পষ্ট যে, সরকার হুঁশিয়ারী দেওয়ার চেয়ে বেশী কিছু করতে প্রস্তুত নয় অথবা সক্ষম নয়।

সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে হঠাৎ করে চাউলের দাম মণ প্রতি ৪০০ টাকায় উঠে গেল। অর্থাৎ তিন বছর আগে---স্বাধীনতার পূর্বে যে দাম ছিল---এই দাম তার দশ গুণ। এই মূল্যবৃদ্ধিকে এভাবে তুলনা করা যায় যে, এক মার্কিন পরিবার তিন বছর আগে যে রুটি ৪০ সেন্ট দিয়ে কিনেছে, তা' আজ কিনছে ৪ পাউণ্ড দিয়ে। কালোবাজারে অর্থনীতির কারসাজিতেই এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। তবে তা' খুব সাময়িক ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই চাউলের দাম ৩০০ টাকায় নেমে আসে। অবশ্য তাও অসম্ভব চড়া দাম। সকলেই আশংকা করছে যে, আগামী কয়েক মাসে চাউলের দামের স্থিতিশীলতার আরো অবনতি ঘটবে।

২৩শে সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন যে, প্রতি ইউনিয়নে একটি করে মোট ৪,৩০০ লঙ্গরখানা খোলা হবে। প্রতি ইউনিয়নের জন্য রোজ বরাদ্দ হ'ল মাত্র দু'মণ ময়দা। যা' এক হাজার লোকের প্রতিদিনের জন্য মাথাপিছু একটি রুটির জন্যও যথেষ্ট নয়। অথচ কোন ইউনিয়নের লোকসংখ্যা এক লাখেরও বেশী। এই রিলিফ সেখানে আঁচড়ও কাটবে না। এমন অভিযোগও রয়েছে যে, সরকারী-গুদাম্ থেকে যে খাদ্যশস্য বের করা হয়, তার বেশীর ভাগই সাধারণ ও বেসামরিক লোকদের কাছে পৌঁছায় না। বিশেষ ডিফেন্স রেশনিং প্রথায় তা' চলে যায় প্যারা-মিলিটারী, সৈন্যবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কাছে যারা এমনিতেই অতি নিম্নমূল্যে পুরা রেশন পেয়ে থাকে।

কৃষি বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মতে, সরকারের বর্তমান স্ট্র্যাটেজী হচ্ছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সৈয়দপুর প্রভৃতি রেশনিং এলাকার লোকদের রেশন সরবরাহ করে যাওয়া। কেননা এগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বড় রকমের বিক্ষোভ এড়াতে হলে এ সব শহর এলাকায় কন্ট্রোল দরে খাদ্যশস্য---পরিমাণে যত স্বল্পই হোক---সর-বরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের তুলনায় বাংলাদেশের দোকানপাট ও খাদ্যশস্য-বাহী নৌকা লুণ্ঠিত হয়েছে খুব কমই। প্রতিবাদও সীমাবদ্ধ রয়েছে অল্প

সংখ্যক মিছিলকারীর মধ্যে, আর শুধু গরম বক্তৃতায়। এর কারণ এই যে, বিরোধী বুদ্ধংদেহী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশকে সরকার কারারুদ্ধ করে রেখেছেন।

—ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক রিভিয়্যু, হংকং, অক্টোবর ২৫, ১৯৭৪

লঙ্গরখানার অভিজ্ঞতা

—পিটার প্রেসটন

ডঃ কিসিঞ্জার ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু আজ ঢাকায় এসে তিনি কোনরূপ বিরূপ মনোভাব দেখবেন না। তিনি কখনো বাংলাদেশ চাননি, বরং বাংলাদেশ যাতে না হয় সে চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বাংলাদেশ একটা "আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি" হবে। আজ সেই ঝুলির তলা এক পালকেই দেখতে পাবেন—তার পরই সরে পড়বেন ভিন্ন দেশের রাজধানীতে।

দুই বাংলার সামনেই মৌলিক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—কেননা উভয় বাংলাই আজ দুর্ভিক্ষের বিভৎসতার মাঝে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তবে, দিল্লী ওপার-বাংলার অভাব কিছুটা মেটাতে পারবে; কিন্তু বাংলাদেশের সে সম্পদটুকুও নেই। ফলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই প্রশ্নটি অধিকতর নগ্নরূপে দেখা দিয়েছে। তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার—যে দুনিয়ার একজনের দুঃখ-দৈন্য কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে কয়েক ঘণ্টা পর অপর একজনের টেলিভিশনের রাত্রির খোরাক যোগায় মাত্র—কি আসে যায় যদি আট কোটি মানুষের একটি দেশ তাদের সমস্যার মোকাবেলা করতে না পারে?

বাংলাদেশে তেমন কোন অজানা বিপর্যয়ের অবকাশ নেই। এই সেদিনের একটি ছবি বাংলাদেশের দৃশ্যপট তুলে ধরেছে: এক যুবতী মা—তার স্তন শুকিয়ে হাঁড়ে লেগে গেছে; ক্ষুধায় চোখ জ্বলছে—অনড় হয়ে পড়ে আছে ঢাকার কোন একটি শেডের নীচে; কচি মেয়েটি তার দেহের উপর বসে আছে গভীর নৈরাশ্যে—দু'জনাই মৃত্যুর পথযাত্রী।

ছবিটি নতুন, কিন্তু চিরন্তন। স্বাধীনতার পর থেকে ঢাকা দুনিয়ার সবচেয়ে—কলিকাতার চেয়েও—বীভৎস শহরে পরিণত হয়েছে। সমস্ত বীভৎসতা সত্ত্বেও কলিকাতার ভীড় করা মানুষের যেন প্রাণ আছে, ঢাকার তার কিছুই নেই। ঢাকা নগরী যেন একটি বিরাট শরণার্থী-ক্যাম্প।

একটি প্রাদেশিক শহর-ঢাকা লাখ লাখ জীর্ণ কুটীর, নির্জীব মানুষ আর লঙ্গরখানার কিউ'তে ছেয়ে আছে।

গ্রামাঞ্চলে যখন খাদ্যাভাব দেখা দেয়, ভুখা মানুষ ঢাকার দিকে ছুটে আসে। ঢাকায় তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই। তারা খাদ্যের জন্য হাতড়ে বেড়ায়, প্রতিবাদ করে, অবশেষে মিলিয়ে যায়। গেল সপ্তাহে একটি মহলের মতে শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই মাসে ৫০০ লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে। এর বেশীও হতে পারে, কমও হতে পারে। নিশ্চিত করে বলার মত প্রশাসন যন্ত্র নাই (যেমন ছিল না বন্যার সময়ে)।

বাংলাদেশ মধ্যযুগে ফিরে যাবে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বহু গুণ। কিন্তু মধ্যযুগীয় কৃষি ব্যবস্থা অটুট থাকবে।

এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী এই নতুন নয়—দশ বছর আগে পাকিস্তানী প্রভুত্বের প্রতিবাদে বাংলাদেশের লোক নিজেরাই এ ধরনের উক্তি করেছিল। জন্মের পর পরই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সাহায্যের এক অভূতপূর্ব ফসল কুড়িয়েছিল: ৫০০ মিলিয়ন পাউণ্ড। আজ সবই ফুরিয়ে গেছে। কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

রাজনীতিবিদ, পর্যবেক্ষক, দাতব্য প্রতিষ্ঠান—সবাই এক নতুন যুক্তি পেশ করছেন—যা' অপরাধকে নিরাপদ করছে, দায়িত্বকে করছে অকেজো। তাদের মোদ্দা যুক্তি হ'ল এই যে: বাংলাদেশের ঝুলিতে মারাত্মক ফুটো আছে, যত সাহায্য দেওয়া হোক না কেন, দুর্নীতি, আলসেমী ও সরকারী আমলাদের আত্মঅহমিকার ফলে অপচয়ে ফুরিয়ে যাবে। বেশী দেওয়া মানেই বেশী লোকসান।

—গার্ডিয়ান, লণ্ডন, অক্টোবর ৩০, ১৯৭৪

নেতৃত্বের ব্যর্থতা ঃ অনাহার

—স্ট্যান কার্টার

তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে যখন বাংলাদেশের সৃষ্টি করা হয় তখন বিদেশী কূটনীতিবিদরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বাংলাদেশ একটা আন্তর্জাতিক 'বাসকেট কেস'-এ পরিণত হবে। বাংলাদেশে যা' ঘটছে, তাতে তাদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের অবস্থা অন্যরূপ হতে পারত—অর্থাৎ কূটনীতিবিদদের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হ'ত—যদি বাংলাদেশ ভাল নেতৃত্ব পেত।

যদিও সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোক ফ্লোরিডার মত আয়তনের একটি দেশে ভীড় করে আছে, এর মাটি সত্যিই উর্বর। এ দেশে বছরে ১ কোটি

২০ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। অবশ্য এ চাউল সমস্ত জনসংখ্যার—খোরাকের জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু এ দেশ আরো বেশী চাউল উৎপন্ন করতে পারত, যদি সরকার কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করতেন।

তা' না করে সরকার 'সমাজতন্ত্রের' নীতি গ্রহণ করেছেন, যদিও এ নীতি কার্যকরী করার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা সোভিয়েত রীতি অনুসরণ করে শিল্প-কল-কারখানা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন—লাভ অবশ্য কিছুই হয়নি। যে ইস্পাত মিলের স্বপ্ন তারা দেখছেন, তা' এখনো কাগজ-পত্রেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এদিকে বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী পাটের বেশীর ভাগ ও ১০ লাখ টন চাউল ভারতে পাচার হয়ে গেছে।

দেশের সম্পদ যে বিদেশে চলে যাচ্ছে, তা সম্ভব হচ্ছে সরকারের অভ্যন্তরে ব্যাপক দুর্নীতির জন্য। বাংলাদেশের "জর্জ ওয়াশিংটন" প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান নিজে হয়ত কোন দিনই ঘুষ গ্রহণ করেননি; কিন্তু সর্বত্র গুজব ছড়িয়ে রয়েছে যে তাঁর স্ত্রী ঘুষ খান। সরকারী কর্মকর্তারা যে ঘুষ খান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারা যদি ঘুষ না খেতেন, তাহলে হয়ত চোরাচালান সম্ভব হ'ত না।

বিদেশী বিশেষজ্ঞরা বলেন: বাংলাদেশে অনাহারে ও অনাহারজনিত রোগে দশ লক্ষ লোক মারা যাবে।

সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন শহরের লোকদের খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে—কেননা শহরের লোকদেরই গোলযোগ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা বেশী। তাদের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য কিনতে গিয়ে সরকার বস্তুতঃ দেউলিয়া হতে চলেছেন।

—ডেইলী নিউজ, নিউইয়র্ক, নভেম্বর ১, ১৯৭৪

অনাহারের জন্য যারা দায়ী

—এইচ. ডি. এস. গ্রীনওয়ে

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে আকাল চলছে। রোজ ট্রেনে করে অনাহার ক্লিষ্ট, মৃত্যুপথযাত্রী লোক জনাকীর্ণ রাজধানীতে এসে ভীড় করছে।

এদের মধ্যে অনেকেই ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশনের বাইরে যায় না। সেখানকার পেভমেন্ট-এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করছে তারা। তাদের গর্তে ঢোকা চোখে চরম ক্ষুধাতুর দৃষ্টি, মাছিতে

তাদের দেহ ছেয়ে আছে, তারা মাছি তাড়ায় না। শিশুগুলো এতই শীর্ণ যে, তাদের বুকের পাঁজর চামড়ার নীচে পাখীর খাঁচার মত দেখায়। কয়েকটি শিশুর পেট পীঠে লেগে গেছে, হাড় শুকিয়ে গেছে, চোখ বের হয়ে আছে—এদেরকে মানুষ বলেই মনে হয় না।

একটি নগ্ন দেহ লোক এক কোণায় পড়ে আছে। কংকাল ছাড়া আর কিছু নয়—সারা শরীর ঘায়ে ভরা। লোকজন তার পাশ দিয়ে যাবার সময় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।

এমনি অবস্থায় আরো লোক স্টেশনের দেয়ালের পাশে পড়ে আছে। কেউ কেউ হয়ত জীবিত নেই, কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি না কে মরে গেছে। অপেক্ষাকৃত ছেলেরা শুকনো গোবর কুড়াচ্ছে, জ্বালানি হিসাবে পোড়াবার জন্য, অন্যেরা আবর্জনার স্তূপ হাতড়ে চলেছে, কিছু খাবার পায় কিনা।

কেউ জানে না এই আকালে কত জীবন শেষ হয়ে গেছে। দেশে কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই খারাপ যে, দেশের দূর-দূরান্তে শত শত লোক মরে গেল, অথচ সরকারের কেউ শুনতেও পায়নি।

যে কথা সকলে জানে, তা' হচ্ছে এই যে, গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে—যেখানে ব্রহ্মপুত্র নদ ভারত থেকে বের হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে—সেখানে বন্যা দেখা দেয়। বন্যার ফলে গ্রীষ্মকালীন ফসলাদি ডুবে যায় এবং যে সব জেলায় বন্যার প্রকোপ বেশী হয়েছে, সেখানে শীতকালীন শস্য—যা সাধারণতঃ নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কাটা হয়—আদৌ রোপণ করা যায়নি।

সারা দেশে ফসল নষ্ট হয়নি। ঘাটতিটুকু অনায়াসেই কাটিয়ে ওঠা যেত। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার খাদ্য বিতরণে সরকারী অক্ষমতা, ব্যাপক দুর্নীতি, ভারতে চাউল পাচার প্রভৃতির জন্য তা' একটি জাতীয় বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে।

ট্রাজেডী হচ্ছে এই যে, বর্তমান আকাল এত ভয়াবহ এবং দীর্ঘস্থায়ী হ'ত না, যদি সরকার বন্যা উপদ্রুত এলাকায় সময় মত খাদ্য বিতরণ করতেন।

—ওয়াশিংটন পোস্ট নভেম্বর ৮, ১৯৭৪

ঢাকা আকাল অনুভব করতে পারছে

---মার্টিন ডেভিডসন

বাংলাদেশের একদল সেরা জ্ঞানী ব্যক্তি, আইনজীবী ও সম্পাদক ঢাকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেন যে, "বর্তমান দুর্ভিক্ষ—যার অস্তিত্ব অবশেষে সরকার স্বীকার করেছেন---কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফল নয়, বরং রাজনীতিরই ফল।" দলটি নিজেদেরকে 'সিভিল লিবার্টিজ এ্যাণ্ড লীগাল এইড্ কমিটি' বলে অভিহিত করেন। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, "সরকারের সর্বস্তরের রাজনীতিবিদরা তাদের দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও দেশের সম্পদের অপব্যবহারের মাধ্যমে এই দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছেন।" বিবৃতিতে আরো অভিযোগ করা হয় যে, "এবারকার মসিবতের জন্য সরকারের মদদপুষ্ট মজুতদার, চোরকারবারী ও কালোবাজারীরা দায়ী। কাজেই-সরকার যেমন দাবি করছেন যে, '১৯৭৪ সালের আকাল বন্যা অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফল', তা' নয়। ইহা মনুষ্য-সৃষ্ট এবং মানুষের অসাধুতারই প্রতিফল।

ঠিক কত লোক না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, তা' নিয়ে ঢাকার শরাবখানা ও ককটেল পার্টিতে বিতর্ক চলে। কিন্তু যারা কিছুসংখ্যক লঙ্গরখানা নিজ চোখে দেখেছেন, তাদের কোন সন্দেহ নেই যে, মৃতের সংখ্যা অকল্পনীয়। যে সব ফটোগ্রাফার রেডক্রসের হেলিকপ্টারে চড়ে দেশের উত্তরাঞ্চলে রংপুর-এর ন্যায় আকালগ্রস্ত এলাকা দেখতে যান এবং তাদের ক্যামেরা ভতি করে প্রামাণ্য ছবি নিয়ে আসেন—কখনো কখনো তাদের প্রামাণ্য চিত্রগুলো এতই মর্মান্তিক যে তা' সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যায় না---তারা সমালোচকদের সাথে একমত যে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, একমাত্র ঢাকা শহরেই রোজ ৭০ থেকে ১০০ জন লোক অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। রংপুরে এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দেড় লাখ ; কিন্তু এ মাসে নতুন ফসল না ওঠা পর্যন্ত এ সংখ্যা প্রতিদিন বাড়তে থাকবে।

বিদেশী দূতাবাস এবং জাতিসংঘের রিলিফ টীমের বিশেষজ্ঞরা একমত যে, বর্ষাকালীন বন্যার প্রায় ১'১ মিলিয়ন (১১ লাখ) টন চাউল লোকসান হয়েছে। কূটনীতিবিদরা বলেন যে, এই লোকসান বর্তমানের ব্যাপক, অনাহারের যথেষ্ট কারণ হতে পারে না কেননা বাংলাদেশ বরাবরই বন্যা অথবা অনাবৃষ্টিতে ভুগেছে। কিন্তু এর আগে এই ধরনের দুর্ভিক্ষ হতে

দেখা যায়নি। জাতিসংঘের জনৈক অফিসার বললেন, "দুর্ভিক্ষের জন্য পাচার আর দুর্নীতিই দায়ী। অপর একজন তাতে সায় দিলেন, কিন্তু জোর দিলেন দুর্নীতির উপর।

এদিকে সরকার কিন্তু পুরো সমস্যার জন্য দোষ দিয়ে চলেছেন অসময়ে বন্যার। জনৈক সরকারী মুখপাত্র একটি পরিসংখ্যান বের করেছেন, যাতে আসাম-সীমান্তের পাহাড়ী এলাকার বন্যার বিশদ বিবরণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সরকারী বক্তব্য হল এই যে, ব্রহ্মপুত্র নদের উর্ধ্বতন অঞ্চলে বন্যা সম্পূর্ণ এক নতুন ঘটনা। অপরপক্ষে জনৈক ভারতীয় বন্যানিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ বলেন, "এ ধরনের উক্তি নিছক উদ্ভট---ব্রহ্মপুত্র এ অঞ্চলকে বরাবর প্লাবিত করে থাকে।"

আসল কথা, যতদিন পূর্ববাংলা ইসলামাবাদের শিল্পোন্নত বন্ধুদের সাথে একত্রে ছিল, ততদিন খাদ্য-শস্য সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থা আজকের চেয়ে উন্নত ছিল।

সরকারী হিসাব মতে, ৭০০ মিলিয়ন ডলারের বিভিন্ন রকম সাহায্য ছাড়াও, গত এক বছরে বাংলাদেশ ৫০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের খাদ্য-শস্য সাহায্য হিসেবে পেয়েছে। চল্লিশটিরও বেশী দেশ এবং OXFAM ও CARITAS-সহ বহু রিলিফ প্রতিষ্ঠান এ সাহায্য যুগিয়েছে। অথচ তা' রংপুরের কোন সাহায্যে আসেনি।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি ফররুখ আহমদ ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ অনাহার। কর্তৃপক্ষের অনেকেই তাঁর মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অনাহারের মত মর্মান্তিক সমস্যার যথার্থ ও অকৃত্রিম সাড়া পাওয়ার জন্য আরো অপেক্ষা করতে হবে।

—ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক রিভিয়্যু, হংকং, নভেম্বর, ৮, ১৯৭৪

দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোক মরছে

---কস্তুরি রংগন

কয়েক সপ্তাহ আগে বাংলাদেশ যে দুর্ভিক্ষের ভয় করছিল, তা' এখন বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানকার অফিসাররা স্বীকার করেছেন যে, বিদেশ থেকে মোটা রকম সাহায্য আসার পরও এত ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির জন্য তারা প্রস্তুত ছিলেন না।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের জনৈক কর্মকর্তা বললেন, "কয়েক হাজার লোক এরই মধ্যে মারা গেছে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহে পুষ্টির অভাবে আরও হাজার হাজার লোক মারা যেতে পারে।"…"ব্যাপক রকম ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে গেছে, ভবিষ্যতেও আশা নেই"---অফিসারটি জানালেন। তিনি বর্তমান অবস্থাকে ১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তরের সাথে তুলনা করলেন। সেই দুর্ভিক্ষে এদেশে লাখ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছিল।

সরকারী পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে, কেননা আকাল গ্রস্তদের সংখ্যা সরকার অনুমিত সংখ্যার তিন গুণ বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগস্ট মাসে যখন সরকার লঙ্গরখানা খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, দেশে আনুমানিক ২০ লাখ লোককে খাওয়াবার জন্য ৪ হাজার লঙ্গরখানাই যথেষ্ট হবে।

সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ৩ হাজারেরও কম লঙ্গরখানা চালু করা হয়েছিল। এর অধিকাংশই চাহিদামত খাদ্য সরবরাহ পাচ্ছিল না। সরকারের মজুদ খাদ্য-শস্য ছিল না, বিদেশ থেকে আমদানীও কমে গিয়েছিল। ফলে সারা সেপ্টেম্বরই খুব দুঃসময়ে গেছে। এ সময়ে মাত্র ২০ হাজার টন খাদ্য-শস্য বাংলাদেশের বন্দরে এসে পেঁাছেছে। সে তুলনায় এ মাসে ও আগামী মাসে মোট ২৫০ হাজার টন পেঁাছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লঙ্গরখানায় যে রেশন দেওয়া হচ্ছে তা যতটুকু না হলে নয়, তার চেয়েও কম। প্রতিটি কেন্দ্রে একবার করে যে এক হাজার কিংবা তারও বেশী লোক এসে ভীড় করে, তারা মাথাপিছু একটি করে রুটি অথবা চাল-ডাল মিশ্রিত ৪ আউন্স খিচুড়ি পেয়ে থাকে। কোন কোন লঙ্গরখানায় রেশন বলতে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া "টিকে থাকার বিস্কুট" দেওয়া হচ্ছে।

সরকারী কর্মচারীরা এতদিনে অনাহারে এত লোক যে মারা গেল তা মেনে নিয়েছেন। এখন তাদের দুর্ভাবনা ভবিষ্যতের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে। বন্যা ও আকাল বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সাহায্য লাভে সহায়তা করেছে। যদিও ২০টিরও বেশী দেশ খাদ্যশস্য পাঠাতে চেয়েছে, তবুও এ বছর সরকারের খাদ্য ঘাটতি হবে ১০ লাখ টন।

বিদেশ থেকে খাদ্য সরবরাহ আসতে থাকায় বর্তমান পরিস্থিতির "নিশ্চয়ই উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আবার অবস্থার অব-নতি হতে পারে"---বললেন খাদ্য-সচিব আবদুল মোমেন খান।

—নিউইয়র্ক টাইমস্ নভেম্বর ২৩, ১৯৭৪

হতাশার দেশ

—পিটার আর. কান

চেষ্টা করলে প্রায় সব দেশ সম্পর্কেই অস্পষ্টভাবে সান্ত্বনাদায়ক কিছু বলার কথা চিন্তা করা যায়, কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে তা' সম্ভব নয়। এ দেশের ব্যাপক মানবিক বিপর্যয়, দুঃখ-কষ্ট, বহুমুখী আর্থিক দৈন্য, সম্পদ ও জমির অভাব, জনসংখ্যার বিরামহীন বৃদ্ধি, সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া রাজ-নীতি এবং নৈরাশ্যব্যঞ্জক মানসিকতা---সবকিছু মিলে বাংলাদেশকে দুনিয়ার সব চাইতে হতাশ জাতিতে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাগুলোর একটি হচ্ছে, এ দেশ কোন বৃহৎ শক্তির কাছে মূল্যবান নয়। ভৌগলিক অবস্থার জন্য দু'দিক থেকে ভারতীয় ভূ-খণ্ড স্যাণ্ডউইচের মত চেপে আছে। বাংলাদেশ ভারত ছাড়া অপর কোন শক্তির কাছে সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ দেশের এমন কোন খনিজ সম্পদ নেই, যা অন্য কোন দেশের প্রয়োজন। কোন দেশ এখানে ঘাটি নির্মাণের জন্যও আগ্রহী নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী বৃহৎ শক্তি। কিন্তু মনে হয় না রাশিয়ানরাও এ দেশ থেকে বেশী কিছু পেতে চায়।

সবকিছু বিবেচনা করলে মনে হয়, দুনিয়া বাংলাদেশকে বেশ উদার-ভাবেই সাহায্য করেছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ দেশকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

একজন পর্যবেক্ষক---যেমন এই রিপোর্টার---যিনি ১৯৭১ সালের বেশীর ভাগ সময় বাংলাদেশে কাটিয়েছেন, বাঙালীদের মুক্তিসংগ্রামে সহানুভূতি জানিয়েছেন, এবং ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের যুদ্ধের পর প্রতিটি বাড়ীর ছাদে নতুন জাতীয় পতাকা উড়েছে আর রাস্তায় রাস্তায় জনতাকে "জয় বাংলা" শ্লোগানে হর্ষোৎফুল্ল দেখে দেশে ফিরে গেছেন---তার পক্ষে তিন বছর পর বাংলাদেশ পুনঃদর্শন হাতাশাব্যাঞ্জক। উচ্চাশা আগেই শেষ হয়ে গেছে, জাতীয় উদ্দীপনাও ভেঙ্গে পড়েছে। আর জাতি হিসাবে যদি দীর্ঘ-কাল টিকেও থাকে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নৈরাশ্যময়।

বাঙালী বন্ধুরা এবং অপরিচিত লোকেরা যখন বলেন, "পাকিস্তান আমলের সেই দিনগুলোতে সবকিছু কতই না ভাল ছিল", তখন বোঝা যায় আজ অবস্থার কত শোচনীয় অবনতি ঘটেছে।

অবস্থা কত খারাপ হয়েছে, তা' আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় সর্বহারা ও ভূখা মানুষদের দেখতে হয়। এরা পেশাদার অন্ধ বা খোঁড়া ভিখারী নয়। এদের মধ্যে বৃদ্ধ মানুষগুলো রাস্তার পাশে পড়ে আছে—এতই শুকিয়ে গেছে যে গাড়ীর সামনে থেকে সরে যাওয়ার সামর্থ্যটুকুও এদের অবশিষ্ট নেই। এদের মধ্যে রয়েছে মহিলারা, দেহের আধাটুকু মাত্র ছেঁড়া কাপড়ে কোন মতে ঢাকা। এরা এদের জরাজীর্ণ, উলঙ্গ, পেটমোটা শিশু-সন্তানদেরকে কতকটা কোলে করে, কতকটা টেনে হেঁচ্ড়ে লক্ষ্যহীনভাবে রাস্তার এপাশ-ওপাশ করছে। 'অনাহারে মরছে এরাই। এদের আরো বেশী, অনেক বেশী সংখ্যায় দেখতে হলে যেতে হয় গ্রাম-বাংলায়—যেখানে শতকরা ৯০ জন বাঙালীর বসবাস।

পরিস্থিতি যে কত শোচনীয়, তা' বোঝার আরো একটি পথ আছে। তা' হল : ধর্মযাজক অথবা ত্রাণকর্মী—যাদের বাংলাদেশের প্রতি নিষ্ঠা রয়েছে— তাদের সঙ্গে আলাপ করা। তারা বাংলাদেশে সাহায্য বন্ধ করে দেবার সম্ভাবনার কথা বেশ জোর দিয়ে বললেন। আরো বললেন যে, অনাহারে লাখ লাখ লোকের মৃত্যু অবধারিত। তাদের মতে দেশটা ভেঙ্গে পড়বে—১৯৮০ সালে না ভেঙ্গে ১৯৭৫ সালে ভেঙ্গে পড়লেই বরং ভাল। এসব কথা তারা বলেন এই আশায় যে, ধ্বংসস্তূপের মাঝ থেকে হয়ত এক নতুন ব্যবস্থা জন্মলাভ করবে। জনৈক অর্থনীতি বিশারদ বললেন, "কেন নয় ? আমরা যা করছি তা' শুধু অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে ক্ষণিকের জন্য ঠেকিয়ে রাখার জন্য।" একজন ধর্মযাজক—যিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময় এ দেশে কাটিয়েছেন—বললেন, "বাংলাদেশে অকল্পনীয় ভাবনাও ভাবতে হয়।"

শেখ মুজিব যখন পাকিস্তানী কারাগার থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন তখন দেশবাসীর কাছে তিনি ছিলেন একজন অতিমানব। এতদিনে তাঁকে দোষে-দুর্বলতায় মিলে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে দেখা হচ্ছে। তাঁর তীব্র সমালোচনা করা হচ্ছে, কারণ তিনি সব সময় দালাল ও চাটুকারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। তাঁর চার পাশের কঠোর বাস্তবতার চেয়ে বরং নিজের বাগাড়ম্বরে বিশ্বাস করেন এবং কঠিন সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাবার চেষ্টা করেন।

শেখ মুজিব সম্পর্কে এখন গরীব চাষীরা কি বলছে ? জিজ্ঞাসা করলাম গ্রামের এক মাতব্বরকে। তিনি জবাব দিলেন, "তারা বলেন কোথাও কোন সমস্যা নেই। কেননা তারা ঠিকই তিন বেলা খেতে পাচ্ছেন।"

—ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল, নিউইয়র্ক, নভেম্বর ২১, ১৯৭৪

তিন বছর পরও বিপদগ্রস্ত এলাকা

—বার্নার্ড ওয়েনরার

তিন বছরেই বাংলাদেশের অর্থনীতি দেউলিয়া হয়ে গেছে। হাজার হাজার লোক অনাহারে মরছে। দুর্নীতি আর প্রশাসনিক অব্যবস্থার সংমিশ্রণে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। দেশে ব্যাপকহারে রাজনৈতিক হত্যা ও সংঘর্ষ চলছে।

বাংলাদেশ—পাকিস্তানের প্রাক্তন পূর্বাংশ—যখন স্বাধীন হয় তখন শুভানুভূতি ও আন্তর্জাতিক সমর্থনের উচ্ছ্বাস বয়ে গেছিল। আগামী গ্রীষ্মকাল নাগাদ বাংলাদেশ ৩ বিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে যেত, কিন্তু সাহায্যকারী দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান পরিতাপ এই যে, বাংলাদেশ একটি প্রশাসনিক কাঠামো পর্যন্ত গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে এবং দুর্নীতির পঙ্কিলে ডুবে আছে। অধিকন্তু, জনসংখ্যা বৃদ্ধির মোকাবেলায় একটি সংঘবদ্ধ কৃষিনীতির রূপ দেওয়ার এখনো বাকী আছে।

এ দেশের জনগণ, রিলিফকর্মীরা এবং কূটনীতিবিদগণ দুনিয়ার সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশটির সমস্যাবলীর ব্যাপকতায় পর্যায়ক্রমে হতাশ ও শংকিত বোধ করছেন। জাতিসংঘের একজন অফিসার মন্তব্য করলেন, "ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯৮০ সালের পর যা ঘটতে পারে, বাংলাদেশে এই মুহূর্তেই তা' ঘটছে।"

জনৈক বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদ বললেন, "আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি। ভবিষ্যতে যে কি হবে, জানি না। নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণ আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে ; অবস্থার অবনতি ছাড়া আমি আর কোন পরিবর্তন দেখছি না।"

একজন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারী বললেন, "অবস্থা শুধু নৈরাশ্যব্যঞ্জকই নয়, মর্মান্তিকও বটে। নৈরাশ্যজনক এই জন্যই যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ দেশের প্রতিকূলে বয়ে চলেছে। মর্মান্তিক এই জন্য যে, দেশের লোক অনাহারে মরছে। বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

অনাহারে হাজার হাজার লোক মারা গেছে। গত এক বছরে মোটা চাউলের দাম ২৪০ পার্সেন্ট বেড়েছে। প্রধান বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী পাটকলগুলোর উৎপাদন চার বছর আগের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ কমে গেছে। হাজার হাজার চাষী হাঁড়ি-পাতিল, চাষের বলদ, এমন কি জমি-জমা বিক্রি করেও চাউল কিনে খেয়েছে। আজ তারা নিঃস্ব হয়ে গ্রামের মাটি

আঁকড়ে পড়ে আছে। ঢাকার রাস্তা দুঃস্থ মেয়েলোকে ছেয়ে আছে। এরা পয়সা ভিক্ষা করছে। কোলের নগ্ন শিশুগুলো এত জীর্ণ-শীর্ণ যে, দেখে ভয় লাগে। ক্ষুধার্ত মানুষ চারপাশে নীরবে বসে আছে। একটি মহিলা মৃত শিশু বুকে করে আমেরিকান এ্যাম্বেসী-ভবনের বাইরে বিলাপ করছে।

দুর্নীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণের কাহিনীতে ঢাকা ভরপুর। জনৈক প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী বললেন যে, "দাতব্য ৭টি বেবীফুড টিনের মাত্র একটি এবং ১৩টি কম্বলের মধ্যে একটি মাত্র গরীবদের কাছে পৌঁছায়। বাংলাদেশে রেড-ক্রসের প্রধান ও ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা, শেখ মুজিবের পরিবার এবং শিল্প, যোগাযোগ ও বাণিজ্য দপ্তরের পদস্থ আমলাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যায়।

জনৈক কেবিনেট মন্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে একজন বাংলাদেশী অর্থনীতি-বিদ বললেন: "যুদ্ধের পর তাঁকে (ঐ মন্ত্রীকে) মাত্র দুই বাক্স বিদেশী সিগারেট দিলেই কাজ হাসিল হয়ে যেত, এখন দিতে হয় অন্ততঃ এক লাখ টাকা (প্রায় ১২ হাজার ডলারের মত)।"

ব্যবসার পারমিট ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আওয়ামী লীগ-দেরকে ঘুষ দিতে হয়। সম্প্রতি জনৈক অবাঙালী শিল্পপতি ভারত থেকে ফিরে আসেন এবং শেখ মুজিবের কাছ থেকে তার পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানাটি পুনরায় চালু করার অনুমোদন লাভ করেন। শেখ মুজিবের ভাগিনা শেখ মণি—উল্লেখযোগ্য যে, তিনি ঐ কারখানাটি দখল করে বসে আছেন—হুকুম জারি করলেন যে তাকে ৩০ হাজার ডলার দিতে হবে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের পশ্চিমবংগে যে চাউল পাচার হয়ে গেছে, তার পরিমাণ ৩ থেকে ১০ লাখ টন।

শেখ মুজিবের সহকর্মীরা স্বীকার করেছেন যে, শাসক হিসেবে তাঁর যোগ্যতা খুবই কম। খুব নগণ্য ব্যাপারাদি অনুমোদনের ফাইলে তার ডেস্ক্ সদা ভরে থাকে।

শেখ মুজিবকে ভাল করে জানেন এমন একজন বাংলাদেশী বললেন, "লোকজন তাঁকে পায় হাত দিয়ে সালাম করুক, তাঁকে দেশের সর্বময় কর্তা হিসাবে সম্মান করুক, এটা তিনি পছন্দ করেন। তাঁর আনুগত্য নিজের পরিবার ও আওয়ামী লীগের প্রতি। তিনি বিশ্বাসই করেন না যে, তারা দুর্নীতি-বাজ হতে পারে কিংবা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।"

—নিউইয়র্ক টাইমস্ ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭৪

৭৪-এর মহা-দুর্ভিক্ষ

—জন পিলজার

পশ্চিম এশিয়ার এবং দুর্ভিক্ষের প্রাচীনতম বিচরণভূমি বাংলাদেশে মহা-দুর্ভিক্ষের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। এত ব্যাপক দুর্ভিক্ষ সম্ভবতঃ অনেককাল দেখা যায়নি।

মৃত্যুর কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এক হিসাব মতে গত জুলাই মাসের বন্যার সমস্ত ফসল এবং পরবর্তী মৌসুমের বীজধান বিনষ্ট হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে এবং পার্শ্ববর্তী ভারতের পশ্চিম-বংগে কয়েক লাখ লোক মারা গেছে।

ঢাকার 'সেভ দি চিলড্রেন ফাণ্ড'-এর কো-অর্ডিনেটর মিঃ মাইকেল প্রোসার বলেন, "আমাদের চরম আশঙ্কাই ফলে গেছে। আমরা এমন একটা বিপর্যয়ের সূচনাতে আছি যা আমি এই উপমহাদেশে গত ৩১ বছর দেখিনি।

"বসন্তের আগে নতুন ফসল উঠবে না। বাইরের দুনিয়া থেকে যদি বাংলাদেশ প্রতি সপ্তাহে ১ লাখ টন খাদ্যশস্য ও তদসঙ্গে প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল সাহায্য না পায়, আমার ভয় হচ্ছে, বহু লোকের জীবন বিপন্ন হবে।"

বস্তুতঃ বাংলাদেশের একটি অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যান হচ্ছে এই যে, দেশের সবগুলো হাসপাতাল মিলিয়ে শিশুদের জন্য সর্বমোট ৭৫টি বেড আছে—অর্থাৎ প্রতি দশ লাখে একটি।

মীরপুর শরণার্থী শিবিরের প্রকাণ্ড লৌহ-কপাটের বাইরে বহু নারী ও শিশু ভীড় করে আছে। গেটের সামনে একজন সিপাই পুরানো ৩০৩ রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে। তার কাজ আশ্রয়-প্রার্থীদেরকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখা।

এ সব শরণার্থীদের অধিকাংশই ঢাকা থেকে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত সবচেয়ে দুর্ভিক্ষ-কবলিত রংপুর জেলা থেকে এসেছে। অনেকেই এতটা পথ পায়ে হেঁটে এসেছে। অন্ততঃ দু'দিন তাই এদের পেটে কিছু পড়েনি। দেখে মনে হ'ল মাত্র দু'টি ছাড়া সব ক'টি শিশুই বসন্ত রোগে আক্রান্ত। এরা এত দুর্বল যে গা থেকে মাছিও তাড়াতে পারে না। এদিকে রিলিফ ক্যাম্পেও তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

বরাবর যেমন হয়ে থাকে আমার ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। একজন বিদেশী সাংবাদিককে দেখে ক্যাম্পের গেট খুলে দেওয়া হ'ল। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

আবদুস সালাম সবাইকে ভেতরে প্রবেশের জন্য ইংগিত করলেন। আর ওমনি ওরা প্রাণপণ ছুটল ভেতরে। এ কথা আমি আক্ষরিক অর্থেই বলছি।

জনাব সালাম বললেন, "এখানে তিন হাজার শরণার্থী রয়েছে। শুক্রবার থেকে সবাইকে দেওয়ার মত খিচুড়ী জুটবে না। শনিবারে হয়ত কিছু আমেরিকান বিস্কুট পেতে পারি। যেভাবেই হোক আমরা যোগাড় করতে চেষ্টা করছি।"

এ দেশে একটি শিশুকে একটু গুড়া দুধ ও এক মুঠো দানা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে মাত্র ২৫ পেন্স খরচ হয়। শুক্রবার থেকে আবদুস সালাম তাও পাবেন না।

একটি তিন বছরের শিশু—এত শুকনো মনে হ'ল যে, যেন মায়ের পেটে থাকাকালীন অবস্থায় ফিরে গেছে---আমি তার ছোট হাতটা ধরলাম। মনে হ'ল তার চামড়া আমার আঙ্গুলে মোমের মত লেগে গেছে।

এই দুর্ভিক্ষের আর একটি ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান এই যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর হিসাব মতে ৫০ লাখ মহিলা আজ নগ্নদেহ। পরিধেয় বস্ত্র বিক্রি করে তারা চাল কিনে খেয়েছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে এবং আমার গাড়ী ইসলামিক মানব কল্যাণ সমিতি আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম-এর লরীর পিছনে পিছনে চলেছে। এই সমিতি রোজ ঢাকার রাস্তা থেকে দুর্ভিক্ষের শেষ শিকারটিকে কুড়িয়ে তুলে নেয়। সমিতির ডাইরেক্টর ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ জানালেন, "স্বাভাবিক সময়ে আমরা হয়ত ক' ডজন ভিখারীর মৃতদেহ কুড়িয়ে থাকি, কিন্তু এখন মাসে অন্ততঃ ৬০০ লাশ কুড়াচ্ছি---সবই অনাহারজনিত মৃত্যু।"

লরীটা যখন গোরস্থানে গিয়ে পৌঁছাল ততক্ষণে সাতটি লাশ কুড়ান হয়েছে। এদের মধ্যে চারটি শিশুর। সব ক'টি বেওয়ারিশ।

লাশগুলো সাদা কাপড়ে মুড়ে সংক্ষিপ্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর গোরস্থানের এক প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে গত মাসে দুর্ভিক্ষে যারা মারা গেছে তাদের কবর খুঁড়ে নতুন দাফনের জায়গা করা হয়।

এ ধরনের দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি। প্রকৃতি আর মানুষ মিলে যদি কখনো বেলসেন আর অশউৎসের অসংখ্য কবর নতুন করে রচনা করার চেষ্টা করে থাকে, তাহলে তারা এই গোরস্থানে সফল হয়েছে।

যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু কঙ্কাল আর কঙ্কাল---বোধ করি হাজার হাজার। প্রথমে লক্ষ্য করিনি। পরে বুঝতে পারলাম অধিকাংশ কঙ্কালই শিশুদের।

—ডেইলী মেইল, লণ্ডন, ডিসেম্বর ১৭, ১৯৭৪

দুর্নীতির খেসারত

—পিটার গীল

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান অর্থনৈতিক বিপর্যয়-সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ গালি-গালাজ করে চলেছেন। এ দিকে বাংলাদেশ ক্রমেই মানবিক দুঃখ কষ্টের এক অজানা অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

গ্রাম-বাংলায় প্রচুর ফসল হওয়া সত্ত্বেও একটি ইসলামিক কল্যাণ সমিতি গত মাসে ঢাকার রাস্তা, রেল স্টেশন ও হাসপাতালগুলোর মর্গ থেকে মোট ৮৭৯টি মৃতদেহ কুড়িয়ে দাফন করেছে। এরা সবাই অনাহারে মরেছে।

সমিতিটি ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে ২৫৪৩টি লাশ কুড়িয়েছে---সবগুলোই বেওয়ারিশ। এগুলোর মধ্যে দেড় হাজারেরও বেশী রাস্তা থেকে কুড়ান। ডিসেম্বরের মৃতের সংখ্যা জুলাইয়ের সংখ্যার সাতগুণ এবং অক্টোবরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় কুড়ান সংখ্যারও প্রায় দ্বিগুণ।

গেল সপ্তাহে ঢাকার একমাত্র আন্তর্জাতিক হোটেলের ৫০০ গজের মধ্যে একটি যুবকের মৃতদেহ শীতের রৌদ্রে পড়েছিল। জনাকীর্ণ এয়ারপোর্ট রোডে গাড়ী ও পথচারীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এর পাশ দিয়ে চলাচল করেছে। পরে লাশটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

গ্রাম-বাংলার ছিন্নমূল হতাশ মানুষেরা আজ ঢাকার পেশাদার ভিখারী-দের স্থান নিয়েছে। পিতা শিশুদের নিয়ে রাস্তার চত্বরে নির্জীবের মত বসে আছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সপ্তাহখানেক আগে নতুন জরুরী অবস্থার নামে শেখ মুজিব একচ্ছত্র ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন। মনে হয় দৃঢ় কিংবা কার্যকরী সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা তার নেই। তার দেশবাসী কেউ কেউ তাকে রাজা কেনিয়ুটের সাথে তুলনা করছেন---তিনি অরাজকতা ও আর্থিক অব্যবস্থা রূপ সমুদ্রকে পিছু হটতে নিষ্ফল হুকুম জারি করে চলেছেন।

মন্ত্রীরা ব্যাখ্যা করছেন, নিরাপত্তা বাহিনীর গ্রেফতার করার ও বিনা বিচারে আটক রাখার ক্ষমতাকে আইন-আদালতের এখতিয়ারের বাইরে সরিয়ে তাদের "মনোবল বাড়ানোর" জন্য জরুরী অবস্থা একটি পরিকল্পিত কৌশল মাত্র।

অত্যন্ত ধিকৃত রক্ষী-বাহিনী খোদ প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে। গেল বছর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এই বাহিনীকে একটি 'অবৈধ' এবং 'সম্পূর্ণ নিয়মবিরোধী' কার্যকলাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। শেখ মুজিবকে আজ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বোঝা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ছোট-খাট স্বজনপ্রীতির ব্যাপারে তিনি ভারী আসক্তি দেখান। ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া বাকী পড়ে থাকে।

সিনিয়র অফিসাররা অভিযোগ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী তাদের ক্ষমতা খর্ব করে চলেছেন। তিনি জুনিয়র অফিসারদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন—বিশেষ করে যাদের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক কিংবা রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে।

অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের বিশ্বাস, আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকট রোধ করার কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম এ সরকারের নেই। রাজনৈতিক মহল মনে করেন, মুজিব খুব শীঘ্রই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বুনিয়াদ আরো নষ্ট করে দেবেন। তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করার পরিকল্পনা করছেন। নতুন জরুরী অবস্থার ফলে আওয়ামী লীগের ভেতরে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা স্তব্ধ হয়ে যাবে।

—ডেইলী টেলিগ্রাফ, লণ্ডন, জানুয়ারী ৬, ১৯৭৫

বেওয়ারিশ লাশের সংখ্যা বাড়ছে

—কেভিন রেফার্টি

সম্প্রতি FAO-এর সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ বোয়েরমা বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ এড়াবার জন্য সমৃদ্ধশালী দেশগুলোর কাছে আরো অধিক পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু একই সময়ে নেতৃস্থানীয় এবং প্রায় উচ্চ-পদস্থ বাঙালীদের কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে, সাহায্যকারী দেশগুলোর বাংলাদেশ থেকে কার্যক্রম প্রত্যাহার করে, বাংলাদেশকে নিজের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

বিশাল উন্নয়ন-পরিকল্পনার স্বপ্ন বাংলাদেশে এসে শেষ হয়ে গেছে। অন্যত্র বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ধনী দেশগুলো সাহায্য করছে—তারা ভাবতে পারছে যে, সে সব দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে তারা সহায়তা করছে, তারা আরো ভাবতে পারছে যে, সে-সব দেশের লোক ধীরে ধীরে অধিকতর ধনবান হবে এবং কয়েক বছরে কিংবা কয়েক দশকে নিজেদের পায়ে

দাঁড়িয়ে "যাত্রা" শুরু করতে পারবে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে তারা বড় জোর এটুকু ভাবতে পারে যে, তারা এ দেশে টাকা ঢালছে যাতে এ দেশের গরীব জনসাধারণ আরো গরীব না হয়।

স্পষ্টতঃ বাংলাদেশে পরাজয়ের সংগ্রাম চলছে। দিনে দিনে বাংলাদেশ আরো গরীব হচ্ছে। কল্পনা করা শক্ত কিন্তু বাস্তব এটাই যে, আজকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাধীনতার সমকার অবস্থা থেকে অনেক শোচনীয়। খাদ্য ঘাটতি আগের চেয়ে অনেক বেশী। শতকরা ৮০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাট-এর উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ কমে গেছে। শিল্প উৎপাদন এখনো ১৯৬৯-৭০-এর মাত্রায় পেঁছায়নি—যদিও লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক মিলিয়ন।

সাহায্যকারী দেশগুলোর উদ্বেগের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের 'ব্যালেন্স অব পেমেন্ট'-এর মোট ঘাটতি পূরণ করে তারা দেখতে পাচ্ছেন যে, দুর্নীতি ও অপচয়ের ফলে দেশটির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন প্রকল্পের শেষ ধাপে উন্নয়ন প্রচেষ্টা নিশ্চিত করার জন্য শতকরা ১০ ভাগ বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন খুব বেশী। আমদানীর জন্য প্রায় ১'৪ বিলিয়ন ডলার আবশ্যক। কিন্তু চলতি বছরে রপ্তানী থেকে খুব আশা-বাদী হয়ে হিসাব করলেও, ৪৫০ মিলিয়ন ডলার অর্জিত হবে না। ফলে ১'১ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি থেকে যায়। এই বিরাট ঘাটতি বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের সাহায্যে পূরণ করতে হবে।

কয়েকটি সাহায্যকারী দেশ এ বছরে শিল্প-কারখানার জন্য অত্যা-বশ্যকীয় অতিরিক্ত কারিগরি যন্ত্র-সরঞ্জাম পাঠিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। কাস্টমস্ থেকে মাল ছাড়াবার জন্য তাদের ১৫০ পার্সেন্ট শুল্ক ও ট্যাক্স দিতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ যে অবস্থায় চলছে, তাতে সাহায্যকারী দেশগুলো খুব ক্ষুব্ধ। বাংলাদেশ সরকার অনেকগুলো তথাকথিত "সমাজতান্ত্রিক" কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, যার ফলে শ্রমিক নেতাদের লালসা বাড়ান ছাড়া আর কিছু সাধিত হয়নি। এদিকে প্রতিটি সিদ্ধান্ত সরকারী লাল ফিতার চাপে এমনি আটকিয়ে থাকে যে, কোন ফলপ্রসূ পদক্ষেপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে, "র‍্যাকেটিয়ার্স" ও মুনাফাবাজরা নির্বিঘ্নে বিপুল মুনাফা কুড়াচ্ছে। কেননা, রাজনৈতিক চাঁইদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

সুবিস্তৃত ইউ. এন. 'এইড অপারেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ টনী হেগেন হিসেব করে দেখেছেন যে, রিলিফ সামগ্রীর সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রকৃত দুঃস্থ লোকদের হাতে পৌঁছেছে।

শুধু নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দুর্নীতির মাধ্যমেই যে আওয়ামী লীগ দেশকে ধ্বংস করেছে, তা' নয়। ভয়াবহ খাদ্য-পরিস্থিতি ও গ্রাম-বাংলায় দুর্ভিক্ষ গ্রামের সামাজিক কাঠামোর ওপরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অনেক জেলায়, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে, কৃষকেরা তাদের জমি-জিরাত বিক্রি করে খাদ্য কিনতে বাধ্য হচ্ছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে, উত্তরবঙ্গে ১ লাখ বিঘা জমি হস্তান্তরের দলিল সম্পাদিত হয়েছে। এ সব জমি প্রধানতঃ আওয়ামী লীগের স্থানীয় চাঁইরা সস্তায় কিনে নিয়েছেন।

পুরান ঢাকায় নদীর পাড়ে উপবিষ্ট আট জনের একটি পরিবারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। এরা এই মাত্র খাওয়া শেষ করেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : "তোমরা কোথা থেকে এসেছ ?" ওরা বলল : "ফরিদপুর থেকে।" প্রশ্ন করলাম : "টাকা-পয়সা কত কি আছে ?" ওরা জবাব দিল : "খাবার কিনে সব খরচ করে ফেলেছি।" "তবুও", আমি আবার প্রশ্ন করলাম : "কত খাবার তোমাদের অবশিষ্ট আছে?"—"এইমাত্র শেষটুকু খেয়ে নিয়েছি।"—ওরা জবাব দিল।

—ফিনানসিয়াল টাইম্স, লণ্ডন, জানুয়ারী ৬, ১৯৭৫

যেখানে ক্ষুধাই একমাত্র সত্য

—জুলিও শেরার

মীরপুরে একজন সৈন্য 'শর্ট গান' ঝুলিয়ে রিফিউজী ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে। গেটের ভেতরে কাঠ, আবর্জনা ও কাদা স্তূপাকার হয়ে আছে। মাঝখানে একটি ছোট্ট বদ্ধ ডোবা। ডোবার এক পাশে পুরুষ ও অপর পাশে মেয়ে রিফিউজীরা তাদের রোজকার বরাদ্দ খাবারের জন্য 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চোখগুলো গর্তে ঢোকা, দেহগুলো হাড্ডিসার। বরবটির খিচুড়ীর বড় হাঁড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ওরা তাকায় যেন কোন অজানার গভীর থেকে। কোন এক রহস্যজনকভাবে ওদের রক্ত-হীন চিমসে যাওয়া দেহের ভেতরে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস কাজ করে চলেছে। শিশুরা ব্যারাকের পাকা মেঝেতে ঘুমায়, কাঁদে, চীৎকার করে। নগ্ন অথবা

অর্ধ-নগ্ন ওরা। ওদের গায়ের চামড়া ক্ষতে ছেয়ে আছে, চোখ থেকে পিঁচুটি গলে পড়ছে। ওদের গায়ের চারিপাশে মাছি ছুটে বেড়ায়।

আবদুল মজিদ—যিনি ক্যাম্পের চার্জে আছেন—বললেন, তিনি এসব সহ্য করতে পারছেন এই জন্যই যে, এগুলো তার গা-সওয়া হয়ে গেছে। তার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, রিফিউজীদের কষ্ট বলে কিছু নেই, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগেই ওদের আত্মা বেরিয়ে যায়। "ওরা ক্ষুধার মূর্ত রূপ"—বললেন তিনি।

কলেরা ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। প্রতি হাজারে দু'জন কিংবা আরো বেশী লোক কলেরায় মারা যাচ্ছে। সঠিক হিসাব কারো কাছেই নেই। হেল্থ অফিসাররা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তারা স্বীকার করেছেন, "মহামারী আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।" কলেরার পাশাপাশি ডায়রিয়া আক্রমণ চালিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোগীর দেহের ওজন ১০ কমে যায়। শরীরের লবণ বেরিয়ে যায়। সে পড়ে থাকে নির্জীবের মত। ঘুমায়ও না—মরেও না। জীবন ও মৃত্যুর টানাপোড়েনে দোল খেতে থাকে। আমরা তাদেরকে মহাখালী হাসপাতালে দেখেছি।

জয়নুল আবেদীন বাংলাদেশের সবচেয়ে সুপরিচিত শিল্পী। তাঁর আঁকা ছবিতে বাংলাদেশের দুঃখ-দৈন্যের চিত্র ফুটে ওঠে, "কেননা আমার এ চোখ আর কিছুই দেখতে পায় না"; তাঁর ছবি অনাহার মৃত্যুকে বর্ণনা করে, 'কেননা, অন্য কিছু আমার অন্তরকে স্পর্শ করে না।"

হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল গড়নের স্বাস্থ্য মন্ত্রী—যিনি মেহমানদেরকে চা, বিস্কুট আর কলা দিয়ে আপ্যায়িত করেন—বললেন যে, "শতকরা ৫০ জন বাঙালীই কম-বেশী ক্ষুধার্ত।"

—টাইম্স্ ক্যানসাস জানুয়ারী ২০, ১৯৭৫

মুজিবের তৈরী বিপর্যস্ত এলাকা

—জেকুইস লেসলী

"আমাদেরকে খাবার দাও, নতুবা গুলী করে মেরে ফেল"—ডেমরা ক্যাম্পের এক বৃদ্ধ বিষণ্ণভাবে বলে উঠল। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত ডেমরায় নিরাশার মর্মস্পর্শী অনুভূতি স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

প্রায় মাস খানেক আগে সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশ ৫০,০০০ বাসিন্দাকে ঢাকার বস্তী এলাকায় তাদের ঘর-বাড়ী থেকে উৎখাত করে একটি অনুর্বর

দ্বীপের ক্যাম্পে নিয়ে আসে। শেখ মুজিবুর রহমান দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার এবং শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখার পর সরকার যে কয়টি পদক্ষেপ নিয়েছেন---এটা তার একটি।

কিছুসংখ্যক পর্যবেক্ষক বিশ্বাস করেন যে, এই উৎখাত অভিযান সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাস দূর করার মতলবেই পরিচালিত হয়েছে। অভিযান শুরু হবার সপ্তাহখানেক পরে বাংলাদেশের পূর্ত মন্ত্রী সোহরাব হোসেন এই উৎখাত কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন, "বস্তীগুলো ছিল এমন যায়গা যেখানে সামাজিক অসন্তোষ সংঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক বিক্ষোভের আকার নেয় এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ জন্ম লাভ করে।"

সরকারের এই পদক্ষেপে বড় জোর ঢাকা শহরের গায়ে একটু প্রসাধন মাখাবার চেষ্টা প্রতিফলিত হয়। তবে এতে ঢাকার চেহারা বদলাবে না। ঢাকা এয়ারপোর্ট রোডের পাশে একটি বস্তী সম্পূর্ণ সাফ করে দেওয়া হয়েছে। একজন বিদেশী কর্মকর্তা বললেন, সারা এলাকাটা "সরকারের পক্ষে আতংকিত হবার কারণ ছিল।"

রিপোর্টাররা ডেমরা ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন আর বাসিন্দারা একের পর এক খাদ্য ও ওষুধের জন্য অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। আগন্তুকদের কয়েকটি পর্ণ কুটীরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে কতগুলো মুমূর্ষু লোক মাটিতে পড়ে আছে। এক মা' জনৈক সাংবাদিকের হাত টেনে নিয়ে তার জরাগ্রস্ত শিশুটির পেটের ওপর চেপে ধরল।

এখানকার দুঃখ-কষ্ট খাদ্যাভাবে প্রকট হয়নি। বরং, মনে হয়, পরিকল্পনার অভাব এবং লোকজনদের ভাগ্যের প্রতি সরকারের উদাসিনতার ফল। ক্যাম্পগুলো না খোলা পর্যন্ত এগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ত্রাণ-পুনর্বাসন এজেন্সিগুলোকে জানানোই হয়নি। ঢাকার 'সেলভেশন আর্মি'র প্রধান প্রতিনিধি ইভা ডেন হারটগ জানালেন, "কাউকে কিছুই জানান হয়নি। সরকার চান না যে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক। তারা চান এটা বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাক্।"

এক বাঙালী মহিলা তার মৃত শিশুকে কোলে করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভীড় ঠেলে ঢুকে দাফন করার মত এক টুকরো কাপড়ের জন্য ক্যাম্পের অফিসারদেরকে অনুরোধ করতে লাগল। মহিলাটি জানাল যে, সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুরোধ করেছে, কিন্তু অফিসাররা তাকে এই

বলে সরিয়ে দিয়েছে যে, "যে-কোন জিনিসের জন্য আবেদন-পত্র চাইতে কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।"

যখন জনৈক রিপোর্টার ক্যাম্পের একজন বাসিন্দার কাছে মন্তব্য করলেন যে, শেখ মুজিব---যাকে বহু বাঙালী জাতির জনক হিসাবে সম্মান করে---যে জেলা থেকে এসেছেন, তিনিও তো সে জেলা থেকেই এসেছেন, লোকটি তখন তাকে থামিয়ে দিল এই বলে যে, "ও কথা আর মুখে আনবেন না।"

—গার্ডিয়ান, লণ্ডন, ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৯৭৫

বাংলাদেশ এক বিরাট ভুল

বাংলাদেশ যেন এক বিরাট ভুল। একে যদি ভেঙ্গে-চুরে আবার ঠিক করা যেত।

জাতিসংঘের তালিকায় বাংলাদেশ সবচেয়ে গরীব দেশ। বস্তুতঃ এর কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। ১৯৭০ সালের শেষে যখন বন্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দেশের দক্ষিণ অঞ্চল ডুবে যায়, তখন দুনিয়ার দৃষ্টি এ দেশের---অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের উপর নিবদ্ধ হয়। বিরাট রিলিফের কাজ সবে শুরু হয়েছিল, এমনি সময়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষী সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হতে থাকে। ১৯৭১ সালে সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের অপ্রতিরোধ্য সাফল্যের পরই বাঙালীরা তাদের অভিযোগ প্রকাশে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ যখন শুরু হ'ল, তখন জয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। একমাত্র ভারতের সাগ্রহ সামরিক হস্তক্ষেপের ফলেই স্বল্পস্থায়ী---কিন্তু ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী---যুদ্ধের পর পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে এবং বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। বিশ্বের জাতিপুঞ্জ আবার সাহায্যার্থে দ্রুত এগিয়ে আসল---এবার তাদের নিজ নিজ প্রাধান্য বজায় রাখার তাগিদে।

উড়োজাহাজ থেকে মনে হয়, যে-কোন প্রধান শহরের মত রাজধানী ঢাকাতেও বহু আধুনিক অট্টালিকা আছে। কিন্তু বিমান বন্দরে অবতরণ করা মাত্রই সে ধারণা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। টার্মিনাল বিল্ডিং-এর রেলিং ঘেঁষে শত শত লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, কেননা তাদের অন্য কিছু করার নাই। আর যেহেতু বিমান বন্দর ভিক্ষা করবার জন্য বরাবরই উত্তম

জায়গা। ওসব আধুনিক অট্টালিকা? সবগুলোই বস্তুতঃ অসমাপ্ত। পাকিস্তানীরা চলে যাবার পর সিমেন্ট ও আন্তর্জাতিক সাহায্য ফুরিয়ে গেছে। তখন থেকে এগুলোর কাঠামো সাজান রয়েছে। যেগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে এসেছিল সেগুলোও বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সিমেন্টের মত রং-ও কালোবাজারে অগ্নিমূল্য না দিলে পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ বাংলাদেশ কালোবাজারের উপরই চলছে। মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও 'শ্যানেল' পারফিউম থেকে শুরু করে শিশুদের মনোহারী খেলনায় দোকান-পাট জাম হয়ে রয়েছে। অগ্নিমূল্য দিলে সব কিছুই পাওয়া যায়। যেমন চিনি এক পাউণ্ড (প্রায় আধাসের)=১৬ টাকা। লবণেরও তাই দাম। বাঙালীদের প্রধান খাদ্য চাউলের দাম প্রতি পাউণ্ড ২০ পেন্স (৪ টাকা)। এই দ্রব্যমূল্যের পাশাপাশি একজন বাঙালী দিনমজুরের দৈনিক উপার্জন মাত্র ৫ টাকার মত, অর্থাৎ ৩০ পেন্স। তাছাড়া প্রতিদিন সে যে কাজ পাবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশ এক অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির মুঠোয়। গত পনের মাসে চাউলের দাম চার গুণ বেড়েছে। সরিষার তেলের দাম তিন গুণ ও কেরোসিন তেলের দাম হয়েছে দ্বিগুণ। কিন্তু মাইনে বাড়েনি কারো। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই যে, এই মুদ্রাস্ফীতির কারণ বাজার দরের কারসাজি এবং ব্যাপক দুর্নীতি—যে দুর্নীতি এই হতাশাগ্রস্ত দেশটির সর্বস্তরে ছড়িয়ে আছে।

ঢাকা এবং অন্যান্য বড় শহরে, যেমন খুলনায়, যারা ভীড় করে আছে, তারা গ্রাম-বাংলায় যারা রয়েছে তাদের চাইতে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান। কেননা তাদের হাত পেতে কিছু পাওয়ার আশা আছে। গ্রামের লোকেরা মনে করে যে, এসব শহরের রাস্তাগুলো বুঝি সোনায় মোড়া। ফলে প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার বুভুক্ষু-অর্ধভুখ মানুষ শহরে এসে ভীড় করছে। প্রতিটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়, আর প্রতিটি ফাঁকা জায়গায় গড়ে ওঠে নিঃস্ব, ক্লান্ত চাষীদের পর্ণকুটীর। এমনি করে মাদুর, চাটাই, বাঁশ কিংবা দু' এক টুকরো কাঠ বা এক খণ্ড লোহার জোড়া-তালি দেওয়া এসব ক্ষুদ্র ছাপরার স্তূপীকৃত 'বস্তীগুলো' ছিল হাজার হাজার গ্রাম ত্যাগী ছিন্নমূল মানুষের বাসভবন। কিন্তু দুই মাস আগে প্রতিটি ঘর ভেংগে সমান করে দেওয়া হয়েছে এবং অধিবাসীদেরকে জোর করে শহরের সীমানার বাইরে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দৃশ্যতঃ সরকার বর্বরোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন শহরগুলোকে পুতিগন্ধময় বস্তীমুক্ত করার সত্যিকার তাগিদে। যেভাবে বস্তী বেড়ে উঠছিল, তাতে বাংলাদেশের শহরগুলো অচিরেই কোলকাতায় পরিণত হ'ত, যেখানে কর্তৃপক্ষ বস্তী নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা হতাশ হয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সরকারের ভয়ও ছিল যে, বস্তীগুলো প্রতিটি বড় শহরে রাজনৈতিক বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। সশস্ত্র হামলার সাম্প্রতিক নাটকীয় বৃদ্ধিতে সম্ভবতঃ এর ইঙ্গিত রয়েছে।

আমি এসব ক্যাম্পের একটি দেখেছি ঢাকার বাইরে টঙ্গীতে, অপরটি খুলনা শহর থেকে দু' মাইল দূরে মজগুনি'তে। এগুলো নীচু ধান জমির উন্মুক্ত এলাকায় অবস্থিত, আসছে বর্ষায় যেখানে ২।৩ ফুট পানি জমবে। টঙ্গীতে ২৫ হাজার উদ্বাস্তু বাস করছে। এখানে আন্তর্জাতিক রিলিফ সংস্থাগুলোর একটি গ্রুপ একযোগে সাহায্যের কাজে এগিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে 'সেভ দি চিলড্রেন' প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। মজগুনিতে অবস্থা আরো শোচনীয় দেখলাম, কেননা সেখানে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই। এ দু'টি ক্যাম্প—বস্তুতঃ বস্তী উচ্ছেদের পর বাংলাদেশের সব কয়টি ক্যাম্পই—ভেঙ্গে ফেলা বস্তীগুলোর নিছক প্রতিকৃতি মাত্র: সেই একই জোড়া-তালি দেওয়া অস্থায়ী কুঁড়েঘর। অধিবাসীদের মনোবল আরো ভেঙ্গে পড়েছে। সাড়ে তিন লাখ থেকে চার লাখ উর্দু ভাষা-ভাষী বিহারী, যারা এখনও বাংলাদেশে পড়ে আছে, তাদেরও একই সমস্যা।

সবগুলো ক্যাম্পই রোগের উৎপাদন ক্ষেত্র। বসন্ত, টাইফয়েড, আমাশয়, কলেরা এবং যন্ত্রণা বাংলাদেশে বরাবর লেগেই আছে। পুষ্টিহীনতায় দুর্বল ক্যাম্পবাসীদের কি বিপদ হতে পারে তা' সহজেই অনুমেয়।

যখন দেখা যায়, যেমন আমি দেখছি, গোটা গ্রামের লোক অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; যখন শোনা যায়, যেমন আমি শুনছি, বিলাপ করছে, চোখের সামনে তার সন্তান খাবারের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, যখন বলা হয়। যেমন আমাকে বলা হয়েছে, অমুক গ্রামে কেউ গান গায়না, কেন না তারা কি গাইবে? যখন দেখা যায়, যেমন আমি দেখছি, একটি শিশু তার চোখে আগ্রহ নেই, গায়ে মাংস নেই, মাথায় চুল নেই, পায়ে জোর নেই, অতীতে তার আনন্দ ছিল না, বর্তমান সম্পর্কে তার সচেতনতা নেই এবং ভবিষ্যতে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না সে, তখন সাহায্যের প্রয়োজন এবং সাহায্যের মূল্য কতই না ভয়ঙ্কররূপে বাস্তব হয়ে ওঠে।

—ব্রাডফোর্ডশায়ার মার্চ ২১, ১৯৭৫

একটি বীভৎস ক্যাম্পে

—জু গেগুল্‌ম্যান

এমন এক সময় ছিল, যখন হাতেম আলী রিকশা চালিয়ে তার পরিবারের (সংখ্যায় তারা সাত জন) ভরণ-পোষণ করতে পারত।

তারপর একদিন সরকার তাকে তার ঢাকার বস্তীর বাড়ী থেকে জোর করে ট্রাকে উঠিয়ে শহরের বাইরে টঙ্গীতে এনে ফেলল। সেখানে তাকে এক ফালি জমি দিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে বলা হ'ল। ঢাকার বস্তীগুলো ইতিমধ্যে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

হাতেম আলী ঢাকার রিকশা চালাতে চেয়েছিল। কিন্তু ৪০ টাকা (প্রায় ৬ ডলার) ঘুষ না দিলে অফিসাররা তাকে লাইসেন্স দেবে না। সে যখন বলল, 'এই ফী' সে দিতে পারবে না, তখন তারা ক্ষেপে গিয়ে ইংরেজীতে তাকে প্রশ্ন করা শুরু করল। সেও তাদের মুখের উপর বাংলায় জবাব দিল, "ইংরেজী জানব কেন? যদি ইংরেজীই জানতাম, তাহলে তো কেরাণীই হতাম, রিকশা টানতাম না।" সুতরাং হাতেম আলী টঙ্গীতেই আছে।

আহন বানুর স্বামী যখন রিকশাওয়ালা ছিল তখন তাদের স্বচ্ছলতা ছিল। আহন বানু নিজেও ঢাকার আয়া বা 'বেবী সিস্টার' হিসাবে সপ্তায় ৩০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) উপার্জন করত। কিন্তু সরকার তাকে ঢাকার বস্তী থেকে উঠিয়ে টঙ্গীতে নিয়ে এসেছেন।

হাতেম আলী আর আহন বানু। টঙ্গীতে নিয়ে আসা ৬,৫৭৫টি অনুমোদিত ও ২,০০০ অননুমোদিত পরিবারের ৫৫.০০০ লোকের মধ্যে দু'জন।

এরা আজ এখানে। তার কারণ গত গ্রীষ্মের মৌসুমে প্রকৃতি বড় নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। ভয়াবহ বন্যা হ'ল। বন্যার পর-পরই দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। ২৭,০০০ (সরকারী হিসাবে), থেকে ৩,০০,০০০ (বেসরকারী হিসাবে) লোক প্রাণ হারান। আর হাজার হাজার বাঙালী খাদ্য, আশ্রয় আর কাজের সন্ধানে ছুটে চলল।

তাদের ভরসা ছিল শহরগুলো। এবং অনেক ছিন্নমূল মানুষের ধারণায় বাংলাদেশের রাজধানী ছিল "সোনার ঢাকা"। কিন্তু রূপকথার কাহিনীর মত সে সোনা শুধু ছলনা প্রমাণিত হয়েছে।

ঢাকার আসা মাত্রই রিফিউজীদেরকে বস্তীতে থাকার জন্য ভাড়া দিতে হ'ত। দু'টি বাঙালী প্রতিষ্ঠান এই ভাড়া আদায় করত। বস্তীর জমিতে আইনতঃ তাদের কোন অধিকার ছিল না, কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে তারা ক্ষমতাশালী ছিল।

বাংলাদেশ রেডক্রসের প্রধান গাজী গোলাম মোস্তফা ছিলেন বস্তীর লর্ড। অনেকেরই বিশ্বাস, তিনি বিপুল পরিমাণ রিলিফ সামগ্রী আত্মসাৎ করে পকেট ভারী করেছেন।

জনৈক রিলিফ অফিসার গোপনে বললেন, মোস্তফা "সত্যিই ভয়ঙ্কর লোক"। তার প্রসঙ্গ তুললেই বাংলাদেশ সরকারের মেজাজ চড়ে যায়---মেজাজ আরো চড়ে যায় বস্তীর কথা বললে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর প্রথম ক্ষমতা প্রদর্শনে শেখ মুজিব বস্তীগুলো ভেঙ্গে সমান করে দিয়ে রিফিউজীদের ঢাকার বাইরে বিভিন্ন সরকারী ক্যাম্পে পুনর্বাসন করেছেন। ঢাকার অধিবাসীরা এতে খুব খুশী হয়েছে। ওয়াকেফহাল মহল বলেন, মুজিবের এ ব্যবস্থা গ্রহণের আংশিক কারণ হ'ল এই যে, বস্তীগুলোতে গাজী গোলাম মোস্তফার প্রাধান্য ছিল।

বিদেশী সাংবাদিকরা---যারা স্বল্পকালের জন্য বাংলাদেশ সফরে আসেন—তাদের কাছে গত কয়েক মাসে টঙ্গী একটি চাঞ্চল্যকর 'হরর স্টোরি' হয়ে উঠেছে। ১২টি কেন্দ্র, ১২টি গ্রাম, অসংখ্য ভাঙ্গাচুরা অস্থায়ী কুঁড়ে ঘর---দৃশ্যতঃ যেন একটা গোটা বস্তীকেই উঠিয়ে আনা হয়েছে।

অথচ টঙ্গীর জন্য বস্তুতঃ কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। রেডক্রস খাবার সরবরাহ করছে। একটি নতুন টিউবওয়েল বসান ছাড়া সরকার এ পর্যন্ত আর কিছু করেনি।

যদিও বাংলাদেশের পটভূমিকায় টঙ্গী এতটা ভয়ঙ্কর নয়, যতটা কেউ কেউ বলে থাকেন। তবুও মনস্তাত্ত্বিক এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য দিক দিয়েও এর ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

ঢাকার বস্তীজীবন কঠোর ছিল বটে, কিন্তু অনেক বস্তীবাসীরই চাকুরী ছিল। টঙ্গী ক্যাম্পে শতকরা মাত্র ৫ জনের নিয়মিত রোজগারের ব্যবস্থা আছে, শতকরা ১৫ জন অনিয়মিতভাবে রিকশা, বেবী টেক্সী কিংবা ঠেলা গাড়ী চালায় আর বাদবাকী সবাই একদম বেকার।

অর্থ নেই বলে কর্মসংস্থানের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু কিছু কিছু সমালোচক বলেন যে, এ ধরনের ক্যাম্প সমস্ত চাহিদার জন্য সরকারের প্রতি নির্ভরশীলতার উৎসাহ যোগার মাত্র। আন্তর্জাতিক অর্থ সংকটে বিদেশী সাহায্য যখন অনিশ্চিত, তখন এ নির্ভরশীলতা বোকামী।

বৃষ্টি হ'লে টঙ্গীর ক্যাম্প অচিরেই জলাভূমিতে পরিণত হবে। টঙ্গী একেবারেই অরক্ষিত। বিশেষজ্ঞরা বিমর্ষভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, বৃষ্টি শুরু হলে টঙ্গী ৮ ফুট পানির নীচে ডুবে যাবে। আর তখনই টঙ্গী ক্যাম্পের বাসিন্দাদের সত্যিকার দুঃস্বপ্ন শুরু হবে।

—শিকাগো ডেইলী নিউজ মার্চ ২৬, ১৯৭৫

ভারতীয় আধিপত্যের কবলে বাংলাদেশ

—জেকুইস লেসলী

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বিপুল সহায়তায় স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির তিন বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের জনমত ভারতের প্রতি বিরূপ হয়ে গেছে।

ভারত ও বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারীরা এখনো বলেন যে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক খুবই আন্তরিক। কিন্তু বেসরকারী অধিকাংশ বাঙালীর মনোভাবে তা' প্রতিফলিত হয় না।

কোন নির্দিষ্ট অভিযোগের চেয়ে বরং ভারতের বিরুদ্ধে বহু বাঙালীর অভিযোগ এই যে, এশিয়া মহাদেশে ভারত প্রাধান্য লাভ করেছে এবং শুধু আয়তনের বিশালত্ব দ্বারাই ভারত বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত না করলেও প্রভাবিত করতে সক্ষম।

এই কিছুদিন আগে একজন মাঝারী শ্রেণীর বাংলাদেশী সরকারী কর্মচারী জনৈক পাশ্চাত্যদেশীর কাছে সবিদ্রূপ কৌতুকের ছলে বলেছিলেন, ''ভারত বলছে, পৃথিবীর মধ্যে সে-ই হচ্ছে বৃহত্তম গণতন্ত্রী। তাই যদি হয় তাহলে, বাংলাদেশ অবশ্যই পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম গণতন্ত্রী।''

বেশ কিছুসংখ্যক বাংলাদেশী এখন এই ধারণা পোষণ করেন যে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে---যে যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে---ভারতের প্রধান স্বার্থ ছিল পাকিস্তানকে ভেঙ্গে এই উপমহাদেশে স্বীয় প্রাধান্য নিশ্চিত করা।

'হলিডে' পত্রিকার সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ খান বললেন, ''বাংলাদেশ মূলতঃ একদিকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও অপরদিকে বাঙালীদের ইচ্ছার ফল।''

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ সমস্যার ফলেই ভারত সম্পর্কে বাঙালীদের মোহ কেটে গেছে কিছু বাংলাদেশী মনে করছেন যে, বাংলাদেশের সৃষ্টির জন্য ভারত যেমন প্রধানতঃ দায়ী, তেমনি বাংলাদেশের বর্তমান দুর্দশার জন্যও ভারত দায়ী।

অত্যন্ত উত্তেজনা-প্রবণ যে কয়টি সমস্যার সাথে বাংলাদেশ জড়িত আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভারত-সীমান্তের ১২ মাইল অভ্যন্তরে গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ। ডিসেম্বর মাসে যখন এই বাঁধ চালু করা হবে, তখন গঙ্গার পানি কলিকাতার পাশ দিয়ে বহমান হুগলী নদী দিয়ে প্রবাহিত হবে। গঙ্গার পানির এই ধারা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হ'ল কলিকাতা বন্দরকে তলানিমুক্ত করা---যে তলানির জন্য কলিকাতা বন্দর প্রায় অনাব্য হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশীরা ভয় করছে যে, এই পরিবর্তনের ফলে গঙ্গা নদীর নিম্নাংশ যা বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে—গ্রীষ্মের মৌসুমে একদম শুকিয়ে যাবে।

কিছুসংখ্যক বাংলাদেশী এ অভিযোগও করেন যে, ভারত সরকারই বাংলাদেশ থেকে পাট ও চাউল পাচারে উৎসাহ যোগাচ্ছে।

ভারতীয় সরকারী কর্মচারীরা স্বীকার করেছেন যে, বাংলাদেশের পাট ও চাউল পাচার হচ্ছে। তবে, তারা অস্বীকার করেন যে, এতে ভারত সরকারের হাত আছে। তারা যুক্তিসংগতভাবেই বলেন যে, ১৫০০ মাইল দীর্ঘ বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত পাহারা দেওয়া অসম্ভব। ''পাচারে উৎসাহ দিচ্ছে বলে ভারত সরকারকে দোষারোপ করা মোটেও সঙ্গত নয়। সীমান্তের উভয় পাশের ব্যবসায়ীরাই পয়সা বানাবার চেষ্টায় আছে।''---বললেন একজন ভারতীয়।

বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদেরই উৎসাহ রয়েছে সীমান্তের ওপারে কাঁচামাল পাচার করার। কেননা, সরকারীভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের মুদ্রার বিনিময় হার সমান হলেও কালোবাজারে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য বাংলাদেশী মুদ্রার দ্বিগুণ। ফলে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা চাউল ভারতে পাচার করে ভারতীয় টাকায় বিক্রি করে এবং সেই টাকা দিয়ে বাংলাদেশে যে সব জিনিসের অভাব, তা ভারত থেকে কিনে বাংলাদেশে এনে দ্বিগুণ দামে বিক্রি করে।

ভারতের একটা উদ্বেগের কারণ হচ্ছে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক। চীন হচ্ছে ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। যদিও, আজ পর্যন্ত চীন ও বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি, চীন তার রেডক্রসের মাধ্যমে বাংলাদেশে বন্যা-রিলিফের জন্য এক মিলিয়ন ডলার সাহায্য পাঠিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

বহু বাংলাদেশীর বিশ্বাস, ভারত কখনো বাংলাদেশকে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে দেবে না। এ প্রসঙ্গে জনৈক বাংলাদেশী সরকারী

কর্মচারী বললেন, "ভারত চায় বাংলাদেশ জোট-নিরপেক্ষ থাকবে..এবং এমন বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে না যা' ভারতের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর।

অন্যান্য পর্যবেক্ষকরা এর চেয়ে বেশী বলেন। "যদি বাংলাদেশের উপকূলে তেল পাওয়া যায়। আর ভারতের অবস্থা যদি আরো খারাপ হয়, তবে ভারত সরাসরি বাংলাদেশ উপকূল দখল করবে।"---ভবিষ্যদ্বাণী করলেন জনৈক বিদেশী অফিসার, "বাংলাদেশের ভাগ্য বাংলাদেশের হাতে নেই।"

—লস এঞ্জেলস্ টাইম এপ্রিল ৪, ১৯৭৪

ভারতীয় গ্রাসের ভয়ে বাংলাদেশ

এ বছর শরৎকালে হিমালয় পাদদেশের ক্ষুদ্র রাজ্যে সিকিমের উপর পক্ষ বিস্তার করে "ভারত মাতা" অজান্তেই বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী মনোভাবকে প্রজ্জ্বলিত করে দিয়েছে।

সিকিমের ঘটনার খবর বাংলাদেশের রাজধানীতে পেঁছার সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে ভারতীয় "সম্প্রসারণ-বাদের" বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে।

বাংলাদেশের অধ্যাপকরা এক প্রতিবাদলিপিতে লিখলেন, "সিকিমকে ভারতীয় অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার আইনকে আমরা সিকিমের সার্বভৌমত্বের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে মনে করি। এ ধরনের সম্প্রসারণনীতি ভারতের প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর প্রতি এক মারাত্মক হুমকী।"

"বাঙালীরা সিকিমকে কোন গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু তাদের ভয়, সিকিমের ভাগ্যে যা ঘটেছে বাংলাদেশের ভাগ্যেও মোটামুটি তাই রয়েছে, "---বললেন জনৈক পশ্চিমদেশীয় কূটনীতিবিদ। অপর একজন বললেন, "১৯৭১ সালে যখন নয়াদিল্লী বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন থেকেই বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে গেছে। সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে ভারত মুখ 'হা' করে এগিয়ে আসবে এবং যখন মুখ বন্ধ করবে তখন বাংলাদেশ ভারতের পেটের ভিতরে।

ভারতের সিকিম-গ্রাস প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের ভারত-ঘেঁষা সরকারেরও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। ভারতের সিকিম নীতির প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে জনৈক সরকারী কর্মচারী জবাব দিলেন, "ভারত একটি বৃহৎ শক্তি, আমাদেরকে বেষ্টন করে আছে।"

ভারতের সংবাদপত্রের একটি কার্টুন বিশেষ দুশ্চিন্তাদায়ক ছিল। কার্টুনটিতে এ ধরনের টিপ্পনী চিত্রিত করা হয় যে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সিকিমকে ট্রামে চড়িয়ে ভারতীয় পার্লামেন্টের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। অদূরে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবর্গ বাচ্চাদের ন্যাপকিন পরে দাঁড়িয়ে 'নার্সী'কে পরের বার তাদেরকে ট্রামে তুলে নিতে অনুরোধ করছেন।

"আমরা এর ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ভারত সরকার কোন জবাব দেননি"---অভিযোগ করলেন জনৈক বাংলাদেশী অফিসার। তিনি বললেন, "আমরা সিকিমের চেয়ে বড় এবং আমরা জাতিসংঘের সদস্য। কাজেই আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

কিন্তু বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত 'দৈনিক ইত্তেফাকের' ৩২ বছর বয়স্ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বললেন, "সিকিমে যেমন করেছে, তেমনি বাংলাদেশেও ভারত আভ্যন্তরীণ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে এবং এই সমস্যার অজুহাতে সে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে।"

বাংলাদেশীরা মুসলমান। ভারত প্রধানতঃ হিন্দু। কিন্তু ভারতের শ্বাস-রুদ্ধকর অর্থনৈতিক চাপে বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী মনোভাব তীব্রতর হচ্ছে, কেননা বাংলাদেশে যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দারুণ অভাব।

বাংলাদেশে যখন লাখ লাখ লোক অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, তখন বিপুল পরিমাণ চাউল বেআইনীভাবে সীমান্তের ওপারে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের হিসাব মতে এ বছর ১০ লাখ টন চাউল ভারতে পাচার হয়ে গেছে। এ পরিমাণ চাউল বাংলাদেশের জনসাধারণকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন।

বহু বাংলাদেশী আফসোসের সঙ্গে স্মরণ করে যে, পাকিস্তানে থাকতে তাদের পাট ও চায়ের তৈরী বাজার ছিল এবং বিনিময়ে তারা (পশ্চিম পাকিস্তান থেকে) নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল পেয়েছে।

আজ পাট বিক্রয়ের ব্যাপারে বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। অধিকন্তু, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশকে আকাশচুম্বী দামে খাদ্য-শস্য কিনতে হচ্ছে।

—হিউস্টন, টেক্সাস, নভেম্বর ৩, ১৯৭৪

হানিমুন শেষ

—ওয়াল্টার সোয়ার্জ

বাংলাদেশ ভারতীয় অস্ত্র এবং কূটনীতির শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর। বাংলাদেশের মুক্তির কাহিনী প্রায় পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনীর মতই চলেছিল এবং কূটনীতির প্রতি ধাপ তদারক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী স্বয়ং। তিনি এমন সুকৌশল এবং সূক্ষ্মতার সাথে কাজটি পরিচালনা করেছিলেন যা' নয়াদিল্লীর কূটনীতিতে সচরাচর দেখা যায় না।

নয়াদিল্লী বাংলাদেশের পক্ষ বরাবর সমর্থন করে আসছে। এমনকি তখনও যখন সমর্থন করার কোন যুক্তিই নেই। যেমন, বাটোয়ারার হিস্যা হিসাবে পাকিস্তানের কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাওনার দাবিকে নয়াদিল্লী সমর্থন করেছে।

শেখ মুজিবের পক্ষে যখন আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ল, নয়াদিল্লী তখন নীরবে তার জন্য বেসামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন করে ট্রেনিং দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে দিয়েছে।

'নাইট' কর্তৃক উদ্ধারকৃত তরুণীর মত বাংলাদেশ কোন অন্যায় করতে পারে না। এতদিন ভারতীয় সংবাদপত্রে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু চার বছর কেটে গেছে, হানিমুন শেষ হয়ে গেছে এবং তরুণীর রূপ কমে গেছে।

শেখ মুজিবকে দুবৃত্ত চিহ্নিত করে বাংলাদেশের অনাহার ও অব্যবস্থার উপর একটি বিদেশী পত্রিকার রিপোর্ট সম্প্রতি 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। দুর্নীতি দমনে শেখ মুজিবের উটপাখী সুলভ ব্যর্থতার সমালোচনা আজকাল কার্টুন ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী জনমত শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কিছুকাল আগেও তা' জনসাধারণের অন্ধ অসন্তোষের চেয়ে বেশী কিছু

ছিল না, যে জনসাধারণ পাকিস্তানী জিনিসের বহুগুণ চড়া দামে ভারতীয় প্রতিটি জিনিস কিনতে বাধ্য হয়েছে।

ভারত বলতে পারে যে, মুদ্রাস্ফীতি ভারতের দোষে হয়নি। সে আরও বলতে পারে যে, যদি উৎপাদিত চাউল ও পাটের এক ষষ্ঠাংশ ভারতে পাচার হয়ে যায়, তাহলে তা' বন্ধ করার দায়িত্ব বাংলাদেশের।

কিন্তু হালে বাংলাদেশ যখন অর্থনৈতিক সংকট ও সম্ভাব্য রাজনৈতিক অচলাবস্থার মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে, ভারতে যে মনোভাব প্রকাশ পেতে শুরু করেছে তা মোটেই বন্ধুসুলভ নয়। চাউল ও পাট পাচার বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু ভারতের জন্য তা' মঙ্গলদায়ক। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় চাউলের দারুণ অভাব। ভারতের পাটশিল্প বাংলাদেশের পাটের উপর একান্ত নির্ভরশীল।

বর্তমানে বঙ্গোপসাগরের আন্তর্জাতিক সীমারেখায় অপেক্ষাকৃত এক নতুন বিবাদ দানা বেঁধে উঠেছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে নয়, দুই সরকারের মধ্যে। সমস্যাটা মোটেই 'একাডেমিক' নয়। কেননা উপকূলীয় তেল আহরণের জন্য জোর অনুসন্ধান চলছে।

আরো সর্বনাশা হচ্ছে গঙ্গার পানি নিয়ে বিতর্ক। ফারাক্কায় ভারতের বিরাট বাঁধ অচিরেই বেশীরভাগ পানি বাংলাদেশের কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে। আলাপ-আলোচনা অচলাবস্থায় এসে ঠেকেছে। এখন শেখ মুজিব ও মিসেস গান্ধীর মধ্যে চূড়ান্ত বৈঠকের অপেক্ষা। দিন-ক্ষণ এখনো ধার্য হয়নি।

সবচেয়ে দুর্ভাবনা হচ্ছে, বাংলাদেশের কাঠামো ধ্বসে পড়ে কী হবে? কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢুকে পড়তে পারবে। কিন্তু তাহলে মুক্তিযুদ্ধ কেন হয়েছিল? ইতিমধ্যে মিঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো উর্দু বক্তৃতায় বেশ রসাল স্বগতোক্তি করেছেন, "মনে হচ্ছে কোন কোন দেশ তাদের স্বাধীনতা তেমন উপভোগ করছে না।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধ্বসে যদি নাও পড়ে, একটানা অধঃপতনের ফলে বাংলাদেশ এক বিপজ্জনক 'পাওয়ার ভ্যাকুয়াম'-এ পরিণত হতে পারে।...

—গার্ডিয়ান, লণ্ডন, জানুয়ারী ৩১, ১৯৭৫

দুই ব্যক্তি—এক পৃথিবী

—স্টীফেন এস. রোজেনফেল্ড

একই দিনে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও পৃথিবীর ধনাঢ্য দেশ আমেরিকার ঐশ্বর্যের প্রতীক জন. ডি. রকফেলার (৩য়) সাথে আলাপ করার মানে হচ্ছে দুনিয়ার হাল-হকিকতের দুই মেরু-দিগন্ত অনুসন্ধান করা।

মুজিবের ব্লেয়ার হাউজে সাক্ষাৎকারে আসতে কয়েক মিনিট দেরী হচ্ছে। তিনি বিশ্বব্যাংক প্রধানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন। সাক্ষাৎকার ঘড়ির কাটায় কাটায় শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং মুজিব পরবর্তী সাক্ষাৎকারের জন্য ছুটে আসছেন।

রকফেলার সাক্ষাৎকারীকে বিলম্বের জন্য অত্যন্ত অমায়িকতার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং সাক্ষাৎকারের জন্য স্বভাবতঃই যে সময়ের প্রয়োজন তা' দিলেন। বলতে গেলে তার যেন সময়ের অভাবই ছিল না।

হালকা সবুজ সোফায় সোজা হয়ে বসে হঠাৎ তার বাগ্মীসুলভ কণ্ঠস্বর চড়িয়ে মুজিব বললেন যে, বিদেশীরা যখন তার দেশের দারিদ্র্য নিয়ে কৌতুক করেন এবং যখন বলেন যে, তাকে সাড়ে সাত কোটি লোকের জন্য— এদের মধ্যে অসংখ্যক দুভিক্ষ প্রপীড়িত—খাদ্য ভিক্ষা করতে হবে, তখন তিনি অত্যন্ত আহত বোধ করেন।

মুজিব এমন সহজভাবে—তাঁর স্বভাবসুলভ ঔধ্যতায় নয়—কথা বলেন যে, বাংলাদেশ যেন তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বললেন, "আমার কি আছে জানেন? আমার সম্পদ আছে।" তিনি যে নিজেকে একজন সোশ্যালিস্ট দাবি করছেন এবং তিনি যে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা বলছেন না, এটা বুঝতে কম করেও মিনিটখানেক সময় লাগল। বললেন, "আমার দুই শ' মিলিয়ন টন চুনাপাথর আছে, আমার পাঁচশ' মিলিয়ন টন কয়লা আছে, আমার নয় ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট প্রাকৃতিক গ্যাস আছে।" এই হচ্ছে আমেরিকানদের ধারণার প্রতিবাদে মুজিবের জবাব। আমেরিকানরা ধরে নিয়েছে যে, বাংলাদেশে মূলধন নেই, সম্পদ নেই, ভবিষ্যতও নেই। এ ধারণা মুজিব পরিবেশিত তথ্যের ও তাঁর "মর্যাদার" পক্ষে অপমানকর।

আপনারা জানেন, রকফেলারের সব কিছুই আছে, কিন্তু তিনি তা' নিজে মুখে জাহির করার কথা কখনো ভাবেন না।

মুজিবের লক্ষ্যবস্তু অত্যন্ত জরুরী: "আমার দেড় হাজার লঙ্গরখানা আছে। আমার লোকদের বাঁচানোর জন্য চাই মোট চার হাজার তিন শতটি লঙ্গরখানা (শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি ইউনিটে একটি করে)— নিজের পেটে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন মুজিব।

যুক্তরাষ্ট্রকে দেবার মত বাংলাদেশের কিছুই নেই। এ সত্য সম্বন্ধে সচেতন মুজিব—তাই দু' দেশের মধ্যে ব্যবধান দূর করার জন্য আমেরিকানদের অনুকম্পা ও মানবিক দায়িত্ববোধের উপর ভরসা করছেন।

এই পর্যায়ে জন. ডি. রকফেলার কথা বলার সুযোগ পেলেন। বললেন, "দু দেশের মধ্যে হাজার ব্যবধান সত্ত্বেও আমেরিকান ও বাঙালীরা একই স্বাধীন বিশ্বের অংশ।"

—ওয়াশিংটন পোস্ট অক্টোবর ৪, ১৯৭৫

বাংলাদেশ ফুল-সার্কেল

তিন বছর আগে গত মাসে (ডিসেম্বর) একটি নতুন জাতির জন্ম হয়। পাকিস্তানের পূর্বাংশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ ভারত ও রাশিয়ার সাহায্যে—আমেরিকার সাহায্যে নয়—তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল। তখন আমেরিকা পাকিস্তানের দিকে "ঝুঁকে পড়েছিল" বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

সেদিন বাংলাদেশের জন্মোৎসব দুনিয়া জুড়ে প্রতিপালিত হয়েছিল অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুক্তির বিজয় হিসাবে, আর বাঙালী "মুক্তিযোদ্ধা" ও "মুক্তি দাতা", যিনি কিছুকালের জন্য আমেরিকান ক্যানভাসে জেন ফণ্ডা ও ডানিয়েল এল্স্‌বুর্গের মত হিরো সেজে বসেছিলেন, সেই শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসারীদের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির এক নব-যুগের সূচনারূপে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ গত তিন বছর বাংলাদেশ ও শেখ মুজিবের জন্য ভাল যায়নি। স্বাধীনতার আগে ছিল অভাব-অনটন; এখন চলছে ব্যাপক অনাহার। দেশে যে কয়টি শিল্প কারখানা আছে, নতুন সরকার তা' রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন। এগুলোর উৎপাদন আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। দুর্নীতি আর অপরাধ চলছে চরম আকারে। প্রধান খাদ্যশস্য চাউলের দাম চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ৩৬ মাসে কমপক্ষেও ৩ হাজার রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

এসব সমস্যার দু' একটির মোকাবেলা করার জন্য মাত্র ৩ বছরের পুরান শাসনতন্ত্র মুলতবী রেখে, হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার বিলুপ্ত করে, বিনা

বিচারে আটক রাখার অনুমতি দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান গত মাসে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।

এই সেদিন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের শেষ ধ্বংসাবশেষটুকু ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। বিনা ওজরে, বিনা বিতর্কে পার্লামেন্টে শেখ মুজিবকে একচ্ছত্র ক্ষমতা দিয়ে এক নতুন ধরনের সরকার সৃষ্টি করা হয়েছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, তিন বছর যেতে না যেতেই বাংলাদেশের 'মুক্তিদাতা' শেখ মুজিব দেশের ডিক্টেটর হয়ে বসে আছেন। আরো পরিহাস এই যে, যে পাকিস্তানের উৎপীড়ন থেকে তিনি তার দেশবাসীকে মুক্ত করেছিলেন, সেই পাকিস্তান আজ অধিকতর মুক্ত এবং সমৃদ্ধ।

গত সোমবার 'দি নিউ ইয়র্ক টাইমস্' প্রকাশ করেছেন যে, তিন বছর আগে পরাজয় ও অবমাননা ভোগ সত্ত্বেও পাকিস্তান আজ অপ্রত্যাশিতভাবে এশিয়া মহাদেশে অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে সজীব দেশ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

যদিও এখনো গরীব দেশ, কিন্তু পাকিস্তানে অনাহারে লোক মরছে না। তাদের জীবন যাত্রার মান বেড়ে চলেছে এবং 'দি টাইমস্' পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের সরকার "ধ্বংসাবশেষ কাটিয়ে উঠে সম্মুখে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।"

পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আদর্শবাদীরা যখন বাংলাদেশের মুক্তির জন্য চিৎকার করছিল, তখন আমেরিকার উচিত ছিল, পাকিস্তানকে আরো সবল সমর্থন দেওয়া।

—রোনড আমেরিকান বোস্টন জানুয়ারী ৩০, ১৯৭৫

অনাহার সমস্যার অংশমাত্র

—জন ডি. গ্রেইটস্

ডেলওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশনের বেসিক প্রফেসর উইলিয়াম ডাব্লিউ. বয়ার বলেন, বহুল প্রচারিত খাদ্যাভাব ও রাজনৈতিক সংগ্রাম বাংলাদেশের সমস্যার অংশমাত্র। এশিয়া ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে জ্ঞানান্বেষণে এক মাস কাটিয়ে প্রফেসর বয়ার সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বয়ার বলেন, বাংলাদেশে মানবিক প্রচেষ্টার কোন ক্ষেত্রই অসুবিধামুক্ত নয়। কল্পনা করুন যে, উইনকনসিন স্টেট অতিক্রম করতে এক মাস কি তারও বেশী সময় লাগছে। তাহলে বাংলাদেশের পরিবহণ সমস্যা উপলব্ধি করতে পারবেন। কোন কোন সময় একটা ট্রাক চাটগাঁ বন্দর থেকে রাজধানী ঢাকায় এসে পৌঁছতে কয়েক মাস লেগে যায়। যদিও গোটা দেশটা আয়তনে প্রায় উইনকনসিনের সমান। বয়ার বলেন, ক্ষুদ্র মন্থর গতিবেগসম্পন্ন খেয়া নৌকায় বড় বড় নদী পার হওয়াটাই এখানকার প্রধান সমস্যা। হয়ত ৫০টি ট্রাক সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে নদী পার হতে, কিন্তু খেয়া নৌকা এক দফায় মাত্র দু'টো ট্রাক নিতে পারে। "নদী পার হতে কয়েকদিন লেগে যেতে পারে", বয়ার জোর দিয়ে বললেন।

রাজনৈতিক দুর্নীতি দেশটির প্রগতিকে ব্যাহত করছে। ডকে সিমেন্ট স্তূপীকৃত হয়ে আছে এবং বৃষ্টিতে ভিজে জমাট বেঁধে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মুষ্টিমেয় লোকের লাভের জন্য আমদানীকৃত খাদ্যশস্য দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে, আর লাখ লাখ লোক মরছে অনাহারে। শিল্প-কল-কারখানায় উৎপাদন হতাশাব্যঞ্জক।

অনাহারই হচ্ছে পয়লা নম্বর সমস্যা। পার্লামেন্টের একজন সদস্য বয়ারকে বলেন যে, তার জেলায় শতকরা ২৫ জন লোক অনাহারের পর্যায়ে আছে। বাংলাদেশের মাপকাঠিতে এর অর্থ এই যে, আজ এক বেলা খাওয়া, তাও অর্ধাহার, কাল উপোস, পরের দিন আবার এক বেলা এবং অর্ধাহার।

প্রশাসনিক ব্যাপারেও বাংলাদেশ পিছিয়ে গেছে। বয়ার বলেন, কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ওষুধপত্র বোঝাই একটি মালগাড়ী ঢাকা স্টেশনে পড়েছিল। যে কর্মচারীটি চার্জে ছিলেন বললেন, গাড়ীর তালা খুলে ওষুধ বের করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের প্রয়োজন। জনৈক আমেরিকান 'এইড অফিসার' নিরাশ হয়ে কয়েকজন শ্রমিককে পয়সা দিয়ে তালা ভাঙ্গিয়ে ক্ষুদে বাঙালী কর্মচারীকে দেখিয়ে দিলেন যে, উপরওয়ালার অনুমোদন আর দরকার নেই। গত জানুয়ারী মাসের চেয়ে এখন অবস্থার হয়ত যৎসামান্য উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ১৯৭১ সালের আগেকার দিনগুলোর মত হয়নি। তখন বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ ছিল। বয়ারের মতে, প্রায় সকলেই একমত যে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাঙালীরা তখন অধিকতর ভাল ছিল। বাংলাদেশ সফরটি "কোন রকমেই আনন্দদায়ক ছিল না। তেমন কিছু করার মতও ছিল না। শুধু বই পড়েছি—অনেক বই," বললেন বয়ার।

তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে এত যে সাহায্য পাচ্ছে—১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ২ বিলিয়ন ডলারেরও

বেশী সাহায্য পেয়েছে এবং এর মধ্যে আমেরিকা দিয়েছে ৫০০ মিলিয়নের উপর—তার কারণ বাংলাদেশের শোচনীয় অবস্থা দুনিয়ার সর্বত্র সহানুভূতির উদ্রেক করে। বয়ার বললেন, তিনি বাংলাদেশে থাকতে জনৈক সরকারী কর্মচারী বলেছেন যে, কোন দিক দিয়েই বাংলাদেশের গুরুত্ব নেই। তিনি আরও বললেন যে, 'মজার ব্যাপার এই যে, বিদেশী কাউকে জিজ্ঞেস করুন, এ দেশে কেন এসেছেন? জবাবে কেউ সহানুভূতির কথা বলবেন না। মানুষ সহানুভূতির কথা স্বীকার করতে পছন্দ করে না।"

—ইভেনিং জার্নাল, উইলিমংটন ডেলাওয়ার মে ১৩, ১৯৭৫

গণতন্ত্রের মৃত্যু

—ডেভিড হার্ষ্ট

গত ২৮শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ উল্লাহকে সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার অনুমতি দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান অবশেষে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এই সিদ্ধান্ত আকস্মিক নয়। এখানকার রাজনৈতিক মহল মাসাধিককাল যাবত এমনি সম্ভাবনার কথা আলোচনা করে এসেছেন। কেননা, গুজব রটেছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমান পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা বাতিল করে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রথা চালু করার ও নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করার চেষ্টা করছেন।

জরুরী অবস্থা বলবৎ করতে গিয়ে শেখ মুজিব সেই পুরানো জুজুর ভয়ই দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে 'প্রো-পাকিস্তানীরা' এখনও সক্রিয়, কিন্তু অধিকাংশ পর্যবেক্ষক একমত যে, যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকার—যে সরকার ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশের জন্ম থেকে শাসন করে আসছে—ব্যর্থ হয়েছে—সে জন্যই জরুরী অবস্থা চালু করা হয়েছে। সরকার যে ওয়াদা পালনে ব্যর্থ হয়েছে তার জলন্ত প্রমাণ দেখা যায় গ্রাম-বাংলায়—যেখানে দুর্ভিক্ষ ও পুষ্টিহীনতায় হাজার হাজার লোক মৃত্যু বরণ করছে, আর যারা বেঁচে আছে তারা সরকারের গুণ্ডাবাহিনীর ভয়ে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত।

১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানী জেল থেকে ফিরে এসে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় শেখ মুজিব দেশবাসীর কাছে তিন বছরের সময় চেয়েছিলেন—যে সময় তিনি তাদের কিছু দিতে পারবেন না এবং হয়ত তাদের 'অনাহারে অর্ধাহারে' থাকতে হবে। এক লক্ষ লোক—যারা নেতার

বক্তৃতা শোনার জন্য সমবেত হয়েছিল—জয় বাংলা, জয় মুজিব ধ্বনিতে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিল।

কিন্তু শুভানুভূতির উল্লাস বছর যেতে না যেতেই উবে গেল। শেখ মুজিবের প্রতিশ্রুতি সোনার বাংলা সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দিল, তারা জানতে চাইল, ক্ষুধা, অনাহার, জরা, পুষ্টিহীনতা এবং রক্ষীবাহিনী (নিরাপত্তা বাহিনী) নামে পরিচিত বাছাই করা প্যারা-মিলিটারী দলের নির্মম দৌরাত্মের জন্যই স্বাধীনতা সংগ্রামে ৩০ লাখ বাঙালী প্রাণ দিয়েছিল কিনা।

গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে গ্রাম-বাংলার দৈনিক গড়ে ৭টি রাজনৈতিক খুন হয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই খুনের শিকার হয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা অথবা তাদের সমর্থকরা। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আওয়ামী লীগের অনুচররা এবং সরকারী এজেন্সীগুলো গ্রাম-বাংলায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে জনসাধারণকে সরকারের কাছ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

সরকার কি কার্যক্রম গ্রহণের কথা ভাবছেন তা জরুরী ঘোষণায় স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে জরুরী আইনে ন্যস্ত 'স্পেশিয়াল' ক্ষমতার বলে শেখ মুজিব স্বয়ং কিংবা তার দল যাকেই 'বিপজ্জনক' মনে করবেন তাকেই জেলে পুরতে পারবেন, আর এভাবে বাংলাদেশে আজও যেটুকু সরকার বিরোধিতা টিকে আছে তা সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

গত অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং ঢাকা-দিল্লী-মস্কো চক্রের জোরালো সমর্থক তাজউদ্দীনের (অর্থমন্ত্রী) অপসারণ থেকেই বুঝা যাচ্ছিল যে শাসক আওয়ামী লীগ গোষ্ঠীর ভেতর সত্যি গোলযোগ দেখা দিয়েছে। তাজউদ্দীনের পদচ্যুতির পর বেশ কিছুদিন সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রেস বাংলাদেশের বর্তমান বিপর্যয়ের জন্যে তাকে দুরাত্মারূপে চিত্রিত করে অভিযান চালিয়েছিল। খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান মূল্য-বৃদ্ধি থেকে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও আইন শৃংখলার ক্ষেত্রে অরাজকতা সব কিছুর জন্যই তাকে দোষী করা হল।

অবশ্য শেখ মুজিব জানতেন যে, তাজউদ্দীনের মত 'বিপজ্জনক' শক্তিকে উপেক্ষা করা যায় না, বিশেষতঃ যখন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের ভেতরে শেখ মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী ও কার্যকরী দল গড়ে তুলেছিলেন, সম্ভবতঃ এ কারণেই বাংলাদেশের নেতা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে প্রোৎসাহিত হয়েছেন।

শেখ মুজিবের সামনে দু'টি পথ খোলা আছে : হয় সর্বদলীয় সরকার গঠন করা (যেমন তাজউদ্দীন প্রস্তাব করেছিলেন) অথবা রক্ষীবাহিনী ও তার প্রতি অনুগত সেনাবাহিনীর সাহায্যে দেশ শাসন করা। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রতি শেখ মুজিবের সহজাত বিরূপ ভাব রয়েছে, কেননা পাকিস্তানী আমলে তাদের হাতে তিনি অশেষ দুর্ভোগ ভুগেছেন।

কাজেই মনে হয় শেখ মুজিব প্রো-মস্কো ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি ও প্রো-মস্কো বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের নিয়ে সর্বদলীয় সরকার গঠনের পথ বেছে নেবেন। তাঁর ও তাঁর পার্টির দোষের জন্য হোক কিংবা তাদের আয়ত্তাতীত বলেই হোক, স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যর্থতার জন্য শেখ-মুজিবকেই তীব্র সমালোচনা করা হয়। দেখা যাক, বিলম্বে হলেও জরুরী অবস্থার মাধ্যমে তার কাজে দেশে গণতন্ত্র হারানোর ক্ষতি পূরণ হয় কিনা।

—ফার ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউ, হংকং জানুয়ারী ১০, ১৯৭৫

মুজিব একনায়কত্ব কায়েম করেছেন

—পীটার গীল

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন।

গত শনিবার ঢাকার পার্লামেন্টের এক ঘণ্টা স্থায়ী অধিবেশনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে ক্ষমতা অর্পণ করেছে।

অনেকটা নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর দেওয়া হয়েছে। বিরোধীদল দাবি করেছিল, এ ধরনের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া উচিত। জবাবে সরকার এক প্রস্তাব পাস করলেন যে, এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক চলবে না।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয় মাস গৃহযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত কিন্তু গর্বিত স্বাধীন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব এম. পি-দের বললেন যে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ছিল 'ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান' (বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র রচনায়ও বৃটিশ বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করেছিলেন)। তিনি দেশের স্বাধীন আদালতকে 'ঔপনিবেশিক' ও 'দ্রুত বিচার ব্যহতকারী' বলে অভিযুক্ত করেন।

প্রেসিডেন্ট এখন খেয়াল খুশী মত বিচারকগণকে বরখাস্ত করতে পারবেন, নাগরিক অধিকার—বিন্দুমাত্রও যদি প্রয়োগ করা হয়—তা প্রয়োগ করবে নতুন 'পার্লামেন্ট' কর্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল আদালত।

এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে একটি 'জাতীয় পার্টি' প্রতিষ্ঠার জন্যে নতুন শাসনতন্ত্র মুজিবকে ক্ষমতা দিয়েছে। এটাই হবে দেশের একমাত্র বৈধ পার্টি। যদি কোন এম. পি. যোগদান করতে নারাজ হন অথবা এর বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহলে তার সদস্যপদ নাকচ হয়ে যাবে।

এহেন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঢাকায় সমালোচনা বোধগম্য কারণেই চাপা রয়েছে। কিন্তু ৩১৫ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টের ৮ জন বিরোধীদলীয় সদস্যের ৫ জনই প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের ১১ জন সদস্য ভোট দিতে আসেননি। তাদের মধ্যে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ গেরিলাবাহিনীর নায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী। শোনা যায় তিনি আওয়ামী লীগ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

শেখ মুজিব ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বেচ্ছাচারিতার সংগে শাসন করতে পারবেন। নতুন শাসনতন্ত্র ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত জাতীয় পার্লামেন্টের মেয়াদও দু'বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে, তবে পার্লামেন্ট বছরে মাত্র দু'বার অল্প সময়ের জন্য বসবে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও কাউন্সিল অব মিনিস্টারস্-এর মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হবে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

বাংলাদেশের ঘনায়মান আর্থিক ও সামাজিক সংকটে বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ সন্দেহ করছেন যে, দেশে একনায়কত্বের প্রয়োজন আছে কিংবা শেখ মুজিবের উদারতা আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ যে নিশ্চিত দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শেখ মুজিবের নতুন ক্ষমতা ও নতুন ম্যাণ্ডেট তাতে তেমন কোন তারতম্য ঘটাতে পারবে কিনা।

এক মাস আগে শেখ মুজিব জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন, কয়েক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বামপন্থী গেরিলা নেতা সিরাজ সিকদারকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, জরুরী আইন প্রয়োগে বিন্দু মাত্র সুশাসন—বর্তমানে সুশাসন বলতে কিছু নেই—পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা।

নতুন প্রেসিডেন্টের যে আদৌ প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই তা গত তিন বছরে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর স্টাইল হচ্ছে ডিক্টেটরের স্টাইল। তিনি গুটিকতক নিম্নতম অফিসারের প্রমোশনে ও তাদের অভিমতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রায়ই ফেলে রাখেন।

একদলীয় শাসন সৃষ্টির ফলে দুর্নীতি দূর না হয়ে বরং বাড়তে থাকবে। কেননা, উদ্ধত আওয়ামী লীগারদের 'চেক' করতে পারবেন একমাত্র প্রেসিডেন্ট। তিনি থাকবেন অতিরিক্ত কাজের চাপে। সরকার বিরোধীরা যতই আত্মগোপন করতে বাধ্য হবে ততই গ্রাম-বাংলার চরমপন্থী গেরিলা ও লুটতরাজকারীদের সমর্থন বাড়তে থাকবে।

—ডেইলী টেলিগ্রাফ, লণ্ডন, জানুয়ারী ২৭, ১৯৭৫

অহমিকার খোরাক চাই

গত সপ্তাহে ঢাকায় পার্লামেন্ট নিজের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত করে দিয়েছে এবং "জাতির পিতা" শেখ মুজিবর রহমান একচ্ছত্র ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। সাধারণ পার্লামেন্টারী কাঠামোর কোন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

শেখ ঘোষণা করলেন, বাংলাদেশের দুশমন, পাচারকারী ও কালোবাজারীরা বিদেশী এজেন্টদের সহযোগিতায় দেশে 'অব্যবস্থা' সৃষ্টি করেছে। অতএব একচ্ছত্র ক্ষমতা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল।

প্রধানমন্ত্রী ও ৩১৫ সদস্যের পার্লামেন্টে ৩০৮ সদস্য বিশিষ্ট দলের নেতা হিসাবে শেখের আগেই বিপুল ক্ষমতা ছিল। এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না, বর্ধিত ক্ষমতা নিয়ে তিনি এমন কি করতে পারবেন। সম্ভবতঃ যে সব সমালোচনা তিনি বরদাশত করতে পারবেন না, অথচ আগে বন্ধও করতে পারেননি, এখন তা বন্ধ করতে পারবেন।

কিছুকাল আগে মেক্সিকোর 'এক্সেলসিয়র' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তাকে যখন প্রশ্ন করা হল, খাদ্যশস্যের অভাবের ফলে দেশে মৃত্যুর হার ভয়াবহ হতে পারে কিনা, শেখ জবাব দিলেন, 'এমন কোন আশংকাই নেই।' প্রশ্ন করা হল, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পার্লামেন্টে বিরোধীদল বলেন যে, ইতিমধ্যেই ১৫০০০ লোক মারা গেছে।' তিনি জবাব দিলেন, 'তারা মিথ্যা বলেন।' কথা হল, ঢাকার বিদেশী মহল মৃত্যু সংখ্যা আরও বেশী বলে উল্লেখ করেন।' শেখ জবাব দিলেন, 'তারা মিথ্যা বলেন।' প্রশ্ন করা হল, 'দুর্নীতির কথা কি সত্য নয়?' ভুখাদের জন্য প্রেরিত খাদ্য কি কালোবাজারে বিক্রী হয় না---?' শেখ বললেন, 'না'। এর কোনটাই সত্যি নয়।"

যে সব সমস্যা তাঁর দেশকে বিপর্যস্ত করত সে সবের কোন জবাব না থাকায় শেখের একমাত্র জবাব হচ্ছে তাঁর নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা বৃদ্ধি। জনসাধারণের জন্য খাদ্য না হোক, তাঁর অহমিকার খোরাক চাই।

—এন্টার প্রাইজ, রিভার সাইড, ক্যালিফোর্নিয়া জানুয়ারী ২৯, ১৯৭৫

প্রেসিডেন্ট মুজিব

বাংলাদেশের অবস্থা যেমন আছে এবং মুজিব নিজে যেমন আছেন তাতে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনসাধারণের কোন উপকার হবে না। রাতারাতি মুজিব পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ছুঁড়ে ফেলে প্রেসিডেন্ট হিসাবে সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। আমরা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার বলতে যা বুঝি, এটা ঠিক তা' নয়। মুজিব যে সর্বাত্মক ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন তা' মার্কিন প্রেসিডেন্টেরও নেই। তিনি নিজের মর্জি মত একটিমাত্র রাজনৈতিক দলকে জাতীয় পার্টি হিসাবে কাজ করার অনুমতি দিতে পারবেন। তিনিই এই পার্টির কর্মসূচী, সদস্যপদ এবং সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং শুধুমাত্র এই পার্টির সদস্যরাই পার্লামেন্টের সদস্য হতে পারবে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের মৌলিক মানবাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা আর থাকবে না। এসব অধিকার---যদি কিছু আদৌ থেকে থাকে—প্রয়োগ করবে পার্লামেন্ট অর্থাৎ মুজিবের লোকদের নিযুক্ত স্পেশাল কোর্ট ট্রাইব্যুনাল অথবা কমিশন। মুজিব "দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতার" অজুহাতে বিচারপতিগণকে অপসারিত করতে পারবেন। মিসেস জি. (মিসেস গান্ধী)-র মত তিনিও তার অনুগত বিচারপতি দেখতে চান, কিন্তু ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে অথবা মানবিক উৎকর্ষতার অভাবে ডাণ্ডা প্রয়োগই তিনি বেশী পছন্দ করেন।

এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সরকারের একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মোকাবেলা করা যায় না। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের দুঃখ-কষ্ট এবং নব্যশাসক শ্রেণীর সৃষ্টি---শ্রেণীগত অসঙ্গতিরই ফল। কিন্তু বাংলাদেশের শাসক ও প্রশাসকরা অধিকতর অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ এবং লোভী—এরা রাতারাতি বড় হতে চায়। ধুরন্ধর ব্যক্তিরা উচ্চাশার টোপ ফেলেছিল যে, "স্বাধীন" বাংলাদেশ প্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং সরল মানুষেরা তা' বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ভারতীয় হস্তক্ষেপের ফলে যারা বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসীন হ'ল তাদের মত স্বার্থপর নেতৃত্ব কোন দেশে সত্যিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের

পর আর দেখা যায়নি। দেশটি যে অর্থনৈতিক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, তা' অবশ্যম্ভাবী ছিল। বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য-সহায়তা বাংলাদেশের কোন কাজে আসেনি। আরামদায়ক বন্দীদশা থেকে শেখ মুজিব প্রত্যাবর্তনের পর দেশের অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর হয়েছে; হাজার হাজার লোক বন্যা, দুর্ভিক্ষ আর বিকৃত গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। যারা আইয়ুব আমলে পাঞ্জাবীদের কাছে তাদের ট্রেড ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স বিক্রী করে নিশ্চিত মুনাফা কুড়িয়েছিল, তারা এখনো ভাল মুনাফা কুড়াচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

জাঁক-জমকের বিভ্রান্তিতে মুজিব যা' করছেন তাতে তাঁর নিজের এবং তাঁর দলের ছাড়া আর কারো উপকার হবে না। হতে পারে, আজও গ্রাম-বাংলার কিছু সরলপ্রাণ লোক তাঁকে জাতির পিতা হিসাবে দেখে আর মনে করে যে, একজন ভাল লোক রেকেটিয়ারদের হাতে পড়ে গেছে। মুজিব সরল লোকদের এই আবেগের উপর নির্ভর করছেন। কিন্তু তাঁর এ মর্যাদা স্থায়ী হবে বলে মনে হয় না।

জাতির প্রতি যা' সবচেয়ে অবমাননাকর, মুজিব তাকে "দ্বিতীয় বিপ্লব" নামে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ্ জানেন, প্রথম বিপ্লবের জন্য—যা বিদেশী চক্রান্তে হয়েছিল—জনগণকে কত খেসারত দিতে হচ্ছে। আমাদের ঐকান্তিক কামনা, বাংলাদেশের জনগণ দ্বিতীয় বিপ্লব কাটিয়ে উঠবে।

—ফ্রন্টিয়ার, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারী ১, ১৯৭৫

শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন

—কুলদীপ নায়ার

শেখ মুজিবুর রহমান জেনারেল ইয়াহিয়ার স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু আজ তিনি নিজেই রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন। ক্ষমতা দখল করতে গিয়ে তিনি 'নিয়মানুবর্তিতা', 'সমাজ বিরোধী দল', 'বৈদেশিক চক্রান্ত' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে চলেছেন, যা এক সময় পাকিস্তানী সামরিক চক্রও ব্যবহার করত। আশ্চর্য, বাংলাদেশের জন্মের আগে যে জনসাধারণ এত দুর্ভোগ সহ্য করেছে, তাদের কোন মতামত নেওয়া হয়নি। এমন কি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিকেও কিছু জানতে দেওয়া হয়নি। পার্টির ২১শে জানুয়ারীর মিটিং-এ শুধু এটুকুই আলোচিত হয়েছিল যে শেখকে প্রেসিডেন্ট করা হবে। সদস্যদের এটা

জানা ছিল না যে, সুপ্রিম কোর্টকে মৌলিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হবে। এসব অধিকার প্রয়োগের জন্য বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কেও তারা জ্ঞাত ছিলেন না। শেখ যে নিজের পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারবেন না, তা' নয়। কিন্তু আগে থেকে সব কিছু জানিয়ে দিলে পার্টির ভিতর থেকে বিরোধিতা আসত। সম্ভবতঃ মুজিব সেটাই আশংকা করেছিলেন। অন্যথায় এ ধরনের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক সংশোধন প্রস্তাব এক ঘণ্টার মধ্যে পার্লামেন্টে পাস হ'ত না এবং প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ উল্লাহ্ও পার্লামেন্ট ভবনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তা' সই করতেন না। স্পষ্টতঃই আগে থেকে এরূপ ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল এবং তা' প্রমাণিত হয় এই থেকে যে, মোহাম্মদ উল্লাহ্কে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই। এখন বিচার বিভাগকেও জিঞ্জিরে আটকানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বিচারকগণকে "অসদাচরণ" ও "অক্ষমতার" জন্য বরখাস্ত করতে পারবেন।

এই পটভূমিকায় কি করে মিসেস গান্ধী এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে শেখকে খোশ আমদেদ জানালেন, বোঝা মুশকিল। বাংলাদেশ যাই করুক, সেটা বাংলাদেশের নিজস্ব ব্যাপার। কূটনৈতিক শিষ্টাচার যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের প্রতিটি কাজ ভারতের সমর্থন করার কোন দরকার করে না। অন্ততঃ অভিনন্দনবাণী প্রেরণ বিলম্বিত করা যেত শুধু এটুকু পরিস্কার বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে, বাংলাদেশে যা ঘটছে তাতে ভারত নিরুৎসাহ বোধ করছে। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরে যখন আইয়ুব খান একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, মিঃ নেহেরুর প্রতিক্রিয়া ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। লোকসভায় বসে তিনি খবরটি পেয়েছিলেন। সদস্যদের বললেন, "এটা নগ্ন সামরিক একনায়কত্ব।"

নয়াদিল্লী হয়ত বিশ্বাস করছে যে, এই পরিবর্তন বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী মনোভাবকে মোকাবেলা করতে শেখকে সাহায্য করবে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, শেখ ভারতের প্রতি অত্যন্ত বন্ধু-ভাবাপন্ন তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন (তিন বছর আগে তাজউদ্দিন আহমদ আমাকে বলেছিলেন, "ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এত ভাল যে, ইচ্ছা করে এখনি মরে যাই, এর অবনতি দেখতে বেঁচে থাকতে চাই না")। ভারত-বিরোধী মনোভাবের কারণ শেখ খুব ভাল করেই জানেন। জিনিসপত্রের অভাব এবং দুর্মূল্যের জন্য জনসাধারণ কষ্ট পাচ্ছে। কাজেই

তারা বিশ্বাস করে যে, তারা অসুবিধা ভোগ করছে যেহেতু "প্রতিটি জিনিস ভারতে চলে যাচ্ছে।" বস্তুতঃ ভারত-বিরোধী মনোভাব প্রতিরোধ করার জন্য ঢাকা কিছুই করেনি। সম্ভবতঃ এর একটা কারণ এই যে, ভারত-বিরোধী মনোভাব মোকাবেলা করতে হলে সরকারকে জনসাধারণের রোষানলে পড়তে হবে।

শেখ কেন একচ্ছত্র ক্ষমতা হাতে নিলেন, এটা এখনো বিভ্রান্তিকর লাগে। ১৯৭২ সালের শুরুতে যেদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন, সেদিন থেকেই তো তার সর্বময় ক্ষমতা ছিল। গত জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ তাকে 'ব্ল্যাংক চেক' দিয়েছিল এবং ডিসেম্বর মাস থেকে দেশ জরুরী অবস্থার অধীনে রয়েছে। কিভাবে অতিরিক্ত ক্ষমতা—যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, কিছু ক্ষমতার অভাব ছিল—তাকে সাহায্য করবে? জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে সরকারের পদক্ষেপ অত্যন্ত মন্থর এবং দুর্নীতি একটি জীবন পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্লোগান ও ফাঁকা-বুলি জনগণকে ভুলিয়ে রাখে। যে জাতি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে উদ্ধতভাবে লড়েছে, সে জাতি আজ আশা হারাতে শুরু করছে। আজ সেখানে যা ঘটছে তা'এই: প্রতিভাবান লোকেরা দেশ ত্যাগ করতে শুরু করেছেন। জানা যায়, এদের মধ্যে শেখের ঘনিষ্ট সহকর্মীদেরও কেউ কেউ রয়েছেন।

—স্টেট্‌সম্যান উইকলী, নয়াদিল্লী, ফেব্রুয়ারী, ১, ১৯৭৫

দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনীতি

ডিক্টেটর মুজিব তথাকথিত "দ্বিতীয় বিপ্লব" সম্পন্ন করেছেন। শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটিয়ে, বাংলাদেশের জনগণকে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং 'জাতির পিতা', প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব নিজের উপর ন্যস্ত করে মুজিব তাঁর নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্যসমূহ ব্যক্ত করেছেন। ২৬শে মার্চ এক কল্পিত স্বাধীনতা দিবসের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে তার "ঐতিহাসিক" ভাষণ শোনার জন্য লাখ লাখ লোক ভীড় করেছিল। মুজিব তাঁর "দ্বিতীয় বিপ্লবের" কর্মসূচী ঘোষণার জন্য এই বার্ষিকী অনুষ্ঠানকে বেছে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা দিবসটি যেমন ছিল মুজিবের একটি প্রতারণা, তেমনি ২৬শে মার্চের জনসভাও ছিল একটি কৃত্রিম সমাবেশ।

একথা অবশ্য সত্য যে, অনেক বাঙালী, মন্ত্রী, আমলা, বিদেশী মেহমান এবং বহু দীন-দরিদ্র এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা এসেছিলেন

হয় উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থে, নয় বাধ্য হয়ে, নয়ত অনুগৃহীত হয়ে; চেয়ারম্যান-প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক সমর্থনের কারণে নয়। ওয়াকিফহাল মহলের মতে, এই বিরাট জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য ৯০ লাখ (৯ মিলিয়ন) টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। টাকার এই ছড়াছড়ি এবং সাংগঠনিক দক্ষতার এই মহড়ার বিপরীত দিকটি হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশ সরকার ভান করছেন, জানুয়ারী মাসে রাজধানী থেকে বিতাড়িত লাখ লাখ আশ্রয়হীন মানুষের ঠাঁই করে দেবার মত আর্থিক সঙ্গতি ও প্রশাসনিক ক্ষমতা তাদের নেই। এই সব হতভাগ্যরা শহরের উপকণ্ঠে ক্যাম্পগুলোয় আবদ্ধ হয়ে দিনে দিনে নিস্তেজ, নির্জীব হয়ে পড়ছে। ঢাকা শহর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মুজিবের উদ্বেগের ফলে এসব নির্দোষ মানুষের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছে তা' "বাংলার ইতিহাসে বৃহত্তম অপরাধ" বলে জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী গোপনে উল্লেখ করলেন।

সরকারের সামাজিক চরিত্র যা' এবং যেভাবে সরকার স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখতে চান, তাতে ঢাকার পর্যবেক্ষকরা মুজিব সরকারকে "ডাকাতের রাজ্য" বলে আখ্যায়িত করেন। রাজনৈতিক দলগুলো বিলোপের এবং একমাত্র "জাতীয় দল" গঠনের পূর্বে (২৪শে ফেব্রুয়ারী) জোর জল্পনা-কল্পনা চলছিল যে, মুজিব তাঁর প্রাক্তন আওয়ামী লীগ সহকর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা করছেন। তা' মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এটা অবশ্য সত্য যে, ভূতপূর্ব বিরোধীদলের কয়েকজন সদস্য (যেমন জাসদ ও ভাসানী ন্যাপের কয়েকজন সদস্য) এবং পার্লামেন্টের কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রতিনিধি (যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'জন এম. পি.) নতুন দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। মুজিব রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করলেন তখনই যখন মাওলানা ভাসানী "বঙ্গবন্ধু" ও তার "দ্বিতীয় বিপ্লবকে" স্বাগত জানালেন। মস্কোপন্থী দলগুলোর (মণি সিং-এর সিপিবি ও মোজাফফর ন্যাপ) কার্যালয় "সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাকেন্দ্রে" রূপান্তরিত হয়েছে। তাহলেও জাতীয় দল অভ্রান্তরূপে প্রাক্তন আওয়ামী লীগেরই বর্ধিত রূপায়ণ। এমন কি 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামেও তা' প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রাক্তন আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ের সামনে "বাকশাল'-এর সাইন বোর্ড ঝোলান হয়েছে। আওয়ামী লীগের সকল সদস্য, মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী আপনা থেকেই "জাতীয় দল"-এর সদস্য বনে গেছেন।

তাহলে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এবং নাগরিক অধিকার মুলতবী রাখার রাজনৈতিক গুরুত্ব কী? নিঃসন্দেহে মুজিবের প্রথম উদ্বেগের কারণ হচ্ছে

বামপন্থী দল ও উপদলগুলোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান। বাংলাদেশের রাজনীতি এতটা একদলীয় হয়ে গেছে যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের অভিযানের অস্ত্র হচ্ছে তার গুপ্ত পুলিশ ও আধা-সামরিক মিলিশিয়া—রক্ষীবাহিনী। গ্রাম-বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এরা ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে।

ময়মনসিংহ জেলার একটি থানাতেই (নান্দাইল থানা) শত শত তরুণ চাষী ও ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। এ এলাকার গরীব চাষীদের মধ্যে সিরাজ সিকদারের দলের বিশেষ প্রভাব ছিল এবং গত তিন বছরের শেষেও তারা কার্যতঃ এ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর হিসাব মতে রক্ষীবাহিনী গত জানুয়ারীতে এক ময়মনসিংহ জেলাতে অন্ততঃ ১ হাজার ৫শ' কিশোরকে হত্যা করে। এদের অনেকেই সিরাজ সিকদারের 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি (ইবিপিপি)'-এর সদস্য ছিল। অন্যদের মার্কসবাদী ও লেনিনবাদী দলের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। এমন কি, অনেক বাঙালী যুবক, যারা রাজনীতিতে ততটা সক্রীয় ছিল না, তারাও এই সন্ত্রাসের অভিযানে প্রাণ হারিয়েছে। রক্ষী-বাহিনী কি করে মস্তকবিহীন দেহে 'সিরাজ সিকদার' নামাংকিত পোস্টার পেরেক দিয়ে এঁটে লাশ সদর-রাস্তায় ফেলে দিয়েছে, তার বর্ণনা নিহতদের আত্মীয়-স্বজনের মুখে শোনা যায়। বস্তুতঃ বাংলাদেশে বীভৎসতা ও নিষ্ঠুর-তার অভাবে নেই। যারা সৌভাগ্যবশতঃ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েছে, তাদের মুখে "মধ্যযুগীয়" অত্যাচার পদ্ধতি অনুসৃত হবার কথা শোনা যায়। অত্যাচারের সাধারণ হাতিয়ার লৌহদণ্ড, সূচ, গরম পানি ও অন্যান্য গার্হস্থ্য সামগ্রী। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দল সম্পর্কে তথ্য উদ্‌ঘাটনে এগুলো যথেষ্ট কার্যকরী। তাছাড়া এসব হাতিয়ার প্রয়োগের ফলে শরীরের যে ক্ষতিসাধিত হয়, তার জের চলে সারা জীবন।

কিন্তু এ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে যে মুজিবের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সকল বিরোধিতা স্তব্ধ হয়ে গেছে; আদৌ তা নয়। বস্তুতঃ জরুরী অবস্থা ও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘোষণার পর থেকে এম. পি. এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের হত্যা, থানা আক্রমণ, রক্ষীবাহিনী ও "চরমপন্থীদের" মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ এবং ঢাকার লক্ষ্য-স্থানের উপর বোমার আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব ঘটনার কয়েকটি ক্ষমতাসীন দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল (যেমন উত্তরবঙ্গের গাইবান্ধা মহকুমার বাকশালের মহিলা নেত্রীর হত্যা)

কিছুসংখ্যক হত্যা অবশ্য বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে তীব্র অবিশ্বাসের কারণে ঘটেছে (যেমন আবদুল হক পরিচালিত ইস্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনৈক মন্টু পরিচালিত জাসদের মধ্যে কুষ্টিয়ার সাম্প্রতিক সংঘর্ষ)। তবে অধিকাংশ সংঘর্ষই মুজিবের ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী লেনিনবাদী গোপন দলগুলোর প্রবল প্রতিরোধের ফল।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনীতি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এর প্রধান দিক হচ্ছে বাংলাদেশের বামপন্থী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম। পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলোর বিভিন্ন সংবাদপত্র (যেমন বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর সাপ্তাহিকী—ইকনমিস্ট) মত প্রকাশ করেছেন যে, দ্বিতীয় বিপ্লব প্রবর্তনে মুজিবের নিজস্ব উদ্দেশ্য হ'ল প্রধানতঃ তাঁর নিজের অহমিকা চরিতার্থ করা এবং রাজনৈতিক গৌরবের অন্বেষণ, যে গৌরব পাগলামির নামান্তর। এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, নতুন শাসন ব্যবস্থার রাজনীতিতে আরো অনেক কিছু নিহিত আছে।

—ফ্রন্টিয়ার, কলিকাতা ভলিউম 'বি' নং—২

শোষিতের গণতন্ত্র

—হার্ভি স্টকউইন

আর একটি এশীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হ'ল। আর একবার অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের নামে গণতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ শাসনের অবসানের পর এই দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের জনগণের জন্য গণতন্ত্র অনুপযোগী বিবেচিত হয়েছে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের বিদেহী আত্মা নিশ্চয়ই স্মিত হাস্যে মৃদুস্বরে বলছে, "আমি তোমাদের বলেছিলাম ------"। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব কর্তৃক ক্ষমতা জবরদখল গণতন্ত্র-বিরোধী ছিল। তিনি নেতৃত্বের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন এবং জাতীয় জীবনে ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানিক শূন্যতা পূরণ করার জন্য এগিয়ে এসে-ছিলেন। ১৯৭৫ সালে সে পটভূমি আদৌ নেই। শেখ আগেও বাংলাদেশের একমাত্র মুখ্য নেতা ছিলেন, এখনো আছেন। যে সময় তিনি আইয়ুবের রূপ পরিগ্রহ করেন, তখন গণতন্ত্র এমন কাটছাঁট হয়ে যায় যে তার ক্ষমতার অভাব ছিল একথা তিনি আদৌ বলতে পারতেন না। আইয়ুবের মত তিনি সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে জড়িত করছেন না। যদিও, নতুন একক জাতীয় দলে কয়েকজন সামরিক চাঁইকে কো-অপ্ট করে নেওয়া হতে পারে। দ্বিতীয় বিপ্লবের আগেও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কতকটা সামরিক ছোঁয়াচ দেবার

ক্ষমতা শেখের ছিল। কেননা, সামরিক প্রথায় গঠিত এবং মুজিবের ব্যক্তিগত বাহিনী বলে সাধারণতঃ পরিচিত রক্ষীবাহিনীকে বরাবরই অপ্রীতিকর কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত করা হয়েছে।

দাঙ্গা, বিক্ষোভ দমন করা এবং সন্ত্রাসবাদী ও বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করা—এগুলোও রক্ষীবাহিনীর কাজ। "নীতি প্রতিষ্ঠা" ও "দুর্নীতি দমন" একচ্ছত্র ক্ষমতা গ্রহণের মামুলি অজুহাত মাত্র। আইয়ুব ও মুজিবের ক্ষমতা-দখলে পার্থক্য রয়েছে। আইয়ুব ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন জাঁদরেল পাচারকারী ও কালোবাজারীকে পাকড়াও করেছিলেন। এতে সারা পাকিস্তানে বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। গোটা দেশে চাউলের দামও কমে গেল। পরে অবশ্য দুর্নীতি আবার দেখা দেয়—এমন কি আইয়ুবের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও। শেখের 'দ্বিতীয় বিপ্লব' আজও তেমন ধরনের নাটকীয় অভিযান করে নাই। বস্তুতঃ দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এত সামান্য যে চাউলের দাম বেড়েই চলেছে। 'শোষিতের গণতন্ত্র'কে আদৌ কোন সুযোগ দিতে অনিচ্ছুক জনৈক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মন্তব্যে আইয়ুব-শেখ চারিত্রিক সাদৃশ্য সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বললেন, "আইয়ুব যে ভুল করেছিলেন, শেখও ঠিক সেই ভুলই করছেন। আইয়ুব বিশ্বাস করতেন যে, জনসাধারণ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতিই চায়। তাই তিনি মানবীয় অধিকারের বিনিময়ে অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পেছনে ছুটলেন। এর ফলেই মুজিব আন্দোলনের মওকা পেয়ে গেলেন। শেখ সে কথা ভুলে গেছেন অথবা ভাবেন যে, তিনি তা ভুলে যেতে পারেন।"

বৃটিশ আমলে প্রশাসনিক দিক দিয়ে পূর্ববঙ্গ ছিল উপেক্ষিত। দেশ বিভাগের সময় ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা এক হাতের আঙুলে গোণা যেত। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের আমদানী হল। বাংলাদেশীরাও আজ খোলাখুলি স্বীকার করছেন যে, স্বাধীনতার পর কয়েকটি অত্যাবশ্যক সার্ভিসের, বিশেষ করে রেলওয়ে ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি ঘটেছে। আগে প্রধানতঃ বিহারীরাই এসব সার্ভিস চালাত। এখন আর ওদের চাকুরী নেই।

কোন কোন দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতাবিরোধী শাসনপদ্ধতি অধিকতর কার্য-দক্ষতা অর্জন করেছে, কিন্তু বাংলাদেশে তা সম্ভব হবে কিনা, গভীর সন্দেহ রয়েছে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশের নতুন শাসনপদ্ধতি সবকিছু প্রেসিডেন্টের হাতে অতিরিক্ত মাত্রায় কেন্দ্রীভূত করে চলেছে।

শোকারনো পাশ্চাত্য সাহায্যকারী দেশগুলোকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইণ্ডিয়ার এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে শেখও অনুরূপ-ভাবে পশ্চিম জগতের সংবাদপত্রগুলোকে ঘা' মেরেছেন। "বাংলাদেশ ধ্বসে পড়বে", বিদেশী পত্র-পত্রিকার এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তার অভিমত জানিতে চাইলে শেখ জবাব দেন, "তাদের গোল্লায় যেতে বলে দিন। আমার শাসন নয়, তাদেরই বুদ্ধিমত্তা ধ্বসে পড়বে। পাশ্চাত্য সংবাদপত্রগুলো শুধু সমালোচনা করছে আর উপদেশ দিচ্ছে। ১৯৭১ সালেও তারা তাই করেছিল এখনও আবার করছে।" (এই উক্তি কৌতূহলজনক, কেননা মুক্তিসংগ্রামের সময় বিদেশী সংবাদপত্রের ভূমিকা বাংলাদেশ এ পর্যন্ত প্রশংসা করে এসেছে)।

নিরাপত্তাবোধের অভাবই শেখকে অস্পষ্ট, এমন কি কাল্পনিক, ভীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে প্ররোচিত করছে। একমাত্র আত্মবিশ্বাসের অভাবের জন্য (এবং সুপরামর্শ গ্রহণের অনিচ্ছার জন্য) ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের "ডি ফেক্টো" প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েও শেখ বাংলাদেশে ঠায় বসে রইলেন। তার চাইতে অধিকতর আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন যে-কোন ব্যক্তিত্ব সে সময় গোটা পাকিস্তানের জনসমর্থন লাভে সমর্থ হতেন এবং ফলে পরবর্তী গৃহযুদ্ধের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি এড়াতে পারতেন। নিরাপত্তাবোধ নেই বলেই বিনা বাধায় সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণের মুহূর্তেও শেখ শিক্ষিত সমাজকে আঘাত করেছেন—এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, "আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলাম এবং পড়াশুনা করেই পাস করেছিলাম।" শেখ গৌণ বিষয়ে—যেমন বিদেশী সংবাদপত্রের সমালোচনা এবং দেশী পত্রিকার নিয়ন্ত্রণে (দেশী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আগেই খর্ব করা হয়েছে) মাথা ঘামাচ্ছেন। নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকে হৃদয়ের সংকীর্ণতা, মনোভাবের তুচ্ছতা, এমন কি প্রতিহিংসাপরায়ণতাও দেখা দেয়। এ ধরনের প্রবৃত্তি শেখের ব্যক্তিগত উদার চরিত্রকে সময় সময় বিকৃত করছে। এমনও হতে পারে যে, এগুলো দ্বিতীয় বিপ্লবের মারাত্মক ত্রুটি হয়ে দাঁড়াবে।

—ফার ইস্টার্ণ ইকনোমিক রিভিউ, হংকং, মার্চ ১৪, ১৯৭৫

মুজিব বাংলাদেশের মনিব

—জো গ্যাণ্ডেলম্যান

১৯৭২ সালে যখন মুজিব ক্ষমতা লাভ করেন, তখন অনেক বাঙালী আশংকা করেছিলেন যে, তিনি "আরেকজন কেরেনেস্কী" (যে সোশা-লিস্টকে বিতাড়িত করে রাশিয়ায় কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করেন) হবেন

মাত্র। কারণ মুজিবের প্রকৃত জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে প্রশাসনিক কাঠামো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থহীন ছিল। এমন কি পুলিশ ও জনসাধারণের কাছে হাস্যাস্পদ ছিল। তার প্রমাণ এই যে, বাংলাদেশের প্রথম এই দু'বছরে কোন আইন-শৃংখলার অস্তিত্ব ছিল না।

বাংলাদেশ দ্রুত অব্যবস্থা ও অরাজকতায় নিমজ্জিত হলে গত বছরের শেষে মুজিব অপ্রত্যাশিতভাবে দেশে জরুরী অবস্থা জারি করেন। এ বছর জানুয়ারী মাসে আর একটি অনুরূপ পদক্ষেপে তিনি নিজেকে একদলীয় রাষ্ট্রের "রাষ্ট্রপতি" ঘোষণা করেছেন। হিতৈষী এক নায়কের পোশাকে সজ্জিত হতে "শেখ সাহেব" বিন্দুমাত্র দেরী করেননি। তিনি শহরের ভূ-স্বামীদের ৪৮ ঘণ্টা সময় দিলেন তাদের বাড়ীর দেয়ালে অংকিত রাজনৈতিক শ্লোগান সব মুছে ফেলতে। তিনি সকাল দশটায় সেক্রেটারিয়েটের গেট বন্ধ করে দিলেন। বিলম্বে আগত কর্মচারীরা ঢুকতে পারলেন না। তিনি ভিক্ষুকদের শহরের বাইরে সরিয়ে দিয়েছেন, বস্তীগুলো ভেঙ্গে সাফ করে ফেলেছেন। এই করতে গিয়ে গুটি বসন্তের প্রকোপ বাড়িয়েছেন। কিন্তু উদ্বাস্তুরা আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। ভিক্ষুকেরা ফিরে এসেছে এবং বসন্তরোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আইন শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য (মুক্তি-সংগ্রামের সময় থেকে এক লাখ বন্দুক, রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লোক-জনদের হাতে রয়েছে যার ফলে হাজার হাজার রাজনৈতিক হত্যা সংঘটিত হচ্ছে) শেখ তার নিজস্ব ভয়াবহ ও ঘৃণ্য জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করেছেন।

জনৈক বিদেশী সাংবাদিক একটি প্রখ্যাত ম্যাগাজিনে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে সমালোচনা করার পর স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রিয় আলোচ্য বিষয় নয়। নীরবে হুকুম জারি হল, উক্ত সাংবাদিককে ফের বাংলাদেশে ঢুকতে দেয়া হবে না। এই স্পর্শকাতরতা কেন? সম্ভবতঃ এ জন্যই যে, রক্ষীবাহিনী বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও পরিবহণ ব্যবস্থাসহ একটি আধা-সামরিক প্রতিষ্ঠান। অথবা রক্ষীবাহিনীর বিস্তৃত-কর সংখ্যা এর কারণ হতে পারে। এখনই এর সংখ্যা ২৫ হাজার এবং পরি-কল্পনা থেকে বুঝা যায় যে, যখন চূড়ান্ত রূপ নেবে তখন রক্ষীবাহিনী পাকিস্তান, এমনকি বৃটিশ আমলে যে সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখা হত, তা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

"জাতির পিতা'র নামে রক্ষীবাহিনী ব্যাপক উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। বস্তুতঃ এর প্রতীক হচ্ছে একটি

আর্মব্যাণ্ড। ব্যাণ্ডের ছবিতে তর্জনী উপরের দিকে উঁচিয়ে আছে—যা মুজিবের সচরাচর বক্তৃতাকালীন ভংগীকে প্রতিফলিত করে। বাঙালীরা বলেন, গোপনে সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপক অভিযান চালানো হচ্ছে। পাকিস্তানী আমলে যা করা হত তা থেকে এ আদৌ তফাৎ নয়। একমাত্র রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে লোকজন মুখ খুলে কথা বলে। ঢাকায় অবস্থানরত জনৈক ভারতীয় সাংবাদিক যেমন বলেছেন, "ঢাকার বিখ্যাত প্রেস ক্লাবে যারা সব রকম বিষয়ে কথা বলতেন, এখন তারা শুধু আবহাওয়া, কানাডা—এ ধরনের বিষয়ে কথা বলেন।" আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ দমন করা ছাড়াও সরকার সংবাদাদি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করছেন, যা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির পক্ষে শুভ নয়। হংকং নিউজ ম্যাগাজিনে মুজিবের বিরুদ্ধে লেখার জন্য জনৈক সাংবাদিককে বাংলাদেশের নিউজ এজেন্সী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

যারা বিদেশী সংবাদপত্রে খবরাদি প্রকাশ করবে তাদেরও অনুরূপ প্রতি-শোধের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন হয়েছেন বাংলাদেশ সিভিল লিবার্টির একজন প্রধান আইনজীবী। তিনি বেনামে সোনার বাংলা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা মুখরোচক ছিল না। হদিস পাওয়ার পর তাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। সংবাদ সম্পর্কীয় বাধা-নিষেধের ফলে বাঙালীরা আহত-বোধ করছেন। এ ব্যবস্থা অবলম্বনের সার্থকতা থাকত যদি বাংলাদেশের ভয়াবহ সমস্যাগুলোর উপশম হত। এ ধরনের আশ্চর্য পরিবর্তন বাস্তবতার নিরিখে আদৌ সম্ভবপর মনে হয় না।

বাংলাদেশে মাথাপিছু বার্ষিক গড়পরতা আয় ৫০ ডলার—স্বাধীনতার আগে যা ছিল, তার চেয়ে কম। এ ভয়াবহ অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য বিদেশী সাহায্য চেয়ে মুজিব সরকার "রিলিফ ডিপ্লোমেসি" চালিয়েছেন। সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলো বন্যা ও দুর্ভিক্ষের যারা শিকার হয়েছে তাদের ছবি যতটা সম্ভব ছাপিয়েছে—সংবেদনশীল কূটনৈতিক বিবেককে স্পর্শ করার জন্য। "এক সময় এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, এসব ছবি দেখার পর সকালে নাশতা খাওয়া হত না"—অভিযোগ করলেন জনৈক ভারতীয়।

বিদেশী সাহায্য-সামগ্রীর অধিকাংশ বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রী হয়। কম্বল, জ্যাম, টিনের খাদ্য, গুড়া দুধ—সব কিছুই (বিশেষ মূল্য দিলে) ঢাকার দোকানপাটে পাওয়া যায়। একটি দূতাবাসের হিসাবে—দূতাবাসটি পশ্চিম দেশীয় নয়। বিদেশী সাহায্যের ১৫ পার্সেন্টেরও কম জনসাধারণের

হাতে পেঁাছায়। শেখ মুজিবের ভাগিনা শেখ মণিকে গত দুর্ভিক্ষের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, "দোষ আমাদের সরকারের নয়, দোষ সে সব সরকারের যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েও সময়মত খাদ্যশস্য পেঁাছে দেননি।" শেখ মণি অবশ্য উপাদেয় খাবার খান। স্বাধীনতার পর তিনি একজন ক্ষমতাসম্পন্ন খুব রাজনৈতিক নেতা বনেছেন। তিনি দু'টি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং দু'টি গাড়ী ও দু'টি 'দখল করা' বাড়ীর মালিক। মামা মুজিবের ক্ষমতায় আসার পর শেখ মণি—যাকে বিদ্রূপকারীরা "জাতীয় ভাগিনা" বলে অভিহিত করেন—হঠাৎ করে অজস্র টাকার মালিক হয়ে গেছেন।

আমেরিকার সুপরিচিত একজন বাঙালী বিশ্লেষক বলেন, "মুজিবকে মেয়র ড্যালীর সমগোত্রীয় মনে করতে হবে। দুর্নীতি অবশ্যই আছে। কিন্তু মুজিব যে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করেন তা যদি ঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে।" ইত্যবসরে যেভাবে মুজিবকে সিদ্ধপুরুষ করে তোলা হচ্ছে তাতে চেয়ারম্যান মাও-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশাল সুশোভিত প্রাচীর পত্রে বাংলাদেশের ইতিহাসের দৃশ্যাবলী চিত্রিত করা হয়েছে। একটি চিত্রে সাহসী মুজিব—তার চোঁয়াল 'হাঁ' হয়ে আছে—'তার' জনগণকে অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত এক ঐশ্বর্যের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তায় রাস্তায় মুজিবের ছবি ও তার বিক্ষিপ্ত বক্তৃতার উদ্ধৃতি শোভা পাচ্ছে। এ কারণে ঢাকার অনেকে অভিযোগ করেন যে, মুজিবের নিজেকে পরাক্রমশালী ভাববার নির্লজ্জ বাতিক আছে। তার নাম লিপিবদ্ধ করতেই সংবাদপত্রের প্রায় সাড়ে তিন কলাম দরকার হয়। সচরাচর তাকে "কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাংলাদেশের একমাত্র পার্টি) চেয়ারম্যান, জাতির পিতা, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" বলে আখ্যায়িত করা হয়। জনৈক পর্যবেক্ষক নাক কুঁচকে বললেন, "দশবার দ্রুত এ নাম জপ করুন, আপনি সরকারের মন্ত্রী হয়ে যাবেন।"

—শিকাগো ডেইলী নিউজ জুন ২৩, ১৯৭৫

দুর্নীতির পঙ্কে ঢাকার রিলিফ ব্যবস্থা

"দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত ঢাকার রিলিফ ব্যবস্থা"। এই শিরোনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক "ওয়াশিংটন পোস্ট"-এ ১৯৭৪-এর

পয়লা সেপ্টেম্বর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওয়াশিংটন পোস্ট-এর ঢাকা প্রতিনিধি মিঃ লুই এম সাইমন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ জাতীয় রেডক্রস সোসাইটির প্রধান গাজী গোলাম মোস্তফার সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

উক্ত প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ অংশের হুবহু অনুবাদ নিম্নে দেয়া হলো: বাংলাদেশের সবচে বড় দুর্নীতিবাজ লোকটি কে? বাংলাদেশের যে কোন ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন করা হলে কোন প্রকার চিন্তা না করে একবাক্যেই সকলে জবাব দেবেন, "গাজী গোলাম মোস্তফা—বাংলাদেশ জাতীয় রেডক্রস সোসাইটির প্রধান।"

"জনগণের অভিযোগ, গত আড়াই বছরে গাজী গোলাম মোস্তফা যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ বাঙালীদের জন্য প্রাপ্ত সাহায্যসামগ্রী ও অর্থ আত্মসাৎ করে দেশের অন্যতম বিত্তবান লোক বনেছেন।

"প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর গাজী মোস্তফার বেশ শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। এ প্রভাব রহস্যজনক বলে যেখানে-সেখানে শোনা যায়। এমনকি শেখ মুজিব তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতেও ভয় পান। যদিও ঢাকার এবং অন্যান্য শহর ও গ্রামের খুব কম লোকই প্রধানমন্ত্রীর এ বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হতে পেরেছেন। বরং সবার মনে প্রশ্ন জেগেছে, কি ধরনের লোক! সত্য হোক, মিথ্যা হোক তিনি কি ধরনের লোক, যিনি এ রকম দুর্নাম অর্জন করতে পারেন? এ প্রশ্নও দেখা দিয়েছে।"

"চেহারা ছবিতে কিন্তু গাজী গোলাম মোস্তফাকে রাক্ষুসে দুর্নীতিবাজ বলে মনে হয় না। দেখতে কালো, খাট। মাথার প্রায় মাঝামাঝি থেকে লম্বা কালো চুল। চোখে চশমা আঁটা। কথা বলেন অত্যন্ত মিষ্টি স্বরে।

"গাজী এর আগে কখনো আমেরিকার কোন সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাৎকার দেননি। তার ভাষায়: কোন মার্কিন সাংবাদিক আগে কোন সাক্ষাতকার নেননি।

"পঁয়তাল্লিশ মিনিট সাক্ষাতকারে গাজী গোলামের কপালে ঘাম দেখা দেয়। এক পর্যায়ে তিনি এক প্যাকেট দামী বিদেশী সিগারেট বের করেন। কি ভেবে তিনি তা পিছনে ছুঁড়ে মারেন। পরে এক প্যাকেট দেশী সিগারেট বের করে আগন্তুককে একটি সিগারেট প্রদান করেন। তিনি আগন্তুককে

মিষ্টি ও চা পানে আপ্যায়িত করেন। বাংলাদেশের রান্না করা সুস্বাদু খাদ্যও পরিবেশন করা হয়।''

''অগোছালো আসবাবপত্রে সাজানো রেডক্রস অফিসে বসেই গাজী গোলাম মোস্তফা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। কিসের ভিত্তিতে তাকে বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ লোক বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন : এ সকল অভিযোগ বিদ্বেষ-প্রসূত। এ সময়ে তার পিছনে বসা একজন সাহায্যকারী 'মিথ্যা' শব্দটি উচ্চারণ করেন। সাথে সাথে গাজী মোস্তফাও 'মিথ্যা' শব্দটি আওড়ালেন।''

''তিনি জানালেন যারা এই সকল অভিযোগ আনছে তারা বাংলাদেশে বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষ ছড়াতে চায়। এই সকল লোকেরা বাংলাদেশে রিলিফ আসুক তার পক্ষপাতী নয়। এই শ্রেণীর লোকেরা সব সময় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে আসছে।''

''তিনি আরো জানান, তারা বাঙালী হলেও বরাবরই স্বাধীন বাংলার বিরোধী, পাকিস্তানী মনোভাবাপন্ন। এরা দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে বাংলাদেশ বিরোধী কাজ করছে।''

''স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ রেডক্রস প্রধান নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি ধনী হয়েছেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে মোস্তফা বলেন, আমার প্রতিষ্ঠান তদানিন্তন রেডক্রস প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক বড়। তাই অনেকেই আমার ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত।''

''তিনি আরো বলেন, পরিষদের সদস্য এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ঢাকা শহরের সভাপতি হিসেবে তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাবান। এবং এটাও তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার আরেকটি কারণ। 'তাই বলে আমি ধনী ব্যক্তি নই।''

''যুদ্ধের শেষে গোলাম মোস্তফা দু'টি বাড়ী দখল করেছেন বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ''ঢাকায় আমার এক টুকরো জমিও নেই। বরং আমি ভাড়াটে বাড়ীতে থাকি।''

''তার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর অকুণ্ঠ সমর্থনের রহস্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ''শেখ মুজিব সোজা ব্যক্তি নন।'' প্রসঙ্গতঃ তিনি জানান : শেখ মুজিব দুর্নীতির দায়ে ৪৫ জন পরিষদ সদস্যকে বহিস্কার করেছেন। তিনি আমাকে ভাল চোখে দেখেন। কারণ, আমি যথাসম্ভব ভাল কাজ করে থাকি।'' ''তিনি কি এটা যথাযথ মনে করেন যে, বাংলাদেশের সম্মানজনক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান একজন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ হওয়া দরকার? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই।'

''অনেক বিদেশী রাষ্ট্রের অভিমত, বাংলাদেশের রেডক্রস প্রধান দুর্নীতিবাজের শিরোমণি। এ জন্যই উক্ত দেশসমূহ বাংলাদেশকে সাহায্য দেয়া স্থগিত কিংবা হ্রাস করছে। গোলাম মোস্তফার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যদি মিথ্যা হয় এবং তিনি যদি নির্দোষ হন, তাহলে বাংলাদেশের স্বার্থে কেন পদত্যাগ করছেন না, এ প্রশ্নের জবাবে গাজী গোলাম মোস্তফা বলেন, ''গত ৩০ বছর যাবত বাংলাদেশের জন্য অনেক ত্যাগ ও দুঃখ ভোগ করেছি।

তদুপরি আমি পাকিস্তান রেডক্রসের সদস্য ছিলাম। ১৯৭০ সালের ঝড়ের সময় দুর্গতদের সাহায্যার্থে অনেক কাজ করেছি। আমি একজন ভাল লোক বলেই প্রধানমন্ত্রী আমাকে ভালবাসেন। আমাকে ভালবাসেন, কারণ, শেখের সমর্থনে দীর্ঘদিন কাজ করেছি এবং আমার যথেষ্ট ত্যাগ রয়েছে।''

—ওয়াশিংটন পোস্ট সেপ্টেম্বর ১, ১৯৭৪

ডেথ অব এ নেশন

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিলেতী পত্রিকা গার্ডিয়ান ১৯৭৪ সালের ৯ই আগস্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে যে নিবন্ধ প্রকাশ করে, তার শিরোনাম ছিল 'ডেথ অব এ নেশন'' অর্থাৎ একটি জাতির মৃত্যু। নিবন্ধকার পিটার প্রেসটন মার্কিন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী কিসিঞ্জারের বাংলাদেশ সফরের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে পত্রিকাটিতে লিখেছেন, ''কিসিঞ্জার বাংলাদেশের প্রতি আস্থাশীল নন। তিনি ইতিপূর্বেই বাংলাদেশকে একটি 'আন্তর্জাতিক বাস্কেট কেস' বা তলাহীন ঝুঁড়ি বলে আখ্যায়িত করেন। তার বর্তমান সফরে তিনি সহজেই উক্ত বাস্কেট কেসের তলা পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন।''

তিনি আরো লিখেন, ''বাংলাদেশ দিল্লী থেকে তালি দেয়া ছিন্ন বস্ত্র যাই পাকনা কেন, তাই নিয়ে সর্বদা মেতে থাকে।''

পত্রিকা লিখেন, ঢাকা বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ভীতিপ্রদ শহর। তা বর্তমানে কলকাতা থেকেও সন্ত্রাসের শহরে পরিণত হয়েছে। কলকাতাকে বর্তমানে কিছুটা জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে। তথায় মানবতা এখনো অবশিষ্ট আছে। কিন্তু ঢাকায় এসব কোন সদগুণের উপস্থিতি নেই।'' ''ঢাকা বর্তমানে একটা বিশাল ত্রাণ শিবিরের সামিল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ

অপরিমিত বিদেশী সাহায্য পায়। প্রায় ৫০০ মিলিয়ন পাউণ্ডের মত। কিন্তু এই বিপুল সাহায্য কোথায় ব্যয় হয়েছে তার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।"

"পর্যবেক্ষকও রাজনীতিবিদ সকলের তরফ থেকে দাবি উঠেছে, সকল কিছুর মূলে রয়েছে বাস্কেটের তলার বিরাট গর্তটি। আর তা হলো দুর্নীতি।" "----বাংলাদেশকে সাহায্য দেয়া মানে হলো হারিয়ে ফেলা।"

—গার্ডিয়ান আগস্ট ৯, ১৯৭৪

অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ছে

—কেভিন রেফাটি

গত ৭ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনের 'দি ফিনান্সিয়াল টাইমস্' পত্রিকায় সাংবাদিক কেভিন রেফাটির 'পরিকল্পনাবিদ বনাম আমলা' বর্তমান সাম্প্রতিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার বঙ্গানুবাদ নীচে দেয়া হোল :

পৃথিবীর সবচাইতে গরীব দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশ কমিশন যে উদ্যোগ নিয়েছে তার প্রতি আমলাদের বিরুদ্ধাচরণ ও বাধা দানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কমিশনের কতিপয় প্রভাবশালী সদস্য বর্তমানে পদত্যাগ করার কথা ভাবছেন।

কমিশনের সদস্য ও আমলাদের মধ্যে মতবিরোধ এখন চরমে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষতস্থান সারাতে ১শ' ২০ কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য বিনিয়োগ করা হয়েছে। তবু স্বাভাবিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছে। বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদনের পরিসংখ্যান খুবই হতাশাব্যঞ্জক। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কত সে সম্পর্কে এখনো সঠিক কিছু জানা যায়নি। তবে একজন পর্যবেক্ষকের ধারণা সরকার নিয়ন্ত্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হাজার হাজার কোটি টাকা। ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী ১ বছরের ব্যর্থতার চিত্র দিনের আলোর ন্যায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যরা বলেছেন যে, দেশের মারাত্মক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গ্রামের ভূমিহীন কৃষক, মজুর ও শহরের স্বল্প আয়ের নিম্নবিত্তরা। নিত্য-

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশে রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কিছু কিছু ঘটনা অবশ্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। তবুও অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, যদি আমরা সততা ও দক্ষতার সাথে কাজ করে যেতে পারি।

১৯৭৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত গড়পড়তা জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় শতকরা ১২ থেকে ১৪ ভাগ কমে গেছে। দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণও শতকরা ২০ ভাগ কমে গেছে। বর্তমানে দেশের লোকসংখ্যা হচ্ছে সাড়ে সাত কোটি। কৃষিক্ষেত্রে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চাল। অথচ ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ কম চাল উৎপন্ন হয়েছে। অর্জনকৃত বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৪০ ভাগ ব্যয় করে ২৮ লক্ষ টন চাল আমদানী করেও চালের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ব্যবধান রয়ে গেছে শতকরা ১০ ভাগ।

শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ নীচে রয়েছে। দেশের প্রধান শিল্প পাট। পাট শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৩শ' টন। এই পরিমাণ ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় শতকরা ২৮ ভাগ কম। কাপড় ও সুতা উৎপাদনও যথেষ্ট কম হয়েছে। ১৯৬৯ সালের তুলনায় শতকরা ৩ ভাগ কম কাপড় উৎপাদন হয়েছে এবং সুতা উৎপাদন হয়েছে শতকরা ২৩ ভাগ কম। চিনি উৎপাদনের পরিমাণও হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৬৯-৭০ সালের মোট উৎপাদনের মাত্র ৫ ভাগের ২ ভাগ চিনি উৎপাদন হয়েছে। কাগজ ও ম্যাচ উৎপাদনের পরিমাণ খুবই অল্প। কেবলমাত্র সার, লৌহ এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প খাতে ১৯৬৯-৭০ সালের চাইতে বেশী উৎপাদন হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট ১৯৭২-৭৩ সালের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। যার ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উৎপাদন কম হওয়ার পেছনে এই বিদ্যুৎ বিভ্রাট অন্যতম কারণ।

গত বছরে রপ্তানীর পরিমাণ-এর আগের বছরগুলোর তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ কম। পরিবহন ব্যবস্থাই পাট রফতানীর ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসম্পর্কে প্লানিং কমিশনের সদস্যরা মন্তব্য করেছেন যে, সরকার নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ উন্নত হতে পারতো। পাট রফতানী কর্পোরেশন এবং আভ্যন্তরীণ পাট বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩টি কর্পোরেশনের মধ্যে আরো সমন্বয় সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। এদিকে

মাত্র ৫০ কোটি টাকা মূল্যের চা রপ্তানী হয়েছে। অথচ ১৯৬৯-৭০ সালে ১৩৮ কোটি টাকার চা রফতানী হয়েছিল। দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা মেটানোর জন্যে যা আমদানী করা হচ্ছে তার পরিমাণ খুবই সামান্য। এদিকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সম্পর্কে প্লানিং কমিশনের সদস্যরা জানিয়েছেন যে, স্বাধীনতার পর থেকে চালের মূল্য শতকরা ১ শ' থেকে দেড়শ' ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরিষার তেলের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। এ ছাড়া মাছ, মাংস, চিনি এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সমপরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেরোসিন ও কাপড়ের দাম তো আকাশে গিয়ে ঠেকেছে।

জাতীয়করণকৃত পাটকলগুলোর মোট সম্পদের মূল্য দেড়শ' কোটি টাকা। তার মধ্যে ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ২৫ কোটি টাকা। রফতানী লক্ষ্যের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্তভাবে হ্রাস পেয়েছে। শ্রমিক অসন্তোষ তীব্রতর হচ্ছে। অর্থের দিক থেকে সঙ্গতি সম্পন্ন একটি সংস্থা শ্রমিকদের চাকুরীর নিশ্চয়তা, দ্বিগুণ বেতন বৃদ্ধি, বিনা বেতনে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, আবাসিক, মেডিক্যাল, প্রার্থনাগারের সুযোগ সুবিধা দানের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু তাতে কোন ফল হচ্ছে না।

কিছু কিছু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, পরিস্থিতি হয়ত আয়ত্তে আনা সম্ভব হবে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় কার্ফু দেয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনী কার্ফুর মধ্যে ভূয়া রেশন কার্ড, লুকিয়ে রাখা অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করছে এবং নতুন রেশন কার্ড বিলি করছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের দেয় মোট ৫০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য ঋণের মধ্যে এ যাবত ৩০ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার ব্যয় করা হয়েছে।

পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্লানিং কমিশনের সদস্যরা যা চাচ্ছেন আমলাদের শত্রুসুলভ আচরণের জন্যে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। উল্লেখযোগ্য, প্লানিং কমিশনের সদস্যরা সবাই পশ্চিমা দেশগুলোর, প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত। প্লানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ নূরুল ইসলাম বলেছেন যে, সমস্যার সমাধানের জন্যে সমস্যার প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার জন্যে তিনি ২৭টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গবেষণা দল গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। যারা প্লানিং কমিশনের সদস্যদের যুক্তিকে সমর্থন করছেন তাদের বক্তব্য হলো আমলারা এখনও ঔপনিবেশিক মানসিকতায় ভুগছেন। এই আমলারাই আবার মন্ত্রীদের খামখেয়ালীপনার সমালোচনা করছেন।

যারা অর্থনৈতিক প্লানিং-এর সাথে জড়িত আছেন তারা মন্তব্য করেছে যে, ডঃ নূরুল ইসলাম কখনও তত্ত্বকে প্রাধান্য দেননি। যদি তিনি তত্ত্বকেই প্রাধান্য দিতেন তাহলে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার কথা তিনি বলতেন না। পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব। কিন্তু আমলাদের অসহযোগিতা ও বিরুদ্ধাচরণ এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। যদি ডঃ নূরুল ইসলামের কখনও তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা থাকতো তাহলে হয়ত তিনি তৎক্ষণাৎ তা পরিহার করতেন।

গত বছর এবং চলতি বছরের পরিকল্পনা বাস্তবের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। ডঃ নূরুল ইসলামের ধারণা, আমূল সংস্কার করা সম্ভব নয়। বর্তমানে যে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া। ডঃ নূরুল ইসলাম তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে বলেছেন আমলাদের শত্রু সুলভ আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পদত্যাগ করার কথা ভাবছেন। ডঃ ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে প্রস্তত।

পরিকল্পনাকারীদের সমর্থনে একটা কথা বলা যায় যে, পুরোনো পাকিস্তানী প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেই আমলাদের জন্ম। ফলে তাদের সে ঔপনিবেশিক মানসিকতা তারা পাল্টাতে পারেননি। তার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে আর একটি দুঃখজনক ঘটনা—সেটি হলো সাধারণতঃ কোন দেশের স্বাধীনতার পর দেশ গড়ার কাজে তরুণদের যেমন আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায় বাংলাদেশের তরুণদের বেলায় তা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে।

রাজনীতিবিদ যাঁরা আছেন তাদের প্রশাসন দফতর চালানোর কাজে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। নেতৃত্বহীন স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রমাণ করেছে যে, বছরের পর বছর কঠোর সংগ্রামের পরও কোন নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি।

শেখ মুজিবের পর নেতৃত্ব কার হাতে যাবে এ নিয়ে শেখ মুজিবের দক্ষিণ হস্ত বলে পরিচিত সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদের জোর লড়াই চলছে। এদিকে শেখ মুজিব তাঁর বন্ধুদের প্রতি উদার মনোভাব দেখিয়ে আসছেন। শেখ মুজিব কার পক্ষে সমর্থন জানাবেন তা বোঝা মুশকিল।

বাংলাদেশের এই চিত্রের পাশাপাশি রয়েছে দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর সব চাইতে গরীব দেশ

দু'টির মধ্যে একটি। হংকং, সিঙ্গাপুর, ভ্যাটিক্যান ও মোনাকোর ন্যায় বাংলাদেশ ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। বাংলাদেশের সম্পদও সীমিত। রপ্তানীযোগ্য পণ্যের মধ্যে পাট অন্যতম। কিন্তু পাট রপ্তানী করে বিশেষ লাভ হচ্ছে না। কারণ বিশ্বে অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বাড়লেও সে হারে পাটের চাহিদা বাড়েনি।

পরিশেষে বলতে হয়, যদি বাংলাদেশ প্লানিং কমিশনের প্রতিভাবান সদস্যরা পদত্যাগ করেন তাহলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

—দি ফিনান্সিয়াল টাইমস্, লণ্ডন, সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৭৪

মুজিব শুধু অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপান

'দি আটলান্টিক মান্থলি' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং সেখান থেকে ১৯৭৫ সালের মে সংখ্যা রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকায় সংক্ষিপ্তাকারে সঙ্কলিত মিঃ ক্লেয়ার স্টারলিং-এর এক নিবন্ধে বলা হয় :---মুজিবকে রাজনৈতিক চিন্তাবিদ প্রতিপন্ন করা কষ্টকর। মুজিববাদ নামধেয় তাঁর বিভ্রান্ত মতবাদ 'ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রে' উত্তীর্ণ হবার উদ্দেশ্যে দেশের শতকরা পঁচাশি ভাগ অকৃষি সম্পদ জাতীয়করণ করা হয়েছে। এই বিভ্রান্ত এক্সপেরিমেন্টের শিকার হিসেবে, সকল দেশী ব্যাঙ্ক ও ইন্সুরেন্স কোম্পানী, প্রায় সকল শিপিং কোম্পানী, সকল টেক্সটাইল শিল্প, চিনি ও পাটকলসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। এগুলোর প্রতিটিই এখন বিপুল লোকসানের সম্মুখীন। ব্যাঙ্কগুলোতে লালবাতি জ্বলার উপক্রম হয়েছে এবং এরা সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। বাংলাদেশের রফতানী বাণিজ্যের প্রাণশক্তি হিসেবে পরিগণিত চটকলসমূহের দশা খুবই কাহিল। পাকিস্তান আমলে প্রতি টন পাটে মুনাফা হতো ৩৯ ডলার। আর এখন টনপ্রতি লোকসানের পরিমাণ দাড়াচ্ছে ১২ ডলার। এসব প্রতিষ্ঠানের এহেন করুণ দশার প্রধান এবং একক কারণ হিসেবে উল্লেখ করতে হয় অব্যবস্থার কথা। শেখ মুজিব শিল্প কারখানাগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করার সাথে সাথে সে সব সংস্থার উচচ পদস্থ ব্যক্তিদের অপসারণ করেন। তদস্থলে তিনি তাঁর রাজনৈতিক স্বমতাবলম্বীদের নিয়োগ দান করেন। রাজনৈতিক মনোনয়ন প্রাপ্ত এসব ব্যক্তি তাদের স্ব স্ব কর্মস্থলে মোটেই উপযুক্ত ছিল না। পরন্তু এই অনুপযুক্ত লোকগুলো নিজেদের আখের গুছাবার

টেকনিকটা অবিলম্বে আয়ত্ত করে ফেলে। এ সব দলীয় মনোনয়ন পরিস্থিতিকে কোন্ খাতে প্রবাহিত করে, একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত থেকেই সে সম্পর্কে আন্দাজ করা যাবে। বাংলাদেশে সিমেন্টের তীব্র সংকট বিরাজ করছিল। এই অবস্থায় একটি জাহাজ ১৮ হাজার টন সিমেন্ট নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছায়। কিন্তু দেখা গেল, জাহাজে মাত্র ১১ হাজার টন সিমেন্ট রয়েছে। জাহাজের কাপ্তানের ভাষ্য অনুযায়ী বাকী সিমেন্ট ছিদ্র পথে হাওয়া হয়ে গেছে।

১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুজিবের আওয়ামী লীগ শতকরা নব্বইটি ভোট লাভ করে এবং ৩১৫টির মধ্যে সংসদে তারা ৩০৭টি আসন দখল করে। উক্ত নির্বাচনে ব্যালট বাক্স নিয়ে বেশ কিছু 'হাঙ্কিপাঙ্কি' হয়েছিল। তবু বলা চলে, এখন অনুরূপ নির্বাচনী ফলাফল লাভের জন্য তাদেরকে এমন কিছু করতে হবে যার তুলনায় পূর্বেকার 'হাঙ্কিপাঙ্কি' তেমন কিছুই নয়। জনগণের মধ্যে শেখের যাদুকরি ইমেজ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এই পটভূমিতে শেখের পদক্ষেপগুলোও ক্রমেই নির্দয় হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে এযাবতকাল পর্যন্ত অন্ততঃ দু'হাজার আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী খুন হয়েছেন। শেখ মুজিব দু'টি বেসামরিক সংগঠনের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। একটি হচ্ছে তাঁর ভাগিনার নেতৃত্বাধীন একলাখ সশস্ত্র একগুয়ে যুবকের সংগঠন যুবলীগ। এটি জাতীয় "শুদ্ধি অভিযানে" নিয়োজিত। অপরটি হচ্ছে তাঁর (মুজিব) নিরাপত্তা বাহিনী, 'নিষ্ঠুর রক্ষীবাহিনী'। শেষোক্ত দলটি যে-কোন কারণে যখন তখন বন্দুক উঁচিয়ে কারখানায় প্রবেশ করে, শ্রমিক নেতাদের ওপর খবরদারি করে, গ্রাম এলাকায় আকস্মিক কারফিউ জারি করে, জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে। এরা লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় এমন নির্মম নির্যাতন চালিয়ে থাকে, যার পরিণতিতে এযাবত বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

বঙ্গবন্ধুর একান্ত ভক্তরা তাদের এই কিংবদন্তীর নায়কের কাছে অনেক কিছুই আশা করেছিল। কিন্তু তিনি কেবল সাংবাদিকদেরকে বলেছেন, "আমি আমার লোকদেরকে ভালবাসি, এটাই আমার শক্তি ; আর আমার দুর্বলতা হলো আমি তাদেরকে বেশী ভালবাসি।" অপরদিকে তিনি দেশের জটিল সমস্যার জন্য অন্যদেরকে দায়ী করে কর্তব্য সমাধা করছেন।

—রিডার্স ডাইজেস্ট মে, ১৯৭৫

সকল সমস্যার মূলে কে ?

গত ৯ই ডিসেম্বর ওয়াশিংটন পোস্টের বৈদেশিক বিভাগে প্রকাশিত "বাংলাদেশের প্রধান রফতানীযোগ্য উৎপাদন: মুজিবের কব্জায় বাংলাদেশ 'খ' শীর্ষক নিবন্ধে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা বিশেষ করে পাটশিল্পের অচলাবস্থার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে দায়ী করা হয়েছে। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য প্রকাশিত উক্ত নিবন্ধের অনুবাদ প্রকাশ করছি:

"একজন অতিরিক্ত অধিকারের দাবিদার পিতার মত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের উপর তাঁর সুদৃঢ় কর্তৃত্ব কিছুতেই শিথিল করতে নারাজ। এবং দু'বছর বয়স্ক জাতির তেমন কোন উন্নতিই হয়নি।"

দায়ী কে?

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী তেল সংকটের সুযোগে বাংলাদেশের প্রধান রফতানীদ্রব্য পাটের ঝিমিয়ে পড়া বাজার নতুন করে সম্প্রসারণের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিবের করায়ত্ত অর্থনৈতিক নীতির জন্য বাংলাদেশ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না।

বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক মন্দাভাবের সব স্তরের ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু সব স্তর ভেদ করার পর দেখা যায় এর অর্থনৈতিক মন্দাভাবের কারণ একটি এবং তা' হচ্ছে শেখ মুজিব।

রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান প্রশাসক হিসেবে ব্যর্থ। আমলাতন্ত্রকে তিনি এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করেছেন যে, মোটামুটিভাবে বলা যায়, তার ইচ্ছার বাইরে কোন কাজ হওয়া সম্ভব নয়।

পাকিস্তানী আমলে যখন তিনি এককভাবে তাঁর দল আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিলেন, তখন থেকেই এই একক ক্ষমতার অধিকারী তিনি হন। কিন্তু একজন বিদ্রোহীর মত কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে দেশ পরিচালনা শুরু করা বাংলাদেশে সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমাগত বাড়ছে।

পাট ও পাটকল সংস্থা:

পাটের ক্ষেত্রেই অচলাবস্থা সবচেয়ে প্রকট। তেল সংকটের জন্য বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম আঁশের উৎপাদন হ্রাস পাবার সাথে সাথে পাটের উপর সবারই নতুন করে নজর পড়েছে।

কৃত্রিম আঁশের আকস্মিক উৎপাদন সংকটের জন্য আমেরিকা ও ইউরোপীয় কম্বল ও গালিচা প্রস্তুতকারকরা বেকিং তৈরীর জন্য প্রাকৃতিক আঁশ বিশেষ করে পাটের উপর নির্ভর করতে শুরু করেছে। চট প্রস্তুতকারকরাও পাটের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।

বিশ্বব্যাপী পাটের এই চাহিদা মেটাবার সুযোগ গ্রহণে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকে নেমে এসেছে। দেশজুড়ে পাট শ্রমিকরা ধর্মঘটরত। প্রধান চটকলগুলো বন্ধ হয়ে আছে। জাহাজের অভাবে অধিকাংশ পাটজাতদ্রব্য চট্টগ্রাম কিম্বা চালনা বন্দরের ডকে ঝুলছে।

১৯৬৯-৭০ সালের স্বাভাবিক বছরের চেয়ে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ কমেছে। কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে উৎপাদন ব্যয়। যুদ্ধের আগে প্রতিটন পাটজাত দ্রব্য ৩৯ ডলার করে মুনাফা হলেও বর্তমানে টন-প্রতি ১২ ডলার ক্ষতি হচ্ছে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ পাকিস্তানীদের কবল-মুক্ত হবার পর নতুন সরকার সর্বপ্রথম যে কাজটি করলেন তা' হচ্ছে পাট শিল্প জাতীয়করণ। এর বেশী অংশই পশ্চিম পাকিস্তানীদের মালিকানাধীন ছিল।

খুরশীদ আনোয়ার প্রসঙ্গ:

জাতীয়করণকৃত পাটকল সংস্থা পরিচালনার জন্য শেখ মুজিব নিযুক্ত খুরশীদ আনোয়ার একজন সাবেক সিভিল সার্জেন্ট এবং ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান কর্তৃক দুর্নীতির দায়ে বরখাস্তকৃত ৩০০ জন অফিসারের অন্যতম।

জনৈক সাবেক পাটকল মালিক বলেছেন, কি করে পাটকল চালাতে হয় সে সম্পর্কে খুরশীদ কিছুই জানে না। শ্রমিকদের বোনাস, ডিভিডেন্ট ও সব রকম ট্যাক্স দেবার পরও মালিকরা পাটকল থেকে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছে কিন্তু খুরশীদ কোনটাই করতে পারছে না।

শেখ মুজিব যেমন সকল কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার অধিকারী তেমনি খুরশীদের হাতেও পাটকলের সকল ক্ষমতা অর্পিত। এটা আমলাতন্ত্রের সম্প্রসারিত রূপ।

জনৈক ক্ষমতাচ্যুত পাটশিল্প কর্মকর্তা বলেছেন, বাংলাদেশের সবাই ক্ষুদ্র বৃহৎ যে-কোন বিষয়ই হোকনা কেন কমপক্ষে ৩ জনের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। এজন্য শেষ পর্যন্ত সব কাজেই বিঘ্ন ঘটছে।

শ্রমিক ও আবদুল মান্নান প্রসঙ্গ:

শেখ মুজিব নিজে একটি জাতীয় শ্রমনীতি নির্ধারণে অনিচ্ছুক অথবা অক্ষম। বাংলাদেশীয় সমাজতন্ত্র মোতাবেক শিল্প, ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব থাকার কথা, কিন্তু বাস্তবে তা নেই।

জাতীয় শ্রমিকলীগ (সরকারী সংগঠন) নামক একটি সংস্থার যোগসাজশে শ্রমিকরা আকাশ ছোঁয়া বেতন দাবি করে আসছে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অন্যতম বিত্তশালী ব্যক্তি বলে সুপরিচিত এবং শ্রমিক লীগ নেতা মান্নান শেখ মুজিবের স্বীকৃতি আদায় করে গত কয়েক মাসে শ্রমিকদের বাড়তি বেতন ও বোনাস বাবদ ৯০ লক্ষ ডলার (৯ কোটি টাকা) শ্রমিকদের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য করেছে।

যদিও দেশে পর্যাপ্ত অর্থের অভাব নেই কিন্তু অবিরত ধর্মঘট এবং শ্রমিক অসন্তোষের ফলে দেশী ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীরা পুঁজি বিনিয়োগ থেকে বিরত।

আইন-শৃংখলার অবনতির দরুন বিত্তশালীরা তাদের অর্থ ব্যাঙ্কে জমা করে রাখছে। কারখানায় শ্রমিকদের দাবি মেটাতে এ মওজুদকৃত অর্থের কিছু অংশ ব্যয় হচ্ছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে ব্যাঙ্কে জমা টাকার পরিমাণ বাড়ছেই।

খাদ্য আমদানী:

জালানি এবং খুচরা যন্ত্রাংশের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় না করে খাদ্য আমদানীর জন্য এ অর্থ মওজুদ রাখা হচ্ছে। জনসাধারণকে শান্ত রাখার জন্যে একটি ভাল পদ্ধতি বেছে নেয়া হয়েছে বলে জনৈক বৈদেশিক পর্যবেক্ষকের মন্তব্য।

পরিকল্পনা কমিশনের জনৈক পদস্থ কর্মকর্তা জানান, এবারের খাদ্য উৎপাদন রফতানীর পর্যায়ে এসে খাদ্য আমদানী হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনা মত ১৯৭৪ সালে ২ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করা হবে। গত বছরে খাদ্যের উৎপাদন ব্যাহত হলেও সমপরিমাণ খাদ্যই এবার আমদানী করা হচ্ছে।

পরিকল্পনা কমিশনসূত্রে আরো জানা গেছে, খাদ্যশস্য, ভোজ্যতেল, সিমেন্ট ও কাপড়ের বিশ্বব্যাপী মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এ ৪টি জিনিসেরই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। এ জন্য বৈদেশিক

মুদ্রা মওজুদ করে রাখা হচ্ছে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানীর উপর বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী নির্ভরশীল। কারণ, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে এরা সবচেয়ে অনুন্নত।

জাহাজ চলাচলের কারণেও আমদানীর স্থবিরতা পাট রফতানীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আমদানী হ্রাস পাওয়ায় খালি জাহাজ নিয়ে বাংলাদেশের বন্দরে আসা অযৌক্তিক। অলাভজনক বিধায় উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের জাহাজ বাংলাদেশে আসা থেকে বিরত থাকছে।

এর ফলে জাতীয়করণকৃত বাংলাদেশের ৮টি জাহাজ ও ভারতীয় জাহাজের উপর বাংলাদেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। যেহেতু নিজস্ব উৎপন্ন পাটের চালান করতেই ভারত গলদঘর্ম। এজন্য বাংলাদেশের পাট রফতানী ভারতের কাছে দ্বিতীয় মর্যাদা পেয়ে আসছে।

—গণকণ্ঠ জানুয়ারী ২৭, ১৯৭৪

চাটুকার পরিবেষ্টিত শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিপর্যয়ের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে

বিরোধীদলের ওপর শেখ মুজিবের খড়গহস্ত এবং রক্ষীবাহিনী দিয়ে জনগণের কণ্ঠরোধ করার ঘৃণ্য সরকারী নীতি বিদেশী সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদেরকে পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পর্কে কটু কথা বলতে বাধ্য করছে।

এক সময় বাংলাদেশ সম্পর্কে বিদেশে যে উচ্চ ধারণা এবং সহানুভূতির জন্ম হয়েছিলো, আজ তার ভগ্নাংশটুকুও অবশিষ্ট রয়েছে কিনা সন্দেহ।

এ সপ্তাহের 'নিউজ উইক' পত্রিকায় বাংলাদেশ সরকারের চণ্ডনীতি এবং অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় শেখ মুজিবের সামগ্রিক ব্যর্থতা সম্পর্কে টনী ক্লিফটন লিখিত একটি নাতিদীর্ঘ সংবাদ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদ নিবন্ধের মুখ্য অংশগুলোর অনুবাদ দেয়া হলো:

'রক্ষীবাহিনী' নামক একটি আধা সামরিক বাহিনী পুনরায় নির্যাতন এবং হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে।

বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বলতে যেয়ে আজো পাকিস্তানী আমলের মতোই জনগণ ভয়ে কেঁপে উঠে।

"এই আড়াই বছর আগে বাংলাদেশ সম্ভবতঃ দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী দেশ ছিলো। পাকিস্তানীদের দ্বারা সংগঠিত নৃশংস গণহত্যা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন সবেমাত্র স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত কিন্তু বিজয়ী বাংলাদেশের বিরাট ভবিষ্যৎ নিয়ে তখন সকল মহলে প্রচুর আশাবাদ।

'কিন্তু আজ এদেশে সুখ এক অবলুপ্ত আবেগমাত্র। 'রক্ষীবাহিনী' নামক একটি আধা সামরিক বাহিনী পুনরায় নির্যাতন এবং হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে। বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বলতে যেয়ে আজো পাকিস্তানী আমলের মতোই জনগণ ভয়ে কেঁপে ওঠে। বাংলাদেশ এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে তফাৎ মাত্র এটুকুই যে, জনগণ এখন আগের চাইতেও দরিদ্র হয়ে পড়েছে এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের বদলে স্বজাতির দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছে।"

পত্রিকাটি আরো লিখেছেন : "যে-কোন ধরনের সমালোচনা স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে যদিও বা সরকারী মহল থেকে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তথাপি সর্বত্র বিপদসংকেত দেখা যাচ্ছে। অর্থনীতিতে অচলাবস্থা নেমে এসেছে এবং কেবলমাত্র ১৫০ কোটি ডলারের বিদেশী সাহায্যই ব্যাপক অনাহার থেকে জনগণকে বাঁচিয়ে রাখছে।"

"ধান-পাটের উৎপাদন যুদ্ধ পূর্ব-কালীন মাত্রার অনেক নীচে নেমে গেছে, বিদেশী মুদ্রার ভান্ডার শূন্য এবং মুদ্রাস্ফীতি শতকরা ৪০ ভাগ ছাড়িয়ে গেছে।

"পাকিস্তানী আমলে যে শ্রমিক দিনে ৩ টাকা পেতো, এখন তার রোজগার ৮ টাকা। কিন্তু সে আমলের ৩ টাকা মূল্যের খাবার কিনতে এখন তার প্রয়োজন ২০ টাকার।

"এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য যে ব্যক্তিকে সরাসরি দোষারোপ করতে হয়, তিনি হলেন বাংলাদেশের জনক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

"কিছুসংখ্যক চাটুকার পরিবেষ্টিত শেখ মুজিবের অবস্থা এমন হয়েছে যে, নিজের ভুলভ্রান্তিগুলো পর্যন্ত জানতে পারা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এ চাটুকারের দল কেবল সেই সংবাদগুলোই তার কানে তোলে, যে সংবাদগুলো তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে জানতে চান। শুধু বৈদেশিক নীতি ছাড়া শেখ মুজিবের নেতৃত্ব প্রায় সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

এমন একটি সরকারের তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার মধ্যে রয়েছে যোগ্যতা-হীন আমলা, যতসব বদমাশ এবং কিছু ভালো কিন্তু অনভিজ্ঞ মন্ত্রীর দল।

ঘরোয়া অসন্তোষ দমনে মুজিব এমন এক ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছেন যাকে বলা যায় : রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের সুপরিকল্পিত কর্মসূচী। রক্ষীবাহিনী মুজিব বিরোধীদের দমন করার কাজে প্রাইভেট বাহিনী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে গঠিত এ বাহিনীকে বর্তমানে অনেক বাঙালী ভীতির চোখে দেখতে শুরু করেছে।

সম্প্রতি জনৈক মন্ত্রীর বাড়ী ঘেরাওকারী একটি মিছিলের ওপর রক্ষী-বাহিনীর মেশিন গান উত্থিত হয় এবং ঠান্ডা মাথায় এরা উক্ত মিছিলের ১৯ জনকে হত্যা করে। নাগরিক অধিকার এবং আইন সাহায্য কমিটির ১৬০ জন সদস্য গত সপ্তাহে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় রক্ষীবাহিনীর নিন্দা করেছে। সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সরকার ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে বলে উক্ত কমিটি অভিযোগ করে।

এতদিন মুজিবের বৈদেশিক নীতি যা কিছু সফল হয়েছিলো ইদানীং তাতেও মন্দা নেমেছে। পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টো দু'-সপ্তাহ আগে ঢাকায় এসে তাঁর সাথে যে কথাবার্তা হয়েছে তাতে কোন ফলোদয় হয়নি। যুদ্ধকালে বাংলাদেশের ক্ষতিপূরণ দাবি করা হলে ভুট্টো সরাসরি সেটা নাকচ করে দেন।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হচ্ছে : বাংলাদেশ মনে করে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সারা দুনিয়ার একটা গরজ পড়ে আছে। এ মন্তব্য জনৈক বিদেশী কূটনীতিকের। উক্ত কূটনীতিক আরো বলেছেন : তারা মনে করে, যুদ্ধের সময় যেহেতু বিশ্ব জনমত তাদের স্বপক্ষে থেকেছে অতএব সব সময়ই সে রকমটিই থাকতে হবে।

বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখতে দুনিয়ার গরজ পড়েছে কি পড়েনি সেটা অন্য কথা। তবে ভবিষ্যতে দেশটির জন্য অত্যন্ত কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য সাহায্যকারী দেশগুলো নিজেরাই মূল্য বৃদ্ধির চাপে অস্থির। ফলে ক্রমাগতহারে তারা সাহায্য-দানের বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করে চলছে।

—নিউজ উইক জুলাই ১৫, ১৯৭৪

'আওয়ামী লীগের আমলে বাংলাদেশ একটা চরম দুর্নীতির রাজ্যে পরিণত হয়েছে'

পশ্চিম জার্মানীর একটি নেতৃস্থানীয় পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি কার্লোস বিডম্যান বলেছেন যে, আওয়ামী লীগের আমলে বাংলাদেশ একটি চরম দুর্নীতির রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

গত আগস্ট মাসে বাংলাদেশের ভয়াবহতম সময়ে সরেজমিনে এদেশের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি রিলিফ সামগ্রী আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতির সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফা আত্মসাতের ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় বলে রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেছেন।

মিঃ বিডম্যান ঢাকা থেকে একটি হেলিকপ্টারে চড়ে গোপালগঞ্জ গিয়েছিলেন বন্যা দুর্গতদের দেখতে। হেলিকপ্টারে ছিলো দু'টন সাদা রুটি।

"হেলিকপ্টারটি দু'টন সাদারুটি নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান টুঙ্গীপাড়ায় অবতরণ করবে। কিন্তু এই রুটি যাদের জন্যে আনা হয়েছে, তাদের হাতে না পৌঁছে অধিকাংশই যাবে অন্য লোকের হাতে।"

"গোপালগঞ্জের ফুটবল খেলার মাঠে তখন একহাঁটু পানি। হেলিকপ্টার সেখানেই কোনমতে নামলো। সংগে সংগেই স্বয়ংক্রিয় পিস্তল ও লাঠি নিয়ে রক্ষীবাহিনী ছুটে আসা শিশুদেরকে তাড়িয়ে দিলো।"

বন্যার্তদের সাহায্য সংগ্রহে সরকারী ব্যর্থতা :

মিঃ বিডম্যান বলেছেন যে, এবারের বন্যা সবচেয়ে ভয়াবহতম বন্যা। কিন্তু সরকার বন্যার্তদের জন্যে বিশ্ববাসীর সহানুভূতি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছেন। মিঃ বিডম্যান লিখেছেন, সন্দেহপ্রবণ ও সংশয়ী বিশ্ব তাই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। আদর্শবাদীরা পর্যন্ত বাংলাদেশের ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছে। ঢাকায় অবস্থিত ৬৭টি বিদেশী সাহায্য সংস্থার মধ্যেও তেমন তৎপরতা দেখা গেল না। অবশেষে সরকার হয়তো বা বাধ্য হয়েই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ক্ষয়ক্ষতির একটি প্রতিবেদন দাঁড় করালো। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও কোন তরফকেই আকৃষ্ট করা গেল না।

সরকার শিল্পোন্নত দেশ থেকে আর্থিক সাহায্য লাভের চেষ্টা করলো। ঢাকায় অবস্থিত কূটনীতিক এবং দেশে উন্নয়নকার্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিরা জনৈক বৃটিশ অফিসারের উদ্ধৃতি দিয়ে বললো, "বাঙালীর শরীর মেঘাচ্ছন্ন, পদযুগল নর্দমায় সিক্ত আর হাত অন্যের পকেটে ঘুরে বেড়ায়।"

নবজাত বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিরা জানে, এসব অর্থ উপযুক্ত লোকের হাতে না পড়ে অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের পকেটেই পড়বে।

জার্মান সাংবাদিক উল্লেখ করেছেন, "বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে ১৯৭৩ সালের শেষ পর্যন্ত এদেশ এক হাজার কোটি টাকার ওপর সাহায্য পেয়েছে। কোন উন্নয়নশীল দেশ এত অল্প সময়ে এত অধিক সাহায্য পায়নি। তা স্বত্ত্বেও দেশের প্রধান প্রধান সমস্যা সমাধানের জন্য তেমন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। দেশে বহু বেকার রয়েছে এবং এমন লোক রয়েছে যারা উপযুক্ততার চেয়েও নীচু মানের কাজ করছে। স্বাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন—এই প্রবাদ আর এদেশে কারো মনে দাগ কাটে না, সেখানে নেতৃবৃন্দ নিজেদের আখের গুছাতে ব্যস্ত। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগেরও এই একই নীতি। বাংলাদেশে জাতিসংঘ ত্রাণ তৎপরতার এককালীন প্রধান টনি হ্যাগেন তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "শিশু খাদ্যের এক সপ্তমাংশ ও প্রতি ১৩টির মধ্যে ১টি কম্বল উপযুক্তদের হাতে পৌঁছায় না। বেশীর ভাগ জিনিস হয় কালোবাজারে চলে যায় অথবা চোরাচালান হয়ে ভারতে চলে যায়। পত্রপত্রিকায় এসব ব্যাপারে লেখালেখি হলেও অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। এক বার বিমানে করে বন্যার্তদের জন্যে গুড়ো দুধ এলো। সেদিন গুড়ো দুধগুলো ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছালো তার পরদিন রাজধানীর এক হোটেল ম্যানেজার দুধ কিনতে বাজারে লোক পাঠালো। বাজারে হরদম সদ্য আসা দুধ বিক্রী হচ্ছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কার্লোস বিডম্যানের মতে, গাজী গোলাম মোস্তফা হচ্ছেন হাস-মুরগীরূপী সাহায্যসামগ্রীর জন্য শেয়ালের মত রক্ষক-ভক্ষকও বটে।

—গণকণ্ঠ অক্টোবর ২৬, ১৯৭৪

আরো ৪০ হাজার মারা যাবে : অক্টোবর পর্যন্ত ৪টি জেলায় অনাহারে ৬০ হাজার লোক মারা গেছে

দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলাদেশের কেবল চারটি জেলাতেই এ পর্যন্ত ৬০,০০০ ব্যক্তি অনাহারে মারা গেছে জানিয়ে এবং ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ আরো ৪০,০০০-এর মৃত্যু আশঙ্কা করে যুক্তরাজ্যের বহুল প্রচারিত গার্ডিয়ান পত্রিকায় সম্প্রতি একটি সংবাদ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। গার্ডিয়ানের সাংবাদিক ওয়াল্টার সোয়ার্জ ঢাকা থেকে উক্ত তথ্য প্রেরণ করেছেন।

সোয়ার্জ লিখেছেন : বছর শেষ হবার পূর্বেই যে লাখো লাখো মানুষ না খেয়ে মারা যাবে এটা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন। বাংলাদেশের সরকার, সরকারী আমলা, কর্মচারী, বিদেশী কূটনীতিবিদ এবং সাহায্য সংস্থার লোকেরাও এটাই মনে করেন।

যুক্তিসংগত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দুর্ভিক্ষ কবলিত চারটি জেলায় অক্টোবর মাস পর্যন্ত ষাট হাজার মানুষ না খেতে পেরে মৃত্যুবরণ করেছে। ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ আরো চল্লিশ হাজার লোকের অনাহার কবলিত হয়ে প্রাণ বিয়োগের আশঙ্কা রয়েছে।

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ৫, ১৯৭৪

পনরই আগস্টের পরবর্তী পর্যায়

আরো ৪০ হাজার মারা যাবে : অক্টোবর পর্যন্ত ৪টি জেলায় অনাহারে ৬০ হাজার লোক মারা গেছে

দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলাদেশের কেবল চারটি জেলাতেই এ পর্যন্ত ৬০,০০০ ব্যক্তি অনাহারে মারা গেছে জানিয়ে এবং ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ আরো ৪০,০০০-এর মৃত্যু আশঙ্কা করে যুক্তরাজ্যের বহুল প্রচারিত গার্ডিয়ান পত্রিকায় সম্প্রতি একটি সংবাদ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। গার্ডিয়ানের সাংবাদিক ওয়াল্টার সোয়ার্জ ঢাকা থেকে উক্ত তথ্য প্রেরণ করেছেন।

সোয়ার্জ লিখেছেন : বছর শেষ হবার পূর্বেই যে লাখো লাখো মানুষ না খেয়ে মারা যাবে এটা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন। বাংলাদেশের সরকার, সরকারী আমলা, কর্মচারী, বিদেশী কূটনীতিবিদ এবং সাহায্য সংস্থার লোকেরাও এটাই মনে করেন।

যুক্তিসংগত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দুর্ভিক্ষ কবলিত চারটি জেলায় অক্টোবর মাস পর্যন্ত ষাট হাজার মানুষ না খেতে পেরে মৃত্যুবরণ করেছে। ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ আরো চল্লিশ হাজার লোকের অনাহার কবলিত হয়ে প্রাণ বিয়োগের আশঙ্কা রয়েছে।

—গণকণ্ঠ ডিসেম্বর ৫, ১৯৭৪

পনরই আগস্টের পরবর্তী পর্যায়

মুজিব নিজেই দায়ী

—মার্টিন উলাকট

সামরিক অভ্যুত্থানের বিস্তারিত খবর স্পষ্ট না হলেও এর কারণ মোটা-মুটি সুস্পষ্ট। শেখ মুজিবের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কারসাজি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। একমাত্র বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মুজিবের প্রখ্যাত রাজনৈতিক দক্ষতা এ তীব্র অসন্তোষ অনু-ধাবন করতে কিংবা তা নিরসন করতে সহায়ক হয়নি।

মুজিবের মৃত্যুর নির্মম পরিহাস এই যে, পাকিস্তানীরা তাকে হত্যা করেনি, তার দেশবাসীরাই তাকে হত্যা করেছে। এতে বুঝতে পারা যায়, কত দ্রুত বাংলাদেশ আশার উচ্চ শিখর থেকে হতাশা ও নৈরাশ্যের অতল গহ্বরে নেমে এসেছিল, যার ফলে এই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে।

এর জন্য বহুলাংশে দায়ী মুজিব নিজে। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র চলাকালে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মুজিব কোন সংস্কার সাধনে, এমন কি একটি যোগ্য, সৎ প্রশাসন গড়ে তুলতেও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এবং দেশে কিছুটা প্রগতি আনার জন্য তার শেষ পদক্ষেপেই তার পতন ডেকে এনেছে। বামপন্থী আদর্শে তিনি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সেনাবাহিনী তার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। অথচ তাদের সমর্থনেই তিনি প্রথম ক্ষমতায় এসেছিলেন।

গত বছরের মাঝামাঝি মুজিব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার সরকার দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। শোচনীয় জীবনযাত্রার মান আরো শোচনীয় হয়ে পড়েছে। সপ্তাহে গড়ে সাতটি করে রাজনৈতিক খুন সংঘটিত হচ্ছিল আর দেশে ব্যাপক দুর্নীতি চলছিল, যার জন্য মুজিব ও তার পরিবারকে দায়ী করা হত।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে স্বাধীনতার পর থেকে ১২ হাজার মিলিয়ন পাউণ্ড বিদেশী সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির অবক্ষয় কমেনি। কালো-বাজারী ও মুনাফাখোরদের কারসাজিতে দেশের কৃষিনীতিও পঙ্গু হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আওয়ামী লীগের চাঁই। এ অবস্থায় মুজিব নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজছিলেন। তাতে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য মস্কোপন্থী দলগুলোও উৎসাহ যুগিয়েছিল।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে মুজিব দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। এ বছর জানুয়ারী মাসে তিনি শাসনতন্ত্র সংশোধন করে কার্যতঃ এক নতুন সংবিধান সৃষ্টি করলেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে মুজিবের হাতে সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা ন্যস্ত হ'ল, এমন কি বিচার বিভাগের কর্তৃত্বও। জাতীয় দল ছাড়া আর সব রাজনৈতিক দল বেআইনী ঘোষিত হ'ল।

কয়েক মাস বিশেষ কিছু ঘটেনি। মুজিব মধ্যযুগীয় নৃপতির মত-অফিসে-দরবারে বসতেন, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতেন, গল্প বলতেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের বিদায় করতেন। তার নতুন মন্ত্রি-সভায় পুরান মন্ত্রীরাই ছিলেন। দু'একজন টেক্‌নোক্রেটকেও নেওয়া হয়েছিল।

মে মাসে মুজিব ঘোষণা করলেন যে, গ্রামে গ্রামে বাধ্যতামূলকভাবে কৃষি সমবায় গঠন করা হবে, গ্রামাঞ্চলে প্রশাসনিক পরিবর্তন করা হবে এবং জাতীয় দল গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। সংক্ষিপ্ত হলেও এ কর্ম-সূচী আওয়ামী লীগ, সেনাবাহিনী, পেশাদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেককেই আতঙ্কিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, মুজিব তার চিরদিনের সমর্থকদের যেমন পেশাদার, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাদ দিয়ে কৃষকদের সমর্থন লাভের প্রয়াস করছেন এবং আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে এমন একটি দল গঠনের চেষ্টা করছেন যা তার হুকুম অন্ধভাবে তামিল করবে। এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠন করে তিনি আমলাতন্ত্রকেও ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন।

আগেই বিরোধীদলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। জুন মাসে সংবাদপত্রগুলোও সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হল। আওয়ামী লীগের চাঁই ও মন্ত্রীরা বুঝতে পারলেন যে, সম্ভবতঃ তাদের দিন ঘনিয়ে আসছে।

আওয়ামী লীগের উর্ধ্বতন নেতৃবর্গ মুজিবকে জানতেন। তারা আরোও জানতেন কি করে মুজিব একে একে দলের ভিতরকার বিরোধী গ্রুপগুলোকে ধ্বংস করেন। ফেব্রুয়ারী মাসেই আওয়ামী নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, নতুন মন্ত্রিসভা একটি "সাময়িক ব্যবস্থা" মাত্র এবং এর ব্যাপক "পরি-শোধনের" জন্য মুজিব সুযোগের অপেক্ষা করছেন।

এসব মন্ত্রীদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মুশতাক আহমেদ, যিনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে সদ্য ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। ১৯৭১ সালে কলিকাতায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের তিনি বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন।

খন্দকার ডানপন্থী বলে পরিচিত। সহকর্মী তাজউদ্দীনের ভাগ্য বিপর্যয় থেকে হয়ত তিনি ছবক নিয়েছিলেন।

তাছাড়া আদর্শগত প্রশ্নও ছিল। মুজিব নতুন জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনেক মস্কোপন্থী রাজনীতিবিদকে স্থান দিয়েছিলেন, ফলে আওয়ামী লীগের ভিতরে ও বাইরে প্রাচীনপন্থী মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, নতুন শাসকরা বাংলাদেশকে "ইসলামিক রিপাবলিক" ঘোষণা করেছেন।

সর্বোপরি, স্বাধীনতার পর থেকেই মুজিব সেনাবাহিনীকে আঘাত করে আসছিলেন। শুরু থেকেই ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। রক্ষীবাহিনী একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রহরী, গোয়েন্দা পুলিশ ও বিকল্প সেনাবাহিনী ছিল। আয়ারল্যাণ্ডের ব্ল্যাক এণ্ড টেন্স ও জার্মানীর ব্রাউন শার্টের সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়।

১৯৭৩ সাল পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীতে ভারতীয় উপদেষ্টা ছিল। এর পরেও রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা ট্রেনিং-এর জন্য ভারতের দেরাদুনে যেত। রক্ষী-বাহিনীর সংখ্যা ২০ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য ছিল আরও অনেক বেশী।

রক্ষীবাহিনীর সংখ্যার জন্য নয়, যেভাবে সরকার তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাত তাতেই সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়েছিল। প্রচুর টাকা খরচ করা হত রক্ষী-বাহিনীর ব্যারাক তৈরী করার জন্য। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বেশীর ভাগই পেত রক্ষীবাহিনী। আর সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট থাকতে হত সেকেলে অস্ত্র-পাতি নিয়ে। রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক স্বয়ং-ক্রিয় রাইফেল-এ সজ্জিত করার আলাপ-আলোচনা চলছিল। অথচ সেনাবাহিনীর হাতে পুরানো ৩০৩ রাইফেলের বেশী কিছু নেই।

সামরিক অভ্যুত্থানে রক্ষীবাহিনীর ভূমিকা স্পষ্ট নয়। যদি তারা সমর্থন করে থাকে—হয়ত করেছে—তা এজন্যে যে রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের অনেকেই সেনাবাহিনীর ভূতপূর্ব অফিসার এবং তাঁরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে একমত হয়েছেন যে, দেশে একটিমাত্র সামরিক বাহিনী থাকবে।

যেভাবেই হোক, রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অসন্তোষই হচ্ছে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ এবং এক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আর এক সেনাবাহিনী গঠন করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার যে নীতি মুজিব গ্রহণ করেছিলেন তা' ব্যর্থ হয়েছে।

—গার্ডিয়ান, লণ্ডন, আগস্ট ১৬, ১৯৭৫

অবশ্যম্ভাবী পতন

—কেভিন রেফার্টি

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির সূত্রপাত হয় গত বছরের মাঝামাঝি সময়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুজিব ভারতে ধান, চাউল ও পাট পাচারের বহর দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছিল। অপরদিকে যখন লাখ লাখ বাঙালী না খেয়ে মরেছে, তখন মুজিবের ঘনিষ্ট সহচররা চোরাচালানের ব্যবসায় মোটা অংক কামাই করেছে—রাতারাতি ধনী হয়ে উঠেছে।

চোরাকারবার থামাবার জন্য মুজিব সেনাবাহিনীকে তলব করলেন, কিন্তু তাদের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতে রাজী হলেন না, বরং রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য চাপ দিলেন। বিশেষ সুবিধাভোগী রক্ষীবাহিনী মুজিবের প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীর প্রতি সেনাবাহিনীর বিশেষ বিরাগ ছিল। সেনাবাহিনীর জনৈক অফিসার মন্তব্য করেছিলেন যে, "রক্ষীবাহিনী শুধুমাত্র ঢাকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম, কেননা তারা স্থানীয় গুণ্ডাদের তুলনায় উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ঠগদের নিয়ে গঠিত।"

সেনাবাহিনীর অসন্তোষ চাপা দেওয়ার জন্য মুজিব একদিকে কোন কোন অফিসারকে প্রমোশন ও অপরদিকে সময় সময় মেজর, লেঃ কর্নেল ইত্যাদি মাঝারি পদমর্যাদার অফিসারদের অপসারণের নীতি গ্রহণ করেন।

চোরাচালানকারী দমনের অভিযান সফল হয়নি। কারণ বেশীর ভাগ দোষী ব্যক্তি সরকারের আশ্রয় লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু এই অভিযান চলাকালে সেনাবাহিনী ক্ষমতার কিছুটা আস্বাদ পেয়েছিল। এতে তাদের অসন্তোষ আরো বেড়ে যায় এবং তারা সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকে।

পরের অংক শুরু হয় গত বছরের শেষ দিকে। শেখ মুজিব দেশের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র পাল্‌টিয়ে, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, নিজেকে প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত করলেন এবং সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে দিয়ে তিনি একটি নতুন একদলীয় শাসন প্রবর্তন করলেন। চারটি ছাড়া বাদবাকী সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হল। সারা দেশকে ৬১টি নতুন জেলায় বিভক্ত করা হল।

নিজের বিশ্বাসে অটল থাকার মত সৎসাহস শেখ মুজিবের কোন দিনই ছিল না। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের চাপে একক দল পুরাতন পাপীদের

ভীড়ে নতুনত্ব লাভ করতে ব্যর্থ হল। এদের অনেকেই সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশাকে পুঁজি করে রাতারাতি সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল।

সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মুজিব নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে নিয়েছিলেন। ফলে, নিতান্ত সামান্য ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে মাসের পর মাস লেগে যেত। কারণ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তার কাছে না পৌঁছালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর ছিল না। শাসন ব্যবস্থার এ দুর্বলতা সব সময়েই সুস্পষ্ট ছিল।

মুজিব তোষামোদপ্রিয় ছিলেন এবং ক্রমেই চাটুকারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে উঠেছিলেন। এই চাটুকারের দল সযত্নে তার কাছ থেকে অপ্রিয় সত্য গোপন করে রাখত। সংবাদপত্রের উপর নির্দেশ জারি করা হয়েছিল মুজিবের বড় ফটো ফলাও করে ঘন ঘন ছাপাবার জন্য।

তাঁর নিজের পরিবারের লোকজনের আর্থিক স্বার্থ আদায়ের প্রতি তাঁর নজর ছিল। তিনি নিজে ঘুষ নিয়েছেন কিনা এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। কারণ তা নেওয়ার তো তাঁর প্রয়োজন ছিল না। বাংলাদেশের কাগজের নোটের উপর তাঁর ছবি ছাপা হয়েছিল। সবচেয়ে গরীব দেশের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট পদের সঙ্গে যে সব ব্যয়বহুল সুযোগ-সুবিধা সম্পৃক্ত তার সবই তাঁর করায়ত্তে ছিল।

তবে অনেকেই তার ছেলেদের এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। ইদানিং ঢাকার লোকমুখে একটা গল্প শোনা যায়। তা হল : পুলিশ দু'জন কমবয়সী গুণ্ডাকে ধরেছে। গ্রেফতারকারী পুলিশ অফিসার তার উপরের অফিসারের কাছে জানতে চাইলেন গুণ্ডা দু'টিকে বিচারে সোপর্দ করা ঠিক হবে কিনা। উপরের অফিসার তাঁর উপরের অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তাঁর উপরের অফিসারকে এবং এইভাবে বিষয়টি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মুজিবের কাছে আসল। শেখ মুজিব তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কামাল ও জামাল কি ঘরে ফিরেছে?" বেগম সাহেবা জবাব দিলেন, "হাঁ, ফিরেছে।" এ কথা শোনার পর শেখ পুলিশকে তরুণ গুণ্ডা দু'টিকে বিচারের জন্য সোপর্দ করতে অনুমতি দিলেন। এ গল্পটি সত্য না বানানো তা বিচার করতে যাওয়া অবান্তর, কারণ বহু লোক এ গল্পের সত্যতায় বিশ্বাস করে এবং এ গল্প বহু লোকের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়েছে।

কিছুকাল আগে শেখ পরিবারের দু'অংশের মধ্যে ঘরোয়া সংঘাত দেখা দেয়। তার ফল হিসাবে বেশ কয়েকটি জীবন বিনষ্ট হয়েছে। একটি বিবাদ-

মান অংশের প্রধান ছিলেন মুজিবের ছেলে কামাল এবং অপরটির প্রধান ছিলেন তার ভাগিনা শেখ মণি। শেখ মণির পেছনে বেগম মুজিবের সমর্থন ছিল।

স্বজনপ্রীতির প্রশ্নটি এ বছরে বড় হয়ে ধরা পড়ে। শেখ মুজিবের বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে, শেখ তার ভাবী উত্তরাধিকারী হিসাবে ভাগিনা শেখ মণিকে গড়ে তুলছেন। প্রতিটি ব্যাপারে তিনি ভাগিনার পরামর্শ নিতেন। দেশব্যাপী সংবাদপত্র নিধন অভিযানের মুখে যে কয়টি পত্রিকা টিকে থাকতে পেরেছে তার একটি হল শেখ মণির পত্রিকা।

কার্যতঃ মাস কয়েক আগেই অবশ্যম্ভাবী পতনের দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন দিয়ে শক্তিশালী করা হচ্ছে দেখে সেনাবাহিনী শংকিত হয়ে পড়ল। কয়েকটি রাজনৈতিক উপদলও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কেননা একদিকে তাদের অপসারিত করা হচ্ছে, কিন্তু অপরদিকে তাদের চেয়েও বেশী দুর্নীতিবাজদের অবাধ লুটতরাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। পদে পদে ভারতের উপর নির্ভরশীলতা বাড়বে দেখে সাধারণ মুসলমানরাও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে একটা পারিবারিক বাদশাহীর ভীত গড়ে তোলা হচ্ছে দেখে মন্ত্রিসভার সদস্যরাও আতংকিত হয়ে উঠেছিলেন।

—ফিনান্সিয়াল টাইমস, লণ্ডন, আগস্ট ১৬, ১৯৭৫

কিসে ভুল হল?

—এন্থনী মাসকারেনহস

১৯৭২ সালে নব-প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান বীরের সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তিনি তখন সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। গত সপ্তাহে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হয়েছেন। দু'টি ঘটনার মাঝখানের ক' বছরে তার সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের মোহ কেটে গেছে এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। কিসে ভুল হল?

মুজিবের ট্রাজেডি এই যে, চার বছরেরও কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর উচ্চতম মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গ-দুশমনে পর্যবসিত হলেন। তার বিপর্যয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ তিনটি উপকরণ মিশে আছে।

প্রথমতঃ সামরিক বাহিনীর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মুজিব সেনাবাহিনীকে অবিশ্বাস করতেন। সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ আন্দোলনে প্রশংসনীয় ভূমিকা

রয়েছে, এমন অনেক সামরিক অফিসারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার কোন সুযোগ তিনি ছাড়তেন না। স্পষ্টতঃই তাদের উপর তিনি গোয়েন্দাগিরি চালাতেন।

মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত উচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত, সুসজ্জিত ইউনিফরমধারী রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রেশস্ত্রে, বেতন-ভাতায়, ব্যয়-বরাদ্দে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হত। উভয়ের মধ্যে স্বার্থের অনেক সংঘাতেই মুজিব অন্ধভাবে রক্ষীবাহিনীকে সমর্থন করতেন।

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সেনাবাহিনী সম্পর্কে দীর্ঘদিনের সন্দেহ ও ভীতি থাকা সত্ত্বেও মুজিব গত বছর পাচার ও দুর্নীতি উচ্ছেদ অভিযানে সেনাবাহিনীকেই নিয়োগ করেছিলেন। তার এই রাজনৈতিক চাতুরী মারাত্মকভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

এতদিন সেনাবাহিনী সরকারের অবৈধ কার্যকলাপের কথা গল্প-গুজবে শুনেছে মাত্র। এবার তারা এর ব্যাপকতার মুখোমুখি দাঁড়াল। দুর্নীতি নির্মূল অভিযানে বাধা আসল রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। এতে তাদের অসন্তোষ আরও বেড়ে গেল এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের আক্রোশ নিবদ্ধ হল মুজিবের উপর।

সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুজিবের বিরোধের ফলে একটি ঘটনা ঘটে যাতে গত শুক্রবারের সামরিক অভ্যুত্থানের মুখপাত্র মেজর ডালিম জড়িত ছিলেন। এক বিয়ের অভ্যর্থনা মজলিশে "মুক্তিবাহিনী"র এই বীর যোদ্ধার পত্নীকে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের প্রধান ও মুজিবের বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্র গাজী গোলাম মোস্তফার ভাই অপমান করেন। মেজর ডালিম প্রতিবাদ করলে মোস্তফার ভাই একদল গুণ্ডা এনে সমবেত মেহমানদের সামনে ডালিম-দম্পতিকে বলপূর্বক উঠিয়ে মোস্তফার বাড়ীতে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে অবিলম্বে তিনটি লরী বোঝাই তরুণ সিপাহী মোস্তফার বাড়ীর উদ্দেশ্যে ধাওয়া করে। গোলমাল আশংকা করে মোস্তফা মেজর ডালিম ও তার পত্নীকে নিয়ে মুজিবের বাসভবনে উপস্থিত হন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দু'পক্ষ মুখোমুখি হলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ডালিম-দম্পতিকে মুক্তি দিলেও মুজিব তরুণ অফিসারদের "বিশৃংখলার" জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেন। এখানেই শেষ নয়। ক'মাস পর মুজিব নয় জন অফিসারকে বরখাস্ত করেন এবং প্রশংসনীয় সার্ভিস রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও মেজর ডালিমকে মাত্র ২৮ বছর বয়সে অবসর করিয়ে দেন। এই ভূতপূর্ব মেজরই গত শুক্রবার ভোরে মুজিবের 'স্বৈরতন্ত্রের' অবসানের খবর ঘোষণা করেন।

মুজিবের পতনের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৭২ সালের রচিত বাংলাদেশ শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেওয়া। ইসলামের মর্যাদার এই অবমাননা অনিশ্চয়তাসূচক প্রমাণিত হয়েছে।

'এক হাজার মসজিদের শহর' বলে ঢাকা বরাবরই গর্ব করেছে এবং বাঙালীরা ঐতিহ্যগতভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে বেশী ধর্মানুরাগী। অপর দিকে, বাঙালী মুসলমানরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিতভাবে সমর্থন করেছিল বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল।

এই পটভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তম অংশকে আহত করেছিল। তাই নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমেদ বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করে রাতারাতি জনসমর্থন লাভ করেছেন। গত শুক্রবার জুমা'র নামাজের জন্য কারফিউ উঠিয়ে দিয়ে মসজিদে এই জনসমর্থন অভিব্যক্ত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ মুজিব ক্রমেই জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আওয়ামী লীগের মোসাহেবরা তার চারদিকে এমন বেষ্টনী গড়ে তুলেছিল, যার ফলে জনসাধারণের সঙ্গে তার কোন সংযোগ ছিল না।

স্পষ্টতঃই এই বিচ্ছিন্নতা চরমে পৌঁছল যখন এ বছর তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র বিলোপ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল ও রাশিয়ার একদলীয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। মূলতঃ ব্যক্তিগত শাসন পাকাপোক্ত করার জন্যই তা' করা হয়েছিল। বাংলার মানুষ, যারা তিন পুরুষ ধরে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে, তারা এটা বরদাস্ত করতে পারেনি।

গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যই প্রাক্তন পূর্বপাকিস্তান ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও মুজিব তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সাধনে অবিচলিত ছিলেন।

পরিহাস এই যে, এর কোন প্রয়োজন ছিল না। পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায়ও মুজিবের কথায়ই বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে এবং তাঁর কথাই ছিল দেশের আইন। এ ক্ষমতা ও মর্যাদা বাংলার মানুষ জাতির জনককে সরল মনেই দান করেছিল। মুজিব যখন এ দান আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্তিগত করে নিতে চাইলেন তখনই তারা বিদ্রোহ করল। ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার উপর আঘাত আসল। আর কোন পথ ছিল না, মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখা ভয়ানক বিপজ্জনক হত।

—সানডে টাইমস, লণ্ডন, আগস্ট ১৭, ১৯৭৫

শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে

—অমিত রায়

বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান নিয়ন্তা হল শহরের বাসিন্দা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের সমর্থনই মুজিবকে নেতা বানিয়েছিল—ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কিন্তু শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে মুজিব তাদের সমর্থন হারিয়ে ফেলেন এবং সেদিন থেকেই নিজেকে অতীতের পাতায় তুলে দিয়েছিলেন।

চারদিকে চাটুকার পরিবেষ্টিত মুজিব সর্বব্যাপী গণ-অসন্তোষ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বরং উল্টা "আমার জনগণ আমাকে ভালবাসে, আমি তাদের ভালবাসি"—এ কথা আওড়িয়ে মিথ্যা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছিলেন। তার মেরুদণ্ডহীন সমর্থকরা তাকে বুঝিয়েছিল যে, অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দশা, শিল্প-কারখানার অব্যবস্থা, অপরিমেয় মজুতদারী ও চোরাকারবার এবং ক্রমাবনতিশীল আইন-শৃংখলাজনিত সমস্যাদি মুজিবী খ্যাতির মুখে কিছুই নয়।

সমস্যার মোকাবেলা না করে মুজিব গুণ্ডা-বদমাইশ নিয়ে ২৫ হাজার লোকের রক্ষীবাহিনী খাড়া করেছিলেন, যাতে সেনাবাহিনী তার বিদ্রোহ করার সাহস না পায়।

সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রথম অসন্তোষ দেখা দেয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসাররা পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে যখন দেখতে পেলেন যে, তাদের অধীনস্থ অফিসাররা কয়েক ধাপ ডিংগিয়ে কর্তা হয়ে বসে আছেন। গত বছর এই অসন্তোষ প্রায় প্রকাশ্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে পড়েছিল। সেনবাহিনীকে মজুতদার ও চোরাকারবারী খুঁজে বের করার কাজে নিয়োগ করা হল। কিন্তু তাদের অনুসন্ধানের ফলে যখন স্বয়ং মুজিবের ঘনিষ্ঠজনেরা জড়িত বলে প্রমাণিত হতে লাগল তখন তাড়াতাড়ি সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে পাঠিয়ে সব কিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হল।

মুজিবের এসব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন হলেন গাজী গোলাম মোস্তফা, যিনি "বাংলাদেশের বড় চোর" বলে কুখ্যাত। দুনিয়ার মানুষ দুঃস্থজনের জন্য রেডক্রসের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাহায্য-সামগ্রী পাঠিয়েছে,

আর বাংলাদেশ রেডক্রসের প্রধান হিসাবে গাজী গোলাম মোস্তফা এসব আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ বানিয়েছেন।

মোস্তফাকে রেশন-বণ্টন কমিটিরও প্রধান বানানো হয়েছিল। রেশন দোকানের মালিকরা তারই প্রত্যক্ষ মদদ নিয়ে রেশনের খাদ্য-সামগ্রী কালো-বাজারে বিক্রী করে দু'হাতে টাকা লুটেছে এবং এ কালো টাকার মোটা অংশ তারা নজরানা হিসাবে মোস্তফার পকেটে তুলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট কমিটির প্রধান এবং পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বোর্ডের সদস্য হিসাবেও তিনি খালি জমি ও বাড়ী বিলি-বন্দোবস্ত ও নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এসবের বিনিময়ে তিনি ঘুষ নিয়েছেন দু'হাতে। উপরন্তু ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের প্রধান হিসাবে ঢাকা মিউনিসিপালিটির উপরও তিনি কর্তৃত্ব খাটিয়েছেন। মুজিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন আইনের উর্ধ্বে।

ব্যাংক-এ ডাকাতি করে ডাকাতরা পালিয়ে যাচ্ছিল, পুলিশ গুলী ছুঁড়ল। দেখা গেল স্বয়ং মুজিবের বড় ছেলে কামাল আহতদের মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি সারাদেশে ১৫৩টি পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং শুধুমাত্র ৪টি পত্রিকা চালু রাখা হয়েছে। এ চারটি পত্রিকার একটি হল মুজিবের ভাগিনা শেখ ফজলুল হক মণির মালিকানাধীন 'বাংলাদেশ টাইমস'।

বিগত চার বছরে শেখ মুজিবের আপন ভাই শেখ আবু নাসের যতবার ঢাকা থেকে স্বীয় আদি ব্যবসা-কেন্দ্র খুলনায় গিয়েছেন তার বেশী বার লণ্ডনে এসেছেন। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সম্পাদক জিল্লুর রহমান লণ্ডনে বেড়াতে আসেন। ফেরার সময় তিনি ২০টি বড় বড় বাক্স বোঝাই করে সওদা নিয়ে গেছেন।

অপরদিকে, মুজিব তার সামান্যতম সমালোচনাকারীকে কোনরূপ বিচার-বিবেচনার তোয়াক্কা না করে নাস্তানাবুদ করেছেন। এমন কি এসব মৃদু সমালোচনাকারীদের অতীত অবদানটুকুও বিবেচনায় আনা হয়নি। ১৯৭১ সালে একটা গোটা ট্রেন বোঝাই করে টাকা-পয়সা নিয়ে তৎকালীন পাবনার ডিপুটি কমিশনার নূরুল কাদির খান কলিকাতায় চলে এসেছিলেন। এই টাকা তৎকালীন নির্বাসিত সরকারের অনেক কাজে এসেছিল। কিন্তু কূটনীতিবিদদের এক মজলিশে কথায় কথায় সামান্য বিরূপ মন্তব্য করায় তাকে পর্যটন করপোরেশনে অপসারিত করা হয়।

—সানডে' টেলিগ্রাফ, লণ্ডন, আগস্ট ১৭, ১৯৭৫

স্বৈরাচারী শাসনই দায়ী

—লুই সিমনস্

"বাংলার জলন্ত চুলায় হাত ঢোকাবার জন্য একদিন মিসেস গান্ধীকে অনুশোচনা করতে হবে"—গত বছর এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর এ ভবিষ্যদ্বাণী যে এভাবে ফলে যাবে তা হয়ত স্বয়ং ভুট্টোও কল্পনা করেননি।

হঠাৎ এই গতি পরিবর্তন শুধু মিসেস গান্ধীকে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নকেও বিচলিত করতে বাধ্য। এতদিন তারা চীনকে আগলে রাখার প্রয়াসে বাংলাদেশকে ব্যবহার করে এসেছিলেন।

যদিও এ অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ হিসেবে শেখ মুজিবের স্বৈরাচারী শাসন, তার অযোগ্যতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতার কথা তুলে ধরা হয়েছে, তবু প্রথম থেকেই দিল্লী-মস্কোর সাথে বেশী মাখামাখির জন্য জনগণ মুজিবকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল।

অতীতে যেমন দুঃখ-দুর্দশার জন্য বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানকে দায়ী করেছে, তেমনি বাংলাদেশ সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই অর্থনৈতিক শোষণ চালু করার জন্য ভারত সরকারও ব্যবসায়ী শ্রেণীকে অভিযুক্ত করছে। পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে উদ্ভূত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে ঘাত-প্রতিঘাতের জন্ম দিয়েছে, তারই ফল হচ্ছে শেখ মুজিবের পতন ও মৃত্যু।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংঘর্ষ মিসেস গান্ধীকে তার বিবাদমান প্রতিবেশীকে ঘায়েল করার এক মোক্ষম সুযোগ এনে দিয়েছিল। সরাসরি পাক ভারত যুদ্ধ লাগার আগে নয় মাস বাঙালী গেরিলারা সক্রীয় ছিল বটে, কিন্তু ভারতই তাদের অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়েছে। ভারত কর্তৃক সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান পাশ্চাত্য জগতে সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু বাঙালীদের স্বাধীনতা-স্পৃহা সহজেই সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেয়।

ইসলামাবাদ, পিকিং এবং ওয়াশিংটন তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের নতুন সরকারের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ট করার চেষ্টা করবে বলে মনে হয়; পাকিস্তান যে তার এককালীন পূর্বাঞ্চলের সাথে একটি কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী তার প্রমাণ এই যে, ইসলামাবাদ বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দান করেছে।

অবশ্য বাংলাদেশের স্বার্থের দিক থেকে ভুট্টোসরকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন অনেক বেশী লাভজনক হবে। স্বাধীন হবার ফলে বাংলাদেশ শুধু গুরুত্বপূর্ণ একটি আভ্যন্তরীণ বাজারই হারায়নি, রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনার উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা এবং প্রধান প্রধান আমদানী পণ্যের প্রধান উৎসও হাত ছাড়া করেছে।

—ওয়াশিংটন পোস্ট আগস্ট ১৮, ১৯৭৫

শেখের ট্র্যাজেডী

—হার্ভে স্টকউইন

বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায়ই যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবার্তা বাংলাদেশের উপর আসে, শেখ মুজিব ছিলেন তারই মানবীয় রূপ। রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁর দীপ্ত পদচারণার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও আবেগের উচ্ছ্বাসে সবকিছু তলিয়ে গেল। আজ মুজিব মঞ্চ থেকে চিরকালের মত সরে গেছেন, কিন্তু দেশকে রেখে গেছেন রিক্ত, নিঃসহায় করে। তাঁর আমলে কি ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার চূড়ান্ত হিসাব কেবল এখনি শুরু হতে পারে।

মূলতঃ শেখ ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি ঘটনাবলীর পশ্চাতে এগিয়ে গেছেন। বিক্ষোভকারীর সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। বিক্ষোভকারীর ভূমিকা থেকে নিজেকে কখনো তিনি বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি এবং পরিণতিতে বিক্ষোভকারীর মৃত্যুকেই তিনি বরণ করে নিয়েছেন।

শেখের মধ্যে তাঁর গুরু সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক সূক্ষ্মতা বা চাতুর্য ছিল না। ১৯৪৬ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীরূপে সোহরাওয়ার্দী পৃথক বাঙালী জাতীয় রাষ্ট্রের কথা তুলেছিলেন। ২৪ বছর পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেই বাংলাদেশের সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু সারা জীবন নেতিবাচক রাজনীতি করার ফলে নতুন জাতিকে বাস্তব কিছু দেবার সামর্থ্য তার হ'ল না। এই রায় কর্কশ শোনাবে। হয়ত আংশিকভাবে এই কঠোর মন্তব্যের উদ্ভব হয় ১৯৫৭ সালে যখন এক কাঁদানে গ্যাসসিক্ত পরিবেশে মুজিবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তিনি তখন পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রিসভার সদস্য (আমার যদি ঠিক স্মরণ থাকে, তিনি তখন বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী ছিলেন)। আওয়ামী লীগের মোকাবেলা করার জন্য তখন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করা হচ্ছিল। সিন্ধু প্রদেশ থেকে আসলেন জি. এম. সৈয়দ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আসলেন খান আবদুল গফফার খান। ন্যাপের অপর একজন প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা ভাসানী। ভাসানীকে শেখ মুজিব বরাবরই প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখেছেন। কেননা ভাসানীই ছিলেন তার একমাত্র সমতুল্য গণবক্তা।

সকলেরই জানা ছিল যে, ঢাকার ন্যাপের এই উদ্বোধনী সভা পণ্ড করতে শেখ মুজিব মনস্থ করেছেন। এবং ঠিকই, যেই মাত্র ন্যাপের উৎসাহী সমর্থকরা পল্টন ময়দানে জমায়েত হতে লাগল, অমনি শেখের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা গোলযোগ সৃষ্টি করতে শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করে সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করতে লাগল।

পাকিস্তানী সাংবাদিকদের কাছ থেকে সম্যক অবহিত হয়ে অল্পকাল পরে অনুষ্ঠিত এক প্রেস কনফারেন্স-এ আমি শেখকে প্রশ্ন করলাম, গত রাতে ঢাকার প্রধান সিনেমা হলের পিছনে তিনি গুণ্ডাদের ঠিক কি বলেছিলেন? তিনবার প্রশ্ন করার পরও শেখ আমার প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করলেন এই বলে যে, তিনি আমার ইংরেজী বুঝতে পারেননি। এই ঘটনা ও অন্যান্য ঘটনা থেকেও শেখের বিকৃত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও একনায়কসুলভ মনোভাব কিছুসংখ্যক চিন্তাশীল বাঙালীর কাছে বরাবরই পরিষ্কার ছিল। তবে বিগত কয়েক মাসেই তা' অধিক সংখ্যক লোকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘকাল ঘটনাপ্রবাহ শেখের অনুকূলে ধাবিত হয়ে উপরোক্ত উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বাঙালীদের হতাশার মধ্যে আইয়ুব আমলের শেষের দিকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রবণতা বেড়ে গেল। ইসলামাবাদও শেখকে বাঙালীদের অধিকারের প্রধান প্রবক্তা হিসাবে প্রতিভাত হবার উত্তম সুযোগ করে দিল। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের সাইক্লোনজনিত বিপর্যয়ের পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি নির্লজ্জ অবহেলা তার একটি উদাহরণ।

বিপর্যয়ের ভয়াবহতার মধ্যে মাওলানা ভাসানী প্রথম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা বলেন। শেখ মুজিবও পিছিয়ে পড়ার লোক নন। মাওলানা ভাসানীর বিবৃতির পরদিনই তিনি সাইক্লোনকে ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল সাফল্যের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করলেন। তারপর থেকে সবাই দেখতে পেল যে, পাকিস্তানের ভাঙ্গন

অবশ্যম্ভাবী। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা অবশ্য এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভের জন্য সূক্ষ্ম পদক্ষেপ নিতে শেখ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য সম্ভাবনাও তেমন ছিল না। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, জুলফিকার আলী ভুট্টো সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের সন্দেহ ছিল, যেমন ছিল শেখ সম্পর্কে কিছুসংখ্যক বাঙালীর।

ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। শেখ মুজিব তা' ব্যহত করতে পারতেন। যাঁরা তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক সফর করার উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁদের কথা না শুনে তিনি ভুট্টোর হাতেই ধরা দিলেন। বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের ধারণা এবং আত্মবিশ্বাস—কোনটাই শেখের ছিল না। প্রচলিত মতের বিরোধী হলেও শেখকে যাঁরা জানতেন তাঁদের কেউ কেউ জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি বিশ্বাস করতেন না যে, পাকিস্তানের ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী ছিল। দেশের ভাঙ্গনকে ঠেকাবার কোন পদক্ষেপ নিতে তিনি যেমন ব্যর্থ হয়েছেন, তেমনি ব্যর্থ হয়েছেন এমন কোন সদিচ্ছা দেখাতে যা' পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ২৫শে মার্চের আকস্মিক অভিযান নিবৃত্ত করতে পারত। এরপর যে ট্রাজেডী শুরু হ'ল তার জন্য পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও ভুট্টো নিঃসন্দেহে দায়ী। তাহলেও বলতে হবে যে, শেখের বাগ্মিতার ফলেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও রক্তপাত শুরু হয় এবং তাতেই পশ্চিম পাকিস্তানের একান্ত অনুগতরা নৃশংস অভিযান আরম্ভ করার অজুহাত পায়।

১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ শেখকে জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতার শীর্ষে পেঁাছে দিল। কিন্তু যে আশা-আকাঙক্ষা তিনি উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তা' কার্যতঃ পূরণ করার তার সামর্থ্য ছিল না। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন, তারপর প্রধানমন্ত্রী এ বছরের জানুয়ারী মাসে আবার প্রেসিডেন্ট হলেন। শেখ ক্ষমতা ও খেতাব নিয়ে খেলা করেছেন, বাংলাদেশের আর্থিক বিপর্যয়ের মোকাবেলা করার জন্য আদৌ কিছু করেননি। বাহ্যতঃ সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার কর্তৃত্ব ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছিল।

চাকা সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রাস্ফীতিমুক্ত সেই দিন-গুলোর জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পেল। জনৈক বাঙালী বুদ্ধিজীবী তিক্ততার সাথে বললেন: "১৯৭২ সালে শেখকে কেন ভুট্টো ছেড়ে দিয়েছিল, জানেন? ভুট্টো সুচতুর। তিনি জানতেন যে মৃত মুজিবকে নিয়ে বাংলাদেশ অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যা হোক মুজিবের স্মৃতি হয়ত বাংলাদেশকে একটা কিছু দিতে পারত।"

শেখ কেন কিছুই করতে পারলেন না, তার কয়েকটি কারণ রয়েছে: প্রথমতঃ, ক্ষমতা সম্পর্কে তার অত্যধিক নিজস্ব মতবাদ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর মধ্যে একটা গভীর হীনমন্যতার ভাব (ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স) ছিল, যা আংশিকভাবে তার শিক্ষার অভাববোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তৃতীয়তঃ, শেখ কখনই বাংলাদেশের সুশিক্ষিত তর্কপ্রিয় বুদ্ধিজীবীদের কিংবা বিজ্ঞ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে স্বচ্ছন্দবোধ করতেন না। এর ফলে শেখ ও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা ব্যবধান বিদ্যমান ছিল। কোন পক্ষই তা দূর করার চেষ্টা করেননি। বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজন ছিল শেখের, যেহেতু তার বিপুল জনসমর্থন। আর শেখেরও প্রয়োজন ছিল বুদ্ধিজীবীদের, কেননা একটা দেশের সমূহ সমস্যাবলী মোকাবেলা করার সাধ্য তার ছিল না।

গত জানুয়ারী মাসে একচ্ছত্র ক্ষমতা দখল করে, বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণ করে, তিনি তাদেরকে আরো দূরে ঠেলে দিলেন। পরবর্তী ঘটনাবলী—বরং বলা চলে ঘটনাবলীর অভাব—আরো স্পষ্ট করে তুলল, মুজিব কতখানি জনসংযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা আত্মম্ভরিতায় রূপ নিল, বাংলাদেশের অপ্রতুল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপায়ে পরিণত হ'ল না। বিপুল সময় ব্যয় করে PRESSকে পঙ্গু করা হল। শেখের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বলতে গিয়ে যাঁরা ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্তও শেখের মিত্র ছিলেন, মে অথবা জুন মাস নাগাদ তাঁরা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়লেন। শেখের একটানা চাটুকারিতা নিত্যদিনের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল। ক্রমবর্ধমান পুষ্টিহীনতা ওমুদ্রাস্ফীতির ব্যাপারে চাটুকারিতার কিছুই ছিল—না। অনেকেই একমত যে, শেখের যা করণীয় ছিল তা' এই যে: সামান্যতম সাফল্যের মাধ্যমে আরও একটু আশা জাগিয়ে তোলা। কিন্তু তিনি যে উপায় বেছে নিলেন, তা' তাঁর ব্যর্থতাকেই সুনিশ্চিত করে দিল। এরপর যা অবশিষ্ট র'ল সেটা হ'ল তার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি। কিছুসংখ্যক লোককে এই ভাবমূর্তি টেনে নিয়ে গেল বিপর্যয়ের মুখে। জনসাধারণের মধ্যে তার অনুগামী অনেক। এরা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, মুজিবের সম্মোহনী শক্তি এমন

একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, যা বহুবিধ জটিল সমস্যার মধ্যে কোন প্রকারে শূন্যতা পূরণ করতে পারত। তার নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যই সে শূন্যতা আরো বেড়ে গেল।

—ফার ইস্টার্ণ ইকনোমিক রিভিয়্যু, হংকং, আগস্ট ২৯, ১৯৭৫

শেখ মুজিবের উত্থান পতন

—এনায়েতুল্লা খান

শেখ মুজিবের অকাল পতন আমাকে অবাক করেছে একথা বললে অত্যুক্তি হবে। ঘটনার আকস্মিকতায় হয়তো বা আপাত বিস্ময়ে চমকিত হয়েছি। বৈরিতা সত্ত্বেও বেদনার অঙ্কুশে বিদ্ধ হয়েছি, দূরদূর ভবিষ্যত চিন্তায় অকারণে উদ্বেলিত হয়েছি। কিন্তু এ সবই নিছক রাজনৈতিক ভাবনা, মধ্যবিত্ত মানসের স্বভাবগত প্রক্রিয়া। এই মুহূর্তের বিমূঢ়তা পর-ক্ষণে স্বস্তির আশ্বাসে উচচকিত হয়েছে, কালান্তরের ঘণ্টাধ্বনি শৃঙ্খলিত চেতনাকে উজ্জীবিত করেছে। কথাগুলো অপ্রিয়—প্রকারান্তরে নিষ্ঠুর কিন্তু নিদরুণ সত্যও বটে। যেমন সত্য নিয়তির অমোঘ বিধান কিংবা ইতি-হাসের নির্মম বিচার। এ দু'এর তফাৎ মৌল। প্রথমটি সংস্কার, দ্বিতীয়টি বিজ্ঞান। কেউ বলে ভবিতব্য, কেউ বলে ডায়ালেকটিক্স। কিন্তু উভয়েরই পরিণাম অবশ্যম্ভাবিতায়। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তাঁর অধিষ্ঠান এবং পরিশেষে 'স্বর্গ হতে বিদায়'-এই অবশ্যম্ভাবিতারই বিয়োগান্ত আলেখ্য। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একদিকে নাটকীয়তায় চমকপ্রদ, অন্যদিকে দ্বৈধতায় খণ্ডিত। তাঁর ক্ষমতারোহণের অভিযাত্রা বিগত এক দশকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল। অগণিত আত্মদান এবং একঝুড়ি রূপকথা মিলিয়ে তৈরী হয়েছিল তাঁর স্বর্গের সিঁড়ি। ব্যক্তিত্বের অপরিমিত শৌর্য ও অনুকূল ইতিহাসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর রাজ-কাহিনী। তিনি ছিলেন রূপকের রাজা। সত্যিকারের মুকুটের ভার তাই তিনি বইতে পারেননি। উপরন্তু সেভাবে ন্যুব্জ হয়েছেন। 'রক্ত করবীর' আত্ম-বিমোহিত রাজার মত দুঃশাসনের অচলায়তন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যাঁরা প্রাণ দিল, ষড়যন্ত্রের রাজনীতিকে পদাঘাত করে নির্দ্বিধায় অস্ত্র তুলে নিল, যারা দেশপ্রেমের সুমহান অঙ্গীকারে রক্ত দিয়ে মাতৃভূমির ঋণ শোধ করলো তাদেরই রক্ত-মাংস হাড়ের বিনিময়ে তিনি গড়তে

চেয়েছিলেন এক অলৌকিক ক্ষমতার দেউল। সেখানে দেবতা একক, কিন্তু পূজারী নেই। মানুষকে বাদ দিয়ে শুরু হলো বিগ্রহের রাজনীতি পুতুলের খেলা। পরদেশী পটুয়ার হাতে সৃষ্টি হলো পুতুলের রাজা—শেখ মুজিবুর রহমান। আমার এ কথা নিষ্করুণ জানি, কিন্তু ইতিহাস আরো বেশী নির্মম। এবং তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১৫ই আগস্ট। হঠাৎ ত্রিম ত্রিম শব্দে বিদীর্ণ হলো নিস্তব্ধ প্রভাত। এক ঝাঁক আগ্নেয় শীসের লক্ষ কোটি মানুষের নির্বীর্য রোষের আকস্মিক বিস্ফোরণের মত নিপাত করল পুতুলের রাজত্ব। এই পুতুল নাচের ইতিকথা রাজনীতি বা ইতিহাস বিযুক্ত নয়, এর সংগে জড়িয়ে আছে গোত্রীয় ক্ষমতার অভিলাষ এবং সাম্রাজ্যবাদী, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনার ইতিবৃত্ত। সে এক বিচিত্র কাহিনী। সাড়ে সাত কোটি মানুষ যখন একাত্তরে চরম-তম জাতিগত নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তখনও পর্দার আড়ালে চলছিল আপোষের জুয়াখেলা। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ও একাত্তরের গণপ্রতিরোধকে নিবৃত্ত করবার জন্য শুরু হয়েছিল প্রতিক্রিয়া-শীল ষড়যন্ত্র ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। কিন্তু ইতিহাস তো স্থাবর নয় যে জাতকের ইচ্ছের উপর তার গতিধারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই জাতীয় মুক্তির বিভ্রম সৃষ্টির হীন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্ফূর্ত হয়েছিল গণবিদ্রোহ। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ সেই সর্বব্যাপী গণবিদ্রোহকে বিধ্বংস করবার রক্তক্ষয়ী প্রচেষ্টা মাত্র। সেই আত্মদান বাংলার মানুষের—ব্যক্তির নয়। দলমত নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর দেশপ্রেমিকদের গোষ্ঠীর নয়। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী ক্ষমতার রাজনীতির যুপকাষ্ঠে লক্ষ আবাল-বৃদ্ধ বনিতাকে বলি দিয়েছে, পলাতক রাজনীতির প্রচ্ছায়ায় গণবিপ্লব ও প্রতিরোধক ঠেকাতে চেয়েছে। সেবারও চট্টগ্রামের অবরোধ, জয়দেবপুরের সেনা বিদ্রোহ, পাবনার বৈপ্লবিক সমাবেশ, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ঐতিহাসিক প্রতিরোধ, তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ভবনের গোপন আলাপনীকে নস্যাৎ করে গণবিদ্রোহের প্রেক্ষিতে সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আপোষকামী নেতৃত্ব জনগণের বীরোচিত রক্তদানকে অস্বীকার করে গোল টেবিলে দেশবিভাজনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যায়ও তাই মনস্থির করতে পারেননি। তাঁর শেষ আহ্বান ছিল সাতাশে মার্চের হরতাল, স্বাধীনতা যুদ্ধের নয়। সেই সঙ্কটকালেও এগিয়ে এসেছিল সামরিক বাহিনী এবং বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণ ও যুবাদের

দল। তবুও সেই যুদ্ধ গণযুদ্ধে রূপায়িত হতে পারেনি। কেননা বৈদেশিক চক্র এই সংগ্রামকে নিজ খাতে প্রবাহিত করবার জন্য বদ্ধ-পরিকর ছিল। মুক্তিবাহিনীর প্রতি চরম অবিশ্বাস হেতু সৃষ্টি হলো তথাকথিত মুজিববাহিনী। জন-যুদ্ধের অভিযাত্রাকে রুখবার জন্য করা হলো সামরিক হস্তক্ষেপ। এই চক্রান্তের ইতিহাস সুদীর্ঘ। যখন মুক্তি বাহিনীর বীর সেনানীরা গেরিলা বাহিনীর তরুণেরা এবং দেশের অভ্যন্তরের বিপ্লবী যোদ্ধারা জন-যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে জাতীয় মুক্তির অভিষ্ট লক্ষ্যে পেঁছিবার জন্যে যুদ্ধ করছিল, তখনই মুজিবনগরের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এই চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠে। এই চক্রান্ত মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ন্ত্রিত করবার চক্রান্ত, পরভৃত নেতৃত্বকে ক্ষমতায় অভিষিক্ত করবার চক্রান্ত। যাঁরাই তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তাঁদেরই কপালে জুটেছে অপপ্রচারণা ও রাজনৈতিক নিগ্রহ। পরলোকগত দুর্গাপ্রসাদ ধরের (ডি. পি. ধর) অঙ্গলি হেলনে পরিচালিত মুজিবনগর সরকারের বংশবদ নেতৃত্ব ও প্রশাসন এবং সম্প্রসারণবাদের সৃষ্ট মুজিব বাহিনীর প্রতিবিপ্লবী কার্যক্রম একাত্তরের সংগ্রামের সব চাইতে মসীলিপ্ত অধ্যায়। ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেবে, সাক্ষ্য দেবে জাতীয় মুক্তির প্রত্যাশী এবং সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ বিরোধী লক্ষ কোটি দেশপ্রেমিক জনগণ। এরই ফলশ্রুতি ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। ত্রিশ লক্ষ প্রাণ ও আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় মুক্তির পরিবর্তে দেশবাসী পেল এক পুতুল সরকার। এবং সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে পুতুল নাচের ইতিকথা। শেখ মুজিবুর রহমান এই ইতিকথার নেপথ্য নায়ক। আগরতলার কুখ্যাত ষড়যন্ত্রের মামলা এবং একাত্তর সালে মুজিববাহিনীর অভ্যুদয় কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরঞ্চ বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক ঘটনাপঞ্জী। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং সম্প্রসারণবাদ বিরোধী সংগ্রামের সংগে এর মৌলিক তফাৎ রয়েছে। প্রথমটি বাঙালী বুর্জোয়ার সবচাইতে ঘৃণ্য ও মেরুদণ্ডবিহীন অংশের ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত এবং দ্বিতীয়টি বাঙালী জাতীয় বুর্জোয়ার অংশসহ সকল শ্রেণীর মানুষের জাতীয় ও অর্থনৈতিক মুক্তির চূড়ান্ত সংগ্রাম। আমার বেদনাবোধ হয় এই জন্যে যে, শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন সত্ত্বেও তার সংকীর্ণ শ্রেণীচেতনা

বিদেশী প্রভুর দায়বদ্ধ রাজনীতির শৃঙ্খল মোচন করতে পারেননি। বরঞ্চ পুতুলের মত—হয়তবা অনিচ্ছুক পুতুলের মত—প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাঁর দ্বৈত ভূমিকা পালন করে গেছেন।

তিনি ছিলেন দক্ষ নট। অভিনয়ের চাতুর্যে প্রতিটি নাটকীয় মুহূর্তে দর্শকবৃন্দের তুমুল করতালি কুড়িয়েছেন, বাগ্মিতার সম্মোহন বিভ্রমের মায়াজাল রচনা করেছেন। জাতীয় স্বাধীনতার মহানায়কের শিরোপ্যা পরিধান করেছেন। কিন্তু বারবার ষড়যন্ত্রের ঋণ শুধতে গিয়ে বাংলার মুক্তিকামী মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সেখানেই তার ট্রাজেডী।

শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতেও এ কাহিনীতে ছেদ পড়েনি। সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট প্রতিবিপ্লবী মুজিব বাহিনী একাত্তর সালে তার পক্ষ হয়ে প্রতিনায়কের ভূমিকা পালন করেছে, এই বিকল্প বাহিনী সেই ষড়যন্ত্রী রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার মুজিববাদের তথা-কথিত ভাবদর্শন, তত্ত্ব, ভাষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসের নির্লজ্জ বিকৃতি এই একই পরিকল্পনার অংশবিশেষ।

মুজিববাদ ও মুজিববাহিনীর কাহিনী আজো ইতিহাসে অনুল্লিখিত। এই প্রতিবিপ্লবী তত্ত্ব ও সংগঠন শুধুমাত্র ব্যক্তি শাসন কায়েম করবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়নি, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট সম্প্রসারণবাদী আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ করবার জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের রক্ষীবাহিনী মুজিববাদ ও মুজিববাহিনীরই সাংগঠনিক রূপ।

মুজিববাদ ও মুজিববাহিনী সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ছিল ত্রিবিধ:

(ক) মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তি ও আধিপত্যকে খর্ব করা, (খ) গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট দেশপ্রেমিক বিপ্লবী সামাজিক শক্তির মোকাবেলা করা এবং (গ) প্রয়োজনবোধে শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। প্রথম দু'টো কারণের জন্য মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মুজিববাহিনীর তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল এবং তৃতীয় কারণের জন্যে সম্প্রসারণবাদের বংশবদ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে ও প্রশাসনের সঙ্গেও সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল।

একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই 'এলিট ফোর্স' সৃষ্টির ইতিহাস আরও বিচিত্র। মুজিববাহিনীর নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা

অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানের স্বহস্তে লিখিত পত্রের উপর ভিত্তি করে এবং তাঁরই নির্বাচিত উত্তরাধিকারীদের (?) নেতৃত্বে এই রাজনৈতিক বাহিনী গঠন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দেরাদুনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই বিশেষ প্রতিবিপ্লবী সংগঠন জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিবাহিনী, এমনকি তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত মুজিবনগর সরকারেরও নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল না। জনৈক ভারতীয় সেনাপতির প্রত্যক্ষ পরিচালনায় সংগঠিত তথাকথিত মুজিববাহিনী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক কাঠামো এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এ কথাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে এই বাহিনীর মৌলিক বিরোধ ছিল। বিরোধের সম্ভাব্য কারণ আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

যদি শেখ মুজিবুর রহমানের পত্রের কথা সত্যি হয়ে থাকে তবে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যের সঙ্গে মুজিববাহিনীর গভীর যোগসূত্র রয়েছে। দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, শেখ মুজিবুর রহমানের পর্দান্তরালের ভূমিকা পূর্ব নির্ধারিত ছিল। মঞ্চসফল নায়কের মত তিনি নেপথ্যের কুশলী পরিচালকের ইঙ্গিত প্রতি পদে পালন করে গেছেন। তিনি ছিলেন ভাগ্যের বরপুত্র। কিন্তু এচিলিসের গোড়ালীর মত তাঁর অজেয় ভাগ্য ১৫ই আগস্ট মুহূর্তের যন্ত্রণায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, মুজিবনগর সরকার ও প্রশাসন, মুজিববাহিনী এবং তথাকথিত কাদেরীয়া বাহিনীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সঙ্গে বাঙালীর জাতীয় দ্বন্দ্বের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই দ্বন্দ্বে আন্তঃস্বার্থের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বীর ক্ষমতার প্রসাদপ্রাপ্তির লড়াই। একাত্তরের যুদ্ধের অনিশ্চয়তা দীর্ঘসূত্রিতার আশঙ্কা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের অনিশ্চিত ভবিষ্যত উপরোক্ত দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তোলে। কিন্তু তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। কেননা সব পুতুলের মাঝে তিনি পুতুলের রাজা। রূপকের মাধ্যমে সৃষ্ট তাঁর ভাবমূর্তি, দূচারণার স্পর্শমণিতে উদ্দীপ্ত। তাঁর আত্মদানের রূপকাহিনী এবং সর্বোপরি তার ব্যক্তিত্বের অপরিমিত শৌর্য ও ঐতিহাসিক নির্বন্ধ জাতীয় স্বাধীনতার বিভ্রম সৃষ্টিতে অনেক বেশী কার্যকর। জনগণের বিমূর্ত ভালবাসার বর্ণচ্ছটায় আলোকিত ভাবমূর্তি—তার শ্রেণীচরিত্রের

রঙ্গীন প্রচ্ছদ মাত্র। বাঙালী বুর্জোয়ার নিকৃষ্টতম ও মেরুদণ্ডবিহীন মুৎসুদ্দী শ্রেণীর তিনি ছিলেন যোগ্যতম, শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি।

পুতুলনাচের ইতিকথার পরের কথা তাই বিচিত্রতর। এই উৎপাদনবিমুখ, লুণ্ঠনপ্রিয়, পরভৃত শ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের ওপর নির্ভরশীল হবে। ঐতিহাসিক কারণে এবং উপমহাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে উপরোক্ত তিন শক্তিত্রয়ের সমন্বয় ও দ্বন্দ্ব পৌনঃপুনিকভাবে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ার আন্তর্জাতিক নির্ভরতার নিক্তিকে প্রভাবিত করেছে। বিগত সাড়ে তিন বছর এই পরান্মুখতার মূল স্তম্ভ ছিল সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট তাদেরই নির্দেশে নির্ণিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক গণচেতনাকে পায়ে মাড়িয়ে সার্বভৌমত্বের জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে, জাতীয় অর্থনীতি উন্নয়নের স্বার্থকে ধ্বংস করে এবং সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে এই শক্তিজোটের স্বার্থে অবনমিত করে শুরু হয়েছিল পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায়। এরই ফলশ্রুতি একদল, একনেতা, একদেশ। এরই পরিণাম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য, এরই অবশেষ লুণ্ঠিত, লাঞ্ছিত, মৃত্যুকীর্ণ বাংলাদেশ।

শেখ মুজিবুর রহমান এই নাটকের নিরূপায় ক্রীড়নক। তাঁর অসহায়তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি, দেখেছি দায়বদ্ধ মানুষের নিষ্ফল ইচ্ছের বিলাপ। এখানেই ছিল তাঁর দ্বৈততা, তিনি ছিলেন কিংবদন্তীর নায়ক। তার রাজনীতির প্রক্রিয়া দ্বিচারণে অতুল্য। কিন্তু ঋণগ্রস্ততার দায় পরিশোধ করতে গিয়ে বার বার চক্রবৃদ্ধি হারে তিনি মূল্যের কড়ি গুণছিলেন। তার প্রাপ্য ছিল শুধুমাত্র ক্ষমতার ময়ূরসিংহাসন।

আমি এ প্রসঙ্গের দীর্ঘ অবতারণা করেছি শুধুমাত্র একথা বলবার জন্যে যে বাংলাদেশের সমাজবিন্যাস, সামাজিক স্তর এবং ঐতিহাসিক পটভূমির প্রেক্ষিতে ব্যক্তিদৌর্বল্য কিংবা ব্যক্তি দুঃশাসন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক স্থবিরতা শেখ মুজিবুর রহমানের অকাল পতনের প্রধান কারণ হতে পারে না। কেননা রাজনীতি ও ইতিহাস নিজস্ব গতিবেগে এগিয়ে চলে। সেখানে ব্যক্তি গৌন, মুখ্য শুধু ঘটনাপ্রবাহের ডায়নামিক্স। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক উত্থান এবং

পতন এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নিহিত ছিল। তার সম্রাটের স্বপ্ন উপজাতীয় গোষ্ঠী-প্রিয়তা, আকাশচুম্বী, অহম এবং আত্মবিমোহন তারই দায়বদ্ধ আত্মা ও শ্রেণীসঞ্জাত অপূর্তির আগ্রাসী অভিব্যক্তি। যতই তিনি হাজারো সুতার বাঁধনে জড়িয়ে গেছেন ততই বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁর বিভ্রম। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় পারা নাইয়া।

আমার কারামুক্তির পর ২৯শে জুলাই তার সাথে দেখা হয়েছিল। বিক্ষিপ্ত পদচারণায় অস্থির শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন : "Perhaps the whole thing was a sabotage. I am sorry for what happened to you. But my hands were tied." তার রাজনীতির দ্বিচারণ সত্ত্বেও আমি তাঁর অসহায়তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম। কেননা, আমি জানি পুতুলের রাজনীতি কতো নিষ্করুণ যে সেখানে রাজা সাজা যায় কিন্তু ইচ্ছামত রাজ্য শাসন করা যায় না। নিপুণ ক্রীড়া তাকে গরিমা দিয়েছিল কিন্তু প্রাণ দেয়নি, পোশাকী বৈভবে বিভূষিত করেছিল কিন্তু স্বাধীনতা দেয়নি। একনেতা একদল : এই প্যান্টোমাইম প্রদর্শনীর সর্বশেষ পর্ব।

বিগত সাড়ে তিন বছর বাংলাদেশের দুঃখী জনগণ এই অবাক প্রদর্শনীর মৌন দর্শক ছিলেন। তাদের নিঃশব্দ আর্তিতে ধ্বনিত হচ্ছিল কতিপয় লুটেরার অট্টরোল। আর তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারী চক্র—যারা সমাজতন্ত্রের ছলে, মৈত্রীর ছদ্মবেশে এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের আবডালে বাংলাদেশকে বৈদেশিক স্বার্থের অবারিত লীলাক্ষেত্রে পরিণত করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। অন্যদিকে বাঙালী বুর্জোয়ার নিকৃষ্টতম মেরুদণ্ডবিহীন মুৎসুদ্দীকুল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিতে ধ্বংসকল্পে পরদেশী বাণিজ্যিক পুঁজির সেবা-দাসের ভূমিকায় নিয়োজিত ছিল। এরই সাংগঠনিক রূপ ছিল "দেশপ্রেমিক" (?)—দের ত্রিদলীয় ঐক্যজোট। এই ঐক্যজোটের নীল নকশা পরিশেষে একদলীয় শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে রূপায়িত হয়।

ফলতঃ একদিকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভাববলয়ে আপতিত হয় এবং অন্যদিকে পূর্ব ভারতের ধ্বংসন্মুখ শিল্পকেন্দ্রের প্রায় ঔপনিবেশিক পশ্চাদভূমিতে পরিণত হয়। দেশের উৎপাদিকা শক্তিকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করবার ইতিহাস বিংশশতাব্দীতে বিরল। অষ্টাদশ শতকের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের লুটেরা বাণিজ্যিক পুঁজির অবাধ লুণ্ঠনের সঙ্গে এই প্রক্রিয়া সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

এই দ্বৈতচক্র কখনো এককভাবে, কখনো যুগমভাবে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কায়েম করবার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও অর্থনীতির গতিধারা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় স্বাধীনতাকে বৈদেশিক প্রভুদের স্বার্থে নস্যাৎ করবার জন্য এই চক্রজোট পৌত্তলিকতার রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছে, মুজিববাদের ফ্যাসিবাদী দর্শনকে নিপীড়নমূলক পৌত্তলিক রাজনীতির তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। আর তার যোগান দিয়েছে দেশ প্রেমিকদের ঐক্যজোটের অপর দু'টো রাজনীতি ও বৈদেশিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দল।

একনেতা, একদল শেখ মুজিবুর রহমানের একক আত্মচিন্তা নয়। বিগত সাড়ে তিন বছরের দেশপ্রেম বিরহিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। আর সে জন্যেই তার পতন শুধুমাত্র অবাধ দুর্নীতি, লুণ্ঠন, দুঃশাসন, গোষ্ঠীপ্রিয়তা ও পারিবারিক শাসন প্রতিষ্ঠার কারণজনিত নয়। এক মৌল কারণ পূর্বে উল্লিখিত রাজনীতি ও ইতিহাসের মধ্যে নিহিত।

আমি বারবার একই কথায় ফিরে আসছি। কারণ আমার দৃষ্টিতে রাজনীতিই মুখ্য, ব্যক্তি নয়— ইতিহাস প্রধান, ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। শেখ মুজিবুর রহমান জুডাসের সিংহ নন অথবা দেববংশোদ্ভব কুলনায়ক নন। তিনি বাংলাদেশের সমাজ বিন্যাস ও পরিমণ্ডলে লালিত একজন নশ্বর মানুষ।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশ্লেষণই অরাজনৈতিক এবং ভ্রমাত্মক বলে আমি মনে করি। তিনি ছিলেন মাধ্যম এবং তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল আমল-মুৎসুদ্দী শ্রেণীর অসার রাজত্ব। সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তি সর্বদাই এই ধরনের মেরুদণ্ডহীন শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করে। আর সে জন্যই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অভিষিক্ত হয়েছিল। বাঙালী বুর্জোয়াদের হীনতম অংশ প্রশাসন যন্ত্রে প্রধান ছিল বাঙালী ব্যুরোক্রেসির সবচাইতে দুর্নীতিপরায়ণ ও তাবেদার অংশ এবং অর্থনীতির ক্ষমতাবান ছিল পরদেশী লুটেরা পুঁজির দেশীয় সেবাদাস। একদলীয় শাসন সেই ঘৃণ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জোটকে কায়েম করবার জন্যে প্রবর্তন করা হয়েছিল।

এই চক্রজোটের একবছর প্রতিভু হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান তার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের ঋণ শোধ করছিলেন। গণতন্ত্র হরণ, নির্মম নিপীড়ন, কণ্ঠরোধ এবং হত্যা এই প্রক্রিয়ারই অন্যতম পর্যায়। আজও ৬২ হাজার রাজনৈতিক কর্মী বিপ্লবী ও মুক্তিযোদ্ধা শেখ মুজিব কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত

হয়ে মুক্তির আকাঙক্ষায় দিন গুণছেন। আর সেই প্রক্রিয়াকে পরমোল্লাসে উস্কানি দিয়েছে কম্যুনিস্ট নামধেয় একদল স্খলিত পরজীবী। কেননা দেশ-প্রেমে উজ্জীবিত গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তিকে নির্মূল না করা পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারত না।

শেখ মুজিবুর রহমানের তিন বছরের দুঃসাহস সহস্র জননীর বুক ভেঙ্গে দিয়েছে, শত শত বীর দেশপ্রেমিকের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, দেশীয় সম্পদ পাচারের নয়া ইতিহাস রচনা করেছে, মনন ও সংস্কৃতিকে হত্যা করেছে এবং সর্বোপরি সার্বভৌমিত্বকে বিকিয়ে দিয়েছে। অর্থনীতির আর কানাকড়িও অবশিষ্ট নেই। অতএব কালান্তরের এই সন্ধিক্ষণে যদি আমরা সেই রাজ-নীতিকে পরাস্ত না করতে পারি, শেকল ভাঙ্গার সংগ্রামে অবতীর্ণ না হতে পারি— এবং দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও কৃষক শ্রমিকের ঐক্যজোট না গড়তে পারি তবে আবার পুতুলরাজ কায়েম হবে। পুতুলের রাজাকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তবে আবার পরদেশী পটুয়া নতুন আদলে পুতুল গড়বে। পরিশেষে তবুও বলব শেখ মুজিবুর রহমান আমার চোখে গ্রীক ট্রাজেডীর করুণ চরিত্র—শ্রেণী চেতনায় সঙ্কীর্ণ ঈর্ষার বিদ্বিষ্ট, ভালবাসার অকৃত্রিম কিন্তু দুর্বলতায় আকীর্ণ একজন নশ্বর মানুষ। ক্ষমতার অঙ্গনে তাঁর সদম্ভ পদচারণা কখনো ভীতি, কখনো করুণার সৃষ্টি করেছে। সত্য ভাষণে তিনি ভ্রূকুটি করেছেন, প্রতিবাদীকে রোষাণলে ভস্ম করতে চেয়েছেন এবং মিথ্যা ভাষণে তুষ্ট হয়েছেন। দেশকে ভাল-বাসতে গিয়েও তিনি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। জীবন দিয়ে তাকে সেই মূল্য শোধ করতে হয়েছে। বাংলাদেশ অমর হোক, স্বাধীনতা দীর্ঘ-জীবী হোক।

পরিশিষ্ট

কেন মুজিবকে মরিতে হইল ?

যদিও শেখ মুজিবের উৎখাত সম্পর্কে দেশবাসী অল্পবিস্তর সবই জানেন, তৎসত্ত্বেও এই বিপ্লবের কর্ণধার লেঃ কর্নেল ফারুকুর রহমান নিজে এ সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য রাখিয়াছেন। লণ্ডনের 'সানডে টাইমস' পত্রিকার ১৯৭৬ সনের ২৬শে মে ইহা প্রকাশিত হয়। নিজের স্বাক্ষরযুক্ত এই নিবন্ধে কর্নেল ফারুক বলিতেছেন :

'আমি দৃঢ়তার সাথে বলিতেছি ইহা (শেখ মুজিবের উৎখাত) ছিল জাতীয় মুক্তির একটি পদক্ষেপ। উহারা (বাংলাদেশ সরকার) প্রকাশ্যে বলুক যে ইহা ছিল একটি অপরাধ। ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থান আমিই ঘটাইয়াছি এই জন্য যে আমার দেশ সোজাসুজি জাহান্নামে যাইতে-ছিল। দেশকে দোজখের অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আমি এই কাজ করিয়াছি।

মুজিবকে চলিয়া যাইতে হইয়াছে। কারণ, আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি-তাম যে, যদিও তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহার আওয়ামী পার্টির তাঁবেদারদিগকে একদিকে যেমন লুটপাটে লেলাইয়া দেন অন্যদিকে তিনি তাহাদিগকে তেমনি রক্ষাও করেন। এই আওয়ামী পাণ্ডারা ঢাকার টঙ্গিতে এক যুবতী গৃহবধূকে ধর্ষণ এবং হত্যা করে। যখন আমরা শেখ মুজিবের কাছে ইহার বিচার চাইতে যাই তখন শেখ মুজিব তাহাদেরকে মুক্ত করিয়া দেন এবং আমরা অপরাধীদের বিচার দাবি করিলে তাঁহারা আমাদিগকে উপহাস করে।

'শেখ মুজিবকে চলিয়া যাইতে হইয়াছে। কারণ তিনি নির্মমভাবে তাহার রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যা করেন। ইহার বিরুদ্ধে বলার মত সরকারের যদি কোন বক্তব্য থাকে অথবা যদি কোন সাক্ষী-সাবুদ থাকে তাহা হইলে উহা বলা বা উহা দাখিল করার জন্য আমি সরকারকে আহ্বান জানাই। হত্যার আগে এবং পরে এই ধরনের ব্যক্তিকে (শেখ মুজিবকে) আইনের দৃষ্টিতে হত্যাকাণ্ডের নায়ক হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে শেখ মুজিবের কথা ছাড়া আর কোন আইন ছিল না। আমি চাহিয়াছিলাম বাংলাদেশে অপরাধ এবং তাহার শাস্তির একটি নজীর প্রতিষ্ঠিত হউক।''

অতঃপর কর্নেল ফারুক বলেন : ৪টি কারণে শেখ মুজিবের পতন হইয়াছিল।

(১) ব্যক্তিক্ষমতার উদগ্র লালসায় তিনি এমন একটি জাতিকে দাস বানাইয়াছিলেন, যে জাতি স্বেচ্ছায় তাঁহাকে পিতৃত্বে বরণ করিয়াছিল। মুজিবের ধোকাবাজি রাজনীতি ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়াছিল অথচ তাঁহার উচিত ছিল সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি সংবাদ-পত্রকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি জাতীয় সংসদকে রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করিয়াছিলেন। হাজার হাজার ব্যক্তিকে তিনি জেলে নিক্ষেপ করেন। কারণ রাজনৈতিক বিরোধিতা সহ্য করা তাঁহার ধাতে ছিল না।

(২) মুজিব এবং তাঁহার পরিবার, তাঁহার আওয়ামী পান্ডারা এবং দুর্নীতিবাজ অফিসারগণ দেশকে শোষণ এবং লুণ্ঠন করে। পক্ষান্তরে দেশের বাদবাকী মানুষ জঠর জ্বালায় ছটফট করিতে থাকে।

(৩) মুজিবের অপদার্থ ও দুর্নীতিবাজ প্রশাসন আমার সাধের জন্মভূমিকে বিদেশের কাছে বেশ্যা বানায়। সব সময় ভিখারীর ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া তিনি আমাদিগকে বিদেশের দরবারে ঘৃণার বস্তু করিয়া তোলেন।

(৪) সবশেষে মুজিব তাহার ঈমান অর্থাৎ পবিত্র ইসলামের সাথে বেঈমানী করেন। ইসলাম একটি শ্বাশত জীবনাদর্শ। যাহা আমার জনগণের ধর্ম এবং এই ধর্মই আমাদের অগ্রাভিযানে আমাদিগকে আদর্শের দিক নির্দেশ করিতে পারে। এইভাবে মুজিব সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে এমন একটি দেশকে প্রায় ধ্বংস করেন, যে দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারই (মুজিব) ভাষায় ৩০ লাখ লোক ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়াছে।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সেনাপতি নির্বাসনের নেপথ্য কাহিনী

কর্নেল ফারুক ইহার পর বলেন : ব্যক্তিগত ক্ষমতার জন্য আমার কোনদিনই কোন লালসা ছিল না। তাই আমার সহকর্মী কর্নেল আবদুর রশীদ আমাকে পরামর্শ দিলেন যে শেখ মুজিবের বদলে প্রধান রাজনীতিবিদ খন্দকার মোশতাক আহমদকে প্রেসিডেন্ট করা যাইতে পারে। এই প্রস্তাবে আমি রাজী হইয়া যাই। আমরা ঠিক করি, খন্দকার মোশতাক জাতীয় পুনঃ-গঠনের কাজে নিয়োজিত থাকিবেন। তবে ইহার সাথে আমি দাবি করি যে, সেক্ষেত্রে মেজর-জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ বানাইতে হইবে। আমি ভাবিয়াছিলাম যে তিনি (জেঃ জিয়া) সেনা-বাহিনীকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবেন এবং ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিবেন। এই সেই সেনাবাহিনী যারা তাঁহার (শেখ মুজিব) কাছে নিদারুণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে।

বিপ্লবে 'বিদেশের হাত' প্রসঙ্গে :

রুশ-ভারতের যে সমস্ত দালালরা আজ আগস্ট বিপ্লবকে 'বিদেশী চক্রান্ত' বলিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কানীমূলক প্রচার চালাইতেছে এবং এ সরকারও বিশেষ করিয়া স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মুখ সেলাই করিয়া রাখিয়া যেভাবে এই মিথ্যাকে প্রচার করিবার সুযোগ দিতেছেন, তাহাদের প্রত্যেকের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, কোন অবস্থা হইতে ১৫ই আগস্টের বিপ্লব দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করিয়াছে। জাতির বিবেককে স্বৈরাচারের বিবর হইতে মুক্ত করা জাতীয় মুক্তিরই সামিল। রুশ-ভারতের দাসত্ব মুক্ত হইবারও প্রথম পদক্ষেপ ১৫ই আগস্টের বিপ্লব। সাম্রাজ্যবাদ এবং আধিপত্যবাদ বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে সংহত করিবার এই বিপ্লব তাহা হইলে কিভাবে বিদেশী হাতের সাহায্যে হয়? তদুপরি, এটি লক্ষণীয় যে, বিপ্লবের পর দেশান্তরিত বিপ্লবের সৈনিকদেরকে আশ্রয় দেয় চরম আমেরিকা বিরোধী দেশ লিবিয়া। তাই রুশ-ভারতের সেবাদাসদের এই হীন অপপ্রচারের পিছনে সত্য কতটুকু তাহা যে কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন।

সশস্ত্র বাহিনীর হাতিয়ারের আঘাতে কোন সরকারকে ঘায়েল করা যখন তখনই পারা যায় কিন্তু সরকার উৎখাত যদি একটি বিপ্লব হয় তাহা হইলে অবশ্যই ওই উৎখাতকে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে গ্রহণ করিবে। সুতরাং জনগণ, সশস্ত্র বাহিনীর সমস্ত ইউনিট, প্রশাসনযন্ত্র, ছাত্র, কৃষক শ্রমিক বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সমাজের সকল অংশের গ্রহণযোগ্যতা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা বাছিয়া নেন ১৫ই আগস্টকে।

এই দিনটিকে বাছিয়া নেওয়া হয় কেন?

দেশবাসীর হয়তো স্মরণ আছে ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট ছিল একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐদিন বাংলাদেশের নবগঠিত ৬০টি জেলার ৬০ জন মুজিবী বাকশালী গভর্নরের ট্রেনিং শেষ হইবার কথা ছিল। ট্রেনিং শেষ হইলে নিজ নিজ জেলায় ফিরিয়া যাইয়া তাহারা জেলা প্রশাসকের ক্ষমতা দখল করিতেন। জেলা গভর্নর এবং জেলা বাকশাল-সেক্রেটারী এই দুইজন মিলিয়া জেলার দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা সেক্রেটারী এই দুইজন মিলিয়া সাজিতেন। তাহাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকিত সংশ্লিষ্ট জেলায় অবস্থানরত রক্ষীবাহিনী, সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ প্রভৃতি। ফলে বাকশাল পদ্ধতি একবার চালু হইলে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ একবার ঐ বাকশালী

জোয়ালে আটকা পড়িলে সারা জিন্দেগী উহার অক্টোপাশে বন্দী থাকিতেন। সম্ভবতঃ তাই আওয়ামী চাঁইরা ঐ সময় সদম্ভে ঘোষণা করিতেন 'আওয়ামী লীগ অন্ততঃ আরও পঁচিশ বছর রাজত্ব করিবে।'

ইহাছাড়া ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া ছাত্র ও শিক্ষক মন্ডলীর উদ্দেশ্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিবার কথা ছিল। সরকারের অত্যন্ত উচ্চ মহল হইতে এই কথাটি ফাঁস হইয়া গিয়াছিল যে শেখ মুজিব এই সমাবেশে এমন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাঠামোর রদবদলের কথা ঘোষণা করিবেন যাহার ফলে বাংলাদেশ তাহার আপন স্বাধীন সত্তা হারাইয়া দ্বিতীয় সিকিমে পরিণত হইবে।

সুতরাং ১৫ই আগস্ট হইয়া পড়িত বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের পরাধীনতার দিন। এই পরাধীনতা হইল বাকশালী জমিদারদের কাছে কোটি কোটি মানুষের প্রজা হইবার দিন। দিল্লীর কাছে ঢাকার গোলামী পাকাপোক্ত করার দিন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে বিএসএফ-এর একটি ইউনিটে পরিণত করার দিন।

সুতরাং হাতিয়ার তুলে নাও :

তাই আর অপেক্ষা করা যায় না। দেশের আজাদীকে বাঁচাইতে হইলে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মুজিবী মহাজনদের রাহুগ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে হইলে, এবার হাতিয়ার তুলিয়া নিতে হইবে, হইলও তাই।

রজনীর মধ্য প্রহরে ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট মহড়ার নাম করিয়া ক্যান্টনমেন্ট হইতে বাহির হইয়া পড়ে। ঐদিকে গোলন্দাজ বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট ছাউনিতে স্ট্যান্ডবাই থাকিয়া যায়।

—ইত্তেহাদ আগস্ট ১৫, ১৯৭৯

'ওলট-পালট করে দে মা—লুটেপুটে খাই'

—এস. মুজিবউল্লাহ্

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পকিস্তানে) বস্ত্রকল ছিল মাত্র পাঁচটি। ঢাকা জেলায় চিত্তরঞ্জন কটন মিলস, লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস, ঢাকেশ্বরী কটন মিলস এবং কুষ্টিয়া জেলায় মোহিনী মিলস। এ ছাড়া চারটি মাত্র ছিল চিনি কল। রাজশাহী জেলার গোপালপুরে উত্তর-বঙ্গ সুগার মিলস, রংপুর জেলায় মহিমাগঞ্জ সুগার মিলস, সেতাবগঞ্জে ইস্ট বেঙ্গল সুগার মিলস ও কুষ্টিয়ার দর্শনায় কেরু কোম্পানী। সবেধন

নীলমণি এই ক'টি মাত্র মিল ছাড়া এ অঞ্চলে কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প-কারখানা ছিল না। এদিকে যদিও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল বলে বাংলাদেশের খ্যাতি ছিল, কিন্তু একটাও পাটকল ছিল না এ অঞ্চলে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত মোট ২৪ বছরে এ অঞ্চলে পাটকল স্থাপিত হয় ৭৬টি, বস্ত্রকল স্থাপিত হয় ৫৯টি এবং চিনিকলের সংখ্যা দাঁড়ায় আগের চারটিসহ মোট ১৫টি। এ ছাড়া বহু ইস্পাত কারখানা, রাসায়নিক কারখানা, কাগজকল, ঔষধের কারখানা, চামড়া ও জুতার কারখানা স্থাপিত হয়। শিল্পায়নের এই ধারাকে মোটা-মুটিভাবে সন্তোষজনক বলা চলে। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর এই ধারা আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং এই স্তব্ধতা এখনও চলছে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলে তৎকালীন শাসকদের সামনে একটা সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয়। সমস্যা হলো,—পরিত্যক্ত (বিশেষতঃ পাকিস্তানী) কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, বীমা ব্যবসায় প্রভৃতি কিভাবে পরিচালিত হবে। '৭১-এর পাক-ভারত যুদ্ধের শেষের দিকে পরিত্যক্ত মালিকরা আত্মরক্ষার জন্য কলকারখানা ও ব্যবসা-পাতি ফেলে রেখে এ দেশ ত্যাগ করে বা করতে বাধ্য হয়। ফলে, অনুপস্থিত মালিকদের ব্যবসা-পাতি পরিচালনার জন্য নব্য শাসকগোষ্ঠী গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয়করণের নীতি! উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নতুন শাসকরা ক্ষমতারোহণের পূর্বে ব্যাঙ্ক, বীমা ব্যবসায় ও কল-কারখানা ইত্যাদি কোনদিন জাতীয়করণ করা হবে এমন দাবি তোলেননি কিংবা তৎকালীন শাসকদলের ম্যানিফেস্টোতেও জাতীয়করণের কোন কথা কোনদিন ছিল না। এমনকি '৭০-এর নির্বাচনেও তারা রাষ্ট্রীয়করণের প্রোগ্রাম ঘোষণা করেননি। তথাপি পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবেলা করার নামে তারা কল-কারখানা ও ব্যাংক-বীমা ব্যবসায় ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়-করণ করার নীতি গ্রহণ করে। সংগে সংগে মুসলমান বাঙালী মালিক-দের কারখানাগুলোও এই নীতির আওতায় নিয়ে আসা হয়, বলা হয় এরা পাকিস্তানপন্থী।

পরবর্তী পরিস্থিতি দৃষ্টে একথা বলা আদৌ অযৌক্তিক হবে না যে, এই রাষ্ট্রীয়করণ যথার্থ অর্থে পার্টিকরণ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এতে দু'টি কাজ একসঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল।

প্রথমতঃ, ক্ষমতাসীন-দল লুট-পাটের মাধ্যমে দলীয় তহবিল গঠন করতে সমর্থ হয় এবং ব্যক্তিগত পর্যায়েও দলীয় নেতারা প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ, কল-কারখানাগুলো লোকসানের কারবারে পরিণত করে ও ভারতে বিভিন্ন কাঁচামাল বিশেষতঃ পাট রপ্তানির ব্যবস্থা (প্রকাশ্যে ও চোরাই পথে) পাকাপোক্ত করে। তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী প্রথম যে পাঁচশালা পরিকল্পনাটি (১৯৭৩-৭৮) গ্রহণ করে, তাকে তারা অভিহিত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সোপান হিসেবে। আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো, তথাকথিত এই সমাজতান্ত্রিক সোপান বেয়ে জাতি ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে এগিয়ে গেছে না অধঃপাতের দিকে নেমে গেছে।

যা হোক ইতিপূর্বে এদেশের কোন কোন দল ও দলীয় নেতারা দেশবাসীকে এই ধারণা দেবার চেষ্টা করতো যে, পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের দৌরাত্ম্যে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) এ অঞ্চলে পুঁজি গঠন সম্ভব নয়। কেননা, পূর্ব পাকিস্তানীদের ভাগ্যের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে আছে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজি। কথাটার সত্যতা কতটুকু, তা আওয়ামী-বাকশালীদের শাসনামলে এ দেশে পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। মিথ্যা নয় যে, এ অঞ্চলের বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ, কাঁচামাল ও অপেক্ষাকৃত সস্তা শ্রমশক্তি পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের দৌলৎ বৃদ্ধিতে যতটা সহায়তা করেছিল সেই তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানী (বর্তমান বাংলাদেশী) ব্যবসায়ীদের পুঁজি গঠনে ততটা সহায়তা করেনি। তার জন্য অবশ্য বাংলাদেশের মুসলমান ব্যবসায়ীদের আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রথমদিকে না বোঝা, প্রাথমিক পুঁজির অভাব ইত্যাদি কম দায়ী ছিল না।

একথা সুবিদিত যে, মুসলিম ব্যবসায়ীদের পুঁজি গঠনের এক বিরাট সম্ভাবনা নিয়েই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল এবং আমরা দেখেছি প্রথম দিকে পশ্চিমা মুসলিম ব্যবসায়ীরা সামান্য কয়েক লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বেশ ভাল অংকের পুঁজি গঠন করতে সক্ষম হয়। এদের সাহায্য করেছিল আমলা গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন ব্যাংক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতের টাটা আটপুরুষ ধরে নানা ধরনের ব্যবসা করে যে পরিমাণ পুঁজি গঠন করতে সক্ষম হয়েছে, পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের অনেকেই মাত্র এক পুরুষেই প্রায় টাটার সমান মূলধন গঠন করতে সমর্থ হয়। বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের

ধারণা ছিল, পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের প্রতিযোগিতা না থাকলে অর্থাৎ বাংলাদেশ সৃষ্টি হলে, তারাও অল্পদিনের মধ্যেই আশানুরূপ মূলধন গঠন করতে সক্ষম হবে। হয়ত তা হতেও পারত; কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল, বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর ভুলনীতির দরুন বাংলাদেশে পুঁজি গড়ে তো উঠলোই না, অন্যপক্ষে কল-কারখানা আর ক্ষেত-খামারে সম্পদ যা সৃষ্টি হলো, তা পুঁজিতে রূপান্তরিত হবার পরিবর্তে কোন্ গহ্বরে যে তলিয়ে গেল, তার হদিসই পাওয়া গেল না।

বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর দেশে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হলো, যাতে অভিজ্ঞ ও বুনিয়াদী ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার পরিবেশই র'ল না, পক্ষান্তরে দেশে এমন এক অব্যবসায়ী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটলো যাদের ব্যবসা করার কোন অতীত অভিজ্ঞতা ছিল না। এক একটা ব্রীফকেস মাত্র সম্বল করে শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায় এই নব্য ভুঁইফোড় শ্রেণী দুই হাতে টাকা কামাতে লাগলো। কিন্তু সেই টাকা পুঁজিতে পরিণত হবার পরিবর্তে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে সহায়তা করলো সাংঘাতিকভাবে।

বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর দেশে যে পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে হিসেব করলে দেখা যাবে তার সামান্য অংশই পুঁজিতে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে সৃষ্ট সম্পদের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছে ক্ষুদ্র একটা শ্রেণীর ব্যক্তিগত ভোগে। ইউরোপে শিল্প বিকাশের যুগে যেমন দেখা গেছে,—ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণী জাতীয় পুঁজি গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে; বাংলাদেশে এই নব্য ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে সেই ভূমিকার লেশমাত্র দেখা যায়নি। বরং কল-কারখানা, ব্যাংক-বীমা প্রভৃতি জাতীয়করণের মাধ্যমে সমাজ নির্মাণের যে শ্লোগান চালু হয়েছিল, সময়ে দেখা গেল, সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে দেশে কায়েম হয়েছে এক লুটপাটতন্ত্র, যে তন্ত্রের একটা মাত্রই মূলনীতি,—"ওলট-পালট করে দে মা—লুটেপুটে খাই।" এই লুটে নেবার মূলমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণকারী বিপুল সংখ্যক অব্যবসায়ী শ্রেণী দেশের লাভজনক শিল্পগুলোকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে এবং দেখা যায়, জনগণের টাকায় গড়ে উঠা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কোটি কোটি টাকা ভর্তুকী দিয়েও শিল্পগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না।

এবার নীতিগতভাবে আমরা একটা মূল প্রশ্নের সমাধান করে নিতে চাই। 'রাষ্ট্রীয়করণ মানেই কি সমাজতন্ত্র?' সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যাঁর প্রাথমিক ধারণা আছে তিনিই স্বীকার করবেন যে, রাষ্ট্রীয়করণ মানেই সমাজতন্ত্র নয়! এ বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক দর্শনের প্রবক্তা মার্কস, এঙ্গেলস,

লেনিন, স্টালিনের এত দ্ব্যর্থহীন উক্তি রয়েছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই তাকে সমাজতন্ত্র ভাববার কোন অবকাশ নেই। আমরা জানি, এ দেশীয় জনগণকে ভাওতা দেবার জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের সস্তা শ্লোগান দিয়ে ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী ও ক্ষমতার আশ্রয়ে লালিত ও পুষ্ট কিছু ভুঁইফোড়ের দল রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ব্যবসার প্রশাসক-পরিচালক বনে যায়। কিন্তু প্রশাসক-পরিচালক হয়ে তারা কি করে? মা-ত ওলট-পালট করে দিল আর তারা শুরু করল লুটপাট। খুব সামান্য দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকটা শিল্প-কারখানায় ঘটল ব্যাপক উৎপাদন হ্রাস। বাংলাদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই উৎপাদন হ্রাসের নেপথ্য কাহিনী খুব সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যেও (প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনের কালাকানুন বাঁচিয়ে) এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় যে, এ সংক্রান্ত কোন তথ্যই আর জনসাধারণের অগোচর র'ল না। (এবারেও জুট সেক্টর ৯০ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে: ইত্তেফাক) শাসক গোষ্ঠীর তরফ থেকে উৎপাদন হ্রাসের যে সব অজুহাত তোলা হতো, তার মধ্যে প্রধান হলো,---নয় মাসের যুদ্ধ ও তজ্জনিত ধ্বংস। অথচ কে না জানেন যে, '৭১-এর যুদ্ধের বছর নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে তেমন কোন শিল্প প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বা উৎপাদন ব্যাহত হয়নি। মরহুম ডঃ মাজহারুল হকও একই বক্তব্য রেখে গেছেন। আসলে যুদ্ধটা একটা অজুহাত মাত্র। তাছাড়া জাতিসংঘের ত্রাণ কমিটির এক হিসাব থেকেও জানা যায়, বাংলাদেশের যুদ্ধজনিত সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে বাংলাদেশে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল তের গুণ বেশী।

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎসও হচ্ছে এই পাট। এই পাট নিয়েই চল্‌ল তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতি। আমরা লক্ষ্য না করে পারিনে যে, ১৯৫১ সালে এই দেশে প্রথম চটকল স্থাপিত হবার পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই কুড়ি বছর সময়টি ছিল পাটশিল্পের অগ্রগতির কাল। অথচ এই পাটশিল্পই রাষ্ট্রীয়করণ নীতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সব থেকে বেশী। আমরা লক্ষ্য করেছি, ১৯৫৮-৫৯ সালে এই শিল্পে তাঁতের সম্প্রসারণ ঘটেছিল ৮,০০০। তারপর '৬৪-৬৫ সালে তাঁতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১১,০০০-এ এবং '৬৯-৭০ সালে ২১,৪০০। বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) এই ২১,৪০০ তাঁত থেকে উৎ-

পাদন হয়েছিল ৫,৬০,০০০ টন পাটজাত পণ্য। বর্তমানে তাঁতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৫,৭০০; কিন্তু উৎপাদন রয়ে গেছে ১৯৬৯-৭০ সালেরও নীচে।

বাংলাদেশের পাটকলগুলো রাষ্ট্রীয়করণের পর তৎকালীন পাটমন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য নয়া পাটনীতি উদ্ভাবন করেন। তৎকালীন শাসক-দের অতি উৎসাহী অংশ আহ্লাদ করে এই পাটনীতির নামে দেয় 'সমাজতান্ত্রিক পাটনীতি।' তথাকথিত এই সমাজতান্ত্রিক পাটনীতির দৌলতে বাংলাদেশের পাটশিল্পে নেমে আসে ধ্বংসের কালো ছায়া। পাটমন্ত্রী আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের পাটের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের সংগে এমন এক চুক্তিতে দেশকে আবদ্ধ করেন, যাতে আমাদের পাটের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। একদিকে বাংলাদেশের কাঁচা পাট বিক্রির ক্ষেত্রে দেখা দেয় সংকট, অন্যদিকে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ প্রশাসনের হাতে পড়ে পাটকলগুলোতে চলে উৎপাদনের নামে নৈরাজ্য। সাবেক পাকিস্তান সরকারের ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় এটা ধারণা করা হয়েছিল যে, ১৯৭৫ সাল নাগাদ পাটশিল্পে তাঁতসংখ্যা বাড়ানো হবে ১৫,০০০ এবং মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৪০,০০০। পাকিস্তানী আমলের পাটশিল্পের বিকাশের ধারা অনুসরণ করলে এটা অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকে না যে, এই লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চয়ই অর্জিত হতো। বলা বাহুল্য, এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে, আমাদের দেশেই কাঁচা পাট ব্যবহৃত হতো ৬০ লাখ বেলেরও বেশী। ফলে, কাঁচাপাটের মূল্যে স্থিতিশীলতা বিরাজ করা ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ ১৯৬৯-৭০ সালের ৩৭৪ কোটি টাকা থেকে ১৯৭৭-৭৮ সাল নাগাদ ১১০০ কোটি টাকায় উন্নীত হতো, সঙ্গে সঙ্গে পাটকল শ্রমিকের সংখ্যা বর্তমানের ১ লক্ষ ৯০ হাজার থেকে বেড়ে প্রায় ৩ লক্ষে দাঁড়াতো। কিন্তু সরকারের ভ্রান্ত রাষ্ট্রায়ত্ত নীতির দরুনই তা হয় নাই,—হতে পারে নাই।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত অন্যান্য শিল্পের অবস্থা, বলা বাহুল্য, পাট-শিল্পের চেয়ে একটুও ভাল নয়। তবু পাটশিল্পের দিকে আমরা বেশী লক্ষ্য করছি এই কারণে যে, এটা এখন পর্যন্ত প্রধান শিল্পখাত। আমাদের অর্থনীতির প্রাণ-ভোমরার অবস্থানটা মূলতঃ এখানেই। বলা বাহুল্য যে, বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক কৃষকের প্রধান অর্থকরী ফসল এই পাট। এই পাট বিক্রি করেই কৃষকের ঘাটতিপড়া খাদ্য,

সারা বৎসরের কাপড়-চোপড়, ছেলের পড়ার খরচ, মেয়ের বিয়ে ইত্যাদি তাবৎ খরচ সম্পন্ন হয়। কাজেই বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির অনন্য এই খাতটির প্রতি আমরা একাগ্র মনোযোগ না দিয়ে পারি না! অথচ স্বাধীনতা উত্তর সরকারের ভ্রান্তনীতির ফলে বাংলাদেশে এই পাট (কৃষি উৎপাদন ও শিল্প উৎপাদনসহ) তার সমস্ত সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলেছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রথম থেকেই বাংলদেশের পাটের টাকায় ডানডি, কলকাতা, বোম্বাই, পিণ্ডি, ইসলামাবাদসহ অনেক আধুনিক শহর ও বন্দর গড়ে উঠেছে। পাকিস্তানী শাসনমুক্ত এই বাংলাদেশে পাটের যে কি বিপুল সম্ভাবনা ছিল তা ধারণা করা যায় না। পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পাটকলগুলোতে ৪০ হাজার তাঁত বৃদ্ধির সম্ভাবনা আশা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাটশিল্পে তাঁতসংখ্যা বৃদ্ধির পাকিস্তানী পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কারণ, 'পরশাসনের' কাল থেকে 'স্ব-শাসনের' কালে উপনীত হবার পর এই আকাঙক্ষা করা আদৌ অস্বাভাবিক নয় যে, আমাদের শিল্পখাত অনেক অনেক বেশী প্রাধান্য পাবে।

অবশ্য রাজনৈতিক ভাষণ দিতে যথেষ্ট প্রাধান্য দেয়াও হয়েছিল। কিন্তু কার্যতঃ আমরা এর উল্টো চিত্রটাই দেখতে পেয়েছি। আমরা লক্ষ্য করি যে, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত প্রথম থেকেই বিদেশে কাঁচা পাট রপ্তানির নীতি ত্যাগ করে ক্রমাগত সমস্ত কাঁচা পাট দেশীয় কারখানার ব্যবহারের নীতি গ্রহণ করে। এবং ক্রমে ক্রমে ভারতীয় কারখানাগুলো এই নীতির অনুকূলে এতদূর বিকশিত হয় যে, তাদের কাঁচা পাট রপ্তানির আর কোন প্রয়োজনই থাকে না। পাকিস্তানী আমলের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশে কাঁচা পাটের উৎপাদন হতো ৭০ থেকে ৭৫ লক্ষ বেল। পাকিস্তানী আমলের পাটশিল্পের বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশে এই ১৯৮০ সাল নাগাদ অর্জিত পাটশিল্পে মোট তাঁতের সংখ্যা দাঁড়াতো প্রায় ৫০ হাজার এবং '৭০-৭৫ লাখ বেল পাটই দেশীয় কারখানায় ব্যবহৃত হতে পারতো। ফলে বাংলাদেশকেও বিদেশে কাঁচা পাট রপ্তানি করতে হয়তো হতো না। কিন্তু একটামাত্র ভুল নীতির জন্যে এই সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অথচ অত্যন্ত বাস্তবভাবেই আশা করা যায় যে, বাংলাদেশের সমুদয় কাঁচা পাট দেশীয় পাটকলগুলোতে ব্যবহার করা সম্ভব হলে জাতীয়

অর্থনীতিতে একটা বিপুল তেজী ভাবের আবির্ভাব ঘটতো। বললে উপকথার মত শোনাবে, এই একটা মাত্র খাত থেকে বছরে সাড়ে ১৩ শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করাও সম্ভব হতো এবং শিল্প বিকাশের ধারায় একটা বিপুল দক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটতো। কিন্তু এ সব কিছুই হয়নি। '৬৯-৭০ সালের উৎপাদনের পর্যায় এই দশ বছরেও আমরা অতিক্রম করতে পারিনি।

পাকিস্তানে প্রথম চটকল স্থাপিত হয় ১৯৫১ সালে। ১৯৭১ পর্যন্ত এই শিল্প বিকাশের ধারায় আমরা যে বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করি, সেই তুলনায় এই '৮০ সাল পর্যন্ত এই শিল্পে বস্তুতঃ কোন বিকাশই ঘটেনি। ১৯৬৯-৭০ সালে একটি তাঁত থেকে যেখানে গড়ে বার্ষিক সাড়ে ১৬ টন উৎপাদন হয়েছে, '৭৭-৭৮ সালে সেখানে উৎপাদন কমে গিয়ে ১১.৭৮ টনে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ চটকল সমিতির প্রতিবেদনে জানা যায়, চট তৈরীর ক্ষেত্রে ১৯৬৯-৭০ সালে গড়পড়তা বার্ষিক ৪১.২২ টন উৎপাদনের স্থলে ১৯৭৭-৭৮ সালে উৎপাদিত হয়েছিল মাত্র ৩২.০০ টন। কার্পেটের অনুকূলে যে অংক তাও হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৬৯-৭০ সালে ৪২.১০ টনের স্থলে উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৩৩.২৮ টন। তুলনামূলক অংক থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, সরকার হাতে নেওয়ার পর থেকে মিলগুলোতে যদি ১৯৬৯-৭০ সালে অর্জিত দক্ষতার সাথে কাজ চলতো তা হলে তারা প্রকৃত উৎপাদন ৫,৪৬,০০০ টনের স্থলে ১৯৭৭-৭৮ সালে ৭,১০,০০০ টন উৎপাদন করতো। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে ঘটেছে উৎপাদন হ্রাস এবং এভাবে উৎপাদনে বার্ষিক ঘাটতি ২৫% এসে দাঁড়িয়েছে। এই উৎপাদন হ্রাসের কারণ কি? এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কাঁচামালের অভাব এর কারণ নয়। তা'হলে এর একমাত্র কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত পরিচালনা ব্যবস্থাই।

আমরা জানি, পৃথিবীর কোন কোন দেশে শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রীয়করণ করার পর উৎপাদনের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। তাহলে নিছক রাষ্ট্রীয়করণই যে এর একমাত্র কারণ নয় তাও বুঝা যাচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করি যে, রাষ্ট্রীয়কৃত অন্যান্য দেশের শিল্পে যেখানে পরিচালন বিভাগে অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখা গেছে, সেখানে আমাদের দেশে দেখেছি সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। একজন বৃদ্ধ শ্রমিক আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন যে, আদৌ কোন পরিচালন ব্যবস্থা না থাকলে উৎপাদন ঘাটতি হতো অনেক কম। অর্থাৎ বাংলাদেশী রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর পরিচালন ব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধিতে

সহায়তা করার পরিবর্তে গ্রহণ করেছে বিপরীত ভূমিকা। কিন্তু এর কারণ কি? এবং এর জন্য দায়ী কে?

বস্তুতঃ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানই আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর দেখা গেল, বাংলাদেশের চটকলগুলোর অধিকাংশের মালিক পাকিস্তানী। দেশীয় মালিকরাও ঘটনাচক্রে 'অধিকাংশই পাকিস্তানপন্থী'। এই পাকিস্তানী ও পাকিস্তানপন্থীদের বিরুদ্ধে ৯ মাসের সংগ্রামের পরই বাংলাদেশ অর্জিত হয়েছে। কাজেই অনুপস্থিত ও বাঙালী মালিকদের কল-কারখানাগুলো পরিচালনার জন্যই সরকার রাষ্ট্রীয়করণের নীতি গ্রহণ করেন এবং বাঙালী মালিকদেরকে আখ্যা দেন "বৈরী মালিক।" এটা যে কেবলমাত্র ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও কর্মীদের ভোগ করার জন্য তা বলাই বাহুল্য।

রাষ্ট্রীয়করণ নীতি গ্রহণ করার পর মিল-কল-কারখানাগুলোর পরিচালনার ক্ষেত্রে এক আজব ব্যাপার দেখা গেল। আজব এই অর্থে যে, পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণের জন্য ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাশ্রয়ী রাজনৈতিক মহলে এক নগ্ন প্রতিযোগিতা শুরু হলো। প্রশাসক নির্বাচনের ব্যাপারে কোন সুষ্ঠু পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হলো না। যে যেমন পারলো মিলগুলো দখল করলো ভারত আক্রমণকারী আলেকজাণ্ডারের চেয়েও আশ্চর্য ক্ষীপ্রতায়। দখল করার পর কি হলো? আমরা দেখলাম, অল্পদিনের মধ্যেই কারখানাগুলোতে উৎপাদন ও পরিচালনে ভয়াবহ নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। কারখানাগুলোতে 'শ্রমিক অসন্তোষ' একটা নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কারখানাগুলোতে যেটুকু শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষিত না হলে বস্তুতঃ উৎপাদনই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, এখানে সেটুকুও রক্ষা করা হলো না। শ্রমিকদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা বাধানো হতে লাগলো, গুম, খুন আর জখম হয়ে দাঁড়ালো নিত্যকার ঘটনা। এরকম অজস্র অভিযোগ আছে যে, ক্ষমতাশ্রয়ী শ্রমিক নেতারা ভুয়া শ্রমিকের তালিকা দাখিল করে লক্ষ লক্ষ টাকার বিল উঠাতো এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতো। প্রকৃত দেশপ্রেমিক শ্রমিকরা এই ঘৃণ তৎপরতায় বাধা দিলে তাদের উপর রাতের আঁধারে এমনকি প্রকাশ্যে দিনের বেলায় গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়া হতো। এই প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে দেখা যায়, শ্রমিক ও জনগণের এক বিপুল অংশের চরিত্র হনন-কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন

হয়েছে আর প্রকৃত শ্রমিকদের মধ্যে নেমে এসেছে হতাশা। এই অবস্থায় বর্ধিত উৎপাদন সম্ভব নয়। এমনকি উৎপাদনের পূর্বের মান রক্ষাও অসম্ভব?

তৎকালীন পাট প্রতিমন্ত্রীকে ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে সাপ্তাহিক বিচিত্রার পক্ষ থেকে সেক্টর কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন পাটকলগুলোর উপর্যুপরি লোকসানের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন তা যথার্থ প্রণিধানযোগ্য। তিনি স্বীকার করেছিলেন, লোকসানের জন্য বিশেষভাবে দুর্নীতি ও অদক্ষতাই দায়ী এবং এ ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ ও দুর্বল প্রশাসনও একটি সমস্যা।

পাট প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল, পাটকলসমূহের লোকসানের পরিমাণ ১৯৭১-৭২ সালে ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা, '৭২-৭৩ সালে ২৫ কোটি টাকা এবং '৭৩-৭৪ সালে (৭৪-এর মার্চ পর্যন্ত) ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ব্যাংকের কাছে জুট মিলের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ওভার ড্রাফট ৩৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা আর ডিবেঞ্চার ২৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ ঋণ ও লোকসানের জন্য পাটমন্ত্রী দায়ী করেছিলেন দুর্নীতি ও অদক্ষতাকে এবং সেক্টর কর্পোরেশনের পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ ও দুর্বল প্রশাসনকে।

আমরা জানি, কোন শিল্পে লোকসান ঘটবার পেছনে সচরাচর যেসব কারণ বর্তমান থাকে সেগুলো হলো কাঁচামালের অভাব, বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতার দরুন পণ্যের মূল্য হ্রাস, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভ্রাট কিংবা শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘটজনিত কারণে উৎপাদন হ্রাস। কিন্তু এক্ষেত্রে এসব কারণকে চিহ্নিত করা যায়নি। কাঁচামালের কোন অভাব ছিল না, বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা থাকলেও তাকে লোকসানের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়নি এবং সমস্যা হিসেবে যা যা চিহ্নিত করা হয়েছে তা ক্ষমতাসীন শাসকদেরই সৃষ্ট। একটা প্রশ্ন বিবেচনা করা যাক: কারখানায় অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল কেন? তৎকালীন পাট প্রতিমন্ত্রী এর কোন জবাব দেননি। কিন্তু জবাবটি কি দেশবাসীর অজানা? আদৌ নয়। তৎকালীন ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে বিভিন্ন রকম

বাহিনী পুষতো এবং এই সব বেসরকারী বাহিনীর লোকদের মালিক-বিহীন কারখানাগুলোর খাতায় নাম লিখানো হতো শ্রমিক হিসেবে। যেখানে মিলের প্রয়োজন ৫ হাজার শ্রমিকের, সেখানে এইভাবে বাহিনীর লোক নিয়োগ করতে করতে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াতো ৮ হাজার, ১০ হাজার। ফলে অনিবার্যভাবেই মিলগুলোতে লোকসান হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। যে ধরনের রাজনৈতিক সচেতনতা ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকলে ব্যক্তি মালিকানার বিপরীতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় উৎপাদন লাভজনক পর্যায়ে হওয়া সম্ভব, এখানে তার কিছুই ছিল না এবং এখনো নেই। 'লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন' এমনি একটা মনোভঙ্গি ছিল সর্বত্র বিরাজিত। এ অবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থের কারণে সুযোগ থাকলে লুটপাট অবশ্যম্ভাবী। তৎকালীন পাট প্রতিমন্ত্রী স্বীকার করেছিলেন, জাহাজে মাল উঠানোর ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের বেলায় জাহাজে জায়গা নেই অথচ প্রাইভেট পাটের বেলায় জায়গার অভাব নেই।

ব্যক্তি-মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা এই দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টা ভাল তার জবাব স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নিরপেক্ষভাবে দেয়া সম্ভব নয়। যে দেশে সম্পত্তির উপরে ব্যক্তির অধিকার পবিত্র বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় উৎপাদনে নৈরাজ্য দেখা দেয়াই স্বাভাবিক। বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়ার পৌরহিত্যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে অধনবাদী বিকাশের তত্ত্ব ফেরী করা হচ্ছে তা যে সমাজতন্ত্রের পথ নয় তা অভিজ্ঞতা থেকে ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বি. আর. টি. সি. রাষ্ট্র পরিচালিত একটি পরিবহন সংস্থা। এই সংস্থাটি জন্মের পর থেকে এ যাবত প্রায় আড়াই শত কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। অথচ আমরা জানি, কোন ব্যক্তি-মালিক যদি একখানা বাস রাস্তায় নামাতে পারে তার সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়েও সে পরের বছর আরেকখানা বাস কিনতে পারবে। এইভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার অনেক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীই দুই-একখানা বাস দিয়ে শুরু করে ২৫/৩০ খানা গাড়ীর মালিক হয়েছে। এরকম উদাহরণের অভাব নেই।

বি. আর. টি. সি. অলাভজনক এমনি লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে কেমন করে? একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, অন্যান্য সেক্টর কর্পোরেশনের মত এখানেও যে তন্ত্রটা কায়েম করা হয়েছে, সেটি নির্ভে-

জাল লুটপাট তন্ত্র। তেল চুরি, মবেল চুরি, টায়ার-টিউব আর যন্ত্রাংশ চুরি, শুধু চুরি আর চুরি। এই চুরি ঠেকাতে গিয়ে লোকের পরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে, কিন্তু চুরি বন্ধ হচ্ছে না। জানা গেছে, বি. আর. টি. সি'র প্রতিটি গাড়ীর পেছনে চোর আর চোরধরা মিলিয়ে কর্মচারীর সংখ্যা নাকি দাঁড়িয়েছে ৩১ জন করে। শুধু পাটকল বা বি. আর. টি. সি. নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টর কর্পোরেশনের আওতাধীন সমুদয় খাতেই কর্তব্যে অবহেলা, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, জনগণের সম্পদের অপচয় ও চুরি একটা সাধারণ ঘটনা। পরিমাণগত তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু ঘটনা সর্বত্র একই। বস্তুতঃ একটা সত্য সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে—আর তা হল, রাষ্ট্রায়ত্ত খাত আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ব্যর্থ। ভিন্ন রকম আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি যদি কখনও সৃষ্টি হয় তখন হয়তো রাষ্ট্রায়ত্ত খাত সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজে আর সব উপাদান ঠিক ঠিক আগের অবস্থানে বিদ্যমান থাকা অবস্থায়, রাষ্ট্রায়ত্ত-করণ ভিন্ন-রকম ফল দেবে, তা হতে পারে না। 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না।' ভিন্ন রকম পরিবেশে হয়তো এ প্রবাদ-বচন মিথ্যে হয়ে যেতে পারে তবে আমাদের দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এখনও এ প্রবচন যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে।

ভুল বুঝবার অবকাশ থাকতে পারে বলে পুনশ্চ উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, কঠোরভাবে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ব্যর্থ হতে বাধ্য, এটা আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই ভালভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা যদি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর গোডাউন থেকে প্রথম দিকের অগ্নিকাণ্ড ও তজ্জনিত মোট ক্ষয়-ক্ষতির হিসেবটা পর্যবেক্ষণ করি তা'হলে এই ব্যবস্থার ব্যর্থতার আর একটা নজীর আমরা দেখতে পাবো। বাংলাদেশ হবার পর থেকে ২৫শে জুন, ১৯৭৪ পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১৮ লক্ষ ৭০৭ মণ পাট পুড়ে গেছে। এতে কর্পো-রেশনের ক্ষতির পরিমাণ ৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা এবং পাটকলের ক্ষতির পরিমাণ ৩৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা---মোট ৮ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। 'সরকারী মাল দরিয়া মে ঢাল্'-এর একটি উদাহরণ হলো এই অগ্নিকাণ্ড।

যাই হোক, উপরের আলোচনার সারসংকলন করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশের শিল্পবিপ্লব সম্ভব করে তুলতে হলে দু'একটি ভারী শিল্পখাত ছাড়া সাধারণ শিল্পখাতগুলো

ব্যক্তি-মালিকানায় আনতে হবে, অন্যথায় রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানায় পরিচালিত করতে গেলে ব্যর্থতা আসবেই। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পুঁজি যেহেতু কোন একক ব্যক্তির নয়, কাজেই জনগণের সম্পদ লুট করে ব্যক্তিগত বিলাসের ভোগে অপচয় করা থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিরত থাকবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। দেশকে শিল্পায়িত করতে হলে, প্রথমে সম্পদের অপচয় রোধ করতে হবে। আমাদের বর্তমান সমাজ কাঠামোর রাষ্ট্রীয় মালিকানা-ধীন উদ্যোগসমূহে অপচয় রোধ অসম্ভব। পক্ষান্তরে সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ছাড়া পুঁজি গঠন আদৌ সম্ভব হতে পারবে না। শিল্পায়নের আরেকটি প্রধান শর্ত শ্রমিক সমাজ বা শ্রমিকশ্রেণী। এই শ্রমিকশ্রেণীর ধারাবাহিক দক্ষতা অর্জন একটি আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু আমরা দেখেছি '৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দক্ষতা অর্জনের যে ধারা বিদ্যমান ছিল পরবর্তীকালে সে ধারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এর পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। পরিশেষে শিল্পায়নের পক্ষে অপরিহার্য পূর্বশর্তসমূহ পুঁজি ও শ্রমশক্তির বিকাশের স্বার্থে আমাদের মোহমুক্ত মন নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। চিন্তা করে দেখতে হবে যে, একটা ভ্রান্ত নীতি আঁকড়ে থেকে আমরা উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহের কাঁচামালের যোগানদার আর শিল্পপণ্যের বাজার হয়েই থাকবো, নাকি সঠিক নীতি গ্রহণ করে আমাদের সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে শিল্পায়িত করে তুলবো। বিষয়টি জাতীয় স্বার্থের বিচারে এতই জরুরী যে, এ নিয়ে বৃথা সময় ক্ষেপ করা আর উচিত হবে না।

সরকারের বিনিয়োগ সিডিউলে বলা হয়েছে, ব্যক্তি-মালিকানার কল-কারখানা আর রাষ্ট্রীয়করণ করা হবে না, করলেও মালিককে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। কিন্তু যেসব দেশীয় মালিকের শিল্প অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের আজো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। দেশে বৈদেশিক পুঁজি লগ্নির আইন পাস হয়েছে। বিদেশী পুঁজি-মালিকদের আহ্বানও জানানো হচ্ছে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য। ফল কি হবে রাষ্ট্রনায়করাই জানেন। দেশীয় মালিকদের মন থেকে ভীতি কিন্তু এখনো কাটেনি। বিদেশীদের মধ্যেও ইতস্ততঃ ভাব রয়েছে। পরিস্থিতিটি এক কথায় খুবই নাজুক তাতে সন্দেহ নেই। দেশবাসী চায় সরকার অতিসত্বর এই বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। কারণ, শিল্পের বিকাশ ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও সম্প্রসারিত হওয়া অসম্ভব।

—ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৮০